তাফসীরে মাযহারী

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)

সপ্তম খন্ড

তাফসীরে মাযহারী

সপ্তম খণ্ড

পঞ্চদশ, ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ পারা
(সুরা বানী ইসরাইল থেকে সুরা আম্বিয়া পর্যন্ত)

কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

মাওলানা মোহাম্মদ অহিদুল্লাহ্ অনূদিত

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভূঁইগড়, পাগলাবাজার, নারায়ণগঞ্জ।

তাফসীরে মাযহারী ঃ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

অনুবাদক ঃ মাওলানা মোহাম্মদ অহিদুল্লাহ্

প্রকাশক ঃ হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

পরিবেশক ঃ সেরহিন্দ প্রকাশন
৮৯, যোগীনগর রোড, উয়ারী, ঢাকা-১২০৩।

প্রচ্ছদ ঃ বিলু চৌধুরী

কাতেব ঃ বশীর মেসবাহ্

মুদ্রক ঃ খন্দকার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ্
নাটোর প্রেস লিঃ
৮৯, যোগীনগর রোড, উয়ারী,
ঢাকা-১২০৩।
ফোন ঃ ২৩৯৪৯০, ২৩১০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ইং রমজান, ১৪২০ হিজরী
দ্বিতীয় হিজরী সনের ১৭ই রমজানে অনুষ্ঠিত বরকতময় বদর যুদ্ধের মহান স্মৃতিচারণ উপলক্ষে।

বিনিময় ঃ তিন শত টাকা মাত্র

TAFSIRE MAZHARI – (7th Volume) Written by Hazrat Allama Kazi Sanaullah Panipathi (Rh.) Translated by Maulana Muhammad Wahidullah and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia and distributed by Serhind Prokashan, Dhaka.

Exchange : Taka Three Hundred only. US$20.00

তাফসীরে মাযহারী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নির্মেঘ আকাশ থেকে যেমন বৃষ্টিপাত হয় না, তেমনি নির্বিশ্বাসী জীবন থেকেও ঝরে না জীবন-মৃত্যুর রহস্যসঞ্চারক বারিনির্ঝর। অথচ অদৃশ্যের নিয়ন্ত্রণেই পরিচালিত হচ্ছে আমাদের অস্তিত্ব, স্থিতি, আগমন-প্রত্যাগমন। এভাবেই আমরা একে একে আসছি। চলে যাচ্ছি। আসবো। চলে যাবো। এ প্রবাসে আমাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব এভাবেই চলেছে নিরন্তর, নিরবচ্ছিন্নরূপে। এ হচ্ছে আমাদের অনড় ললাটলিখন।

মানুষ! ভেবে দ্যাখো, কতো অসহায় তুমি। তোমার আবির্ভাব ও তিরোধানকে তুমি মুহূর্তকাল অগ্র-পশ্চাৎ করতে পারো না। অনড় মৃত্যুকে কিছুতেই করতে পারো না রুদ্ধ অথবা বিলম্বিত। নিজের। প্রিয়জনের। সুহৃদ-স্বজনের। শত্রুর। মিত্রের।

কে তোমাকে, তোমাদেরকে এভাবে করে চলেছে অস্তিত্বের আকর? কে তোমাদেরকে জাগিয়েছে অনস্তিত্বের সুপ্তি থেকে সুষমার দৃষ্টিগ্রাহ্যতায়। কে আবার নিভিয়ে দিচ্ছে সাধের জীবনায়ন, কৃতি, খ্যাতি ও নির্মিতি। তবে জীবনে-মরণে, সফলতায়-বিফলতায়, সুস্থতায়-অসুস্থতায় তিনিই কি নন তোমাদের প্রকৃত ও একমাত্র বিশ্বাসভাজন, সমর্পণস্থল ও আশ্রয়?

সুতরাং হে মানুষ! এসো তুমি-তোমরা, আমি-আমরা এই মুহূর্তে চূর্ণ করে ফেলি আমাদের অজ্ঞতা ও অহমিকাকে। উদাসীনতা ও উন্নাসিকতাকে। পৃথিবীর প্রপঞ্চময়তাকে। ভাসাই তওবার তটভূমি থেকে আশা ও আনন্দের, ভয় ও ভরসার, প্রেম ও প্রজ্ঞার তৃষিত তরণী তাঁর দয়া ও মমতার অকুল সমুদ্রে। একটি মাত্র জীবন আমাদের। আত্মার সম্পাতশোভিত এ দুর্লভ মানবজীবনকে কেনো তবে করি অবহেলা ও অসতর্কতার অধীন। এসো মুখর হই তাঁর স্মরণে ও সমর্থনে। দানে ও দয়ায়। প্রমিত ও নমিত হই তাঁর প্রেমে, পরিব্রাজনায়, পরিপ্রার্থনায়।

মহাকাশ, মহাপৃথিবী, মহাকাল, মহাজীবন আমাদের দায়িত্বহীনতা দর্শনে দ্যাখো কীরূপ বিষণ্ন। আমরা যে মানুষ— মহাসৃষ্টি। তাই আমাদের পতন, স্খলন ও বিস্মরণ সৃষ্টিকুলের কারোই কাম্য নয়। তাই বিশ্বাস ও বিধান আমাদের অপরিহরণীয় একটি অত্যাবশ্যকতা। সুতরাং এসো আস্থায় আনত হই। বিনম্র হই বিধানে, বিচারে, বিবেচনায়। বলি— হে আমাদের দয়াময় প্রেমময় পরম প্রভুপালনকর্তা! আমরা প্রবৃত্তির পীড়নে পিষ্ট করেছি আমাদেরকেই। অতএব আমাদেরকে দাও ক্ষমা, দয়া, ত্রাণ। প্রতিষ্ঠিত করো প্রত্যয়ে, প্রশ্রয়ে, প্রেমে, পরিত্রাণে। তারপর জানি, জানতে চেষ্টা করি আমাদের সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, এক-এককক-অবিভাজ্য, আনুরূপ্যবিহীন স্রষ্টা ও প্রতিপালনকর্তার বচনবৈভবের রহস্যময় পরিচয়। ভাসি, ডুবি, সন্তরণ করি প্রজ্ঞা ও প্রেমের এই অনন্ত সায়রে। আমাদের জীবন ও মৃত্যুকে মহিমময় করে তুলতে এই অন্তহীন পরিব্রাজনার নাবিক না হয়ে আর কোনো উপায়ই যে আমাদের নেই। আমরা যে বিশ্বাসী। তাই অপথ, বিপথ, কুপথ আমাদের জন্য চিরনিষিদ্ধ, সতত অসিদ্ধ।

অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে, প্রকৃত ও যথাযথ ব্যাখ্যা-ভাষ্য ব্যতিরেকে আকাশী বচনামৃতের সমাহার এই মহাগ্রন্থ আলকোরআন বুঝতে পারা একটি অসম্ভব ব্যাপার। আর এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উন্মোচিত করবার অধিকার রয়েছে কেবল তাঁর, যাঁর উপরে সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে অবতারিত হয়েছে এই মহান গ্রন্থের নিদর্শন ও নির্দেশনাসমূহ। আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সমগ্র জীবনে ও কর্মে, কথায় ও নীরবতায় বাস্তব ব্যাখ্যা ফুটিয়ে তুলেছেন কোরআনের। সে কাল গত হয়েছে। তারপর প্রজন্ম-পরম্পরায় বয়ে চলেছে সেই অমলিন জ্ঞানের প্রবাহ। এভাবে তাফসীর শাস্ত্রের জ্ঞানপ্রবাহের প্রতিনিধিত্বে যুগে যুগে অংশগ্রহণ করেছেন অনেক যোগ্য ও জাগ্রতহৃদয় তাফসীরকারগণ (কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ)। সেই তাফসীরকারগণের অন্তর্ভুক্ত এক কালজয়ী পুরুষের নাম কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী আল হানাফি আল মোজাদ্দেদি আল ওসমানী। বাংলার জ্ঞানতৃষ্ণার সুধা ও সলিলরূপে তাঁর সেই সুবিখ্যাত তাফসীরের বঙ্গরূপ নিয়ে বার বার হাজির হচ্ছি আমরা। আলহামদুলিল্লাহ্। পরম প্রেমাস্পদ আল্লাহ্‌র দয়া ও প্রশ্রয়ে এবার আমরা উপস্থিত হতে পারলাম সপ্তম খণ্ড নিয়ে। বারো খণ্ডে সমাপ্তব্য এই মহৎ ও বৃহৎ আয়োজনের সফল সমাপ্তির জন্য আমরা থাকতে চাই সচল, সবল ও অমল। আল্লাহ্‌পাক আমাদের এ আর্তিটুকু কবুল করুন। আমিন।

কাযী ছানাউল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঐতিহাসিক পানিপথ শহরে ১১৪৩ হিজরী সনে। দীর্ঘ বিরাশি বছর পর ১২২৫ হিজরী সনে লাভ করেছিলেন তাঁর প্রিয়তম মহাসৃজয়িতার একান্ত সন্নিধান। রেখে গিয়েছেন তাঁর নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানচর্চা ও সাধনা

সুষমার অবাক অর্জন — তিরিশের অধিক কালজ ও কালোত্তর গ্রন্থ-বৈভব। সেগুলোর মধ্যে তাফসীরে মাযহারীই মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম। বিশালাকৃতির দশটি খণ্ডে অত্যন্ত উচ্চমানের আরবী ভাষায় রচিত ওই অনন্যসাধারণ তাফসীর গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে তাঁর প্রজ্ঞার বিপুল ও বিরল দ্যুতি, জ্যোতি ও বিভূতি। সেই মহতী জ্ঞানসমুদ্রের সংক্ষুব্ধ তরঙ্গ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখনো হাতছানি দিয়ে ডেকে চলেছে মহাজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু পরিব্রাজকদেরকে। এ দুর্লভ মগ্নতা ও মুখরতা অপ্রতিরোধ্য। চিরন্তনতার প্রতি এ আহবান সতত স্বপ্নিল, বর্ণিল ও সাবলীল। এ মুগ্ধতা স্বতোৎসারিত।

আল্লাহ্প্রদত্ত এক অলৌকিক প্রতিভার মানসছবি ছিলেন তিনি। মাত্র সাত বছর বয়সে স্মৃতিস্থ করেছিলেন সম্পূর্ণ কোরআন। জবানী এলেমের শিক্ষা সমাপন করেছিলেন মাত্র ষোলো বছর বয়সে। মহাযশস্বী হাদিসশাস্ত্রবিদ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী ছিলেন তাঁর ইলমে হাদিসের শিক্ষক। তিনি বলতেন, ছানাউল্লাহ্কে ফেরেশতারাও সমীহ করে। আরো বলতেন, মহাবিচারের দিবসে আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয়— কী নিয়ে এসেছো, তবে আমি বলবো, ছানাউল্লাহ্কে। তাঁর পীর ও মোর্শেদ মহাসম্মানার্হ মাযহারে জানে জাঁনা তাঁকে উপাধি দিয়েছেন আ'লামুল হুদা (হেদায়েতের নিশান)। আর তাঁর একান্ত সুহৃদ ও সতীর্থ শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'এ যুগের বায়হাকী' বলে।

কাযী ছানাউল্লাহ্ ছিলেন ইসলামের মহান খলিফা হজরত ওসমান জিন্নুরাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সুযোগ্য উত্তরপুরুষ। ছিলেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের এক অনির্বাণ আলোকস্তম্ভ। অনুসারী ছিলেন ইমামশ্রেষ্ঠ আবু হানিফার। আর আত্মিক দিক থেকে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ইমাম মোজাদ্দেদে আলফে সানির মহান তরিকার সঙ্গে। তাঁর আধাত্মিক সংশ্লিষ্টতা ওই পরম শ্রদ্ধার্হ ইমামের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে এভাবেঃ স্বীয় পীর মোর্শেদ শায়েখ মাযহারে শহীদ জানে জাঁনা— শায়েখ নূর মোহাম্মদ বদাউনি— শায়েখ সাইফুদ্দিন সেরহিন্দী— খাজা মোহাম্মদ মাসুম— ইমাম মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহমতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন। এই সূত্রশৃঙ্খলটি আবার একুশজন কালজয়ী আধ্যাত্মিক পুরুষের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছে ইসলামের প্রথম খলিফা সিদ্দীকশ্রেষ্ঠ হজরত আবু বকর ইবনে আবু কোহাফার সঙ্গে। তাই এই মহান সম্পৃক্ততার নাম নেসবতে সিদ্দিকী। এভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সংযোজনা ও শ্রেষ্ঠতম মাজহাবের নূরে স্নাত হয়েছিলেন বলেই তাঁর প্রতিভা ও সংবেদনা পেয়েছিলো পূর্ণ ও পরিণত আয়তন। তাই তাঁর নির্মাণ এতো আকর্ষণীয়, হৃদয়হারক। তাই তাঁর বক্তব্যে ফুটে উঠেছে বর্ণনাসঞ্জাত বিদ্যার বৃন্তে মনীষা ও অন্তর্দৃষ্টির এই বিরল কমল— রেওয়ায়েত, দেরায়েত ও ফেরাসাতের সুসমঞ্জস বৈভব।

তাঁর সম্মানিত পূর্বপুরুষগণের অনেকেই ছিলেন দায়িত্ববান বিচারকর্তা। পারিবারিক ঐতিহ্যানুযায়ী তাঁকেও অভিষিক্ত হতে হয়েছিলো পানিপথ শহরের বিচারকর্তার গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদায়। প্রতিদিন এক মঞ্জিল কোরআন পাঠ এবং একশত রাকাত নফল নামাজ ছিলো তাঁর পবিত্র অভ্যাসের অন্তর্গত। এর মধ্যেই চলতো পঠন—পাঠন, অধ্যয়ন, গ্রন্থ-রচন। ভারতবর্ষের অপসৃয়মান মুসলিম শাসনের সময় এই অনন্যসাধারণ জ্ঞানতাপস এভাবেই জ্যোতির্ময় করে তুলেছিলেন তাঁর

পৃথিবীর জীবনকে। তারপর একসময় আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধানানুসারে অন্য সকলের মতো তিনিও পান করলেন তাঁর একান্ত আরাধ্য প্রেমাস্পদের মিলনসুধা। সেদিন ছিলো ১০ই রমজান। ১২২৫ হিজরী সন। ঐতিহাসিক পানিপথ শহরে এখনো তাঁর পবিত্র সমাধি আল্লাহ্‌ প্রেমিকগণের এক আকর্ষণীয় তীর্থস্থল।
এই খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন প্রিয় আধ্যাত্মিক আত্মজ মাওলানা মোহাম্মদ অহিদুল্লাহ্‌। প্রতিবারের মতো এই বঙ্গয়ানটির সযত্ন ও সতর্ক পরীক্ষা-পর্যালোচনা-সম্পাদনার জন্য অভিনিবেশী হতে হয়েছে যুথবদ্ধ খানকাবাসী তাফসীর কর্মীগণকে। সকল মহৎ ও বৃহৎ কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এমতো নেপথ্য-পরিচর্যা যেনো অবধারিত।

আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা ও অযোগ্যতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দানকারী। বিশুদ্ধতা ও একনিষ্ঠতার পিপাসা নিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের এই দুর্বার অভিযাত্রা। যিনি আমাদেরকে স্থবিরতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন, গতিময়তাকে করেছেন আমাদের সতীর্থ, সেই সর্বজ্ঞ ও সর্বক্ষমতাধর আল্লাহ্‌র প্রতিই উৎসর্গীকৃত আমাদের সকল আর্তি, আকুতি, নিবেদন ও সমর্পণ। হে আমাদের পরম কৃপাপরবশ আল্লাহ্‌! আমাদেরকে ক্ষমা করো। উত্তম বিনিময় দান করো পাঠক-পাঠিকা, আর্থিক ও অন্যবিধ সকল সহযোগীদেরকে। আমিন।

হে আমাদের জীবন দাতা ও মৃত্যু প্রদাতা আল্লাহ্‌! জীবনে মরণে তুমি এবং তোমার প্রেমাস্পদ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা স. আমাদের বিশ্বাস, আশ্রয়। হৃদয়োৎসারিত সর্বোৎকৃষ্ট অসংখ্য দরূদ ও সালাম পাঠালাম তোমার প্রিয়তম সেই বচনবাহকের প্রতি। তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন, বংশধর, সহচর ও তাঁর স. এর একনিষ্ঠ অনুগামী আউলিয়াগণের প্রতি। বিশেষভাবে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন পীর মোর্শেদ হাকিম আবদুল হাকিম আউলিয়ার প্রতি। দয়া করে আমাদের প্রেমাপ্লুত এই উপহারটুকু তুমি যথাস্থানে পৌঁছে দাও। গ্রহণ করো আমাদেরকে। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

জ্ঞাতব্য— তাফসীরে মাযহারী রচিত হয়েছে আরবীতে। কিন্তু আমরা এর অক্ষরান্তর ঘটিয়েছি দিল্লীর নাদ্‌ওয়াতুল মুসান্নিফিনের পরিচালক মাওলানা আবদুদ্‌ দাঈমের উর্দু তরজমা থেকে। অবশ্য জটিল বিষয়গুলো পরীক্ষা করেছি আরবী অনুলিপি দেখেই। এভাবে বক্তব্যকে দান করতে চেষ্টা করেছি নিশ্চিতি ও পরিমিতি। আর আয়াতের বঙ্গানুবাদটি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের 'কুরআনুল করীম' থেকে।

পরিশেষে জানাই নিবেদন সহৃদয় পাঠককুলের প্রতি— মুদ্রনজনিত ও অন্যবিধ ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে জানাবেন, যাতে আমরা সংশোধিত হতে পারি দোয়া ও কল্যাণকামনা সহযোগে।

ওয়াস্‌সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভূঁইগড়, পাগলাবাজার, নারায়ণগঞ্জ।

তাফসীরে মাযহারী

সূচীপত্র

পঞ্চদশ পারা — সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১ — ১১১

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ১ — ৭৪

ষষ্ঠদশ পারা — সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ৭৫— ১১০

সপ্তদশ পারা — সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১—১১২

তাফসীরে মাযহারী

সপ্তম খন্ড

পঞ্চদশ, ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ পারা
(সুরা বানী ইসরাইল থেকে সুরা আম্বিয়া পর্যন্ত)

সুরা বানী ইসরাইল	ঃ আয়াত ১ — ১১১
সুরা কাহ্ফ	ঃ আয়াত ১ — ১১০
সুরা মার্য়াম	ঃ আয়াত ১ — ৯৮
সুরা ত্বাহা	ঃ আয়াত ১ — ১৩৫
সুরা আম্বিয়া	ঃ আয়াত ১ — ১১২

পঞ্চদশ পারা

সূরা বানী ইসরাইল

এই সূরা অবতীর্ণ হয় সূরা কাসাসের পরে। এই সূরায় রয়েছে ১২ রুকু এবং ১১১ আয়াত। ৭৩ থেকে ৮০— এই আটটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এছাড়া অন্য সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

❏ পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাঁহার দাসকে তাঁহার নিদর্শন দেখাইবার জন্য রজনীযোগে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন মসজিদুল হারাম হইতে মসজিদুল আক্সায়, যাহার পরিবেশ তিনি করিয়াছিলেন আশিস-পূত; তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

মহা রহস্যময় মেরাজের প্রারম্ভিক অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে 'সুবহানা'। একথার অর্থ— পবিত্র ও মহিমময় তিনি। 'সুবহান' অর্থ পবিত্র। অথবা— আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করি। কিংবা— তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করো। শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ইসমে মাছদার (নাম পদ) এবং এর প্রকৃত অর্থ— পবিত্রতাবোধ। কখনো কখনো শব্দটি আল্লাহ্র নাম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন— আল্লাহু সুবহান (আল্লাহ্ পবিত্র)। সুবহানা শব্দটি নামপদ হলেও কখনো কখনো ক্রিয়ার স্থলে শব্দটি ব্যবহার করা

হয়। সে সময় ক্রিয়া থাকে অনুল্লেখিত। এখানেও তেমনটি ঘটেছে। আর বক্তব্যের শুরুতেই শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে, এতদসংশ্লিষ্ট বক্তব্যটি সাধারণ কোনো বক্তব্য নয়। আর এ বক্তব্যে উল্লেখিত বিষয়াবলীর উপরে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কোনো প্রকার প্রভাব বা অধিকার নেই। বিস্ময় প্রকাশার্থেও শব্দটির ব্যবহার সুপ্রচল। যেমন— সুবহানাল্লহ্ (আল্লাহ্ কতোই না পবিত্র!)।

এরপর বলা হয়েছে— আল্লাজী আস্‌র বি আ'বদিহী। কথাটির অর্থ— যিনি তাঁর বান্দা বা দাসকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন। অর্থাৎ সেই মহাপবিত্র ও মহিমময় আল্লাহ্, যিনি তাঁর প্রিয়তম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রজনীযোগে এক বিস্ময়কর ভ্রমণে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'লাইলান' (রজনীযোগে)। 'ইসরা' কথাটির অর্থও রাত্রিকালিন ভ্রমণ। এতদ্‌সত্ত্বেও 'লাইলান' বা রাত্রির কথা অনির্দিষ্টবাচক রূপে উল্লেখ করে এখানে একথাটিই বোঝানো হয়েছে যে, ওই ভ্রমণ করানো হয়েছিলো রাতের কোনো এক সময়ে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'মিনাল মাসজিদিল হারামি ইলাল মাসজিদিল আক্বস' (মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বসায়)। অর্থাৎ কাবা শরীফের মসজিদের এলাকা থেকে বায়তুল মাকদিস মসজিদ পর্যন্ত।

হজরত আনাস রা. থেকে মালেক বিন স'সাহ্‌র মাধ্যমে ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি কাবা মসজিদের প্রাঙ্গণে তন্দ্রামগ্ন ছিলাম। এমন সময় জিবরাইল আমীন সেখানে বোরাক নিয়ে উপস্থিত হলেন। অপর বর্ণনায় এসেছে, আমি শুয়েছিলাম কাবা শরীফের হাতিমে। এমন সময় এলেন এক জ্যোতির্ময় আগন্তুক। (গ্রন্থকার বলেন) আমি সুরা ওয়ান্ নজ্‌মের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, রসুলেপাক স. তখন শায়িত ছিলেন তাঁর পিতৃব্য-পুত্রী হজরত উম্মে হানীর গৃহে। সেখান থেকেই তাঁকে মেরাজ করানো হয়। উল্লেখ্য যে, মক্কা শরীফের পুরো এলাকাই মসজিদে হারামের সীমানাভূত। আয়াতে 'মসজিদে হারাম থেকে' বলা হয়েছে সে কারণেই। অর্থাৎ হজরত উম্মে হানীর গৃহও মসজিদে হারামের অন্তর্ভূত।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হজরত আনাসের হাদিসে রয়েছে কাবা প্রাঙ্গণের কথা। আবার হজরত আনাস থেকে হজরত আবু জরের মাধ্যমে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি শুয়েছিলাম। সেখান থেকে কাবা গৃহের ছাদ ভেদ করে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। (গ্রন্থকার বলেন) আমি এই হাদিসটির ব্যাখ্যাও সুরা 'ওয়ান্ নজ্‌মের' তাফসীরে সন্নিবেশিত করেছি। যথাস্থানে তা দ্রষ্টব্য।

আল্লামা আবু ইয়ালী তাঁর 'মসনদে' এবং আল্লামা তিবরানী তাঁর 'আল কবীর' নামক পুস্তকে লিখেছেন, রসুলেপাক স. মে'রাজে রওয়ানা হয়েছিলেন হজরত উম্মে হানীর গৃহ থেকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আবার ফিরেও এসেছিলেন এবং হজরত উম্মে হানিকে খুলে বলেছিলেন তাঁর সেই অলৌকিক ভ্রমণের কথা। বলেছিলেন, সকল পয়গম্বরকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছিলো। একসঙ্গে আমরা নামাজ পাঠ করেছি। আর ওই জামাতের ইমাম ছিলাম আমি। সকালে রসুল স. কাবা শরীফের প্রাঙ্গণে উপস্থিত জনতাকেও তাঁর অলৌকিক ভ্রমণের কথা জানালেন। একথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো সকলে। সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীরা তাঁর কথা তো অবিশ্বাস করলোই, তাদের সঙ্গে আবার অবিশ্বাস করে বসলো কোনো কোনো দুর্বলচিত্ত বিশ্বাসী। এভাবে তারা হয়ে গেলো ধর্মত্যাগী। কেউ কেউ দৌড়ে গেলো হজরত আবু বকর রা. এর বাড়ীতে। তাঁকে ডেকে বললো, শুনেছো, তোমার বন্ধু নাকি গত রাতে বায়তুল মাকদিসে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। এর পরেও কি তুমি তাকে বিশ্বাস করবে? হজরত আবু বকর বললেন, যদি তিনি একথা বলে থাকেন তবে তিনি ঠিকই বলেছেন। আমি তাঁর সকল কথা বিশ্বাস করি। এর চেয়েও তো বিস্ময়কর কথা আমি বিশ্বাস করি। হজরত জিবরাইল আল্লাহ্পাকের নিকট থেকে কোরআনের আয়াত নিয়ে তাঁর নিকটে আসেন, আবার ফিরে যান। আল্লাহ্তায়ালার মহান বাণী নিয়ে তাঁর ওই গমনাগমন তো আরো অধিক বিস্ময়কর । তৎসত্ত্বেও আমি তো তা মানি।

মক্কার কেউ কেউ বায়তুল মাকদিসে এক বা একাধিকবার গিয়েছিলো। তারা বায়তুল মাকদিসের বিবরণ জানতে চাইলো রসুল স. এর নিকটে। সহসা রসুল স. এর দৃষ্টির সম্মুখ থেকে উঠিয়ে নেয়া হলো দূরত্বের পর্দা। তিনি স্বচক্ষে বায়তুল মাকদিস দেখে দেখে তার আনুপূর্বিক বিবরণ উপস্থাপন করতে শুরু করলেন। প্রশ্নকারী ও তাদের সঙ্গীরা বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে নিখুঁত বর্ণনা দিতে দেখে তাজ্জব হয়ে গেলো। বললো, ঠিকই তো বলেছেন। এবার বলুন তো দেখি, আমাদের যে কাফেলা মক্কার দিকে এগিয়ে আসছে, তা এখন কতদূরে, কী অবস্থায় রয়েছে? রসুল স. তাদের কাফেলার উটের সংখ্যা, উটের পিঠের মালপত্র— সবকিছু সম্পর্কে তাদেরকে জানালেন। তারপর বললেন, অমুক দিন সূর্যোদয়ের সময় তোমাদের কাফেলা মক্কায় পৌঁছবে। কাফেলার সামনে থাকবে মেটে রঙের একটি উট। নির্দিষ্ট দিনে ওই লোকেরা খুব ভোরে উঠে একটি পাহাড়ে উঠে কাফেলার অপেক্ষা করতে লাগলো। সবিস্ময়ে দেখলো, কাফেলা এগিয়ে আসছে। আর সামনে রয়েছে সেই মেটে রঙের উট। কিন্তু এই অলৌকিকত্ব দেখেও তারা ইমান আনলো না। বললো, এতো দেখছি প্রকাশ্য যাদু।

আমি বলি, মেরাজের ঘটনা ঘটেছিলো দু'বার। একবার হাতীম থেকে। আর একবার হজরত উম্মে হানীর গৃহ থেকে। সুতরাং বুঝতে হবে উভয় বর্ণনাই স্ব স্ব স্থানে সঠিক।

আল্লামা বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল বলেছেন, মেরাজ সংঘটিত হয়েছিলো হিজরতের এক বছর আগে। আলেমগণ বলেছেন, রসুল স. এর মেরাজ হয়েছিলো দু'বার। একবার রজব মাসে। আর একবার রমজান মাসে।

এখানে 'মাসজিদুল আক্বসা' অর্থ বায়তুল মাকদিসের মসজিদ। 'আক্বসা' অর্থ শেষ প্রান্তে বা শেষ সীমানায়। এরকম বলার কারণ হচ্ছে, তখন কাবা শরীফ ও বায়তুল মাকদিসের মধ্যে আর কোনো মসজিদ ছিলো না। উভয় মসজিদের দূরত্ব ছিলো অনেক। এক রাতের মধ্যে সেখানে গিয়ে আবার ফিরে আসা ছিলো অসম্ভব। তাই কুরায়েশ জনতা রসুল স. এর ওই অলৌকিক ভ্রমণকে বিশ্বাস করতে পারেনি।

আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, সূর্যের দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী দূরত্ব পৃথিবীর দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী দূরত্বের একশত ষাট গুণ বেশী। এতদ্‌সত্ত্বেও সূর্যের নিম্নপ্রান্ত উর্ধ্বপ্রান্তে একমুহূর্তে উঠে যায়। ইলমে কালামের (বিশ্বাস সম্বন্ধীয় বিষয়ের) একটি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস এই যে, সকল দেহের মধ্যে 'ইরাজ' (বাহ্যিক প্রভাব) গ্রহণ করার যোগ্যতা রয়েছে। সুতরাং একথা কি করে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলের শরীরে সর্বাপেক্ষা অধিক গতি সঞ্চার করতে পারবেন না। সৃষ্টির মধ্যেই যদি অধিক গতিময় হওয়ার যোগ্যতা থাকে, তবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর ইচ্ছেমতো সবকিছুই সম্পাদন করতে নিশ্চয় সক্ষম। তবে বিষয়টি স্বাভাবিকতা-বিরোধী বলেই বিস্ময়কর। আর মোজেজা তো বিস্ময়েরই নামান্তর। যা বিস্ময়ের উদ্রেক করে না তা কি কখনো মোজেজা হতে পারে? কখনোই নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্‌লাজী বারকনা হাওলাহু' (যার পরিবেশ তিনি করেছেন আশীস-পূত)। এখানে 'বারাকা' বা 'বরকত' কথাটির অর্থ বরকতময়, কল্যাণময় বা আশীস-পূত। উল্লেখ্য যে, বায়তুল মাকদিসের সন্নিহিত অঞ্চল ছিলো স্রোতস্বিনী-সমৃদ্ধ ও শস্য-শ্যামল। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'যার পরিবেশ আমি করেছি বরকতময়'। মুজাহিদ বলেছেন, ওই স্থানকে বরকতময় বলা হয়েছে এ কারণে যে, সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন বহুসংখ্যক নবী। আর অনেক নবীর বসবাস ও ধর্মপ্রচারকেন্দ্রও ছিলো বায়তুল মাকদিস। সেখানে তাঁদের উপর দীর্ঘদিন ধরে অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ। আর কিয়ামত দিবসে মানুষের হাশরও শুরু হবে সেখান থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা' (আমি তাকে নিদর্শন দেখাবার জন্য)। উল্লেখ্য যে, মেরাজ রজনীতে প্রকাশিত হয়েছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন। যেমন মুহূর্তমধ্যে বায়তুল মাকদিস গমন। সেখানে সকল আম্বিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত। তাঁদেরকে নিয়ে নামাজ আদায়।

তারপর রহস্যাচ্ছন্নতা ভেদ করে সকল আকাশ অতিক্রম, বেহেশত-দোজখ দর্শন, আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে একান্ত আলাপন ইত্যাদি। এরকম সময় ও সময়াতীত রহস্যের বহুমাত্রিক উন্মোচন সে রাতে রসুল স.কে দেখানো হয়েছিলো বলেই এখানে বলা হয়েছে 'আমি তাকে নিদর্শন দেখাবার জন্য'।

শেষে বলা হয়েছে— 'ইন্নাহু হুয়াস্ সামীউ'ল বাসীর' (তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা)। একথার মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা প্রিয় রসুলকে একথাই জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা বলেই আঁধার রাতেও তাঁর প্রিয়তম দাস রসুল স.কে পরিপূর্ণরূপে হেফাজত করেন। মেরাজ রজনীতেও বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে দিয়েছেন সুন্দর ও সুচারুরূপে, নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে।

বাগবী লিখেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, মেরাজ রজনীতে রসুল স. এর পবিত্র শরীরকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো তাঁর পবিত্র আত্মাকে। অর্থাৎ মেরাজ শারীরিকভাবে সংঘটিত হয়নি, সংঘটিত হয়েছিলো রূহানীভাবে। হজরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে ঘটনাটি এসেছে এভাবে— রসুল স.কে কাবা প্রাঙ্গণ থেকে মেরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। ঘটনাটি ঘটেছিলো তাঁর প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির পূর্বে। তিনি সেখানে শায়িত ছিলেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি দেখলেন, তিনজন লোক এসে দাঁড়ালো তাঁর কাছে। প্রথম লোকটি বললো, এই ব্যক্তি কে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। তৃতীয় ব্যক্তি বললো, যে সবচেয়ে উত্তম তাকেই নিয়ে চলো। একথা বলেই তারা প্রস্থান করলো। পরের রাতেও রসুল স. শুয়েছিলেন কাবা প্রাঙ্গণে। তাঁর চোখ ছিলো ঘুমন্ত। কিন্তু হৃদয় ছিলো জাগ্রত। নবী-রসুলগণের হৃদয়ের অবস্থা এরকমই। ঘুম আসে তাদের চোখে। হৃদয়ে নয়। ওই তিন লোক উপস্থিত হলো। কোনো কথা না বলে তারা রসুল স.কে উঠিয়ে নিয়ে গেলো জমজম কূপের পাশে। হজরত জিবরাইল তাঁর বক্ষদেশ চিরে ফেললেন। জমজমের পানিতে ধুয়ে ফেললেন তাঁর বক্ষাভ্যন্তর। তারপর সেখানে স্থাপন করলেন তাঁর উপযোগী ইমান ও এলেম। শেষে মিলিয়ে দিলেন তাঁর চিরে ফেলা বুককে। হজরত আনাস এভাবে মেরাজের পুরো ঘটনাটিই বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন, হজরত জিবরাইল রসুল স.কে বোরাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন প্রথম আসমানে। সেখানে তিনি স. দেখলেন দু'টি প্রবহমান নদী। হজরত জিবরাইল বললেন, এই নদী দু'টো পৃথিবীর ফোরাত ও নীল নদীর উৎস। রসুল স.কে নিয়ে পুনরায় উর্ধ্বারোহণ করলেন হজরত জিবরাইল। সেখানে দেখলেন, আর একটি অনিন্দ্যসুন্দর নদী। নদীটির পাশে রয়েছে মোতি ও জবরজদ পাথর নির্মিত বিশাল প্রাসাদ। রসুল স. নদীর পানিতে হাত দিলেন। দেখলেন তা মেশক আম্বরের সুবাসে ভরপুর। জিজ্ঞেস করলেন, ভ্রাতা জিবরাইল! এটা কি? হজরত জিবরাইল বললেন, হাউজে কাওছার। এই হাউজ আপনার জন্য নির্ধারিত। হজরত আনাস এরপর বললেন, রসুল স.কে নিয়ে যাওয়া হলো সপ্তম আসমানে। হজরত মুসা

তাঁর এই অত্যুচ্চ মর্যাদা দেখে বলে উঠলেন, আমি তো ভাবতেই পারিনি যে, আমার উপরে আর কেউ উঠতে পারে। রসুল স.কে আরো উপরে ওঠানো হলো। এবার তিনি পৌঁছলেন সিদ্‌রাতুল মুনতাহার সেই বৃক্ষের নিকটে। সেখান থেকে গমন করলেন আরো উর্ধ্বে— আল্লাহ্‌র সকাশে। তখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর নৈকট্য দাঁড়ালো এরকম— যেন ধনুকের দু'টি জ্যা। অথবা তদপেক্ষা নিকটে। আল্লাহ্‌পাক এগিয়ে আসলেন আরো নিকটে। হলো একান্ত আলাপন। আল্লাহ্ দান করলেন দিবা-রাতের পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। ওই অনন্য উপহার নিয়ে তিনি ফিরে চললেন পৃথিবীর দিকে। প্রথমে দেখা হলো হজরত মুসার সঙ্গে। হজরত মুসা জিজ্ঞেস করলেন, কী উপহার পেয়েছেন? রসুল স. বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। হজরত মুসা বললেন, আপনার উম্মত কিছুতেই পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারবে না। আপনি আল্লাহ্‌র কাছে আবার যান। নামাজ কমিয়ে আনুন। রসুল স. পুনরায় আল্লাহ্‌র সকাশে উপস্থিত হলেন। এভাবে হজরত মুসার পীড়াপীড়িতে কয়েকবার তাঁকে যেতে হলো আল্লাহ্ সকাশে। প্রতিবারই কিছু কিছু করে কমাতে কমাতে আল্লাহ্ চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের। হজরত মুসা বললেন, হে সর্বশেষ রসুল! এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও আপনার উম্মতের জন্য হবে অত্যন্ত কঠিন। এ ব্যাপারে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমার উম্মতকে মাত্র দুই ওয়াক্ত নামাজ পড়তে বলা হয়েছিলো। তবুও তারা তা নিয়মিত পালন করতে পারেনি। আপনার উম্মত তো হবে সর্বাপেক্ষা দুর্বল। শারীরিক, মানসিক উভয় দিক দিয়েই আপনার উম্মত হবে পূর্ববর্তী সকল উম্মত অপেক্ষা অদৃঢ়। সুতরাং আপনি আবার যান। নামাজ আরো কমিয়ে আনুন। রসুল স. তাকালেন হজরত জিবরাইলের দিকে। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন পেলেন না। অথচ আগের বার গুলোতে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সমর্থক। আল্লাহ্ তখন তাঁর হৃদয়ে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলেন যে, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আমার বিধান অনড়। লওহে মাহফুজে আমি আমার বিধান সমূহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। আপনার উম্মতের জন্য লওহে মাহফুজে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের কথাই লেখা আছে। সেই বিধানই বহাল রইলো। আপনার আবেদনের সম্মানে তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হলো। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকেই পঞ্চাশ ওয়াক্তরূপে গণ্য করবো আমি। কারণ এটাও আমার অনড় বিধান যে, আমি প্রতিটি পুণ্যকর্মের বিনিময়কে কমপক্ষে দশগুণ বৃদ্ধি করে থাকি। রসুল স. তাঁর হৃদয়ে এই প্রত্যাদেশ পেয়ে হজরত মুসাকে লক্ষ্য করে বললেন, পাঁচওয়াক্ত নামাজই আমি গ্রহণ করলাম। পুনঃ পুনঃ একই আবেদন নিয়ে তাঁর কাছে যেতে আমার লজ্জা করে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রসুল স. জাগ্রত হলেন। দেখলেন, তিনি শুয়ে রয়েছেন কাবা শরীফের প্রাঙ্গণে। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, যখন তিনি স. জাগ্রত হলেন, তখন দেখলেন, তিনি শুয়ে রয়েছেন মসজিদুল হারামের চত্বরে। এতে করে বোঝা যায় রসুল স. এর মেরাজ হয়েছিলো রূহানীভাবে। সশরীরে নয়। কিন্তু সুবিদিত ও

যথাসূত্রসম্বলিত অনেক হাদিস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, রসুল স. এর মেরাজ হয়েছিলো সশরীরে; রূহানীভাবে নয়। আর একথার উপরেই সংঘটিত হয়েছে আলেমগণের ঐকমত্য। আলোচ্য আয়াতও একথা প্রমাণ করে। এখানে সুস্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে যে, রাতের কোনো এক মুহূর্তে আল্লাহ্তায়ালা রসুল স.কে মসজিদুল হারাম থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন মসজিদুল আক্বসায়। রসুল স. এর এই ভ্রমণ রূহানীভাবে বা স্বপ্নযোগে ঘটে থাকলে কুরায়েশ জনতা আর বিস্ময় প্রকাশ করবে কেনো? অস্বীকারই বা করতে যাবে কোন দুঃখে? স্বপ্নযোগে বিস্ময়কর কোনো ঘটনা দর্শন করা অস্বাভাবিক কিছু তো নয়। তাই প্রকৃত কথা হচ্ছে, মেরাজ হয়েছিলো জাগ্রত অবস্থায় ও সশরীরে। সে কারণেই সন্দেহবাদীরা বিষয়টি নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু করে দেয়। আল্লামা বাগবী বলেন, আমার শায়েখ ইমাম বলেছেন, বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদিস দু'টো ছাড়া আর কোনো হাদিস নেই, যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মেরাজ ঘটেছিলো স্বপ্নযোগে। কিন্তু উক্ত হাদিসের সূত্রপরম্পরাভূত বর্ণনাকারী শরীক বিন আবদুল্লাহ্ নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত নন। তাই তার মাধ্যমে আগত হাদিস পরিত্যাজ্য। তাছাড়া ওই হাদিসে বলা হয়েছে, ওই মেরাজের ঘটনা ঘটেছিলো ওহী আগমনের পূর্বে। আর আলোচ্য আয়াতে যে মেরাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা ঘটেছিলো ওহী বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার বারো বছর পর। অর্থাৎ হিজরতের এক বছর আগে। আর এই মেরাজ সংঘটিত হয়েছিলো সশরীরেই। সুতরাং বুঝতে হবে, প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার আগে স্বপ্নযোগে যে মেরাজ হয়েছিলো.তা-ই বাস্তবে সশরীরে সংঘটিত হয়েছিলো প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার বারো বছর পর। যেমন ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে রসুল স.কে মক্কা বিজয় দেখানো হয়েছিলো স্বপ্নযোগে। তারপর অষ্টম হিজরীতে সে বিজয় তাঁকে দেয়া হয়েছিলো বাস্তবে।

বাগবী লিখেছেন, মেরাজ সমাপন করে যখন রসুল স. যীতুয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন বললেন, ভ্রাতা জিবরাইল! আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তো এই ঘটনা বিশ্বাস করবে না। হজরত জিবরাইল তখন বললেন, আবু বকর বিশ্বাস করবেন। কারণ তিনি সত্যবাদী।

হজরত ইবনে আব্বাস ও উম্মত জননী হজরত আয়েশা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স.বলেছেন, গভীর রাতের একাংশে মেরাজ সমাপনের পরদিন সকালে আমি বসে বসে ভাবছিলাম, মেরাজের কথা বললে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তো আমাকে অসত্যভাষী বলবে। কাবা প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে বসেছিলাম আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে। এমন সময় আবু জেহেল সেখান দিয়ে যেতে যেতে বিদ্রূপের স্বরে বললো, মোহাম্মদ! আবার নতুন কিছু পেলে নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ, বিগত রাতে আমাকে এক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। সে বললো, কোথায়? আমি বললাম, বায়তুল মাকদিসে। সে বললো, তারপর সকাল হতেই

মক্কায় ফিরে এলে, কেমন? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না করে কেবল বললো, তুমি যা বললে, তা কি আমি লোকজনকে বলে দিবো? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে তখন চিৎকার করে বলতে শুরু করলো, হে কা'ব বিন লুয়াই সম্প্রদায়ের লোকেরা, এদিকে এসো। তার ডাক শুনে অনেকেই এগিয়ে এলো। আবু জেহেল বললো, মোহাম্মদ! তুমি আমাকে যা বলেছো, তা এবার সবার কাছে বলো। আমি বললাম, গতরাতে আমাকে এক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। লোকেরা বললো, কোথায়? আমি বললাম, বায়তুল মাকদিসে। তারা বললো, তারপর সেখান থেকে রাতের মধ্যেই ফিরে এলে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। একথা শুনেই কিছু লোক বিদ্রূপচ্ছলে হাততালি দিতে শুরু করলো। আবার কিছু লোক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে নিজ হাতে নিজেদের মস্তকের কেশ টানতে শুরু করলো। কেউ কেউ নতুন ইমান এনেছিলো। কিন্তু তারা ছিলো দুর্বলচিত্ত। তারাও একথা শুনে সরে গেলো ইমানের পথ থেকে। এক মুশরিক দৌড়ে গেলো হজরত আবু বকরের গৃহে। বললো, শুনেছো, তোমার সাথী কী বলে? সে নাকি কাল রাতে বায়তুল মাকদিসে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। আবু বকর বললো, তাই নাকি? সে বললো, হ্যাঁ। আবু বকর বললো, তিনি যদি এরকম বলে থাকেন, তবে ঠিকই বলেছেন। সে বললো, তুমি কি এরকম অবিশ্বাস্য কথাও বিশ্বাস করবে? আবু বকর বললো, আমি তো এর চেয়ে তাঁর আরো বেশী বিস্ময়কর কথা বিশ্বাস করি। তাঁর প্রতি আসমান থেকে প্রতিনিয়তই প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়ে চলেছে। আমি তো সেগুলোকেও সত্য বলে মানি। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কার কিছু সংখ্যক লোক বায়তুল মাকদিস দেখে এসেছিলো। তারা বললো, হে মোহাম্মদ! তুমি কি আমাদের কাছে বায়তুল মাকদিসের বিবরণ দিতে পারবে? রসুল স. বললেন, আমি একে একে বায়তুল মাকদিসের বিভিন্ন অংশের বিবরণ দিতে শুরু করলাম। সরিয়ে দেয়া হলো দূরত্বের পর্দা। মনে হলো আকীলের বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বায়তুল মাকদিস। আমি স্বচক্ষে তা দেখে দেখে বলতে লাগলাম। লোকেরা শুনে বললো, তোমার বর্ণনা সঠিক। এবার তবে আমাদের কাফেলা সম্পর্কে কিছু বলো। বায়তুল মাকদিস যাওয়া আসার পথে তুমি তাদেরকে কোথায় দেখে এসেছো? রসুল স. বললেন, আমি তোমাদের কাফেলাকে দেখেছি রওয়াহা নামক স্থানে। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিলো। হারানো উট খুঁজে ফিরছিলো তারা। সেখানে ছিলো তাদের একটি পানির মশক। আমার তেষ্টা পেয়েছিলো। তাই ওই মশক থেকে পানি ঢেলে পান করেছিলাম আমি। তারপর তা রেখে দিয়েছিলাম যথাস্থানে। কাফেলা ফিরে এলে কাফেলার লোকদেরকে তোমরা জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি যেখানে বললাম, সেখানে তাদের পানির পাত্রটি ছিলো কি না। লোকেরা বললো, এটি একটি নিদর্শন বটে, যা প্রণিধানযোগ্য। রসুল স. বললেন, আমি অমুক গোত্রের কাফেলারও সাক্ষাত পেয়েছিলাম। তাদের দু'জন লোক আরোহণ করেছিলো একটি উটে। জীমার

নামক স্থানে তাদের ওই উট আমাকে দেখে আওয়াজ করে উঠেছিলো। তাদের কাফেলা এলে ওই লোক দু'টোকে জিজ্ঞেস করে দেখো আমি ঠিক কথা বলেছি কিনা। লোকেরা একথা শুনে বললো, এটাও একটা চিহ্ন বটে, যা বিচার্য। লোকেরা পুনরায় বললো, এবার তবে আমাদের ওই কাফেলার উটগুলো সম্পর্কে কিছু বলো। রসুল স. বললেন, তানঈম নামক স্থানে আমি তোমাদের কাফেলার উটগুলোকে দেখেছি। লোকেরা বললো, কয়টি উট ছিলো সেখানে? সেগুলোর আকার আকৃতি কেমন ছিলো? আর সেগুলোর পিঠেই বা ছিলো কোন কোন পণ্যের বোঝা ? রসুল স. বললেন, তখন অতো কিছু তো আমি লক্ষ্য করিনি। তবুও বলছি, শোনো— আর একবার হারুরাহ নামক স্থানে সম্পূর্ণ কাফেলা একত্রে আমার সামনাসামনি হয়েছিলো। তখন আমি অমুক অমুক ব্যক্তিকে দেখেছি। কাফেলার সম্মুখভাগে ছিলো একটি মেটে রঙের উট। তার পিঠে ছিলো খেজুরের দুই পাতা বুননের মাদুরের বোঝা। অমুক দিন সূর্যোদয়ের সময় তোমাদের কাফেলা মক্কায় পৌঁছবে। অংশীবাদীরা বললো, এই নিদর্শনটিও যাচাইযোগ্য। নির্দিষ্ট তারিখে সূর্যোদয়ের সময় তারা সবিস্ময়ে দেখলো, সম্মুখভাগের মেটে উটটিসহ কাফেলা ফিরে এসেছে। কাফেলার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে তারা জানতে পারলো রসুল স. যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। এরপরেও অংশীবাদীরা রসুল স.কে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করলো না। বলতে লাগলো, আরে, এ যে দেখছি স্পষ্ট যাদু।

মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. একবার আমাদের সামনে বললেন, সেদিনের কথা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, আমি হাজরে আসওয়াদের নিকটে বসেছিলাম। অংশীবাদীরা আমাকে রাতের ভ্রমণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো। বায়তুল মাকদিস সম্পর্কেও জানতে চাইলো তারা। আমি তো বায়তুল মাকদিসের সবকিছু সেভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিনি। তাই অস্বস্তিবোধ করলাম। কিন্তু আল্লাহ্ আমার চোখের সামনে প্রতিভাসিত করলেন বায়তুল মাকদিস। এরপর তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলাম দেখে দেখে। ওই অলৌকিক ভ্রমণের সময় সকল নবী-রসুলের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটেছিলো আমার। নবী মুসাকে দেখেছিলাম নামাজ পাঠরত অবস্থায়। তিনি ছিলেন কৃশকায় ও কুঞ্চিত, ঘন কেশবিশিষ্ট। দেখলে মনে হয় তিনি যেনো শানুরাহ গোত্রের কেউ হবেন। তিনি দেখতে অনেকটা ওরওয়া বিন মাসউদ ছাক্বাফীর মতো। পিতা ইব্রাহিমকেও নামাজ পড়তে দেখেছিলাম তখন। তিনি ছিলেন আমার মতো দেখতে। নামাজের জামাতের আয়োজন করা হলো। সকল নবী সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। নামাজ সুসম্পন্ন হলো আমার ইমামতিতে। নামাজ শেষে জনৈক নবী একজনকে দেখিয়ে বললেন, হে আখেরী নবী! ইনি হচ্ছেন দোজখের প্রধান প্রহরী মালেক। এঁকে সালাম বলুন। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি সালাম বললেন প্রথমে।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মেরাজ রজনীতে রসুল মুসার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো আমার। তিনি ছিলেন হালকা পাতলা ধরনের। দেখে মনে হয় যেনো শানুরাহ গোত্রভূত। রসুল ঈসার সঙ্গেও সাক্ষাত ঘটেছিলো তখন। তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির সুঠামদেহী। শরীরের বর্ণ রক্তিমাভ। দেখে মনে হয় এইমাত্র তিনি গোসলখানা থেকে গোসল সেরে বেরিয়ে এলেন। রসুল ইব্রাহিমের দেখাও পেয়েছিলাম তখন। আমার সঙ্গেই তিনি সর্বদিকে সাদৃশ্য রাখেন। তখন আমার সামনে নিয়ে আসা হলো দু'টি পাত্র। একটিতে ছিলো দুধ। অন্যটিতে শরাব। আমাকে বলা হলো, পছন্দ মতো যে কোনো একটি গ্রহণ করুন। আমি দুধের পাত্রটি হাতে নিলাম এবং পাত্রের দুধটুকু নিঃশেষে পান করে ফেললাম। দুধ ও শরাব উপস্থাপনকারী বললো, আপনি গ্রহণ করেছেন স্বভাবসিদ্ধতাকে। অথবা বললেন, আপনি প্রতিষ্ঠিত হলেন স্বভাবধর্মে। যদি আপনি শরাবের পাত্র গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মত হয়ে যেতো পথভ্রষ্ট।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ২, ৩, ৪, ৫, ৬

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۭ
اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝ وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِي
الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝
فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ
شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ۭ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝ ثُمَّ
رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ
اَكْثَرَ نَفِيْرًا

❒ আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম ও উহাকে করিয়াছিলাম বনি ইস্রাঈলের জন্য পথ-নির্দেশক। আমি আদেশ করিয়াছিলাম, 'তোমরা আমা ব্যতীত অপর কাহাকেও কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করিও না।'

❒ 'তোমরাই তো তাহাদিগের বংশধর যাহাদিগকে আমি নূহের সহিত নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলাম; সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ দাস।'

❒ এবং আমি তওরাতে প্রত্যাদেশ দ্বারা বনি-ইস্রাঈলকে জানাইয়াছিলাম, 'নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দুই বার বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং তোমরা অতিশয় অহংকার-স্ফীত হইবে।'

❒ অতঃপর এই দুইয়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হইল তখন আমি তোমাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম আমার দাসদিগকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী; উহারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধ্বংস করিয়াছিল। শাস্তির প্রতিজ্ঞা কার্যকরী হইয়াই থাকে।

❒ অতঃপর আমি তোমাদিগকে পুনরায় উহাদিগের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলাম, তোমাদিগকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করিলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করিলাম।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল ! শুনুন, আপনার প্রতি আমি যেমন কোরআন অবতীর্ণ করে চলেছি, তেমনি আপনার পূর্ববর্তী রসুল মুসার উপরেও তওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম। তাকে অথবা তার প্রতি অবতীর্ণ ওই তওরাতকে আমি বানিয়েছিলাম বনী ইসরাইলদের পথ-নির্দেশক। আর মুসার মাধ্যমে অথবা তওরাতের মাধ্যমে আমি তাদের প্রতি এই মর্মে নির্দেশ জারী করেছিলাম যে, তোমরা কেবল আমাকে তোমাদের প্রভুপালক ও কর্মবিধায়করূপে স্বীকার করো। অন্য কাউকে নয়।

পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তোমরাই তো তাদের বংশধর যাদেরকে আমি নুহের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম; সেতো ছিলো পরম কৃতজ্ঞ দাস।' বনী ইসরাইলকে লক্ষ্য করে এখানে তাদেরকে প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— হে বনী ইসরাইল জনতা! স্মরণ করো, তোমাদের পূর্বপুরুষকে আমি নবী নুহের নৌকায় উঠিয়ে নিয়ে রক্ষা করেছিলাম। নবী নুহ ছিলো আমার পরম কৃতজ্ঞ বান্দা। তার সহ-আরোহীগণও। সুতরাং তোমরা আমার মনোনীত ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজির প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো না কেনো?

আবু ফাতেমার বর্ণনাসূত্রে ইবনে মারদুবিয়া উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নবী নুহ ছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি সতত কৃতজ্ঞ। ছোট বড় সকল কাজের শুরুতে ও শেষে তিনি উচ্চারণ করতেন বিসমিল্লাহ্‌ ও আলহামদুলিল্লাহ্‌। এ কারণেই তাঁর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে 'আবদান শাকুরা'— কৃতজ্ঞ দাস। হজরত সাঈদ ইবনে মাসউদ সাক্বাফী থেকে ইবনে জারীর ও তিবরানীও এরকম বর্ণনা

এনেছেন। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা সর্ববিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব ও অত্যাবশ্যকতা সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আর কৃতজ্ঞতার মহান দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন হজরত নুহকে।

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তওরাতে প্রত্যাদেশ দ্বারা বনী ইসরাইলকে জানিয়েছিলাম, নিশ্চয় তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় অহংকার স্ফীত হবে।'

এখানে 'আল কিতাব' অর্থ তওরাত। আর 'আল আরদ্ব' (পৃথিবীতে) অর্থ সিরিয়ায়। হজরত ইবনে আব্বাস এবং কাতাদা বলেছেন, এখানে 'ইলা' (প্রতি) শব্দটির অর্থ হবে 'আ'লা' (উপর)। আর 'কিতাব' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে লওহে মাহফুজকে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আমি লওহে মাহফুজে এই সিদ্ধান্তটি চূড়ান্তরূপে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম যে, হে বনী ইসরাইল! তোমরা সিরিয়া অঞ্চলে দু দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। আর তোমরা হবে অত্যন্ত অহংকারী। বলা বাহুল্য, সেরকমই ঘটেছিলো। প্রথম বিপর্যয়টি ছিলো এরকম— তারা তওরাতের বিধান পরিত্যাগ করে নিষিদ্ধ বস্তুকে গ্রহণ করেছিলো এবং শহীদ করে দিয়েছিলো তাদের তৎকালীন নবী হজরত শা'ইয়া বিন মুজইয়াকে। দ্বিতীয় বিপর্যয় ছিলো— তারা হজরত জাকারিয়া ও হজরত ইয়াহ্ইয়াকে শহীদ করেছিলো এবং হজরত ঈসাকেও শহীদ করার উদ্যোগ নিয়েছিলো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার প্রথম বিপর্যয়টি ছিলো হজরত জাকারিয়ার শাহাদত এবং দ্বিতীয় বিপর্যয় ছিলো হজরত ইয়াহ্ইয়ার শাহাদত ও হজরত ঈসার প্রাণনাশের চেষ্টা। এখানে 'উলুওয়া' কথাটির অর্থ অবাধ্য হওয়া বা অহংকার-স্ফীত হওয়া। অর্থাৎ অবাধ্য ও অহংকারী হয়ে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের বন্ধনকে ছিন্ন করা ও মানুষের প্রতি অত্যাচার করা।

এর পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর এই দুইয়ের নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হলো, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার দাসদেরকে, যারা ছিলো যুদ্ধে শক্তিশালী, তারা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করে সমস্ত কিছু ধ্বংস করেছিলো।' হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে 'ইবাদাল্ লানা' (আমার দাসদের) বলে বুঝানো হয়েছে নিনুয়া নামক স্থানের বাসিন্দা সাখারীব ও তার সঙ্গীদেরকে। তারা ছিলো অত্যন্ত দুর্ধর্ষ। হজরত কাতাদা বলেছেন, জালুত ও তার সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে 'আমার দাসদেরকে যারা ছিলো যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী।' উল্লেখ্য যে, দুর্ধর্ষ জালুতকে হত্যা করেছিলেন হজরত দাউদ। ইবনে ইসহাক বলেছেন, বখতে নসর ও তার বাহিনী বনী ইসরাইলদের ঘরে ঘরে ঢুকে সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছিলো। তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলো বাবেলে। ওই বখতে নসরকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার

দাসদের, যারা ছিলো অত্যন্ত বলশালী, তারা তোমাদের গৃহে গৃহে প্রবেশ করে তোমাদের সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছিলো। বাগবী লিখেছেন, এখানে বখতে নসরের কথা বলা হয়েছে— একথাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

এখানে 'জাস্' অর্থ হত্যার জন্য গৃহে গৃহে প্রবেশ করা। জুজায বলেছেন, কোনো কিছুকে খুঁজে বের করার জন্য হন্যে হয়ে ফেরা। ফাররা বলেছেন, 'জাস্' অর্থ তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে হত্যা করেছিলো।

শেষে বলা হয়েছে—'শাস্তির প্রতিজ্ঞা কার্যকরী হয়েই থাকে।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে তা অতি অবশ্যই কার্যকর হয়। যেমন তাদের উপর শাস্তি কার্যকর হয়েছিলো বখতে নসরের মাধ্যমে।

এর পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তোমাদেরকে পুনরায় তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম। তোমাদেরকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম।'

এখানে 'আল কাররাতা' অর্থ— সাম্রাজ্য বা ক্ষমতা। 'আলাইহিম' অর্থ ওই সকল লোকের উপর। অর্থাৎ যারা বনী ইসরাইলদেরকে হত্যা করেছিলো ও বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলো, পরবর্তী সময়ে তাদের উপরেই আবার আল্লাহ্পাক বিজয়ী করে দিয়েছিলেন বনী ইসরাইলকে। বায়যাবী লিখেছেন, ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— ইরানের বাদশাহ গশতাসপ বিন লহরাসপের মৃত্যু হলে তার প্রপৌত্র বাহমন বিন ইস্ফান্দারিয়া ইরানের সিংহাসনে বসলেন। আল্লাহ্তায়ালা তার হৃদয়ে সৃষ্টি করে দিলেন বনী ইসরাইলদের প্রতি কিছুটা অনুরাগ। তিনি বনী ইসরাইলদেরকে মুক্ত করে পুনরায় সিরিয়ায় প্রেরণ করলেন। নবী দানিয়েলকে করে দিলেন তাদের নেতা। তারা সিরিয়াতে গিয়ে বখতে নসর বাদশাহর সেনা বাহিনীকে পরাজিত করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলো। ওদিকে আবার অত্যাচারী জালুতকে হত্যা করলেন হজরত দাউদ। বনী ইসরাইলদের আরেক শত্রুও নিপাত হলো এভাবে। ধীরে ধীরে তাদের সকল বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে লাগলো। বেড়ে গেলো জনসংখ্যা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্পদ। সেদিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে— 'তোমাদের ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম।'

এখানে 'নাফিরা' কথাটির অর্থ— ওই সকল লোক, যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শত্রুর মুখোমুখি হয়। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, 'নাফিরা' শব্দটি 'নাফার' এর বহুবচন। যেমন 'আবীদ' বহুবচন 'আবদ' এর। নাফার বলা হয় ওই দলকে যারা বহির্গত হয় দুশমনদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ যে দল সংখ্যায় গরিষ্ঠ হওয়ার কারণে হয় শক্তিমান, অজেয়।

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا
جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ
كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا - عَسَىٰ رَبُّكُمْ
أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ
حَصِيرًا - إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا -
وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا -

❑ তোমরা সৎকর্ম করিলে সৎকর্ম নিজদিগেরই জন্য করিবে এবং মন্দকর্ম করিলে তাহাও করিবে নিজদিগের জন্য। অতঃপর, পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে আমি আমার দাসদিগকে প্রেরণ করিলাম তোমাদিগের মুখ-মণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করিবার জন্য, প্রথমবার তাহারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করিয়াছিল পুনরায় সেই ভাবেই উহাতে প্রবেশ করিবার জন্য এবং তাহারা যাহা অধিকার করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিবার জন্য।

❑ সম্ভবতঃ তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের প্রতি দয়া করিবেন; কিন্তু তোমরা যদি তোমাদিগের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে তিনিও তাঁহার আচরণের পুনরাবৃত্তি করিবেন। জাহান্নামকে আমি করিয়াছি সত্য প্রত্যাখ্যান-কারীদিগের জন্য কারাগার।

❑ এই কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ করে এবং সৎকর্ম পরায়ণ বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ দেয় যে, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

❑ এবং যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি মর্মন্তুদ শাস্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা সৎকর্ম করলে সৎকর্ম নিজেদেরই জন্য করবে এবং মন্দকর্ম করলে তা-ও করবে নিজেদের জন্য।' একথার অর্থ— হে মানুষ! অথবা হে বনী ইসরাইল জনতা ! তোমরা যদি আল্লাহ্র বিধানানুসারে

চলো, তবে তোমরাই লাভ করবে পুণ্য ও আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ। আর যদি আল্লাহ্র বিধানবহির্ভূত জীবন যাপন করো, তবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তোমরাই। আল্লাহ্র এতে কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। কারণ তিনি চিরঅমুখাপেক্ষী।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আমি আমার দাসগণকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করবার জন্য, প্রথম বার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিলো পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করবার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিলো, তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবার জন্য।'

এখানে 'লিইয়াসূউ উজুহাকুম' কথাটির অর্থ—তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করবার জন্য, যা সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হবে।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্তায়ালা পারস্যরাজ খরদুশ ও টাইটিসকে বনী ইসরাইলদের উপরে বিজয় দান করেছিলেন। তারা বীর বিক্রমে বনী ইসরাইলদের উপর চড়াও হয়েছিলো। তাদের কাউকে হত্যা করেছিলো। কাউকে করেছিলো বন্দী। আবার কাউকে বানিয়েছিলো ক্রীতদাস। এরকম ব্যাপক ধ্বংস তাদের উপরে নেমে এসেছিলো দু'বার।

'মা আলাও' অর্থ তারা যে স্থান অধিকার করেছিলো। অথবা যতদিন পর্যন্ত অধিকারে রেখেছিলো।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক সূত্রে বাগবী লিখেছেন, বনী ইসরাইলেরা অধিকাংশ সময় অপকর্মে লিপ্ত থাকতো। অবাধ্যতা ছিলো তাদের স্বভাব। তৎসত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালা তাদের বহুভাবে অনুগৃহীত করেছিলেন। হজরত মুসার মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে এইমর্মে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, সংশোধিত না হলে তাদের উপরে নেমে আসবে আযাব। হজরত মুসার তিরোধানের পর যথাসময়ে দুর্বিনীত বনী ইসরাইলদের প্রতি ঠিকই আযাব নেমে এসেছিলো। তাদের এক রাজার নাম ছিলো সিদ্দীকাহ্। তখনকার নিয়ম ছিলো, মানুষকে সুপথে পরিচালনার জন্য তখনকার রাজাদের সঙ্গে আল্লাহ্পাক রাখতেন তাঁর প্রেরিত কোনো নবীকে। ওই সকল নবীর উপরে কোনো আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হতো না। তাঁরা মানুষকে পথ-প্রদর্শন করতেন তওরাতের মাধ্যমে। সিদ্দীকাহ'র সঙ্গে নবী হিসেবে ছিলেন হজরত শা'ইয়া বিন আমজীয়া। তিনি ছিলেন হজরত জাকারিয়া ও হজরত ইয়াহ্ইয়ার পূর্ববর্তী নবী। তিনি হজরত ঈসা আ. ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রচার করতেন। বলতেন, হে জেরুজালেমবাসী! শোনো, অচিরেই তোমাদের নিকটে আগমন করবেন দু'জন মহান রসুল। একজন হবেন অশ্বারোহী। আরেকজন হবেন উষ্ট্রারোহী।

বাদশাহ্ সিদ্দীকাহ্ ছিলেন ধর্মপ্রাণ। সুদীর্ঘ কাল ধরে তিনি বনী ইসরাইলদের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে ব্যাবিলনের রাজা সাখারিব বনী ইসরাইলদের রাজ্য আক্রমণ করলো। ছয়লক্ষ পতাকা নিয়ে সে পৌছে গেলো বায়তুল মাকদিসের উপকণ্ঠে। বাদশাহ সিদ্দীকাহ্ তখন পায়ের ফোঁড়ায় দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিলেন। আল্লাহ্র নবী হজরত শা'ইয়া তাঁকে বললেন, হে ইসরাইলদের সম্রাট! ইরাকরাজ ছয়লক্ষ পতাকা নিয়ে উপনীত হয়েছে বায়তুল মাকদিসের উপকণ্ঠে। তার ভয়ে অনেকে পালিয়েছে। আপনিও হুঁশিয়ার থাকুন। বাদশাহ চিন্তিত হলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র নবী ! আমার ও ব্যাবিলনরাজের মধ্যে কী সিদ্ধান্ত হবে, সে সম্পর্কে আপনি কোনো প্রত্যাদেশ পেয়েছেন কি? হজরত শা'ইয়া বললেন, না। এমতো কথোপকথনের কিছুক্ষণ পরেই প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো। আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, হে শা'ইয়া! বাদশাহকে বলো, তাঁর অন্তিম সময় সন্নিকটে। সুতরাং সে যেনো যা অছিয়ত করবার তা করে নেয়। নির্ধারণ করে একজন প্রতিনিধি। হজরত শা'ইয়া বললেন, সম্রাট! আপনার সম্পর্কে প্রত্যাদেশ পেয়েছি। আল্লাহ্ জানাচ্ছেন, আপনার পরকাল যাত্রার সময় সমুপস্থিত। সুতরাং আপনার যদি কিছু অছিয়ত করার থাকে, তবে করে নিন। আপনার পরিবারের কাউকে যদি আপনার স্থলাভিষিক্ত করে যান, তবে তা-ও করতে পারেন। এ কথা শুনে বাদশাহ নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। কেঁদে কেঁদে দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা আল্লাহ্! হে মহারাজাধিরাজ! হে সকল সৃষ্টির একমাত্র উপাস্য! তুমি সকল দোষত্রুটি থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। নিদ্রা বা তন্দ্রা তোমাকে কোনোকালে কখনোই স্পর্শ করে না। তুমি জানো, আমি বনী ইসরাইলদের সাম্রাজ্য শাসন করেছি ন্যায়ানুগতার সঙ্গে। আমার প্রকাশ্য ও গোপন সকল কিছুই তুমি জানো। তুমি আমার প্রতি তোমার বিশেষ রহমত বর্ষণ করো।

হজরত শা'ইয়ার নিকটে পুনঃ প্রত্যাদেশ হলো, হে আমার নবী! তুমি সিদ্দীকাহকে বলো, আমি তার প্রার্থনা গ্রহণ করেছি। আরো বলো, ব্যাবিলনরাজের হাত থেকে আমি তাকে ও তার রাজ্যকে রক্ষা করবো। আর আমি তার হায়াত বাড়িয়ে দেব আরো পনেরো বছর। হজরত শা'ইয়া বাদশাহকে প্রত্যাদেশিত শুভসংবাদটি জানালেন। শুভসংবাদ শ্রবণ করার সাথে সাথে বাদশাহ্র অন্তর থেকে শত্রুভীতি দূর হয়ে গেলো। তিনি সেজদাবনত হয়ে দোয়া করলেন, হে আমার দয়াময় আল্লাহ্! হে আমার মাতা ও পিতার উপাস্য! আমি কেবল তোমাকেই সেজদা করি। তোমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানি। সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা কেবলই তোমার। তুমি যাকে খুশী রাজ্য দান করো, আবার যাকে খুশী

করো রাজ্যহারা। সর্বজ্ঞ তুমি। সকলের প্রকাশ্য ও গোপন— সকল কিছুই তোমার জানা। তুমি প্রকাশ, তুমি গোপন। তুমি প্রথম, তুমিই শেষ। বিপর্যস্ত দাসের দোয়া তুমিই তো দয়া করে গ্রহণ করো। তুমি আমার দোয়া কবুল করেছো। পরমতম দয়ার্দ্র বলেই তুমি এমন করলে।

বাদশাহ সেজদা থেকে মাথা ওঠালেন। হজরত শা'ইয়ার প্রতি আবারো অবতীর্ণ হলো প্রত্যাদেশ। বলা হলো, হে নবী শা'ইয়া। তুমি বাদশাহকে জানিয়ে দাও, সে যেনো তার কোনো পরিচারককে দিয়ে ডুমুরের রস আনিয়ে তার ফোঁড়ায় লাগিয়ে দেয়। এরকম করলে সে নিরাময় লাভ করবে। হজরত শা'ইয়া প্রত্যাদেশের কথা বাদশাহকে জানালেন। বাদশাহ প্রত্যাদেশানুসারে তাঁর ফোঁড়ায় ডুমুরের রস লাগিয়ে নিরাময় লাভ করলেন। তারপর হজরত শা'ইয়াকে বললেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! দয়া করে আল্লাহ্র নিকট থেকে জেনে নিন, শত্রুদের কী পরিণতি হবে? বাদশাহর এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতে প্রত্যাদেশ হলো, হে আমার প্রিয় নবী! বাদশাহকে বলে দিন, সে শত্রুমুক্ত। আগামী কাল প্রত্যূষে ব্যাবিলনরাজের সকল সৈন্য মারা যাবে। বেঁচে থাকবে কেবল রাজা ও তার পরিবারের পাঁচজন মাত্র। তুমি তাদেরকে বন্দী কোরো।

পরদিন প্রত্যূষে বাদশাহ তার বিশেষ ঘোষকের মাধ্যমে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন যে, হে বনী ইসরাইল জনতা! তোমরা কে কোথায় আছো, দেখে যাও। আল্লাহ্ তাঁর দুশমনদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরপর বাদশাহ নিজে চললেন শহরের উপকণ্ঠের দিকে। তাঁকে অনুসরণ করলো পারিষদবর্গ ও বিপুল সংখ্যক জনতা। ইরাকী বাহিনীর অবস্থান স্থলে গিয়ে দেখলেন, মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে সৈন্যদের অসংখ্য মরদেহ। ব্যাবিলনরাজ সাখারীব ও তার পাঁচ সঙ্গীকে খুঁজতে লাগলো সকলে। কিন্তু তাদেরকে কোথাও পেলো না। আশে-পাশে তল্লাশী শুরু হলো। শেষে তাদেরকে পাওয়া গেলো এক পাহাড়ের গুহায়। বখতে নসরও ছিলো তাদের মধ্যে। তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আনা হলো বাদশাহর সামনে। তাদেরকে দেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বাদশাহ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হলেন। আসরের সময় পর্যন্ত সেজদায় পড়ে রইলেন তিনি। তারপর মাথা উঠিয়ে বললেন, হে ব্যাবিলনরাজ! দেখলে তো, মহান আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করলেন। তিনি সর্বশক্তিধর। দেখলে তো তার প্রমাণ। ব্যাবিলনরাজ বললো, আমি আগেই জানতাম,আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। তোমাদের প্রতি বর্ষণ করবেন তাঁর বিশেষ দয়া। এ সংবাদ আমাকে দেয়া হয়েছিলো যাত্রা শুরুর পূর্বেই। কিন্তু ওই শুভপরামর্শদাতার কথা আমি মানিনি। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই আজ আমার এই দুর্দশা। এই শোচনীয় পরিণতির কথা জানতে পারলে আমি তো এদিকে অগ্রসরই হতাম না। বাদশাহ বললেন, সকল প্রশংসা ও কৃতিত্ব

কেবলই আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে ধ্বংস করতে চান, সে অবশ্যই ধ্বংস হয়। তোমরা বেঁচে গিয়েছো বলে আবার একথা মনে কোরো না যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র। কখনোই নয়। দুনিয়ায় অধিক পাপ অর্জনের জন্য এবং সেই পাপের কারণে আখেরাতে আরো অধিক শাস্তি দানের জন্যই তোমাদেরকে আপাততঃ অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তোমরা এবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। তোমাদের দেশবাসীকে জানাবে আল্লাহ্‌র শাস্তি কতো ভয়াবহ। এটাই এখন তোমাদের কাজ। কাজটি জরুরী বিধায় তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলো। নতুবা তোমাদেরকে আমি এই মুহূর্তে হত্যা করতাম। হে ইরাকাধিপতি! একথাটিও উত্তমরূপে অবগত হও যে, তুমি ও তোমার সাথীদের রক্ত আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটে কীট-পতঙ্গের রক্তের চেয়েও মূল্যহীন। এরপর বাদশাহ্‌র হুকুমে তাদের গলায় শিকল পরানো হলো এবং সত্তর দিন ধরে ঘোরানো হলো বায়তুল মাকদিস ও ইলইয়ার চার পাশে। প্রতিদিন তাদেরকে খেতে দেয়া হতো দু'টো করে যবের রুটি। এরকম অপমানের কারণে সাখারীব একদিন বাদশাহকে বললো, আপনি যে দুর্ব্যবহার আমার সঙ্গে করছেন, তার চেয়ে আমার মৃত্যুই ছিলো শ্রেয়ঃ। বাদশাহ সাখারীব ও তার সঙ্গীদেরকে বধ্যভূমিতে পাঠালেন। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী হজরত শা'ইয়াকে প্রত্যাদেশ করলেন, বাদশাহ্‌কে বলো, সে যেনো সাখারীব ও তার অনুচরদেরকে মুক্তি দেয়। সম্মানের সঙ্গে তাদেরকে পাঠিয়ে দেয় তাদের স্বদেশে। তারা গিয়ে তাদের দেশবাসীকে ভয় দেখাবে। হজরত শা'ইয়া বাদশাহ্‌কে আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ জানালেন। বাদশাহ্‌ নির্দেশ পালন করলেন। সসম্মানে তাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন ইরাকে।

সাখারীব ও তার সাথীরা দেশে ফিরে গিয়ে লোকদেরকে ডেকে সেনাবাহিনীর দুরবস্থার কথা জানালো। গণক ও জ্যোতির্বিদেরা বললো, মহামান্য সম্রাট! আমরা তো আগেই আপনাকে বায়তুল মাকদিস অভিযানে যেতে নিষেধ করেছিলাম। বলেছিলাম, তাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র নবী। নবীর কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ আসে। আর নবীর অনুসারীরা আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত । কিন্তু আপনি আমাদের কথায় কর্ণপাত করেননি।

এ ঘটনার পর সাখারীব বেঁচেছিলো মাত্র সাত বছর। মৃত্যুর পূর্বে সে তার প্রপৌত্র বখতে নসরকে তার স্থলাভিষিক্ত করে গেলো। বখতে নসরও ছিলো তার পিতামহের একনিষ্ঠ অনুসারী। সে রাজ্য শাসন করেছিলো সতেরো বছর।

ওদিকে বনী ইসরাইলদের বাদশাহ্‌র অন্তিম যাত্রার সময় হয়ে এলো। কিন্তু তার পরকালের যাত্রার আগেই রাজ্য জুড়ে দেখা দিলো বিশৃংখলা। ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হলো বনী ইসরাইলেরা। শুরু হয়ে গেলো অশান্তি, খুন, খুনের পর খুন। নবী শা'ইয়া তাদেরকে সদুপদেশ দান করলেন। কিন্তু তার কথার প্রতি

কেউ ভ্রূক্ষেপই করলো না। আল্লাহ্‌তায়ালা তখন তাঁকে এইমর্মে প্রত্যাদেশ করলেন, 'হে আমার নবী ! আপনি বিশৃংখল জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করুন। ওই বক্তৃতাই হবে আমার প্রত্যাদেশ। হজরত শা'ইয়া জনতার দিকে লক্ষ্য রেখে বললেন, হে আকাশ! শোন। হে পৃথিবী! অভিনিবেশী হও। আল্লাহ্ বনী ইসরাইলদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তিনি তাদেরকে অনুগৃহীত করেছেন তাদেরকে নির্বাচন করেছেন প্রিয়পাত্ররূপে। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর উপরে তাদেরকে দান করেছেন শ্রেষ্ঠত্ব। তারা ছিলো দিশেহারা মেষপালের মতো। ছিলো না তাদের কোনো সদুপদেশ দানকারী ও পথপ্রদর্শক। তারপর আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন নবী। এভাবে নবীর মাধ্যমে তাদেরকে একত্র করেছেন। ফলে অসুস্থজনেরা হয়েছে সুস্থ, বিচ্ছিন্ন জনেরা হয়েছে সম্মিলিত এবং দুর্বলেরা হয়েছে শক্তিমান। এরপরেও তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো না। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসা পরিত্যাগ করে শুরু করলো হানাহানি। এই অনৈক্যের বিষময় প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। অসহায় জনতা হলো আশ্রয়চ্যুত। রক্তরঞ্জিত হলো প্রশান্ত মৃত্তিকা। বলো হে আকাশ ও পৃথিবী! এ দুর্বিপাক চলবে আর কতোকাল? সময় হলে উষ্ট্র ফিরে আসে তার আরোহীর কাছে। চারণ ভূমি থেকে স্বআবাসে ফিরে আসে পশুর পাল। কিন্তু দেখো এই অপরিণামদর্শী বনী ইসরাইল জনতা কতোই না মূর্খ। তারা এতোটুকুও অনুধাবন করতে পারছে না যে, কেনো এই বিশৃংখলা, কেনো এই হানাহানি, রক্তপাত। হে নীলাকাশ! হে ধরিত্রী! তোমরা তাদেরকে ওই দৃষ্টান্তটির কথা বলো— একটি প্রান্তর ছিলো শস্যশূন্য। শুকনো ঘাস ছাড়া আর কিছুই ছিলো না সেখানে। ওই প্রান্তরের মালিক চতুষ্পার্শ্বে দেয়াল নির্মাণ করে প্রান্তরটিকে ঘিরে ফেললেন, প্রাচীরবেষ্টিত ওই প্রান্তরে নির্মাণ করলেন নয়নাভিরাম প্রাসাদ। খনন করলেন হ্রদ। রচনা করলেন বাগান। সে বাগানে রোপন করলেন যয়তুন, আনার, খেজুর ও আরো অনেক ফলের গাছ। আর বাগান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন একজন জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে। যথাসময়ে গাছে গাছে দেখা দিলো ফুল ও মুকুল। কোনো কোনো ফুল ও মুকুল থেকে প্রকাশ পেলো ফল। আর কোনো কোনো ফুল ও মুকুল ঝরে পড়লো অকালে। বাগানের অধিবাসীরা বললো, এ গাছগুলো কোনো কাজের নয়। না হলে এগুলোতে মরা মুকুল ও ঝরা ফুল দেখা দিবে কেনো? এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় হচ্ছে, এসকল কিছু উচ্ছেদ করে ফেলা। সুতরাং ভেঙে ফেলো প্রাসাদ। ভরাট করে ফেলো জলময় হ্রদ। আর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দাও বৃক্ষগুলোকে। পূর্ববৎ শস্যশূন্য প্রান্তরই উত্তম। হে আসমান! হে জমিন! তাদেরকে বলে দাও, ওই সাজানো বাগানের দেয়ালই হচ্ছে সত্য ধর্ম। আর প্রাসাদ হচ্ছে শরিয়ত। হ্রদ বা

নহর হচ্ছে আসমানী কিতাব। আর বাগানের রক্ষক হচ্ছে আল্লাহ্‌র নবী এবং বাগানের বৃক্ষগুলো তো তোমরাই। মরা মুকুল ও ঝরা ফুল হচ্ছে তোমাদের মন্দ আমল, তোমাদের অপকর্মের পরিণাম। হে বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠী! আমি তো তোমাদের স্বেচ্ছাচারিতার পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করি। উপস্থাপিত দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে সদুপদেশ প্রদান করলাম। তোমরা গাভী, বকরী ইত্যাদি জবাই করে আমার নৈকট্য অর্জন করতে চাও। কিন্তু মনে রেখো তোমাদের কোরবানীর গোশত আমার নিকটে পৌঁছে না। আমি তো পানাহার থেকে চিরমুক্ত। চিরপবিত্র । আমি কেবল বলি, হে উদাসীন জনতা! তাক্বওয়া (সাবধানতা) অবলম্বন করো। যে সকল হত্যা আমি হারাম করেছি, সেগুলো থেকে বিরত থাকো। এভাবে হালাল ও হারামের যথামান্যতার মাধ্যমে আমার প্রসন্নতা লাভে সচেষ্ট হও। কিন্তু তোমরা তো উন্নাসিক। রক্তলোলুপ। তোমাদের হস্ত ও বস্ত্র অবৈধ রক্তে রঞ্জিত। তোমরা আমার গৃহ নির্মাণ করো। নির্মিত গৃহ বা মসজিদের ভিতর ও বাহির পবিত্রও রাখো। কিন্তু তোমাদের অন্তর ও বাহির অপরিচ্ছন্ন, অপবিত্র। তোমরা মসজিদকে সাজিয়েছো সুন্দররূপে। কিন্তু জ্ঞান ও বিবেককে রেখেছো অসুন্দর আচ্ছাদনে। কী ভেবেছো তোমরা? আমি কি মসজিদে থাকি? আমি তো মসজিদ নির্মাণ করতে বলেছি এজন্যে যে, সেখানে সমুন্নত হবে আমার বিধানাবলী। সমুচ্চারিত হবে আমার স্মরণ। বিঘোষিত হবে আমার প্রশংসা ও পবিত্রতা।

তারা বলে, আমরা রোজা রাখি। কিন্তু আমাদের রোজা উপরে ওঠানো হয় না। আমরা নামাজ পড়ি। কিন্তু সে নামাজে নূর সৃষ্টি হয় না। আমরা দান করি। কিন্তু সে দান আমাদেরকে পবিত্র করে না। আমরা গর্দভের মতো চিৎকার করে প্রার্থনা জানাই এবং বাঘের মতো সশব্দে কাঁদাকাটি করি। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা ও রোদন গৃহীত হয় না। তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কী কারণে তাদের কার্যকলাপ, আবেদন ও রোদন আমার নিকটে পৌঁছে না। আমি কি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ও পরমতম দয়ার্দ্র নই? কী করে তাদের রোজাকে আমি উপরে ওঠাবো? তারা রোজা রেখে মিথ্যা কথা বলে। নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করে। কী ভাবে তাদের নামাজে দেখা দিবে জ্যোতির উদ্ভাস? তাদের হৃদয় যে আমার শত্রু। সীমালংঘনকারীদের প্রতি তাদের রয়েছে আন্তরিক অনুরাগ। তাদের দানই বা তাদের পরিশুদ্ধ করবে কেনো? তারা তো দান করে অপরের আত্মসাৎকৃত সম্পদ। আমি তো দানের বিনিময় প্রদান করি কেবল তাদেরকেই, যারা বিশুদ্ধাচারী। তাদের প্রার্থনাই বা আমি কবুল করবো কেনো? তারা যে কপট। তাদের কথা ও কাজ যে সুসমঞ্জসপূর্ণ নয়। আমি তো প্রার্থনা গ্রহণ করবো কেবল তাদের, যারা

প্রশান্ত হৃদয়বিশিষ্ট ও বিনয়ী। তারা তো দরিদ্র ও অনাথকে প্রসন্ন করে না। তারা তো জানে না, অসহায় জনতার সন্তোষই আমার সন্তোষ।

তুমি দেখো তাদের উন্নাসিকতার নিদর্শন। আমার বার্তা যখন তাদের নিকটে পৌছানো হয়, তখন তারা বলে, এগুলো তো কল্পকাহিনী ও কিংবদন্তী। পুরুষানুক্রমে এ সকল কথা আমাদেরকে শোনানো হয়েছে। গণক ও পদ-রচয়িতাদের মতো এগুলো তো কতিপয় ছন্দোবদ্ধ পদ। ইচ্ছে করলে আমরাও এরকম ছন্দ নির্মাণ করতে পারি। শয়তানের পক্ষ থেকে আমরাও প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত। ইচ্ছে করলে আমরাও শয়তানের নিকট থেকে জেনে নিতে পারি অদৃশ্যের সংবাদ।

আমি তোমাদেরকে যখন সৃষ্টি করেছি, তখনই গ্রহণ করেছি মহাপ্রলয়ের সিদ্ধান্ত। এর মধ্যবর্তীতে অবকাশ দিয়েছি পার্থিব জীবন যাপনের। এই পার্থিবতা শেষে অবশ্যই আগমন করবে প্রতিশ্রুত কিয়ামত। তারা গায়েবের সংবাদ জানে বলে দাবি করে। তারা যদি তাদের দাবিতে সত্য হয়, তবে একথা বলতে পারে না কেনো যে, কিয়ামত কখন হবে? তাদের আস্ফালন তো সাময়িক। আর মহাপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী। অংশীবাদীরা পছন্দ না করলেও আমার এ অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হবেই। আমার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুশলতা অবশ্যই একদিন প্রকাশিত হবে। আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রাক্কালে আমি এ সিদ্ধান্তটিও গ্রহণ করেছি যে, পৃথিবীতে আমি প্রবহমান করবো নবুয়তের ধারা। আর সাম্রাজ্যাধিকার দিবো সাধারণতঃ নিম্ন মর্যাদাধারীদেরকে। ফলে পৃথিবীতে সম্মানহীনেরাই পাবে সম্মান, অযোগ্যরাই লাভ করবে প্রভাব-প্রতিপত্তি। মূর্খ ও অজ্ঞরা পরিচিতি পাবে জ্ঞানী বলে। পৃথিবীর ওই সকল শাসক, জ্ঞানী ও বিত্তশালীকে প্রশ্ন করো, বলো, কখন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় ? কে ঘটাবে এমতো সর্ববিধ্বংসী ঘটনা। তার সাহায্যকারীই বা হবে কে?

আরো শোনো, আমি নবুয়তের ধারাক্রমের অন্তিমে প্রেরণ করবো এক অক্ষরের অমুখাপেক্ষী নবীকে। যিনি অহমিকাপ্রবণ হবেন না। রূঢ় আচরণবিশিষ্ট হবেন না। বাজারে শোরগোল করবেন না। হবেন না অশ্লীলভাষী। অসুন্দর কথা তিনি কখনই বলবেন না। আমি তাঁকে পরিচালিত করবো সহজ সরল পথে। দান করবো সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র। মহানুভবতা হবে তাঁর পরিচ্ছদ। শুভবোধ ও পুণ্য হবে তাঁর অভ্যন্তরীণ বৈভব। তিনি হবেন সাবধানী, সুবিবেচক, সত্যবাদী ও অঙ্গীকার রক্ষাকারী। ক্ষমা ও কল্যাণকামনা হবে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাব। ন্যায়পরায়ণতা হবে তাঁর জীবনাদর্শ। আমি সত্যকে বানাবো তাঁর শরিয়ত। পথপ্রদর্শনকে তাঁর অনুচর এবং ইসলামকে তাঁর ধর্ম। তাঁর পবিত্র নাম হবে আহমদ। আর তাঁর মাধ্যমে বিভ্রান্তকে দান করবো সুপথ। মূর্খদেরকে দান করবো জ্ঞান। আর অপ্রসিদ্ধজনকে

প্রদান করবো প্রসিদ্ধি। প্রাচুর্যে পরিণত করবো অনটনকে। বিত্তবৈভবে পরিণত করবো নিঃস্বতাকে। চিন্তান্বিতদেরকে মিলিয়ে দিবো প্রশান্ত অন্তর বিশিষ্টদের সঙ্গে। সংরাগ-শূন্যদেরকে দান করবো ভালোবাসা। একতায় পরিণত করবো সকল অনৈক্যকে।

তাঁর উম্মতকে বানাবো আমি সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। তাদের অভ্যুদয় ঘটাবো কল্যাণের জন্য। তারা নির্দেশ করবে সকল শুভ ও শুভ্রকে। নিষিদ্ধ করবে সকল অশুভ ও মলিনতাকে। তারা আমাকে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় বলে জানবে। আমাকে বিশ্বাস করবে। তাদের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপকে পরিশুদ্ধ করবে কেবল আমার জন্য। তারা নামাজ পাঠ করবে বিনম্র ভঙ্গিতে। একাগ্রচিত্তে সমাপন করবে তাদের দণ্ডায়মানতা, রুকু ও সেজদা। জেহাদের প্রান্তরে তারা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়বে সারিবদ্ধ হয়ে। প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর উপর। কেবল আমার পরিতুষ্টি সাধনার্থে তারা বহির্গত হবে তাদের গৃহ থেকে। আমি তাদের অন্তরে ও মুখে প্রতিধ্বনিত করবো আমার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা, এককত্বের বাণী, পবিত্রতা ও প্রশংসার স্তোত্র। ফলে তাদের নির্জনতা ও সমাবেশস্থল ভরে উঠবে আমার স্মরণের মৌন ও মুখর আয়োজনে। গৃহে, পথযাত্রাকালে তারা উচ্চারণ করবে 'আল্লাহু আকবার'। হৃদয়ের গভীরে লালন করবে আমার পবিত্রতা, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। উচ্চস্থানে আরোহণ করে তারা প্রক্ষালনের মাধ্যমে পবিত্র করবে তাদের মুখমণ্ডল, হাত, পা ও শরীর। পরিচ্ছদ পরিধান করবে কোমরের উপরে। তাদের রক্ত উৎসর্গীকৃত হবে কেবল আমার জন্য। আর তাদের বক্ষদেশ জাগ্রত থাকবে আমার আকাশজ বাণী বৈভবে। আমার ভয় তাদেরকে প্ররোচিত করবে নিশিজাগরণে। নিভৃত উপাসনায়। আর তাদের দিবাভাগ হবে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর। রণপ্রান্তরে তারা হবে অজেয় শার্দুল সদৃশ। এ সকল কিছু হচ্ছে আমার অনন্য অনুকম্পা। আমি যাকে ইচ্ছা এমতো অনুকম্পা দানে ধন্য করি।

হজরত শা'ইয়া তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলো বনী ইসরাইল জনতা। একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর উপর। হজরত শা'ইয়া আত্মরক্ষার জন্য একদিকে দৌড় দিলেন। লোকেরা তাড়া করলো তাঁকে। পথিমধ্যে পড়লো একটি বৃক্ষ। বৃক্ষটি বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী। আমার অভ্যন্তরে আত্মগোপন করুন। বৃক্ষটি দু'ফাঁক হয়ে গেলো। হজরত শা'ইয়া তার ভিতরে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দু'ফাঁক হওয়া গাছটি এক হয়ে গেলো। নবী শা'ইয়া বৃক্ষাভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের একটি কোণা রয়ে গেলো বাইরে। সেখানে একটু পরেই এসে পড়লো উন্মত্ত জনতা। শয়তান ছিলো তাদের সঙ্গে। সে বললো, এই গাছের মধ্যেই সে আত্মগোপন করেছে। এই

দেখো তার কাপড়ের একাংশ। লোকেরা তখন একটি করাত এনে আড়াআড়িভাবে গাছটিকে চিরে ফেললো। গাছের সঙ্গে হজরত শা'ইয়ার পবিত্র শরীরও হয়ে গেলো দ্বিখণ্ডিত।

এরপর আল্লাহ্তায়ালা বনী ইসরাইলদের বাদশাহ বানালেন নাশিয়া বিন আমওয়াসকে। আর নবুয়ত দান করলেন আরমিয়া বিন হালাকিয়াকে। তিনি ছিলেন হজরত হারুন বিন ইমরানের বংশধর। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, তাঁর উপাধি ছিলো খিজির। আর নাম ছিলো আরমিয়া। একবার তিনি একস্থানে শুকনো ঘাসের উপরে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে উঠতেই দেখা গেলো শুষ্কতৃণ পরিণত হয়েছে সবুজ তৃণশয্যায়। তখন থেকে লোকসমক্ষে তিনি খিজির নামে খ্যাত হয়েছিলেন। নবী আরমিয়াকে দেয়া হলো বাদশাহ নাশিয়ার পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব।

কিছুকাল পরে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীকে প্রত্যাদেশ করলেন, হে আরমিয়া। বনী ইসরাইল জনতা ভ্রষ্টতার চরমে পৌছেছে। আমার নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার পরোয়াই তারা করে না। তুমি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করো। তাদেরকে প্রদত্ত আমার অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দাও। স্মরণ করিয়ে দাও আমার নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ। নবী আরমিয়া বললেন, হে আমার প্রভুপালক! তারা তো সংখ্যাগুরু। আর আমি একা। তারা শক্তিমান। আর আমি শক্তিহীন, নিঃসঙ্গ। সুতরাং তুমি আমাকে সাহায্য করো। আমি জানি তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে আমি দীন, হীন, দুর্বল। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, হে আরমিয়া! তুমি কি জানোনা যে, সকল হৃদয় ও রসনা আমার কর্তৃত্বাধীন। আমার অভিপ্রায়ানুসারে আপতিত হয় সকলের হৃদয়। আমি তো তোমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। সুতরাং তুমি চিন্তিত কেনো? যাও, এবার কর্তব্যকর্মের দিকে ধাবিত হও।

হজরত আরমিয়া জনসমাবেশে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। কিন্তু কী বলবেন, কিছু ভেবে পেলেন না। সহসা তাঁর হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত হলো একটি প্রত্যাদেশিত ভাষণ। সে ভাষণ উঠে এলো রসনায় । সুন্দর, সুললিত ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তিনি সদুপদেশ দিতে শুরু করলেন। বললেন আল্লাহ্র আনুগত্যের কথা। অবাধ্যতার কথা। আনুগত্যের পুরস্কার ও অবাধ্যতার শাস্তির কথা। সবশেষে আধ্যাত্মিক ঘোরের মধ্যে সরাসরি আল্লাহ্র জবানীতে বলে উঠলেন, আমার সম্মানের শপথ! আমি বনী ইসরাইলের বিপর্যয়কে প্রবল করে দিবো। তাদের কোনো বিজ্ঞজনই তখন আর পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাবে না। একজন নিষ্ঠুর ও নির্দয় রাজাকে আমি তাদের উপরে বিজয়ী করে দিবো। আর নির্মম আক্রমণের শংকায় আমি শংকাচ্ছাদিত করবো বনী ইসরাইলদেরকে। ইয়াফেছ গোত্রের জনপদ থেকে আগমন করবে তারা ।

উল্লেখ্য যে, বাবেলের অধিবাসীদেরকেই বলা হয় ইয়াফেছ। সম্ভবতঃ তারা ছিলো হজরত নূহের পুত্র ইয়াফেছের বংশধর। তাই তাদের নাম বনী ইয়াফেছ বা ইয়াফেছ। তখন তাদের রাজা ছিলো বখতে নসর।

বখতে নসর তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলো বায়তুল মাকদিস অভিমুখে। প্রায় বিনা বাধায় অধিকার করে বসলো বনী ইসরাইলদের সাম্রাজ্য। হত্যা করলো তাদের অনেককে। ধ্বংস করে দিলো বায়তুল মাকদিস মসজিদ। বখতে নসর তার সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিলো, ঢাল ভর্তি করে মাটি এনে ঢেকে দাও মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। সৈন্যেরা নির্দেশ পালন করলো। এরপর সে হুকুম দিলো, রাজ্যের সকল জনতাকে ধরে আনো। সৈন্যরা বেচেঁ যাওয়া বনী ইসরাইলের সকল নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকাকে ধরে এনে হাজির করলো রাজার সামনে। রাজা ক্রীতদাস-দাসীরূপে বাছাই করে নিলো প্রায় ষাট হাজার বালক-বালিকাকে। তারপর গণিমতের মাল বণ্টন করে দিলো সৈন্যদের মধ্যে। সৈন্যরা বললো, গণিমত আমরা চাই না। আমরা চাই গোলাম। মহামান্য সম্রাট! সকল গণিমত রেখে দিন আপনার ভাণ্ডারে। আর বালক বালিকা বণ্টন করে দিন আমাদের মধ্যে। বখতে নসর তাই করলো। প্রত্যেক সৈন্য ভাগে পেলো চারজন করে গোলাম ও বাঁদী। শেষে বখতে নসর ঘোষণা করলো, বনী ইসরাইলের এক তৃতীয়াংশ জনতাকে হত্যা করো। এক তৃতীয়াংশ রেখে দাও এই শহরে। আর অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশকে নিয়ে চলো বাবেলে। হুকুম তামিল করা হলো। বাদশাহ নাশিয়াকেও বন্দী করেছিলো বখতে নসর। তাকে এবং এক তৃতীয়াংশ বনী ইসরাইল জনতা যার সংখ্যা ছিলো প্রায় সত্তর হাজার, সঙ্গে নিয়ে বিজয়ীর বেশে বখতে নসর প্রত্যাবর্তন করলো বাবেলে। এই ধ্বংসপর্বটি ছিলো বনী ইসরাইলদের প্রথম ধ্বংসপর্ব। আলোচ্য আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে 'এরপর ওই দু'টি প্রতিশ্রুতির প্রথমটি যখন এলো, তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার দাসদেরকে, যারা ছিলো অতিশয় শক্তিশালী'। এখানে 'দাসদেরকে প্রেরণ করলাম' অর্থ বখতে নসরকে তার বাহিনিসহ প্রেরণ করলাম।

বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হলো নির্বিঘ্নে। একদিন বখতে নসর দেখলো এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন। কিন্তু জাগ্রত হওয়ার পর সে আর তার স্বপ্নের বিবরণ মনে রাখতে পারলো না। বন্দী বনী ইসরাইলদের মধ্যে ছিলেন দানিয়েল, হানানিয়া, আযারিয়া ও মীশাইল। তাঁরা ছিলেন নবীর বংশধর। বখতে নসর একথা জানতো। তাই তাঁদেরকে ডেকে আনলো। বললো, তোমরা আমার স্বপ্নের কথা বর্ণনা করো। নবীজাদা চতুষ্টয় বললেন, আপনি আপনার স্বপ্নের বিবরণ দিন। আমরা তার ব্যাখ্যা বলে দিবো। বখতে নসর বললো, আমার তো স্মরণ নেই। তোমরাই আমার স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও। যদি না বলো তবে আমি

তোমাদের হাত তোমাদের স্কন্ধ থেকে পৃথক করে ফেলবো। নবীজাদাগণ বললেন, ঠিক আছে। তাহলে আমাদেরকে কিছু দিন সময় দিন। এই বলে তাঁরা রাজদরবার থেকে বেরিয়ে এলেন। আল্লাহ্তায়ালার দরবারে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা জানালেন। আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে সাহায্য করলেন। তাঁদের স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত করে দিলেন পুরো বিষয়টি। তাঁরা রাজদরবারে গমন করে রাজাকে বললেন, আপনি স্বপ্নে দেখেছিলেন একটি মূর্তি। মূর্তিটির পা ছিলো মাটির। হাঁটু ও উরুদেশ ছিলো তামার। উদর ছিলো রূপার। বক্ষদেশ সোনার। আর মস্তক ও স্কন্ধদেশ লোহার। বখতে নসর বললো, তোমরা ঠিকই বলেছো। তাঁরা বললেন, আপনি আরো দেখেছিলেন, অকস্মাৎ আকাশ থেকে পতিত হলো একটি পাথর। ওই পাথরের আঘাতে মূর্তিটি টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। আপনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। বখতে নসর বললো, তোমরা ঠিকই বলেছো। এবার তবে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলো। তাঁরা বললেন, বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অবস্থা দেখানো হয়েছে আপনাকে। মূর্তিটির মৃত্তিকা নির্মিত অংশের অর্থ দুর্বল সাম্রাজ্য। তাম্র নির্মিত অংশের অর্থ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী আর একটি সাম্রাজ্য। রৌপ্য নির্মিত অংশ হচ্ছে তদপেক্ষা অধিক সুন্দর ও দৃঢ় এক সাম্রাজ্যের প্রতীক। স্বর্ণ-নির্মিত অংশ হচ্ছে আর একটি সুবিন্যস্ত ও সুন্দর সাম্রাজ্য। আর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের অংশ হচ্ছে মূর্তিটির লৌহনির্মিত অংশ। এবার আকাশ থেকে পতিত ওই পাথরটির কথা বলি, ওই পাথরটি আল্লাহ্র গায়েবী শক্তির প্রতীক। আর প্রস্তর-প্রক্ষেপণের মাধ্যমে মূর্তিটি চুরমার হয়ে যাওয়ার অর্থ অবশেষে আল্লাহ্তায়ালার অদৃশ্য শক্তির আঘাতে সকল রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। টিকে থাকবে কেবল আল্লাহ্র সাম্রাজ্য।

বাবেলবাসীরা একদিন বখতে নসরের কাছে গিয়ে বললো, মহামান্য সম্রাট! বনী ইসরাইলী গোলামদের কারণে আমাদের কিছু সমস্যা হচ্ছে। তারা আমাদের গৃহসীমানায় বসবাস করে। প্রয়োজনীয় কর্ম তাদের দ্বারা সমাধা করতে হয় বলে তারা পেয়েছে পারিবারিক মেলামেশার সুযোগ। তারা সুদর্শন। তাই আমরা লক্ষ্য করছি, আমাদের স্ত্রীরা তাদের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমাদের আবেদন, তাদেরকে হয় হত্যা করে ফেলুন। না হয় তাড়িয়ে দিন। বখতে নসর বললো, এটা তোমাদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। তোমরা নিজেরাই তাদেরকে হত্যা অথবা বিতাড়নের অধিকার সংরক্ষণ করো। কারণ তারা তোমাদের ক্রীতদাস। বন্দী বনী ইসরাইলেরা রাজার ঘোষণা শুনতে পেয়ে আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য কামনা করলেন। জানালেন প্রাণ রক্ষার আকুল আবেদন। বললেন, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা তো তোমার অবাধ্য নই। সুতরাং অন্যের পাপের কারণে আমরা শাস্তি পাবো কেনো? আমাদেরকে দান করো

তোমার বিশেষ রহমত। আল্লাহ্তায়ালা তাদের অশ্রুসিক্ত আবেদন গ্রহণ করলেন। অল্প কিছু সংখ্যক নিহত হলেও বেঁচে রইলো সংখ্যাগুরু অংশটি। ওই অংশে ছিলেন দানিয়েল, হানানিয়া, আযারিয়া ও মীশাইল।

অবশেষে বখতে নসরের ধ্বংসের সময় সমুপস্থিত হলো। দম্ভ প্রদর্শনের মাধ্যমে ধ্বংসকে ডেকে আনলো সে নিজেই। একদিন সে বন্দীদেরকে রাজ দরবারে হাজির করিয়ে বললো, বলো, যে স্থান আমি ধ্বংস করে এসেছি, সে স্থান কেমন? সে রাজ্যের অধিবাসীরাই বা কেমন? বনী ইসরাইলেরা জবাব দিলো, ওই দেশ তো সিরিয়া। নবী-রসুলগণের জন্মভূমি। সেখানকার বায়তুল মাকদিস হচ্ছে আল্লাহ্র ঘর। আর সেখানকার অধিবাসীরা নবী-রসুলগণের বংশধর। তারা বায়তুল মাকদিসের সেবকও। তারা হয়ে পড়েছিলো আল্লাহ্তায়ালার অবাধ্য। তাই আপনার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। সম্মান, প্রতিপত্তি— সব কিছুই আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বেচ্ছাচরণের কারণে আল্লাহ্ তাদের উপরে আপনাকে বিজয়ী করেন। কিন্তু বিজয়ীবাহিনী এ সম্পর্কে বেখবর। তারা মনে করে তারা বিজয় লাভ করেছে নিজেদের শক্তিবলে। একথা শুনে বখতে নসর অতুষ্ট হলো। বললো, তোমরা আমাকে এমন কৌশল শিখিয়ে দাও, যা রপ্ত করে আমি আকাশে আরোহণ করতে পারি। আমি আকাশে যারা আছে, তাদেরকে হত্যা করে সেখানেও আমার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবো। পৃথিবীর রাজত্ব আমি আর চাই না। বনী ইসরাইলেরা বললো, সম্রাট! এটা তো মানুষের ক্ষমতাবহির্ভূত। বখতে নসর বললো, আকাশে ওঠার উপায় তোমাদেরকে বলে দিতেই হবে। অন্যথায় আমি তোমাদেরকে হত্যা করবো। নিরুপায় বনী ইসরাইলেরা আল্লাহ্তায়ালার দরবারে উপস্থাপন করলো তাদের রোদনসিক্ত নিবেদন। আল্লাহ্পাক সদয় হলেন। একটি হন্তারক মশাকে প্রেরণ করলেন তিনি। মশাটি অবলীলায় বখতে নসরের নাকের মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়লো তার মস্তকে। তার উপর্যুপরি দংশনে জর্জরিত হতে হতে একসময় মৃত্যু ঘটলো তার।

মুক্ত হলো বনী ইসরাইল বন্দীরা। তারা ফিরে গেলো সিরিয়ায়। সেখানে গড়তে শুরু করলো নতুন বসতি। সংস্কার করলো বায়তুল মাকদিস। ধীরে ধীরে স্ফীত হতে লাগলো তাদের জনসংখ্যা। শ্রীবৃদ্ধি ঘটলো তাদের জনপদের। যারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিলো, তারাও জড়ো হলো এক জায়গায়।

সবকিছুই হলো। কিন্তু তওরাতের কোনো অনুলিপি কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। সাধারণ জনতার এ নিয়ে তেমন কোনো দুশ্চিন্তা না থাকলেও বিশেষ ব্যক্তিগণ এ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সবচেয়ে বেশী চিন্তাযুক্ত হলেন হজরত উযায়ের। তিনিও ছিলেন বাবেল বন্দীগণের মধ্যে। ছাড়া পেয়ে তিনিও আগমন করেছিলেন সিরিয়ায়। তওরাতের বিরহে তিনি একা একা বসে কাঁদতেন। কখনো

চলে যেতেন দূরে অরণ্যের দিকে। একদিন এক লোক তাকে বললেন, আপনি এতো কাঁদেন কেনো ? হজরত উযায়ের বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাবের জন্য। বখতে নসরের লোকেরা তওরাত পুড়িয়ে দিয়েছে। এখন তা উদ্ধার করি কী করে। তওরাত বিহনে দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো কিছুই তো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। লোকটি বললো, আপনি যদি সত্যিই তওরাত চান, তবে তা অবশ্যই পাবেন। আমার পরামর্শ শুনুন। আগামীকাল আপনি রোজা রাখুন। পবিত্র পরিচ্ছদাবৃত হয়ে কাল এখানে আসুন। আমার দেখা পাবেন। তারপর যা বলার বলবো। পরদিন হজরত উযায়ের রোজা রেখে পাক সাফ পোশাক পরে নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলেন। একটু পরেই হাজির হলো লোকটি। তার হাতে ছিলো একটি পানির পাত্র। লোকটি আসলে ছিলো এক ফেরেশতা। আল্লাহ্‌তায়ালাই তাকে পাঠিয়েছিলেন। লোকটি তার পাত্র থেকে কিছু পানি পান করালেন হজরত উযায়েরকে। সঙ্গে সঙ্গে হজরত উযায়েরের বক্ষাভ্যন্তরে মুদ্রিত হয়ে গেলো সম্পূর্ণ তওরাত। তিনি ফিরে এলেন তাঁর জনপদে। বনী ইসরাইলদেরকে তওরাত পাঠ করে শুনালেন। মুগ্ধ হয়ে গেলো তারা। হজরত উযায়ের হলেন তাদের একান্ত প্রিয়ভাজন। পারস্পরিক প্রীতি ও ভালোবাসার এরকম প্রকাশ ইতোপূর্বে আর কখনো ঘটেনি। এভাবে অতিবাহিত হলো বেশ কিছুদিন। শেষ হয়ে এলো হজরত উযায়েরের পৃথিবীর আয়ু। নির্ধারিত ক্ষণে তিনি চলে গেলেন তাঁর প্রভুপালনকর্তার একান্ত সন্নিধানে।

আবারো বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো বনী ইসরাইল জনতা। ক্রমে ক্রমে বিচ্যুত হয়ে পড়তে লাগলো আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত ধর্মাদর্শ থেকে। নতুন নতুন নবী প্রেরণ করতে লাগলেন আল্লাহ্‌পাক। কিন্তু তারা নবীগণের সদুপদেশের প্রতি কর্ণপাত করলো না। উপরন্তু তাদেরকে বলতে লাগলো মিথ্যাবাদী, ভণ্ড ইত্যাদি। কোনো কোনো নবীকে আবার হত্যাও করে ফেললো তারা। শেষে এলেন হজরত জাকারিয়া, হজরত ইয়াহ্‌ইয়া ও হজরত ঈসা। কিন্তু তারা শত্রুতা শুরু করলো ওই ত্রয়ী নবীর সঙ্গেও। হজরত জাকারিয়া পৃথিবীর আয়ু শেষে প্রত্যাবর্তন করলেন তাঁর পরম প্রেমময় প্রভুপালকের সন্নিধানে। কেউ কেউ বলেছেন, বনী ইসরাইলেরা তাঁকেও শহীদ করে দিয়েছিলো।

হজরত ইয়াহ্‌ইয়াকেও শহীদ করে ফেললো দুর্বৃত্তরা। এরপর শূলে চড়াবার চেষ্টা করলো হজরত ঈসাকে। আল্লাহ্‌পাক তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিলেন। তারপর তাদের উপরে আপতিত করলেন আযাব। বাবেলের নতুন রাজা খারদুশকে প্রবল করে দিলেন তাদের উপর। সে তার সেনাবাহিনী নিয়ে চড়াও হলো বনী ইসরাইলদের উপরে। বায়তুল মাকদিসের সন্নিকটে উপস্থিত হলো তারা। ইয়াবুরজাযান নামক এক সেনাপতি তার অধীনস্থ সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে

বললো, শোনো হে যোদ্ধবৃন্দ! আমি আমার প্রভুর নামে এই মর্মে শপথ করেছি যে, বায়তুল মাকদিস অধিকার করতে পারলে আমি সেখানকার সকল অধিবাসীকে হত্যা করবো। প্রবাহিত করবো রক্তের নদী। ক্ষান্ত হবো তখন, যখন হত্যা করার মতো আর কাউকে পাবো না। একথা বলে সে তার সেনাদলকে নিয়ে এগিয়ে গেলো বায়তুল মাকদিসের কোরবানী খানার দিকে। সবিস্ময়ে দেখলো, সেখান থেকে অনর্গল ধারায় নির্গত হচ্ছে রক্ত। সে জিজ্ঞেস করলো, এ রক্ত কার? এ রক্ত বন্ধ হয় না কেনো? বনী ইসরাইলেরা বললো আটশত বছর ধরে এখানে কোরবানী হয়ে আসছে। সকল কোরবানীই কবুল হয়েছে। কিন্তু কেনো যে এ কোরবানী আর কবুল হলো না। ইয়াবুরজাযান বললো, সত্যি করে বলো, আসল ঘটনা কী? বনী ইসরাইলদের সমাজপতিরা বললো, এখন আমরা রাজ্যহারা, প্রত্যাদেশ ও নবুয়তের ধারাও এখন রুদ্ধ। তাই মনে হয় আমাদের কোরবানী আর গৃহীত হচ্ছে না। সেনাপতি তাদের কথা বিশ্বাস করলো না। তাদের সাত শত সত্তর জন সমাজপতির প্রতি জারী করলো হত্যার নির্দেশ। সে নির্দেশ প্রতিপালিত হলো অল্পক্ষণের মধ্যে। তবুও কোরবানীগাহের রক্ত বন্ধ হচ্ছে না দেখতে পেয়ে পুনরায় হত্যার নির্দেশ দিলো তাদের সাতশত বালককে। সে নির্দেশও কার্যকর হলো। কিন্তু তবুও কোরবানীগাহের রক্তপ্রবাহ রইলো আগের মতো। সেনাপতি বললো, হে দুর্ভাগার দল! এখনো তোমাদের চৈতন্যোদয় ঘটছে না কেনো? কী ভেবেছো তোমরা? সত্য কথা না বলা পর্যন্ত আমি কি তোমাদেরকে ছেড়ে দিবো? সত্য উদঘাটন না হওয়া পর্যন্ত আমার এ নিধনপর্ব কখনো বন্ধ হবে না। তোমাদের শেষতম ব্যক্তিকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হবো না। সুতরাং এখনো সময় আছে। বাঁচতে যদি চাও, তবে এক্ষুণি সত্য ঘটনা জানাও। বনী ইসরাইলেরা আর সত্যকে গোপন রাখতে পারলো না। বললো, এই রক্ত এক নবীর। তিনি আমাদের ন্যায়ানুগ হতে বলতেন। মন্দ কর্ম করতে নিষেধ করতেন। বলতেন পুণ্যের প্রতিফল শান্তি। আর পাপের প্রতিফল শাস্তি। আমরা তাকে বিশ্বাস করিনি। মিথ্যাবাদী বলে গালমন্দ করেছি। প্রত্যাখ্যান করেছি তাঁর সরল পথের আহ্বানকে। শেষে তাকে হত্যাও করেছি আমরা। এই কোরবানীগাহেই আমরা ঘটিয়েছি এ হত্যাকাণ্ড। সেনাপতি ইয়াবুরজাযান বললো, কী নাম ছিলো তাঁর? তারা বললো, ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাকারিয়া। সেনাপতি বললো, এতক্ষণে তোমরা সত্য কথা বললে। এ কথা বলেই সে সেজদায় পতিত হলো। সেজদা থেকে মস্তক উত্তোলন করে বললো, হে সৈন্যদল! শহরের বাইরে চলে যাও। বন্ধ করে দাও শহরের সকল প্রবেশ পথ।

সৈন্যরা চলে গেলো। কোরবানীগাহের প্রবহমান রক্তের দিকে লক্ষ্য করে ইয়াবুরজাযান বললো, হে ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাকারিয়া! আপনাকে হত্যা করার জন্য

যে বিপদ বনী ইসরাইলদের প্রতি আপতিত হয়েছে এবং যে পরিমাণে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে— তার সকল কিছুই আমাদের স্রষ্টা জানেন। এখন আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তার হুকুমে গাত্রোত্থান করুন। নতুবা আপনার সম্প্রদায়ের কাউকে আমি জীবিত রাখবো না। একথা বলার পর সেনাপতি দেখলো, রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলো। বিস্ময়কর এই দৃশ্যটি দেখে সে হত্যা-পরিকল্পনা স্থগিত করতে মনস্থ করলো। বললো, বনী ইসরাইলেরা যে আল্লাহ্‌র উপরে ইমান এনেছে, আমিও তাঁর প্রতি ইমান আনলাম। আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে যে, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। এরপর সে বনী ইসরাইলদের উদ্দেশ্যে বললো, সম্রাট খারদুশ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাদের এ মতো পরিমাণ হত্যা করতে, যাতে করে তোমাদের রক্তপ্রবাহ গিয়ে পৌঁছে শহরের উপকণ্ঠে অবস্থানরত সেনাছাউনির মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত। তাঁর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা আমার নেই। তাই আমি বলি, তোমরা একটি বৃহৎ গর্ত খনন করো। তারপর তোমাদের সকল গৃহপালিত পশুকে জবাই করে ফেলে দাও গর্তটির মধ্যে। বনী ইসরাইলেরা তাই করলো। প্রবাহিত হলো রক্তের স্রোত। সে স্রোত গিয়ে পৌঁছলো সেনাশিবিরের মধ্যবর্তী স্থানে। এরপর নিহত লোকদের লাশ দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো গর্তটি, যাতে মনে হয় গর্তটি পূর্ণ করা হয়েছে কেবল মানুষের লাশে। সম্রাট খারদুশ তার বিশেষ সংবাদবাহককে পাঠিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করলো। সংবাদবাহক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গিয়ে তাকে জানালো, হ্যাঁ ! মানুষের লাশ দ্বারা পরিপূর্ণ একটি বিশাল গর্ত থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে সেনাশিবিরের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত। সম্রাট খারদুশ তার সৈন্যদেরকে নিয়ে হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন করলো বাবেলে।

এটাই সে ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি যার দিকে ইঙ্গিত করে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'লাতুফসিদুন্না ফীল আরদ্বি মাররাতাইনি' (অবশ্যই তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এ ধরাধামে দু'বার) এভাবে বনী ইসরাইলদের প্রতি আপতিত বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিলো বখতে নসরের মাধ্যমে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি কার্যকর হয়েছিলো খারদুশের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, প্রথম বিপর্যয় অপেক্ষা দ্বিতীয় বিপর্যয়টি ছিলো অধিকতর মর্মন্তুদ। আরো উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিপর্যয়ের পর বনী ইসরাইলেরা আর মাথা তুলতে পারেনি কোনদিন। তাই সহজে সিরিয়া ও বায়তুল মাকদিস অধিকার করে নিয়েছিলো রোমান ও গ্রীকরা।

সময় গড়িয়ে চললো। মানবেতর জীবন যাপন সত্ত্বেও বংশবিস্তার ঘটে চললো বনী ইসরাইলদের। ব্যাপক বংশবৃদ্ধির ফলে অবশ্য তারা সামাজিক প্রতিপত্তি ফিরে পেলো কিছুটা। কিন্তু হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার আর সম্ভব হলো না। আল্লাহ্‌তায়ালা পুনরায় নানারকম নেয়ামত প্রদান করতে লাগলেন তাদেরকে। কিন্তু তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে হয়ে উঠলো উন্নাসিক, উচ্ছৃঙ্খল ও

স্বেচ্ছাচারী। এভাবে একসময় চলে গেলো আল্লাহ্‌তায়ালার বিধানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তখন আল্লাহ্‌পাক তাদের উপরে বিজয়ী করে দিলেন টিটাস ইবনে আস্‌ইয়ানাশ রুমীকে। রাজা টিটাস ধ্বংস করে দিলো তাদের জনপদ। বায়তুল মাকদিসের পবিত্র শহর থেকে বিতাড়িত করে দিলো দুর্বিনীত বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে। যারা থাকতে চাইলো, তাদের উপরে ধার্য করলো অপমানজনক কর। এভাবে নিজ ভূমিতে পরবাসী হয়ে গেলো তারা। তাদের এরকম অবমাননাকর অবস্থা বহাল রইলো ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের শাসনকাল পর্যন্ত। তিনিই বহুকাল পর বায়তুল মাকদিসের অবরুদ্ধ মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

কাতাদা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা প্রথমে রাজা জালুতকে বনী ইসরাইলদের উপরে বিজয়ী করে দিয়েছিলেন। সে বহুসংখ্যক বনী ইসরাইলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো এবং প্রায় বিরান করে দিয়েছিলো তাদের জনপদ। হজরত দাউদ নবীর যুগে আবার তাদের ছন্নছাড়া জীবনে এসেছিলো স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য। হৃত রাজ্যের অধিকার পুনরায় ফিরে পেয়েছিলো তারা। কিন্তু ধীরে ধীরে আবারো তারা হয়ে উঠলো উন্নাসিক ও অবাধ্য। ফলে দ্বিতীয় বার আল্লাহ্‌ তাদের উপরে প্রবল করে দিলেন বখতে নসরকে। বখতে নসর তাদেরকে ঘিরে ফেললো। চালালো ব্যাপক গণহত্যা। বন্দীও করলো অনেককে। বনী ইসরাইলদের জনজীবনে পুনরায় নেমে এলো লাঞ্ছনা ও অপমান। শেষে এক সময় আল্লাহ্‌তায়ালা রক্ষা করলেন। দীর্ঘকাল লাঞ্ছিত ও অনিকেত জীবন যাপনের পর আবারো তারা লাভ করলো মুক্তির আস্বাদ। সম্মান, কর্তৃত্ব— সব কিছুই লাভ করলো তারা। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে আবারো তারা হয়ে উঠলো দুর্বিনীত, দুঃশীল। অবশেষে আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে শায়েস্তা করলেন আরবী নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর মাধ্যমে। তাদের উপরে অবমাননার এই ধারাক্রম কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'এবং যখন আপনার প্রভুপালক সংবাদ দিলেন যে, তাদের উপর সব সময় নেতৃত্ব করতে থাকবে কেউ না কেউ এবং তাদের এই শাস্তি ক্রমাগত চলতেই থাকবে।'

সুদ্দী লিখেছেন, একবার বনী ইসরাইলের এক লোক স্বপ্নে দেখলো, মরুবাসী এক এতিম বালক বায়তুল মাকদিস অধিকার করেছে। সে বাবেল শহরের এক বিধবার পুত্র। নাম বখতে নসর। উল্লেখ্য যে, ওই সময় বনী ইসরাইলদের মধ্যে অনেকে ছিলো সত্যবাদী। তাই তাদের স্বপ্ন সত্য হতো। স্বপ্ন দর্শনকারীও বুঝলো তার স্বপ্ন একদিন ফলবতী হবেই। তাই সে তার সঙ্গী সাথীদেরকে সঙ্গে নিয়ে চললো বাবেল শহরে। খুঁজতে খুঁজতে তারা উপস্থিত হলো বখতে নসরের বিধবা

মায়ের কাছে। একটু পরেই দেখলো, কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে এগিয়ে আসছে বালক বখতে নসর। সে ছিলো তখন কাঠুরিয়া। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রয় করে অত্যন্ত কষ্টে সৃষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতো নিজের ও বিধবা মায়ের। বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়েই বাজারের দিকে যাচ্ছিলো সে। বনী ইসরাইল পথিকেরা তাকিয়ে ছিলো তার গমন পথের দিকে। পরিশ্রান্ত বখতে নসর একটু জিরিয়ে নেয়ার জন্য থামলো। কাঠের বোঝাটি মাটিতে রেখে বসে পড়লো তার উপর। পথিকেরা এগিয়ে গেলো তার দিকে। কুশল বিনিময় করলো তার সঙ্গে। তারপর তাকে তিনটি দিরহাম দিয়ে বললো, যাও, এগুলো দিয়ে কিছু খাবার কিনে নিয়ে এসো। সবাই এক সঙ্গে বসে খাবো। বখতে নসর বাজার থেকে কিনে আনলো এক দিরহামের রুটি, এক দিরহামের গোশত এবং এক দিরহামের মদ। এরপর সকলে মিলে রুটি গোশত ভক্ষণের পর পান করলো মদ্য। পরপর তাদের এরকম পানাহার চললো তিন দিন। তারপর বনী ইসরাইল আগন্তুকেরা বললো, শোনো বখতে নসর! আমরা চাই তুমি আমাদেরকে নিরাপত্তা পত্র লিখে দাও। তুমি যদি কোনো দিন রাজা হও, তবে নিরাপত্তাপত্রটি আমাদের কাজে লাগবে। বখতে নসর বললো, তোমরা কি আমার সঙ্গে উপহাস করছো? তারা বললো, না, উপহাস নয়। এক সময় তুমি যদি রাজা হও, তবে অসুবিধা কোথায়? আর আমাদেরকে নিরাপত্তানামা দিতেই বা তুমি আপত্তি করছো কেনো? বখতে নসর আর কথা বাড়ালো না। তাদের চাহিদা মতো নিরাপত্তাপত্র লিখে দিলো সে। তারা বললো, তুমি রাজা হলে তোমার চারপাশে থাকবে অনেক গণ্যমান্য মানুষের ভিড়। তখন আমরা তোমার কাছে পৌঁছবো কেমন করে ? বখতে নসর বললো, তোমরা তখন একটি লম্বা লাঠির মাথায় নিরাপত্তাপত্রটি বেঁধে লাঠিটি উঁচু করে ধোরো। ওই উঁচু লাঠি আমার চোখে পড়লেই আমি চিনতে পারবো।

কাতাদা বর্ণনা করেছেন, বনী ইসরাইলদের তৎকালীন বাদশাহ সাহাবাইন হজরত ইয়াহ্ইয়া নবীকে খুবই শ্রদ্ধা করতো। একান্ত আপন মনে করতো তাঁকে। কিন্তু ঘটনাক্রমে বাদশাহ পড়ে গেলো এক মহাবিপাকে। তার এক স্ত্রীর আগের স্বামীর কন্যা অথবা তার এক ভগ্নিপুত্রীর প্রেমে পড়ে গেলো সে। হজরত ইবনে আব্বাস নির্দিষ্ট করে বলেছেন ভগ্নিপুত্রীর কথা। বাদশাহ কিছুতেই তার দিক থেকে মন ফিরাতে পারলো না। হজরত ইয়াহ্ইয়াকে ডেকে এ ব্যাপারে শরিয়তের বিধান কী, তা জানতে চাইলো। হজরত ইয়াহ্ইয়া স্পষ্ট জানালেন, এরকম বিবাহ আমাদের শরিয়তে হারাম। তাঁর এই অভিমতের কথা পৌঁছে গেলো মেয়েটির মায়ের কাছে। সে তখন উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কন্যাকে বাদশাহর হাতে তুলে দিয়ে বাদশাহর উপরে প্রভাব বিস্তার করাই ছিলো তার ইচ্ছা।

কিছুদিন পরের ঘটনা। বাদশাহ তার ওই ভগ্নিপুত্রীকে এক মদ্যপানের আসরে নিমন্ত্রণ জানালো। মেয়েটির মা তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে সুবাসিতা ও আভরণ শোভিতা করে বাদশাহর দরবারে প্রেরণ করলো। বার বার বলে দিলো, খবরদার! সহজে ধরা দিয়ো না। বাদশাহকে নিজ হাতে মদ্য পরিবেশন কোরো। তিনি যখন তোমাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হবেন, তখন বোলো, আমার একটি দাবি আপনাকে পূরণ করতেই হবে। অন্যথায় আপনার আহ্বানে আমি মন থেকে সাড়া দিতে পারবো না। বাদশাহ যখন তোমার দাবির কথা জানতে চাইবেন, তখন বোলো, ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাকারিয়ার ছিন্ন মস্তক চাই। যতক্ষণ আপনি তা বাসনে করে আমার সামনে উপস্থিত না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার অঙ্কশায়িনী হতে পারবো না। রাজ দরবারে মেয়েটি তার মায়ের নির্দেশ মতো সব কিছুই করলো। তার দাবির কথা শুনে চমকে উঠলো বাদশাহ। বললো, হতভাগী নারী! অন্য কিছু চাও। মেয়েটি বললো, অন্য কিছুই আমি চাই না। চাই ইয়াহ্ইয়ার কর্তিত মস্তক। বাদশাহ তখন তার ভগ্নিপুত্রীর প্রেমে আত্মহারা। তাই তার মনস্তুষ্টির জন্য হুকুম জারী করলো, এই মুহূর্তে ইয়াহ্ইয়ার মাথা কেটে এনে একটি পাত্রে করে আমার প্রিয়তমার সম্মুখে উপস্থাপন করা হোক। রাজ-নির্দেশ পালিত হলো। হজরত ইয়াহ্ইয়ার কর্তিত মস্তক একটি খোলা বাসনে করে আনা হলো বাদশাহ ও তার প্রিয়তমার সামনে। কর্তিত মস্তক থেকে তখনও ফিনকি দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিলো রক্ত। আর বার বার উচ্চারিত হচ্ছিলো, বাদশাহ! তোমার জন্য এ বিবাহ বৈধ নয়। দিন গেলো। রাত গেলো। পরদিন প্রত্যুষে বাদশাহ হুকুম দিলো, বন্ধ করো এর রক্ত ও আওয়াজ। মাটি নিক্ষেপ করো ছিন্ন মস্তকের উপর। সম্পূর্ণ প্রোথিত করে দাও মাটির নিচে। রাজ প্রাসাদ থেকে এবার ছিন্ন ও রক্তাক্ত পবিত্র মস্তকটি নিয়ে যাওয়া হলো দূরে বধ্যভূমিতে। কিন্তু তখনও নির্গত হতে লাগলো অবিরল রক্তস্রোত।

বখতে নসর তখন বাবেলরাজের প্রধান সেনাপতিরূপে শহরের উপকণ্ঠে তার সেনাবাহিনী নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। সন্ত্রস্ত শহরবাসীরা বন্ধ করে দিলো প্রবেশপথগুলো। দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলো সকলে। বখতে নসর ও তার সেনাবাহিনী নিরুপায় হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করাও অসম্ভব হয়ে পড়লো তাদের জন্য। খাদ্য সংকট দেখা দিলো। দেখা দিলো আরো অনেক আনুসঙ্গিক অসুবিধা। বখতে নসর অগত্যা ফিরে যেতে মনস্থ করলো। সেনাবাহিনীকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দান করতে যাবে, এমন সময় তার সঙ্গে দেখা করতে এলো এক বনী ইসরাইলী বৃদ্ধ। বললো, সেনাপতি! তুমি কি বিজয়ী না হয়েই ফিরে যেতে চাও? বখতে নসর বললো, হ্যাঁ। বৃদ্ধ বললো, আমি একটি উপায় বলে দিতে চাই। যদি আমার কথা মানো, তবে তোমার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু আমার একটি কথা তোমাকে শুনতে হবে। যখন হত্যাকাণ্ড চালাতে বলবো তখন চালাবে। আর বন্ধ করতে বললে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করবে। বখতে নসর বললো, ঠিক আছে, তাই করবো। বৃদ্ধ বললো, তোমার সৈন্যদেরকে চারটি সমান অংশে ভাগ করে শহরের চারদিকে অবস্থান গ্রহণ করতে বলো এবং তাদেরকে নির্দেশ দাও, তারা যেনো সকলে একযোগে উপরের দিকে হাত উঠিয়ে বলে, আমরা ইয়াহ্ইয়া বিন জাকারিয়ার রক্তের বিনিময়ে তোমার কাছে বিজয় চাই। আশা করা যায়, তোমরা এরকম দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়বে সকল প্রাকার। বখতে নসর বৃদ্ধের পরামর্শ বাস্তবায়ন করলো। সৈন্যদের দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়লো প্রাকার। বৃদ্ধ বললো, সেনাপতি! সেনাদলকে সংযত হতে বলো। আর তুমি এসো আমার সঙ্গে। এই বলে বৃদ্ধ বখতে নসরকে নিয়ে গেলো বধ্যভূমিতে। সেখানে তখনো ফিনকি দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিলো হজরত ইয়াহ্ইয়ার শহীদি খুন। বৃদ্ধ বললো, তুমি গণহত্যা শুরুর নির্দেশ দানের পর লক্ষ্য রেখো এই রক্ত প্রবাহের দিকে। দেখবে গণহত্যার সময় এই রক্ত টগবগ করে ফুটছে। একসময় আবার বন্ধ হয়ে যাবে এই রক্তপ্রবাহ। তখন তুমি গণহত্যা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ো।

বখতে নসর গণহত্যার নির্দেশ দিলো। তার সৈন্যরা বনী ইসরাইলদের যাকে সামনে পেলো, তাকেই হত্যা করতে লাগলো। এ ভাবে সত্তর হাজার লোককে হত্যা করার পর বন্ধ হয়ে গেলো হজরত ইয়াহ্ইয়ার রক্তপ্রবাহ। বৃদ্ধ বললেন, সেনাধিনায়ক! এবার সকলকে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে বলো। কোনো নবীকে হত্যা করলে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হন্তারক ও হন্তারকের প্রতি যারা সন্তুষ্ট, তাদেরকে হত্যা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হন না। বখতে নসর হত্যাকাণ্ড বন্ধের নির্দেশ দিলো। সৈন্যরা তাদের তরবারী কোষাবদ্ধ করলো। ওই সময় বখতে নসরের সঙ্গে সাক্ষাত করলো ওই তিন ব্যক্তি যারা এক সময় তার নিকট থেকে নিরাপত্তাপত্র লিখে নিয়েছিলো। বখতে নসর তাদেরকে চিনতে পারলো এবং নিরাপত্তাপত্রের শর্ত অনুসারে তাদের ও তাদের পরিবার পরিজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলো। অবশেষে বখতে নসর বায়তুল মাকদিস মসজিদকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করলো। মৃত জীব-জন্তু ও আবর্জনা দিয়ে ভরে ফেললো বায়তুল মাকদিসের প্রাঙ্গণ। তারপর প্রত্যাবর্তন করলো বাবেলের দিকে। উল্লেখ্য যে, বায়তুল মাকদিসের শহর ধ্বংস করার ক্ষেত্রে রোমানরাও বখতে নসরকে প্রভূত সাহায্য করেছিলো। বখতে নসর বাবেলে প্রত্যাবর্তনের সময় বনী ইসরাইলদের কতিপয় সমাজপতিকে সঙ্গে নিয়ে গেলো। তাদের সঙ্গে আরো ছিলেন পরবর্তী সময়ের নবী হজরত দানিয়েল ও অন্য কয়েকজন নবী। তাঁরা তখন বালক। জালুতের মাথাও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো বখতে নসর।

বাবেল পৌঁছে সকলে দেখতে পেলো রাজা সাহাবাইন আর নেই। জনতা তখন বখতে নসরকেই নির্বাচিত করলো তাদের রাজারূপে। বাবেলবাসীরা ছিলো অগ্নি উপাসক। বখতে নসরও ছিলো তাদের সম্প্রদায়ভূত। তৎসত্ত্বেও সে হজরত দানিয়েল ও তাঁর সঙ্গীদেরকে খুবই সম্মান করতো। বিষয়টিকে কেউ কেউ মেনে নিতে পারলো না। তারা একবার রাজাকে একান্তে পেয়ে বললো, মহামান্য রাজন! দানিয়েল ও তার সঙ্গীরা আপনার ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। তারা আমাদের জবাই করা পশুর গোশত ভক্ষণ করাকে বৈধ মনে করে না। রাজা তৎক্ষণাৎ হজরত দানিয়েল ও তাঁর সঙ্গীদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, এরা যা বললো, তা কি ঠিক ? হজরত দানিয়েল জবাব দিলেন, আমরা এক আল্লাহ্য় বিশ্বাসী। তাই যারা অংশীবাদী, তাদের জবাইকৃত পশুর গোশত আমাদের জন্য হারাম। বখতে নসর একথায় অপমানিত বোধ করলো খুব। নির্দেশ দিলো, এই মুহূর্তে একটি গর্ত খনন করে দানিয়েল ও তাঁর সতীর্থদেরকে ওই গর্তে ফেলে দাও। তারপর সেখানে ফেলে দাও একটি হিংস্র বাঘকে। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। গভীর গর্তে হজরত দানিয়েলের দল ও হিংস্র বাঘটিকে রেখে ফিরে এলো সকলে। হজরত দানিয়েলের সতীর্থদের সংখ্যা ছিলো ছয়জন।

কয়েকদিন পর কৌতূহলী লোকেরা গর্তটির কাছে গেলো। তারা ভেবেছিলো এ কয়দিনে নিশ্চয় বাঘটি হজরত দানিয়েল ও তাঁর দলের লোকদেরকে খেয়ে সাবাড় করেছে। কিন্তু গর্তের পাড়ে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো তারা। দেখলো হজরত দানিয়েল ও তাঁর সঙ্গীরা বহাল তবিয়তে উপবিষ্ট। আর তাঁদের সামনে বিশাল বাঘটি সামনের পা দু'টো মেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। তাদের সঙ্গে সপ্তম এক ব্যক্তিও উপস্থিত। সে আর কেউ নয়, বখতে নসর স্বয়ং।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্পাক বখতে নসরের চেহারা প্রতি বছর পরিবর্তন করে দিতেন। ওহাব বলেছেন, আল্লাহ্পাক বখতে নসরকে কোনো বছর শকুন আকারে, কোনো বছর ষাঁড় আকারে আবার কোনো বছর বাঘের আকারে রাখতেন। এভাবে তার আকৃতি পরিবর্তন করা হয়েছিলো সাত বছর ধরে। এই পরিবর্তন অবশ্য ছিলো তার শারীরিকভাবে। অন্তর কিন্তু বরাবরই ছিলো তার মানুষের মতো। শেষে আল্লাহ্পাক তাকে সাম্রাজ্যাধিকারী করেছিলো এবং শোনা যায় সে শেষ কালে আল্লাহ্র প্রতি ইমানও এনেছিলো। এ প্রসঙ্গে একবার ওহাবকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি বখতে নসর সম্পর্কে আহলে কিতাবদেরকে বিভিন্ন মন্তব্য করতে শুনেছি। তাদের কেউ কেউ বলেছে, বখতে নসর ইমানসহ মৃত্যুবরণ করেছিলো। আবার কেউ কেউ বলেছে, সে তো আল্লাহ্র দুশমন। সে বায়তুল মাকদিস ধ্বংস করেছে। পুড়িয়ে দিয়েছে তওরাত। নবীদেরকে হত্যা করতেও সে কুণ্ঠিত হয়নি। সে ছিলো অভিশপ্ত। তাই তার তওবা কবুল করা হয়নি।

সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যখন আকৃতি বিকৃত করার পর পুনরায় বখতে নসরকে আগের মতো চেহারা দিলেন, তখন তার স্বভাবে আচরণে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। সে হজরত দানিয়েল ও তার সাথীদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলো বিশেষভাবে। এরকম করতে দেখে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা হিংসা করতে লাগলো খুব। তারা ছিলো অগ্নি উপাসক। হিংসাবশতঃ তারা বখতে নসরকে বললো, দানিয়েল মদ্যপান করে। সুতরাং সে অতিমাত্রায় প্রস্রাব নিশ্চয়ই করে। উল্লেখ্য যে, অতি মাত্রায় প্রস্রাব করাকে তাদের সমাজে ঘৃণার চোখে দেখা হতো। বখতে নসর তাদের কথায় প্ররোচিত হলো। একদিন সে হজরত দানিয়েল আর তার সঙ্গীদের জন্য পাঠালো কিছু উত্তম আহার্য ও মদ। তাঁর বাড়ীর সামনে বসালো প্রহরী। তাকে বললো, খেয়াল রেখো, সর্ব প্রথম যে প্রস্রাব করতে বাইরে বেরোবে, তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। সে যদি বলে আমি বখতে নসর তবু তার কথা বিশ্বাস করবে না। বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী। যে প্রথমে বাইরে বের হবে, তাকেই তীর বিদ্ধ করার জন্য আমি নির্দেশপ্রাপ্ত। এই বলে সঙ্গে সঙ্গে তীর বিদ্ধ করবে তাকে। একথা বলেই বখতে নসর হজরত দানিয়েলের বাসভবনে হাজির হলো মেহমানরূপে। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থানের পর বখতে নসরই বের হলো প্রথমে। প্রহরীকে বললো, আমি কিন্তু বখতে নসর। প্রহরী তার কথা বিশ্বাস করলো না। বললো, তুমি মিথ্যাবাদী। এই বলেই তীর নিক্ষেপ করলো সে। তীরবিদ্ধ বখতে নসরের মৃত্যু ঘটলো কিছুক্ষণের মধ্যেই।

বাগবী লিখেছেন, ঐতিহাসিকগণ হজরত ইয়াহ্‌ইয়ার শহীদ হওয়ার পর বখতে নসরের বায়তুল মাকদিস অভিযানের কথা লিখেননি। তাঁরা লিখেছেন বখতে নসর বায়তুল মাকদিস অভিযানে বের হয়েছিলো হজরত শা'ইয়াকে শহীদ করার পর। তখন বনী ইসরাইলদের নবী ছিলেন হজরত আরমিয়া। হজরত আরমিয়া ও হজরত ইয়াহ্‌ইয়ার আবির্ভাবকালের ব্যবধান ছিলো চারশ' একষট্টি বছর। আর তখন পারস্যরাজ বাহমানের পক্ষ থেকে বাবেল শাসন করতো কীরাশ। ওই সময় দ্বিতীয় বারের মতো বায়তুল মাকদিস পুনঃনির্মিত হয়। ওই পুনঃনির্মাণ সংঘটিত হয়েছিলো বখতে নসর কর্তৃক বায়তুল মাকদিস ধ্বংস হওয়ার সত্তর বছর পর। পুনঃনির্মাণের অষ্টাশি বছর পরে বায়তুল মাকদিসের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে শাহ্ সেকেন্দার। এরপর আনুমানিক তিনশত তেষট্টি বছর বিগত হলে জন্ম গ্রহণ করেন হজরত ইয়াহ্‌ইয়া। বাগবী আরো লিখেছেন, এ সম্পর্কে ইবনে ইসহাকের বর্ণনাটিই সমধিক শুদ্ধ।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি করো তবে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন।' এ কথার অর্থ— হে কিতাবধারীগণ! হে ইহুদী, হে খৃষ্টান! তোমরা যদি শেষ রসুলের প্রতি ইমান আনো এবং কোরআনের বিধানানুসারে নিজেদেরকে সংশোধিত করো, তবে

এমতো আশা করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন। আর যদি আখেরী রসুল ও কোরআনের বিরোধী হও, তবে তিনিও তোমাদের সঙ্গে পূর্ববৎ আচরণ করবেন। অর্থাৎ আগের মতো আবার তোমাদের উপরে নেমে আসবে আল্লাহ্র আযাব।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্তায়ালার এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন ইহুদী সম্প্রদায়ভূত হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, হজরত কাব আহবার ও তাঁর সঙ্গীসাথীগণ। ওদিকে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সাড়া দিলেন বাদশাহ নাজ্জাসী ও আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় আগত প্রতিনিধি দল। আর অঙ্গীকারা-নুসারে আল্লাহ্তায়ালা তাদের উপর বর্ষণ করলেন তাঁর বিশেষ রহমত। তাঁদের সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত একটি দল আছে, তারা রাত্রিকালে আল্লাহ্র আয়াত আবৃত্তি করে এবং সেজদা করে।' অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'রসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শ্রবণ করে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু বিগলিত দেখবে।' অপর পক্ষে যারা আল্লাহ্তায়ালার এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি তাদের উপর নেমে এসেছিলো আল্লাহ্র শাস্তি। বিদ্বেষপ্রবণ ইহুদীরা রসুল স.কে শহীদ করে দেয়ার জন্য গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিলো। যাদু করেছিলো তাঁকে। আর একবার খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলো এ পৃথিবী থেকে। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে প্রতিশোধ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। রসুল স.ও যথারীতি এ নির্দেশ পালন করলেন। বনী কুরায়জার সকল পুরুষকে প্রদান করলেন মৃত্যুদণ্ড। আর বনী নাজীরকে করলেন দেশান্তর। তদুপরি তাদের উপর ধার্য করলেন অবমাননাকর জিযিয়া কর।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়াজাআ'ল্না জাহান্নামা লিল্ কাফিরীনা হাসীরা' অর্থাৎ জাহান্নামকে আমি করেছি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কারাগার। ওই কারাগারে আমি তাদেরকে অনন্তকালের জন্য আবদ্ধ করে রাখবো। কস্মিনকালেও তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'হাসীরা' শব্দটির অর্থ বাসাত্ব (শয্যা বা বিছানা)। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— জাহান্নামকে আমি করেছি সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের শয্যা।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে — 'এই কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ-নির্দেশ করে।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনুন এবং প্রচার করুন যে, নিঃসন্দেহে আপনার উপরে অবতীর্ণ এই কোরআন সত্যান্বেষীদেরকে প্রদান করে নির্ভুল পথের দিশা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।' এ কথার অর্থ— যারা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ, তাদের জন্য এই কোরআন প্রদান করে জান্নাতের সুসংবাদ। ওই জান্নাতই হচ্ছে 'আজ্‌রান্ কাবীরা' বা মহা পুরস্কার।

এর পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'এবং যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি মর্মন্তুদ শাস্তি।' একথার অর্থ— যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য আমি পরকালে প্রস্তুত করে রেখেছি মহাযন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১১, ১২

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝

❒ মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে; মানুষ তো তাহার মনে যাহা আসে চিন্তা না করিয়া তাহার আশু রূপায়ণ কামনা করে।

❒ আমি রাত্রি ও দিবসকে করিয়াছি দুইটি নিদর্শন; রাত্রিকে করিয়াছি নিরালোক এবং দিবসকে করিয়াছি আলোকময়, যাহাতে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব স্থির করিতে পার; এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মানুষ ত্বরাপ্রবণ। তাই সে তার শুভ ও অশুভ সকল প্রকার অভিপ্রায়, চিন্তা ও প্রার্থনার অতিদ্রুত বাস্তবায়ন কামনা করে। এমতো চঞ্চলমতিত্বের কারণে স্বাভাবিকভাবেই তার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে। সে হয়ে পড়ে অদূরদর্শিতাচ্ছাদিত। কিন্তু আল্লাহ্ পরম ক্ষমাপরবশ ও মহাদয়ার্দ্র। সে কারণেই তাদের ত্বরাপ্রবণতাকে তিনি প্রশ্রয় দেন না। শুভ-পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের প্রার্থনাকে কখনো করেন বিলম্বিত। আবার কখনো করেন অগ্রাহ্য।

মানুষের অকল্যাণ কামনা আসে দু'টি পথে। কখনো সে ক্রোধবশতঃ অকল্যাণ কামনা করে নিজের পরিবারের ও সম্পদের। আবার কখনো সে প্রার্থনা করে এমন বস্তুর, যা তার জন্য চিত্তহারী কিন্তু প্রকৃতই সেটা তার জন্য অকল্যাণকর।

এরূপ কামনাকেই আয়াতে বলা হয়েছে অপপ্রার্থনা। কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে— সে কামনা করে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ। পরিত্রাণ কামনা করে পারলৌকিক শাস্তি থেকে। এরূপেই সে কামনা করে অকল্যাণও। তবে আল্লাহ্ মেহেরবান। তাই তাৎক্ষণিক সে সব প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করেন না। করলে দুর্দশাগ্রস্ত হতো তারা।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, স্বভাবতই মানুষ অসহিষ্ণু, অস্থির। তাই তারা দুঃখে ধৈর্যহারা হয় এবং সুখে হয় কৃতজ্ঞতা বিমুখ। প্রার্থনা করে চাঞ্চল্য সহকারে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'ইনসান' (মানুষ) কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে হজরত আদমকে। আর এখানে 'আশু রূপায়ণ কামনা করে' বলে বুঝানো হয়েছে তাঁর ওই অবস্থানের কথা, যখন তার শরীরে ঘটানো হয়েছিলো আত্মার সম্পাত। তাঁর নাভীমূল পর্যন্ত আত্মার ক্রিয়া শুরু হতে না হতেই তিনি তখন পুনঃপুনঃ উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিলেন। আর বার বার তাঁর ওই প্রচেষ্টা পর্যবসিত হচ্ছিলো নিষ্ফলতায়। হজরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর।

ওয়াকেদী তাঁর যুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থে জননী আয়েশার এক মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এক বন্দীকে জননী আয়েশার নিকটে উপস্থিত করে বললেন, একে কড়া পাহারায় রাখতে হবে। এই বলে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। জননী আয়েশা বন্দীটির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এক আগন্তুক মহিলার সংগে কথা বলতে গিয়ে অন্যমনষ্ক হয়ে পড়লেন তিনি। সুযোগ পেয়ে লোকটি সটকে পড়লো সেখান থেকে। কিছুক্ষণ পর সেখানে হাজির হলেন রসুল স. স্বয়ং। বললেন, বন্দী লোকটিকে তো দেখছি না। জননী বললেন, কোথায় যে গেলো। রসুল স. কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্ তোমার হাত কেটে দিক! একথা বলেই তিনি বাইরে গিয়ে অপেক্ষমান সাহাবীগণকে বললেন, মালযামের পশ্চাৎভূমি থেকে শিগ্‌গীর লোকটিকে খুঁজে নিয়ে এসো। নির্দেশ শুনে অতি দ্রুত রওনা হলো অনুসন্ধানকারীরা। পলাতক লোকটি বেশী দূর যেতে পারেনি। তাই সহজেই ধরা পড়লো সে। পুনরায় তাকে বন্দী করে আনা হলো রসুল স. সকাশে। তাকে দেখে নিশ্চিন্ত মনে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে রসুল স. দেখলেন, তাঁর প্রিয়তম জীবন সঙ্গিনী একস্থানে বসে বার বার তাঁর হাত ওলোট পালট করে দেখছেন। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার ? জননী আয়েশা বললেন, আমি আপনার অপপ্রার্থনা কার্যকর হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুই হাত উর্ধ্বে উত্তোলন করে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! আমিও তো মানুষ। সুতরাং ভুল, ক্রোধ এ সকল মানবিক বৃত্তি কখনো কখনো আমার স্বভাবেও ছায়াপাত করতে পারে। হে আমার

জীবনাধিকারী। আমি বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের জন্য যদি কখনো অপপ্রার্থনা প্রকাশ করি, তবে তুমি সে অপপ্রার্থনাকে তাদের জন্য শুভপ্রার্থনায় পরিণত করে দিয়ো। সে প্রার্থনাকে করে দিয়ো তাদের বিশুদ্ধচারিতার কারণ। আল্লাহ্তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে 'ইনসান' বলে বুঝানো হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। আর 'অকল্যাণ কামনা করে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে তাদের শাস্তি কামনাকে। উল্লেখ্য যে, মক্কার মুশরিকেরা আল্লাহ্র আযাবের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতো। যেমন, নজর বিন হারেছ বলতো, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদের দল ও আমাদের দলের মধ্যে যে দল উত্তম, সেই দলকে তুমি বিজয়ী করো। আবার কখনো বলতো, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ এবং কোরআন যদি সত্য হয়, তবে তুমি আকাশ থেকে আমাদের উপরে প্রস্তর বর্ষণ করো। আল্লাহ্পাক অবশ্য তার এ অপপ্রার্থনাকে তাৎক্ষণিকভাবে কবুল করেননি। তাকে এবং তার মতো দুর্বৃত্তদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন পরে— বদর যুদ্ধের সময়।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আমি রাত্রি ও দিবসকে করেছি দু'টি নিদর্শন।' একথার অর্থ— রাত্রি ও দিবস হচ্ছে আমার অপার ক্ষমতা ও প্রজ্ঞাময়তার দু'টি বিশেষ নিদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— 'রাত্রিকে করেছি নিরালোক এবং দিবসকে করেছি আলোকময়।' একথার অর্থ— আমি রাতকে করেছি তমসাবৃত ও দিবসকে করেছি আলোকোজ্জ্বল। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, রাত্রি ও দিবসের কথা বলে এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে রাতের চন্দ্র ও দিবসের সূর্যের প্রতি। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— আমি রাতের চাঁদকে ক্ষয় করতে করতে নিঃশেষ করে ফেলি, আর দিবসকে রাখি সূর্যালোকে সমুদ্ভাসিত। তাই দিবসে পৃথিবীর সবকিছু হয় স্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান। এভাবে রাতের চাঁদ ও দিনের সূর্য হয়েছে আমার অতুলনীয় নিদর্শনের দু'টি বিশেষ প্রতীক। ক্বারী কাসায়ী বলেছেন, আরববাসীরা 'আব্সারান নাহার' বলে ওই সময়কে, যখন সকলবস্তু স্পষ্টরূপে অক্ষিগোচর হয় দিবাভাগে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রথমদিকে চন্দ্র ও সূর্যের আলো ছিলো সমান। তারপর আল্লাহ্তায়ালা সূর্যালোককে সত্তর ভাগে ভাগ করলেন। চন্দ্রালোককেও তেমনি ভাগ করলেন সত্তর ভাগে। তারপর চন্দ্রের ঊনসত্তর ভাগ আলোকে চিরদিনের জন্য মিলিয়ে দিলেন সূর্যালোকের সঙ্গে। এরপর আল্লাহ্র নির্দেশানুসারে চাঁদের উপর হজরত জিবরাইল তাঁর ডানাস্পর্শ করলেন তিন বার। ফলে চন্দ্রালোকের তেজস্বিতা গেলো উবে। থাকলো কেবল নরম ও স্নিগ্ধ আলো। একবার চন্দ্রপৃষ্ঠের কালো দাগ সম্পর্কে ইবনে কাওয়া কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে হজরত আলী বলেছিলেন, ওটি হচ্ছে আলোর তীব্রতা মুছে ফেলার দাগ।

জ্ঞাতব্যঃ ইমাম বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল' পুস্তকে সায়ীদ মাকবরী সূত্রে লিখেছেন, একবার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রসুল স.কে চন্দ্রপৃষ্ঠের কালো দাগ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রসুল স. বললেন, সূর্য ও চন্দ্রের আলো ছিলো একই রকম। পরে চন্দ্রের তীক্ষ্ণ আলোককে নিষ্প্রভ করা হয়। সেই মুছে ফেলার দাগকেই তোমরা বলো চন্দ্রের কলঙ্ক। আল্লাহ্ এরশাদ করেন— 'ফামাহাওনা আয়াতাল লাইলি' (রাত্রিকে করেছি নিরালোক)।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পারো।' একথার অর্থ— রাত্রি ও দিবসকে এরকম করেছি একারণে যে, রাতে যেনো তোমরা দূর করতে পারো দিবসের কর্মমুখরতাজনিত পরিশ্রান্তি। সৃষ্টি করতে পারো ইবাদতের সুখকর সুযোগ ও সময়। আর দিবসে পূর্ণোদ্যমে শুরু করতে পারো আয়-উপার্জন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। আবার রাত্রি-দিবসের এমতো বিবর্তনকে গণনা করতে পারো সপ্তাহ, মাস, বছর— বছরের পর বছর।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।' একথার অর্থ— এভাবে আমি প্রমাণ উপস্থাপন করি আমার একক সৃজনশীলতার— যাতে সত্যান্বেষণ ও সত্যাভিসার হয় অনাবিল, স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১৩, ১৪

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ۞ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ؕ

❒ প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তাহার গ্রীবালগ্ন করিয়াছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য বাহির করিব এক কিতাব, যাহা সে পাইবে উন্মুক্ত।

❒ আমি বলিব, 'তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি।' একথার অর্থ— আমি প্রত্যেকের অদৃষ্টলিপি বা তাকদীরকে করেছি তার কণ্ঠদেশের আবরণ বা গলার হার। সুতরাং মানুষ যেখানেই থাক না কেনো, তাকদীরের বিধান থেকে সে কোনোক্রমেই পৃথক হতে পারবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস, কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, ভালো ও মন্দ মানুষের অস্তিত্বসম্পৃক্ত। আর তাকে ওই ভালো-মন্দ বা পুণ্য-পাপ সম্পর্কে জবাবদিহিও করতে হবে। হাসান বলেছেন, এখানে 'ত্বায়ের' কথাটির অর্থ কৃতকর্ম— কল্যাণ ও অকল্যাণ। তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, 'ত্বায়ের' অর্থ ওই পূর্বনির্ধারণ, যার বাস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ মানুষ তার তাকদীরের লিখন অনুসারে কর্ম অবশ্যই করবে এবং তার প্রতিফলও অবশ্যই পাবে। পুরস্কার অথবা তিরস্কার— যাই হোক না কেনো।

আবু উবাইদা এবং কুতাইবি বলেছেন , 'ত্বায়ের' অর্থ এখানে ভালো এবং মন্দ উভয় প্রকার ভাগ্যলিপি। আরববাসীরা বলে থাকে 'ত্বরা ছাহমু ফুলানিন বি কাযা' (অমুক ব্যক্তি ভাগ্যের দাস)।

উল্লেখ্য যে, গ্রীবাদেশ, কণ্ঠদেশ বা গলা এমন একটি অঙ্গ— যার মাধ্যমে সৌন্দর্য ও অপসৌন্দর্য উভয় অবস্থাই প্রকাশিত হয়। অচ্ছেদ্য, বা সার্বক্ষণিকরূপে সত্তাসংশ্লিষ্ট বিষয়কে আরববাসীরা গলার হার বলে থাকে। যেমন— নিন্দা বা প্রশংসা অমুক ব্যক্তির গলার হার। এভাবেই প্রতিটি মানুষের তাকদীরকে আল্লাহ্পাক তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছেন বা করেছেন কণ্ঠহার স্বরূপ।

মুজাহিদ বলেছেন, প্রতিটি মানবশিশুর কণ্ঠলগ্ন করে দেয়া হয় একটি লিখিত পত্র বা চিরকুট। ওই চিরকুটে লেখা থাকে 'পুণ্যবান' অথবা 'পাপিষ্ঠ।'

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করবো এক কিতাব যা সে পাবে উন্মুক্ত।' একথার অর্থ— মহাবিচারের দিনে আমি বের করবো প্রত্যেকের আমলনামা। ওই আমলনামা সে পাবে উন্মুক্ত অবস্থায়।

বাগবী লিখেছেন, সম্মানিত সাহাবীগণের বক্তব্যরূপে এসেছে, মানুষের আয়ু শেষ হয়ে গেলে আমল লেখক ফেরেশতাদেরকে বলা হয়— তার আমলনামা বন্ধ করে দাও। বিচারদিবসের আগে তার আমলনামা আর খোলা হবে না।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'আমি বলবো, তুমি তোমার আমলনামা পাঠ করো; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।' একথার অর্থ— মহাবিচারের দিন মানুষকে বলা হবে, তোমার আমলনামা তুমিই পড়ো। নিজে নিজেই হিসাব করে দ্যাখো, তুমি কী? পাপী না পুণ্যবান?

এখানে 'হাসীব' অর্থ হিসাব গ্রহণকারী। অথবা এর মর্মার্থ 'যথেষ্ট'। অর্থাৎ তোমার সত্তাই তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। সে তখন সাক্ষ্য প্রদান করবে তোমারই বিরুদ্ধে। হজরত আনাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সকল আমলনামা সেদিন আরশের নিচে রাখা হবে (সকল মানুষকে একত্র করা হবে হাশরের ময়দানে) হঠাৎ প্রবাহিত হবে এক দমকা বাতাস। ওই বাতাসে আমলনামাগুলো উড়ে গিয়ে পড়বে মানুষের ডান অথবা বাম হাতে।

হাসান বসরী বলেছেন, যে ব্যক্তি আপন সত্তাকে তার নিজের হিসাব গ্রহণকারী বানিয়ে নিয়েছে, নিশ্চয় সে ন্যায়পরায়ণ। বাগবী ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, পৃথিবীর অক্ষরজ্ঞানহীনেরাও সেদিন তাদের আমলনামা পড়তে পারবে। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, হাসান বলেছেন, *প্রত্যেকের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে একটি করে মাল্য।* আমলনামা ভাঁজ করে ওই ফলকের মধ্যে রেখে দেয়া হয়। পুনরুত্থানের পর ওই আমলনামা তার সামনে উন্মোচন করা হবে এবং তাকে বলা হবে— তুমি তোমার কিতাব পাঠ করো; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।

হজরত আবু উমামা থেকে রাগেব ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষের সামনে যখন তার আমলনামা উন্মোচন করা হবে, তখন কেউ কেউ বলবে, আমি অমুক অমুক নেক কাজ করেছিলাম। সেগুলোর কথা তো এখানে নেই। আল্লাহ্তায়ালা বলবে, তুমি তো মানুষের গীবত (পরনিন্দা) করতে, তাই তোমার পুণ্যগুলোকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১৫

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

❐ যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজদিগেরই মংগলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে তাহারা তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজদিগেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। আমি রসূল না পাঠান পর্যন্ত কাহাকেও শাস্তি দেই না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে, তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য।' একথার অর্থ— মানুষ তার নিজের কল্যাণের জন্যই পুণ্যাভিসারী হয়, আর পথভ্রষ্টও হয় নিজের ধ্বংসের জন্য অর্থাৎ তার পুণ্য ও পাপের প্রতিফল ভোগ করে সে নিজে, অন্য কেউ নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কেউ কারো ভার বহণ করবে না।' উম্মত জননী হজরত আয়েশা থেকে শিথিল সূত্রে ইবনে আবদুল বার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার জননী হজরত খাদিজাতুল কোবরা রসুল স.কে মুশরিকদের অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জানতে চাইলেন, তারা জান্নাতী না জাহান্নামী? রসুল স. জবাব দিলেন, তারা তাদের পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্মলাভ করে। সুতরাং তাদের পরিণতি হবে তাদের পিতা-মাতার

মতোই। কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় এরকম জিজ্ঞেস করলে তিনি স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালাই এ বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। ধীরে ধীরে ইসলামের প্রসার ঘটতে লাগলো। তখন আবার সম্মানার্হা খাদিজা এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন রসুল স. এর নিকটে। তখন অবতীর্ণ হলো 'ওয়ালা তাযিরু ওয়াযিরাতুন বিয্‌রা উখরা' (এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না)। এখানে 'বিযরুন' অর্থ পাপের ভার বা বোঝা। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— পাপের ভার বহন করবে পাপী নিজে, অন্য কেউ নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি রসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না।' এ কথার অর্থ— আমি প্রথমে রসুল প্রেরণ করে উদাসীন মানুষকে সতর্ক করি। জানিয়ে দেই শরিয়তের বিধি-বিধান। আমার প্রেরিত রসুল ও তাঁর শরিয়তকে অস্বীকার করলেই কেবল অবাধ্যদের উপরে আপতিত হয় আমার শাস্তি। সুতরাং আমার চিরাচরিত বিধানই এই যে, রসুল প্রেরণ ব্যতিরেকে আমি কাউকে শাস্তি দেই না।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, কেবল জ্ঞান ও বিবেকের কারণে কারো প্রতি ইমান ও আমল অত্যাবশ্যক হয় না। সুতরাং কারো কাছে যদি নবী-রসুলগণের দাওয়াত বা আহ্বান না পৌঁছায় তবে সে শিরিক অথবা অন্যবিধ অপরাধ করলেও তার কোনো শাস্তি হবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরকম ব্যক্তি অবশ্যই শাস্তিযোগ্য হবে। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত বিচারকর্তা। মানুষ তার জ্ঞান ও বিবেককে কাজে লাগালে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। আর এই ইমান বা বিশ্বাস নবুয়ত, মোজেজা ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তি জ্ঞান ও বিবেক। সুতরাং একথাটি অবশ্য মাননীয় যে, নবী-রসুলগণের দাওয়াত না পেলেও মানুষের উপর এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। এই অত্যাবশ্যকতা লংঘিত হলে শাস্তি অনিবার্য। এই অভিমতের সমর্থনে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিস বিদ্যমান। যেমন—

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার বললেন, মহাবিচারের দিন আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম! আদম উত্তরে বলবেন, এই যে আমি। হে আমার আল্লাহ্! সকল কল্যাণ তো তোমারই অধিকারে। আল্লাহ্ বলবেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে দোজখের অংশ বের করো। আদম বলবেন, কীভাবে? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। আল্লাহ্র এ নির্দেশ হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। শাস্তির ভয়ে তখন শিশুরা হয়ে যাবে বৃদ্ধ। আর গর্ভপাত ঘটবে গর্ভবতীদের। মানুষ তখন হয়ে পড়বে নেশাগ্রস্তদের মতো উদভ্রান্ত। অথচ তারা মাতাল নয়। আল্লাহ্র শাস্তির আশংকাতেই তারা হয়ে

পড়বে মাতালের মতো বাহ্যজ্ঞান শূন্য। উপস্থিত সাহাবীগণ একথা শুনে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমাদের মধ্য থেকে ওই পরিত্রান প্রাপ্ত ব্যক্তিটি কে হবেন? তিনি স. বললেন, তোমাদের জন্য শুভসংবাদ। তোমাদের মধ্যে জাহান্নামী হবে হাজারে একজন। আর ইয়াজুজ মাজুজেরা সকলেই। ইমাম আবু হানিফা এই হাদিসের প্রেক্ষিতেই বলেছেন, যার জ্ঞান ও বিবেক আছে তার উপরে তাওহীদ বা আল্লাহ্তায়ালার অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। ইয়াজুজ মাজুজদের প্রতি কোনো নবী প্রেরিত হবেন না, তারা অবস্থান করবে প্রাচীরবেষ্টিত অবস্থায়। অথচ বলা হয়েছে 'তারা সকলে জাহান্নামী'। সুতরাং তাওহীদ সকলের উপরে ফরজ— তার বা তাদের প্রতি নবী প্রেরিত হোন, অথবা নাই-ই হোন।

নবীগণের তিরোধান ও আবির্ভাব কালের মধ্যবর্তী সময়ের মানুষকে মহাবিচারের দিন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হবে। হজরত সাওবান থেকে বায্যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রসুল ঈসার তিরোধানের পরে ও আমার আবির্ভাবের আগের অনেক লোক ছিলো পথভ্রষ্ট। পুনরুত্থান দিবসে তারা তাদের পাপের বোঝা নিয়ে হাশরের প্রান্তরে উপস্থিত হবে। বলবে, হে আমাদের আল্লাহ্! আমরা কোনো রসুল পাইনি। যদি পেতাম, তবে তোমার নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ সম্পর্কে জানতে পারতাম এবং তার উপর আমল করতে পারতাম। আল্লাহ্ বলবেন ঠিক আছে। এখন যদি তোমাদেরকে কোনো নির্দেশ দেই, তবে তোমরা কি তা পালন করবে? তারা বলবে, অবশ্যই। আল্লাহ্ বলবেন, তবে দোজখে চলে যাও। এটাই আমার নির্দেশ। তারা নির্দেশানুসারে দোজখের দিকে যেতে থাকবে। কিন্তু দোজখের কাছাকাছি গিয়ে ভয়ে ফিরে আসবে। বলবে, হে আমাদের আল্লাহ্! দোজখের ভয়ে আমরা ভীত। আমরা তো কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করতে পারবো না। আল্লাহ্ বলবেন, অবশ্যই তোমরা দোজখে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়। এ পর্যন্ত বলার পর রসুল স. হাসলেন। একটু পরেই বললেন, যদি তারা প্রথম নির্দেশানুসারে দোজখে প্রবেশ করতো, তবে দোজখের আগুন তাদেরকে পোড়াতো না।

ইমাম আহমদ ও ইবনে রহ্ওয়াইহ্ রচিত গ্রন্থে এবং বায়হাকীর 'কিতাবুল ই'তিকাদ' গ্রন্থে হজরত আসওয়াদ বিন সারী থেকে বর্ণিত একটি বিশুদ্ধ-সূত্রসম্বলিত হাদিসে বলা হয়েছে রসুল স. একবার বললেন, মহাবিচারের দিন চারজন পথভ্রষ্ট লোক তাদের পথভ্রষ্টতার পক্ষে দলিল উপস্থাপন করবে। তাদের একজন হবে বধির, একজন বোকা, একজন অতিবৃদ্ধ, আর একজন হবে দুই নবীর মধ্যবর্তী নবীবিহীন সময়ের। বধির বলবে, হে আমার আল্লাহ্! আমাদের সময়ে তোমার এক নবী সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমি তা শুনতে পাইনি। কেউ আমাকে জোর করে শোনানোর চেষ্টাও করেনি।

বোকা লোকটি বলবে, আমিতো তখন ছিলাম পাগল। শিশু পশু সকলেই আমার গায়ে নিক্ষেপ করতো তাদের বিষ্ঠা। অতিবৃদ্ধ লোকটি বলবে। সত্য ধর্মের সংবাদ আমি পেয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু আমি তা ঠিক বুঝতে পারিনি। নবীবিহীন সময়ের লোকটি বলবে, আমিতো তোমার কোনো নবীর সাক্ষাতই পাইনি। আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, ঠিক আছে। এখন আমি সরাসরি হুকুম দিচ্ছি— তোমরা দোজখে চলে যাও। তারা দোজখের দিকে যেতে থাকবে। কিন্তু কাছে গিয়ে দোজখ দেখে ভয় পেয়ে ফিরে আসবে। এ পর্যন্ত বলার পর রসুল স. মন্তব্য করলেন, মোহাম্মদের জীবনাধিকারী সেই পবিত্র সত্তার শপথ! তারা যদি হুকুম তামিল করতো, তবে দোজখ হয়ে যেতো তাদের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক। হজরত আবু হোরায়রা থেকেও তিনজন বর্ণনাকারী এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে সংযোজিত হয়েছে এই কথাটুকু— তখন আল্লাহ্র এমতো হুকুম যে পালন করবে, দোযখের আগুন তাকে পোড়াবে না। আর যে হুকুম পালন করবে না তাকে জোর করে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে।

ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, আমাকে মুসলিম বিন ইয়াসার বলেছেন, মহাবিচারের দিনে বিচার শুরু হবে একজন অন্ধ, একজন বধির, একজন বোবার। আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, তোমরা আমার নির্দেশানুসারে আমল করোনি কেনো? তারা বলবে, আমরা তো ছিলাম অঙ্গহীন,পঙ্গু— শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডতুল্য। আল্লাহ্ বলবেন, এখন যদি তোমাদেরকে কোনো নির্দেশ দেই, তবে কি তোমরা তা পালন করবে? তারা বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলবেন, দোজখের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ো। এমতো নির্দেশ শুনে তারা চুপচাপ থাকবে। তখন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে দোজখে।

আমি বলি হানাফিগণের অভিমত এই যে, জ্ঞানবান মানুষের নিকট নবীগণের আহ্বান না পৌঁছলেও জ্ঞান ব্যবহার করে তাকে এক আল্লাহ্র উপর ইমান আনতে হবে। মুক্ত থাকতে হবে শিরিক থেকে। নতুবা তাকে শাস্তি পেতেই হবে। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে অংশীদার স্থাপনকারীদেরকে ক্ষমা করবেন না'। নবী বিহীন সময়ের লোকেরাও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ শিরিক সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ এবং ক্ষমার অযোগ্য। বিচার দিবসে সম্ভবতঃ তারা তাদের অজ্ঞতা ও অসহায়ত্বকে ওজর হিসেবে উত্থাপন করবে। কিন্তু আল্লাহ্ যথাবিধি পরীক্ষা করার পর তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেদিন মুশরিকেরাও তাদের কৃত শিরিককে অস্বীকার করে বসবে এবং তাদের পক্ষে সাক্ষী অনুসন্ধান করতে থাকবে। কিন্তু তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও সাক্ষ্য দিবে তাদের বিরুদ্ধে। এভাবে মহা অপরাধীরূপে প্রমাণিত হয়ে যাবে

তারা। আল্লাহ্ তখন তাদের যেভাবে ইচ্ছা শাস্তি দান করবেন। আর ওই শাস্তিদান হবে সম্পূর্ণতঃই ন্যায়ানুগ। কিন্তু একথাটিও প্রণিধাননীয় যে, মানুষ কখনো তার জ্ঞান ও তার বিবেকের মাধ্যমে শরিয়তের বিধি-বিধান রচনা করতে সক্ষম নয়। ব্যবহারিক বিষয়ের বিধি-বিধান প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানানো হয় কেবল নবী রসুলগণকে। তাই তাদের ধর্ম মত সম্পর্কে জানার সুযোগ না থাকলে শরিয়তের বিধি-বিধান পালন করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় শরিয়ত পালন না করার বিষয়টি ক্ষমার্হ। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ এ রকম নন যে, কোনো সম্প্রদায়কে তিনি পথ-প্রদর্শনের পর পুনরায় পথভ্রষ্ট করবেন। যতক্ষণ না তিনি ওই সকল বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা করেন, যেগুলো থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক।'

হানাফী অভিমতানুসারে তাফসীরে মাদারেক রচয়িতা আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— এখানে বলা হয়েছে পৃথিবীতে শাস্তিদানের কথা। অর্থাৎ 'আমি রসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না' বলে বুঝানো হয়েছে — নবী প্রেরণ ছাড়া শিরিকের অপরাধের জন্য পৃথিবীর কোনো সম্প্রদায়কে আমি সমূলে বিনাশ করি না। আমি বলি, 'এখানে শাস্তি দেই না' কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। কথাটিতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের শাস্তির কথা রয়েছে। অর্থাৎ এখানকার 'শাস্তি দেই না' কথাটি একটি সাধারণ ঘোষণা। কোনো বিশেষ কাল বা স্থান এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে না। সুতরাং নবী প্রেরণ ছাড়া দুনিয়াতেই যদি শাস্তি দেয়া না হয়, তবে আখেরাতে আবার শাস্তি দেয়া হবে কীভাবে? আর এখানে বলা হয়েছে কেবল আল্লাহ্পাকের বিধান লংঘন এবং অন্যবিধ পাপাচরণ সম্পর্কীয় শাস্তির কথা। শিরিক সম্পর্কীয় শাস্তির কথা আলোচ্য বাক্যের উদ্দেশ্য নয়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'রসূল' শব্দটিও জ্ঞান ও বিবেকের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সুবিবেচনাও মানুষের জন্য রসুল তুল্য। সুস্থ বিবেকই মানুষকে ভালো ও মন্দের পার্থক্য নির্দেশ করে। তাই বিবেক যাকে সত্য বলে মনে করে, তাকে পরিত্যাগ করা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই বিধানটি শিরিকসহ অন্যান্য সকল পাপকর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

দ্রষ্টব্যঃ আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকদের শিশু সন্তান এবং উন্মাদদের জন্য কোনো শাস্তি নেই। শিরিক অথবা অন্যান্য পাপের কারণে তারা শাস্তিযোগ্য নয়। কারণ তাদের প্রতি কোনো রসুল প্রেরিত হয় না। অর্থাৎ রসুলতুল্য বিবেকবুদ্ধির অধিকারী তারা নয়। তাছাড়া একজনের অপরাধের কারণে অন্যকে দায়ী করা হয় না। শিশুরাও তাই তাদের পিতামাতার অপরাধে

অপরাধী নয়। তাই বলা হয়েছে, 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না।' বিভিন্ন হাদিসেও বিষয়টিকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, খানাসা বিন মুয়াবিয়ার চাচা বর্ণনা করেছেন, একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! জান্নাতী কারা? তিনি স. বললেন, নবী, শহীদ ও সদ্যজাত ওই সকল শিশু যাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ এরা হবেন বিনা হিসাবে জান্নাতবাসী)।

হজরত সামুরা বিন জুনদুব থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসের এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে— স্বপ্নযোগে রসুল স. দেখলেন, একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ শিশুদেরকে নিয়ে একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসে আছেন। তিনি স. তাঁর সহচর জিবরাইল ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? জিবরাইল বললেন, ইনি হচ্ছেন নবী ইব্রাহীম। আর তাঁর সঙ্গের শিশুরা হচ্ছে মুসলমান ও মুশরিকদের শিশু সন্তান। এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, মুশরিকদের শিশুরাও? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। এই হাদিসের প্রেক্ষিতে কোনো কোনো আলেম তাই বলেছেন, যে সকল মুশরিক-সন্তান শিশুকালে মৃত্যুবরণ করবে, তারা হবে জান্নাতবাসীদের পরিচারক।

হজরত আনাস থেকে আবু দাউদ তায়ালাসী বর্ণনা করেছেন, শিশুকালে মৃত্যুবরণকারী মুশরিক সন্তানদের সম্পর্কে একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, তাদের তো কোনো খারাপ আমল নেই। তাই তারা জাহান্নামে যাবে না। আবার তাদের এমতো পুণ্যকর্মও নেই, যার জন্য তারা লাভ করবে জান্নাতের অধিকার। তাই তারা হবে জান্নাতের খাদেম।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সামুরাহ বলেছেন, আমরা একবার রসুল স. এর নিকটে অংশীবাদীদের শিশু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি স. বললেন, তারা হবে বেহেশতবাসীদের খাদেম। অপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে।

একটি প্রশ্নঃ বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত কোনো হাদিসে অংশীবাদীদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। অর্থাৎ তিনি দৃঢ়ভাবে এরকম বলেননি যে, তারা বেহেশতী অথবা দোজখী। যেমন, হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স.কে অংশীবাদীদের অকাল প্রয়াত শিশু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, এ বিষয়ে আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞাত। তিনিই জানেন, তাদেরকে তিনি কী করবেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে।

উত্তরঃ অংশীবাদীদের অকালপ্রয়াত শিশু-সন্তান সম্পর্কে বর্ণিত শিথিল-সূত্রবিশিষ্ট হাদিস দু'টো রহিত (মনসুখ) পদবাচ্য। হাদিস দু'টো রহিত হয়েছে সুরা ফাতাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে। ইতোপূর্বে রসুল স. দৃঢ়তার সঙ্গে কাউকে

বেহেশতী বলে স্বীকার করতেন না। বলতেন, আমি জানি না তোমাদের সঙ্গে সেদিন কীরূপ ব্যবহার করা হবে। আমার প্রতিই বা প্রদর্শন করা হবে কীরূপ আচরণ। তখন হজরত ওসমান বিন মাজউন ইন্তেকাল করলে সাহাবীগণের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে জান্নাতী বলেছিলেন। কিন্তু রসুল স. তাঁদের উক্তিকে তখন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এরপর অবতীর্ণ হলো সুরা ফাতাহ্। রসুল স. হলেন অত্যধিক আনন্দিত। তারপর থেকে তিনি স. নির্দিষ্ট করে অনেককে দিয়েছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ।

মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জননী আয়েশা বলেছেন, জনৈক আনসারী সাহাবীর এক শিশু সন্তানের মৃত্যু হলো। লোকেরা রসুল স.কে তার জানাযা পড়বার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! শিশুটির কতোইনা সৌভাগ্য! সে তো ছিলো বেহেশতের পাখির মতো। পাপ করবার বয়সই সে পায়নি। সুতরাং শুভ পরিণতি ছাড়া তার জন্য অন্য কোনো কিছু হওয়া কি সম্ভব? রসুল স. বললেন, শোনো আয়েশা! যিনি জান্নাত সৃষ্টি করেছেন তিনি জান্নাতের জন্য পিতৃপৃষ্ঠ থেকে কিছু মানুষও সৃষ্টি করেছেন। জাহান্নামও সৃষ্টি করেছেন তিনি। আর ওই জাহান্নামের জন্যও পিতৃপৃষ্ঠ থেকে সৃষ্টি করেছেন অনেককে। এই হাদিসে দেখা যায়, মুসলমানদের অকাল প্রয়াত শিশু সম্পর্কেও সুস্পষ্ট কোনো মন্তব্য করা হয়নি। সুতরাং এ সম্পর্কে নীরব থাকাই সমীচীন। এতদ্সত্ত্বেও সলফে সালেহীন এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, মুসলমানদের অকালমৃত শিশু সন্তানেরা জান্নাতী। এই ঐকমত্যের কথা ফাররা ও অন্যান্যের সূত্রে উল্লেখ করেছেন ইমাম আহমদ, ইবনে আবী যায়েদ, আবু ইয়া'লী প্রমুখ। ইমাম নববী ও ইমাম সুয়ূতির মন্তব্যও এরকম। মোট কথা, এ সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ ছিলো সুরা ফাতাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে, পরে নয়।

ইবনে হাব্বানের 'সহীহ্' নামক গ্রন্থে এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায্যারের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, এই উম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত তাকদীরের বিষয়ে বিতর্কের অবতারণা না করবে এবং অকাল মৃত শিশুদের সম্পর্কে মন্তব্য না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মীয় বিষয়ে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না। ইবনে হাব্বান বলেছেন, অকালমৃত শিশুদের সম্পর্কে হাদিসে উল্লেখিত মন্তব্য না করার নির্দেশটি প্রযোজ্য হবে কেবল অংশীবাদীদের অকালমৃত শিশুদের ক্ষেত্রে। মুসলমানদের শিশুদের ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু এই হাদিসটিও মনসুখ বা রহিত। অর্থাৎ সুরা ফাতাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের। ওই সময় রসুল স.কে অংশীবাদীদের অকালমৃত শিশুদের পরিণতি সম্পর্কে জানানো হয়নি।

অংশীবাদীদের অকাল মৃত শিশু সন্তান দোজখে যাবে?ঃ অংশীবাদীদের অকালমৃত শিশু সন্তান সম্পর্কেও বেশ কয়েকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

হজরত বারা বিন আজীব থেকে আবু ইয়ালী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. সকাশে মুসলমানদের অকালে ঝরে যাওয়া শিশুকুল সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা হলো। তিনি স. বললেন, তারা থাকবে তাদের জনকদের সঙ্গে। পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপন করা হলো মুশরিকদের অকালমৃত শিশুদের সম্পর্কে। তিনি স. বললেন, তারাও থাকবে তাদের জনকদের সঙ্গে।

আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! বিশ্বাসীদের অকাল প্রয়াত শিশুদের কী পরিণতি হবে? তিনি স. বললেন, তারা থাকবে তাদের আপন আপন জনয়িতার সঙ্গে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোনো পুণ্যকর্ম ছাড়াই? (তারা তো সে সুযোগও পায়নি)। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌ এ ব্যাপারে সম্যক অবগত যে, বড় হলে তারা কী করতো? আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তা হলে অবিশ্বাসীদের অকালমৃত শিশুদের কী হবে? তিনি স. বললেন, আপন আপন জনয়িতার সঙ্গে থাকবে তারাও। আমি বললাম, কোনো পাপকর্ম ব্যতিরেকেই? (তারা সে বয়সে পৌঁছেইনি)। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন, বড় হলে তারা কী করতো।

শিথিলসূত্রে আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে জননী আয়েশা বলেছেন, একবার অংশীবাদীদের অকালমৃত শিশুদের সম্পর্কে আলোচনা হলো। রসুল স. বললেন, আয়েশা! তুমি যদি চাও, তবে আমি দোজখে তাদের ঠিকানা দেখিয়ে দিতে পারি।

অপ্রসিদ্ধ ও বিপর্যস্ত সূত্রে আবদুল্লাহ্‌ বিন আহমদের 'ফাওয়াইদুল মসনদ' নামক গ্রন্থে এবং ইবনে আবী হাতেমের 'আস্‌সুন্নাহ্‌' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, জননী খাদিজা একবার তাঁর ইসলামপূর্ব জীবনের অকালপ্রয়াত দু'জন শিশু সন্তান সম্পর্কে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন। রসুল স. বললেন, তারা দুজনই দোজখী। জননী বিমর্ষ হলেন। রসুল স. তাঁর বিমর্ষ চেহারা দেখে বললেন, যদি তুমি তাদের পরিণতি স্বচক্ষে দর্শন করো, তবে তাদের প্রতি জাগবে তোমার বিবমিষা। জননী বললেন, আর আপনার পরলোকগত শিশুসন্তানেরা? রসুল স. বললেন, তারা জান্নাতী। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন—'যারা ইমান আনে, আর তাদের সন্তান-সন্ততি ইমানে তাদের অনুগামী হয়, আমি তাদের সঙ্গে মিলিত করবো তাদের সন্তান-সন্ততিকে।'

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে উত্তমসূত্রে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জীবন্ত কবরস্থ শিশুকন্যা ও তাকে কবরস্থকারী উভয়েই জাহান্নামী। ভিন্নসূত্রে আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সালমা বিন কয়েস আশজায়ী বলেছেন, আমি ও আমার ভাই একবার রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমাদের জননী মৃত্যুবরণ করেছেন মূর্খতার যুগে। তিনি ছিলেন অতিথি-পরায়ণা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারিণী। কিন্তু তিনি তার এক

অপ্রাপ্ত বয়স্কা বোনকে জীবন্ত কবর দিয়েছিলেন। রসুল স. বললেন, কবরদানকারিণী ও কবরস্থা উভয়েই জাহান্নামী। তবে কবরস্থা শিশুকন্যাটি যদি ইসলামী যুগ পেতো এবং মনে প্রাণে ইসলামকে গ্রহণ করতো, তবে সে হতো জান্নাতী।

উপরে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বলা যেতে পারে, হাদিসে উল্লেখিত 'আলওয়াইদাহ্' কথাটির অর্থ হবে ধাত্রীমাতা। আর 'মাওউদাহ্' কথাটির অর্থ হবে প্রোথিতা শিশুর জন্মদাত্রী মাতা। এভাবে হাদিসটির প্রকৃত অর্থ হবে— মাটিতে জীবন্ত প্রোথিত শিশুকন্যার ধাত্রীমাতা যদি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলে, আর এভাবে তাকে হত্যা করার ব্যাপারে যদি তার জন্মদাত্রী মাতা সম্মত থাকে, তবে ধাত্রীমাতা ও জন্মদাত্রী মাতা উভয়েই হবে জাহান্নামী। এভাবে হাদিসে উল্লেখিত বিরোধাভাস দূরীভূত করা প্রয়োজন। এবার অবশিষ্ট রইল ওই সকল হাদিস, যেগুলোতে বলা হয়েছে, অংশীবাদীদের অকাল প্রয়াত শিশুসন্তানেরা জাহান্নামী। এই হাদিসগুলো ওই সকল হাদিসের মতো দৃঢ়সূত্রবদ্ধ নয়, যেগুলোতে বলা হয়েছে, অংশীবাদীদের শিশুসন্তানেরাও জান্নাতী। তাছাড়া মুশরিকদের শিশুদের দোজখী হওয়ার হাদিসগুলো কোরআন মজীদের বক্তব্যেরও বিরোধী। সুতরাং সেগুলো গ্রহণীয় নয়। আর এ সকল হাদিস বর্ণিত হয়েছে বিজ্ঞপ্তিরূপে এবং বিজ্ঞপ্তিরূপী বিবরণ নাসেখ বা রহিতকরণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ সেগুলো প্রবহমান বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নয়। সে কারণেই আমি ওই বিবরণগুলোকে রহিত বলি না, বলি শিথিল। অবশ্য এই অর্থে সেগুলোকে রহিত বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে দোজখী বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু রসুল স. এর সুপারিশে তিনি তাদেরকে নিষ্কৃতি দিবেন। হজরত আনাস থেকে ইবনে আবী শায়বা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এরকমই বলা হয়েছে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, মানুষের যে সকল শিশুসন্তান খেলাধূলার বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের জন্য আমি আমার প্রভুপালনকর্তার নিকটে প্রার্থনা করেছি। আর আমার প্রার্থনা গৃহীতও হয়েছে। তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, এই হাদিসের 'লাহী' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মানব শিশুকে। তারা তো খেলাধূলা করতেই ভালোবাসে। জ্ঞান, বিবেক ও দায়িত্ব বোধ বলে কিছু থাকে না।

আল্লামা সুয়ূতী লিখেছেন, অংশীবাদীদের অকাল প্রয়াত সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন রকম উক্তি করেছেন। কেউ কেউ তাদেরকে বলেছেন দোজখী। আবার কেউ কেউ বলেছেন বেহেশতী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ঠিক বেহেশতী নয়— বরং বেহেশতীদের খাদেম। আমি বলি, শেষোক্ত অভিমত দু'টোর মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। কেননা বেহেশতীগণের খাদেম তো অবশ্যই

বেহেশতী। আমার মতে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করাই সমীচীন। এরকম ধারণা রাখাই উত্তম যে, তাদের বেহেশতী অথবা দোজখী হওয়া সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় নির্ভর একটি বিষয়। এরকম অভিমত পোষণ করেন হাম্মাদ, ইবনে মোবারক, ইবনে রহ্ওয়াইহ্ এবং ইমাম শাফেয়ী। নাসাফী বলেছেন, ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এরকম।

এক বর্ণনায় এসেছে, মহাবিচার দিবসে রসুল স. এর পূর্ববর্তী জামানার মানুষকে যেভাবে পরীক্ষা করা হবে, মুশরিকদের শিশুসন্তানদেরকেও পরীক্ষা করা হবে সেভাবে। হজরত আনাস থেকে আবু ইয়ালী ও বায্যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিচার দিবসে চার প্রকার লোকের বিচার অনুষ্ঠিত হবে একসাথে। ওই চার প্রকার লোক হচ্ছে— ১. অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ২. উন্মাদ ৩. হজরত ঈসার আকাশ আরোহণের পর থেকে রসুল স. এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মানুষ এবং ৪. বয়োবৃদ্ধ। তারা সকলেই তখন তাদের নিজেদের পক্ষে বিভিন্ন অজুহাত দেখাতে থাকবে। আল্লাহ্ তখন দোজখের উপরিভাগের আগুনকে ডেকে আনবেন। তারপর ওই চার প্রকারের লোককে উদ্দেশ্য করে বলবেন, আমি পৃথিবীতে আমার বার্তাবাহকগণের মাধ্যমে আমার নির্দেশ প্রচার করেছিলাম। আর এখন তোমাদের সরাসরি নির্দেশ দিচ্ছি— এই আগুনে প্রবেশ করো। এ আদেশ শুনে দুর্ভাগারা বলবে, এই ভয়াবহ ও বীভৎস নরকাগ্নিতে আমরা কীভাবে প্রবেশ করতে পারি! আমরা তো এই লেলিহান শিখা থেকে পরিত্রাণার্থী। আমরা তো এখান থেকে পলায়ন করতে চাই। আর যারা সৌভাগ্যশালী, তারা কোনো উচ্চবাচ্য না করে আল্লাহ্র আদেশের সম্মান রক্ষার্থে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে আগুনে। আল্লাহ্ অবাধ্যদেরকে বলবেন, পৃথিবীতে প্রেরিত পুরুষগণের মাধ্যমে প্রচারিত আমার নির্দেশের কোনো তোয়াক্কাই তোমরা করোনি। এখনো লংঘন করলে আমার সরাসরি আদেশ। সুতরাং তোমরা চিরঅবাধ্য। তাই তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হলো চিরস্থায়ী অগ্নিবাস। এ কথা বলে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে। আর যারা আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলো, তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হবে বেহেশতে।

বায্যার ও মোহাম্মদ বিন ইয়াহ্ইয়া হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শেষ বিচারের দিন তিন ধরনের লোক বিভিন্ন অজুহাত তুলে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে । ১. হজরত ঈসার ধর্মাদর্শ বিকৃত হওয়ার পর থেকে রসুল স. এর মহা আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীরা। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমাদের কাছে তো তোমার কোনো নবী অথবা গ্রন্থ পৌঁছেনি। ২. মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীরা। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালয়িতা ! আমাদেরকে তো তুমি সুস্থ জ্ঞান ও বোধ দান করোনি। তাই আমরা পৃথিবীতে সত্য ও মিথ্যার

প্রভেদ বুঝতে পারিনি। ৩. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণকারী শিশুরা। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা তো পৃথিবীতে ভালো-মন্দ বুঝবার বয়সই পাইনি। তাদের এমতো ওজর আপত্তি উত্থাপনের পর সেখানে আনা হবে নরকাগ্নির একাংশকে। আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, এই অগ্নিতে প্রবেশ করো। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র এই আদেশ পালন করবে তারা, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ যাদের সম্পর্কে একথা জানেন যে, ওজর আপত্তিগুলো না থাকলে তারা দুনিয়ায় ইমান আনতো ও নেক আমল করতো। আর আদেশ পালনে বিরত থাকবে তারা, যাদের সম্পর্কে তিনি জানেন যে, ওজর আপত্তিগুলো না থাকলেও তারা কোনো কালেও বিশ্বাস স্থাপন করতো না। পুণ্যকর্মও করতো না।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে তিবরানী ও আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে হিসাব নিকাশের জন্য একসাথে হাজির করা হবে রসুল ঈসার জামানার পর থেকে আমার জামানার পূর্ব পর্যন্ত কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী, শিশুকালে মৃত্যুবরণকারী ও পাগলদেরকে। তারা তাদের অসুবিধাগুলো তুলে ধরে তখন নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করবে। আল্লাহ্ বলবেন, ঠিক আছে, আগে যা হয়েছে, হয়েছে। এখন আমি যদি তোমাদেরকে কোনো হুকুম করি, তবে কি তোমরা তা তামিল করবে? তারা বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলবেন, যাও। দোজখে প্রবেশ করো। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে আনা হবে দোজখাগ্নির একাংশকে। সেই ভয়ংকর আগুনের লেলিহান শিখা দেখে তাদের কেউ কেউ সভয়ে পিছিয়ে আসবে। আল্লাহ্ পুনরায় হুকুম করবেন। পুনরায় পশ্চাদপসরণ করবে তারা। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই আমি জানি যে, তোমরা চির অবাধ্য।

উপরে বর্ণিত হাদিসের উপরে ভিত্তি করে কেউ কেউ বলেছেন, এভাবে ইমানের পরীক্ষা নেয়ার পর আল্লাহ্পাক তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু এমতো অভিমত প্রকাশ্য প্রমাণের পরিপন্থী। কেননা জননী আয়েশা, হজরত আলী ও হজরত ওমর থেকে ইমাম আহমদ, আবু দাউদ এবং হাকেম বিশুদ্ধ সূত্রে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের লোকের উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে (শরিয়তের বিধান তাদের উপরে অত্যাবশ্যক নয়)। তারা হচ্ছে— ১. উন্মাদ, যতক্ষণ না তার মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসে। ২. নিদ্রাভিভূত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং ৩. শিশু, যতক্ষণ না সে বয়োপ্রাপ্ত হয়।

অন্যান্য হাদিস থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, পাপের বাসনা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অভিযুক্ত করা হবে না। প্রকৃত অবস্থা যদি এরকমই হয়, তবে যারা পাপ-পুণ্যবোধ বর্জিত, তাদেরকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে কীভাবে? সুরা বাকারার এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কাউকে সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করেন না।' একারণেই এইমর্মে উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, জ্ঞানবান

ও প্রাপ্তবয়স্কদের উপরেই কেবল প্রযোজ্য হতে পারে আল্লাহ্তায়ালার আদেশ ও নিষেধ। সুতরাং বুঝতে হবে, পাগল ও শিশুর শাস্তির কথা এসেছে বর্ণনাকারীর অনবধানতাবশতঃ। আর যদি তাদের উপরে সে দিন দোজখে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়, তবে তারা তা সঙ্গে সঙ্গে পালনও করবে। কারণ তারা বোধ-বুদ্ধি বিবর্জিত। ভয়-ভীতির অনুভূতিশূন্য। কিন্তু হজরত ঈসার জামানার পর থেকে রসুল স. এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিষয়টি স্বতন্ত্র। তারা বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো। বিচার দিবসেও তেমনি তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানই করবে। কারণ সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতা তাদের সত্তাসন্নিবিষ্ট। তারা চিরভ্রষ্ট।

আল্লামা সুয়ুতী লিখেছেন, মুশরিকদের শিশু সন্তান সম্পর্কে এরকম বক্তব্যও এসেছে যে, তারা থাকবে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে। অর্থাৎ তারা জান্নাতী অথবা জাহান্নামী কোনোটাই হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, তাদেরকে পরিণত করা হবে মৃত্তিকায়। কিন্তু এই অভিমতটি প্রমাণ সিদ্ধ নয়। তবে বিশ্বাসীদের শিশুসন্তানদের জান্নাতী হওয়া সম্পর্কে কোনো মতপৃথকতা নেই।

সূরা বানী ইসরাইল : আয়াত ১৬, ১৭

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ۝ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ۝

❒ আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করিতে চাহি তখন উহার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদিগকে সৎকর্ম করিতে আদেশ করি, কিন্তু উহারা সেথায় অসৎকর্ম করে; অতঃপর উহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সংগত হইয়া যায় এবং আমি উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।

❒ নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি! তোমার প্রতিপালকই তাঁহার দাসদিগের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি যখন কোনো জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি।' এখানে 'মুতরাফীন' অর্থ সমৃদ্ধিশালী বা প্রতাপশালী ব্যক্তি। আর এখানকার 'আমারনা' কথাটিকে

মুজাহিদ উচ্চারণ করতেন 'আম্মারনা'। তাঁর উচ্চারণানুসারে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়—আমি তাদেরকে বিজয়ী বা সুপ্রতিষ্ঠিত করি, অথবা বানিয়ে দেই তাদেরকে বিচারক বা শাসক। হাসান, কাতাদা ও ক্বারী ইয়াকুব কথাটিকে 'আমারনা'ই পড়েছেন। তাঁদের উচ্চারণানুযায়ী কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— যারা প্রাচুর্য ও আরাম আয়েশের মধ্যে রয়েছে, তাদেরকে আমি আমার নবী-রসুলগণের মাধ্যমে আমার আনুগত্য করার আদেশ দেই। এখানে 'আমারনা' বা আদেশ কথাটির পরে 'বিত্‌ত্বয়াত্‌' বা 'আনুগত্য' কথাটি উহ্য রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা সেখানে অসৎকর্ম করে।' লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি রসুল প্রেরণ না করা পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না।' আর এই আয়াতে বলা হচ্ছে— 'ফাসাকু ফীহা' (কিন্তু তারা সেখানে অসৎকর্ম করে)। এখানে 'ফিস্‌কুন' অর্থ অনানুগত্য বা অবাধ্যতা বা অসৎকর্ম। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ওই সকল প্রতাপশালী সমাজপতিরা নিজেরা তো অসৎকর্ম করতোই, উপরন্তু তাদের অনুগামীদেরকেও পরিচালিত করতো পাপাচরণের দিকে। আরববাসীরা বলে 'আমারতুহু ফা জালাসা' (আমি তাকে হুকুম দিয়েছি, সে বসেছে)। এমতোক্ষেত্রে কথাটির শাব্দিক অর্থ ব্যবহার্য নয়। কেননা আল্লাহ্‌ কখনো পাপকর্মের আদেশ দেন না। এক আয়াতে তাই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌ কখনোই অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার আদেশ প্রদান করেন না।' তাই এখানে পরোক্ষভাবে এমতো বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে যে— আমি অসৎকর্মের উপকরণগুলো তাদের সম্মুখে উপস্থিত করি। দান করি সামাজিক প্রতিপত্তি ও আরাম-আয়েশ। তখন তারা গা ভাসিয়ে দেয় বিলাসিতা ও অহমিকায়। এভাবে লিপ্ত হয়ে পড়ে অসৎকর্মে। হয় অবাধ্য।

কোনো কোনো আলেম 'আমারনা' কথাটির অর্থ করেছেন— 'কাছছারনা' অর্থ আমি ওই বস্তুকে বেশী করে দিয়েছি। 'ফাআমুরা' অর্থ, অতঃপর তা বেশী হয়ে গেলো। হাদিস শরীফে এসেছে— 'খইরুল মালি সাক্‌কাতুন্‌ মা'বুরাতুন্‌ ওয়া মুহ্‌রাতুন্‌ মামূরাতুন'। এখানে 'সাক্‌কাতুন্‌' অর্থ খেজুর বৃক্ষের সারি। গাছের সারি। 'মাবুরাতুন' অর্থ সমান, সমতল বা শুদ্ধ। 'মুহ্‌রাতুন্‌' অর্থ অশ্বশাবক। আর 'মামুরাতুন' অর্থ অধিক সন্তান প্রসবিনী। এভাবে হাদিসটির অর্থ দাঁড়ায়—উত্তম সম্পদ হচ্ছে সমমাপের সারিবদ্ধ খেজুর গাছ এবং ওই অশ্বিনী অথবা নারী, যারা অধিক সংখ্যক শাবক অথবা সন্তানের জন্ম দেয়।

সম্রাট হেরাক্লিয়াসের দরবারে আবু সুফিয়ান বলেছিলো, 'লাক্বদ্‌ আমারা আমরাব্‌না আবী কাব্‌ছাতা'। কথাটির অর্থ— আবু কাবছাহ্‌র (আবদুল্লাহ্‌র) পুত্রের (মোহাম্মদের) কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে তার মর্যাদা।

এক লোক একবার রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, 'মালিইয়া আরা আম্‌রাকা ইয়ামুরু' (আমি দেখছি, আপনার প্রভাব-বলয় ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছে)। রসুল স. বললেন, 'ওয়াল্লহি লা ইয়া'মুরান্‌না আ'লা মা তারা' (আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা যা দেখছো, তা আরো অধিক বিস্তৃত হবে)।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, মূর্খতার যুগে আমরা বলতাম, 'কুদ্‌ আমারা বানু ফুলানিন্‌ ফুলানুন্‌' (অমুক অমুক গোত্রের জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে)। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'আমারা' (দীর্ঘস্বর আলিফ সহযোগে) ও 'আমারা' শব্দ দু'টো সমঅর্থসম্পন্ন। এ দু'টোর অর্থ— তার বংশ ও পশুপালের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে।

এক পরিভাষা অনুসারে 'উমিরা উমারাতান্‌' অর্থ— অমুক ব্যক্তিকে জননেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সম্ভবতঃ আলোচ্য আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থেই । যদি তাই হয়, তবে এখানে বক্তব্যবিষয়টি হবে এরকম— আমি ওই জনপদের আরামপ্রিয় লোকদেরকে বানিয়েছি সেখানকার জননেতা। এরপর 'মুত্‌রাফীনা' শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে একারণে যে, জনতার উপর ওই সকল নেতারা অত্যধিক প্রভাবশালী হয়। নির্বুদ্ধিতা ও অসৎকর্মের ব্যাপারেও তারা হয়ে ওঠে অন্যাপেক্ষা অধিক দুর্বিনীত ও দৃঢ়।

এরপর বলা হয়েছে—'অতঃপর তার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সংগত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।' এ কথার অর্থ— পাপে নিমজ্জিত ওই জনপদের অধিবাসীকে আমি তখন ধ্বংস করে দেই। কারণ তারা তখন হয়ে যায় ধ্বংসের উপযোগী।

উম্মত জননী হজরত উম্মে হাবীবা থেকে বোখারী উল্লেখ করেছেন, উম্মত জননী হজরত জয়নব বিনতে জাহাশ বলেছেন, একবার রসুল স. ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমার কাছে এসে বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)। আরববাসীদের জন্য দুঃসংবাদ। এরপর তিনি স. হাতের বৃদ্ধাংগুলি ও তর্জনী একত্র করে একটি বৃত্ত নির্মাণ করে বললেন, ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায় তাদের প্রাচীরের এতোটুকু অংশ ক্ষয় করতে সমর্থ হয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আরববাসীদের মধ্যে তো অনেক ভালো লোকও রয়েছে। তারাও কি বিনাশপ্রাপ্ত হবে? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। অসদাচরণ ও অপবিত্রতা যদি বৃদ্ধি পায়, তবে তো তারা বিনাশপ্রাপ্ত হবেই।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'নুহের পর আমি কতো মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি!' একথার অর্থ— আমি নবী নুহের তিরোধানের পরের যুগের অনেক অবাধ্য জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। যেমন, আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়।

কথাটির মাধ্যমে মক্কার মুশরিকদেরকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। যেনো বলা হয়েছে— হে মক্কার অংশীবাদী জনতা! অংশীবাদিতাকে পরিহার করে এখনো যদি তোমরা সত্যধর্ম ইসলামকে গ্রহণ না করো, তবে তোমাদেরকেও বিনাশ করা হবে। যেমন বিনাশ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের অংশীবাদীদেরকে।

এখানে 'ক্বুর্‌ন্' অর্থ যুগ বা যামানা। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, আরববাসীরা বলে, হুয়া আ'লা ক্বারনী (সে আমার সমবয়সী বা একবয়সী)। এভাবে কোনো ক্বুর্‌ন্ বা যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে— ওই যুগের সকল লোক শেষ হয়ে যাওয়া। একজনও অবশিষ্ট না থাকা। কামুস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার অর্থ— ওই সময়ের সকল মানুষের মৃত্যু হওয়া। একজনও বেঁচে না থাকা।

আমি বলি, 'ক্বুরনে সাহাবা' শেষ হওয়ার অর্থ সকল সাহাবীর পরলোকগমন করা এবং 'ক্বুর্‌নে তাবেঈন' শেষ হওয়ার অর্থ পৃথিবীতে কোনো তাবেয়ী (যিনি এক বা একাধিক সাহাবীকে দেখেছেন), জীবিত না থাকা। কেউ কেউ বলেন, 'ক্বুর্‌নে' অর্থ কোনো যুগ বা কালের একটি নির্দিষ্ট সময়। ওই নির্দিষ্ট সময়ের পরিসর কতখানি সে সম্পর্কে বহু মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন দশ বছর, আবার কেউ কেউ বলেছেন, বিশ/তিরিশ/চল্লিশ/পঞ্চাশ/ষাট/সত্তর/আশি অথবা একশ' বিশ বছর। কামুস রচয়িতা এরকমই লিখেছেন।

মাফকুদুল খবর বা নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্য অপেক্ষার সময়সীমা সম্পর্কে হানাফীগণ বলেছেন— নব্বই বছর। অর্থাৎ নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্য এক 'ক্বুর্‌নে' বা নব্বই বছর অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, 'ক্বুর্‌ন' অর্থ এক শতাব্দী। মোহাম্মদ বিন কাসেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন তাসতার মাজানী বলেছেন, রসুল স. আমার মাথায় হাত রেখে বলেছেন, এই ছেলেটি এক ক্বুর্‌ন জীবিত থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন আমরা তার বয়সের হিসাব রাখছিলাম। শেষে দেখা গেলো, তিনি পরলোকগমন করলেন একশ' বছর বয়সে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকই তাঁর দাসদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।' একথার অর্থ— মানুষ তার পাপকর্মকে গোপন রাখতে চায়। কিন্তু একথা কেনো বোঝেনা যে, আল্লাহ্‌তায়ালা সকলের ও সকল কিছুর আদি-অন্ত, প্রকাশ্য-গোপন সবকিছুই জানেন। কারণ তাঁর দর্শন ও পর্যবেক্ষণ সর্বত্রগামী। তিনি যে সর্বজ্ঞ।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۞ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ۞ كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۭ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ۞ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۭ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ۞ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ۔

❒ কেহ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করিলে আমি যাহাকে যাহা ইচ্ছা সত্বর দিয়া থাকি; পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেথায় সে প্রবেশ করিবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হইতে দূরীকৃত অবস্থায়।

❒ যাহারা বিশ্বাসী হইয়া পরলোক কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাহাদিগেরই চেষ্টা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

❒ তোমার প্রতিপালক তাঁহার দান দ্বারা ইহাদিগকে ও উহাদিগকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত।

❒ লক্ষ্য কর, আমি কীভাবে উহাদিগের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম, পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর ।

❒ আল্লাহের সহিত অপর কোন ইলাহ্ স্থির করিও না; করিলে, নিন্দিত ও নিঃসহায় হইয়া পড়িবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি।' একথার অর্থ— যারা পৃথিবী-পূজক, তাদের কাংখিত বস্তুসমূহ আমি এই পৃথিবীতেই কিছু কিছু দিয়ে থাকি। তাদের সকল আকাংখা তো আমি পূরণ করতে বাধ্য নই। সুতরাং যাকে যেভাবে যতটুকু দিতে আমি ইচ্ছা করি, সে সেভাবে ততটুকুই পায়। এখানে 'মা নাশাউ' অর্থ— যাকে যা ইচ্ছা। আর 'লিমান্ নুরীদু' অর্থ— আমি যাকে ইচ্ছা করি অর্থাৎ তাই বলে সবারই আকাঙ্খা পূরণ করা হয় না।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি, যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ থেকে দূরীভূত অবস্থায়।' একথার অর্থ— ওই সকল পৃথিবী-পূজকদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জাহান্নাম। সেখানে তাদেরকে প্রবেশ করাবো লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও রহমত-বঞ্চিত অবস্থায়।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাসী হয়ে পরলোক কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।' একথার অর্থ— যারা এক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী আল্লাহ্র প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসকে হৃদয়ে লালন করে তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ যথাপ্রতিপালনে সতত যত্নবান থাকে, তাদের চেষ্টাই হয় ফলপ্রসূ। আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে তাঁর প্রিয়ভাজন হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাদের পুণ্য প্রচেষ্টার যথা বিনিময় দান করেন। এখানে 'মাশ্কুরা' বা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শোকর কথাটির অর্থ— তাদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা তাদের সৎকর্মসমূহের যথাবিনিময় বা সওয়াব দান করেন।

এর পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক তার দান দ্বারা এদেরকে ও ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনুন, পৃথিবীতে প্রদত্ত আমার রহমত সার্বজনীন। আমি পার্থিব কল্যাণ দান করি বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলকে। আমার পার্থিব ধনভাণ্ডার সকলের জন্য অবারিত। এখানে 'হাউলায়ি ওয়া হাউলায়ি মিন আত্বায়ি রব্বিক' অর্থ এদেরকে ও ওদেরকে অর্থাৎ সকলকে আল্লাহ্ দান করেন বা সাহায্য করেন। আর এখানে 'কুল্লা' শব্দটির অর্থ সকলকে। শব্দটির 'তান্ভীন' নেয়া হয়েছে সম্বন্ধ পদের পরিবর্তে এবং 'আতা' শব্দটি এখানে ধাতুমূল এবং এর অর্থ— 'আতিয়্যাহ্' (সাহায্য বা দান)।

এর পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'লক্ষ্য করো, আমি কীভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! পর্যবেক্ষণ করুন কীভাবে পৃথিবীতে আমি কখনো বিশ্বাসীদেরকে, আবার কখনো অবিশ্বাসীদের পরস্পরকে পরস্পরের উপরে উপজীবিকা, সৌন্দর্য ও সুস্থতায় প্রভাবশালী করে দেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর।' একথার অর্থ— আরো লক্ষ্য করুন হে আমার প্রিয়তম রসুল! আখেরাতের মর্যাদাই প্রকৃত মর্যাদা। পার্থিব অর্জন তো সাময়িক ও ভঙ্গুর। আর পরকালের প্রাপ্তি চিরস্থায়ী, অক্ষয়। সুতরাং পরকাল নিশ্চয় মর্যাদায় ও মহিমায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর।

এর পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র সঙ্গে অপর কোনো ইলাহ্ স্থির কোরোনা; করলে নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি সকল মানুষকে বলুন, তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে অপর কোনো

উপাস্যকে নির্বাচন কোরো না। যদি করো, তবে তোমরা হয়ে পড়বে লাঞ্ছিত ও সাহায্যহীন। উল্লেখ্য যে, এখানে রসুল স.কে সরাসরি সম্বোধন করে শিরিক না করার যে নির্দেশটি দেয়া হয়েছে, তা প্রযোজ্য হবে সকল মানুষের প্রতি। কারণ রসুল স. এর সঙ্গে শিরিকের সম্পর্ক চিরতিরোহিত। অর্থাৎ তাঁর পক্ষে শিরিক করা সম্ভবই নয়। এখানে 'ফাতাক্বউদা' একটি বাগধারা। এর অর্থ— করলে বা হয়ে গেলে। যেমন আরববাসীরা বলে 'শাহাজাশ্ শাফরাতা হাত্তা ক্বায়াদাতা কাআন্নাহা হারবাতুন' (সে তার অস্ত্রকে শানিত করেছে, ফলে তা হয়ে গিয়েছে ক্ষুদ্র বল্লমের মতো)। অথবা 'ফাতাক্বউদা' অর্থ এখানে অক্ষম বা নিরুপায় হয়ে যাওয়া। যেমন বলা হয় 'ক্বাআদা আনিশ্ শাই' (সে ওই বিষয়ে অক্ষম)।

'মাজমুমান' অর্থ ফেরেশতা ও মুমিনগণ কর্তৃক নিন্দিত। আর 'মাখজুলান' অর্থ সহায়হীন বা নিঃসহায়।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۝ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ۝

❑ তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। উহাদিগের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় থাকাকালে বার্ধক্যে উপনীত হইলেও উহাদিগকে বিরক্তিসূচক কিছু বলিও না এবং উহাদিগকে ভর্ৎসনাও করিও না; উহাদিগের সহিত বলিও সম্মানসূচক নম্র কথা ।

❑ অনুকম্পায় উহাদিগের প্রতি বিনয়াবনত থাকিও এবং বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক' উহাদিগের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে উহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।'

❒ তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের অন্তরে যাহা আছে তাহা ভাল জানেন; তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হইলে যাহারা সতত আল্লাহ্ অভিমুখী আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি ক্ষমাশীল।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে।' শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে 'ক্বদ্বা'। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য বিষয়টি একটি অকাট্য বিধান— যা অবশ্যপালনীয়। এখানে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত নিষিদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে পিতামাতার প্রতি উত্তম আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, হাসান ও রবী বিন আনাস সে কারণেই এই নির্দেশটিকে বলেছেন কেত্য়ী (অকাট্য)। প্রত্যেক পিতা-মাতার মাধ্যমেই বাস্তব জগতে মানব-অস্তিত্ব পায়, আবার বেড়েও ওঠে তাঁদেরই প্রত্যক্ষ স্নেহসিক্ত লালন-পালনের মাধ্যমে। তাই তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রদর্শনকে করা হয়েছে অত্যাবশ্যক।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় থাকাকালে বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বোলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনাও কোরো না; তাদের সঙ্গে বোলো সম্মানসূচক নম্র কথা।' এখানে 'ইন্দাকা' অর্থ তোমাদের জীবদ্দশায় থাকাকালে, বা তোমাদের প্রতিপালনের দায়িত্বে বা রক্ষণাবেক্ষণে থাকাকালে। 'উফ' অর্থ অশোভন, শ্রুতিকটু বা বিরক্তিসূচক শব্দ । অথবা 'উফ' শব্দটি এখানে ক্রিয়াপদ। অর্থাৎ সংকীর্ণমনা হয়ে যাওয়া। আবু উবায়দা বলেছেন, 'উফ' এবং 'তুফ' এর আভিধানিক অর্থ— ওই ময়লা বা আবিলতা যা জমে থাকে আঙ্গুলের অগ্রভাগে। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'উফ' অর্থ নখ কেটে ফেলা। অর্থাৎ যে আঙ্গুলে ময়লা লেগেছে, সেই আঙ্গুলটি কর্তন করা। অথবা নখ বা আঙ্গুলের ময়লা। কিংবা ওই কাষ্ঠখণ্ড বা বংশদণ্ড, যা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে মাটি থেকে। 'কম' বা 'ন্যূন' অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ অবজ্ঞা, অবহেলা বা উপেক্ষাসূচক এতোটুকু কথাও তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি প্রয়োগ কোরো না, যা তাদের মনোক্ষুণ্নতার কারণ হয়। এভাবে পিতা-মাতার প্রতি ন্যূনতম অসদাচরণকে হারাম করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তাদের প্রতি অধিক অসদাচরণ যে হারাম, তা বলাই বাহুল্য।

'লা তানহারহুমা' অর্থ তাদেরকে ভর্ৎসনাও কোরো না। আর 'ক্বওলান কারীমা' অর্থ সম্মানসূচক নম্র কথা বা ভক্তিমূলক বিনম্র আচরণ। ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, অপরাধী বালক যেমন রূঢ়স্বভাব বিশিষ্ট অভিভাবকের সামনে অবনত

মস্তকে কথা বলে, পিতামাতার সঙ্গে কথা বলতে হবে সেভাবে। মুজাহিদ বলেছেন, বার্ধক্যগ্রস্ত পিতা-মাতাকে ঘৃণা কোরো না। তোমাদের শিশুকালে তাঁরা যেমন তোমাদের মলমূত্র পরিষ্কার করে দেন, তেমনি করে প্রয়োজন হলে তোমরাও তাঁদের মলমূত্র পরিষ্কার করে দিয়ো এবং একাজে কোনো অনাগ্রহ ও ঘৃণা প্রকাশ কোরো না। আর তাদেরকে লক্ষ্য করে 'উহ্' 'আহ্'— এ ধরনের কোনো বিরক্তি উদ্রেককারী কথাও বোলো না।

পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো।' এখানকার 'ওয়াখ্‌ফিদ্ব জানাহাকা' হচ্ছে একটি আরবী বাগধারা। এর শাব্দিক অর্থ— তোমার ডানা অবনত করো। আর এখানে এর মর্মার্থ— বিনয়াবনত থেকো। হজরত ওরওয়াহ্ বিন যোবায়ের আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এরকম— তাদের প্রতি বিনম্র হও এবং যত্নবান হও তাদের অভিপ্রায় পূরণে।

'মিন্‌রহ্‌মাতি' অর্থ অনুকম্পায় বা অনুরাগবশতঃ। অর্থাৎ যে গভীর স্নেহমমতায় তারা তোমাদেরকে প্রতিপালন করেছেন, সেই স্নেহমমতার কথা মনে করে তোমরা তাদের প্রতি বিনম্র হয়ো। স্মরণ কোরো আজ যেমন তারা তোমাদের মুখাপেক্ষী, এরচেয়েও বেশী তাদের মুখাপেক্ষী ছিলে তোমরা শিশুকালে। এ কথা ভেবে তোমরা তাদের প্রতি প্রদর্শন কোরো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বোলো, হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া করো, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' এ কথার অর্থ— তোমরা তাঁদের জন্য দোয়া কোরো এভাবে, হে আমাদের প্রভুপালয়িতা! আমার বাল্যবেলায় আমার পিতামাতা যেভাবে আদরযত্নে আমাকে মানুষ করেছেন, তেমনি তুমি তাদের প্রতি তোমার বিশেষ রহমত বর্ষণ করো। পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে। বাগবী লিখেছেন, পিতামাতা যদি মুসলমান হন, তবেই কেবল তাঁদের জন্য এরকম দোয়া করা যাবে। মুসলমান না হলে তাদের জন্য এরকম দোয়া করা যাবে না। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য এটা অসমীচীন যে, তারা অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।' হজরত ইবনে আব্বাস অবশ্য বলেছেন, এই আয়াত দ্বারা আলোচ্য আয়াতটি রহিত হয়েছে।

বায়যাবী লিখেছেন, 'আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক'— এরকম দোয়া সকলের জন্য করা যায়। অতএব মুমিন ও কাফের উভয় প্রকার পিতামাতার জন্য দোয়া করা যাবে। অর্থাৎ এরকম বলা যাবে— হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার পিতামাতাকে ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক দান করো। আর নিঃসন্দেহে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক বা যোগ্যতা আল্লাহ্‌র রহমত।

হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পিতা হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশের দরজা। এখন তোমরা ভেবে দেখো, জান্নাতের দরজা রক্ষা করবে, না নষ্ট করে ফেলবে। যথাসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও হাকেম। হাকেম হাদিসকে আরো বিশুদ্ধ আখ্যায়িত করেছেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পিতার প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতার উপরে আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতা নির্ভরশীল। তিরমিজি, হাকেম।

হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বায্যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দানের পর গ্রহিতাকে খোঁটাদানকারী, মদ্যপায়ী ও পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান কখনো বেহেশতে প্রবেশ করবে না। নাসাঈ ও দারেমী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তির নাসিকা ধূলিধূসরিত হোক, আমার নাম শুনেও যে দরুদ পাঠ করে না। আর ওই ব্যক্তির নাকও মৃত্তিকামর্থিত হোক, যে রমজান মাস পেয়েও নিজেকে পাপমুক্ত করতে পারলো না এবং ওই ব্যক্তির নাসারন্ধ্রও ধূলিমলিন হোক, যে তার পিতা-মাতার একজনকে অথবা উভয়কে পেয়েও তাদের সেবা-যত্ন করে বেহেশতে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করতে পারলো না। অন্য বর্ণনায় কথাটি এসেছে এভাবে— যার বৃদ্ধ পিতা-মাতা তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারলো না। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বাগবী, তিরমিজি ও হাকেম হাকেম হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার এক ব্যক্তি রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! জনক-জননীর প্রতি সন্তানের করনীয় কী? রসুল স. বললেন, তারাই তোমার বেহেশত এবং তারাই তোমার দোজখ। ইবনে মাজা। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধানানুসারে তার জনয়িতা-জনয়িত্রীর প্রতি প্রত্যুষে আনুগত্য প্রকাশ করে, তার জন্য বেহেশতের দু'টি দরজা খুলে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি তার জনয়িতা-জনয়িত্রী যে কোনো একজনের সঙ্গে এরকম করে, তার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় বেহেশতের একটি দরজা। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করে, তাদের দু'জনের সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করে, তার জন্য খুলে দেয়া হয় দোজখের দু'টি দরজা। আর তাদের যে কোনো একজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে দোজখের দরজা খুলে দেয়া হয় একটি। জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! যদি তার পিতা-মাতা তার হক নষ্ট করে? রসুল স. বললেন, হক নষ্ট করলেও। তার প্রতি জুলুম করলেও। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. বললেন, পিতা-মাতার বাধ্যগত সন্তান যদি তার পিতা-

মাতার মুখমণ্ডলের প্রতি মহব্বতের নজরে তাকায়, তবে তাকে দেয়া হয় একটি কবুল হওয়া হজের সওয়াব। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! যদি সে এভাবে প্রতিদিন একশত বার তাকায়? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। তবে আল্লাহ্পাক তার চেয়েও মহান ও পবিত্র। হজরত আবু বকর সিদ্দীক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার যে কোনো গোনাহ্ ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য যারা, তাদেরকে তিনি মাফ করবেন না। এই অবাধ্যতার শাস্তি তাদেরকে দুনিয়াতেও দেয়া হবে। বায়হাকীও এই তিনটি হাদিস উল্লেখ করেছেন তাঁর শো'বুল ইমান নামক গ্রন্থে। আর এই ত্রয়ি হাদিসের প্রথমটি ইবনে আসাকেরের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে।

শিথিলসূত্রে হজরত আবু বকরাহ্ থেকে তিবরানী ও হাকেম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষের যে কোনো পাপ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তার শাস্তি অথবা মার্জনা প্রলম্বিত করতে পারেন মহাবিচারের দিবস পর্যন্ত। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানদেরকে তিনি ক্ষমা করবেন না। পিতা-মাতার প্রতি দুর্ব্যবহারের শাস্তি পৃথিবী থেকেই দেয়া শুরু হয়। মৃত্যুর পূর্বেই।

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা ভালো জানেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, তোমরা তোমাদের জনক-জননী সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করো তা-ও আল্লাহ্ জানেন। একথার মাধ্যমে মানুষকে এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেনো তাদের পিতা-মাতাদের সম্পর্কে অন্তরে অন্তরেও উপেক্ষা অথবা অবহেলার ভাব লালন না করে। কথাটির অর্থ এরকম যে, হে মানুষ! সাবধান! তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি আচরণজনিত অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আল্লাহ্তায়ালা সম্যক অবগত। অতএব কেউ যদি আল্লাহ্পাকের পরিতোষ ও পুণ্যলাভের আশায় তার পিতা-মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে, তবে আল্লাহ্পাক তার যথাবিনিময় দান করবেন। আর যদি পার্থিব লাভা-লাভের আশায়, অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কেউ তার পিতা-মাতার সঙ্গে বাহ্যিকভাবে শুভ আচরণ প্রদর্শন করে, তবে সে প্রতিফল পাবে তার নিয়ত অনুসারে।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হলে যারা সতত আল্লাহ্ অভিমুখী, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল।' একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমরা যদি সৎকর্মপরায়ণ হও এবং তোমাদের উদ্দেশ্য হয় সতত আল্লাহ্র পরিতোষাভিমুখী, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে মার্জনা করবেন। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যারা শুভ উদ্দেশ্য বিশিষ্ট হৃদয়ের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অনবধানতাবশতঃ অকস্মাৎ যদি তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে কচিৎ কখনো শিষ্টাচার বিরোধী আচরণ করে ফেলে, তবে আল্লাহ্ তাদেরকে অভিযুক্ত করবেন

না। এরকমও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনাটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। আর এর মর্মার্থ হচ্ছে— কেউ যদি তার পিতা-মাতার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করার পর লজ্জা ও অনুতাপ সহকারে তওবা করে, তবে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। তাকে ক্ষমা করে দেন।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, এখানে 'আওয়াব' বলে বুঝানো হয়েছে ওই ব্যক্তিকে, যে পাপ করার পর যথাবিধি তওবা করে। এভাবে পুনঃপুনঃ পাপ করলেও প্রতিবারই সে আন্তরিকভাবে তওবা করে। তিনি আরো বলেছেন, কল্যাণের দিকে পুনঃপুনঃ ধাবিত ব্যক্তিকেই বলে 'আওয়াব'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আওয়াব' ওই ব্যক্তি, যে প্রতিটি বিপদ ও বিবর্তনের সময় আল্লাহ্ অভিমুখী হয়। তিনি আরো বলেছেন, 'আওয়াবিন' অর্থ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনাকারী। কেননা আল্লাহ্‌পাক এক স্থানে পাহাড়কে লক্ষ্য করে বলেছেন— 'ইয়া জিবালু আওবিবী'(হে পর্বত! আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করো)। কাতাদা বলেছেন, 'আওয়াব' অর্থ নামাজী।

আউফ উকাইলী বলেছেন, 'আওয়াব' বলে চাশ্‌ত নামাজ পাঠকারীকে। হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বাগবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একবার কোবা মসজিদে চাশ্‌তের নামাজ পড়লেন। তারপর বেরিয়ে এসে বললেন, এটা হচ্ছে আওয়াবীনের নামাজ। আহমদ ও মুসলিম। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন— আবদ ইবনে হুমাইদ এবং সিব্‌ওয়াইহ্। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ পাঠ করে, তাকে রহমতের ফেরেশতারা পরিবেষ্টন করে রাখে। এই নামাজের নামই আওয়াবীন নামাজ।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ২৬, ২৭

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝

❒ আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তাহার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও, এবং কিছুতেই অপব্যয় করিও না।

❒ যাহারা অপব্যয় করে তাহারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তাহার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য।' একথার অর্থ— আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, তাদের সঙ্গে করবে আপনজনোচিত ব্যবহার। অধিকাংশ তাফসীরকার এরকমই বলেছেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, উপার্জনে অক্ষম পুরুষ, বিধবা, এতিম, অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও অসহায় আত্মীয়-স্বজনের ভরণ পোষণ করা ধনী ব্যক্তির একটি অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। সূরা বাকারার 'ওয়া আ'লাল ওয়ারিছি মিছলু জালিকা' আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

বাগবী লিখেছেন, ইমাম জয়নুল আবেদীন বলেছেন, এখানে 'কুরবা' বা আত্মীয়-স্বজন বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর আত্মীয়-স্বজনকে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— তোমরা তোমাদের রসুলের আত্মীয়-স্বজনের যথাপ্রাপ্য পরিশোধ করো। অর্থাৎ তাদের প্রতি অন্তরে ও আচরণে লালন করো শ্রদ্ধা ও প্রদর্শন করো ভক্তি ও ভালোবাসা। ইবনে আবী হাতেম এবং সুদ্দীও এরকম বলেছেন।

তিবরানী প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, 'আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য' এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. তাঁর প্রিয় পুত্রী হজরত ফাতেমাকে ডেকে এনে দান করলেন খায়বরের একখণ্ড ভূমি (ফিদাক)। ইবনে মারদুবিয়াও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাছীর লিখেছেন, বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলে মেনে নেয়া কঠিন। কারণ বর্ণনাটি সঠিক হলে বলতে হয় আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। খায়বর বিজিত হয়েছিলো হিজরতের অনেক পরে। কিন্তু প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, এই আয়াতটির অবতরণস্থল মক্কা। আমি বলি, প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা এই যে, ফিদাক চেয়েছিলেন হজরত ফাতেমা স্বয়ং। কিন্তু রসুল স. তাঁর প্রিয় আত্মজার ওই আবেদন মনজুর করেননি। ওমর ইবনে আবদুল আজিজও এরকম বলেছেন, যদি রসুল স. তাঁর প্রিয় কন্যা হজরত ফাতেমাকে দান করতেন, তবে খোলাফায়ে রাশেদীন, বিশেষ করে হজরত আলী এ ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করতেন না। আল্লাহ্পাকই সমধিক পরিজ্ঞাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও।' সুরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং কিছুতেই অপব্যয় কোরো না।' একথার অর্থ— কিছুতেই তোমাদের অর্থ-সম্পদ পাপ পথে ব্যয় কোরো না। মুজাহিদ বলেছেন, যদি কেউ তার সহায়-সম্পত্তি পুণ্যপথে খরচ করে ফেলে, তবে তাকে অপচয় বলা যায় না। কিন্তু পাপপথে এক কপর্দক ব্যয় করলেও তা হবে অপচয় বা অপব্যয়। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, অসৎপথে অর্থ ব্যয়ের নামই অপচয়।

শো'বা বর্ণনা করেছেন, আমি একবার আবু ইসহাকের সঙ্গে কুফার এক রাস্তা অতিক্রম করছিলাম। একস্থানে দেখলাম চুন ও পাকা ইট নির্মিত একটি অতি মজবুত প্রাচীর। আবু ইসহাক পাকা প্রাচীরটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের অভিমতানুসারে এটা অপচয়। অনাবশ্যক অর্থ ব্যয়ই অপচয়।

পরের আয়াতে (২৭)বলা হয়েছে— 'যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই।' একথার অর্থ অপচয়কারীরা অযথার্থ কর্মের দিক দিয়ে শয়তানের মতোই। বাগবী লিখেছেন, যে ব্যক্তি ভিন্ন গোত্রের রীতিনীতি অনুসরণ করে সে ওই গোত্রভূতদের ভ্রাতৃতুল্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।' একথার অর্থ— শয়তান সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, আল্লাহ্র নেয়ামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী। তাই তার আনুগত্য নিষিদ্ধ।

তাত্ত্বিকগণ বলেছেন, প্রাপ্ত নেয়ামত দাতার সন্তোষের অনুকূলে ব্যয় করাই কৃতজ্ঞতা। আর দাতার সন্তোষের বিপরীতে খরচ করার নাম অকৃতজ্ঞতা। এরকম খরচকারীরা অপব্যয়ী। আর অপব্যয়ীরা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ।

সাঈদ ইবনে মানসূরের বর্ণনায় এসেছে, আতা খোরাসানী বলেছেন, একবার এক জেহাদের প্রাক্কালে মুযাইনা গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধগমনের জন্য বাহন প্রার্থনা করলেন। রসুল স. বললেন, সেরকম কিছুতো এখন আমার কাছে নেই। লোকগুলো বিফলমনোরথ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলো। তাদের ধারণা হলো নিশ্চয় রসুল স. আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন। তাই তিনি আমাদেরকে বাহন দান করলেন না। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ২৮

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

❑ এবং তুমি নিজেই যখন তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সম্পদ লাভের প্রত্যাশায় উহার সন্ধানে থাক তখন উহাদিগকে যদি বিমুখই কর উহাদিগের সহিত নম্রভাবে কথা বলিও;

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আমার কাছে সম্পদ প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে সময়াতিপাত করার সময় যদি কেউ আপনার নিকটে প্রার্থী হয়, তবে নম্রভাবে তাদের প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। তাহলে তারা মনোকষ্টে পতিত হবে না। এখানকার 'মাইসূরা' কথাটি এসেছে 'ইয়াসারাল আমরু' থেকে।

বাগবী লিখেছেন, এখানে 'নম্রভাবে কথা বোলো' অর্থ, হে আমার রসুল! বিনম্র বচনে তাদের সঙ্গে এই মর্মে অঙ্গীকার করুন যে, আল্লাহ্ যখন সঙ্গতি দান করবেন, তখন অবশ্যই আমি তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করবো। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্পাক যেনো উদ্ভূত সমস্যার সহজ সমাধান দেন, এইমর্মে দোয়া করাই আলোচ্য নির্দেশনাটির লক্ষ্য। যেনো এখানে বলা হয়েছে, হে আমার রসুল! আপনি প্রার্থনা উপস্থাপন করুন এভাবে— আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের অভাব মোচন করুন। দয়া করে আমাদেরকে দান করুন প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ।

সাঈদ ইবনে মানসূরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাইয়্যার বিন আবীল হাকাম বলেছেন, একবার রসুল স. এর পবিত্র অঙ্গনে উপস্থিত হলো এক কাপড় বিক্রেতা। রসুল স. ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানবীর। তিনি কাপড়গুলো কিনে নিয়ে উপস্থিত লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। পরে যারা এলো, তারা আর কিছুই পেলো না। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ২৯, ৩০

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

❑ তুমি বদ্ধমুষ্টি হইও না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হইও না; হইলে, তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হইবে।

❑ তোমার প্রতিপালক যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা হ্রাস করেন; তিনি তাহার দাসদিগকে ভালভাবে জানেন ও দেখেন।

এখানকার 'ইয়াদাকা মাগলূলাতান ইলা উনুকিকা' কথাটি একটি আরবী বাগধারা। কথাটির শাব্দিক অর্থ— গ্রীবাদেশে হস্ত-আবদ্ধ করে রেখো না। আর প্রকৃত অর্থ— বদ্ধমুষ্টি বা কৃপণ হয়ো না। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি কৃপণ ও অমিতব্যয়ী কোনোটাই হবেন না। চলবেন এতোদুভয়ের মাঝামাঝি। এরকম সুসমঞ্জস অবস্থাই আপনার জন্য প্রশংসনীয় ও একান্ত শোভন। কার্পণ্য ও অমিতাচার মানুষকে যেমন নিন্দিত করে, তেমনি করে দেয় নিঃস্ব।

হজরত ইবনে মাসউদ এর উদ্ধৃতিতে ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবুদল্লাহ্ বলেছেন, একবার এক যুবক রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রসুল! আমার মা আপনার নিকটে খাদ্য, বস্ত্র ও কিছু নগদ অর্থ চেয়েছেন। রসুল স. বললেন, এখন যে আমার কাছে কিছুই নেই। যুবক বললো, আমার আম্মা বলে দিয়েছেন, কিছু না থাকলে আপনি যেনো আপনার গায়ের জামাটি দান করেন। রসুল স. তৎক্ষণাৎ তাঁর গায়ের জামাটি খুলে তাকে দিয়ে দিলেন। তারপর গৃহাঙ্গণে প্রবেশ করলেন অনাবৃত শরীরে। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। মিনহাল বিন আমর সূত্রে ইবনে আবী হাতেমও এরকম বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত আবু উমামা বলেছেন, রসুল স. তাঁর প্রিয়তমা ভার্যা হজরত আয়েশাকে একবার বললেন, হে আয়েশা! যা কিছু পাও, সঙ্গে সঙ্গে খরচ করে ফেলো। উম্মত-জননী আয়েশা বললেন, তাহলে তো একেবারে নিঃস্ব হয়ে যেতে হবে। তাঁদের এমতো কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

হজরত জাবের থেকে বাগবী লিখেছেন, একবার এক কিশোর রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার জননী আপনার কাছে একটি পরিধেয় বস্ত্র চেয়েছেন। রসুল স. বললেন, মনে হয় শীঘ্রই আমার কাছে কিছু কাপড় আসবে। সুতরাং তুমি পরে এসো। কিশোরটি চলে গেলো। একটু পরেই পুনরায় হাজির হয়ে বললো, আমার মা আপনার গায়ের জামাটিই দিতে বলেছেন। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে গায়ের জামাটি খুলে কিশোরটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে পরিধেয়হীন হওয়ার কারণে তিনি ঘরের মধ্যে আটকে রইলেন। নামাজের সময় হলো। হজরত বেলাল এসে আজান দিলেন। নামাজের জন্য মসজিদে সমবেত হলেন সাহাবীগণ। রসুল স. এর আগমন বিলম্বিত হচ্ছে দেখে কেউ কেউ অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলেন রসুল স. এর প্রকোষ্ঠে। দেখলেন, তিনি খালি গায়ে বসে আছেন। এই ঘটনাকে লক্ষ্য করে তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের অন্তর্নিহিত বক্তব্য এরকম, হে আমার রসুল! পুণ্যকর্মে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে আপনি ওই লোকের মতো হবেন না, যার হাত বাঁধা রয়েছে তার গ্রীবাদেশের সঙ্গে। অর্থাৎ যে ব্যয়কুণ্ঠ বা কৃপণ। আবার ওই ব্যক্তির মতোও হবেন না, যে সম্পূর্ণরূপে মুক্তহস্ত বা অপচয়কারী। অর্থাৎ যে অপচয় করার কারণে নিজের পরিবারবর্গের ও আত্মীয়-স্বজনের হক পরিপূরণ করতে ব্যর্থ হয়।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'বদ্ধমুষ্টি হয়ো না' বলে কার্পণ্যকে এবং 'একবারে মুক্তহস্ত হয়ো না ' বলে অতিরিক্ত ও অযথার্থ ব্যয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে অবলম্বন করতে বলা হয়েছে মধ্যম পন্থাকে। অর্থাৎ দানশীলতাকে।

'ফা তাকুউদা মালুমা' অর্থ নিন্দিত হবে। অর্থাৎ যদি কার্পণ্য করো, তবে হবে দুর্নামের ভাগীদার। নিন্দনীয় হবে আল্লাহর সকাশে ও মানুষের নিকটে। আর 'মাহ্সূরা' অর্থ নিঃস্ব হবে। অর্থাৎ অপব্যয় বা অতিরিক্ত ব্যয় যদি করো তবে হয়ে পড়বে কপর্দকহীন। কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— কৃপণতা ও অমিতাচার দু'টোই পরিত্যাজ্য। লজ্জা ও অনুতাপই হচ্ছে এ দু'টোর পরিণতি। তাঁর অভিমতানুসারে লজ্জা ও অনুতাপের ব্যাপারটি সম্পৃক্ত হবে কৃপণতা ও অমিতাচার দু'টোর সঙ্গেই।

এ রকমও হতে পারে যে, এখানে 'মালূমান্' (নিন্দা) কথাটি সম্পৃক্ত হবে কৃপণতা ও সংকীর্ণচিত্ততার সঙ্গে। আর 'মাহ্সূরা' (নিঃস্বতা) কথাটি সম্পৃক্ত হবে অযথার্থ ব্যয় বা অপচয়ের সঙ্গে। এভাবে বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়াবে— সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রার্থীকে কিছু না দান করলে সে শুরু করবে নিন্দা। আর অপরিকল্পিত উপায়ে সবকিছু দান করে দিলে হতে হবে নিঃস্ব। আক্ষেপ ও লজ্জা ছাড়া তখন আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না।

পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার প্রভুপালক তাঁর ইচ্ছামতো মানুষসহ সকলপ্রাণীকে রিজিক দান করেন। আর ইচ্ছামতো তিনি কারো রিজিক বাড়িয়ে দেন। আবার কারো রিজিক দেন কমিয়ে। সুতরাং অর্থ ব্যয়কে সুসমঞ্জস করার নিমিত্তে কিছু সম্পদ হাতে রাখা হলে তা নিন্দার্হ নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি তাঁর দাসদেরকে ভালোভাবে জানেন ও দেখেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বান্দাগণের সকল অবস্থা উত্তমরূপে জানেন ও প্রত্যক্ষ করেন। তাই মানুষের যেভাবে কল্যাণ হয়, সেভাবেই তিনি বণ্টন করেন তাদের জীবনোপকরণ। আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এ রকমও হতে পারে— জীবিকার সংকোচন ও প্রসরণ ঘটে থাকে আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় ও নির্দেশানুসারে। তিনি মানুষের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাই যথাসময়ে ও যথাবিধি তিনি পূরণ করেন সকলের জীবিকার প্রয়োজন। কিন্তু অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মানুষকে অবলম্বন করতে হবে মধ্যম পন্থা। এটা তাদের দায়িত্ব। অথবা আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরকমও হতে পারে যে— হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্র বিধানানুসারে চলো। তিনি মানুষের জীবনোপকরণকে কখনো প্রসারিত করেন, আবার কখনো করেন সংকুচিত। সুতরাং তোমরাও অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে কৃপণ ও অপব্যয়ী কোনোটিই হয়ো না। অবস্থান গ্রহণ করো এতোদুভয়ের মধ্যবর্তীতে।

এরকমও হওয়া সম্ভব যে, আলোচ্য আয়াত পরবর্তী আয়াতের ভূমিকা বা মুখবন্ধস্বরপ। কারণ পরবর্তী আয়াতে দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দ্ব্যর্থহীনভাবে একথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালাই সকলের রিজিক দিয়ে থাকেন। সুতরাং রিজিকের স্বল্পতার আশংকায় সন্তান হত্যা মহাপাপ।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ۞ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ۞ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ۞

❐ তোমাদিগের সন্তানদিগকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদিগকে ও তোমাদিগকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়া থাকি। উহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।

❐ অবৈধ যৌন-সংযোগের নিকটবর্তী হইও না, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

❐ আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করিও না! কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার উত্তারাধিকারীকে তো আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়াছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্য-প্রাপ্ত হইয়াছেই।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! সন্তান প্রতিপালন করতে গিয়ে তোমরা দরিদ্র হয়ে যাবে, এই আশংকায় তোমরা তোমাদের কন্যা-সন্তানদেরকে বধ কোরো না। কারণ তাদের জীবনোপকরণ প্রদানের অধিকার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব তোমাদের নয়, আমার। আমিই তাদেরকে ও তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করে থাকি। সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করে মহাপাপী হয়ো না।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সবচেয়ে বড় পাপ কী ? তিনি স. বললেন, কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করা, অথচ আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমি

জিজ্ঞেস করলাম তারপর? তিনি স. বললেন, দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করা। আমি পুনরায় বললাম তারপর? তিনি স. বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা। বোখারী , মুসলিম।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, উহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।' আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে অবৈধ যৌন চরিতার্থতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, অবৈধ যৌনাচরণ একটি ঘৃণ্য, অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। এতে করে নৈতিক ও সমাজ জীবনে সৃষ্টি হয় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা।

হজরত বুরাইদা থেকে বায্যার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী বৃদ্ধ ব্যভিচারীকে অভিসম্পাত দেয়। আর দোজখে ব্যভিচারীর লজ্জাস্থান থেকে যে দুর্গন্ধ বের হবে, ওই দুর্গন্ধে অন্যান্য দোজখবাসীও কষ্ট পাবে। হজরত আনাস থেকে আল খারাবাতি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ব্যভিচারপরায়ণ ব্যক্তি মূর্তিপূজকের মতো।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ব্যভিচারকালে ইমান বের হয়ে ব্যভিচারীর মস্তকের উপরে ঝুলতে থাকে। ব্যভিচার থেকে বিরত হলে ইমান পুনরায় প্রবেশ করে তার ভিতরে। আবু দাউদ, তিরমিজি, বায়হাকী, হাকেম।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন তার ইমান থাকে না। তেমনি চোর চুরি করার সময় ও মদ্যপায়ী মদ্যপানের সময়ও ইমান তাদের মধ্যে থাকে না।

এর পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।'এখানে 'নাফস্' শব্দটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে মুসলমান এবং জিম্মিকে (জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রাপ্ত কাফেরকে)। আর এখানে 'যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে' কথাটির অর্থ শরিয়তসম্মত দণ্ডাজ্ঞা ব্যতিরেকে। যেমন, কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা), ব্যভিচার, রাষ্ট্রদ্রোহীতা, ধর্মদ্রোহীতা, সাহাবীগণকে গালমন্দ করা ইত্যাদি ব্যতিরেকে। অর্থাৎ শরিয়তসম্মত হত্যার দণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করা নিষিদ্ধ নয়। যেমন ধর্মদ্রোহীতা সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে—'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে।' রাষ্ট্রদ্রোহীতা সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।' কিসাস সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'প্রাণের বদলে প্রাণ।'

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর রসুল' এ কথার সাক্ষ্য যে দেয়, তাকে হত্যা করা বৈধ নয়, যদি না সে হয় বিবাহিত ব্যভিচারী, হত্যাকারী ও ধর্মত্যাগী। বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ। উল্লেখ্য যে, এখানে 'ধর্মত্যাগী' অর্থ মুরতাদ হয়ে যাওয়া নয়। কারণ সে তো তখন আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' কলেমার সাক্ষ্যদাতা থাকে না। বরং এখানে 'ধর্মত্যাগী' অর্থ বেদাতী, যারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতকে পরিত্যাগ করেছে। বিদ্রোহ ঘোষণা করে হয়েছে রাফেজী, খারেজী ইত্যাদি।

হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিনে সর্বপ্রথম মীমাংসা করা হবে অযথার্থ রক্তপাতের। বোখারী, মুসলিম। হজরত বারা বিন আজীবের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কোনো মুমিনকে অবৈধভাবে হত্যার তুলনায় সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া তুচ্ছ। উত্তমসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা। বায়হাকী হাদিসটির সংগে অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন— যদি আকাশ ও পৃথিবীর সকল অধিবাসী একযোগে অবৈধভাবে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করে, তবে আল্লাহ্ তাদের সকলকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

হজরত বুরাইদা থেকে নাসাঈ উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সারা পৃথিবী ধ্বংস হওয়া কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করার তুলনায় তুচ্ছ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অর্ধেক কথা বলেও কোনো মুমিনের হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে, বিচার দিবসে তার দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে লিখা থাকবে 'আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত'। ইসপাহানী লিখেছেন, ইবনে ওয়াইনাহ্ 'অর্ধেক কথা'র ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সে 'উক্তুল্'(তাকে হত্যা করো) কথাটি পুরোপুরি উচ্চারণ করবে না, বলবে কেবল 'উক্'। হজরত ইবনে ওমর থেকে বায়হাকীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত মুয়াবিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকল পাপীকে ক্ষমা করে দিবেন, ওই ব্যক্তি ব্যতীত— যে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, অথবা কাউকে হত্যা করেছে ইচ্ছাকৃতভাবে। নাসাঈ বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। হজরত আবু দারদা থেকে আবু দাউদও এরকম হাদিস উল্লেখ করেছেন। আর ওই হাদিসের সূত্রপরম্পরাকে প্রত্যয়ন করেছেন ইবনে হাব্বান ও হাকেম।

হজরত আবু মুসা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সকাল হলেই ইবলিস তার বাহিনীকে ছেড়ে দেয় এবং বলে, আজ কোনো মুসলমানকে যে পথভ্রষ্ট করবে, আমি তার মস্তকে মুকুট পরাবো। দিবাবসানে তার বাহিনীর

সদস্যরা তাদের আপনাপন প্রতিবেদন পেশ করে। একজন বলে, আমি এক মুসলমানের পিছনে লেগেছিলাম। আমার প্ররোচনায় সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। ইবলিস বলে, হতে পারে সে হয়তো আবার বিবাহ করবে। দ্বিতীয় জন বলে, আজ আমি একজনকে তার পিতা-মাতার অবাধ্য করেছি। ইবলিস বলে, সে হয়তো আবার তার পিতা-মাতার বাধ্যগত হবে। তৃতীয় জন বলে, আমার কুমন্ত্রণার প্রভাবে আজ একজন মুসলমান মুশরিক হয়ে গিয়েছে। ইবলিস বলে, তোমার কর্ম উত্তম। চতুর্থজন বলে, আজ আমি একজনকে এমনভাবে প্ররোচিত করেছি যে, সে তার মুমিন ভ্রাতাকে হত্যা করেছে। ইবলিস বলে, তুমিই সর্বোত্তম। একথা বলে ইবলিস তার মস্তকে মুকুট পরিয়ে দেয়। ইবনে হাব্বান তাঁর 'সহীহ্' পুস্তকে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

শেষে বলা হয়েছে— 'কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেনো বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।' এখানে 'ওয়ালী' অর্থ উত্তরাধিকারী, যে নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সকল কাজের জিম্মাদার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত। 'সুলত্বানা' অর্থ এখানে শক্তি এবং কিসাস গ্রহণের অধিকার।

'লা ইউস্‌রিফ্ ফীল্ ক্বত্‌লি' (হত্যার ব্যাপারে সে যেনো বাড়াবাড়ি না করে) কথাটির উদ্দেশ্য এখানে দু'টি— ১. উত্তরাধিকারী এক্ষেত্রে সীমালংঘন করতে পারবে না। অর্থাৎ যাকে হত্যার অধিকার তার নেই, তাকে সে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে না। স্মর্তব্য যে, জ্ঞানবানেরা কখনো এমন কাজ করে না, যা ইহকাল ও পরকালে ডেকে আনে ধ্বংস। ২. হজরত ইবনে আব্বাস এবং অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী কিসাসের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে পারবে না। অর্থাৎ হত্যাকারী ব্যতীত অন্য কাউকে হত্যা করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, মূর্খতার যুগের মানুষ কেবল হত্যাকারীকে বধ করাকে যথেষ্ট মনে করতো না, হত্যাকারীর সম্মানিত কোনো নিকটজনকেও হত্যা করে বসতো।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হত্যাকারী একজন হলে কেবল একজনকে অর্থাৎ কেবল হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে। একজনের বদলে একটি দলকে হত্যা করা যাবে না। অথচ নিহত ব্যক্তির বদলে হত্যাকারীসহ তার আত্মীয়-স্বজনের একটি দলকে হত্যা করাই ছিলো মূর্খতার যুগের রীতি। কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে হত্যাকারীর উপরে কিসাস কার্যকর করা যাবে। অর্থাৎ তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে। কিন্তু তাকে মুছলাহ্ করা যাবে না (নাক, কান অথবা অন্য কোনো অঙ্গ-প্রতঙ্গ কর্তন করা যাবে না)।

ইন্নাহু কানা মান্‌সূরা (সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই) কথাটির অর্থ— অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে সাহায্যপ্রাপ্ত। দুনিয়ায় শরিয়তানুসারে তার হত্যাকারীর উপর কিসাস প্রয়োগ করা হয়। আর আখেরাতে

তাকে সাহায্য করা হয় তার পাপমোচন করে এবং তার হত্যাকারীকে দোজখে প্রবেশ করিয়ে। এরকম বলেছেন মুজাহিদ। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'কানা' কথাটির সর্বনাম প্রযুক্ত হয়েছে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর সংগে। অর্থাৎ 'সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।' কথাটির অর্থ এখানে— নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী তো সাহায্যপ্রাপ্ত অবশ্যই হয়েছে। শরিয়তানুসারে বিচারক তাকে সাহায্য করতে বাধ্য। কোনো কোনো তাফসীরকার আবার বলেছেন, এখানকার সর্বনামটি সংযুক্ত হবে হত্যাকারীর সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা কিসাস গ্রহণের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করতে পারবে না। এরকম অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ির হাত থেকে শরিয়ত তাকে সাহায্য করেছে। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'সে তো (হত্যাকারী তো) সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই'।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৩৪

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ○

❐ পিতৃহীন বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইও না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করিও; প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পিতৃহীন বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না।' একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! যতক্ষণ পর্যন্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতৃহীন বা এতিম প্রাপ্তবয়স্ক না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তার সম্পত্তির যথাসংরক্ষণ নিশ্চিত কোরো। ব্যবসায়ে বা অন্য কোনো বৈধ উপায়ে তাদের সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা কোরো। আত্মসাৎ বা অপব্যবহারের অসদুদ্দেশ্য নিয়ে তাদের সম্পদ স্পর্শ কোরো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং প্রতিশ্রুতি পালন কোরো।' একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানানুসারে জীবন-যাপন করবার জন্য তাঁর সঙ্গে যে অংগীকারে আবদ্ধ হয়েছো, সেই অংগীকার পূর্ণ কোরো এবং মানুষের সঙ্গে যদি কোনো বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে থাকো, তবে সে প্রতিজ্ঞাও অটুট রেখো।

শেষে বলা হয়েছে— 'প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবেই।' একথার অর্থ— অংগীকার পূরণ অত্যাবশ্যক। এই অত্যাবশ্যকতা যথানিয়মে প্রতিপালিত হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কেবল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদেরকে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তিও তাদেরকে অবশ্যই দেয়া হবে।

অথবা মহাবিচারের দিবসে তাদেরকে তাদের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিরস্কৃত করা হবে। যেমন মৃত্তিকায় জীবন্ত প্রোথিত শিশুকন্যাকে প্রশ্ন করা হবে 'তোমাকে কোন অপরাধের জন্য হত্যা করা হয়েছে?' কিংবা এরকমও হওয়া সম্ভব যে, এখানকার 'আলআহ্দি' (প্রতিশ্রুতি) কথাটির পূর্বে 'চুক্তিনামা' বা 'চুক্তিপত্র' কথাটি উহ্য রয়েছে। যদি তাই হয়, তবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— যে চুক্তিপত্রের মাধ্যমে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ হয়েছো, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেই।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৩৫, ৩৬

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

❒ মাপিয়া দিবার সময় পূর্ণমাপে দিবে এবং ওজন করিবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, ইহাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।

❒ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হইও না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়— উহাদিগের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মেপে দিবার সময় পূর্ণরূপে দিবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।' এখানে 'ক্বিস্ত্বাস্' শব্দটির অর্থ পাল্লা বা দাঁড়িপাল্লা। এটি আরবী ভাষায় আত্তীকৃত একটি রোমীয় শব্দ। আত্তীকৃত হওয়ার কারণে শব্দটিকে অনারব বলা যায় না। কেননা এ ধরনের কিছু কিছু অনারব শব্দকে আরবী ভাষা আত্মস্থ করেছে। ফলে ই'রাব, মারেফা, নাকেরাহ্ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসহ শব্দগুলো পেয়েছে আরবী ভাষার পরিপূর্ণরূপ। অধিকাংশ আলেম অবশ্য বলেছেন, 'ক্বিস্ত্বাস্' শব্দটি আরবী। এর উৎসারণ ঘটেছে 'ক্বিস্ত্ব' থেকে। 'ক্বিস্ত্ব' অর্থ আদল বা ন্যায়পরায়ণতা। আর এখানকার 'আল মুস্তাক্বীম' অর্থ ঠিক বা সঠিক।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট' (জালিকা খইরুউঁ ওয়াআহ্সানু তা'বীলা)। এখানে 'তা'বীলা' অর্থ পরিণাম বা পরিণতি।

পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনে রাখুন এবং প্রচার করুন, প্রত্যাদেশাগত ও বুদ্ধিগত প্রমাণ বিবর্জিত বিষয় অনুসরণযোগ্য নয়। তাই অনুমানের অনুসরণ নিষিদ্ধ।

একটি প্রশ্নঃ এই আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, অনুমানভিত্তিক আমল সিদ্ধ নয়। তাহলে তো বলতে হয়, খবরে আহাদ (একক বর্ণনা) এবং কিয়াস (বুদ্ধিবৃত্তিক অনুমান) অননুসরণীয়। কারণ এ দু'টোর দ্বারা প্রত্যাদেশের (ওহীর) মতো অকাট্য ধারণা লাভ করা যায় না। অপ্রসিদ্ধ হাদিসও তো তাহলে পরিত্যাগ করতে হয়। কারণ এগুলো ধারণাকে অধিকতর বলিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন করতে পারে বটে, কিন্তু ওহীর মতো নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে না।

উত্তরঃ লক্ষণীয় যে, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে ভিত্তিহীন অনুমানের অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে বলিষ্ঠ বিশ্বাসের, সে বিশ্বাস প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশজাত অথবা অপ্রত্যক্ষ প্রমাণজাত (অপ্রসিদ্ধ হাদিস, একক বর্ণনা, এজমা, কিয়াস) —যাই হোক না কেনো। এভাবে 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— যে বিষয়ে তোমার আয়ত্তে কোরআন, হাদিস, এজমা ও কিয়াস সম্পর্কিত প্রমাণ নেই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে অনুমানভিত্তিক অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে কেবল আকায়েদ বা বিশ্বাস্য বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কেবল বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই ধারণা, খেয়াল, দোদুল্যমানতা ও অনিশ্চিতির অনুসরণ নিষিদ্ধ। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কেবল সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ প্রদান ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে। সুতরাং এ দু'টো ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে আলোচ্য বাক্যের নিষেধাজ্ঞাটি প্রযোজ্য নয়।

মুজাহিদ বলেছেন, রসুল স. এর মাধ্যমে আলোচ্য বাক্যে একথাই বলে দেয়া হয়েছে যে— হে মানুষ! তোমরা সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে কাউকে অভিযুক্ত কোরো না। স্বধারণা বা অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে দোষারোপ করতে যেয়ো না। কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য নির্দেশনাটির মর্মার্থ এই যে— তোমরা অদর্শিত, অশ্রুত ও অজানিত বিষয়াবলীকে দর্শিত, শ্রুত ও জানিতরূপে প্রকাশ কোরো না।

আমি বলি, যথাসূত্রে বর্ণিত খবরে আহাদ, যথার্থ কিয়াস অথবা দু'জন পুরুষ ও একজন নারীর সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে মান্য করা ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক)। প্রত্যাদেশ বা কোরআন এবং এজমা বা ঐকমত্য একথাই বলে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি দল কেনো বিদেশে গমন করে না।' আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'হে বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ! প্রজ্ঞাশ্রয়ী হও।' অন্য আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী নির্বাচন করো'। সুবিদিত হাদিসসমূহের মাধ্যমেও একথার প্রমাণ এসেছে যে, রসুল স. তাঁর কোনো কোনো সহচরকে ধর্মপ্রচার ব্যপদেশে অন্যত্র প্রেরণ করতেন। অতএব খবরে আহাদ অথবা কিয়াসকে সুনিশ্চিত বলা না গেলেও তা অনুসরণীয়। অর্থাৎ এগুলোর উপর আমল করা জরুরী। কোরআন মজীদে এরকমই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে— 'কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়— তাদের প্রত্যেকের নিকটে কৈফিয়ত তলব করা হবে।' একথার অর্থ— বর্ণিত অঙ্গ তিনটির আনুগত্য ও অনানুগত্য সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করা হবে। অথবা এই ত্রয়ী প্রত্যঙ্গকে এই মর্মে প্রশ্ন করা হবে যে, যার সঙ্গে তোমরা ছিলে সে তোমাদের দ্বারা কি কি কাজ করিয়েছে? কিংবা যে ব্যক্তি দেখা, শুনা ও জানার দাবি করে, তার চোখ, কান ও হৃদয়কে তার দাবির সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। চোখকে বলা হবে, সত্যিই কি সে দেখেছিলো? কানকে বলা হবে, সে শুনেছে বলে যে দাবি করে, তা কি সত্যি? আর হৃদয়কে বলা হবে, তার জানার দাবিটি সত্য না মিথ্যা?

হজরত শেকেল বিন হুমাইদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমার এক নিবেদনের প্রেক্ষিতে আমার হাত ধরে বলেছিলেন, বলো, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার সকাশে পরিত্রাণ প্রার্থনা করি কর্ণ, নয়ন, রসনা ও হৃদয়ের পাপ থেকে। আরো পরিত্রাণ যাচ্ঞা করি বীর্য স্খলনজনিত পাপাচার থেকে। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই দোয়াটি স্মৃতিবদ্ধ করে নিয়েছি। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ, হাকেম ও বাগবী। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। হাদিসটির এক বর্ণনাকারী সাঈদ বলেছেন, এখানে বীর্য স্খলনজনিত পাপাচার থেকে পরিত্রাণ কামনার অর্থ অবৈধস্থানে বীর্যপাত ঘটানো থেকে রক্ষা পাওয়া।

মানুষ জ্ঞান আহরণ করে তার ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে। বিশেষ করে চোখ, কান ও হৃদয়ের মাধ্যমে। এগুলো হচ্ছে জ্ঞানাহরণের উপায়, উপকরণ বা পথ। পরিচ্ছন্ন ও পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে গেলে তাই দৃষ্টি, শ্রুতি ও উপলব্ধিজাত জ্ঞানের সম্মিলন একান্ত জরুরী।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ۝ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝

❑ ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করিও না, তুমি তো কখনই পদভরে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিতে পারিবে না। এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত-প্রমাণ হইতে পারিবে না।

❑ এই সমস্তের মধ্যে যে-গুলি মন্দ সেই গুলি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য।

❑ তোমার প্রতিপালক ওহির দ্বারা তোমাকে যে হিকমত দান করিয়াছেন এইগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহের সহিত কোন ইলাহ্ স্থির করিও না, করিলে তুমি নিন্দিত ও আল্লাহের অনুগ্রহ হইতে দূরীকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

❑ তোমাদিগের প্রতিপালক কি তোমাদিগের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করিয়াছেন এবং তিনি নিজে ফেরেশতাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলিয়া থাক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ কোরো না; তুমি তো কখনোই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না।' একথার অর্থ— হে অহমিকাপ্রবণ মানুষ! অহমিকা পরিত্যাগ করো। গর্বোন্মত্ত পদবিক্ষেপ থেকে বিরত হও। কী ভেবেছো তোমরা? মনে করেছো কি যে, তোমাদের দর্পিত পদভারে মৃত্তিকা বিদীর্ণ হবে? এখানে 'মারাহান' অর্থ অহমিকাবশতঃ বা দম্ভভরে। 'মারাহুন' অর্থ প্রতাপপ্রকাশক অভিব্যক্তি বা পরাক্রমপ্রবণ পদবিক্ষেপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং উচ্চতায় তুমি কখনো পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।' একথার অর্থ— হে অর্বাচীন মানুষ! অহংকারের বশবর্তী হয়ে যতোই তুমি বাড়তে চেষ্টা করো না কেনো, তুমি তো কখনোই পাহাড়ের মতো সুউচ্চ হতে পারবে না। তবে এ বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করোনা কেনো? কেনো হওনা অনুগত ও বিনয়াবনত?

হজরত আয়াজ বিন হাম্মাদ মাজাশিঈ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, আমরা যেনো একে অপরের প্রতি হই প্রীতিপ্রবণ ও অনহংকারী। যেনো সতত মুক্ত থাকি উন্নাসিকতা থেকে। মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন— অহংকার আমার উত্তরীয় এবং পরাক্রম আমার পরিধেয়। যে ব্যক্তি আমার এই একক পরিচ্ছদকে নিজের দিকে টানতে শুরু করবে, আমি তাকে দোজখে প্রবেশ করাবো। মুসলিম।

হজরত সালমা ইবনে আকওয়ার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে মানুষ সারাক্ষণ দাম্ভিকতা প্রকাশ করে, তাকে আখ্যা দেয়া হয় 'জাব্‌বারীন' বা দর্পিত বলে। তারপর তার উপরে আপতিত হয় আযাব, যে আযাবের সে উপযোগী। তিরমিজি।

আমর বিন শোয়াইবের পিতামহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিন দাম্ভিকদেরকে পিপীলিকার মতো নিকৃষ্ট ও নগণ্য হিসেবে পুনরুত্থিত করা হবে। সেদিন তারা হবে লাঞ্ছনা ও অবমাননা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এভাবে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে সবচেয়ে বেশী দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট জাহান্নামের 'বুলাস্' নামক প্রকোষ্ঠে। সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে 'ত্বইয়্যানাতুল খাবাল' (দোজখীদের রক্ত ও পুজ)। তিরমিজি।

হজরত আসমা বিনতে উমায়েশ বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, ওই মানুষ মন্দ, যে তোষামদ প্রিয়, দাম্ভিক এবং মহান আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়। তিরমিজি, বায়হাকী।

একদিন হজরত ওমর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনতা! শোনো, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র জন্য যে বিনয়াবনত হয়, আল্লাহ্ তাকে মর্যাদায়িত করেন। তখন সে হয় নিজের দৃষ্টিতে নগণ্য, কিন্তু জনসাধারণের দৃষ্টিতে মহান। আর যে ব্যক্তি নিজেকে মর্যাদামণ্ডিত মনে করে, আল্লাহ্ তাকে অপমানিত করেন। ফলে সে হয় স্বদৃষ্টিতে সমুন্নত, কিন্তু জনতার দৃষ্টিতে কুকুর ও শুকর অপেক্ষা তুচ্ছ। আল্লাহ্‌তায়ালাই সর্বোত্তম পরিজ্ঞাতা।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস একবার বললেন, তওরাতের প্রথম পনেরো আয়াতের মধ্যেই রয়েছে আলোচ্য আয়াতের অনুকূল নির্দেশ। একথা বলার পর তিনি পাঠ করলেন— 'ওয়ালা তাজ্‌আ'ল মাআ'ল্লহি ইলাহান্ আখারা' (আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে উপাস্য সাব্যস্ত কোরো না)।

পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'এ সমস্তের মধ্যে যেগুলো মন্দ, সেগুলো তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য।' এখানে 'এ সমস্তের মধ্যে' কথাটির অর্থ— শরিয়তের এ সকল নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, শরিয়ত কোনো কোনো বিষয়কে বৈধ করেছে, আবার কোনো কোনো বিষয়কে করেছে অবৈধ। বৈধ বিষয়সমূহ শুভ। আর অবৈধ বিষয়সমূহ অশুভ বা মন্দ। মন্দ বিষয়গুলোই আল্লাহ্‌র নিকটে ঘৃণিত ও নিন্দিত।

এর পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক ওহীর দ্বারা তোমাকে যে হেকমত দান করেছেন, এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত।' কামুস রচয়িতা এখানকার 'হিকমত' কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— ন্যায়পরায়ণতা, জ্ঞান, সহিষ্ণুতা, বিনয়, নবুয়ত ও কিতাব (ইঞ্জিল, তওরাত, কোরআন ইত্যাদি)। আমি বলি, এখানকার 'হিকমত' কথাটির অর্থ ফলপ্রসূ বা উপকার প্রদায়ক জ্ঞান।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো ইলাহ্ স্থির কোরো না।' কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে এই কথাটি বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, তওহীদ বা আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাসই হচ্ছে সত্য ধর্মের মূল ভিত্তি। বিশুদ্ধ তওহীদের উপরেই কেবল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে গ্রহণযোগ্য আমল। বরং সকল আমলের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিশুদ্ধ এককত্বের বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। সকল প্রজ্ঞাময়তা ও জ্ঞানের মূলও এই তওহীদ। শিরিক বা অংশীবাদিতা বিশ্বাসের মূল ভিত্তি এই তওহীদকে অপসারিত করে। তাই শিরিক সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও চিরস্থায়ী শাস্তির যোগ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'করলে তুমি নিন্দিত ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে দূরীকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, তারা যেনো আল্লাহ্র সমকক্ষ বা অধীনস্থ হিসেবে কাউকে বা কোনোকিছুকে উপাস্য স্থির না করে। যদি কেউ এরকম করে, তবে সে একসময় নিজের কাছেই হয়ে পড়বে নিন্দিত। আর আল্লাহ্ ও সকল সৃষ্টির কাছেও সে হয়ে পড়বে তিরস্কারের যোগ্য। অবশেষে আল্লাহ্র অনুগ্রহ বঞ্চিত অবস্থায় সে নিক্ষিপ্ত হবে চিরস্থায়ী অগ্নিকুণ্ডে। এখানে নিজের কাছে নিন্দিত ও আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত — এ দু'টো অবস্থাকে বোঝানো হয় যথাক্রমে 'মালুমান' ও 'মাদহুরান' কথা দু'টোর মাধ্যমে।

এর পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং তিনি নিজে ফেরেশতাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলে থাকো।' একথার অর্থ— হে মক্কার অংশীবাদীরা! তোমাদের মনোবৃত্তি ও বক্তব্য কতোই না জঘন্য। তোমরা চিরঞ্জীব, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর ও চির অমুখাপেক্ষী আল্লাহ্কে মানুষের জন্ম প্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চাও। এটা তো এক অতি ঘৃণ্য মিথ্যাচারিতা। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তিনি যেমন কারো দ্বারা জাত নন, তেমনি নন কারো জনক। এসকল বৈশিষ্ট্য তো নশ্বরতার বৃত্তভূত। আর তিনি অনশ্বর। হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! এর চেয়ে আরো অধিক মিথ্যা বলতেও তো তোমরা দ্বিধান্বিত হও না। পুত্র সন্তানের জনক বলে তোমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকো, আর মহাবিশ্বের মহান প্রভুপালনকর্তাকে বলো কন্যা সন্তানের জনক। আবার ফেরেশতাদেরকে বলো আল্লাহ্র কন্যা। অথচ তারা আমার এক নিষ্পাপ ও জ্যোতির্ময় সৃষ্টি— নারী-পুরুষ কোনোটাই তারা নয়। কী ভয়ানক তোমাদের বচন! চরমতম নির্বোধ ও দুর্ভাগা ছাড়া কারো মুখে কি এমতো অপবিত্র উচ্চারণ শোভন?

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۝ قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۖ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۖ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

❒ এই কুরআনে বহু নীতিবাক্য আমি বারবার বিবৃত করিয়াছি যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাতে উহাদিগের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

❒ বল, 'উহাদিগের কথামত যদি তাঁহার সহিত আরও ইলাহ্ থাকিত তবে তাহারা আরশ-অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উপায় অন্বেষণ করিত।

❒ তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং উহারা যাহা বলে তাহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্বে।

❒ সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু উহাদিগের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করিতে পার না; তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এই কোরআনে বহু নীতিবাক্য আমি বারবার বিবৃত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।' একথার অর্থ— এই মহাগ্রন্থ আল কোরআনে আমি বিভিন্ন উপদেশমূলক কাহিনী, শরিয়তের বিভিন্ন বিধান, বিভিন্ন হেকমত ও নানা রকম উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও প্রমাণ বার বার বিভিন্নভাবে উপস্থিত করেছি। মানুষ যাতে এ সকল কিছু অনুধাবন করে সৎপথ প্রাপ্ত হয়, সে কারণেই এই মহান আয়োজন। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, এই কোরআনে আমি হেদায়েতের উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ বিভিন্ন নীতিবাক্য ও উপদেশ প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথবা এখানে 'হাজাল্ কুরআন' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে 'ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা'—এই অপবিশ্বাসটি আমি বারংবার বাতিল বলে প্রমাণ করেছি। করেছি এজন্য যে, মানুষ যেনো এভাবে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের সাক্ষাৎ পায় এবং তা

অবলম্বন করে পথ-প্রাপ্ত হয়। এভাবে এখানকার 'কুরআন' কথাটির অর্থ হবে 'কি্বরআত' বা পাঠ, বাণী অথবা বাক্য। এখানকার 'সর্রাফ্না' কথাটির অর্থ বার বার। কথাটি আধিক্য প্রকাশক। আর 'লিইয়াজ্জাক্কারু' অর্থ যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে । অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার জন্য যে ধারণা শোভনীয় নয়, তা থেকে মুক্তি লাভ করে আল্লাহ্র বিধানাবলীর সঠিক অনুসরণ করে সফল হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।' এ কথার অর্থ— কিন্তু অর্বাচীন ও অবিমৃশ্য মানুষ আমার এই কল্যাণ প্রচেষ্টার প্রতি বিমুখ। আত্মহননের আনন্দেই তারা মগ্ন। এভাবে যতো আমি তাদেরকে কাছে ডাকি, ততোই তারা দূরে সরে যায়। কল্যাণের সঙ্গে রচনা করে দীর্ঘ, দীর্ঘতর ব্যবধান।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'বলো, তাদের কথামতো যদি তাঁর সঙ্গে আরো ইলাহ্ থাকতো, তবে তারা আরশ-অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার উপায় অন্বেষণ করতো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে একথা বলুন যে, আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অথচ নির্বোধ অংশীবাদীরা এক আল্লাহ্র উপাসনা ছেড়ে বহু দেব-দেবীর উপাসনায় লিপ্ত। তারা একথা জানে না এবং মানে না যে, আল্লাহ্ একাধিক হওয়া সম্ভবই নয়। যদি এরকম হতো, তবে তো মহান আরশের একক অধিকর্তা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করতো— যেমন এক রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করে অন্য রাজার বিরুদ্ধে। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এমতো সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। আর এমতাবস্থায় একপক্ষ হতো বিজয়ী এবং অপর পক্ষ হতো পরাজিত। অথবা ধ্বংস হয়ে যেতো উভয় পক্ষই। যে এরকম জয়-পরাজয়ের মুখাপেক্ষী, সে কখনোই আল্লাহ্ হতে পারে না। কারণ দুর্বলতা ও পরাজয় প্রভুত্বের পরিপন্থী।

এর পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা অতুলনীয়রূপে পবিত্র ও মহিমান্বিত। সকল অক্ষমতা, অপারগতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত অপেক্ষা তিনি বহু উর্ধ্বে। সত্তা, গুণাবলী ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রেও তাঁর মর্যাদা জ্ঞানাতীতরূপে সমুচ্চ। অংশীবাদীদের বিশ্বাস অনুসারে সন্তান গ্রহণও তাঁর পক্ষে অসম্ভব। জন্মপ্রবাহ তো হচ্ছে অবক্ষয়প্রবণ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তিনি তো চির অধ্বংসী, চির অক্ষয়।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না।' এ কথার অর্থ— সাত আকাশ ও পৃথিবীসহ সকল কিছুই আল্লাহ্পাক যে অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র ও

অপ্রতিদ্বন্দ্বিরূপে মহিমময়— একথা ঘোষণা করে। এই সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা থেকে সৃষ্টি জগতের কোনো কিছুই বিরত নয়। প্রতিটি সৃষ্টি তাদের স্ব স্ব ভাষায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করে চলেছে তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা এবং মহিমা।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমরা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার অলৌকিকত্বকে বরকতময় বলে জানি। আর তোমরা এটাকে মনে করো ভীতিপ্রদ ব্যাপার। এক সফরে আমি ছিলাম রসুল স. এর সঙ্গী। হঠাৎ পানির সংকট দেখা দিলো। রসুল স. বললেন, সামান্য পানি যদি কারো কাছে থেকে থাকে তবে তা নিয়ে এসো। একটি পাত্র উপস্থিত করা হলো তাঁর সম্মুখে। তার মধ্যে ছিলো যৎসামান্য পানি। রসুল স. তাঁর পবিত্র হস্ত পাত্রের মধ্যে রেখে বললেন, হে বরকতময় পানি, বেরিয়ে এসো। বরকত তো আল্লাহ্র দিক থেকেই আসে। আমরা দেখলাম, এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রসুল স. এর পবিত্র আঙ্গুল থেকে নির্গত হতে শুরু করলো তীব্র পানির ধারা। আমরা সকলেই সেই পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলাম এবং ওই পানি দিয়ে আহার্যও প্রস্তুত করলাম। শুনতে পেলাম আহার্য বস্তু থেকে উত্থিত হচ্ছে 'সুবহানআল্লাহ্' 'সুবহানআল্লাহ্' আওয়াজ। বোখারী।

মুজাহিদ বলেছেন, জড়-অজড় সকল সৃষ্টি আল্লাহ্র তস্বী পাঠ করে। অর্থাৎ পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করে 'সুবহান আল্লাহি ওয়া বিহামদিহি'। ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, সপ্রাণ-নিস্প্রাণ সকল বস্তুই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। এমন কি দরজার চৌকাঠ এবং ভেঙে পড়া ছাদের টুকরা পর্যন্ত বর্ণনা করে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'শাইইন' অর্থ সকল জীবিত বস্তু। অর্থাৎ সকল জীবিত প্রাণী বর্ণনা করে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা। যেমন জ্বিন, মানুষ, ফেরেশতা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি। কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্র প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে প্রাণী ও অরণ্যানী। অর্থাৎ সকল প্রবৃদ্ধিপ্রবণ সৃষ্টি। ইকরামা বলেছেন, বৃক্ষকুল তস্বি পাঠ করে। কিন্তু বৃক্ষ থেকে নির্মিত কাষ্ঠখণ্ড তস্বি পাঠ করে না।

আমি বলি, ইকরামার অভিমতটি অযথার্থ। কেননা রসুল স. এর বিরহে মসজিদে নববীর একটি কাঠের খুঁটি শিশুদের মতো ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিলো। একথা বিশুদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত। এক আয়াতে হজরত দাউদকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্পাক বলেছেন—'হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং হে বিহঙ্গকুল, তোমরাও।' হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে জিজ্ঞেস করে তোমার উপর দিয়ে কি আল্লাহ্র নাম স্মরণ করতে করতে কোনো ব্যক্তি গমন করেছে? অন্য পাহাড় যদি বলে 'হ্যাঁ', তবে প্রশ্নকারী

পাহাড় আনন্দিত হয়। সুতরাং একথা নিঃসন্দিগ্ধ যে, প্রতিটি সৃষ্টবস্তু নিরন্তর তস্‌বী পাঠে রত। সমগ্র সৃষ্টি সম্ভাব্যের বৃত্তভূত ও ধ্বংসশীল। তাই তাকে অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য চিরঅবিনাশী ও চিরঅমুখাপেক্ষীর মুখাপেক্ষী হতেই হয়। আর নিরন্তর তসবী পাঠই হচ্ছে ওই মুখাপেক্ষিতার প্রমাণ। আল্লাহ্‌পাক সকল প্রকার শূন্যতা, ত্রুটি, বিনাশপ্রবণতা ও অবক্ষয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সকল প্রকার পূর্ণতা কেবল তাঁর মধ্যেই বিদ্যমান। সকল গুণের তিনিই আকর। সুতরাং সৃষ্টির পক্ষে সর্বক্ষণ তাঁর তস্‌বী পাঠ করাই স্বাভাবিক ও শোভন।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না।' একথার অর্থ— হে মানুষ! সৃষ্টিজগতের এই সার্বক্ষণিক তস্‌বী পাঠের বিষয় আমি করে রেখেছি প্রচ্ছন্ন, সর্বসাধারণের দৃষ্টি ও অনুভূতি থেকে সংগুপ্ত। তাই তা তোমাদের অনুধাবনের আওতাভূত নয়। উল্লেখ্য যে, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এর ব্যতিক্রম। তারা বিষয়টি কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে সক্ষম। কিন্তু তাদের নিকটেও বিষয়টির রহস্য সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত নয়। কীভাবে উন্মোচিত হবে? শিল্পের রহস্য শিল্পী ছাড়া অন্যের নিকটে যেমন পূর্ণরূপে উন্মোচিত নয়, তেমনি সৃষ্টির রহস্য স্রষ্টা ছাড়া কি করে অন্যরা পুরোপুরি বুঝবে? উল্লেখ্য যে, অংশীবাদীরা জ্ঞানান্ধ, অদূরদর্শী ও দর্পান্ধ। তাই তারা আলোচ্য বিষয়টি কিছুতেই অনুধাবন করতে পারে না।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, পশুদের মুখের উপরে আঘাত কোরো না। প্রতিটি সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করে। মায়মুন বিন মাহ্‌রান বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীক সকাশে একবার একটি কাক আনা হলো। কাকটির ডানা ছিলো গুটানো। তিনি তার ডানা দু'টো প্রসারিত করে দিয়ে বললেন, তসবীহ্‌ পাঠ বন্ধ না করা পর্যন্ত কোনো প্রাণীকে শিকার করা যায় না এবং কোনো বৃক্ষকেও কর্তন করা যায় না। জুহুরীও এরকম বর্ণনা এনেছেন। ইজালাতুল খাফা।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।' একথার অর্থ, আল্লাহ্‌ সহিষ্ণু— তাই তিনি পাপীকে শাস্তি প্রদানের জন্য ব্যতিব্যস্ত নন। আর তিনি ক্ষমাপরবশও— তাই কেউ কৃত পাপের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।

জুহুরী সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. মক্কার অংশীবাদীদেরকে পবিত্র কোরআন পাঠ করে শোনালেন এবং আহ্বান জানালেন সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি। কিন্তু তারা উপহাসচ্ছলে বললো— 'তুমি যার প্রতি আহ্বান করছো, সে বিষয়ে আমাদের হৃদয় পর্দাচ্ছাদিত, কর্ণ বধির এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে রয়েছে অন্তরাল।' তাদের এমতো পরিহাসের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۝ وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝

❒ তুমি যখন কুর্আন পাঠ কর তখন তোমার ও যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রাখিয়া দেই।

❒ আমি উহাদিগের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন উহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে এবং উহাদিগকে বধির করিয়াছি; 'তোমার প্রতিপালক এক', ইহা যখন তুমি কুর্আন হইতে আবৃত্তি কর তখন উহারা সরিয়া পড়ে।

❒ যখন উহারা কান পাতিয়া তোমার কথা শুনে তখন উহারা কেন কান পাতিয়া উহা শুনে তাহা আমি ভাল জানি, এবং ইহাও জানি গোপনে আলোচনাকালে সীমালংঘনকারীরা বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি যখন কোরআন পাঠ করেন, তখন আপনার ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে আমি স্থাপন করি একটি অনড় অন্তরায়। ফলে তারা কোরআনের মর্ম অনুধাবন করতে পারে না।

কাতাদা বলেছেন, এখানে 'হিজাব' (পর্দা বা অন্তরায়) কথাটির মাধ্যমে ওই পর্দার কথা বলা হয়েছে যা তারা উপহাসচ্ছলে বলেছিলো। বলেছিলো, 'তুমি যার প্রতি আহ্বান করছো, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর পর্দাচ্ছাদিত'। অর্থাৎ এখানকার হিজাব বা পর্দা হচ্ছে কোরআন অনুধাবনের অন্তরায়।

'মাস্তূরা' অর্থ প্রচ্ছন্ন বা গোপন। অর্থাৎ যা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। অথবা এমন পর্দা যা অনেক পর্দার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। অর্থাৎ পর্দার ভিতরের পর্দা, তার ভিতরের পর্দা— এরকম। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'মাস্তূরা' শব্দটি

কর্মপদ, যা কর্তৃপদের অর্থ প্রকাশক। এভাবে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'সাতীর' (গোপনকারী)। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কানা ওয়া'দুহূ মাতিয়্যা।' এখানে 'মাতিয়্যা' অর্থ আগমনকারী।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে হিজাব বলে ওই পর্দাকে বুঝানো হয়েছে, যা রাখা হতো রসুল স. এবং কাফেরদের মাঝখানে। ফলে তারা তাকে দেখতে পেতো না। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যখন 'তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব্' আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন আবু লাহাবের স্ত্রী একটি প্রস্তর খণ্ড হাতে নিয়ে রসুল স.কে মারতে এলো। রসুল স. তখন একস্থানে হজরত আবু বকরের সঙ্গে বসেছিলেন। আবু লাহাবের স্ত্রী সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলো কেবল হজরত আবু বকরকে। রসুল স.কে সে দেখতেই পেলো না। হজরত আবু বকরকে লক্ষ্য করে সে বললো, তোমার সাথী কোথায়? আমি শুনতে পেলাম সে আমাদের দুর্নাম করেছে। হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্র কসম! তিনি তো কবিতা পাঠ করেন না। কবিতা রচনাও করেন না (তবে তিনি দুর্নাম করেন কীভাবে)। আবু লাহাবের স্ত্রী সেখান থেকে এই কথা বলতে বলতে প্রস্থান করলো যে, আমিতো এই পাথরটি নিক্ষেপ করে তার মাথা ফাটিয়ে দিতে এসেছিলাম। তার অন্তর্ধানের পর হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সে তো আপনাকে দেখতে পায়নি। রসুল স. বললেন, একজন ফেরেশতা তার ও আমার মধ্যে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

আমি বলি, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের এই বর্ণনাটি বিশেষ একটি ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এরকম ঘটনা সচরাচর ঘটতো না। অর্থাৎ এরকম সবসময় হতো না যে, রসুল স. কোরআন তেলাওয়াত করতেন, অথচ তারা তাঁকে দেখতে পেতো না।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে—'আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি, যেনো তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে।' একথার অর্থ— আমি ওই সকল চিরভ্রষ্টদের অন্তরের উপর রেখে দিয়েছি এক অচ্ছেদ্য আবরণ। তাই তারা কোরআনের অন্তর্নিহিত বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে বধির করেছি।' একথার অর্থ— আমি তাদের শ্রুতিকে করেছি সত্যশ্রবণের ক্ষমতাবিবর্জিত। তাই তারা মনোযোগের সঙ্গে কোরআনের বাণী শুনতে পারে না। উল্লেখ্য যে, কোরআন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য উভয় দিক থেকে মোজেজা বা অলৌকিকত্ব। তাই কোরআনের উভয় দিক সম্পর্কে অবিশ্বাসীদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সে কারণেই তাদের হৃদয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় এবং কোরআনের মাঝখানে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। এভাবে তাদেরকে করা হয়েছে কোরআনের উচ্চারণ ও অনুধাবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক এক— একথা যখন তুমি কোরআন থেকে আবৃত্তি করো, তখন তারা সরে পড়ে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি যখন অংশীবাদীদের বাতিল উপাস্যসমূহকে অস্বীকারার্থে কোরআন থেকে পাঠ করেন আল্লাহ্র একক উপাস্য হওয়া সম্পর্কিত কোনো আয়াত, তখন তারা ঘৃণাভরে সেখান থেকে প্রস্থান করে।

'নুফূরা' অর্থ ঘৃণাভরে প্রস্থান করা বা সরে পড়া। শব্দটি সাধারণ কর্মপদ ও কারণ প্রকাশক কর্মপদ উভয়রূপে ব্যবহার্য। শব্দটি নাফির শব্দের বহুবচন। যেমন 'আক্বিদ' এর বহুবচন 'উকুদ্।'

এর পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'যখন তারা কান পেতে তোমার কথা শোনে, তখন তারা কেনো কান পেতে তা শোনে, তা আমি ভালো জানি।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! ওই সকল অবিশ্বাসীরা যে কৌতুক এবং বিদ্রূপপ্রবণ মানসিকতা নিয়ে আপনার কথা কান পেতে শোনে, তা আমি ভালো করেই জানি।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং এ-ও জানি, গোপনে আলোচনাকালে সীমালংঘনকারীরা বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছো।'

এখানে 'নাজ্ওয়া' শব্দটি ধাতুমূল এবং কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক। শব্দটি 'নাজী' শব্দের বহুবচন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনার কোরআন পাঠ কান পেতে শোনার পিছনে তাদের কী দুরভিসন্ধি রয়েছে, তা আমার অজানা নয়। বক্তব্যটি এরকমও হতে পারে যে, যখন তারা এ সম্পর্কে কানাকানি করে, তখনকার গোপন আলাপচারিতার বিষয়বস্তুও আমার জ্ঞানবহির্ভূত নয়। অর্থাৎ তাদের তখনকার সকল গোপন কলাকৌশল,পরামর্শ বিনিময় ও ষড়যন্ত্রের কথাও আমি উত্তমরূপে অবগত। তারা তখন একে অপরকে বলে— তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত লোকের পাল্লায় পড়েছো।

'আজ্জলিমূনা' অর্থ সীমালংঘনকারী। অর্থাৎ ওলীদ বিন মুগীরা ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা। তারা রসুল স.কে যাদুগ্রস্ত বলতো। নিঃসন্দেহে এরকম অপকথন জুলুম বা সীমালংঘন ছাড়া অন্য কিছু নয়।

'মাসহূরা' অর্থ যাদুগ্রস্ত, যে যাদুর প্রভাবে বিবেক-বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মুজাহিদ 'মাসহূর' শব্দের অর্থ করেছেন— প্রতারিত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শব্দটি উৎকলিত হয়েছে 'মাসাহারাকা' থেকে। 'মা সাহারাকা' অর্থ— 'কোন বিষয়ে তোমাকে বিমুখ করেছে।' এভাবে 'মাসহূর' শব্দের অর্থ হবে— সত্য বিমুখ। আবু উবাইদ 'মাসহূর' শব্দের অর্থ করেছেন— যাদুকর। আর

'সাহার' শব্দের অর্থ করেছেন ফুস্‌ফুস্‌। অর্থাৎ তারা একে অপরকে লক্ষ্য করে গোপনে বলাবলি করে, এ লোক তো তোমাদের মতোই ফুস্‌ফুস্‌ বিশিষ্ট লোক। তোমাদের পানাহার ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই তার পানাহার ও শ্বাস-প্রশ্বাস।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
سَبِيلًا ○ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
خَلْقًا جَدِيدًا ○ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ○ أَوْ خَلْقًا
مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي
فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ
مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ○ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ
فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ○

❒ দেখ, উহারা তোমার কী উপমা দেয়, উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং উহারা পথ পাইবে না।

❒ উহারা বলে, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলেও কি নুতন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হইব?'

❒ বল, 'তোমরা হইয়া যাও পাথর অথবা লৌহ,

❒ অথবা এমন কিছু যাহা তোমাদিগের ধারণায় খুবই কঠিন;' তাহারা বলিবে, 'কে আমাদিগকে পুনরুত্থিত করিবে?' বল, 'তিনিই যিনি তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছেন।' অতঃপর উহারা তোমার সম্মুখে মাথা নাড়িবে ও বলিবে, 'উহা কবে?' বল, 'হইবে সম্ভবতঃ শীঘ্রই,

❒ 'যেদিন তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন, এবং তোমরা প্রশংসার সহিত তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করিবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করিয়াছিলে।'

প্রথমে বলা হয়েছে—'দেখো, তারা তোমার কী উপমা দেয়, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আপনাকে কতো কিছু বলে সম্বোধন করে। কেউ বলে কবি। কেউ বলে যাদুকর। কেউ বলে যাদুগ্রস্ত। কেউ বলে গণক। আবার কেউ বলে উন্মাদ। এ সকল মিথ্যা কথা বলার কারণেই তারা চিরদিনের জন্য পথভ্রষ্ট হয়েছে। মিথ্যাচারীরাই এভাবে পথভ্রষ্ট হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা পথ পাবে না।' একথার অর্থ— তারা কখনোই সত্যপথের সন্ধান পাবে না। কারণ আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে করেছেন অবরুদ্ধ, পর্দাচ্ছাদিত। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, তারা আপনাকে ভর্ৎসনা করবার জন্য যুৎসই কোনো সম্বোধনও খুঁজে পায় না। তাই তারা একেক বার একেক কথা বলে। তাদের এমতো প্রমাণবিহীন সম্বোধন অন্ধের হাতড়িয়ে বেড়ানোর মতো। মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া ব্যক্তির মতো, যে তার কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করতে অক্ষম।

পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো?' এখানে 'রুফাত' অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া। 'ফাতাত' এবং 'হুতাম' শব্দ দু'টোর অর্থও এরকম। কামুস গ্রন্থে রয়েছে— রফাতা, ইয়ারফুতু (শব্দরূপ নাসারা, ইয়ানসুরু) অর্থ ভগ্ন, চূর্ণবিচূর্ণ। মুজাহিদ 'রুফাতা' শব্দটির অর্থ করেছেন— মাটি। জীবিত মানুষের অস্থি সুঠাম ও সজীব। আর মৃত মানুষের হাড় শুষ্ক ও ভঙ্গুর । দু'টো অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই অংশীবাদীরা বিশুষ্ক হাড়গোড় নিয়ে মাটিতে মিশে যাওয়া মানুষের পুনর্জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করতো। বলতো— আমাদের দেহ হাড়গোড়ে পরিণত ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো?

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লোহা'। এই আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা চলে গিয়েছে পরবর্তী আয়াতেও (৫১)। বলা হয়েছে— 'অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন।' এভাবে সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলে দিন, অস্বীকার করলেও পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর পর তোমরা পাথর, লোহা অথবা অকল্পনীয় কোনো কিছুতে পরিণত হয়ে গেলেও তোমাদের পুনরুত্থান ঘটানো হবে।

এরপর বলা হয়েছে — 'তারা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে? বলো, তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার মুখে পুনরুত্থানের অনিবার্যতার কথা শুনে অংশীবাদীরা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে? আপনি বলবেন, তিনিই যিনি

তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির দ্বিতীয় সংস্করণ নিশ্চয় প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা সহজ। অর্থাৎ অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দানের তুলনায় রূপান্তরিত অস্তিত্বের পুনরুজ্জীবন নিশ্চয় অতিসহজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা তোমার সম্মুখে মাথা নাড়বে ও বলবে, উহা কবে? বলো, হবে সম্ভবতঃ শীঘ্রই।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার যথার্থ যুক্তি শুনে পুনরুত্থান দিবসকে তারা অস্বীকার করার আর কোনো উপায় খুঁজে পাবে না। তখন তারা বলবে, ঠিক আছে। না হয় মানলাম— কিয়ামত, হাশর, নশর এসব কথা ঠিক। কিন্তু তা কখন সংঘটিত হবে? এ পর্যন্ত কোনো লোককেই তো আমরা পুনরুত্থিত হতে দেখলাম না। হে আমার রসুল! তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি বলুন, হবে। নিশ্চয়ই হবে। আবার সেই মহাদিবস মনে হয় খুব বেশী দূরেও নয়। এখানে 'সম্ভবতঃ শীঘ্রই' কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান সংঘটিত হবে অত্যল্প সময়ের মধ্যে। অথবা অর্থ হতে পারে এরকম— প্রথম সৃষ্টি থেকে দ্বিতীয় সৃষ্টি খুব বেশী দূরেও তো নয়।

এর পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সঙ্গে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে তোমরা অল্পকালই অবস্থান করবে।'একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে জানিয়ে দিন, আমার হুকুমে ইস্রাফিল ফেরেশতা সেদিন তোমাদের কবর থেকে হিসাবের জন্য হাশর প্রান্তরের দিকে আহ্বান জানাবে। তখন তোমরা নিরূপায় হয়ে আমার প্রশংসা বর্ণনা করতে করতে উপস্থিত হবে সেখানে। আর তোমাদের তখন মনে হবে তোমরা অল্প সময়ের জন্য পৃথিবীতে অথবা পৃথিবী ও কবরে অবস্থান করেছিলে। কাতাদা বলেছেন, মহাবিচারের দিবসের তুলনায় পৃথিবীর জীবনকালকে মনে হবে অত্যন্ত নগণ্য।

এখানে 'তোমরা প্রশংসার সঙ্গে তার আহ্বানে সাড়া দিবে' কথাটির অর্থ— তোমরা তখন বাস্তব অবস্থা স্বনয়নে অবলোকন করে অকুণ্ঠচিত্তে একথা স্বীকার করবে যে, আল্লাহ্ই সকল কিছুর একক স্রষ্টা ও পুনরুত্থানকারী। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, যেমন করে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ আনুগত্যকারী তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করে, তোমরাও তেমনি প্রশংসা বচন উচ্চারণ করতে করতে উপস্থিত হবে হাশরের ময়দানে। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির লক্ষ্যস্থল ইমানদারগণ। তাঁরাই তখন আল্লাহ্র স্তব-স্তুতি করতে করতে অগ্রসর হবে বিচারের ময়দানের দিকে। কাফেরেরা আল্লাহ্র স্তব-স্তুতির কথা মুখেই আনবে না। কেবল উচ্চারণ করতে থাকবে 'হায় হায়' 'হায় হায়' এবং বলবে— 'হায়। এটা তো সেই ঘটনা, আল্লাহ্ যার কথা পূর্বাহ্নে জানিয়েছিলেন। রসুলগণ তো ঠিকই বলেছিলেন। আক্ষেপ! আমরা তো আল্লাহ্র বিধানের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছিলাম।' বিশ্বাসীগণ সমুত্থিত হবে একথা বলতে বলতে— হায়, হায়। কে আমাদেরকে স্বপ্নবিভোর নিদ্রাস্থল থেকে সমুত্থিত করলো।

খাত্তালী তাঁর 'আদদীবাজ' নামক গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে জিবরাইল জানিয়েছেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমা মৃত্যুর সময়, কবর জীবনে এবং পুনরুত্থানকালে শান্তিপ্রদায়ক হবে। ভ্রাতা মোহাম্মদ! সেদিনের অবস্থা হবে আশ্চর্যজনক। বিশ্বাসীরা তাদের আপনাপন সমাধি থেকে মাথা ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াবে এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ও আলহামদুলিল্লাহ্' বলতে বলতে পা বাড়াবে হাশরের ময়দানের দিকে। তাদের চেহারা হবে তখন শুভ্র ও উজ্জ্বল। আর অবিশ্বাসীরা তখন বলবে, হায় আফসোস! আমি যথাকর্তব্য পালনে অবহেলা করেছি। তাদের মুখমণ্ডল তখন হবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিবরানী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমায় প্রত্যয় স্থাপনকারী মৃত্যুকালে, কবরে ও পুনরুত্থান দিবসে থাকবে নিরাপদ। যেনো ওই দৃশ্যটি আমার চোখের সামনে— দ্বিতীয় শিঙ্গা-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসীরা তাদের স্ব স্ব সমাধি থেকে মাথা ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াচ্ছে আর বলছে 'আলহামদুলিল্লাহিল্ লাজী আযহাবা আন্নাল হাযানা'। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

কালাবীর বর্ণনায় এসেছে, যখন ইসলামের উন্মেষ ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে শুরু করলো, তখন অংশীবাদীরা সংখ্যালঘু মুসলমানের উপরে শুরু করে দিলো অকথ্য অত্যাচার। নির্যাতিত সহচরবৃন্দ রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে সংকট মুক্তির জন্য নিবেদন জানালো। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৫৩, ৫৪, ৫৫

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۝ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ۚ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۝ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝

❒ আমার দাসদিগকে যাহা উত্তম তাহা বলিতে বল। শয়তান উহাদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

❑ তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগকে ভালভাবে জানেন। ইচ্ছা করিলে তিনি তোমাদিগের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে শাস্তি দেন; আমি তোমাদিগকে উহাদিগের অভিভাবক করিয়া পাঠাই নাই।

❑ যাহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাহাদিগকে তোমার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন। আমি তো নবীগণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়াছি; দাউদকে আমি জবুর দিয়াছি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমার দাসদেরকে যা উত্তম তা বলতে বলো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার পার্শ্বচরগণকে ইসলাম প্রচার করতে বলুন নম্রতা, শুভমনোবৃত্তি ও হৃদয়স্পর্শী যুক্তির মাধ্যমে। পরিহার করতে বলুন উগ্রতা ও মূর্খজনোচিত বিতর্ক। হাসান বলেছেন, অংশীবাদীদেরকে বলতে হবে, আল্লাহ্ আপনাকে সোজা পথ প্রদর্শন করুন। উল্লেখ্য যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে জেহাদের অনুমতি প্রদানের পূর্বে।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। জনৈক অংশীবাদী তাঁকে গালি দিয়েছিলো। এই আয়াতের মাধ্যমে হজরত ওমরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তাকে ক্ষমা করার জন্য। কোনো কোনো আলেম বলেছেন এখানে 'যা উত্তম' বলে বুঝানো হয়েছে কলেমায়ে এখলাস ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্কে। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনাটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। অর্থাৎ এখানে সকল মুসলমানকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে— ওই কথা বলবে যা সর্বোত্তম এবং ওই আচরণ অবলম্বন করবে যা সর্বোন্নত।

এরপর বলা হয়েছে— 'শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।' একথার অর্থ— শয়তান মানুষে মানুষে শুরু করায় দ্বন্দ্ব-কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ। সে তো মানুষের নিশ্চিত শত্রু। কুপ্ররোচনায় মানুষকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাওয়াই তার কাজ। সুতরাং সতর্ক হতে হবে। কথা বলতে হবে সাবধানে। চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়হারক ভাষায়। যেনো শত্রু শয়তান প্ররোচিত করার কোনো ফাঁকফোকড় খুঁজে না পায়।

পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ভালোভাবে জানেন। ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন।' ইবনে জুরাইজ বলেছেন, এই আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের 'যা উত্তম তা বলতে বলো' কথাটির ব্যাখ্যা। মধ্যবর্তী কথাগুলো ভিন্ন প্রসঙ্গের। এভাবে ব্যাখ্যা করলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি অবিশ্বাসীদেরকে বলুন 'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক

পরিজ্ঞাত।' আপনার একনিষ্ঠ অনুচরবর্গকেও এরকম বলতে নির্দেশ দিন। তাদেরকে গালিগালাজ করা ও তাদের মূর্খতাসুলভ কথাবার্তার জবাব দেয়াও ঠিক নয়। স্পষ্ট করে একথাও বলা ঠিক নয় যে, 'তোমরা দোজখী।' এতে করে কলহ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া একথাও তো কারো জানা নেই যে, তারা জীবন সমাপন করবে কিসের উপরে? অবিশ্বাসে না বিশ্বাসে। এরকম হওয়াও তো সম্ভব যে, মৃত্যুর পূর্বে যে কোনো সময় তারা হয়ে যাবে ইমানদার। এ জ্ঞান তো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নেই।

কালাবী বলেছেন, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে বিশ্বাসীদেরকে। সেক্ষেত্রে মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্তায়ালা কোনো কিছু করতে বাধ্য নন। অভিপ্রায় ও ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি চিরস্বাধীন, চিরমুক্ত। সেকথাই এখানে দ্ব্যর্থহীনতার সঙ্গে জানিয়ে দেয়া হয়েছে এভাবে— ইচ্ছে করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, আবার ইচ্ছে করলে প্রদান করবেন শাস্তি। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে অংশীবাদীদের উপরে বিজয়ী করে দিবেন, অথবা ইচ্ছে করলে তোমাদের উপরে প্রবল করে দিবেন তাদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি আপনাদেরকে তাদের অভিভাবক করে পাঠাইনি।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি তো আপনাকে এবং আপনার অনুচরগণকে এমতো দায়িত্ব দান করিনি যে, আপনারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে জোর করে মুসলমান বানাবেন বা বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবেন। আপনি তো কেবল শুভসমাচার প্রদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী। পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তো আমার। সুতরাং আশ্রয় করুন বিনম্র বচন ও সুন্দর আচরণকে। সাথীদেরকেও এরকম নির্দেশ দিন। আর তাদের দিক থেকে আগত কষ্ট-বিপদকে মোকাবিলা করতে বলুন ধৈর্যের মাধ্যমে।

এর পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে, তাদেরকে তোমার প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন।' একথার অর্থ— আকাশ ও পৃথিবীতে যারা বা যা কিছু আছে, তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। কারণ তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা ও পালনকর্তা। তিনি জানেন মানুষের মধ্যে কে নবুয়তের যোগ্য এবং কে যোগ্য বেলায়েতের। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানই বা কার অনড় অদৃষ্টলিপি।

মক্কার মুশরিকেরা বিস্মিত হয়ে বলতো, আবু তালেবের এতিম ভ্রাতুষ্পুত্র আবার নবী হতে পারে কীভাবে? কীভাবে বেলাল ও সুহাইবের মতো ক্রীতদাসেরা হতে পারে আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন। আর বেহেশত-দোজখ যদি থেকেই থাকে, তবে মক্কার অভিজাত কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ নারকী হবে কেনো? তাদের এমতো অপকথনের যথোপযুক্ত জবাব দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে,

বংশগত ও সম্পদগত আভিজাত্য মানুষের প্রকৃত যোগ্যতার মাপকাঠি নয়, যার কারণে চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভ করা যায়। বরং মানুষের প্রকৃত যোগ্যতা সম্পর্কে জানেন কেবল আল্লাহ্। জানেন, কে সূচনাগত দিক থেকে চিরসৌভাগ্যশালী এবং কে চিরবঞ্চিত।

এরপর বলা হয়েছে—'আমি তো নবী-গণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি।' একথার অর্থ স্বভাবগত ও প্রবৃত্তিগত দিক দিয়ে আমি আমার নবীগণকে মর্যাদায়িত করেছি এবং তাদের পার্থিব শরীরকেও করেছি পবিত্র ও নিষ্পাপ। তাই শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিভূ তাঁরাই। পার্থিব ধন-সম্পদ ও আভিজাত্য কখনোই শ্রেষ্ঠত্বের স্মারক নয়। আর আমি নবীগণের মধ্যেও মর্যাদার ন্যূনাধিক্য ঘটিয়েছি। কাউকে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি কারো কারো উপর। তাই সকলেই শ্রেষ্ঠ হলেও কেউ কেউ আবার অন্যাপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর ব্যপদেশে কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর কোনো কোনো নবীকে বিশেষভাবে মর্যাদায়িত করেছেন। যেমন হজরত ইব্রাহিমকে করেছেন খলিল(বন্ধু)। হজরত মুসার সঙ্গে করেছেন বাক্যালাপ। হজরত ঈসাকে সৃষ্টি করেছেন পিতা ব্যতিরেকে, কেবল 'কুন' (হও) আদেশের মাধ্যমে। আমি বলি, হজরত ঈসাকে আরো অনেক ফযীলত দান করেছেন আল্লাহ্তায়ালা। যেমন তাঁকে দিয়েছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশু অবস্থায় কথা বলার শক্তি। দিয়েছিলেন কিতাব ও হেকমত। তওরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান। রূহুল কুদুসকে (হজরত জিবরাইলকে) করে দিয়েছিলেন তাঁর সাহায্যকারী। কাতাদা আরো বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত সুলায়মানকে দান করেছিলেন এক বিস্ময়কর সাম্রাজ্য। মানুষ-জ্বিন সকলেই ছিলো তাঁর আজ্ঞাবহ। জ্বিনদেরকে তিনি বন্দী করে রাখতে পারতেন। আর তিনি হজরত দাউদকেও দান করেছিলেন বিশেষ সম্মান। দিয়েছিলেন যবুর।

শেষে বলা হয়েছে— 'দাউদকে আমি যবুর দিয়েছি।' উল্লেখ্য যে, হজরত দাউদকেও আল্লাহ্তায়ালা বানিয়েছিলেন রাজ্যাধিকারী। কিন্তু সেকথা এখানে বলা হয়নি। বলা হয়েছে কেবল যবুর কিতাব প্রদানের কথা।

মক্কার অংশীবাদীরা পার্থিব বিত্ত-বৈভব ও সামাজিক নেতৃত্ব-কর্তৃত্বকেই মনে করতো প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব। এসকল কিছু রসুল স. এর ছিলো না বলেই তারা রসুল স.কে নবী বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত ছিলো। আলোচ্য আয়াতে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাদের অপধারণাকে নাকচ করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে জ্ঞান ও হেকমতই হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। আর এই শ্রেষ্ঠত্ব তিনি দিয়েছেন তাঁর বার্তাবাহকগণকে। তাঁদের মধ্যে আবার কাউকে কাউকে দিয়েছেন বিশেষ ফযীলত। যেমন নবী দাউদকে দিয়েছেন যবুর নামের আকাশী গ্রন্থখানি। এভাবে পরোক্ষভাবে বলে দিয়েছেন যে, সর্বশেষের রসুল ও তাঁর উপরে অবতীর্ণ কোরআনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। আর সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের উম্মতেরাও সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। কেননা যবুর কিতাবে বলা

হয়েছে— জমিনের উত্তরাধিকারী হবে 'আসহাবে সিলাহ' (বিশুদ্ধাচারী সহচর)। কোরআন মজীদ পূর্ববর্তী সকল কিতাবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কারণ জ্ঞান, কল্যাণ ও অলৌকিকত্বের সমারোহ এই কিতাবে অধিক। আর যাঁর উপরে এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তিনিও আল্লাহ্তায়ালার সর্বাপেক্ষা অধিক নৈকট্যভাজন ও প্রিয়জন। তাই আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং বলেছেন— 'তৎপর সে হলো নিকটবর্তী, আরো নিকটতর, দুই ধনুকের জ্যা পরিমাণ নিকটে, বরং তদপেক্ষা কম।'

বাগবী লিখেছেন, যবুর অবশ্যই আল্লাহ্র কিতাব, যা অবতীর্ণ হয়েছিলো আল্লাহ্র প্রিয় নবী হজরত দাউদের উপরে। যবুর শরীফে ছিলো একশত পঞ্চাশটি সুরা। সবগুলো সুরাই ছিলো আল্লাহ্তায়ালার স্তব-স্তুতি ও প্রার্থনার ভাষায় ভরপুর। হালাল-হারাম, ফরজ-ওয়াজিব ইত্যাদি বিধানের আলোচনা সেখানে একেবারেই ছিলো না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ইসলামপূর্ব সময়ে কোনো কোনো লোক কোনো কোনো জ্বিনের পূজা করতো। ইসলাম আগমনের পর ওই সকল জ্বিন মুসলমান হয়ে গেলো। তবুও তাদের পূজকেরা তাদের পূজা-অর্চনা করেই যেতে লাগলো। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৫৬, ৫৭

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝

❒ বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ইলাহ্ মনে কর তাহাদিগকে আহ্বান কর; করিলে দেখিবে তোমাদিগের দুঃখ-দৈন্য দূর করিবার অথবা পরিবর্তন করিবার শক্তি উহাদিগের নাই।'

❒ উহারা যাহাদিগকে আহ্বান করে তাহাদিগের মধ্যে যাহারা নিকটতর তাহারাই তো তাহাদিগের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে, তাঁহার দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁহার শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল জ্বিন-পূজারীদের বলে দিন, তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদের পূজা করে, তাদের কারো

দুঃখ-দারিদ্র দূর করার অথবা কারো কোনো প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা নেই। তারাও তাদের পূজারীদের মতো সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর ও একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী।

পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তাদের মধ্যে যারা নিকটতর, তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে।' একথার অর্থ জ্বিনপূজকেরা যে সকল জ্বিনের পূজা করে, সে সকল জ্বিন তো এখন গ্রহণ করেছে মহান ধর্ম ইসলাম। এখন তো তারা ইমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য ও পারিতোষ প্রত্যাশী। কোনো কোনো আলেম বলেন, 'ওয়াসীলাহ্' সীন সহযোগে (উপলক্ষ) হচ্ছে সুনির্দিষ্ট। আর ওয়াছীলাহ্ সদ্ সহযোগে (মিলিত) হচ্ছে সাধারণ। এই সাধারণ 'ওয়াসীলা'র অর্থ একে অপরের সঙ্গে মিলিত হওয়া। আর আলোচ্য বাক্যে উল্লেখিত 'ওয়াসীলা' অর্থ আবেগ বা অনুরুক্তির মাধ্যমে কোনো স্থানে বা অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া। 'ওয়াসীলা ইলাল্লহ্' এর অর্থ এলেম ও আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথের সুরক্ষা করা এবং কায়মনোবাক্যে শরিয়তের বিধান প্রতিপালনের ইচ্ছা ও চেষ্টা করা। এভাবে 'ওয়াসীলা ইলাল্লাহ্' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের উপায় অনুসন্ধান। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'ওয়াসীলা' ও 'ওয়া-সেলা' অর্থ বাদশাহ্‌র দরবারের বিশেষ মর্যাদা ও নৈকট্য। এভাবে 'ওয়াস্‌সালা ইলাল্লহি তাওয়াস্‌সালা' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— সে এমন আমল করেছে, যার দ্বারা সে পৌঁছে গিয়েছে আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজনতার স্তরে।'আইয়্যুহুম আক্বরাবু' অর্থ তাদের মধ্যে যারা নিকটতর। এভাবে সম্পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তাদের মধ্যে যারা অধিকতর নৈকট্যভাজন, তারা আল্লাহ্‌তায়ালার আরো অধিক নৈকট্যলাভের 'ওয়াসীলা' বা উপায় অন্বেষণ করে। অতএব যারা নৈকট্যভাজন নয়, তাদের অবস্থা সহজে অনুমেয়। এরকম বলেছেন জুজায। কোনো কোনো তাফসীরকার আবার বলেছেন, এখানকার বক্তব্যটি হবে এরকম— তারা এমন ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধান করে, যারা আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বাপেক্ষা অধিক নৈকট্যশীল। অথবা বক্তব্যটির মর্ম হতে পারে এরকম— তারা আল্লাহ্‌তায়ালার অধিকতর নৈকট্যকামী। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের জন্য তারা উচ্চাশা পোষণকারী, একনিষ্ঠ আনুগত্যের মাধ্যমে অধিকতর নৈকট্যপ্রত্যাশী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।' একথার অর্থ— ওই সকল জ্বিন ইসলাম গ্রহণের কারণে আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যলাভ করা সত্ত্বেও আরো অধিক নৈকট্য অর্জনের উপায় অনুসন্ধান তো করেই, তদুপরি তারা চায় আল্লাহ্‌র দয়া এবং ভয় করে তার শাস্তিকে। সুতরাং অংশীবাদীরা কোন যুক্তিতে তাদের উপাসনা করতে চায়?

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জ্বিনপূজক অংশীবাদীদেরকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্তায়ালা আনুরূপ্যবিহীন প্রতাপ ও পরাক্রমের অধিকারী। তাই তার প্রিয়ভাজন নবী-রসুলগণ ও ফেরেশতাকুলও তাঁকে ভয় করে থাকেন। তবে তোমরা তাঁকে ভয় করবে না কেনো?

বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য বক্তব্যের অর্থ— হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমরা ফেরেশতা, জ্বিন, মসীহ, উযায়ের— অনেককেই তো তোমাদের উপাস্য স্থির করে নিয়েছো। কিন্তু তারা কেউই তোমাদেরকে এরকম বলেননি। তারা তো সম্পূর্ণতই আমার উপর নির্ভরশীল। তারা যে আমার খাঁটি বান্দা। তারা তো চায় কেবল আমার নৈকট্য ও সন্তোষ।

হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন, হজরত ঈসা, তাঁর মহাসম্মানিতা জননী, হজরত উযায়ের, ফেরেশতাকুল, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা সকল কিছুই আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য ওয়াসীলা অন্বেষণকারী, কেবল তাঁর দয়া প্রত্যাশা এবং কেবল তাঁর শাস্তিকে ভয়কারী। প্রকৃত অবস্থা যখন এই, তখন অংশীবাদীরা কীভাবে তাদেরকে তাদের প্রভুপ্রতিপালকরূপে গ্রহণ করে?

বাগবী লিখেছেন, একবার মক্কাবাসীরা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হলো। অবস্থা এতো সঙ্গীন হয়ে পড়লো যে, মৃত পশুর গোশত ভক্ষণ করেও ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণ করতে হলো তাদেরকে। নিরুপায় হয়ে তারা রসুল স. এর নিকটে হাজির হলো প্রার্থনার প্রস্তাব নিয়ে। তখন অবতীর্ণ হলো— 'আপনি অংশীবাদীদেরকে বলুন, আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে যে জ্বিনগুলোর ইবাদত তোমরা করো, তাদের কাছেই সাহায্যপ্রার্থী হও, তারা তো তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার শক্তি রাখে না।'

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৫৮

وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا

❑ এমন কোন জনপদ নাই যাহা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করিব না অথবা যাহাকে কঠোর শাস্তি দিব না; ইহা তো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এমন কোনো জনপদ নেই, যা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করবো না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দিবো না।' একথার অর্থ— মহাপ্রলয়ের দিন অথবা তৎপূর্বেই আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও স্বেচ্ছাচারীদের সকল জনপদ বিনাশ করবো। অথবা তাদেরকে প্রদান করবো কঠোর শাস্তি। মুকাতিল প্রমুখ বলেছেন, এখানে ধ্বংস করার অর্থ মেরে ফেলা।

অর্থাৎ ওই সকল জনপদের লোকদের মধ্যে যারা ইমানদার তাদের ঘটাবো সাধারণ মৃত্যু, আর যারা কাফের তাদের উপরে বারংবার আপতিত করবো বিভিন্ন রকমের গজব।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, যে সকল জনপদে সুদ ও অবৈধ যৌনাচারের ব্যাপক প্রচলন হয়, ওই সকল জনপদকে আল্লাহ্তায়ালা ধ্বংস করে দেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা তো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।' এখানে কিতাব অর্থ লওহে মাহফুজ। হজরত উবাদা ইবনে সামেত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ সৃষ্টি করলেন কলমকে। তারপর তাকে লক্ষ্য করে বললেন, লেখো। কলম বললো, কী লিখবো? আল্লাহ্ বললেন, তকদীর। কলম তখন আদি অন্তের সকল ঘটিতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করলো। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি। তিনি আরো বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী ও হাকেম এবং হজরত ইবনে যোবায়ের থেকে তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার মক্কাবাসীরা রসুল সকাশে হাজির হয়ে বললো, মোহাম্মদ! সত্যিই যদি তুমি নবী হয়ে থাকো তবে তার প্রমাণ স্বরূপ সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দাও এবং নিকটবর্তী অন্যান্য পাহাড়কে সরিয়ে মক্কাসংলগ্ন এলাকাকে করে দাও সমতলভূমি। আমরা ওই বিস্তীর্ণ সমভূমিতে আবাদ করবো ফল ও ফসল। তাদের এমতো আবদারের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে জানালেন, আপনি যেমন চান তেমনই হবে। যদি চান, তাদের বাসনা পূরণ না হোক, তবে তাই করবো আমি। আর যদি চান, তাদের অভিলাষ ফলবতী হোক, তবে তাও করবো। কিন্তু তাদের অভিলাষ বাস্তবায়নের পর যদি তারা ইমান না আনে, তবে তাদেরকে ধ্বংস করে দিবো পূর্ববর্তী যুগের অবাধ্যদের মতো। রসুল স. বললেন, হে আমার আল্লাহ্! তাদেরকে অবকাশ দেয়া হোক। তাদের বাসনা পূরণ না হওয়াই উত্তম। রসুল স. এর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৫৯, ৬০

وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ۝ وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ ؕ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ۝

❐ পূর্ববর্তিগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখে। আমি স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ সামূদের নিকট উষ্ট্রী পাঠাইয়াছিলাম, অতঃপর তাহারা উহার প্রতি জুলুম করিয়াছিল। আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।

❐ স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখাইয়াছি তাহা ও কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি উহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করি কিন্তু ইহা উহাদিগের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে বিরত রাখে।' একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা পূর্ববর্তী যুগের মুশরিকদের মতোই অবিমৃশ্য, উন্নাসিক ও গোঁয়ার। তাদের পূর্বসূরীরা তাদের নবী-রসুলগণের নিকটে বিভিন্ন মোজেজা দেখতে চেয়েছিলো। এরাও সেরকম চায়। তাদের পূর্বসূরীরা মোজেজা দেখেও ইমান আনেনি। তাই তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। এখন যদি আমি মোজেজার প্রকাশ ঘটাই তবে এরাও মোজেজার অবমাননা করবে। ফলে পূর্ববর্তীদের মতোই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আমার আখেরী নবীর উম্মতকে ধ্বংস করা আমার অভিপ্রায় নয়। তাই এদের অপঅভিলাষ পূরণ করা থেকে আমি বিরত রইলাম।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ ছামুদের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা তার উপর জুলুম করলো।' একথার অর্থ— ছামুদ সম্প্রদায় তাদের নবী হজরত সালেহের নিকটে চেয়েছিলো প্রস্তরাগত অলৌকিক উষ্ট্রী। আমি সে উষ্ট্রী তাদেরকে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা সে উষ্ট্রটিকে হত্যা করে ফেলেছিলো। এভাবে হয়েছিলো আত্মঅত্যাচারের অপরাধে অপরাধী। যথোপযুক্ত শাস্তিও তারা পেয়েছিলো এজন্যে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।' একথার অর্থ— মোজেজা বা নিদর্শন হচ্ছে ভয় প্রদর্শন করা। অর্থাৎ অলৌকিকত্ব দর্শনে ভীত হয়ে মানুষ যেনো সত্যধর্মে ফিরে আসে, আমি মোজেজার প্রকাশ ঘটাই সে উদ্দেশ্যেই। এরপরেও ভীত না হলে সমূলে বিনাশ করি তাদেরকে। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— হে আমার রসুল! আপনার সমকালীন ও অনাগত জনগোষ্ঠিকে ভীতি প্রদর্শনের জন্যই আমি কোরআনে সন্নিবেশিত করেছি পূর্ববর্তী যুগের মোজেজাসমূহের বিবরণ।

পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! স্মরণ করুন, আমি আপনাকে পূর্বাহ্নেই এ কথা জানিয়ে দিয়েছি যে, আপনার বিরুদ্ধবাদীদের শাস্তি নিশ্চিত। আল্লাহ্তায়ালার মহা-

পরাক্রমের অভেদ্য বেষ্টনী দ্বারা তারা সতত পরিবেষ্টিত। এখানে 'আন্নাস্' (মানুষকে) কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মক্কার মুশরিকদেরকে। আর 'পরিবেষ্টন করে আছেন' অর্থ তাদেরকে অবধারিত আযাবের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিবেষ্টন করে আছেন। এভাবে এখানে দেয়া হয়েছে বদর প্রান্তরের ধ্বংস হওয়ার সুসংবাদ। তাই হয়েছিলো। বদর যুদ্ধে তাদের অনেকে হয়েছিলো নিহত অথবা বন্দী। অবশিষ্টরা পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে এসেছিলো পালিয়ে। ওই ঘটনাটি সুনিশ্চিত ছিলো। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালের শব্দরূপ। অর্থাৎ যেনো তা ঘটেই গিয়েছে।

আবু ইয়ালীর বর্ণনায় হজরত উম্মে হানী থেকে এবং ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় হাসান বসরী সূত্রে এসেছে, রহস্যাচ্ছন্ন মেরাজের রাত্রি অবসান হলো। সকালে রসুল স. কুরায়েশদের এক সমাবেশে মেরাজের ঘটনা জানালেন। তারা রসুল স. এর কথা হেসে উড়িয়ে দিলো তারা। কেউ কেউ আবার বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করে, সত্যাসত্য যাচাই করে দেখলো। জানতে চাইলো বায়তুল মাকদিসের বিবরণ, তাদের মক্কাভিমুখী কাফেলার সংবাদ ইত্যাদি। রসুল স. তাদের সকল প্রশ্নের সঠিক জবাব দিলেন। বিস্মিত ও অভিভূত ওলীদ বিন মুগীরা তখন বলে উঠলো, এ লোক নিশ্চয় যাদুকর। তখন অবতীর্ণ হলো আয়াতের পরবর্তী বাক্যটি।

বলা হলো— 'আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য।' একথার অর্থ— আমি মেরাজের ঘটনাকে এবং দোজখের অভিশপ্ত 'যাক্কুম' বৃক্ষকে বানিয়েছি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য ফেৎনা বা পরীক্ষা। অর্থাৎ এ দু'টোকে যারা বিশ্বাস করে তারা ইমানদার। আর যারা অবিশ্বাস করে তারা কাফের।

উল্লেখ্য যে, মেরাজের ঘটনা প্রকাশ করার পর মক্কার অংশীবাদীরা তো অস্বীকার করেছিলোই, তাদের সতীর্থ হয়েছিলো কিছুসংখ্যক দুর্বল বিশ্বাসীও। এভাবে বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের স্পষ্টরূপে পৃথক করা হয়েছিলো অবিশ্বাসীদের থেকে। এখানে 'রু'ইয়া' (দর্শন) কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর মেরাজ হয়েছিলো স্বপ্নের মাধ্যমে। বোখারীর বর্ণনায় তাই এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. এর মেরাজ হয়েছিলো রূহানীভাবে, সশরীরে নয়। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'রু'ইয়া' অর্থ চর্মচক্ষের দর্শন। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, হাসান বসরী, মাসরুক, কাতাদা, মুজাহিদ, ইকরামা, ইবনে জুরাইজ এবং অধিকাংশ আলেম এই অভিমতই পোষণ করেন। আরববাসীরা বলে 'রআইতু বিআইনী রু'ইয়াতান (আমি স্বচক্ষে দেখেছি)। এবং 'রুইয়ান' কথা দু'টোর অর্থও— আমি নিজ চোখে দেখেছি। 'রুইয়াত্' ও 'রুইয়া' শব্দ দু'টো সমার্থক। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, রসুল স. এর মেরাজ হয়েছিলো দু'বার— একবার রূহানীভাবে, আর একবার সশরীরে।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি হাকাম বিন আসের সন্তানদেরকে মিম্বরের উপরে বানরনৃত্য করতে দেখেছি। তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে 'আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষকে পরীক্ষা করবার জন্য'। এখানে হাকামের সন্তানদের ফেৎনা বা পরীক্ষার কথাই বলা হয়েছে। তার পুত্র মারওয়ান ও প্রপৌত্র আবদুল মালেক পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতা পেয়েছিলো। তাদের ওই ক্ষমতান্মোত্ততার দৃশ্যই রসুল স.কে স্বপ্নযোগে দেখানো হয়েছিলো। হজরত সহল ইবনে সা'দ, হজরত ইয়ালী ইবনে মুররাহ্, হজরত হোসাইন ইবনে আলী, উম্মত জননী হজরত আয়েশা এবং হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হজরত ইমাম হোসাইন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একদিন সকালে রসুল স.কে চিন্তাক্লিষ্ট দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি স. বললেন, আমি দেখলাম আমার এই মিম্বরে বনী উমাইয়ারা পালাক্রমে উপবেশন করছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! চিন্তিত হবেন না। এটা তো দুনিয়া। দুনিয়াতেই তারা তাদের প্রাপ্য পেয়ে যাবে। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতের এই অংশটি— আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা ও কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। অতএব বুঝতে হবে, এখানকার 'ফেৎনা '(পরীক্ষা) কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে বনী উমাইয়ার শাসনকালের বিভিন্ন বেদাত, অশ্লীলতা ও বিশৃঙ্খলার কথা।

হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একবার স্বপ্নে দেখলেন, বনী উমাইয়ারা বিসদৃশভাবে একের পর এক তাঁর মিম্বরে গমনাগমন করছে। এ স্বপ্ন দেখে তিনি স. বিমর্ষ হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতাংশ।

হজরত আমর বিন আস থেকে ইবনে আবী হাতেম, হজরত ইয়ালী বিন মাররাহ থেকে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া এবং হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে অবিন্যস্ত সূত্রে বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, একবার রসুল স. স্বপ্নে বনী উমাইয়াকে তার মিম্বরে একের পর এক আরোহণ করতে দেখলেন। ফলে তিনি হয়ে পড়লেন বিষণ্ন ও মনোক্ষুণ্ন। আল্লাহ্ তখন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানালেন, পরবর্তীতে তাদেরকে শাসন ক্ষমতা দেয়াই আল্লাহ্র ইচ্ছা। একথা জানতে পেরে তিনি স. স্বস্তিবোধ করলেন (কারণ তিনি স. ছিলেন আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে সদাপ্রসন্ন)। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ের সকল হাদিস শিথিলসূত্রবিশিষ্ট।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'আররু'ইয়া' অর্থ ওই স্বপ্ন, যা রসুল স. দেখেছিলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনের বছরে। দেখেছিলেন, তিনি স. তাঁর সহচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করছেন। এই স্বপ্ন দেখার

পরই তিনি স. সাহাবীগণকে নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু হুদায়বিয়া থেকে সম্মুখে আর অগ্রসর হতে পারেননি। মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনের পর তাঁকে মদীনায় ফিরে আসতে হয়েছিলো। ওই ঘটনাটি ছিলো কিছু সংখ্যক দুর্বলচিত্ত বিশ্বাসীদের জন্য একটি পরীক্ষা। পরের বছর তিনি ঠিকই মক্কায় গমন করতে পেরেছিলেন। আর তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো— 'লাক্বদ্ সাদাক্বল্লাহু রসুলাহুর্রু'ইয়া বিলহাক্ব' (আল্লাহ্ তাঁর রসুলের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে দেখালেন)। বায়যাবী লিখেছেন, এই বর্ণনাটি গ্রহণ করলে একটি সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। সন্দেহটি এই— আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কিন্তু হুদায়বিয়ার ঘটনা ঘটেছিলো হিজরতের পরে। তবে একটি কথা মেনে নিলে সন্দেহ আর থাকে না। তা হচ্ছে— স্বপ্নটি তিনি মক্কাতেই দেখেছিলেন। কিন্তু বর্ণনা করেছিলেন হিজরতের পরে— মদীনায়। আমি বলি, একথাটিও ঠিক নয়। কারণ বায়যাবী এ কথাও লিখেছেন যে, আলোচ্য স্বপ্নের সম্পর্ক রয়েছে বদর যুদ্ধের সঙ্গে। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে— 'ওয়া ইজ ইউরিকাহুমুল্লহু ফী মানামিকা কৃলীলা।' এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বদর প্রান্তরে বৃষ্টির জমানো পানিতে অবতরণ করলেন। বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, মুশরিকেরা কোন কোন স্থানে নিহত হবে। একথা বলে তিনি মুশরিক নেতাদের নাম ধরে ধরে তাদের নিহত হওয়ার স্থান দেখিয়ে দিতে লাগলেন। একথা যখন মুশরিক বাহিনীর লোকেরা শুনলো, তখন তারা এই নিয়ে উপহাস করতে লাগলো।

'শাজারাতাল মাল্উ'নাহ্' অর্থ অভিশপ্ত বৃক্ষ বা যাক্কুম বৃক্ষ। অর্থাৎ ওই বৃক্ষটি মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা। এ পরীক্ষার স্বরূপ রয়েছে দু'টি— ১. আবু জেহেল একবার বললো, হে মক্কাবাসী! শোনো, মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ তোমাদেরকে এমন আগুনের ভয় দেখায় যা পাথরকেও পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। কিন্তু সে আবার একথাও বলে যে, ওই অগ্নিকুণ্ডে থাকবে নাকি একটি বৃক্ষ। তা হলে বোঝো কী রকম উল্টাপাল্টা কথা সে বলে। নিঃসন্দেহে আবু জেহেলের এরকম মন্তব্য চরম পর্যায়ের মূর্খতার নিদর্শন ছাড়া অন্য কিছু নয়। পৃথিবীতেই এরকম অনেক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন সামান্দল নামক এক প্রকার পাখির পিঠের চামড়া আগুনে পোড়ে না। আবার উট পাখি ভক্ষণ করতে পারে উত্তপ্ত লৌহখণ্ড। এতে করে তার গলা,পাকস্থলি কোনোটাই জ্বলে না। যে আল্লাহ্ পৃথিবীতে এরকম নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি দোজখে দহনক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত কোনো বৃক্ষ সৃষ্টি করতে পারবেন না? তাফসীরে মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন, তুর্কিস্তানের এক প্রকার ছোট প্রাণীর নাম সামান্দল। ওই প্রাণীটির চামড়া দিয়ে রুমাল বানানো হয়। রুমাল ময়লা হয়ে গেলে তা আগুনে ফেলে

দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। আর রুমালের ময়লা আগুনে পোড়ে। কিন্তু রুমাল পোড়ে না। বরং পরিষ্কার হয়ে যায়। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, সামান্দল আরবের এক শ্রেণীর পাখি; যা আগুনে পোড়ে না। পাখিটির বৈশিষ্ট্য হলো তার বাসস্থান অগ্নিতে। আগুন থেকে বের হলেই প্রাণত্যাগ করে। ২. ইবনে যাবআরী একবার বললো, মোহাম্মদ আমাদেরকে যাক্কুমের ভয় দেখায়। কিন্তু আমরা তো যাক্কুম বলি মাখন ও খেজুরকে। এছাড়া যাক্কুমের অন্য কোনো অর্থ আমাদের জানা নেই। এরকম বলে সে তার ক্রীতদাসীকে উচ্চ কণ্ঠে নির্দেশ দিলো— ইয়া জারিয়াতা তায়ালী যাক্কিমীনা (হে বাঁদী! আমার জন্য মাখন ও খেজুর নিয়ে এসো)। আবু জেহেলও তার সঙ্গে বলে উঠলো, হে মক্কাবাসী! তোমরা সকলে যাক্কুম ভক্ষণ করো। মোহাম্মদ তো তোমাদেরকে এই যাক্কুমেরই ভয় দেখায়। সুরা সাফ্ফাতে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

ইবনে আবী হাতেম এবং বায়হাকী আল্ বা'ছ নামক গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন আল্লাহ্ অংশীবাদী কুরায়েশদেরকে যাক্কুমের ভয় দেখালেন, তখন আবু জেহেল তার অনুসারীদেরকে বললো, মোহাম্মদ তোমাদেরকে যাক্কুমের ভয় দেখায়। বলো দেখি যাক্কুম কী? লোকেরা বললো, আমরা তো জানি না। আবু জেহেল বললো, যাক্কুম হচ্ছে ইয়াসরেবের (মদীনার) উন্নতমানের খেজুর, যা মাখনের সঙ্গে মিলিয়ে খাওয়া হয়। অতএব ওই যাক্কুম যদি আমরা পাই, তাহলে তো আমরা তা বেশী বেশী করে খাবো। এরপর আবু জেহেল বললো, লানাতাযাক্কামান্নাহা তাযাক্কুমা (যাক্কুমের দ্বারা অবশ্যই আমি তাদেরকে তুষ্ট করবো)। এরপর অবতীর্ণ হয় ১. ওয়াশ্শাজারাতাল মাল্উ'নাতা ফীল্ কুরআন (আর কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ)। ২. ইন্নাশ্শাজারাতায্ যাক্কুমী ত্বআ'মূল্ আছীম (অবশ্যই যাক্কুম বৃক্ষ পাপীদের আহার্য)।

যাক্কুম বৃক্ষ অত্যন্ত ভয়ংকর। তাই এখানে ওই বৃক্ষকে বলা হয়েছে অভিশপ্ত বৃক্ষ। আর ওই বৃক্ষ হবে জাহান্নামের 'জাহীম' (অত্যুষ্ণ) এর মূল। আল্লাহ্র রহমত থেকে যারা সর্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্তী, তাদের চিরস্থায়ী আবাস হবে ওই জাহীম। অথবা বলা যায় 'মাল্উ'নাতুন্' অর্থ ঘৃণ্য, ক্ষতিকর। এরকম ঘৃণ্য ও ক্ষতিকর বস্তু ভক্ষণকেই আরব দেশে বলা হয় মালউন বা অভিশপ্ত। কারো কারো মতে এখানে যাক্কুম কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে শয়তানকে অথবা আবু জেহেলকে কিংবা হাকাম বিন আসকে।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করি, কিন্তু তা তাদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! পর্যবেক্ষণ করুন, আমি মুশরিকদেরকে ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে সত্যাভিমুখী করতে চাই। কিন্তু তারা চির অবাধ্য বলেই এতে করে তাদের অবাধ্যতা হয় আরো অধিক তীব্র।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ۗ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۝ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ إِلَّا قَلِيْلًا ۝ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ۝ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ إِلَّا غُرُوْرًا ۝ إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۚ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا

❒ স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাদিগকে বলিলাম, 'আদমের প্রতি নত হও,' তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হইল। সে বলিয়াছিল, আমি কি তাহাকে সিজদা করিব যাহাকে আপনি কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?'

❒ সে বলিয়াছিল, 'বলুন, উহাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করিলেন, কেন? কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহা হইলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তাহার বংশধরগণকে সমূলে নষ্ট করিয়া ফেলিব।'

❒ আল্লাহ্ বলিলেন, 'যা, জাহান্নামই সম্যক শাস্তি তোর এবং তাহাদিগের যাহারা তোর অনুসরণ করিবে।

❒ 'তোর আহ্বানে উহাদিগের মধ্যে যাহাকে পারিস্ সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা উহাদিগকে আক্রমণ কর এবং উহাদিগের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হইয়া যা, ও উহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দে,' শয়তান উহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় উহা ছলনা মাত্র।

❒ 'আমার দাসদিগের উপর তোর কোন ক্ষমতা নাই।' কর্মবিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার প্রথম পিতা আদম ও ইবলিসের কথা স্মরণ করুন। আমি আদমকে করেছি আমার বিশেষ

নৈকট্যভাজন ও প্রিয়ভাজন। তাই তাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সেজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম নেতৃস্থানীয় ফেরেশতাবৃন্দকে এবং ইবলিসকে। বলেছিলাম 'আদমের প্রতি প্রণতিপাত করো।' সকলেই নির্দেশ পালন করলো। কিন্তু ইবলিস করলো না। বরং দর্পভরে বললো, 'আদমকে আপনি সৃষ্টি করেছেন কর্দম থেকে। তাই তাকে আমি সেজদা করতে পারি না।'

লক্ষণীয় যে, কাদামাটি থেকে হজরত আদমের দেহাবয়ব গঠিত হওয়ার কারণে ইবলিস তাঁকে সেজদা করতে চায়নি। আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করা যে অত্যাবশ্যক, সে কথা তার মনেই ছিলো না। এই জঘন্য বিস্মৃতির কারণেই সে চিরঅভিশপ্ত। বাগবী লিখেছেন, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন আল্লাহ্ হজরত আদমকে সৃষ্টি করতে চাইলেন তখন এক ফেরেশতাকে নির্দেশ দিলেন, যাও, পৃথিবী থেকে মাটি নিয়ে এসো। নির্দেশ মোতাবেক পৃথিবী থেকে নিয়ে যাওয়া হলো এক মুঠো মাটি। ওই মাটি ছিলো মিষ্ট ও লবণাক্ত। ওই মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে হজরত আদম ও তাঁর বংশধরগণকে। সুতরাং মিষ্ট মাটি দ্বারা যে সৃষ্ট হয়েছে, সে হয়েছে সৌভাগ্যশালী, হেদায়েতপ্রাপ্ত— যদিও তার পিতা-মাতা কাফের হয়। আর যে সৃষ্ট হয়েছে লবণাক্ত মাটি থেকে, সে হয়েছে চিরদুর্ভাগা ও চিরভ্রষ্ট— যদিও তার পিতা হয় নবী।

হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, বায়হাকী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীর সকল স্থান থেকে কিছু কিছু করে মাটি একত্র করে মুঠোভর্তি মাটি নিয়ে যাওয়া হলো আল্লাহ্‌র সকাশে। ওই মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হলো তাঁকে। তাই তাঁর সন্তানেরা বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন স্বভাবের। কেউ কালো, কেউ শাদা, কেউ লাল, কেউ শ্যামলা। আবার কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ নম্র, কেউ কঠিন।

পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'সে বলেছিলো, বলুন, তাকে যে আপনি আমার উপরে মর্যাদা দান করলেন, কেনো? এ কথার অর্থ— ইবলিস তখন আমার নির্দেশ প্রতিপালন তো করেইনি, উপরন্তু আমাকে প্রশ্ন করেছিলো— আপনি আদমকে আমার চেয়ে বেশী মর্যাদা দান করলেন কেনো? কী উদ্দেশ্যে?

এরপর বলা হয়েছে— 'কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন, তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরগণকে সমূলে নষ্ট করে ফেলবো। 'ইহ্তানাকাল জারাদুয্ যারআ' একটি আরবী বাগধারা। এর অর্থ— পঙ্গপাল খেয়ে ফেলেছে ক্ষেতের সমস্ত ফসল। আর একটি অর্থ— আমি তার

উপর প্রতিষ্ঠা করবো আমার পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব, যেদিকে ইচ্ছা করবো সেদিকেই টেনে নিয়ে যাবো তাকে। হানাকাদ্ দাব্বাতা' অর্থ ঘোড়ার নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে শক্ত করে— যেনো তার মালিক তাকে যেদিকে খুশী সেদিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'ইহ্তানাকা' অর্থ কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। আবার 'ইহ্তানাকাল জারাদুল আরদ্ব' অর্থও— পঙ্গপাল ভক্ষণ করেছে ক্ষেতের সমুদয় ফসল। এই অর্থেই আলোচ্য বাক্যের 'লাআহতানিকান্না জুর্রিয়্যাতাহু' কথাটির অর্থ করা হয়েছে 'তার বংশধরগণকে সমূলে নষ্ট করে ফেলবো।'

'ইল্লা ক্বলীলা' অর্থ অল্প কয়েকজন ব্যতীত। একথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে নবী-রসুল ও পুণ্যবানগণকে, যাদেরকে আল্লাহ্তায়ালা শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদে রেখেছেন। আলোচ্য বক্তব্যে ইবলিস নিজে স্বীকার করেছে যে, তাঁদেরকে সে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ নিজেও বলেছেন 'আমার বান্দাদেরকে প্রতারণা করার ব্যাপারে তোমার কোনো ক্ষমতাই নেই।'

বায়যাবী লিখেছেন, আদম সন্তানদেরকে প্রতারিত করা যায়— এরকম ধারণা ইবলিস সম্ভবতঃ লাভ করেছিলো ফেরেশতাদের কথোপকথন থেকে। যেমন হজরত আদম সৃষ্টির কথা ফেরেশতাদেরকে জানানো হলে তারা বলেছিলো, 'আপনি কী এমন এক জাতি সৃষ্টি করতে চান, যারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ঘটাবে?' অথবা হজরত আদমের সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখেই সে একথা বুঝতে পেরেছিলো যে, তাঁর মধ্যে থাকবে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও অন্যান্য অশোভন বৃত্তি। সুতরাং তাকে প্রতারণা করা হবে সহজ।

এর পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বললেন, যা। জাহান্নামই সম্যক শাস্তি তোর ও তাদের, যারা তোর অনুসরণ করবে।' একথার অর্থ, ধিক্কারের স্বরে আল্লাহ্ ইবলিসকে বললেন, যা যা তোর যা ইচ্ছা হয় কর। তবে একথা জেনে রাখিস দোজখই হবে তোর এবং তোর অনুসারীদের চিরকালীন আবাস। এটাই হচ্ছে তোর স্বেচ্ছাচারিতার শাস্তি। এখানকার 'মাউফূর' কথাটির অর্থ 'ওয়াফীর' বা পরিপূর্ণ। আরববাসীরা বলে 'ওয়াফ্ফির লিসাহিবিকা আরদ্বাহু (তোমার সাথীর পরিপূর্ণ সম্মান করো)।

এর পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'তোর আহ্বানে তাদের মধ্যে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর।' এখানে 'ইস্তাফযিয্' অর্থ প্ররোচিত করা, উত্তেজিত করা। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'ইসতাফায্যাহ্' অর্থ উচ্ছেদ করা, উপড়ে ফেলা বা গৃহচ্যুত করা। আর এখানকার 'বিসওতিকা' অর্থ পাপকর্মের প্রতি আহ্বান করা বা সত্যচ্যুত

করা। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। উল্লেখ্য যে, যে পাপকর্মের প্রতি আহ্বান জানায়, সে অবশ্যই শয়তানের সতীর্থ।

আযহারী বলেছেন, 'ইসতাফযিয্ বিসওতিকা' কথাটির অর্থ নিজের দিকে ডাকা, পদস্খলিত করা। মুজাহিদ বলেছেন, 'সওতুন' অর্থ গানবাদ্য করা।

'আজ্বলিব্ আ'লাইহিম' কথাটির জ্বালাবা শব্দটির শব্দ রূপ নাসারা ইয়ানসুরু আর 'ইজতালাবা' হচ্ছে শব্দ রূপ ইফতিয়াল এর অর্থ কাউকে স্থানান্তর করে নিয়ে যাওয়া। এ রকম বলা হয়েছে 'কামুস' গ্রন্থে। হাদিস শরীফে 'লা জ্বালাবা' কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে— যে স্থানে প্রয়োজন, সে স্থান থেকে অন্যস্থানে শস্য স্থানান্তরিত করা জায়েয নয়। 'নেহায়া' রচয়িতা লিখেছেন, 'জ্বালাব' হয় দু'ধরনের— ১. জাকাত আদায়কারী কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বসে হুকুম চালাবে যেনো জাকাত প্রদাতারা তার অবস্থান স্থলে জাকাত এনে জমা করে— এরকম করা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। বরং শরিয়তের বিধান এই যে, জাকাত আদায়কারীরা জাকাত প্রদাতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জাকাত আদায় করবে। ২. ঘোড়দৌড়ের স্থানে এমন লোক নিযুক্ত করা, যার চিৎকারে ঘোড়া যেনো জোরে জোরে চলতে থাকে— এরকম করাও নিষেধ। 'কামুস' গ্রন্থে 'আজ্বলাবা আলাল ফারাস্' কথাটির অর্থ এভাবেই লেখা হয়েছে। আবার 'জ্বালাবাতাহ' শব্দটির অর্থ 'আওয়াজ' বা 'ধ্বনি'ও হয়। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'রয়াদা ফাজ্বালাবা' অর্থ প্রকম্পিত হওয়া এবং চিৎকার করা। এভাবে 'আজ্বলাবা আ'লাইহি' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— চিৎকার করে তাদেরকে প্ররোচিত করা বা উৎসাহিত করা। কুতাইবি বলেছেন, 'জ্বালাবুন' শব্দটি 'জ্বালবাতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ উচ্চ নাদ বা সমুচ্চ আওয়াজ। এরকমও বলা হয়েছে যে 'জ্বালাব্ ' অর্থ 'ইজতিমা' (একত্র হওয়া বা সমবেত হওয়া)। 'নেহায়া' গ্রন্থে রয়েছে 'আজ্বলাবা আ'লাইহি' অর্থ সমবেত হয়েছে। আর 'আজ্বলাবাহ্'অর্থ— তাকে সাহায্য করেছে। এভাবে এখানে 'তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তোর সকল প্রকার সৈন্য ও কৌশল একত্র করে তাদেরকে আক্রমণ কর।

আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— হে অভিশপ্ত ইবলিস! তুই তোর আহ্বানে যাদেরকে পারিস পথভ্রষ্ট কর, তোর সকল বুদ্ধি ও শক্তি দ্বারা তাদেরকে সরাসরি পাপের মধ্যে নিমজ্জিত কর, অথবা তাদেরকে পাপ কর্ম করতে সাহায্য কর।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, 'বি খইলিকা ওয়া রজিলিকা' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক সকল প্রকার

সৈন্যকে। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, জ্বিন ও মানুষের মধ্যে কেউ কেউ হয় শয়তানের বাহন ও প্রহরী। যে পাপের পক্ষ নেয়, সে-ও ইবলিস-বাহিনীর সদস্য। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে শয়তানের ওই সকল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের কথা বলা হয়েছে, যারা মানুষকে তার দিকে নিয়ে যেতে প্ররোচিত করে।

এরকমও হতে পারে যে, শাব্দিক অর্থ এখানে ধর্তব্য নয়। এখানে গ্রহণ করতে হবে মর্মার্থ। মর্মার্থটি হচ্ছে— হে ইবলিস্! যারা তোর মতো চিরদুর্ভাগা কেবল তাদের উপরেই তোর প্রভাব কার্যকর হবে। সুতরাং তাদের উপরেই তুই তোর সকল কৌশল ও শক্তি প্রয়োগ কর এবং তাদেরকেও তোর মতো সত্যবিচ্যুত করে দে। উল্লেখ্য যে, শয়তানকে এখানে তুলনা করা হয়েছে ওই নির্মম সেনাপতির সঙ্গে, যে তার শত্রুদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা ও তাদের প্রতিশ্রুতি দে। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র।

মুজাহিদ, হাসান বসরী ও হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে 'শারীকহুম ফীল আমওয়াল' (ধনে শরীক হয়ে যা) অর্থ— তুই তাদের উপার্জন ও অর্থব্যয়ে অংশ গ্রহণ কর। অর্থাৎ তাদেরকে হারাম উপার্জন, সঞ্চয় ও খরচের প্রতি উৎসাহিত কর। আতা বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে সুদ ভক্ষণ, দেব-দেবীদের নামে পশু ছেড়ে দেয়া ইত্যাদিকে। হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বলাকে। জুহাক বলেছেন, মুশরিকদের দেব-দেবীদের নামে ছেড়ে দেয়া পশুকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে 'শারীকহুম ফীল আমওয়াল।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'শারীকহুম ফীল আওলাদ' (সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা) বলে বুঝানো হয়েছে শিশু কন্যাকে জীবন্ত কবর দেয়াকে। জুহাক ও মুজাহিদ বলেছেন, ব্যভিচারজাত সন্তান-সন্ততিকে। হাসান ও কাতাদা বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে সন্তান-সন্ততির ইহুদী, খৃষ্টান, মূর্তিপূজক এবং অগ্নিপূজক হওয়াকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, অনেকে সন্তান-সন্ততিদের নাম রাখে শিরিক মিশ্রিত নিয়মে। যেমন— আবদুল হারেছ, আবদুশ শামস্, আবদুল উজ্জা ইত্যাদি। আলোচ্য বক্তব্যটির মাধ্যমে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, মানুষ যখন স্ত্রীসঙ্গম করতে উদ্যত হয়, তখন শয়তান বসে পড়ে তার পুরুষাঙ্গের উপর। এমতাবস্থায় 'বিসমিল্লাহ্' না বলে সঙ্গম শুরু করলে শয়তানও হয়ে যায় তার সঙ্গম-সঙ্গী। এভাবে শয়তানও বীর্যপাত করে তার স্ত্রীঅঙ্গে। এরকম মিলনের ফলে যে সন্তানের জন্ম হয়, সে সন্তানের মধ্যে থাকে শয়তানের অংশীদারিত্ব।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. একবার বললেন, কোনো কোনো মানুষ মাগরাব। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মাগরাব কারা? তিনি স. বললেন, যার মধ্যে রয়েছে শয়তানের অংশীদারিত্ব।

'ওয়া ই'দহুম' অর্থ— এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। অর্থাৎ তাদেরকে এভাবে মিথ্যা আশ্বাস দে যে— দেব-দেবীরা সুপারিশ করবে, বাপ-দাদার ধর্মই মুক্তির পথ। অথবা তাদের অন্তরে, সৃষ্টি কর তওবার প্রতি অনীহা, কিয়ামত, বেহেশত, দোজখ ইত্যাদির প্রতি অবিশ্বাস ইত্যাদি।

একটি প্রশ্নঃ আলোচ্য আয়াতের 'সত্যচ্যুত কর', 'আক্রমণ কর', 'ধনে ও সন্তান সন্ততিতে শরীক হয়ে যা', 'প্রতিশ্রুতি দে'— কথাগুলো আদেশ সূচক। তাহলে কি বলা যায়, আল্লাহ্ এখানে শয়তানকে পাপকর্মসমূহ করবার আদেশ দিয়েছেন? কিন্তু আল্লাহ্ তো কখনো পাপকাজের আদেশ দেন না।

উত্তরঃ কথাগুলো আদেশসূচক ঠিকই। কিন্তু এখানে কথাগুলো বলা হয়েছে হুমকি প্রদর্শনার্থে। অথবা এখানে আদেশগুলোর মাধ্যমে এই মর্মে জানানো হয়েছে যে— ঠিক আছে। তুই যা করতে চাস করে নে। তোর এসকল অপকর্মের কারণে আমার সম্মান ও পরাক্রমের কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। আর এগুলোর কারণে তোর জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি তো নির্ধারিত রয়েছেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র।' এখানে 'গুরুর' অর্থ ধোকা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা বা ছলনা। মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রদর্শন।

বাগবী লিখেছেন, সাহাবীগণের বক্তব্যসমূহে এসেছে, বিতাড়িত হওয়ার পর ইবলিস বললো, হে আল্লাহ্! আদমের কারণেই আজ আমার এই দুর্দশা। অতএব তুমি আমাকে এমন শক্তি দাও যাতে আমি আদম-সন্তানদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারি। আল্লাহ্ বললেন, তথাস্তু। ইবলিস বললো, আমি জানি যে, তোমার শক্তি ছাড়া আর কারো কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ্ বললেন, 'তোর আহ্বানে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর।' হজরত আদম বললেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি তো আমার ও আমার সন্তানদের উপরে ইবলিসকে প্রবল করে দিলে। এখন তোমার বিশেষ সাহায্য ব্যতিরেকে তো আমাদের উপায় নেই। আল্লাহ্ বললেন, তোমার সন্তান-সন্ততিদের হেফাজতের জন্য আমি প্রহরী নিয়োগ করবো। হজরত আদম বললেন, কীভাবে? আল্লাহ্ বললেন, তাদের পুণ্যকর্মগুলোকে আমি দশগুণ বাড়িয়ে দিবো। হজরত আদম বললেন, আর? আল্লাহ্ বললেন, মৃত্যু যন্ত্রণার পূর্ব পর্যন্ত আমি তাদের জন্য খুলে রেখে দিবো তওবার দরজা। হজরত আদম বললেন, আর? আল্লাহ্ বললেন, বলবো 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা আত্মঅত্যাচার করেছো, তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্ তোমাদের সমুদয় পাপ মোচন করবেন।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, ইবলিস বললো, হে আল্লাহ্! তুমি তো মানুষের মধ্যে প্রেরণ করবে নবী। তাদের উপরে অবতীর্ণ করবে কিতাব। আমার

কিতাব কি? আল্লাহ্ বললেন, কুপ্রবৃত্তিজাত কবিতা ও শ্লোক। ইবলিস বললো, আমার দলিল কি? আল্লাহ্ বললেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের অবৈধ চিত্রম। ইবলিস বললো, আমার পয়গম্বর কে? আল্লাহ্ বললেন, গণক। আমার বসবাস কোথায় হবে? আল্লাহ্ বললেন, গোসলখানায়— যেখানে মানুষ উলঙ্গ হয়ে গোসল করে। ইবলিস বললো, আমার বৈঠকখানা কোনটি? আল্লাহ্ বললেন, বাজার। ইবলিস বললেন, খাদ্য? আল্লাহ্ বললেন, বিসমিল্লাহ্ পাঠবিবর্জিত খাদ্য। ইবলিস বললো, পানীয়? আল্লাহ্ বললেন, মাদকদ্রব্য। ইবলিস বললো, প্রতারণার জাল বিছাবো কাদেরকে দিয়ে? আল্লাহ্ বললেন, রমণীদেরকে দিয়ে। ইবলিস বললো, আর আমার বিনোদনের সামগ্রী? আল্লাহ্ বললেন, কৌতুক।

এর পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'আমার দাসদের উপরে তোর কোনো ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।' একথার অর্থ— তবে হে ইবলিস! একথা উত্তমরূপে অবগত হও যে, আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দা যারা, তাদের উপরে তুই কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবি না। কারণ তারা সর্ববিষয়ে আমার মুখাপেক্ষী ও সর্বতোভাবে আমারই প্রতি নির্ভরশীল, সমর্পিত। তাই কর্মবিধায়করূপে আমিই তাদের জন্য যথেষ্ট।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯

رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝ وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝ اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ۝ اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ۝

❑ তোমাদিগের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদিগের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার। তিনি তোমাদিগের প্রতি পরম দয়ালু।

❒ সমুদ্রে যখন তোমাদিগকে বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান করিয়া থাক তাহারা তোমাদিগের মন হইতে সরিয়া যায়; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ!

❒ তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে তিনি তোমাদিগকে স্থলে কোথাও ভূগর্ভস্থ করিবেন না অথবা তোমাদিগের উপর কংকর বর্ষণ করিবেন না? তখন তোমরা তোমাদিগের কোন কর্মবিধায়ক পাইবে না।

❒ অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে তিনি তোমাদিগকে আর একবার সমুদ্রে লইয়া যাইবেন না এবং তোমাদিগের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাইবেন না এবং তোমাদিগের সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য তোমাদিগকে নিমজ্জিত করিবেন না? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আমিই তো তোমাদের সেই প্রভুপালনকর্তা, যে তোমাদের সমুদ্র যাত্রাকালে তোমাদের জলযানগুলোর গতি ও স্থিতি নির্বিঘ্ন রাখে। এভাবে সমুদ্র-বেসাতির মাধ্যমে তোমরা অনুসন্ধান করো আমার অনুগ্রহরূপী জীবনোপকরণ। আমি তো তোমাদের প্রতি পরম দয়ার্দ্র।

পরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাকো, তারা তোমাদের মন থেকে সরে যায়।' একথার অর্থ—সমুদ্র-ঝড় অথবা অন্য কোনো দুর্বিপাকে যখন তোমরা পতিত হও, তখন তো তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ডাকো না। তোমাদের স্মরণ-পট থেকে উবে যায় তোমাদের কল্পিত উপাস্যসমূহের স্মৃতি। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— ওই ঘোর বিপদে তোমাদের কাতর প্রার্থনা তো তোমাদের পূজিত দেব-দেবীগুলো শোনে না। শোনেন কেবল আল্লাহ্, যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।' একথার অর্থ— হে অবিমৃশ্য জনগোষ্ঠী! দুর্যোগ থেকে উদ্ধার করে আমি যখন তোমাদেরকে তটভূমিতে ফিরিয়ে আনি, তখন তোমরা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। তোমরা তো আল্লাহ্র নেয়ামতের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

এর পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছো যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না, অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ষণ করবেন না? তখন তোমরা তোমাদের কোনো কর্মবিধায়ক পাবে না।' একথার অর্থ— হে অকৃতজ্ঞ মানুষ! দুর্যোগ— দুর্বিপাক কি কেবল সমুদ্রেই আসে? স্থলভাগে কি বিপদ-মুসিবত নেমে আসতে পারে না? ঘূর্ণিঝড় , তুফান, ভূমিকম্প, ভূমিধস— এসকল বিপদেও তো তোমরা পতিত হতে পারো। পর্যুদস্ত

হয়ে যেতে পারো প্রস্তরবৃষ্টিতে। পারো না কি? আল্লাহ্ যদি তোমাদের উপর এরকম বিপদ অবতীর্ণ করতে চান, তবে তোমরা পালাবে কোথায়? তখন তো তোমরা তোমাদের কর্মবিধায়ক ও সাহায্যকারীরূপে কাউকেই খুঁজে পাবে না।

এর পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছো যে, তিনি তোমাদেরকে আর একবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাবেন না এবং তোমাদের সত্যপ্রত্যাখ্যান করার জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পাবে না।' একথার অর্থ— তোমরা কি আর কখনো সমুদ্রযাত্রা করবে না? কীভাবে তোমরা নিশ্চিত হতে পারলে যে, আল্লাহ্ আর কখনো তোমাদেরকে সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না? আর ওই সমুদ্রযাত্রায় তোমাদেরকে প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে ফেলবেন না? আর অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে সমুদ্র-সমাধি দান করবেন না। যদি আল্লাহ্ এরকম করেন তবে কি তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে?

হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'ক্বাস্বিফ্' কথাটির অর্থ করেছেন 'আসিফ' বা প্রবল ঘূর্ণিঝড়। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, শব্দটির অর্থ হবে এখানে— ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়া। অর্থাৎ 'ক্বাস্বিফ' বলা হয় তাকে, যে নিজস্ব শক্তিতে সকল কিছু ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। কুতাইবি বলেছেন, ওই ব্যক্তি কাসিফ যে লণ্ড-ভণ্ড করে দেয় অরণ্যের বৃক্ষরাজি।

'বিমা কাফারতুম' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যান করার জন্য বা অকৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য। আর 'তাবীআ'ন্' অর্থ সাহায্যকারী বা প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৭০

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۟

❐ আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি, স্থলে ও সমুদ্রে উহাদিগের চলাচলের বাহন দিয়াছি; উহাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদিগের অনেকের উপর উহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।' একথার অর্থ— আমি মানুষকে দান করেছি বিশেষ বিশেষ মর্যাদা। যেমন, সর্বোত্তম অবয়ব, সুসংগত স্বভাব, বস্তুসমূহের পার্থক্য নির্ণয়ের জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেক-

বিবেচনা, ভাষা, লিপিকৌশল, বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, বস্তুসমূহের প্রতি কর্তৃত্ব, প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ ও পরার্থপরতা ইত্যাদি। মানুষকে আমি আরো দিয়েছি প্রেমময় হৃদয়, প্রত্যাদেশিত প্রজ্ঞা। তাই তারা জানতে পেরেছে আমার নৈকট্য ও প্রসন্নতা লাভের উপায়। হাকেম তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এবং দায়লামী হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হাত ও হাতের আংগুলের মাধ্যমে আহার করাও মানুষের প্রতি আল্লাহ্র একটি বিশেষ অনুগ্রহ।

এরপর বলা হয়েছে 'স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি।' একথার অর্থ— স্থলভাগে আমি মানুষের জন্য দিয়েছি আরোহণযোগ্য পশুকুল ও আমার দেয়া বুদ্ধির মাধ্যমে আবিষ্কৃত অন্যান্য বাহন। আর জলপথে বাহন স্বরূপ দিয়েছি নৌকা, জাহাজ ও অন্যান্য জলযান।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি।' একথার অর্থ আমি তাদেরকে দান করেছি পরিতৃপ্তিপ্রদায়ক অনেক অনেক পানাহারের সামগ্রী।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।' এখানে 'ফাদ্বলুন্' অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব অথবা, পুণ্য ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মর্যাদা। 'ফাদ্বলনাহুম' কথাটির 'হুম' সর্বনামটি এখানে সম্পৃক্ত হয়েছে 'আদম সন্তানদের ' সঙ্গে। কিন্তু এখানে 'আদম সন্তান' বলে বুঝানো হয়েছে কেবল ইমানদার ব্যক্তিগণকে। অন্য আয়াতেও সর্বনামকে এরকম বিশেষায়িত করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়াল মুত্বাল্লাক্বাতু ইয়াতারাব্বাসনা বি আনফুসিহিন্না।' এখানে 'মুত্বাল্লাক্বাতু' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তা রমণীকে। কিন্তু এর পূর্বের 'ওয়া বুউ'লাতুহুন্না আহাক্কু বিরদ্দিহিন্না' কথাটির 'হিন্না' সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে কেবল 'আল্মুত্বাল্লাক্বাতু' কথাটির সঙ্গে। এভাবে যাদেরকে তালাকে রজয়ী দেয়া হয়েছে তারাই হবে এখানে উদ্দেশ্য। আলোচ্য আয়াতেও তেমনি শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি সম্পৃক্ত হবে কেবল বিশ্বাসীদের সঙ্গে। কারণ অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্র নিকটে শ্রেষ্ঠ নয়— বরং স্বতন্ত্র ও নিকৃষ্ট।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্তায়ালা সকল মানুষকে সকল সৃষ্টির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেননি। শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন কেবল কিছু সংখ্যক মানুষকে। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃতি ও প্রকার সম্পর্কে আলেমগণের মতপ্রভেদও রয়েছে প্রচুর। কেউ কেউ বলেছেন, ফেরেশতাদের উপরে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়নি। সুতরাং ফেরেশতা ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টির চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কালাবী বলেছেন, অল্প কয়েকজন ফেরেশতা

ছাড়া অন্য সকল ফেরেশতার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ। আর ওই অল্প কয়েকজন ফেরেশতা হচ্ছে হজরত জিবরাইল, হজরত মিকাইল, হজরত আজরাইল এবং হজরত ইসরাফিল।

কোনো কোনো আলেম আবার 'কাছীর' (অনেকের) কথাটির অর্থ করেন 'কুল' (সকলের)। তাই তাঁরা বলেন, মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে সকল ফেরেশতার উপরে। এরকম অর্থ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে অপর একটি আয়াতেও। যেমন— ওয়া আকছারুহুম কাজিবূন। এখানে 'আক্ছারুহুম' বলে বোঝানো হয়েছে সকল মানুষকে। হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত একটি সর্বোন্নত হাদিসের মধ্যেও এই অভিমতের পোষকতা রয়েছে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন আদম ও তাঁর বংশধরগণকে সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন ফেরেশতারা বললো, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তোমার এই নতুন সৃষ্টি অপূর্ব! তারা দুনিয়ায় পানাহার করবে, শয্যাসঙ্গিনী করবে তাদের স্ত্রীদেরকে, আরোহী হবে বিভিন্ন বাহনের উপর। তুমি তো তাদেরকে দান করেছো পৃথিবীর আরাম-আয়েশ। আর আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছো আখেরাত। আল্লাহ্ বললেন, এরা ওই সকল সৃষ্টির মতো নয়, যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি 'কুন' (হও) আদেশের মাধ্যমে। এদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি আমার আনুরূপ্যবিহীন অলৌকিক হাতে। আর তাদের প্রতি করেছি আমার আত্মার জ্যোতিসম্পাত। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান নামক গ্রন্থে।

পর্যালোচনাঃ সাধারণ ইমানদার অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ওলীগণ সাধারণ ফেরেশতা-দের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। গোনাহ্গার ইমানদারেরা এরকম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন পাপমুক্তির পর— খাঁটি তওবার মাধ্যমে, শাস্তিভোগের পর অথবা আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমালাভের কারণে। অর্থাৎ পাপমুক্তির পর তারাও হয়ে যায় আল্লাহ্‌র ওলী এবং হয়ে যায় জান্নাতের যোগ্য। এভাবেই তারা হয় ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর নবী রসুলগণ হচ্ছেন বিশেষ মানুষ। এই বিশেষ মানুষেরা বিশেষ ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'ইন্নাল্লাজীনা আমানু ওয়া আ'মিলুস্সলিহাতি উলায়িকাহুম খইরুল বারিয়্যাহ্' (নিশ্চয় যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা সকল সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মুমিনগণের নিকটে যে ফেরেশতারা থাকে তাদের চেয়ে তারা (মুমিনেরা) অধিক মর্যাদাশালী। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজার বর্ণনাতেও একথা এসেছে। এভাবে দেখা যায়, যারা ইমানদার, তারা সকল অবস্থায় ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক সম্মানার্হ।

আহলে সুন্নতওয়াল জামাতের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, বিশেষ মানুষেরা সকল ফেরেশতাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এমনকি বিশেষ ফেরেশতাদের চেয়েও। কারণ চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কাম রয়েছে, কিন্তু জ্ঞান বা বিবেক নেই । আবার ফেরেশতারা কামপ্রবৃত্তিশূন্য, কিন্তু জ্ঞানবান। তাই স্বভাবগতভাবে তারা নিষ্পাপ।

কিন্তু মানুষের অবস্থা চতুষ্পদ বা ফেরেশতা কারো মতোই নয়। তাদের কামপ্রবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু জ্ঞান-বিবেকও আছে। এই জ্ঞান-বিবেকের সাহায্যেই মানুষকে তার নিজের কু-রিপু সমূহের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহন করতে হয়। আল্লাহ্‌র আনুগত্যকে আশ্রয় করে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয় আপন অন্ধকারের বিরুদ্ধে। তাই সে মুজাহিদ বা ধর্মযোদ্ধা। আর এই মুজাহিদেরা আল্লাহ্‌র জ্ঞানে জ্ঞানী এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যে সাহায্যমণ্ডিত। তাই তারা লাভ করেন কাংখিত বিজয়, যে মর্যাদা ফেরেশতাদের পক্ষে লাভ করার সুযোগই নেই। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'যারা আমার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো, অবশ্যই আল্লাহ্ রয়েছেন সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে।' আর যারা এভাবে আত্ম-অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুতুল্য। বরং তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাহলে এ ধরনের মানুষ সংশোধিত হওয়ার আগে ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক মর্যাদামণ্ডিত হবে কীভাবে?

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৭১, ৭২

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

❒ স্মরণ কর, সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে উহাদিগের নেতাসহ আহ্বান করিব। যাহাদিগের দক্ষিণ হস্তে তাহাদিগের আমলনামা দেওয়া হইবে তাহারা তাহাদিগের আমলনামা পাঠ করিবে এবং তাহাদিগের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হইবে না।

❒ যে ইহলোকে অন্ধ পরলোকেও সে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহ্বান করবো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! ওই বিচারদিবসের কথা স্মরণ করুন, যখন আমি হিসাব গ্রহণের জন্য প্রত্যেক নরগোষ্ঠির নেতা ও জনতাকে হাশর প্রান্তরে সমবেত করবো।

মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, এখানে 'ইমাম' বা নেতা বলে বুঝানো হয়েছে নবী-রসুলগণকে। আবু সালেহ ও জুহাক বলেছেন, 'নেতা' বলে এখানে বুঝানো

হয়েছে ওই নরগোষ্ঠির প্রতি অবতীর্ণ কিতাব সমূহকে। হজরত আলী থেকে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীর প্রতিটি নর গোষ্ঠিকে সেদিন ওঠানো হবে তাদের আপনাপন নবী ও কিতাব সহকারে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে নেতা দ্বারা বুঝানো হয়েছে ভালো-মন্দ সকল ধরনের নেতাকে, যারা মানুষকে ভালো পথ দেখায়, অথবা করে পথভ্রষ্ট। কোরআন মজীদে 'নেতা' বলে উভয় দলকে বোঝানোর আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন—১. 'এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা, তারা আমার নির্দেশানুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো।' ২. 'তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম, তারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করতো।'

কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'নেতা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে অংশীবাদীদের মিথ্যা উপাস্যসমূহকে। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, মানুষ তাদের আপনাপন নেতার অনুগত হয় সে নেতা ভালো হোক, অথবা মন্দ। হাসান ও আবুল আলীয়া বলেছেন, এখানে ইমাম বা অগ্রণী অর্থ মানুষের কৃতকর্মসমূহ যা তারা পূর্বাহ্নে প্রেরণ করে। কাতাদা বলেছেন, আয়াতের বক্তব্যভঙ্গির মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে 'ইমাম' অর্থ আমলনামা। আমলনামাকেও কিতাব বলা হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া কুল্লা শাইইন আহসাইনাহু ফী ইমামিম মুবীন' (আমি প্রতিটি বিষয় এক সমুজ্জ্বল কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি)। এখানে 'ইমামমিম মুবীন' অর্থ আমলনামা। কারো কারো মতে এখানে ইমাম বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল শক্তিকে, যা মানুষকে শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ পথে অনুপ্রাণিত বা পরিচালিত করে। মোহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, 'ইমাম' হচ্ছে 'উম্মু' (মা) এর বহুবচন। যেমন 'খুফ্‌ফুন' এর বহুবচন 'খিফাফ। তাই এখানকার অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি হবে— সেদিন প্রত্যেককে ডাকা হবে তাদের নিজ নিজ মায়ের নাম ধরে। হজরত ঈসার পবিত্রা জননী হজরত মরিয়ম এবং ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের মহাসম্মানিতা মাতা হজরত ফাতেমার সম্মানেই সেদিন এরকম করা হবে। আবার জারজ সন্তানদেরকে লজ্জিত না করার উদ্দেশ্যটিও এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব।

'বি ইমামিহিম' অর্থ তাদের নেতা সহ। এতক্ষণের আলোচনায় কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— সেই বিচার দিবসে মানুষ সমবেত হবে নবী-রসুল অথবা অন্য কোনো

ভালো অথবা মন্দ নেতার সঙ্গে। অথবা হাজির হবে আমলনামা বা সহিফা সহকারে। এরকমও হতে পারে যে, তখন প্রত্যেককে ডাকা হবে তাদের স্ব স্ব নেতা অথবা মতবাদের নামোল্লেখ করে। যেমন বলা হবে— হে অমুকের অনুসারী, হে অমুক মতবাদের অনুগামী, হে অমুকের অনুরক্ত, হে অমুক গ্রন্থের ভক্ত, হে মরিয়ম তনয়, হে ফাতেমা-দুলাল ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাদের দক্ষিণ হস্তে তাদের আমলনামা দেয়া হবে, তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।' এখানে বলা হয়েছে কেবল ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের কথা। বলা হয়েছে, তখন আমলনামা হাতে পেয়ে তারা আনন্দিত চিত্তে তা পাঠ করতে থাকবে। আরো বলা হয়েছে, তাদের উপর সেদিন এতোটুকুও অন্যায় আচরণ করা হবে না। এখানে 'লা ইউজলামুনা ফাতিলা' অর্থ সামান্য পরিমাণ জুলুম। 'ফাতিল' অর্থ ওই চিকন তন্তু যা থাকে খেজুরের আঁটির ফাটলের মধ্যে। অথবা ওই ক্ষুদ্র ময়লা, যা মানুষ চিমটি দিয়ে ওঠায়। কথাটির মাধ্যমে এখানে বলা হয়েছে— সেদিন তাদেরকে সামান্য পরিমাণ সওয়াবও কম দেয়া হবে না। উল্লেখ্য যে, বাম হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের অবস্থা হবে এর বিপরীত।

পরের আয়াতে (৭২) আলোচিত হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথা। বলা হয়েছে— 'যে ইহজগতে অন্ধ, পরজগতেও সে হবে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।' একথার অর্থ— যে পৃথিবীতে সত্য পথ দেখতে পায় না, সে আখেরাতে পরিত্রাণের পথতো পাবেই না। অর্থাৎ এ জগতে হেদায়েত না পেলে ওই জগতে হেদায়েত প্রাপ্তি হবে অসম্ভব। তখন তওবা করা ও তা কবুল হওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। অতএব তওবা করলে করতে হবে এখনই, এখানেই। বক্তব্যটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— যে ব্যক্তি ইহকালে সত্যদর্শন থেকে অন্ধ, সে তো আখেরাতে হবে আরো অধিক অন্ধ।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন এখানে 'হাজিহী' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল পার্থিব নেয়ামতকে যেগুলোর বিবরণ দেয়া হয়েছে 'তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন' থেকে 'তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি' (আয়াত ৬৬ থেকে ৭০) পর্যন্ত। আর 'ফীল আখিরাতি' বলে বুঝানো হয়েছে আখেরাতের অবিনাশী নেয়ামতসমূহকে। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ হবে, দুনিয়ার

দৃষ্টিগ্রাহ্য নেয়ামতের যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে যারা অন্ধ হয়ে রইলো, তারা তো আখেরাতের অনাগত ও অদৃশ্য নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে হবে আরো অধিক অন্ধ। আর নিঃসন্দেহে তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের পথভ্রষ্ট।

কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে এখানে 'হাজিহী' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে পৃথিবীর জীবনকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহ্তায়ালার এককত্বের অসংখ্য নিদর্শন দেখেও তার বিবেকের চক্ষুকে সত্যদর্শন থেকে অন্ধ করে রেখেছে, সে নিশ্চয় আখেরাতে মুক্তির পথ দেখার ব্যাপারে আরো অধিক অন্ধ হয়ে থাকবে। নাজাতের রাস্তা তো তাকে তখন দেখানোই হবে না। কারণ সে চিরভ্রষ্ট। উল্লেখ্য যে, 'আম্‌মা' শব্দটি তুলনামূলক বিশেষণ। এখানে মর্মার্থ হবে তুলনামূলক বিশেষণ হিসাবে। অর্থাৎ নিরেট অন্ধ।

একটি প্রশ্নঃ এখানে আ'মা শব্দটি ছুলাছি মুজাররাদ (মূল তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ) এর ইস্‌মে তাফজীলের (তুলনামূলক বিশেষণে) শব্দরূপ। ইসমে তাফজীল 'আফয়ালুর' শব্দরূপে ওই সময় আসে, যখন তার অর্থের মধ্যে দেখা দেয় কোনো ক্রটি এবং যখন তার মধ্যে থাকে না কোনো রঙ বা আকার। উল্লেখ্য যে, অন্ধ হওয়া একটি দোষ, সুতরাং 'আ'মা' (অন্ধ) কথাটি এখানে তুলনামূলক বিশেষণের শব্দরূপ হতে পারে না। কারণ শব্দটির একমাত্র অর্থ— অন্ধ। তাই এখানে 'আ'মা' কথাটির অর্থ 'অধিক অন্ধ' বললে তা ঠিক হবে না। অতএব তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের (তুলনামূলক বিশেষণের) শব্দরূপ তৈরী করতে হলে আ'মা শব্দটির সঙ্গে বসাতে হবে 'আশাদদু' বা 'আকছার।' যেমন অধিক অন্ধ বুঝানো হলে আরবীতে বলা হয় 'আশাদ্‌দু উ'ম্‌ইয়ান'। কেবল 'আ'মা' নয়। তবে এখানে এরকম অর্থ করা হবে কেনো?

উত্তরঃ এখানকার অন্ধত্ব হচ্ছে অন্তর্চক্ষুর অন্ধত্ব বা বিবেকের অন্ধত্ব। এটি একটি অভ্যন্তরীণ ক্রটি। আর তুলনামূলক বিশেষণ হওয়ার পথের অন্তরায় হচ্ছে প্রকাশ্য ক্রটি । সুতরাং এখানে 'আ'মা' তুলনামূলক বিশেষণের শব্দরূপ হতে পারে। যেমন 'আহমাক্ব' (মূর্খতা) 'আবলাহু' (নির্বুদ্ধিতা), 'আজহালু' (বোধহীনতা) ইত্যাদি।

ইবনে মারদুবিয়া ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, ইবনে ইসহাক সূত্রে মোহাম্মদ বিন আবী মোহাম্মদ ইকরামা কর্তৃক উল্লেখিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার উমাইয়া বিন খালফ, আবু জেহেল বিন হিশাম ও অন্যান্য কুরায়েশ নেতারা রসুল স. সকাশে হাজির হয়ে বললো, মোহাম্মদ! তুমি আমাদের দেব-দেবীদের মূর্তিগুলোতে একটি বার শ্রদ্ধার সঙ্গে হাত বুলিয়ে

দাও, তাহলে আমরা সকলেই হয়ে যাবো তোমার অনুসারী। রসুল স. মনেপ্রাণে চাইতেন, তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করুক। তাই তাদের এই ছোট্ট আবদারটি শুনে কিছুটা হতচকিত হয়ে গেলেন। তখন অবতীর্ণ হলো —

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৭৩, ৭৪, ৭৫

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِیْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِیَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖۗ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ۝ وَلَوْلَاۤ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ۝ اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝

❒ আমি তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা হইতে তোমার পদস্খলন ঘটাইবার জন্য উহারা চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াছে, যাহাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন কর; সফল হইলে উহারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত।

❒ আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখিলে তুমি উহাদিগের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকিয়াই পড়িতে।

❒ তুমি ঝুঁকিয়া পড়িলে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাইতাম; তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইতে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি, তা থেকে তোমার পদস্খলন ঘটাবার জন্য তারা চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে।' 'লুবাবুন নুকুল ফী আসবাবিন্নুযুল' প্রণেতা লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত সম্পর্কে একটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত বিবরণ রয়েছে। বিবরণটি এই— হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, একবার রসুল স. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করছিলেন। তখন কুরায়েশ নেতারা বললো, আমাদের মূর্তিগুলোকে সম্মান না প্রদর্শন করা পর্যন্ত আমরা তোমাকে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে দিবো না। রসুল স. ভাবলেন, প্রকাশ্যে তাদের আবদার রক্ষা করলে কী আর ক্ষতি। অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি একাগ্র বিশ্বাস তো রয়েছেই। রসুল স. এর এমতো মনোভাব লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনাটির শব্দবিন্যাস এরকম— রসুল স. ভাবলেন,

একবার তাদের কথা রক্ষা করলে দোষ কী? আমি তো অন্তরে তাদের প্রতিমাগুলোকে ঘৃণাই করি। এ রকম করলে তারা তো কোনোদিন আর হাজরে আসওয়াদ চুম্বনে বাধা সৃষ্টি করবে না। এরপর আমি তো বরাবরের মতো এগুলোকে ঘৃণা করতেই থাকবো। জুহুরী সূত্রে ইবনে আবী হাতেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। যোবায়ের বিন নাফীর সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, কুরায়েশ নেতারা একবার বললো, মোহাম্মদ! আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তুমি যদি আমাদেরকে পথপ্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েই থাকো, তবে তোমার নিম্নশ্রেণীর সহচরদেরকে তাড়িয়ে দাও। ক্রীতদাস শ্রেণীর লোকদেরকে দূর করে দিলেই আমাদের পক্ষে তোমার ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব। রসুল স. তাদের এ প্রস্তাবে কিছুটা আকৃষ্ট হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী থেকে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একবার পাঠ করলেন সুরা নজম। পড়লেন— 'আফারআইতুমুল লাতা ওয়াল উয্যা' (তোমরা কি লাত ও উয্যা সম্পর্কে ভেবে দেখেছো)। শয়তান এর সঙ্গে যোগ করলো 'তিলকাল গারানীকুল উ'লা ওয়া ইন্না শাফাআতা হুন্না লা তুরতাজা' (ওই সকল বড় বড় প্রতিমার শাফায়াতের আশা করা যায়)। এই ঘটনার পর অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এরপর রসুল স. চিন্তা করতে লাগলেন, কী থেকে কী হয়ে গেলো! শয়তান কি তবে তাঁর মুখ থেকে এরকম শিরিকসম্ভূত বাক্য উচ্চারণ করিয়ে নিলো? তখন অবতীর্ণ হলো— 'ওয়ামা আরসালনা মিন্ ক্বলিকা মির্ রসূলিন ওয়ালা নাবীয়্যিন ইল্লা ইজা তামান্না' (আমি আপনার পূর্বে যে সকল রসুল ও নবী প্রেরণ করেছি, তাদের কেউ যখন কোনো কিছু আকাঙ্খা করেছে....)।

বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতের অবতরণস্থল মক্কা। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অবতরণস্থান মদীনা। তাঁদের মতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এরকম— আউফির মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সাক্বীফ গোত্রের লোকেরা একবার রসুল স. এর নিকটে আবেদন জানালো, আপনি আমাদেরকে এক বছরের অবকাশ দিন। লোকেরা আমাদের পূজিত প্রতিমাগুলোর নিকটে বিভিন্ন মানত করে। হাজির করে বিভিন্ন উপঢৌকন। মানতকারীরা উপঢৌকন ইত্যাদি রেখে ফিরে গেলেই আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। রসুল স. তাদের প্রার্থিত অবকাশ বিবেচনা করবেন বলে মনস্থ করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। উল্লেখ্য যে, এই বর্ণনার সূত্র-শৃঙ্খল শিথিল। তাই তা অগ্রহণীয়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, সাক্বীফ গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক একদিন রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, আমরা তিনটি শর্তে আপনার নিকটে বায়াত গ্রহণ করতে চাই। শর্ত তিনটি হচ্ছে— ১. আমরা নামাজের মধ্যে মস্তক অবনত করবো না। ২. আমাদের প্রতিমাগুলোকে আমরা নিজ হাতে ভাঙবো না। ৩. মানতকারী ও ভক্তরা আমাদের দেব-দেবীদের নামে যে ভোগ ও উপঢৌকন প্রদান করে, তা আমরা সম্ভোগ করবো এক বছর ধরে কিন্তু তাদের পূজা থেকে বিরত থাকবো। রসুল স. বললেন রুকু সেজদাবিহীন ধর্ম কল্যাণরহিত। অবশ্য তোমরা নিজ হাতে তোমাদের প্রতিমাগুলোকে ভাঙবে কিনা, তা তোমাদের নিজস্ব ব্যাপার। আর লাত ও উয্যাকে দেয়া উপঢৌকন ভোগ করার অনুমতি তো কিছুতেই দেয়া যায় না। তারা বললো, আমরা চাই, মানুষ একথা বলুক যে, আরববাসী হিসেবে আপনি আমাদেরকে এই বিশেষ সুবিধাগুলো দান করেছেন। অন্য লোক যদি এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে তবে আপনি একথা বললেই তো পারেন যে, আল্লাহ্‌র হুকুমেই আমি বনী সাক্বীফকে এই বিশেষ সুবিধাগুলো দিয়েছি। রসুল স. নিশ্চুপ রইলেন। আবদারকারীরা মনে করলো তাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। সেক্ষেত্রে আয়াতের মর্ম দাঁড়ায় এ রকম— ওই লোকগুলো আপনাকে প্রত্যাদিষ্ট বিধান বিধৃত স্বঅবস্থান থেকে অধঃপতন ঘটিয়ে বিপদগ্রস্ত করার উপক্রম করেছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন করো, সফল হলে তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো।' এখানে 'লিতাফতারিয়া আ'লাইনা' অর্থ হে আমার রসুল! যা আমি আপনাকে প্রত্যাদেশ করিনি, আপনি তা-ই বলুন। অর্থাৎ যাতে আপনি আমার সম্বন্ধে কিছু অসত্য উদ্ভাবন করেন। 'ইজাল্‌লাত্‌তাখাজ্‌তুকা খলীলা' অর্থ সফল হলে তারা আপনাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতো।

পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি আপনাকে স্বভাবগতভাবে সত্যের প্রতি অবিচল রেখেছি। এরকম না রাখলে আপনি ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতারণার দিকে কিছুটা হলেও আকৃষ্ট হতেন। কারণ আপনি স্বভাবগতভাবে সত্যাধিষ্ঠিত, অথচ সরল। আর এই সারল্যের কারণেই তাদের ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাবের দিকেই ছিলো আপনার মূল লক্ষ্য। তাই তাদের কঠিন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছুটা হলেও আপনি হয়ে পড়েছিলেন অনবধান।

উল্লেখ্য যে, রসুল স. সত্তাগতভাবেই ছিলেন সত্যের প্রতি সুদৃঢ়। ছিলেন বিশুদ্ধতম। তাই এখানে বলা হয়েছে 'প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে।' অর্থাৎ কিছুটা ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা হয়তো ছিলো, কিন্তু পুরোপুরি কখনোই নয়।

এর পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— তুমি ঝুঁকে পড়লে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম; তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোনো সাহায্যকারী পেতে না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হলে, তা হতো একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর ওই অপরাধের কারণে আপনাকে ইহকাল ও পরকালে আস্বাদন করতে হতো দ্বিগুণ শাস্তি। তখন আমার ওই শাস্তির বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারীও আপনি পেতেন না। কিন্তু হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, কোনো প্রকার শাস্তির উদ্যোগ আপনার বিরুদ্ধে কখনোই নেয়া হবে না। কারণ আপনি আমার সত্য রসুল। আপনি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়ভাজন। আর প্রিয়ভাজনতা হচ্ছে শাস্তির পরিপন্থী। এখানে 'দ্বি'ফাল হায়াত' অর্থ পৃথিবীর শাস্তি। আর 'দ্বি'ফাল মামাত' অর্থ আখেরাতের শাস্তি। কোনো কোনো আলেম শব্দ দু'টোর অর্থ করেছেন যথাক্রমে— আখেরাতের আযাব ও কবরের আযাব।

বায়হাকী তাঁর দালায়েল নামক পুস্তকে এবং ইবনে আবী হাতেম, শহর বিন হাওশাব ও আবদুর রহমান বিন গানাম সূত্রে উল্লেখ করেছেন, ইহুদীরা একবার রসুল স.কে বললো, হে মোহাম্মদ! আপনি যদি সত্যি সত্যিই নবী হয়ে থাকেন, তবে সিরিয়ায় চলে যান। কারণ ওই স্থান হচ্ছে নবীদের বিচরণ ভূমি। আর ওই স্থানই হবে হাশরের প্রান্তর। রসুল স. তাদের কথা মেনে নিলেন এবং এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন সিরিয়া অভিমুখে। চলতে চলতে উপস্থিত হলেন তাবুক নামক স্থানে। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৭৬, ৭৭

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ۝

❒ উহারা তোমাকে দেশ হইতে উৎখাত করিবার চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াছিল তোমাকে সেথা হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য; তাহা হইলে তোমার পর উহারাও সেথায় অল্পকালই টিকিয়া থাকিত।

❒ আমার রসূলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম তাহাদিগের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাইবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা তোমাকে দেশ থেকে উৎখাত করবার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিলো তোমাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করবার জন্য।' এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্তায়ালা রসুল স.কে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। হজরত জিবরাইল তখন তাকে বললেন, ভ্রাতা মোহাম্মদ! আল্লাহ্র কাছে কিছু চান। এমতাবস্থায় নবীগণের দোয়া কবুল হয়। রসুল স. বললেন, আপনিই বলুন, আমি কী দোয়া করবো? হজরত জিবরাইল বললেন— 'বলুন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক, তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাও এবং যেখান থেকে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক, সেখান থেকে আমাকে বের কোরো এবং তোমার নিকট থেকে আমাকে দান কোরো সাহায্যকারী শক্তি।' (আয়াত ৮০)। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তাবুক থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে। কিন্তু এই বর্ণনাটি অপরিণত ও শিথিল। কিন্তু এর পক্ষে আর একটি অপরিণত বর্ণনাও রয়েছে। বর্ণনাটি এই— সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, মুশরিকেরা বললো, হে মোহাম্মদ! নবী-রসুলগণের প্রকৃত বিচরণভূমি তো সিরিয়া। সুতরাং আপনি মদীনায় পড়ে রয়েছেন কেনো? আপনার তো সিরিয়াতেই যাওয়া উচিত। রসুল স. একথা শুনে মদীনা পরিত্যাগ করে সিরিয়া গমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। ইবনে জারীরের আরেকটি অপরিণত বর্ণনায় মুশরিকদের স্থলে এসেছে ইহুদীদের কথা।

কালাবী সূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন ইহুদীদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে গেলো। তারা বললো, হে আবুল কাসেম! আপনি তো জানেনই, মদীনা নয়, সিরিয়াই হচ্ছে পবিত্র ভূমি। সেখানেই ছিলেন হজরত ইব্রাহিম ও অন্যান্য নবীগণ। আপনি যেহেতু নিজেকে নবী বলেন, সেহেতু আপনার জন্য সিরিয়া গমনই উত্তম। সিরিয়া গমন রসুল স. এর মনোপূত ছিলো না। কারণ তখনকার সিরিয়া ছিলো রোম সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। সুতরাং যুদ্ধ প্রস্তুতি ব্যতিরেকে সিরিয়া গমন ছিলো অসমীচীন। ইহুদীরা এ কথা বুঝতে পেরে বললো, অযথা আপনি যুদ্ধ বিগ্রহের আশংকা করবেন না। আল্লাহ্ নিশ্চয় আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন। কারণ আপনি তো আল্লাহ্র নবী। রসুল স. সিরিয়া অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। শিবির স্থাপন করলেন মদীনা থেকে তিন মাইল দূরের এক স্থানে। কেউ কেউ বলেছেন, জুলহুলাইফাতে। সেখানে সকলকে সমবেত করে তাবুক অভিমুখে যাত্রা করাই ছিলো তাঁর অভিপ্রায়। ওই অবস্থায় তাঁর উপরে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

মুজাহিদ ও কাতাদার বক্তব্যানুসারে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। আর এখানকার 'আল-আরদ্ব' (দেশ) কথাটির অর্থ— মক্কা। উল্লেখ্য যে, মক্কার মুশরিকেরাও রসুল স.কে দেশান্তরিত করতে চেয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ নিজেই সেই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করেছিলেন। দিয়েছিলেন হিজরতের নির্দেশ। আর ওই নির্দেশানুসারেই রসুল স. হিজরত করেছিলেন মদীনায়। বাগবী লিখেছেন, এই বক্তব্যটিই সমধিক শুদ্ধ। কারণ ইতোপূর্বের আয়াতগুলোতে মক্কাবাসীদের কথাই বলা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, এই আয়াত মুশরিক অথবা ইহুদী কারো সঙ্গেই বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। সাধারণভাবে সকল প্রকারের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে, 'তারা তোমাকে দেশ থেকে উৎখাত করবার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিলো'। বলাবাহুল্য যে, আল্লাহ্তায়ালা তাদের সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। বিশেষভাবে হেফাজত করেছিলেন তাঁর প্রিয়তম রসুলকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাহলে তোমার পর তারাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকতো।' একথার মাধ্যমে এটাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, রসুল স.কে বিতাড়িত করলে বিতাড়নকারীদের বিনাশ ছিলো অনিবার্য। তাই দেখা যায় রসুল স. এর মদীনাগমনের পর বদর প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের উপরে নেমে এসেছিলো গজব। আবার মদীনার ইহুদীরা তাঁকে বিতাড়ন ও হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো বলে তাদের উপরেও নেমে এসেছিলো চরম লাঞ্ছনা ও অপমান। বধ করা হয়েছিলো বনী কুরায়জাকে। আর বনী নাজিরকে দেয়া হয়েছিলো নির্বাসন। তারা আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো খায়বরে। কিন্তু সেখান থেকেও তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছিলো হজরত ওমরের খেলাফতের সময়। এভাবে সমগ্র আরবভূমি হয়েছিলো বিধর্মী বিবর্জিত। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, মদীনা থেকে রসুলকে যদি বের করে দেয়া হতো, তবে মদীনাবাসীরাও উৎপাটিত হতো সমূলে। অবশ্য পরে এরকম কোনো ঘটনা আর ঘটেনি।

এর পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— আমার রসুলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিলো এইরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোনো পরিবর্তন পাবে না। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনুন, কোনো নবীকে যদি তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বহিষ্কার করে, তবে আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেই। এটাই আমার চিরন্তন নিয়ম। সুতরাং আপনাকে যদি আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা দেশান্তরিত করতো, তবে আমিও তাদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করতাম। কারণ আপনিও আমার প্রিয়ভাজন রসুল। এখানে 'তাহ্বীলা' কথাটির অর্থ— রদবদল করা বা পরিবর্তন করা।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝

❒ সূর্য হেলিয়া পড়িবার পর হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করিবে এবং কায়েম করিবে ফজরের সালাত। ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।

❒ এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করিবে; ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রশংসিত স্থানে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সূর্য হেলে পড়বার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে।' নামাজ পাঠের সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আর আলোচ্য বাক্যে বলা হয়েছে দ্বিপ্রহরের পর থেকে রাত পর্যন্ত চার ওয়াক্ত নামাজের কথা। অর্থাৎ জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার কথা।

হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে ওমর, হজরত জাবের এবং আতা, কাতাদা, হাসান বসরী ও অধিকাংশ তাবেয়ীর মতে এখানকার 'দুলুক' শব্দটির অর্থ সূর্য হেলে পড়া। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বলেছেন। হজরত ইবনে ওমর থেকে শিথিল সূত্রে ইবনে মারদুরিয়া ও বায্যার এই বর্ণনাটিকে বলেছেন সর্বোন্নত (মারফু)। রসুল স. এর এক পবিত্র বচন থেকেও একথা প্রমাণিত হয়। যেমন হজরত আবু মাসউদ আনসারী থেকে ইসহাক বিন রহওয়াইহ্ তাঁর মসনদে, ইবনে মারদুবিয়া তাঁর তাফসীরে এবং বায়হাকী তাঁর আল-মা'রিফাতে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন সূর্য হেলে পড়লো, তখন জিবরাইল আমার নিকটে এলেন এবং জোহরের নামাজ পড়ালেন।

'দালাকা' কথাটির শাব্দিক অর্থ মিলিত করা। দ্বিপ্রহরের পর যখন সূর্য হেলে পড়ে তখন সূর্যের দিকে তাকানো যায় না। আলোর প্রখরতার কারণে চোখ আপনাআপনি বন্ধ হয়ে আসে। তাই 'দুলুক' অর্থ জাওয়াল বা হেলে পড়া।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'দুলুক' অর্থ সূর্যাস্তের সময়।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বাগবী লিখেছেন, 'দুলুক' অর্থ সূর্যাস্ত। ইব্রাহিম নাখয়ী, মুকাতিল ইবনে হাব্বান, জুহাক ও সুদ্দী বলেছেন, দুলুক অর্থ একদিকে ঝুঁকে পড়া বা হেলে যাওয়া। দ্বিপ্রহরের পর এবং সন্ধ্যার পর সূর্য তো হেলেই যায়। এই দু'টি সময়ই হচ্ছে সূর্য হেলে যাওয়ার সময়। 'কামুস ' প্রণেতা বলেছেন, 'দালাকাতিশ শামসু দুলুকা' অর্থ সূর্য ডুবে গিয়েছে, হলুদ হয়ে গিয়েছে, আকাশ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। বায়যাবী লিখেছেন, শব্দটির গঠন প্রকৃতিই প্রকাশ করছে স্থানান্তরিত হওয়া বা স্থানান্তরের অর্থ। মালিশ করাকেও 'দুলুক' বলে। কারণ মালিশ করার সময় মালিশকারীর হাত এদিকে ওদিকে সরে যায়। যে শব্দের প্রথম অক্ষর 'দাল' এবং পরের অক্ষর 'লাম'— সেই শব্দে স্থানান্তরের অর্থ অবশ্যই প্রকাশ পায়। যেমন— দালাজা, দালাহা, দালাআ, দালাফা ইত্যাদি।

বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ আলেম শব্দটির প্রথমোক্ত অর্থটিকেই গ্রহণ করেছেন। একথাটিও প্রণিধানযোগ্য যে, 'দুলুকি'র অর্থ সূর্য হেলে পড়া ধরা হলে আলোচ্য আয়াতে এসে যায় চার ওয়াক্ত নামাজের কথা। বাকী এক ওয়াক্ত অর্থাৎ ফজরের কথাও এসেছে এর অব্যবহিত পরেই। এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় প্রসঙ্গও তাহলে আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভূত হয়ে যায়।

'রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত' অর্থ পশ্চিমাকাশের লাল রঙ উঠে যাওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ রাতের আঁধার ঘনবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। এখানে 'গাসাক্ব' অর্থ ঘনবদ্ধ। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, সন্ধ্যার অবসানের পর রাতের যে অন্ধকার শুরু হয়। তাকে বলে 'গাসাক্ব'।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত।' এখানে 'ওয়া কুরআনাল ফাজরি' বলে ফজরের নামাজ পাঠকেই বুঝানো হয়েছে। কোরআন পাঠ যেহেতু নামাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ তাই এখানে কোরআনের উল্লেখের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে নামাজকেই। কোরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে রুকু ও সেজদার মাধ্যমেও নামাজকে বুঝানো হয়েছে। 'ইন্‌নাস্ সলাতা কানাত্ আ'লাল মু'মিনীনা কিতাবাম মাউকুতা' (নিশ্চয় নামাজ নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে বিশ্বাসীদের জন্য ফরজ করা হয়েছে) — সুরা নিসার এই আয়াতের তাফসীরে আমি যথাস্থানে নামাজের ওয়াক্তসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।' একথার অর্থ ফজরের নামাজ ফেরেশতামণ্ডলীর দ্বারা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কারণ ওই সময় রাতের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতাদের গমনাগমনের সময়। পরিলক্ষিত হওয়া বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'শুহুদ' বা প্রত্যক্ষগোচর শব্দটি। বলা হয়েছে— 'কানা মাশহুদা।'

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একা নামাজ পড়া থেকে জামাতে নামাজ পড়ার মধ্যে রয়েছে পঁচিশগুণ বেশী পুণ্য। আর ফজরের নামাজের সময় সম্মিলিত হয় দিনের ও রাতের ফেরেশতারা। হাদিসটি বর্ণনা করার পর হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একথার প্রমাণ যদি তোমরা চাও, তবে পড়ো— 'এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত।'

বায়যাবী লিখেছেন, ফজরের নামাজ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওই সময় রাতের ঘোর অন্ধকার কেটে গিয়ে সকল কিছু হয় সমুদ্ভাসিত। মুছে যায় মৃত্যুর অনুজ নিদ্রার প্রভাব। ওই সময়ের সাক্ষ্য দেয় অন্ধকার ও আলো, নিদ্রা ও জাগরণ এবং ফেরেশতাদের একটি বৃহৎ দল। অথবা ওই সময় জামাতে উপস্থিত হতে পারে বহুসংখ্যক নামাজী। কিংবা কথাটির মাধ্যমে এই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, ওই সময়ের নামাজে উপস্থিত হওয়া উচিত সকলের।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে একই সঙ্গে বলা হয়েছে মাগরিব ও ফজর নামাজের কথা। এভাবে আলোচ্য আয়াতের পূর্ণ বক্তব্যের মধ্যে মাগরিবের নামাজকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সূর্যাস্ত থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত। আর ফজরের ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছে রাত্রি অবসানের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। আর সূর্যোদয়ের প্রভা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সময় তো বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হওয়ারই সময়।

পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে, এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! রাতের একাংশে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে আপনি তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠ করবেন। এটা হচ্ছে আপনার একটি অতিরিক্ত (নফল) কর্ম। এখানকার 'বিহী' সর্বনামটি পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত কোরআন বা নামাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, 'হাজাদা' ও 'হুজুদা' হচ্ছে তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ। বাবে তাফায়য়ুল নিয়মে এখানে শব্দটি রূপান্তরিত হয়েছে 'তাহাজ্জুদা।' 'নিদ্রাভিভূত হওয়া' ও 'জাগ্রত হওয়া'— দুই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এটি বিপরীতার্থক শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এভাবে 'তাহজিদা' 'হাজ্‌জাদা' শব্দ দু'টোর অর্থও নিদ্রামগ্ন হওয়া ও নিদ্রাভঙ্গ হওয়া। সুতরাং এ দু'টোও বিপরীতার্থক শব্দ।

বাবে ইফআলের নিয়মে 'আহজাদা' ও 'হাজজাদা'র মতো। এভাবে নিদ্রামগ্ন হওয়ার ব্যাপারটি একই সঙ্গে লাজেম (অকর্মক ক্রিয়া), আবার মুতাআদ্দিও (সকর্মক ক্রিয়া)। প্রকৃত কথা এই যে, 'জীম' অক্ষরের উপরে তাশদীদ যদি সলবে মা'খুজ বা ধাত্যর্থ বিলোপ করার জন্য ধরা হয়, তবে অর্থ হবে— ঘুমকে দূর করা বা জাগ্রত হওয়া। আর মুতাআদ্দি বা সকর্মক ক্রিয়া ধরা হলে অর্থ হবে নিদ্রাভিভূত হওয়া।

বাগবী লিখেছেন, 'তাহাজ্জুদ' যখন জাগ্রত হওয়াকেই বুঝায় তখন মনে করতে হবে নামাজ পাঠ করতে হবে নিদ্রাভঙ্গের পর। কারণ সারারাত জেগে জেগে নামাজ পড়াকে কখনো তাহাজ্জুদ বলে না। আমি বলি, তাহাজ্জুদ অর্থ নামাজের

জন্য নিদ্রা পরিত্যাগ করা। এই নিদ্রা পরিত্যাগ হতে পারে তিনভাবে— ১. সারারাত জেগে জেগে নামাজ পড়া। ২. রাতের প্রথমাংশে জেগে থেকে নামাজ পড়া, শেষাংশে ঘুমিয়ে যাওয়া। এবং ৩. রাতের প্রথমাংশে ঘুমিয়ে যাওয়া, তারপর শেষরাতে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়া। শেষের প্রকারটির সুনির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই। হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে রোজা রাখতাম। তিনি কখনোই রাতে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে (তারাবীর) নামাজ পড়াননি। রমজানের ২৪ তারিখের রাতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন। নামাজের মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে গেলো রাতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। পরের রাতে তিনি আর উঠলেনই না। তার পরের রাতে পুনরায় আমাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন। সেদিন নামাজে অতিবাহিত হলো প্রায় অর্ধরাত। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কতোইনা উত্তম হতো, যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে সারারাত নামাজ পড়তেন। তিনি স. বললেন, যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে জামাতে (ইশার) নামাজ পড়ে নিদ্রা যায়, তার আমলনামায় লিখে দেয়া হয় সারারাত নামাজ পড়ার সওয়াব। এর পরের রাতেও তিনি আর নামাজে এলেন না। তার পরের রাতে আবার অপেক্ষমান সাহাবীগণকে নিয়ে নামাজ শুরু করলেন। এভাবে নামাজ পড়তে পড়তে 'ফালাহ' এর সময় চলে যাবার উপক্রম হলো। বর্ণনাকারী হজরত আবু জরের একথা শুনে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ জিজ্ঞেস করলো, হজরত! ফালাহ আবার কী? তিনি বললেন, সেহেরী। পুনরায় বললেন, এর পরের রাতগুলোতে তিনি স. আর নামাজ পড়াননি। সুনান রচয়িতাবৃন্দ হাদিসটির বর্ণনাকারী। শব্দগত কিছু হেরফের সহ তিরমিজি কর্তৃকও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

সায়েব ইবনে ইয়াজিদ বর্ণনা করেছেন, হজরত উবাই ইবনে কা'ব এবং হজরত তামীমদারীকে হজরত ওমর এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, লোকদেরকে এগারো রাকাত নামাজ পড়াবে। তাঁরা যখন ইমামতি করতেন তখন এরকমই করতেন। কিন্তু তাঁদের নামাজের রাকাত হতো খুব দীর্ঘ। ফলে আমরা কেউ কেউ লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতাম। এভাবে নামাজ পড়তে পড়তে প্রায়শই ফজরের নামাজের সময় হয়ে যেতো। মুয়াত্তা। হজরত উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, আমাদের রমজান মাসের রাতের নামাজ দীর্ঘায়িত হতো। ফলে সেহেরীর আহার্য তৈরী করতে হতো অত্যন্ত দ্রুত। হজরত মালেক ইবনে আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ভোরের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখতেন (অর্থাৎ সফরে তিনি স. তাঁর বাহনের উপরে প্রায় ভোর পর্যন্ত নফল নামাজ পড়তেন)।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. ভ্রমণাবস্থায় তাঁর উটের উপরে নফল নামাজ পাঠ করতেন, উটের মুখ যেদিকেই থাকুক না কেনো। তখন তিনি স. রুকু ও সেজদা করতেন ইশারায়। বিতির নামাজও তিনি তাঁর বাহনের

উপরেই পড়তেন। কিন্তু ফরজ নামাজের সময় হলে উট থামিয়ে নিচে নেমে আসতেন এবং কেবলামুখী হয়ে নামাজ পাঠ করতেন ভূমিতে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রাতের প্রথম অংশেই নামাজ পড়ে নেয়া ভালো। কারণ ঘুম কখন ভাঙবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অবশ্য প্রথম রাতের চেয়ে শেষ রাতের তাহাজ্জুদ নামাজের সওয়াব অনেক বেশী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর প্রথম আসমানে আমাদের প্রভুপালনকর্তার আনুরূপ্যবিহীন অবতরণ ঘটে এবং বর্ষিত হয় তার বিশেষ রহমত।

আবদুর রহমান ইবনে আবদুর কারী বর্ণনা করেছেন, আমি একবার হজরত ওমরের সাথে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে গেলাম। দেখলাম অধিকাংশ লোক পৃথক পৃথক অবস্থানে দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠ করছে। আর একপাশে জামাত করে নামাজ পড়ছে কয়েকজন। হজরত ওমর বললেন, আমি যদি এদের সকলকে এক ইমামের পশ্চাতে একত্র করে দেই, তবে তা হবে অতি উত্তম। একথা বলে তিনি হজরত উবাই ইবনে কা'বকে সকলের ইমাম বানিয়ে দিলেন। আর একদিন আমি হজরত ওমরের সঙ্গে মসজিদে গিয়ে দেখলাম, সকলে এক ইমামের পিছনে নামাজ পড়ছে। হজরত ওমর বললেন, এটা হচ্ছে এক নতুন উত্তম রীতি। এভাবে রাতের প্রথম অংশে নামাজ পড়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়তেন। হজরত ওমর তাই বলতেন, তোমরা নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে যাও। তোমাদের এই নামাজের চেয়ে শেষ রাতের নামাজই উত্তম। বোখারী।

মাসআলাঃ প্রথম দিকে তাহাজ্জুদ নামাজও রসুল স. ও তার সাহাবীগণের উপরে ছিলো ফরজ। এই ফরজের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো সুরা মুজাম্মেলের এক আয়াতে এভাবে— 'হে বস্ত্রাবৃত! নিশীথে নামাজে দণ্ডায়মান থাকুন, কিয়দংশ ব্যতীত, অর্থাৎ অর্ধরাত্রি।' পরবর্তীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয় এবং তাহাজ্জুদ নামাজকে করা হয় নফল। নির্দেশ দেয়া হয়— 'ফাক্বরায়ু মা তাইয়াস্সারা মিন্হু' (কাজেই কোরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমার জন্য সহজ হয়, ততটুকু আবৃত্তি করো)।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পর তাহাজ্জুদ নামাজ উম্মতের জন্য নফল হয়ে যায়। কিন্তু রসুল স. এর উপরে তা ফরজ না নফল, সে বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে বিস্তর মতপৃথকতা রয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে রসুল স. এর উপরে তাহাজ্জুদ নামাজ যেমন ফরজ ছিলো, তেমনি পরেও তা ফরজ রয়ে গিয়েছে। জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স.

বলেছেন, তিনটি বিষয় আমার উপরে ফরজ, কিন্তু তোমাদের উপরে সেগুলো সুন্নত। ওই তিনটি বিষয় হচ্ছে— বিতির, মেসওয়াক ও তাহাজ্জুদের নামাজ। এই বর্ণনার প্রেক্ষিতে বলতে হয়, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'নাফিলাতাল্ লাক' (আপনার জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য) — কথাটির অর্থ হবে অতিরিক্ত ফরজ। অর্থাৎ যা অন্যের উপর ফরজ নয়। আমি বলি, তাহাজ্জুদের ফরজ দায়িত্ব রসুল স. এর উপর থেকেও প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাই তাহাজ্জুদ ছিলো তাঁর মোসতাহাব জাতীয় অতিরিক্ত একটি আমল। আয়াতের বিবরণভঙ্গিতেও একথা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। কেননা 'নাফিলা' (অতিরিক্ত) শব্দটির অর্থ যদি অতিরিক্ত ফরজ হতো, তবে এখানে 'লাকা' এর স্থলে বসতো 'আলাইকা' (তোমার উপর)। অত্যাবশ্যকীয় কোনো কিছুর উপরে কখনো 'লাম ' ব্যবহৃত হয় না, ব্যবহৃত হয় 'আলা'।

একটি প্রশ্নঃ তাহাজ্জুদের নামাজ তো সকলের জন্যই নফল। তবুও তা আলোচ্য আয়াতে রসুল স. এর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো কেনো?

উত্তরঃ নফল দ্বারা পাপ মোচন হয়। তাই উম্মতের পাপমোচনের নিমিত্তে সাধারণভাবে সকলের জন্য নফল ইবাদতের অবকাশ রাখা হয়েছে। কিন্তু রসুল স. ছিলেন নিস্পাপ। পাপের সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পৃক্ততাই তাঁর ছিলো না। এছাড়াও তাঁর পূর্বাপর সকল অনবধানতাকেও আল্লাহ্ অপসারিত করে দিয়েছেন। তাই তাঁর নফল পাপমোচনের নিমিত্ত নয়, বরং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম। সে কারণেই এখানে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধিজনিত এই আমলটিকে 'অতিরিক্ত কর্তব্য' আখ্যা দেয়া হয়েছে। এছাড়া হজরত মুগীরা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসের মাধ্যমেও রসুল স. এর জন্যও তাহাজ্জুদ নফল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। হাদিসটি এই— রসুল স. রাতের নামাজে এতো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, এতে করে তাঁর পবিত্র পদযুগল ফুলে যেতো। তাঁকে একবার বলা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তো পূর্বাপর সকল অনবধানতাজনিত বিচ্যুতি থেকে পবিত্র। তিনি স. বললেন, আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞপরায়ণ বান্দা হবো না? তখন কিন্তু তিনি স. একথা বলেননি যে, তাহাজ্জুদ আমার উপরে ফরজ।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. ফরজ নামাজ ছাড়া অন্য সকল প্রকার নামাজ উটের পিঠে বসেই পড়তেন। এমনকি বিতিরও। নামাজ পাঠ কালে উট যেদিকেই চলুক না কেনো, তার প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। এই হাদিসের মাধ্যমেও বুঝা যায় যে, তাহাজ্জুদ নামাজ ছিলো রসুল স. এর জন্য নফল, ফরজ নয়।

মাসআলাঃ উম্মতের জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ সুন্নত। তবে এই সুন্নত মোয়াক্কাদা না গায়ের মোয়াক্কাদা, সে বিষয়ে সমাধান পাওয়া মুশকিল। আমার নিকটে কিন্তু তাহাজ্জুদ নামাজ সুন্নতে মোয়াক্কাদা। কেননা রসুল স. এই নামাজ সব সময় অতি গুরুত্ব ও যত্নের সঙ্গে পাঠ করেছেন। হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর কাছে একবার এক লোক সম্পর্কে বলা হলো 'সে তো সারারাত ঘুমিয়েই কাটায়'। রসুল স. বললেন, শয়তান তার কানে প্রস্রাব করে দিয়েছে। বোখারী, মুসলিম। তাহাজ্জুদ যদি সুন্নতে মোয়াক্কাদা না হতো, তবে নিশ্চয় রসুল স. ওই ব্যক্তিকে এভাবে ভর্ৎসনা করতেন না। মোসতাহাব আমল পরিত্যাগকারী কখনোই তিরস্কারের পাত্র নয়।

রসুল স. এর তাহাজ্জুদঃ হজরত জায়েদ বিন খালেদ জুহনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর রাতের আমল স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছা জেগেছিলো আমার মনে। তাই আমি একরাতে তাঁর বহিরাঙ্গণের দরজায় হেলান দিয়ে বসে রইলাম। দেখলাম গভীর রাতে উঠে তিনি দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামাজ পড়লেন। এরপর দুই রাকাত নামাজ পড়লেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। এরপর দু'রাকাত পড়লেন কিছুটা সংক্ষেপে। তারপর আবার দু'রাকাত পড়লেন আরো সংক্ষেপে। তারপরে আরো সংক্ষিপ্তভাবে পড়লেন দুই রাকাত। এরপর পড়লেন বিতির। এভাবে তিনি স. নামাজ পড়লেন মোট তেরো রাকাত। বাগবী এরকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মেশকাত রচয়িতা লিখেছেন, বিতির সহ সর্বমোট নামাজ ছিলো পনেরো রাকাত। মেশকাতের এই বর্ণনাটি নেয়া হয়েছে 'কিতাবুল হুমায়দী', মুয়াত্তায়ে মালেক, সুনানে আবু দাউদ ও জামিউল উসুল থেকে। এক্ষেত্রে বিতির নামাজ হবে এক রাকাত। আর বাগবীর বর্ণনায় বিতিরের রাকাত সংখ্যা হবে তিন। অর্থাৎ তাহাজ্জুদ দশ ও বিতির তিন।

জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. রমজানে ও অন্যান্য সকল মাসে রাতে এগারো রাকাতের বেশী নামাজ পড়তেন না। প্রথম চার রাকাতের দৈর্ঘ ও সৌন্দর্য ছিলো দেখবার মতো। পরের প্রলম্বিত চার রাকাতের আকৃতি-প্রকৃতিও ছিলো অতীব সুন্দর। এরপর তিনি পড়তেন তিন রাকাত। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি বিতিরের আগে কি একবার ঘুমিয়ে নেন? তিনি স. বললেন, আয়েশা! আমি ঘুমাই কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না। বোখারী ও মুসলিম।

জননী আয়েশা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রমজানের ভিতর ও বাইরে রসুল স. ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তীতে সর্বমোট নামাজ পড়তেন এগারো রাকাত। প্রতি দু'রাকাত অন্তর সালাম ফেরাতেন। সব শেষে পড়তেন এক রাকাত এবং সেজদা করতেন দু'টি। সেজদায় গিয়ে এত সময় ক্ষেপণ করতেন যে, ওই সময়ের মধ্যে কেউ ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াত করে নিতে পারতো। এরপর শুয়ে

পড়তেন। উঠতেন ফজরের আজানের শেষে। তারপর সংক্ষেপে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিয়ে পুনরায় ডান হাতে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন। জামাতের সময় হলে মোয়াজ্জিন খবর দিতো। তিনি স. উঠে চলে যেতেন মসজিদে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমরা ইচ্ছে করলে রসুল স. এর রাতের নামাজ পাঠ দেখতে পারতাম (রাতে তিনি শয্যাগ্রহণ করতেন, আবার নামাজও পড়তেন)। হজরত আনাস থেকে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. কখনো কখনো একাধারে রোজা রাখতেন। আমরা ভাবতাম এ মাসে মনে হয় তিনি আর রোজা ভঙ্গ করবেনই না। আবার কখনো কখনো রোজা রাখতেন না। আমরা ভাবতে শুরু করতাম, এ মাসে মনে হয় তিনি আর রোজাই রাখবেন না। নাসাঈ।

জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. রাতে নামাজ পড়তেন মোট তেরো রাকাত। বিতির ও ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ছিলো ওই তেরো রাকাতের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম।

মাসরুক বর্ণনা করেছেন, আমি একবার জননী আয়েশার নিকটে রসুল স. এর রাতের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ফজরের দু'রাকাত সুন্নত ছাড়া তাঁর রাতের নামাজ হতো কখনো সাত কখনো এগারো রাকাত। জননী আয়েশা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. গভীর রাতে উঠে নামাজ পড়তেন। প্রথম দুই রাকাত পড়তেন সংক্ষিপ্তরূপে। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে সর্বোন্নত সূত্রে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা যদি রাতে উঠে নামাজ পড়তে চাও, তবে প্রথমে দু'রাকাত নামাজ পড়ে নিবে সংক্ষিপ্তরূপে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর প্রকোষ্ঠে শুয়ে ছিলাম। দেখলাম, গভীর রাতে তিনি স. গাত্রোত্থান করলেন। মেসওয়াক করলেন। তারপর পাঠ করলেন 'ইন্না ফী খলক্বিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি' থেকে সুরার শেষ পর্যন্ত। তারপর ওজু করে নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। দীর্ঘ কিয়াম, রুকু ও সেজদা সহকারে পাঠ করলেন দুই রাকাত নামাজ। এরপর শুয়ে পড়লেন তিনি। এমনভাবে নিদ্রাভিভূত হলেন যে, শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ হয়ে উঠলো ভারী। পুনরায় উঠে পড়লেন তিনি। পুনরায় নামাজ শুরু করলেন। তিনি স. এরকম করলেন মোট তিন বার। এভাবে রাকাতের সংখ্যা দাঁড়ালো ছয়। প্রতিবারই উঠে তিনি স. প্রথমে মেসওয়াক করলেন। ওজু করলেন এবং পাঠ করলেন উল্লেখিত আয়াত। সবশেষে বিতির পড়লেন তিন রাকাত। মুসলিম।

জননী আয়েশা বলেছেন, শেষের দিকে যখন রসুল স. এর পবিত্র শরীর হলো কিছু হৃষ্টপুষ্ট, তখন তিনি রাতের নামাজ পড়তে লাগলেন বসে বসে। বোখারী,

মুসলিম। হজরত হুজায়ফা বলেছেন, আমি রসুল স.কে তাঁর রাতের নামাজ পাঠ করতে দেখেছি। তিনি স. শয্যাত্যাগের পর তিন বার 'আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করলেন। তারপর পড়লেন— 'জুল মালাকুতি ওয়াল জাবারুতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল আ'জমাতি।' এরপর তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে পাঠ করলেন সুরা বাকারা। এরপর রুকুতে গিয়ে কাটালেন প্রায় কিয়ামের পরিমাণ সময়। রুকুতে বারংবার পাঠ করলেন 'লি রব্বিইয়াল হামদ'। এরপর রুকু থেকে উঠে সেজদায় গেলেন। সেজদা করলেন প্রায় কিয়ামের সমপরিমাণ দীর্ঘ। আর বারংবার পাঠ করলেন 'সুবহানা রব্বিইয়াল আ'লা।' এরপর মাথা ওঠালেন। এভাবে বসে থাকলেন প্রায় সেজদার সমপরিমাণ সময়। বার বার পড়তে থাকলেন 'রব্বিগ্ফিরলি।' এভাবে তিনি সুরা বাকারা, সুরা আল ইমরান, সুরা নিসা ও সুরা আন্আম সহকারে নামাজ আদায় করলেন মোট চার রাকাত। আবু দাউদ।

হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর রাতের নামাজ পাঠ দেখলাম। তিনি নামাজে একটি আয়াত পুনঃপুনঃ পাঠ করতে করতেই কাটিয়ে দিলেন সমস্ত রাত। আয়াত এই— ইন্ তুয়াজ্জিব্হুম ফা ইন্নাহুম ই'বাদুকা ওয়া ইন্ তাগ্ফিরলাহুম ফা ইন্নাকা আনতাল আ'যীযুল হাকীম (যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করো, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)।

জনৈক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. ইশার নামাজ আদায়ের কিছুক্ষণ পরে শয্যাগ্রহণ করলেন। গভীর রাতে জেগে উঠলেন, আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পাঠ করলেন 'রব্বানা মা খলাক্বতা হাজা বাত্বিলা' থেকে 'ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীয়াদ' পর্যন্ত। তারপর শয্যার দিকে হাত বাড়িয়ে মেসওয়াক গ্রহণ করলেন। মেসওয়াক করার পর ওজু সেরে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন নামাজে। আমার মতে তিনি স. নামাজ পড়লেন ওই পরিমাণ সময় ধরে, যে পরিমাণ সময় তিনি ব্যয় করেছিলেন নিদ্রায়। এরপর তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমালেন প্রায় একই পরিমাণ সময়। পুনরায় উঠে নামাজ শুরু করলেন তিনি স.। ফজর পর্যন্ত এরকম করলেন তিনি তিন বার। নাসাঈ।

জননী উম্মে সালমা বলেছেন, রসুল স. যে পরিমাণ সময় ঘুমাতেন, নামাজও পড়তেন সেই পরিমাণ সময় ধরে। আবার যতক্ষণ তিনি নামাজ পড়তেন, ঘুমাতেনও ঠিক ততক্ষণ। এভাবেই অতিবাহিত হতো তাঁর রাত্রি। জননী উম্মে সালমার নিকটে একবার রসুল স. এর কোরআন পাঠ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো। তিনি প্রতিটি শব্দের পৃথক ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে কোরআন পাঠ করে শোনালেন এবং বললেন, এভাবে। আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাঈ।

শেষে বলা হয়েছে— 'আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।' এখানে 'মাকামাম্ মাহমূদা' অর্থ প্রশংসিত স্থান। পূর্বাপর সকল মানুষ ওই স্থানের প্রশংসায় হবে পঞ্চমুখ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে আবু দায়েলের মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. একবার বললেন, আল্লাহ্ নবী ইব্রাহিমকে বানিয়েছেন তাঁর খলিল (বন্ধু)। তোমাদের সাথীও আল্লাহ্র খলিল। তাঁকেই করা হয়েছে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ সম্মানার্হ। এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন—'আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে'। রসুল স. পুনরায় বললেন, আল্লাহ্ তাঁকে তখন উপবেশন করাবেন আরশের উপরে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেছেন, আল্লাহ্ তখন রসুল স.কে সমাসীন করবেন কুরসির উপরে। প্রথমোক্ত হাদিসের মাধ্যমে বুঝা যায় মাকামে মাহমুদ হচ্ছে আরশ। আর পরের হাদিসের মাধ্যমে জানা যায়, কুরসিই হচ্ছে মাকামে মাহমুদ। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, মাকামে মাহমুদ অর্থ মাকামে শাফায়াত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি, আহমদ ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মাকামে মাহমুদ হচ্ছে ওই স্থান যেখানে অধিষ্ঠিত হয়ে আমি শাফায়াত করবো আমার উম্মতের জন্য।

হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে মুসলমানেরা কঠোর হিসাবের ব্যবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়বে এবং আক্ষেপ করে বলতে থাকবে, হায়! আমরা যদি এখন কাউকে সুপারিশকারী হিসেবে পেতাম, তবে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার নিকটে আমাদের জন্য সুপারিশ করাতে পারতাম। তারা ভেবে চিন্তে দেখবে নবী আদম হচ্ছেন সকলের আদি পিতা। অতএব তিনিই একাজের উপযুক্ত। নবী আদমের কাছে গিয়ে তখন তারা বলবে, আপনি আমাদের সকলের পিতা। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অলৌকিক হাতে সৃষ্টি করেছেন আপনাকে। পরম যত্নে স্থান দিয়েছেন জান্নাতে। সম্মানিত করেছেন ফেরেশতাদের সেজদার মাধ্যমে। শিখিয়েছেন সকল কিছুর নাম। সুতরাং আপনি আপনার প্রভুপালকের নিকটে সুপারিশ করে আমাদেরকে এ স্থান থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করুন। নবী আদমের তখন মনে পড়বে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের কথা। তাই তিনি বলবেন, আমি এই গুরুদায়িত্ব বহনের উপযোগী নই। তোমরা নুহের কাছে যাও। তিনিই মহাপ্লাবনের পরের প্রথম নবী। আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন পৃথিবীবাসীদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে। লোকেরা তখন উপস্থিত হবে নবী নুহের নিকটে। জানাবে তাদের অভিপ্রায়। তিনি বলবেন, অজ্ঞাতসারে আমি আমার এক কাফের পুত্রের জন্য দোয়া করেছিলাম। সে কথা স্মরণ করে আমি লজ্জিত। তোমরা বরং ইব্রাহিম

খলিলুল্লাহ্র নিকটে যাও। লোকেরা উপস্থিত হবে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ সকাশে। তাঁর তখন মনে পড়ে যাবে ওই তিনটি বচনের কথা যা প্রকাশ্যতঃ অসত্য। ওই তিনটি উক্তি হচ্ছে— ১. মিসরের বাদশাহর কাছে তিনি তাঁর স্ত্রী সারাকে বলেছিলেন তাঁর বোন। ২. অংশীবাদীদের মেলায় গমনের জন্য আহ্বান জানানো হলে তিনি বলেছিলেন, আমি অসুস্থ। ৩. তাদের মূর্তিগুলোকে ভাঙার পর একটি অক্ষত মূর্তিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, একাজ করেছে ওই মূর্তিটি। ওই তিনটি কথা মনে পড়ার কারণে নবী ইব্রাহিম তখন লজ্জিত হবেন এবং বলবেন, হে জনতা! তোমরা রসুল মুসার কাছে গিয়ে ধর্ণা দাও। আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। তাঁকে দান করেছেন তওরাত। জনতা তখন সমবেত হবে রসুল মুসা সকাশে। তিনি তাদের কথা শুনে বলবেন, এরকম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা আমার নেই। আমার আঘাতে নিহত হয়েছিলো এক কিবতী। সে কথা স্মরণ করে আমি এখন ব্রীড়াক্রান্ত। তোমরা বরং যাও ঈসা রূহুল্লাহ্র কাছে। তিনি আল্লাহ্র রসুল, রূহুল্লাহ্ ও কালিমাতুল্লাহ্। উদভ্রান্ত জনস্রোত তখন উপস্থিত হবে ঈসা রূহুল্লাহ্র নিকটে। তিনি বলবেন, হে জনতা! তোমরা ভুল করেছো। তোমাদের এখন যাওয়া উচিত শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফার কাছে। তিনিই এই মহান কর্তব্য পালনের পরিপূর্ণ যোগ্যতাধারী। আল্লাহ্ তাঁর পূর্বাপর সকল বিচ্যুতি অবলোপন করে দিয়েছেন। লোকেরা তখন আসবে আমার কাছে। আমি তখন মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রার্থনা জানাবো। অনুমতি পাওয়ার পর আমি ওই প্রশংসিত স্থানে গিয়ে সেজদাবনত হবো। আল্লাহ্ বলবেন, হে আমার প্রেমাস্পদ! মস্তক উত্তোলন করো। আজ তোমার প্রার্থনা কবুল করা হবে। আমি সেজদা থেকে মস্তক উত্তোলন করে বর্ণনা করবো আল্লাহ্র বিশেষ প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি— যেমন তিনি শিক্ষা দান করবেন। তারপর আমি শুরু করবো শাফায়াত। আল্লাহ্তায়ালা আমার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দিবেন। আমার শাফায়াত হবে ওই সীমানার ভিতরেই। আমার শাফায়াত গৃহীত হবে। এরপর যাদের জন্য আমার শাফায়াত গৃহীত হবে তাদেরকে দোজখ থেকে বের করে পৌঁছে দিবো জান্নাতে। পুনরায় আমি চাইবো ওই প্রশংসিত স্থান। পুনরায় আমাকে দেয়া হবে সেখানে প্রবেশের অধিকার। সেখানে প্রবেশ করে আল্লাহ্র দীদার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় লুটিয়ে পড়বো আমি। ওই অবস্থায় থাকবো ততক্ষণ, যতক্ষণ আল্লাহ্ চান। আল্লাহ্ বলবেন, প্রিয়তম মোহাম্মদ! মাথা ওঠাও। মনোবাসনা প্রকাশ করো। দাবি উত্থাপন করো। তোমার কামনা ও দাবি পূরণ করা হবে। আমি মাথা ওঠাবো এবং আল্লাহ্র প্রশিক্ষণানুযায়ী কেবল তাঁরই প্রশংসা ও প্রশস্তি বর্ণনায় মুখর হবো, যতক্ষণ তিনি চান। তারপর অনেক জাহান্নামবাসীদের জন্য সুপারিশ করবো। যাদের জন্য সুপারিশ করবো, তাদের জন্য ঘোষিত হবে নিষ্কৃতি

দানের আদেশ। আর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে এনে পৌঁছে দিবো বেহেশতে। তৃতীয়বারও ঘটবে এরকম শাফায়াতের ঘটনা। অবশেষে জাহান্নামে থাকবে কেবল তারা, যাদের জাহান্নামী হওয়ার বিষয়ে পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বলার পর রসুল স. তেলওয়াত করলেন— আশা করা যায় তোমার প্রভুপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। এরপর তিনি স. উপস্থিত সহচরবর্গকে লক্ষ্য করে বললেন, এই হচ্ছে মাকামে মাহমুদের বিবরণ, যার অঙ্গীকার করেছেন তোমাদের প্রভুপালক তোমাদের নবীর সঙ্গে।

হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসেও শাফায়াতের কথা বলা হয়েছে। হাদিসটির বিবরণভঙ্গি এরকম— রসুল স. বলেন, আমি আমার প্রভুপালনকর্তার নিকটে শাফায়াতের মাকামে অনুপ্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমার হৃদয়ে তখন প্রক্ষেপ করা হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিছু প্রশংসা প্রকাশক বাক্য, যে বাক্যগুলো এখন আমার স্মৃতিতে নেই। ওই বাক্যগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র স্তব-স্তুতি বর্ণনা করার পর আমি সেজদাবনত হবো। আল্লাহ্ বলবেন, হে আমার প্রিয়তম রসুল! মস্তক উত্তোলন করো, তোমার নিবেদন ও দাবি পূরণ করা হবে। কবুল করা হবে তোমার প্রার্থনা— শাফায়াত। আমি বলবো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমার উম্মত। আমার উম্মত। আল্লাহ্ বলবেন, যার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ইমান আছে তাকে নরক থেকে বের করে নিয়ে এসো। আমি তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন করবো। পুনরায় তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পর সেজদায় লুটিয়ে পড়বো আমি। নির্দেশ হবে, যাদের অন্তরে সরিষার দানা অপেক্ষাও কম পরিমাণ ইমান রয়েছে, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। আমি তৎক্ষণাৎ এ নির্দেশ পালন করবো। এরপর রসুল স. এভাবে তৃতীয় ও চতুর্থবার শাফায়াতের কথা উল্লেখ করলেন। তারপর বললেন, শেষে আমি বলবো, হে আমার মহাদয়ার্দ্র প্রভুপালক! ওই সকল লোককে বের করার নির্দেশও আমাকে প্রদান করুন যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ উচ্চারণ করেছিলো। আল্লাহ্ বলবেন, আমার সম্মান, মহত্ব, পরাক্রম ও প্রতাপের শপথ! যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেছিলো, তাদেরকে আমি অবশ্যই নিষ্কৃতি দিবো।

আল্লামা সুয়ূতি লিখেছেন, বিদ্বজ্জনেরা বর্ণিত হাদিসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ পোষণ করেছেন। কেননা এখানে প্রথমে বর্ণিত হয়েছে, বিচারের জন্য অপেক্ষমান জনতার দুঃখ কষ্টের কথা। শেষাংশে এসেছে শাফায়াত ও দোজখ থেকে পরিত্রাণের আলোচনা। বলাবাহুল্য যে, শাফায়াত ও দোজখ মুক্তি

তো শেষেই হবে। এর পূর্বে ঘটবে পুলসিরাত অতিক্রমের ঘটনা। পুলসিরাত অতিক্রম করতে গিয়ে অনেকেই পতিত হবে দোজখে। কিন্তু হজরত হুজায়ফা কর্তৃক বর্ণিত একটি যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসে পুলসিরাত অতিক্রমের কথা এসেছে শাফায়াতের পরে। আর হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, তখন প্রত্যেককে হুকুম দেয়া হবে, পৃথিবীতে যে যার ইবাদত করেছে সে তার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হও। এরপর পৃথক করে ফেলা হবে মুমিন ও মুনাফিকদেরকে। তারপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে পুলসিরাত। তারপর দেয়া হবে শাফায়াত এবং দোজখ থেকে বের করে আনার হুকুম। প্রত্যেকে তখন একত্র হবে তাদের নেতাদের পশ্চাতে। আর শাফায়াতের মাধ্যমে দোজখ মুক্তির ঘটনাটি ঘটবে সকলের শেষে। এই ধারাবাহিকতাটির উল্লেখ করেছেন কাযী আয়ায ও ইমাম নববী।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসসমূহের বিবরণ কিছুটা সংক্ষিপ্ত। প্রকৃত কথা এই যে, শাফায়াত হবে দু'বার। প্রথম বার হবে হাশরের প্রান্তরের কষ্টদায়ক অবস্থান থেকে মুক্তির লক্ষ্যে। দ্বিতীয়বার হবে দোজখ থেকে পরিত্রাণ প্রদানের জন্য। অন্যান্য হাদিসে এরকম বলা হয়েছে।

আমি আরো বলি, বর্ণিত হাদিসের 'ফী দারিহী' কথাটির অর্থ হবে জান্নাত। কেননা জান্নাতই হচ্ছে আল্লাহ্‌র দীদারের একমাত্র স্থান। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌কে দেখে সেজদায় পতিত হওয়ার ঘটনাটি ঘটবে জান্নাতে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, লোকেরা তখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছুটাছুটি করতে থাকবে। আর প্রত্যেকে থাকবে তাদের আপনাপন নবীদের সঙ্গে এবং তাদেরকে তারা শাফায়াত করার জন্য নিবেদনও জানাবে। কিন্তু শাফায়াতের অধিকার পাবেন কেবল শেষ নবী মোহাম্মদ স.। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলকে দণ্ডায়মান করিয়ে দিবেন মাকামে মাহমুদে বা প্রশংসিত স্থানে। অন্যান্য হাদিসে বিষয়টির বর্ণনা এসেছে এভাবে— সূর্য তখন নেমে আসবে অতি নিকটে। তার প্রচণ্ড উত্তাপে সৃষ্টি হবে মানুষের শরীর থেকে ঘামের স্রোত। ওই স্বেদস্রোতে মানুষের শরীর ডুবে যাবে তাদের কান পর্যন্ত। তখন তারা আদি পিতা আদমের নিকটে সমবেত হয়ে শাফায়াতের জন্য ফরিয়াদ জানাবে। বাবা আদম বলবেন, শাফায়াত করার অধিকার আমার নেই। সর্বশেষে উদভ্রান্ত জনতা উপস্থিত হবে রসুল স. সকাশে। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তিনি শাফায়াত করবেন। জড়িয়ে ধরবেন জান্নাতের দরজা। আল্লাহ্ তখন তাঁর প্রিয়তম রসুলকে দাঁড় করাবেন মাকামে মাহমুদে। তাঁর ওই অভূতপূর্ব মর্যাদা অবলোকন করে সমবেত জনমণ্ডলী শতমুখে তাঁর প্রশংসা করতে থাকবে।

হজরত হুজায়ফা থেকে বাযযার ও বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ তখন সকল মানুষকে সমবেত করবেন এক বিশাল প্রান্তরে। আপনাপন পরিণতির ভাবনায় তখন সকলেই হয়ে পড়বে বাকরুদ্ধ। সর্বপ্রথম আহ্বান করা হবে

মোহাম্মদ! তিনি স. বলবেন, এই যে আমি। হে আমার প্রভুপালক! আমি তো লাভ করেছি তোমার সান্নিধ্যের কল্যাণ। সকল কল্যাণের অধিকারী কেবল তুমি। অকল্যাণ থেকে তুমি সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত। তুমি যাকে পথের সন্ধান দাও, সে-ই হয় পথপ্রাপ্ত। তোমার অপার প্রীতিপ্লাবিত এই দাস এখন তোমার সকাশে দণ্ডায়মান। তুমিই তোমার অসীম অনুগ্রহের কারণে তাকে দান করেছো মানব অস্তিত্ব। আর তার সততপ্রত্যাবর্তন তোমারই অভিমুখী। এভাবে সমগ্র সৃষ্টি তোমার দিকেই ধাবিত। অন্য কোনো দিকে পলায়নের সাধ্য কারো নেই। পলায়নকারীদেরও অনিবার্য গন্তব্য কেবলই তুমি। হে মহিমময় কাবাগৃহের একমাত্র অধিকর্তা! তুমি মহা কল্যাণময়। সকল কিছু অপেক্ষা সমুচ্চ। একথা বলে রসুল স. তাঁর শাফায়াতের দায়িত্ব পালন করবেন। অধিষ্ঠিত হবেন ওই মর্যাদায়, যার সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'আ'সা আঁই ইয়াব্‌আঁছাকা রব্বুকা মাক্বামাম মাহ্‌মূদা' (আশা করা যায় তোমার প্রভুপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।

হাসান বসরী সূত্রে তিরমিজি এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইবনে খুজাইমা ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি আদম সন্তানদের অগ্রণী। এটা আমার কোনো অহমিকা প্রকাশক উক্তি নয়। মহা বিচারের দিবসে আমার হাতেই থাকবে প্রশংসার পতাকা। আমার এই বক্তব্যটিও অহংকার মুক্ত। ওই দিন সকল আদম সন্তান সমবেত হবে আমার পতাকাতলে। সমাধিক্ষেত্র থেকে সর্বপ্রথম পুনরুত্থিতও হবো আমি। আমার এ কথার মধ্যেও অহংকারের লেশ মাত্র নেই। ওই দিন তিনটি বিষয় হবে সকলের আশংকার কারণ। বিপদগ্রস্ত জনতা শাফায়াতের আশায় তখন উপস্থিত হবে আদমের নিকটে। বলবে, আপনি আমাদের সকলের পিতা। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আদম বলবেন, আমার একটি বিভ্রমের কারণে আমাকে নামিয়ে দেয়া হয়েছিলো পৃথিবীতে। তোমরা বরং নুহের কাছে যাও। নবী নুহের কাছে যখন সকলে একত্র হবে, তখন তিনি বলবেন, আমার প্রার্থনার কারণে আল্লাহ্ মহাপ্লাবনের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিকে ধ্বংস করেছিলেন। তোমরা বরং ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্‌র কাছে যাও। লোকেরা তাই করবে। নবী ইব্রাহিম বলবেন, আমি এমন তিনটি কথা বলেছি, যা প্রকাশ্যতঃ অসত্য। সুতরাং তোমাদের অভিলাষ পূরণার্থে মুসা কলীমুল্লাহ্‌র নিকটে যাওয়াই উত্তম। কিংকর্তব্যবিমূঢ় জনতা তখন তাই করবে। তাদের নিবেদন শুনে মুসা কলীমুল্লাহ্ বলবেন, হত্যার উদ্দেশ্য না থাকা সত্ত্বেও আমার প্রহারে এক লোকের মৃত্যু ঘটেছিলো। অতএব তোমরা ঈসা রুহুল্লাহ্‌র কাছে যাও। মুসা কলিমুল্লাহ্‌র পরামর্শক্রমে তারা তখন উপস্থিত হবে ঈসা রুহুল্লাহ্ সকাশে। তাদের আবেদন শুনে তিনি বলবেন, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে আমার উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো।

সুতরাং তোমরা এবার যাও শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফার দরবারে। তখন বিশাল জনতা ছুটে আসবে আমার কাছে। আমি তখন জান্নাতের দরজায় করাঘাত করবো। প্রহরী ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে, কে? আমি বলবো, মোহাম্মদ। আমারই জন্য তখন খুলে দেয়া হবে জান্নাতের তোরণ। ফেরেশতাদের কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হবে, মারহাবা, মারহাবা। আমি সেজদাবনত হবো। আমার হৃদয়ে প্রক্ষেপিত হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কতিপয় প্রশংসা ও পবিত্রতাপ্রকাশক বচন। হুকুম হবে, মাথা তোলো। চাও এবং দাবি জানাও। শাফায়াত করো। তোমার শাফায়াত মঞ্জুর করা হবে। প্রকাশ করো তোমার মনোবাসনা। শ্রবণ করা হবে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমার ওই একান্ত আলাপনের স্থানটিই হচ্ছে মাকামে মাহমুদ। কুরতুবী বলেছেন, তিনটি আশংকা উদ্রেককারী বিষয়ের একটি হচ্ছে এই। আর দু'টি হচ্ছে— ১. দোজখকে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে হাজির করানো হবে হাশর প্রান্তরে। ২. দোজখের ওই লেলিহান রূপ দেখে মানুষের ভয়ের কোনো সীমা পরিসীমা থাকবে না।

ইবনে খুজাইমা ও তিবরানীর একটি শুদ্ধসূত্রসম্বলিত বর্ণনায় এসেছে, হজরত সালমান বলেছেন, কিয়ামতের দিন সূর্যকে দেয়া হবে তার দশ বছরের সমান তাপ এবং তাকে আনা হবে মানুষের মাথার উপরে। লোকেরা তখন উপস্থিত হবে রসুল স. এর নিকটে। নিবেদন জানাবে শাফায়াতের। রসুল স. বলবেন, হ্যাঁ। আমি তোমাদের সঙ্গী হবো। একথা বলে তিনি জান্নাতের দরজার কড়া নাড়বেন। ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করা হবে, কে? তিনি বলবেন, মোহাম্মদ। দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। তিনি প্রবেশ করবেন। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পতিত হবেন সেজদায়। নির্দেশ হবে, মাথা তোলো। অভিলাষ প্রকাশ করো, পূরণ করা হবে। শাফায়াত করো, কবুল করা হবে। এই শাফায়াতের মাকামই হচ্ছে 'মাকামে মাহমুদ'।

কুরতুবি বলেছেন, বর্ণনাটি অসম্পূর্ণ। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম তাঁর 'আস্‌সুন্নাহ্‌' গ্রন্থে এবং তাঁর বর্ণনায় বিষয়টি বিশদভাবে এনেছেন। তাঁদের বর্ণনার শেষদিকে বলা হয়েছে, যাদের অন্তরে গম, যব অথবা সরিষার দানার সমপরিমাণ ইমান থাকবে, তাদের জন্য শাফায়াত করা হবে। শাফায়াতের ওই মাকামই হবে মাকামে মাহমুদ।

হজরত কা'ব ইবনে মালিক থেকে তিবরানী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। আমি ও আমার উম্মত থাকবো একটি উচ্চভূমিতে। আমার প্রভুপালনকর্তা আমাকে পরিধান করাবেন একটি সবুজ পোশাক। তারপর আমাকে শাফায়াতের অনুমতি দেয়া হবে। আমি তখন ওই সকল শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করতে থাকবো, যা তাঁর জন্য শোভন। ওই স্থানের নামই প্রশংসিত স্থান।

জ্ঞাতব্যঃ শাফায়াতে কোবরা বা মহান সুপারিশ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণসমৃদ্ধ অনেক হাদিসই রয়েছে। যেমন বায্যার, আবু আ'ওয়ানা, আবু ইয়ালী ও ইবনে হাব্বান হজরত আবু বকর সিদ্দিক থেকে, বোখারী-মুসলিম প্রমুখ হজরত আবু হোরায়রা থেকে, আহমদ ও আবু ইয়ালি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে, মুসলিম ও হাকেম হজরত হুজায়ফা ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং তিবরানী ইবনে মোবারক ও ইবনে জারীর হজরত উকবা বিন আমের থেকে। সুরা ইব্রাহিমের 'ওয়া ক্বলাশ শাইত্বনু লামা ক্বুদ্বিইয়াল আমরু' আয়াতের তাফসীরে আমি বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছি। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে। কুরতুবী লিখেছেন, এটাই শাফায়াতে আম্মাহ্ (সাধারণ শাফায়াত), যার অধিকার দেয়া হয়েছে কেবল রসুল স.কে। এই হাদিসে আরো বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে দেয়া হয় একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার। অন্য নবীগণ সেই দোয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেছেন। কিন্তু আমি তা আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছি। কুরতুবী শেষে বলেছেন, শাফায়াতের ফলে হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা থেকে পরিত্রাণ পাবে সকলে এবং সকলের হিসাব নিকাশের পর্বও সম্পন্ন হবে দ্রুত।

আমি বলি, এখানে যে দোয়া সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে তা হবে তৃতীয় শাফায়াতের দোয়া, যার মাধ্যমে পরিত্রাণ পাবে দোজখবাসী পাপী-বিশ্বাসীরা। রসুল স. হবেন তিনটি শাফায়াতের অধিকারী। ইবনে জারীরের তাফসীরে, তিবরানীর আল মুতাওয়ালাত, আবু ইয়ালীর মসনদে, বায়হাকীর বা'ছ গ্রন্থে, আবু মুসা মদিনীর আল মুতাওয়ালাত, আলী বিন মা'বাদের আত্ত্বয়াত ওয়াল ইসইয়ান গ্রন্থে এবং আবু শায়েখের কিতাবুল উজমায় হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে রয়েছে শিঙ্গার জন্ম-বৃত্তান্ত, ফুৎকার, কিয়ামতের ভয়াবহতা, জান্নাত, জাহান্নাম, শাফায়াতের মাধ্যমে অনেক দোজখবাসীর নিষ্কৃতি ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ। সেখানে আরো বলা হয়েছে, দোজখ থেকে নিষ্কৃতি-প্রাপ্তদের স্কন্ধদেশে লেখা থাকবে 'রহমান কর্তৃক বিশেষ রহমতে মুক্তিপ্রাপ্ত।' আমি নিম্নে হাদিসটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করলাম।

হাশরের প্রান্তরে বিচারের জন্য সকলকে আটকে রাখা হবে। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া হবে না। মানুষ আহাজারি করতে থাকবে। একটা কিছু ফয়সালার জন্য হয়ে উঠবে অস্থির। তারা সুপারিশের নিবেদন জানাবে প্রথমে হজরত আদমের নিকটে। তিনি বলবেন, এ অধিকার আমার নেই। বিফল মনোরথ হয়ে মানুষ তখন ধর্ণা দিবে বিভিন্ন নবীর কাছে। কিন্তু সকলেই এ ব্যাপারে তাঁদের অপারগতা প্রকাশ করবেন। শেষে সকলে আসবে আমার কাছে। আমি তাদের

নিবেদন শ্রবণ করবো। আরশের সামনে গিয়ে সেজদায় পতিত হবো। আল্লাহ্তায়ালা সর্বজ্ঞ। তবু বলবেন, অভিলাষ প্রকাশ করো। আমি বলবো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা। তুমি আমাকে শাফায়াতের অধিকার দান করবে বলে ওয়াদা করেছো। তোমার ওই বিশেষ অনুগ্রহের সূত্রে আজ আমার নিবেদন— বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য আমার সুপারিশ কবুল করো। অতিদ্রুত সকলের বিচার মীমাংসা করে দাও। আল্লাহ্ বলবেন, তোমার সুপারিশ কবুল করলাম। এরপর শুরু হবে বিচার। হাদিস শরীফে এরপর দেয়া হয়েছে সকল পশু-পাখির বিচারের দীর্ঘ বিবরণ। তারপর উল্লেখ করা হয়েছে মানুষের বিভিন্ন প্রকার অনাচার অত্যাচারের বিচার-মীমাংসার কথা। এরপর সকলকে নির্দেশ দেয়া হবে প্রত্যেকে তাদের আপনাপন উপাস্যের সঙ্গে মিলিত হও। অংশীবাদীরা তখন মিলিত হবে তাদের বাতিল দেব-দেবীদের সঙ্গে। আর ইমানদারেরা হয়ে যাবে পৃথক। মুনাফিকেরাও থাকবে তাদের সঙ্গে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর আনুরূপ্যবিহীন কদম কিঞ্চিত উন্মোচন করবেন। বর্ণনাতীত সৌন্দর্য অবলোকন করে ইমানদারেরা লুটিয়ে পড়বে সেজদায়। কিন্তু মুনাফিকেরা সেজদা করতে পারবে না। শক্ত হয়ে যাবে তাদের সমস্ত শরীর। স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকবে তারা। এরপর দোজখের উপর প্রতিষ্ঠা করা হবে পুলসিরাত। সকলকে হুকুম দেয়া হবে, পুলসিরাত পার হও। কেউ কেউ ওই সেতু পার হবে বিনা বাধায়। কেউ কেউ কিছুটা বাধা প্রাপ্ত হবে। কিন্তু কষ্টে সৃষ্টে পৌঁছে যাবে ওপারে। কেউ কেউ তাদের শরীরে পাবে লোহার শিকলের আঘাত। ফলে তারা আহত হয়ে পড়ে যাবে দোজখের আগুনে। যারা পুলসিরাত অতিক্রম করবে তারা আবার হবে সুপারিশকারীর মুখাপেক্ষী। সুপারিশের প্রস্তাব নিয়ে তারা তখন গমন করবে নবী আদমের কাছে। তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের কথা স্মরণ করে বলবেন, আমি তোমাদের সুপারিশ করার উপযুক্ত নই। তোমরা নুহের কাছে যাও। লোকেরা যাবে নুহ নবীর কাছে। তিনিও জ্ঞাপন করবেন তাঁর অপারগতা। এরপর বিপদায়িত জনতা একে একে যাবে ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসা— এই নবীত্রয়ের নিকটে। তাঁরাও প্রকাশ করবেন তাঁদের অক্ষমতার কথা। শেষে সকলে আসবে আমার কাছে। আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পেয়েছি তিন ধরনের শাফায়াতের অধিকার। আল্লাহ্তায়ালা এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি তখন বেহেশতের কপাটের শিকল ধরে নাড়া দিবো। খুলে যাবে বেহেশতের দরজা। আল্লাহ্তায়ালার আনুরূপ্যহীন সন্দর্শন অক্ষিগোচর হতেই আমি পতিত হবো সেজদায়। আল্লাহ্ আমাকে দান করবেন তাঁর মর্যাদা ও মহত্বের প্রশংসা প্রকাশের এক বিশেষ অনুমতি, যা ইতোপূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি ও পরবর্তীতেও আর কাউকে দেয়া হবে না। তারপর বলবেন, প্রিয়তম রসুল আমার! মস্তক উত্তোলন করো। সুপারিশ করো। তোমার সুপারিশ কবুল করা

হবে। যাচ্ঞা করো। অভিলাষ পূরণ করা হবে। আমি বলবো, হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালক! তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো। অপেক্ষমান জনতাকে দাও জান্নাতের প্রবেশাধিকার। মঞ্জুর করা হবে তাঁর সুপারিশ।

এরপর আলোচিত হয়েছে দোজখবাসীদের প্রসঙ্গ। বলা হয়েছে, বিপুল সংখ্যক লোক পতিত হবে দোজখে। বিভিন্ন রকমের শাস্তিতে নিপতিত হবে তারা। কারো শাস্তি হবে অল্প। কারো অধিক। আগুন কেবল জ্বালাতে থাকবে কারো কারো পায়ের গ্রন্থি। আগুনে দগ্ধ হতে থাকবে কারো কারো হাঁটু ও তার নিম্নাংশ, কারো কারো কোমর ও তার নিম্নভাগ। কারো কারো মুখ ছাড়া সমস্ত শরীরই থাকবে অনলাবৃত। আমি নিবেদন জানাবো, হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালক! আমার উম্মতের কোনো কোনো লোক এখনও অগ্নি-আক্রান্ত। আল্লাহ্ বলবেন, যাদেরকে চিনতে পারো, তাদেরকে বের করে নিয়ে এসো। আমি আমার পাপী উম্মতকে একে একে দোজখ থেকে বের করে নিয়ে আসবো। শেষে আমার কোনো উম্মতই আর দোজখে থাকবে না। এরপর আল্লাহ্ দিবেন শাফায়াতের সাধারণ অনুমতি। তখন নবী শহীদ ও অন্যান্য পুণ্যবানেরাও শাফায়াত করতে থাকবে। সবশেষে আল্লাহ্ আমাকে বলবেন, এক দীনার পরিমাণ ইমানও যাদের বক্ষদেশে রয়েছে, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। এরপর একে একে হুকুম দিবেন, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো, যাদের অন্তরে রয়েছে দুই তৃতীয়াংশ, অর্ধেক, একচতুর্থাংশ, এক ক্বিরাত অথবা একটি শস্যদানাতুল্য ইমান। এভাবে অবশেষে এমন কোনো লোক আর দোজখে থাকবে না, যে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সামান্যতম ভালো কাজ করেছে। সকলের শেষে আল্লাহ্ বলবেন, শাফায়াতকারী তাদের শাফায়াতের কাজ শেষ করেছে। এখন রইলাম আমি। আমি তো আরহামুর রহিমীন। একথা বলে আল্লাহ্ তাঁর আনুরূপ্যবিহীন হাত দোজখে প্রবেশ করিয়ে বহুসংখ্যক দোজখীকে বের করে আনবেন। যাদের শরীর পুড়ে হয়ে গিয়েছিলো জলন্ত অঙ্গারের মতো।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, উপরে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন বর্ণনাখণ্ডকে একত্র করে। বর্ণনাসূত্রগুলোর মূল মাধ্যম মদীনা শরীফের প্রধান বিচারপতি ইসমাইল বিন রাফে। তাঁর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কারো কারো অনুযোগ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনাগুলোকে এককরূপে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে অনেক হাদিসকে বানিয়েছেন একটি হাদিস। হাফেজ আবু মুসা মাদানীও হাদিসটির বর্ণনাকারী। তাঁর বর্ণনাসূত্রভূত কোনো কোনো বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কেও রয়েছে অনেক অভিযোগ। কিন্তু যে সকল সূত্রে বর্ণনাগুলো সংকলিত হয়েছে, সে সকল সূত্র আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ইবনে আরাবী ও কুরতুবীও হাদিসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে হাজারও এর সঠিকতার সমর্থক। কিন্তু বায়হাকী এর সূত্রপ্রবাহকে বলেছেন অশক্ত। সুয়ূতি লিখেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালাম তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, কালাবী বলেছেন, জান্নাতীরা ও জাহান্নামীরা চলে যাবে তাদের আপন আপন আবাসে। তখন দেখা যাবে ইমানদারদের একটি দল দোজখের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে। তাদেরকে লক্ষ্য করে কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকেরা বলবে, আমরা তো ভোগ করছি কুফরী, শিরিক ও মুনাফিকির যথাশাস্তি। কিন্তু তোমাদের ইমান তো তোমাদের কোনো কাজেই এলো না। একথা শুনে তারা পরিত্রাণের জন্য চিৎকার জুড়ে দিবে। তাদের চিৎকারের আওয়াজ জান্নাতবাসীদের কানেও পৌঁছবে। তারা তখন অগ্নিদগ্ধ ইমানদারদের মুক্তির জন্য বাবা আদমের কাছে ধর্ণা দিবে। এরপর একে একে যাবে অন্য নবীদের কাছে। সকলেই তাঁদের অক্ষমতার কথা জানালে শেষে সকলে উপস্থিত হবে রসুল স. এর মহান সন্নিধানে। তিনি স. মহান প্রভুপালকের উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হবেন। নিবেদন জানাবেন, হে আমার প্রিয়তম আল্লাহ্! তোমার একদল পাপী বান্দা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধমান। তারা পাপী হলেও তোমার এককত্ব সম্পর্কে তারা ছিলো নিঃসন্দিগ্ধ। তারা এখন অবিশ্বাসী, অংশীবাদী ও কপটচারীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার। আল্লাহ্ বলবেন, আমার অতুলনীয় মর্যাদার শপথ! আমি তাদেরকে অবশ্যই দোজখ থেকে নিষ্কৃতি দিবো। ইবনে হাজার আরো লিখেছেন, এই বর্ণনাটি মেনে নিলে দরওয়ারদির ওই বর্ণনাটিকে পরিত্যাগ করতে হয়। কারণ দরওয়ারদির বর্ণনায় এসেছে, শাফায়াত করা হবে হাশর ময়দানের বিপদগ্রস্তদেরকে বিপদমুক্ত করার জন্য। আর ওই ঘটনা ঘটবে বেহেশত ও দোজখে মানুষের গমনের পূর্বে। তাই বলতে হয়, এখানকার এই বর্ণনাটি অদৃঢ়সূত্রসম্বলিত যা বিশুদ্ধ সূত্রবিশিষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী । অর্থাৎ শাফায়াত সংঘটিত হবে হাশরের ময়দানে। সুয়ূতি লিখেছেন, বর্ণনা দু'টো পরস্পরবিরোধী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে পরস্পরবিরোধিতার কিছু নেই। শাফায়াত একবার হবে হাশরের ময়দানে এবং পরবর্তীতে হবে সকলের বেহেশত ও দোজখে গমনের পর— এ কথা মেনে নিলেই এক্ষেত্রে বৈপরীত্য বলে আর কিছু থাকে না।

আমি বলি, মানুষ সুপারিশকারী অন্বেষণ করবে তিনবার। একবার হাশর-প্রান্তরের অসহ্য কষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্তে, দ্বিতীয়বার জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে এবং তৃতীয়বার দোজখ থেকে পাপী বিশ্বাসীদের মুক্তির লক্ষ্যে। এক হাদিসে পরিষ্কাররূপে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি আমার প্রভুপালকের সকাশে সুপারিশ করবো তিনবার। তিনি এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ নেই যে, শাফায়াত অনুষ্ঠিত হবে তিনবার।

আর মাকামে শাফায়াতের নামই হচ্ছে মাকামে মাহমুদ। অর্থাৎ শাফায়াত তিনবার অনুষ্ঠিত হলেও শাফায়াতের স্থান হবে একটিই। ওই স্থানটি মাকামে মাহমুদ বা প্রশংসিত স্থান।

মাসআলাঃ মুতাজিলা ও খারেজীরা শাফায়াতকে স্বীকার করে না। তারা বলে, কবীরা গোনাহকারী কেউ যদি তওবা ব্যতিরেকে মারা যায়, তবে চিরদিনের জন্য সে জাহান্নামী হবে। তার জন্য কোনো শাফায়াত করা হবে না। অথচ শাফায়াত সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলো 'সুবিদিত' পর্যায়ের।

হজরত ইবনে ওমর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার তেলাওয়াত করলেন, হজরত ইব্রাহিমের এই উক্তি— 'হে আমার প্রভুপালক! এ সকল প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। কিন্তু কেউ অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' তারপর পাঠ করলেন হজরত ঈসার উক্তি 'তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করো তবে তো তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' এরপর দু'হাত উত্তোলন করে বললেন, আমার উম্মত। আমার উম্মত। তারপর কেঁদে ফেললেন। আল্লাহ্ তখন জিবরাইলকে বললেন, তুমি আমার রসুলের নিকটে গিয়ে বলো, আমি তার উম্মতের ব্যাপারে তাকে প্রসন্ন করবো।

'আলআওসাত' গ্রন্থে বায্যার এবং উত্তম সূত্রে হজরত আলী থেকে আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য শাফায়াত করবো, আমার প্রভুপালক তখন আমাকে বলবেন, তুমি কি পরিতুষ্ট? আমি বলবো, হ্যাঁ।

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার প্রভুপালক আমাকে দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটিকে বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। একটি হচ্ছে— আমার অর্ধেক উম্মতকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে— আমাকে দেয়া হবে শাফায়াতের সুযোগ। আমি শাফায়াতকেই গ্রহণ করেছি। সুতরাং আমি আমার সকল উম্মতের জন্য শাফায়াত করতে পারবো। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আমার শাফায়াত হবে তাদের জন্য, যারা শিরিকসহ মৃত্যুবরণ করেনি। হজরত আউফ বিন মালিক আশজায়ী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী ও তিবরানী। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। এই হাদিসটি আবার উত্তমসূত্র পরম্পরায় হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ, বায্যার ও তিবরানী। আর বিশুদ্ধ সূত্র

পরম্পরায় হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, তিবরানী ও বায়হাকী। এই বর্ণনার শেষে রয়েছে, রসুল স. আরো বললেন, তোমরা কি মনে করেছো আমার শাফায়াত হবে মুত্তাকীদের জন্য? না। আমার শাফায়াত হবে আমার পাপী উম্মতের জন্য।

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যারা কবীরা গোনাহ করেছে, তাদের জন্যই হবে আমার শাফায়াত। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস ইবনে মালেক থেকে আবু দাউদ, তিরমিজি, হাকেম ও বায়হাকী। আর হজরত আবদ বিন বাশীর থেকে তিবরানী ও আবু নাঈম। তিবরানী তাঁর আওসাত নামক পুস্তকে হজরত ইবনে ওমর থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন তিবরানী তাঁর 'কবীর' নামক পুস্তকে জননী উম্মে সালমা থেকে এবং তিরমিজি ও হাকেম হজরত জাবের থেকে। আবার কা'ব ইবনে উজরাত এবং তাউস্ সূত্রেও অনুরূপ হাদিস এসেছে। বায়হাকী লিখেছেন, হাদিসটির সূত্র পরম্পরা অপরিণত ও উত্তম। তাবেয়ীগণের যুগে হাদিসটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

ইবনে আবী হাতেম তাঁর 'আস্সুন্নাহ্' গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে সর্বোন্নত সূত্রে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি প্রতিনিয়ত আমার প্রভুপালকের কাছে শাফায়াত করতে থাকবো এবং তিনিও আমার শাফায়াত কবুল করতে থাকবেন। শেষে আমি নিবেদন করবো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা। যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' কলেমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার জন্যও আমার শাফায়াত কবুল করে নাও। আল্লাহ্ আমার নিবেদন কবুল করবেন এবং বলবেন, হে আমার প্রিয়তম রসুল! এ অধিকার তোমার কিংবা অন্য কারো নেই। শপথ আমার কল্যাণের, পরাক্রমের এবং দয়ার! যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' বলেছে, তাদের কাউকে আমি দোজখে প্রবেশ করাবো না।

অপর এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি আমার উম্মতের অনুত্তম মানুষের জন্য হবো উত্তম মানুষ। আমার শাফায়াতের মাধ্যমে আমি তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবো। আর আমার উম্মতের মধ্যে যারা উত্তম তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে শাফায়াত ব্যতিরেকেই। হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী সেই পবিত্রতম সত্তার শপথ! পুনরুত্থান দিবসে আমি হবো সকল মানুষের অগ্রনায়ক। আমার এই উক্তি দাম্ভিকতামুক্ত। সেদিন সকল মানুষ সমবেত হবে আমারই পতাকা তলে। আমারই হাতে সেদিন থাকবে প্রশংসার পতাকা। আমি আমার অনুসরণকারীদেরকে নিয়ে জান্নাতের দরজার সামনে উপনীত হবো। বলবো, দরজা উন্মুক্ত করা হোক। প্রহরীরা বলবে, আপনি কে? আমি বলবো, মোহাম্মদ।

চতুর্দিক থেকে তখন ধ্বনিত হবে স্বাগতম, স্বাগতম। এরপর আমি হবো আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন দর্শনধন্য। সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আমি সেজদায় লুটিয়ে পড়বো। হুকুম হবে মস্তক উত্তোলন করো। দাবি উত্থাপন করো। গ্রহণ করা হবে। শাফায়াত করো। মঞ্জুর করা হবে। তখন আমার শাফায়াতে আল্লাহ্‌র রহমতে অনেক মানুষকে বের করে আনা হবে জাহান্নাম থেকে।

তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি জাহান্নামের দরজায় গিয়ে করাঘাত করবো। আমার সম্মানে খুলে দেয়া হবে জাহান্নামের দরজা। আমি ভিতরে প্রবেশ করবো। বর্ণনা করবো আল্লাহ্‌র এমন স্তব-স্তুতি, যা ইতোপূর্বে আর কেউ কখনো করেননি। পরেও করবেন না। এরপর ওই সকল লোককে বের করে আনবো যারা বিশুদ্ধ অন্তরে অন্ততঃ একবার বলেছিলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' তখন কতিপয় কুরায়েশ আমার আত্মীয় বলে পরিচয় প্রদান করবে। কিন্তু আমি তাদেরকে সেখানেই রেখে আসবো।

সর্বোন্নত সূত্রে হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর শাফায়াতের মাধ্যমে যাদেরকে দোজখ থেকে বের করে এনে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে, জান্নাতবাসীরা তাদেরকে বলবে জাহান্নামী। হজরত জাবের থেকে সর্বোন্নত সূত্রে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, শাফায়াতের মাধ্যমে কিছুসংখ্যক লোককে দোজখ থেকে বের করে এনে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে সর্বোন্নতরূপে উত্তম সূত্র পরম্পরায় তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমাদের কেবলার অনুসারী লোকদের মধ্যে এতো অধিক সংখ্যক লোক দোজখে প্রবেশ করবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কারো পক্ষে তার সংখ্যা নিরুপণ সম্ভব নয়। আমাকে তখন প্রদান করা হবে শাফায়াতের অনুমতি। আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় ও সেজদারত অবস্থায় বর্ণনা করবো আল্লাহ্‌র অগণিত প্রশংসা ও পবিত্রতা। সেজদারত অবস্থায় আমাকে হুকুম করা হবে, মাথা তোলো। চাও, যা কিছু চাইতে ইচ্ছা করো। চাহিদা পূর্ণ করা হবে। শাফায়াত করো, তোমার শাফায়াত কবুল করা হবে।

ত্রুটিবিমুক্ত সূত্র পরম্পরায় হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে আহমদ ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, হে প্রিয় রসুল! আমার প্রেরিত নবী রসুলগণ আমার নিকটে কোনো না কোনো বিষয়ে বিশেষভাবে প্রার্থনা করেছে। আমি তাদের প্রার্থনা পূরণও করেছি। এবার তুমি প্রার্থনা করো। তোমার প্রার্থনাও আমি পূর্ণ করবো। আমি বললাম, মহাবিচারের দিবসে আমি আমার উম্মতের পরিত্রাণের জন্য শাফায়াত করবো। একথা শুনে

হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! শাফায়াত কী? তিনি স. বললেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে বলবো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমাকে এখন দান করো ওই শাফায়াতের অধিকার, যা আমি রেখেছি তোমার হেফাজতে।

আল্লাহ্ বলবেন, হ্যাঁ। তারপর আমি শাফায়াত করবো। আর ওই শাফায়াতের পরে আল্লাহ্ আমার সকল উম্মতকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, মুসলিম, হজরত আনাস এবং হজরত জাবের থেকে মুসলিম, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ এবং হজরত আব্দুর রহমান বিন আকীল থেকে বায়হাকী ও বায্যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য রয়েছে বিশেষভাবে গ্রহণীয় একটি দোয়া। ওই দোয়ার ব্যাপারে সকল নবী ব্যস্ততা প্রদর্শন করেছেন (এবং তা কবুলও করে নেয়া হয়েছে)। কিন্তু আমি ওই বিশেষভাবে গৃহীতব্য দোয়া রেখে দিয়েছি আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য। সুয়ূতি লিখেছেন, অর্থগত দিক থেকে হাদিসটি সুবিদিত।

হজরত ওমর ফারুক থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এই উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক হবে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তিপ্রাপ্ত। দাজ্জালের আবির্ভাব এবং পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়ের ব্যাপারে অবিশ্বাসী। কবরের আযাব ও শাফায়াতের প্রতিও তাদের আস্থা থাকবে না। দোজখীদেরকে দোজখ থেকে বের করার ব্যাপারেও হবে তারা সন্দিহান। আমার শাফায়াতে তারাও দোজখ থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

সাঈদ ইবনে মানসুর, বায়হাকী ও হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, যে ব্যক্তি শাফায়াতে বিশ্বাস করবে না তার শাফায়াত নসীব হবে না। আর যে ব্যক্তি রসুল স. এর হাউজে কাওছারকে স্বীকার করবে না, সে ব্যক্তিও হবে হাউজে কাওছারের পানি থেকে বঞ্চিত।

হজরত আনাস থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের দুই শ্রেণীর লোকের ভাগ্যে শাফায়াত ঘটবে না। তারা মারজিয়্যাহ ও কাদরিয়্যাহ্। মারজিয়্যারা বলে, আমল মূল্যহীন। যদি অন্তরে ইমান থাকে তবে মন্দ আমলের জন্য পরকালে কোনো শাস্তি হবে না। তাই যে মুমিন, সে যত পাপীই হোক না কেনো কখনোই দোজখে যাবে না। আর কাদরিয়্যাহ্ সম্প্রদায় বলে মানুষ নিজে তার আমলের স্রষ্টা। তকদীর বলে কিছু নেই।

শাবীব বিন আবী ফুজালাহ্ মাক্কী সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, একবার লোকেরা হজরত ইমরান বিন হোসাইনের সামনে শাফায়াতের আলোচনা করলো। এক লোক বললো, হে আবু নাজীদ! আপনি এমন কথা বলেন এবং করেন, যেগুলোর দলিল আমরা কোরআনে পাই না। তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, তুমি

কি কোরআন পড়েছো? লোকটি বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মাগরিবের নামাজ তিন রাকাত, ইশা চার রাকাত, ফজরের দুই রাকাত, জোহরের চার রাকাত, আসরের চার রাকাত— এ সব কথা কি কোরআনের কোথাও পেয়েছো? লোকটি বললো, না। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা এগুলো কার কাছ থেকে শিখলে? নিশ্চয় আমার কাছ থেকে। আর আমি শিখেছি রসুল স. এর কাছ থেকে। এবার বলো, চল্লিশ দিরহামের মধ্যে এক দিরহাম জাকাত দিতে হবে, উট ও বকরির জাকাত এভাবে এভাবে দিতে হবে— এসব কথা কি কোরআনে রয়েছে? লোকটি বললো, না। তিনি বললেন, তোমরা কোরআনে দেখেছো— 'ওয়াল ইয়াত্ত্বাও-ওয়াফু বিল বাইতিল্ আ'তিক্ব।' কিন্তু এসব কথা কি কোরআনের কোথাও দেখেছো যে— সাত বার তাওয়াফ করো, মাকামে ইব্রাহিমের কাছে দুই রাকাত নামাজ পড়ো? বলো, এগুলো কি তোমাদেরকে আমি শিক্ষা দেইনি? আর আমি কি এগুলো রসুল স. থেকে শিক্ষা করিনি? উপস্থিত লোকেরা তখন সকলেই বললো, আপনি যথার্থ বলেছেন। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা কি কোরআনের মধ্যে এ কথা পেয়েছো যে—গ্রাম থেকে আনা খাদ্যশস্য শহরে প্রবেশের পূর্বে পথিমধ্যে ক্রয় কোরো না, বলপ্রয়োগ, অননুমোদিত এবং তাওর নিষিদ্ধ? (কেউ যদি তার মেয়ের মোহরানা ধার্য না করে এই শর্তে বিবাহ দেয় যে, এর বদলে সে বিনা মোহরানায় বিবাহ করবে মেয়ের স্বামীর কোনো নিকটাত্মীয়াকে — এ ধরনের বিনা মোহরানায় কন্যা রদ বদল করার বিবাহকে বলে তাওর। এরকম বিবাহ শরিয়তসিদ্ধ নয়)। লোকেরা বললো, না। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাঁর পাককালামে আজ্ঞা করেছেন— 'রসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা করতে নিষেধ করেছেন, তা করতে বিরত থাকো।' অতএব হে জনতা! তোমরা একথা উত্তমরূপে অবগত হও যে, আমি রসুল স. এর নিকট থেকে এরকম অনেক জ্ঞান লাভ করেছি। কিন্তু তোমরা এগুলো জানো না।

বাগবী লিখেছেন, ইয়াজিদ বিন সুহাইব ফকীর বলেছেন, খারেজীদের মতবাদ আমাকে বিভ্রান্তিতে নিপতিত করেছিলো। কিন্তু হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্র কথা শুনে আমার ওই বিভ্রান্তির নিরসন হয়েছে। একবার একটি দলের সঙ্গে আমি হজে যাত্রা করলাম। মদীনার কাছাকাছি এক স্থানে সাক্ষাত পেলাম হজরত জাবেরের। তিনি শাফায়াতের মাধ্যমে দোজখীদের পরিত্রাণ সম্পর্কে রসুল স. এর একটি হাদিস বর্ণনা করলেন। আমি বললাম, হে রসুল স. এর প্রিয় সহচর! আপনি এরকম বলছেন কেনো? আল্লাহ্ তো স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছেন যে— 'নিঃসন্দেহে তিনি যাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সে হবে অপদস্থ এবং দোজখীরা যখন দোজখ থেকে বের হতে চাইবে, তখন তাকে দোজখের দিকেই ঠেলে দেয়া

হবে।' হজরত জাবের বললেন, হে যুবক! তুমি কি কোরআন পাঠ করো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি মাকামে মাহমুদের কথা পড়েছো, সেখানে অধিষ্ঠিত হবেন স্বয়ং আল্লাহ্র রসুল। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ কথাই তো আমি বলেছি। রসুলুল্লাহ্ ওই মাকামে অধিষ্ঠিত হয়ে শাফায়াত করবেন। আর তাঁর শাফায়াতের কারণে বহু সংখ্যক লোক দোজখ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। এরপর হজরত জাবের বর্ণনা দিলেন পুলসিরাত সম্পর্কে। বললেন, কেউ কেউ পুলসিরাত অতিক্রম করে যাবে। কেউ কেউ প্রোথিত হবে দোজখে। ওই দোজখবাসীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আবার শাফায়াতের মাধ্যমে নিষ্কৃতি লাভ করবে।

নবী-রসুল ও অন্যান্যদের শাফায়াতঃ হজরত ওসমান থেকে সর্বোন্নতসূত্রে ইবনে মাজা ও বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচার দিবসে নবী-রসুলগণও শাফায়াত করবেন। তারপর শাফায়াত করবেন আলেমগণ ও শহীদগণ। বায্যারের বর্ণনায় এরপর এসেছে— মুয়াজ্জিন। হজরত ইবনে ওমর থেকে পরিণতসূত্রে দায়লামী উল্লেখ করেছেন, আলেমগণকে তখন বলা হবে, তোমাদের শিক্ষার্থীগণের জন্য শাফায়াত করো— যদিও তাদের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের মতো অসংখ্য হয়। সর্বোন্নতসূত্রে হজরত আবু দারদা থেকে আবু দাউদ ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শহীদ তার আপন পরিবারের সত্তরজনের জন্য শাফায়াত করতে পারবে। আহমদ ও তিবরানীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে। আর ইবনে মাজা হজরত মেকদাম বিন মা'দীকারাব থেকে, বায়হাকী হাসান বসরীর বর্ণনা থেকে, হাকেম, বায়হাকী ও হান্নাদ হজরত হারেস বিন কায়েস থেকে, আহমদ হজরত আবু বুরদা থেকে, হান্নাদ হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং যথাসূত্রে আহমদ, তিবরানী ও বায়হাকী হজরত আবু উমামা থেকে। তাঁদের বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের একজন মানুষের শাফায়াতে রবীয়া এবং মুজার গোত্রের চেয়েও অধিক সংখ্যক লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে। মোট কথা, বহু সংখ্যক হাদিস থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নবী-রসুলগণ ও আওলিয়া-আলেমগণও শাফায়াত করতে পারবেন।

একটি সন্দেহঃ যদি রসুল স. এর শাফায়াতের মাধ্যমে সকল পাপী উম্মত দোজখ থেকে পরিত্রাণ পায়, তবে নবী-রসুল ও অন্যান্যদের শাফায়াতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হবে কেনো? তাদের শাফায়াতের প্রকৃতি তাহলে কী রকম?

সন্দেহের নিরসনঃ সম্ভবতঃ নবী-রসুলগণের শাফায়াত নির্দিষ্ট থাকবে তাঁদের আপনাপন উম্মতের মধ্যে। কিন্তু রসুল স. এর শাফায়াত হবে সাধারণ ও ব্যাপক। অন্যান্য উম্মতেরাও তাঁর শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর নবী-রসুল ছাড়া অন্যান্য পুণ্যবানেরা সম্ভবতঃ রসুল স.কে তখন এই মর্মে নিবেদন জ্ঞাপন করবেন যে, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি দয়া করে অমুক অমুক লোকের জন্য শাফায়াত করুন।

বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার শাফায়াত হবে আমার উম্মতের কবীরা গোনাহকারীদের জন্য। এতে করে বুঝা যায়, ফেরেশতারা কবীরা গোনাহকারীদের জন্য শাফায়াত করবেন না। তবে হ্যাঁ, তারা সুপারিশ করবেন সগীরা গোনাহ মাফের জন্য এবং মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে, রসুল স. এর জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ নফল হওয়ার কথা। তারপর দেয়া হয়েছে মাকামে মাহমুদ বা প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত হওয়ার শুভ সংবাদ। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাহাজ্জুদ নামাজের রয়েছে একটি বিশেষ ভূমিকা।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, বিধর্মীদের অত্যাচারে রসুল স. এর মক্কার জীবন হয়ে উঠলো দুর্বিষহ। তখন তাঁকে দেয়া হলো হিজরতের নির্দেশ। অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৮০, ৮১

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۔ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ ۖ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۔

❒ বল, 'হে আমার প্রতিপালক, যেথায় গমন শুভ ও সন্তোষজনক তুমি আমাকে সেথায় লইয়া যাইও এবং যেথা হইতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেথা হইতে আমাকে বাহির করিও এবং তোমার নিকট হইতে আমাকে দান করিও সাহায্যকারী শক্তি।'

❒ এবং বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে'; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, হে আমার প্রতিপালক, যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক, তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যেয়ো এবং যেখান থেকে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেখান থেকে আমাকে বের কোরো।' এখানে 'মুদ্খলা সিদ্ক্ব' অর্থ মদীনা এবং 'মুখরজা সিদ্ক্ব' অর্থ মক্কা। এরকম বলেছেন, হাসান ও কাতাদা। 'মুদ্খলা' এবং 'মুখরজা' হচ্ছে অধিকরণ কারক। প্রথমটি প্রবেশের স্থান ও পরেরটি প্রস্থানের । দু'টো শব্দই ধাতুমূল। সুতরাং আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— হে আমার রসুল! আপনি প্রার্থনা করুন এভাবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমাকে মদীনাতে এমনই পরিবেশে প্রবেশ করাও যেনো আমার

সম্মুখে অনভিপ্রেত ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় এবং মক্কা থেকে এভাবে বের হয়ে যেতে দাও যেনো পিছনের কোনো ক্ষতিকর আকর্ষণ আর আমার অন্তরে অবশিষ্ট না থাকে। জুহাক আলোচ্য প্রার্থনার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার আল্লাহ্! মক্কা থেকে আমার প্রস্থানকে করো নিরাপদ, যেনো অংশীবাদীরা আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে না পারে এবং আমার মদীনা-গমনকে করো সফল, যেনো সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় আমার ধর্মসম্মত নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'সেখানে নিয়ে যাও' কথাটির অর্থ নবুয়তের গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠভাবে প্রতিপালনের নিমিত্তে আমাকে সেখানে নিয়ে যাও। আর 'বের কোরো' অর্থ— যে স্থান আমার নবুয়তের কর্মকাণ্ড পরিচালনার কেন্দ্রভূমি হওয়ার উপযুক্ত নয়, সেখানে থেকে শুভ ও সন্তোষজনক অবস্থায় আমাকে বের করে নিয়ে যাও। অর্থাৎ যেখানে আমার ধর্মপ্রচারের কাজ শুভ ও সন্তোষজনক হয়, সেখানেই তুমি নিয়ে যাও আমাকে।

হাসান বলেছেন, এখানে 'মুদখলা সিদ্‌ক্ব' অর্থ জান্নাত এবং 'মুখরজা সিদ্‌ক্ব' অর্থ মক্কা। আমি বলি, 'মুদখলা সিদক্ব', অর্থ যদি 'জান্নাত' হয়, তবে 'মুখরজা সিদ্‌ক্ব' কে পৃথিবী বলাই হবে অধিক যুক্তিসঙ্গত। বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে— আমাকে কবরের মধ্যে প্রবেশ করাও শুভ ও সন্তোষজনক অবস্থায় এবং সেভাবেই পুনরুত্থিত কোরো মহাবিচার দিবসে। কেউ কেউ আবার কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— আমাকে প্রবেশ করাও তোমার আনুগত্যের মধ্যে এবং বের করে নিয়ে যাও অনানুগত্যের গণ্ডি থেকে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, প্রবেশ ও প্রস্থান উভয়ক্ষেত্রে 'সিদ্‌ক্ব' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে একথা বোঝাতে যে— আমার প্রবেশ ও প্রস্থান উভয় অবস্থাই যেনো হয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা জড়তা মুক্ত। উল্লেখ্য যে, দ্বিধাবিজড়িত কোনো কর্মই 'সিদ্‌ক্ব' (শুভ ও সন্তোষজনক) হয় না। অথবা এখানে বলা হয়েছে, গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ ও সেখান থেকে নির্গমনের কথা। প্রকৃত কথা হচ্ছে 'সিদ্‌ক্ব' ও 'কিজব' (সত্য ও মিথ্যা) হচ্ছে বক্তব্যের বিধেয় এর একটি বিশেষণ। বিধেয়-এর বিশেষণকে সত্য অথবা মিথ্যা যে কোনো একটি হতেই হয়। কিন্তু আদেশ, নিষেধ, প্রশ্নবোধক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সত্য ও মিথ্যার প্রসঙ্গ আসে পরোক্ষ অর্থে। এমতো ক্ষেত্রে কোনো বিজ্ঞপ্তিকে সত্য অথবা মিথ্যা বলার অবকাশ রয়েছে। যেমন— কেউ বললো, জায়েদ কি বাড়ীতে আছে? কথাটি যদিও প্রশ্নবোধক, তবু এর মধ্যে রয়েছে অনুসন্ধানের একটি ব্যাপার । অর্থাৎ প্রশ্নকারী যেনো একথা বলছে, জায়েদ গৃহাভ্যন্তরে আদৌ রয়েছে কি না, সে সম্পর্কে আমি জানি না, তাই জিজ্ঞেস করছি। তাই তার এই জিজ্ঞাসাই প্রকাশ করছে তার অজ্ঞতার কথা। এরকম উক্তির ক্ষেত্রে সত্য ও মিথ্যা উভয়টির অবকাশ রয়েছে। কিন্তু কখনো কখনো

আবার কর্ম ও ক্রিয়ার দিক থেকেও এরকম সত্য ও মিথ্যা উভয়টির ব্যবহার সুপ্রচল। তাই লড়াইয়ের ময়দানে সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে যদি কেউ যুদ্ধ করে, তবে তাকে আরববাসীরা বলে— হুয়া সদাক্বা ফীল্ ক্বিতাল (সে একজন যথার্থ যোদ্ধাই বটে)। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'রিজালুন্ সদাক্বূ মা আ'হাদুল্লাহ্' (কিছু লোক এমন, যারা আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পরিপূর্ণরূপে কার্যকর করেছে)। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'সাদাক্বল্লহু রসুলাহুর্ রু'ইয়া (আল্লাহ্ তাঁর রসুলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন)।

এতক্ষণের আলোচনায় একথাই প্রমাণিত হলো যে, উত্তম, শ্রেষ্ঠ ও উন্নত যে কোনো কর্মকে বলে 'সিদ্‌ক্ব'। তাই কোনো কর্মকে শুভ ও সন্তোষজনক বুঝাতে ব্যবহৃত হয় এই শব্দটি। যেমন— ফী মাক্বআ'দি সিদ্‌ক্ব। লাহুম ক্বদামা সিদ্‌ক। ওয়াজ্‌আ'ল্‌লী লিসানা সিদ্‌ক্ব ইত্যাদি। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াতে পারে এরকম— আমার গমন ও নির্গমনকে এমনভাবে বাস্তবায়িত করো যেনো মানুষ তা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় এবং তাদের ওই প্রশংসা যেনো লাভ করে বাস্তবরূপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমার নিকট থেকে আমাকে দান কোরো সাহায্যকারী শক্তি।' 'সুলত্বনান্ নাসীরা' অর্থ সাহায্যকারী শক্তি। মুজাহিদ কথাটির অর্থ করেছেন— স্পষ্ট দলিল। হাসান অর্থ করেছেন— আমাকে শক্তিশালী করো কোনো সাম্রাজ্যের উপরে যেখানে আমার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে বিরুদ্ধবাদীদের উপর। অর্থাৎ এমন বিজয়প্রদায়ক শক্তি, যার মাধ্যমে দ্বীন ইসলাম হয় স্থায়ী ও শক্তিশালী। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা প্রদান করেছিলেন পারস্য, রোম ও অন্যান্য সাম্রাজ্য বিজয়ের অঙ্গীকার। আর ওই বিজয় শুরু হয়েছিলো আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই।

কাতাদা বলেছেন, রসুল স. একথা সুনিশ্চিতরূপে জানতেন যে, আল্লাহ্র সাহায্যকারী শক্তি ব্যতীত ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও কোরআনের বিধান বাস্তবায়িত হতে পারে না। তাই তিনি এমতো সাহায্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

আমি বলি, আল্লাহ্তায়ালাই তাঁর প্রিয় রসুলকে এই জ্ঞান দান করেছিলেন যে, আল্লাহ্র দ্বীন কেবল আল্লাহ্র বিশেষ সাহায্যের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই তিনি তাঁর রসুলকে এভাবে প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কুফরের উপর ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠাই ছিলো রসুল স. এর অভিলাষ। তাই তিনি আল্লাহ্তায়ালা সকাশে সাহায্যকারী শক্তির নিবেদন জানিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে, আল্লাহ্পাক তাঁর এই নিবেদন কবুল করেছিলেন। কোরআন মজীদের অন্যান্য আয়াতেও এই বিজয়ের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'সকল দ্বীনের উপর তাকে

শ্রেষ্ঠত্বদানের জন্য।' আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দল বিজয়ী।' অন্য আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই।'

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'এবং বলো, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হয়েই থাকে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যখন মক্কা বিজিত হবে, তখন আপনি মক্কা নগরীতে প্রবেশের সময় এই বাক্যটি উচ্চারণ করবেন যে— সত্য ইসলাম, কোরআন অথবা বিশুদ্ধ ইবাদতের মৌসুম এসেই পড়েছে এবং অবলুপ্ত হয়েছে অংশীবাদিতা ও ধর্মদ্রোহিতা। কারণ অংশীবাদিতা ও ধর্মদ্রোহিতা হচ্ছে মিথ্যা। আর মিথ্যা তো অবলুপ্ত হয়েই থাকে। কেননা তা ভিত্তিহীন। এখানে 'যাহাকা' শব্দটির অর্থ— 'খারাজা' বা অবলুপ্ত হওয়া অথবা বের হয়ে যাওয়া। যেমন বলা হয়, 'যাহাকা রূহুহু' (তার প্রাণ বহির্গত হয়েছে)।

হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বিজয়ীর বেশে যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কাবা প্রাঙ্গণে ছিলো তিনশত ষাটটি মূর্তি। রসুল স. এর হাতে ছিলো একটি কাষ্ঠ নির্মিত যষ্টি। তিনি ওই যষ্টির অগ্রভাগ দ্বারা মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা কখনোই পারে না নতুন কিছু সৃজন করতে এবং কোনো কিছুর পুনরাবৃত্তি ঘটাতে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ ও তিবরানী। ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন তাঁর আদ্‌দালায়েল নামক পুস্তকে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকীও অনুরূপ হাদিস এনেছেন।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৮২, ৮৩, ৮৪

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۞ وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوْسًا ۞ قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۞

❒ আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যাহা বিশ্বাসীদিগের জন্য উপশান্তি ও দয়া কিন্তু উহা সীমালংঘনকারীদিগের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

❒ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করিলে সে মুখ ফিরাইয়া লয় ও অহংকারে দূরে সরিয়া যায় এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে।

❒ বল, 'প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকে এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি অবতীর্ণ করি কোরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য প্রশান্তি ও রহমত।' একথার অর্থ— আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতা ও মূর্খতাজনিত ব্যাধির উপশমকরূপে এবং হৃদয়ের অন্ধকার দূর করবার আলোকরূপে। এখানে 'মিনাল কুরআন' কথাটির 'মিন' বর্ণনামূলক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'মিন' আংশিক অর্থ প্রকাশক। আবার কেউ বলেছেন বিবৃতিমূলক। অর্থাৎ এখানকার 'উপশম' কথাটির অর্থ হবে শারীরিক ব্যাধির উপশম। যেমন সুরা ফাতিহা ও কোরআনের কোনো কোনো অংশ দৈহিক ব্যাধির উপশমকরূপে ব্যবহৃত হয়। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা দু'টি আরোগ্যলাভের উপকরণকে গ্রহণ করো— মধু ও কোরআন। আর এখানকার রহমত বা দয়া কথাটির অর্থ হচ্ছে— যারা কোরআনকে মানে এবং কোরআনের বিধানানুযায়ী আমল করে, তারা লাভ করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু এই কোরআন সীমালংঘনকারীদের ক্ষতি বৃদ্ধিই করে।' একথার অর্থ— যারা কোরআন মানে না তাদের জন্য কোরআন ডেকে আনে ক্ষতি। কোরআনের প্রতি মিথ্যারোপ ও অস্বীকৃতিই এমতো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ, কোরআনের কোনো মজলিসে বসেও যারা সঠিক দিক নির্দেশনা লাভ করতে পারে না, তাদের জন্য কোরআন অবশ্যই ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা এখানে এমতো সিদ্ধান্ত দান করেছেন যে— কোরআন হচ্ছে বিশ্বাসীদের জন্য নিরাময়ক ও রহমত। আর অবিশ্বাসীদের জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ।

পরের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে— 'মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দূরে সরে যায়।' এ কথার অর্থ— মানুষকে যখন আমি দান করি দৈহিক সুস্থতা ও সম্পদের প্রাচুর্য, তখন তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায়। মুখ ফিরিয়ে নেয় কোরআনের দিক নির্দেশনা থেকে। আর অহংকারবশতঃ দূরে সরে যায় সত্য ধর্মের সীমানা থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে।' এ কথার অর্থ— আর যখন আমি তাদের উপরে আপতিত করি বিপদ, রোগ, শোক ও দারিদ্র— তখন তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে একেবারে হতাশ হয়ে যায়।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'বলো, প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মানুষের নিকট এ কথা প্রচার করুন যে, প্রত্যেকেই তার নিজস্ব স্বভাবের অনুকারক। তাই যে স্বভাবগতভাবে কৃতজ্ঞ, সে আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামতের প্রতি প্রদর্শন করে যথাকৃতজ্ঞতা। আর যে সত্তাগতভাবে কৃতঘ্ন, সে আল্লাহ্র দানের প্রতি প্রদর্শন করে অকৃতজ্ঞতা ও অহংকার।

হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'শাকিলাতিহী' কথাটির অর্থ করেছেন— সত্তাগত অবস্থা, যার প্রতি সে আকৃষ্ট— পথ-প্রাপ্তির বাসনা অথবা পথ-ভ্রষ্টতার আকর্ষণ। কাতাদা ও হাসান কথাটির অর্থ করেছেন— উদ্দেশ্যের অনুসরণ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পৃথিবীপূজক, সে তার কর্মকাণ্ডকে প্রস্তুত করে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্য। আর যে ব্যক্তি পরকালপ্রেমিক, সে তার কৃতকর্মকে সজ্জিত করে পারলৌকিক সাফল্য লাভের নিমিত্তে। মুকাতিল বলেছেন, 'শাকিলাতিহী' কথাটির অর্থ স্বভাব বা প্রকৃতি। ফাররা বলেছেন, স্বভাবজ প্রবৃত্তি অনুসারেই মানুষ তার কর্ম-পরিকল্পনা রচনা করে। কুতাইবী বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে জন্মগত প্রকৃতিকে। উল্লেখ্য যে, 'শাকিলাতিহী' কথাটির বর্ণিত অর্থসমূহের মধ্যে মূলতঃ কোনো বিরোধ নেই। কারণ সকলেই প্রায় সমস্বরে বলেছেন, জন্মগত স্বভাব বা সত্তাগত প্রবৃত্তির কথা, যে প্রকৃতি আল্লাহ্তায়ালাই মানুষকে দিয়েছেন। এ কারণেই রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেককে সামর্থ্য দেয়া হয় তার জন্মগত প্রকৃতি অনুসারে। হজরত আলী ইবনে আবী তালেব থেকে সর্বোন্নতসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমরা একবার রসুল স. এর পবিত্র দরবারে বসে আমাদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। রসুল স. আমাদের কথা শুনে বললেন, পাহাড় তার আপন স্থান থেকে সরে গিয়েছে— একথাও বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু মানুষের স্বভাব পরিবর্তন হয়েছে, এ কথা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আহমদ।

জন্মগত প্রকৃতি বা স্বভাব কীঃ জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ একটি বিশেষ প্রকৃতি বা স্বভাব পেয়ে থাকে। ওই স্বভাব হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার কোনো একটি নাম বা গুণাবলীর প্রতিবিম্ব। যেমন, জন্মসূত্রে যার উপরে আল্লাহ্তায়ালার 'আলহাদী' (হেদায়েতকারী) নামের প্রভাব বা প্রতিবিম্ব পড়ে, সে হয় হেদায়েতের অনুগামী। আর যার উপরে জন্মলগ্নে পড়ে আল্লাহ্পাকের 'আলমুদ্বিল্লু' (গোমরাহ্কারী) নামের প্রতিচ্ছায়া সে হয় পথ-ভ্রষ্ট। আবার আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস এই চারটি

উপাদান থেকে সৃষ্টি হয়েছে মানুষের শরীর। এই চারটি উপাদানের মধ্যে রয়েছে আবার বৈপরীত্য। তাই মানুষের শরীর তৈরী করার সময়ে যে উপাদানটি প্রবল হয়, সেই উপাদানের প্রভাব পড়ে তার চরিত্রে। আবার মাটির মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্য। তাই কারো চরিত্র হয় নম্র, কারো কঠিন। আবার কারো গাত্রবর্ণ হয় লাল। কারো শাদা। আবার কারো কালো। হাদিস শরীফে যে স্বভাবের কথা উল্লেখিত হয়েছে, সেই স্বভাব এভাবে জন্মলগ্ন থেকেই হয়ে যায় সুনির্ধারিত। এটাই মানুষের জন্মগত প্রকৃতি বা স্বভাব।

কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, 'আ'লা শাকিলাতিহী' কথাটির অর্থ— মানুষ ওই পথেই চলে, যে পথ তার পছন্দ।

বায়যাবী লিখেছেন, যা মানুষের স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, সে তাকেই গ্রহণ করে। তাই কেউ কেউ হয়ে যায় পথ-ভ্রষ্ট। আবার কেউ হয়ে যায় পথ-প্রাপ্ত। অথবা মানুষ ওই পথে চলে, যে পথ তার আত্মার আকাংখার অনুকূল এবং চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'শাকিলাতিহী' অর্থ— আকৃতি, রূপ, অবস্থা, তুলনা— যা বাস্তবসম্মত। আর আকৃতি অর্থ এখানে অনুভূতি অথবা ধারণামূলক আকৃতি, লক্ষ্য, পথ, উদ্দেশ্য, উপায়, অভিমত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা সকলের অন্তরের ও বাহিরের সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি সর্বজ্ঞ। তাই তিনি অবশ্যই জানেন যে, কে সত্যাশ্রয়ী ও কে মিথ্যাচারী।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. এর সঙ্গে একদিন আমি একটি শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। রসুল স. এর হাতে ছিলো একটি খেজুরের ডাল। তিনি স. ওই খেজুরের ডালটি মাটিতে লাগিয়ে লাগিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। পথে দেখা হলো একদল ইহুদীর সঙ্গে। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো এ লোকের কাছে রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হোক। একজন বললো, না। এভাবে প্রশ্ন করলে সে হয়তো এমন উত্তর দিবে, যা তোমাদের মনোপুত হবে না। আরেকজন বললো, আমি অবশ্যই এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করবো। এ কথা বলেই সে এগিয়ে এসে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে বসলো। রসুল স. কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। আমি বুঝতে পারলাম ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। দেখলাম, একটু পরেই ওহীর প্রভাব অন্তর্হিত হলো। তখন রসুল স. পাঠ করলেন নিম্নের আয়াত—

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ۝ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ۝

❒ তোমাকে উহারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদিগকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হইয়াছে।'

❒ ইচ্ছা করিলে আমি তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা অবশ্যই প্রত্যাহার করিতে পারিতাম; তাহা হইলে এ বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পাইতে না।

❒ ইহা প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপালকের দয়া; তোমার প্রতি আছে তাঁহার মহা অনুগ্রহ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! ইহুদীরা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে আপনাকে বিপাকে ফেলতে চায়। আপনি তাদেরকে বলে দিন, রূহ সৃষ্টি করা হয়েছে সরাসরি আল্লাহ্‌র 'কুন' (হও) আদেশের মাধ্যমে। অন্যান্য সৃষ্টি যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার পরোক্ষ আদেশে একটিকে অবলম্বন করে অপরটি গড়ে উঠে, রূহকে সেভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। প্রশ্নকারীদের চাহিদা অনুযায়ী এখানে এভাবে উত্তরের অবতারণা করা হয়েছে। এভাবে এখানে কেবল একথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, রূহ অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয় নয়। রূহের পূর্ণ রহস্য এখানে উন্মোচন করা হয়নি। কারণ বিষয়টি সর্বসাধারণের জ্ঞানানুগত নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।' এ কথার অর্থ—সাধারণ মানুষকে রূহ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিত ধারণা দেয়া হয়েছে। তাই রূহের রহস্য সকলের বোধগম্য নয়। জ্ঞানার্জনের প্রচলিত পথ ও পদ্ধতি এক্ষেত্রে অচল। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রূহের রহস্য সূক্ষ্মতর অনুভূতির মাধ্যমে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারলেও, তা তাঁরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। কারণ এ রহস্য ভাষার অতীত। সে কারণেই 'মা রব্বুল আ'লামীন' (বিশ্বসমূহের

প্রভুপালনকর্তা কি রকম) — ফেরাউনের এ কথার জবাব হজরত মুসা যথাযথ-ভাবে দিতে পারেননি। কারণ ভাষা আল্লাহ্‌তায়ালার হকিকত বা তত্ত্ব ধারণ করতে অক্ষম। হজরত মুসা তাই তার জবাবে আল্লাহ্‌তায়ালার কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা মাত্র উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এই আয়াতের মাধ্যমে কেউ যেনো একথা বুঝে না নেন যে, রূহ সম্পর্কিত জ্ঞান ও রহস্য রসুল স. এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আউলিয়া কেরামের অজানা ছিলো। বরং প্রকৃত কথা এই যে, নবী-রসুলগণ ও বিশেষ মর্যাদাধারী আউলিয়া এ জ্ঞান লাভ করেন অনুপ্রেরণা ও আত্মিক দর্শনের (ইলহাম ও মুকাশাফার) মাধ্যমে। এ জ্ঞান আত্মজ্ঞান বা এলমে হুজুরীর অন্তর্ভুক্ত। অর্জিত জ্ঞান বা এলমে হুসুলীর মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। হৃদয়জ শ্রুতি ও দৃষ্টির মাধ্যমেই এমতো রহস্য সঞ্চারক জ্ঞান উপলব্ধ হতে পারে। শরীর সংলগ্ন কর্ণ ও চক্ষুর মাধ্যমে এই জ্ঞান আয়ত্ত করা যায় না। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দাগণ নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এভাবে সে বাঁধা পড়ে আমার ভালোবাসার বন্ধনে। ফলে আমি হই তার কান, যার দ্বারা সে শ্রবণ করে এবং হই তার চক্ষু, যার দ্বারা সে দেখে।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই রূহের তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত। আরবাবে ইনকেশাফ গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, রূহে সুফ্‌লা একটি— যাকে বলা হয় নফস। আর উলুবি আরওয়াহ্ বা উর্ধ্ব জগতের রূহ হচ্ছে পাঁচটি— কলব, রূহ, সের, খফি, আখফা। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আবার সত্তাগত ও গুণগত পার্থক্য। তাই এগুলোর বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম। যেনো একটির সঙ্গে অপরটির কোনো সম্পর্কই নেই। কিন্তু কোনো কোনো আধ্যাত্মিক সাধক এগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। ফলে এগুলোকে তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিশ্রিত করে ফেলে। তাই তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে উঠে— আমি তিরিশ বছর যাবত্ রূহের ইবাদত করে এসেছি। তারপর আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন রূহের হকিকত। ফলে আমি বুঝেছি রূহ সম্ভাব্য জগতের বৃত্তভূত ও ধ্বংসশীল। এমতাবস্থায় তাই কেউ কেউ বলে উঠেছেন— 'লা উহিব্‌বুল আফিলীন' (যা অস্ত যায় তা আমি ভালোবাসি না)।

একটি প্রশ্নঃ ইকরামা থেকে অপরিণত সূত্রে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এই আয়াত তাঁর সহচরবৃন্দের সম্মুখে পাঠ করলে তাঁরা বলেছিলেন, রূহ আসলে কী? এই আয়াতের সম্বোধিত জন কি কেবল আপনি না আমরাও? রসুল স. বলেছিলেন, এখানে আমিসহ সকল মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। সাহাবীগণ বলেছিলেন, আশ্চর্য! একসময় তো আপনি বলতেন— 'ওয়া মা ইয়ুতাল হিকমাতা ফাক্বদ্ উতিয়্যা খইরান্ কাছীরা' (যাকে হিকমত দান করা হয়েছে, তাকে দান করা হয়েছে অধিক কল্যাণ)। আবার একসময় আপনি একথাও বলেছেন যে,

রূহ সম্পর্কে আমার জানা নেই। তাহলে হেকমত ও অধিক কল্যাণ কাকে বলে? তাঁদের একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিলো এই আয়াত— 'ওয়ালাও আন্না মা ফীল আরদ্বি মিন শাজারাতিন্ আক্বলাম্' (ভূপৃষ্ঠে যতো বৃক্ষ বিদ্যমান, সবগুলোই যদি হয় লেখনী)। এ সকল বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, রূহের হকিকত সম্পর্কে রসুল স. জানতেন না। তা হলে কীভাবে বলা যায় যে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ রূহের হকিকত সম্পর্কে জানেন?

উত্তরঃ উপরের বর্ণনাটিকে যদি সঠিক মনে করা হয়, তবে একথা না বলে উপায় নেই যে, আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স. সহ সকল সাহাবীকে। অর্থাৎ সকলকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে, 'এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে'। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলতে আমরা বাধ্য যে, আল্লাহ্তায়ালার সীমাহীন জ্ঞানের তুলনায় নবী-রসুলগণ ও ফেরেশতাগণের জ্ঞান নিতান্তই নগণ্য। সে কারণেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে। আর 'ওয়ালাও আন্না মা ফিল আরদ্বি মিন শাজারাতিন আক্বলাম্'— এই আয়াতের মাধ্যমে একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, নবী-রসুলগণ ও আল্লাহ্র বিশেষ নৈকট্যভাজন আউলিয়াগণকে যে হেকমত ও কল্যাণ দান করা হয়েছে, রূহ সম্পর্কিত জ্ঞান তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তাদেরকে প্রদত্ত হেকমত ও কল্যাণ আল্লাহ্র অপার জ্ঞানের তুলনায় সামান্য হলেও তা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পূর্ণতার পরিচায়ক। সিদ্ধপুরুষ বা কামেল ইনসান এই পূর্ণতার বহির্ভূত নন।

জ্ঞাতব্যঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও অবতীর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে যা বলা হলো তাতে করে বুঝা যায় যে, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বললো এভাবে— মোহাম্মদ আমাদের সামনেই বড় হয়েছে। আমরা তাই ভালো করেই জানি যে, সে সত্যবাদী ও আমানত সংরক্ষণকারী। কিন্তু এখন তো সে বলে, তার উপরে নাকি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়। ব্যাপারটা একটু যাচাই করে দেখা দরকার। মদীনার ইহুদীদের কাছে কাউকে পাঠিয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হোক। তারা তো আহলে কিতাব। দেখা যাক, তারা মোহাম্মদ সম্পর্কে কী মন্তব্য করে। এই সিদ্ধান্তে সকলে সম্মত হলো। কয়েকজনকে তারা পাঠিয়ে দিলো মদীনায়। তারা ইহুদীদেরকে রসুল স. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। ইহুদীরা বললো, তোমরা গিয়ে মোহাম্মদের কাছে তিনটি প্রশ্ন কোরো। যদি সে তিনটি প্রশ্নের উত্তরই দিয়ে দেয়,

অথবা যদি একটিরও জবাব না দেয় তবে নিশ্চিত জেনো, সে নবী নয়। আর যদি দু'টি প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং একটি প্রশ্নের জবাব না দেয়, তাহলে বুঝবে, সে সত্য নবী। প্রশ্ন তিনটি হচ্ছে— ১. ওই যুবক কে, যে পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিলো? ২. ওই ব্যক্তি কে, যে পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিলো? ৩. রূহ কী? কুরায়েশেরা মদীনা থেকে ফিরে এসে রসুল স. সকাশে প্রশ্ন তিনটি উপস্থাপন করলো। রসুল স. বললেন, আমি আগামীকাল তোমাদের প্রশ্নগুলোর জবাব দিব। এ কথা বলার সময় তিনি স. ইনশাআল্লাহ্ বলেননি। তাই প্রত্যাদেশ হলো বিলম্বিত। মুজাহিদ বলেছেন, তখন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছিলো বারো দিন পর। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে পনের দিন পর। ইকরামা বলেছেন, চল্লিশ দিন পর। কুরায়েশেরা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ আমাদের কাছে আগামীকাল জবাব দিবে বলে অঙ্গীকার করেছিলো। কিন্তু এতদিন গত হওয়ার পরেও সে কিছুই বলতে পারলো না। এই নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপও শুরু করে দিলো। রসুল স. ব্যথিত হলেন। কিছুদিন পর অবতীর্ণ হলো— 'কখনোই তুমি এমন বোলো না যে আমি আগামীকাল করবো, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে— একথা না বলে।' (সুরা কাহ্ফ আয়াত ঃ ২৩, ২৪)। এরপর প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো— 'তুমি কি মনে করো না যে, গুহা ও রক্বীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর? (সুরা কাহ্ফঃ আয়াত ৯)। দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো— 'তারা তোমাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।' (সুরা কাহ্ফঃ আয়াত ৮৩)। এরপর তৃতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। বলা হলো— বলো, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। তিরমিজি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন সংক্ষেপে।

ইবনে কাছীর বর্ণিত হাদিস দু'টোর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করতে পৌনঃপুনিক অবতীর্ণের অভিমতকেই পছন্দ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজারও এরকমই করেছেন। অতিরিক্ত হিসেবে তিনি এতটুকু লিখেছেন, ইহুদীদের প্রশ্ন করার সময় রসুল স. কিছুক্ষণ নীরব ছিলেন এই আশায় যে, সম্ভবতঃ এ সম্পর্কে আরো কিছু প্রত্যাদেশ করা হবে। আর আলোচ্য আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত ও স্থান সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস দু'টো যদি মিলানোর চেষ্টা না করা হয়, তবে তো যে কোনো একটিকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়ে পড়বে অত্যাবশ্যক। আবার এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, বিশুদ্ধ হাদিস ষষ্ঠকের বর্ণনাই অধিকতর প্রাধান্যপ্রাপ্তির উপযুক্ত। এ ছাড়া বোখারীর বর্ণনা অধিকতর প্রাধান্য পাওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, ইহুদীদের সরাসরি প্রশ্ন করার সময় তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বাগবীর বর্ণনায় একথা নেই যে,

হজরত ইবনে আব্বাস ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আবার বাগবী হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে এই উক্তিটিকেও সম্পর্কিত করেছেন যে, যে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, সেই রূহের উদ্দেশ্য ছিলো হজরত জিবরাইল। অর্থাৎ হজরত জিবরাইলকে ইহুদীরা রূহ বলতো, আর ওই রূহ বা জিবরাইল সম্পর্কে তারা রসুল স.কে প্রশ্ন করে বসেছিলো। হাসান এবং কাতাদাও এ কথার সমর্থক।

আমি বলি, আবদ ইবনে হুমাইদ ও আবু শায়েখ কর্তৃক বর্ণিত জুহাকের উক্তিরূপে এবং হজরত আলীর উক্তিরূপে বাগবী লিখেছেন, রূহ হচ্ছে সত্তর হাজার মুখমণ্ডল বিশিষ্ট এক ফেরেশতা, যার প্রতিটি মুখমণ্ডলে রয়েছে সত্তর হাজার করে মুখ। ওই মুখগুলো দিয়ে সে প্রতিনিয়ত বর্ণনা করে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা। মুজাহিদ বলেছেন, রূহ আল্লাহ্তায়ালার এক অবাক সৃষ্টি। তার আকৃতি মানুষের মতো। কিন্তু সে মানুষ বা ফেরেশতা কোনোটাই নয়। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আরশ ব্যতীত রূহের চেয়ে বৃহৎ কোনো মাখলুক আল্লাহ্ আর সৃষ্টি করেননি। যদি সে চায়, তবে সাত আসমান ও সপ্তস্তর বিশিষ্ট জমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুকে সে একটি লোকমা বানিয়ে গিলে-ফেলতে পারে। তার দৈহিক গঠন ফেরেশতাদের মতো এবং মুখাবয়ব মানুষের মতো। মহাবিচারের দিবসে সে দণ্ডায়মান হবে আরশের ডানপাশে এবং হবে আল্লাহ্তায়ালার সত্তর হাজার পর্দার অধিক নিকটবর্তী। আর যারা আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাস করে, তাদের জন্য সে শাফায়াতও করবে। ফেরেশতাদের সঙ্গে তার রয়েছে নূরের আড়াল। ওই আড়াল না থাকলে আকাশবাসীরা তার জ্যোতিতে ভস্মীভূত হয়ে যেতো। আবদ্ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, ইকরামা বলেছেন, রূহ ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং এমন কোনো ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না যার সঙ্গে সে থাকে না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'রূহ' অর্থ আল কোরআন এবং 'মিন আমরি রব্বি' (প্রভুপালকের আদেশ ঘটিত) কথাটির অর্থ এখানে— 'মিন্ ওয়াহ্ ইল্লাহ্' (আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ ঘটিত)। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'রূহ' অর্থ হজরত ঈসা। যদি তাই হয়, তবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— ইহুদীরা যেমন মনে করে, হজরত ঈসা সে রকম নন। আর তাঁর পবিত্রা জননীকে তারা অপবাদ দেয়, কিন্তু তিনিও সে রকম নন। আবার খৃষ্টানেরা হজরত ঈসাকে বলে আল্লাহ্র পুত্র, সে কথাও ঠিক নয়। বরং তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে জনক ব্যতিরেকে, সরাসরি আল্লাহ্র 'কুন' (হও) আদেশের মাধ্যমে।

পরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'ইচ্ছা করলে আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম; তাহলে এ বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোনো কর্মবিধায়ক পেতে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার

রসুল! এ কথা তো আপনি নিশ্চিতরূপে অবগত যে, যদি আমি চাইতাম, তবে মানুষের স্মৃতিপট থেকে এবং গ্রন্থিত অনুলিপি থেকে কোরআনকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতাম। এরকম করলে আমার নিকট থেকে পুনরায় কোরআনকে ফেরত নেয়ার সাধ্য তো কারো থাকতো না।

এর পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'এটা প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপালকের দয়া।' এ কথার অর্থ হতে পারে দু'রকম— ১. আল্লাহ্‌র দয়া যদি হয়, তবে তিনিই কেবল কোরআনকে ফেরত নিতে পারেন। ২. 'ইসতেসনায়ে মুনকাতি' (বিকর্তিত ব্যতিক্রমী)। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালাই নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে এই কোরআনকে আপনার ও কোরআন স্মৃতিবদ্ধকারীদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন। রেখে দিয়েছেন কোরআনের অনুলিপির মধ্যেও। উল্লেখ্য যে, কোরআন সম্পর্কে এখানে আল্লাহ্‌তায়ালার দু'টি অনুগ্রহের কথা বর্ণিত হয়েছে। ১. কোরআনকে অবতীর্ণ করা ২. পুস্তকাকারে এবং মানুষের স্মৃতিপটে কোরআনকে সংরক্ষণ করা।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতি আছে তাঁর মহা অনুগ্রহ।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার প্রতি রয়েছে আমার বিশাল অনুগ্রহ। আপনাকে আমি বানিয়েছি আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক। আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছি মহাগ্রন্থ আল কোরআন। সে কোরআনকে আবার সংরক্ষিত রেখেছি আপনার হৃদয়ে এবং পুস্তকাকারে। দিয়েছি এই মহাকল্যাণের প্রচারের নির্দেশ। দিয়েছি মাকামে মাহমুদ ও হাউজে কাউসার।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, মহাপ্রলয়ের পূর্বে কোরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। সুতরাং কোরআন উঠিয়ে নেয়ার পূর্বেই তোমরা তা পাঠ করো (অনুধাবন করো এবং তার উপরে আমল করো)। এক লোক বললো, পুস্তকে লিপিবদ্ধ কোরআনের বাণী উঠিয়ে নেয়া সম্ভব। কিন্তু স্মৃতি থেকে কোরআনকে উঠিয়ে নেয়া হবে কীভাবে? তিনি বললেন, মানুষ রাতে নিদ্রামগ্ন হবে। তারপর জাগ্রত হয়ে দেখবে তার আর কোনো কিছুই মনে নেই। এরপর কোরআনের অনুলিপি খুঁজে দেখলে সেখানেও কোরআনের কোনো বাণী লিপিবদ্ধ দেখতে পাবে না। শেষে তারা মত্ত হয়ে পড়বে কাব্যচর্চায়।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস বলেছেন, কিয়ামত আগমনের কিছুদিন আগে কোরআন যেখান থেকে এসেছিলো সেখানেই চলে যাবে। তখন মধুমক্ষিকার গুঞ্জনের মতো আরশের চতুষ্পার্শ্বে ধ্বনিত হতে থাকবে গুণ গুণ আওয়াজ। আল্লাহ্ বলবেন, কী হলো? কোরআন বলবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমাকে তো পাঠ করা হয়, কিন্তু কেউ আমার উপরে আমল করে না। এরকম বর্ণনা করেছেন বাগবী।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ মানুষের অন্তর থেকে কোরআনকে ছিনিয়ে নিবেন। বরং আলেমদেরকেই উঠিয়ে নিবেন দুনিয়া থেকে। আর যখন কোনো আলেম থাকবে না, তখন মানুষ নিজেরাই হবে নিজেদের মূর্খতার অগ্রনায়ক। তখন না জেনেশুনে যে ফতওয়া দিবে, সে হবে পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্ট করবে অন্যকেও।

আহমদ ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত জিয়াদ ইবনে লবীদ বলেছেন, একবার রসুল স. প্রসঙ্গক্রমে বললেন, এক সময় এলেম চলে যেতে থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কীভাবে? আমরা তো কোরআন পড়বো এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও কোরআন শিক্ষা দিবো। তারা শিক্ষা দিবে তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে কোরআনের চর্চা। তিনি স. বললেন, জিয়াদ! তোমার জন্য তোমার মা রোদন করুক। আমি মনে করতাম, তুমি মদীনার একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। ইহুদী ও খৃষ্টানেরা কি তাদের আপনাপন ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করে না? কিন্তু তারা তওরাত ও ইঞ্জিল অনুসারে আমল করে কি? তিরমিজিও এই হাদিসটির বর্ণনাকারী। আর দারেমী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু উমামা থেকে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, এলেম শিক্ষা করো এবং অন্যকে শিক্ষা দাও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত এলেম। কেননা আমি চিরদিন তোমাদের মধ্যে থাকবো না। মনে রেখো, একদিন এলেম উঠে যাবে। প্রসারিত হবে বিশৃংখলা। তখন উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে দেখা দিবে প্রচণ্ড মতপৃথকতা। কিন্তু সে মতপার্থক্যের মীমাংসা করার জন্য কাউকে পাওয়া যাবে না। দারেমী, দারা কুতনী।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, আলেম সম্প্রদায়কে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে এলেম উঠিয়ে নেয়া হবে। এরকম হবে না যে, কারো স্মৃতিপট থেকে কোরআন মুছে দেয়া হবে। উল্লেখ্য যে, হজরত জিয়াদের বর্ণনানুসারে এলেম অনুযায়ী আমল না করার অর্থ হবে এলেম উঠিয়ে নেয়া। অর্থাৎ আমল করার যোগ্যতাই তখন অবলুপ্ত হয়ে যাবে। উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে যে পরস্পরবিরোধীতা রয়েছে, তা নিরসনার্থে বলা যেতে পারে যে, প্রথমে উঠিয়ে নেয়া হবে এলেম অনুযায়ী আমল করার যোগ্যতা। তারপর উঠিয়ে নেয়া হবে আলেমদেরকে। এভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমে ক্রমে অবলুপ্ত হবে এলেম।

সাঈদ অথবা ইকরামার মধ্যস্থতায় ইবনে জারীর এবং ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একদল ইহুদী একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আমরা কীভাবে আপনার আনুগত্য

করতে পারি, আপনি তো আমাদের কেবলাকেও ত্যাগ করেছেন। আর আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার সঙ্গেও আমরা আমাদের তওরাতের কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছি না। সুতরাং আপনি এমন কিতাব আনুন, যা আমাদের বোধগম্য হয়। নতুবা আপনি যেমন বলে চলেছেন, সেরকম তো আমরাও বলতে পারি। তাদের একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৮৮, ৮৯

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۞

❒ বল,'যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় ও তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ কুরআন আনয়ন করিতে পারিবে না।'

❒ আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সত্য প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত আর সমস্ত কিছুই অস্বীকার করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, আরববাসী কবি ও অলংকার শাস্ত্রবিদসহ সকল মানুষ ও জ্বিন সম্মিলিতভাবে কোরআনের মতো জ্ঞানগর্ভ ও শিল্পসুষমামণ্ডিত কোনো বাণী রচনা করতে চাইলেও সফল হবে না। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তখন, যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলেছিলো—ইচ্ছে করলে আমরাও এরকম রচনা করতে পারি। আল্লাহ্‌তায়ালা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাদের ওই অপকথনের প্রতিবাদ উপস্থাপন করেছেন। আর কোরআনের এটাও একটি মোজেজা যে, কোরআনের অনুরূপ কোনো বাণী কোনোদিনও কেউ রচনা করতে পারেনি। পারবেও না।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে মানুষ ও জ্বিনের কথা। ফেরেশতাদের উল্লেখ এখানে আসেনি। সম্ভবতঃ এর কারণ এই যে, ফেরেশতারা যদি কোরআনের মতো কোনো বাণী রচনা করতে সক্ষম হয়েও থাকে, তবুও তা

মানুষ ও জ্বিনের জন্য মোজেজা হয়েই থাকবে। মোজেজা হওয়ার ব্যাপারে এক্ষেত্রে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না। একথাটিও প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআন অবতীর্ণ হয় ফেরেশতার মাধ্যমে। এ ব্যাপারে মানুষ ও জ্বিন কখনোই মধ্যস্থ নয়। আমি বলি, কোরআনের অনুরূপ রচনার আমন্ত্রণের অর্থ হচ্ছে— নিজে রচনা করে উপস্থিত করো, যাতে প্রত্যাদেশের কোনো নাম গন্ধ থাকবে না। আর একটি কথা এই যে, ফেরেশতারা তো আল্লাহ্র বাণীর অনুরূপ কোনো বাণী রচনা করার চিন্তাই করতে পারে না। এরকম চিন্তা করতে পারে কেবল তারা যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর ফেরেশতারা কখনোই সত্যপ্রত্যাখ্যান করে না। কারণ তারা মাসুম বা নিষ্পাপ। এরকম হতে পারে যে, এই আয়াতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের একটি বাক্য। বাক্যটি এই— 'তাহলে এ বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোনো কর্মবিধায়ক পেতে না।'

পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'আমি মানুষের জন্য এই কোরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।' এখানে 'সর্‌রাফনা' অর্থ বিশদভাবে। অর্থাৎ বিভিন্নভাবে, সুস্পষ্টরূপে ও গুরুত্বসহকারে বার বার। 'মিনকুল্লি মাছালিন' কথাটির অর্থ বিভিন্ন উপমার দ্বারা। অর্থাৎ বিধানাবলীর বিবরণ, শাস্তি ও শাস্তির অংগীকার ইত্যাদি বিষয়ে বুঝবার জন্য বিভিন্ন উপমার সাহায্যে। 'মাছালা' অর্থ সদুপদেশও হয়। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— এই কোরআনে আমি উপস্থাপন করেছি বিভিন্ন সৌন্দর্যমণ্ডিত সদুপদেশ ও অনেক হৃদয়স্পর্শী বিবরণ। এগুলো যেনো কোরআনের বিভিন্ন উপমা।

শেষে বলা হয়েছে— 'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সত্যপ্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত আর সমস্ত কিছুই অস্বীকার করে।' একথার অর্থ— কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কোরআন মজীদের এ সকল সদুপদেশের প্রতি দৃকপাত করে না। এভাবে তারা হয়ে যায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

ইকরামার মধ্যস্থতায় বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উতবা বিন রবীয়া, শায়বা বিন রবীয়া, আবু সুফিয়ান বিন হারব, আবদুদ্দার গোত্রের এক লোক (বাগবীর মন্তব্যানুসারে নজর বিন হারেছ), আবুল বুখতারী, আসওয়াদ বিন মুত্তালিব, জাম্য়া বিন আসওয়াদ, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আবু জেহেল বিন হিশাম, আবদুল্লাহ্ বিন আবু উমাইয়া, উমাইয়া বিন খালফ, আস বিন ওয়ায়েল, নাবী বিন হাজ্জাজ, মাযবাহ্ বিন হাজ্জাজ এবং আরো কতিপয় লোক সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর কাবাগৃহের পশ্চাতে সমবেত হয়ে রসুল স. এর বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ বিনিময় শুরু করলো। একজন বললো, মোহাম্মদকে এই সমাবেশে ডেকে আনা হোক। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে

নিরসন করা হোক তার ও আমাদের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যাবলী। তার এ কথায় সকলেই একমত হলো। একজনকে লক্ষ্য করে বলা হলো, তুমিই যাও। মোহাম্মদকে গিয়ে বলো, গোত্রপতিগণ তোমার সঙ্গে কথা-বার্তা বলার জন্য অপেক্ষমান।

রসুল স. তাদের এমতো প্রস্তাব জানতে পেরে ভাবলেন, এবার হয়তো গোত্রপতিদের বোধোদয় ঘটেছে। তিনি স. সব সময় চাইতেন, তারা হেদায়েত-প্রাপ্ত হোক। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে হাজির হলেন তাদের সমাবেশস্থলে। গোত্রপতিরা নানাভাবে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলো। একজন বললো, দেখো মোহাম্মদ! তোমার ও আমাদের মধ্যে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হওয়া খুবই দুঃখজনক। তুমি যা বলো তা আমাদের নিকটে খুবই বিরক্তিকর। কোনো আরববাসী এ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এরকম আচরণ করেনি। তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে মন্দ বলো। তাদের মতাদর্শকে অস্বীকার করো। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে বলো নির্বোধ। নিন্দা করো তাদের উপাস্যদের। এভাবে তুমি আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছো অনৈক্য। বংশপরম্পরায় যে ধর্মমতকে আমরা একান্ত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে প্রতিপালন করে চলেছি, সেই ধর্মমতের বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়িয়েছো কোরআন ও ইসলাম নিয়ে। কেনো তুমি এভাবে ধর্মদ্রোহী হয়ে উঠলে। কী চাও তুমি? ধন-সম্পদ? প্রতিপত্তি? রাজত্ব? যদি এসব কিছু চাও, তবে তা স্পষ্ট করে বলো। আমরা তোমাকে দান করবো অঢেল সম্পদ। বানাবো আমাদের অধিনায়ক অথবা রাজা। আর যদি কোনো দুষ্ট জ্বিনের প্রভাবে তুমি এরকম করে থাকো, তবে (গণক অথবা ওঝার মাধ্যমে) তোমার উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য আমরা আমাদের সম্পদ ব্যয় করতেও প্রস্তুত। রসুল স. বললেন, তোমাদের ধারণা অযথার্থ। কোরআন প্রচারের মাধ্যমে আমি ঐশ্বর্য অন্বেষণ করি না। সম্মান, নেতৃত্ব, রাজত্ব— কোনো কিছুই আমি চাই না। আল্লাহ্ তো আমাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন তাঁর বাণীবাহকরূপে। দান করেছেন একটি কিতাব। নির্দেশ করেছেন একথা প্রচার করতে যে, এই কিতাবের অনুসারীদের জন্য রয়েছে জান্নাতের শুভ সংবাদ। আর দুঃসংবাদ রয়েছে তাদের জন্য, যারা একে অস্বীকার করে। তাই এভাবে শুভসংবাদ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন করাই আমার কর্তব্য কর্ম। আর আমি তো একথা তোমাদেরকে বার বার বলে চলেছি। সুতরাং হে আমার সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ! এই কোরআনকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করো। যদি এরকম করো, তবে লাভ করবে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। আর যদি প্রত্যাখ্যান করো, তবে আমি আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করবো। আমার ও তোমাদের বিষয়ে মীমাংসা করবেন আল্লাহ্ স্বয়ং।

গোত্রপতিদের একজন বললো, মোহাম্মদ, আমরা তো তোমার সম্মুখে একটি উত্তম প্রস্তাব উপস্থাপন করেছি। তুমি যদি এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে না চাও, তবে তোমার দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করো। তুমি তো জানো, আমাদের এই মক্কা নগরী পর্বত বেষ্টিত ও সংকীর্ণ। ইয়েমেন ও সিরিয়াবাসীদের মতো আমরা সম্পদশালীও নই। সুতরাং তুমি তোমার প্রভুপালকের কাছে এইমর্মে প্রার্থনা জানাও, যেনো তিনি আমাদের জনপদের চতুষ্পার্শ্বের পাহাড়গুলোকে সরিয়ে দেন। প্রসারিত করে দেন আমাদের বসবাসের পরিসর। আর সিরিয়া ও ইরাকের মতো আমাদের দেশের মধ্য দিয়েও যেনো প্রবাহিত করে দেন জলবতী নদী। সেই সঙ্গে আমাদের মৃত পূর্ব পুরুষদেরকে করে দেন জীবিত। সত্যবাদী কুসাই বিন কিলাবও যেনো থাকেন ওই পুনর্জীবিতদের মধ্যে। আমরা তাদের নিকটে তোমার দাবির সত্যাসত্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো। যদি তারা তোমাকে সত্য পয়গম্বর বলে বিশ্বাস করে, তবে আমরাও তোমাকে সত্য বলে মানবো।

রসুল স. বললেন, আমাকে তো এজন্যে প্রেরণ করা হয়নি। যে বার্তা প্রচারের নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে, তাতো তোমাদের নিকটে আমি পৌঁছে দিয়েছি। এখন তোমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, কী চাও তোমরা? চিরন্তন সৌভাগ্য, না চিরস্থায়ী শাস্তি। আমি তো বাণীবাহক মাত্র। তারা বললো, আমাদের প্রস্তাব যদি তুমি মেনে না নাও, তবে অন্ততঃ এ রকম করো যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করাও একজন ফেরেশতাকে, যে তোমার নবুয়তকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিবে এবং দূর করে দিবে তোমার দারিদ্র। রসুল স. বললেন, না। আল্লাহ্ আমাকে এ জন্য প্রেরণ করেননি। আমি তো বলেছি, আমি শুভসংবাদ প্রদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী। তারা বললো, তা হলে তুমি আমাদের উপরে আকাশকে পতিত করাও। কারণ তুমি বলো, তোমার প্রভুপালক সর্বশক্তিধর। রসুল স. বললেন, এটা সম্পূর্ণতঃই আমার আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন একটি বিষয়। তিনি যদি চান তবে অবশ্যই এরকম করতে পারেন। গোত্রপতিদের একজন উত্তেজিত হয়ে বললো, অতো কথার দরকার নেই। তোমার আল্লাহ্ ও তার ফেরেশতারা আমাদের সামনে এসে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো না। একথা শুনে রসুল স. উঠে দাঁড়ালেন। যাত্রা করলেন গৃহাভিমুখে। তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো তাঁর ফুফু আতেকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহ্ বিন আবী উমাইয়া। রসুল স. এর সঙ্গে পথ চলতে চলতে সে বললো, মোহাম্মদ, গোত্রপতিগণ তোমার নিকটে কয়েকটি দাবি উত্থাপন করলো। কিন্তু তুমি সেগুলোর কোনো তোয়াক্কাই করলে না। শেষে তারা বললো, তুমি যে শাস্তির ভয় দেখাও, দ্রুত সে শাস্তি নিয়ে এসো। কিন্তু সে শাস্তিও তুমি আনতে পারলে না। এখন আমি বলছি, এই মুহূর্তে তুমি আমার চোখের সামনে সিঁড়ি বেয়ে আকাশে উঠে যাও। সেখানে থেকে নিয়ে এসো একটি কিতাব। আর ওই কিতাবের সঙ্গে নিয়ে এসো চারজন ফেরেশতা। তারা তোমার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করুক। তবে আমার মনে হয়, এরকম করলেও হয়তো আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারবো না। তার একথা শুনে রসুল স. ব্যথিত হলেন। চিন্তাক্লিষ্ট মনে ফিরে এলেন স্বগৃহে। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত চতুষ্টয়।

অজ্ঞাতনামা এক মিসরবাসী জ্ঞান প্রবীণের মধ্যস্থতায় ইবনে জারীর ও ইবনে ইসহাক ইকরামা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নিম্নের আয়াত চতুষ্টয় অবতীর্ণ হয়েছে জননী উম্মে সালমার ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ বিন উমাইয়া সম্পর্কে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে সাঈদ ইবনে মানসুরও এ রকম বলেছেন। 'লুবাবুন্ নুকুল' রচয়িতা লিখেছেন, বর্ণনাটি অপরিণত, কিন্তু বিশুদ্ধ।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ۙ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ۙ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ۙ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِى السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝

❐ এবং উহারা বলে,'কখনই তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিব না যতক্ষণ না তুমি আমাদিগের জন্য ভূমি হইতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করিবে,

❐ 'অথবা তোমার খর্জুরের অথবা আংগুরের এক বাগান হইবে যাহার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করিয়া দিবে নদী-নালা',

❐ 'অথবা তুমি যেমন বলিয়া থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া আমাদিগের উপর ফেলিবে, অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণকে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিবে',

❐ 'অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হইবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করিবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ আমরা কখনও বিশ্বাস করিব না যতক্ষণ তুমি আমাদিগের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ না করিবে যাহা আমরা পাঠ করিব।' বল, 'পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রসূল।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! অংশীবাদীরা কীরূপ সত্যদ্রোহী। কোরআন যে একটি অলৌকিক গ্রন্থ, তার প্রমাণ সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও তারা আপনাকে আরো অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করতে বলে। বলে, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে একটি প্রস্রবণের উৎসারণ ঘটাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাকে নবী বলে বিশ্বাস করবো না।

পরের আয়াতে (৯১) বলা হয়েছে— 'অথবা যতক্ষণ না তুমি হবে এক খেজুর বা আঙ্গুরের বাগানের অধিকারী, যার মধ্যে মাঝে মাঝে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দিবে নদী-নালা।'

এর পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'অথবা তুমি যেমন বলে থাকো, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপরে ফেলবে।' এ কথার অর্থ— অথবা হে মোহাম্মদ! তুমি বলো, কোরআন না মানলে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের উপর আকাশ আপতিত করবেন— তাই করো তুমি। আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপরে ফেলে দাও। এখানকার 'কিসাফুন' শব্দটির অর্থ খণ্ড-বিখণ্ড করে। শব্দটি 'কাসিফাতুন' এর বহুবচন। যেমন 'ক্বিত্বাউন' শব্দটি 'ক্বিত্বআতুন ' এর বহুবচন।

এরপর বলা হয়েছে— 'অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'ক্বাবীলা' শব্দটির অর্থ 'কাফীলা'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে এরকম— অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদেরকে সাক্ষ্যদাতারূপে উপস্থিত করো আমাদের সামনে। তারাই সাক্ষ্য দিক যে, তোমার দাবি সত্য। তারাই বহন করুক সকল দায়-দায়িত্ব। কাতাদা বলেছেন, 'ক্বাবীলা' অর্থ সামনাসামনি। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণকে নিয়ে এসো আমাদের সামনে। ফাররা বলেছেন, আরববাসীরা বলে, লাক্বীতু ফুলানান ক্বাবীলান্ ওয়া ক্বুবুলান' (আমি অমুক ব্যক্তির সামনাসামনি হয়েছিলাম)। এমতাবস্থায় 'ওয়াল মালায়িকাতি' থেকে 'ক্বাবীলান' হবে হাল বা অবস্থা জ্ঞাপক। 'ক্বাবীলান' শব্দটি 'ক্বাবীলাতুন' এর বহুবচন। কথাটি ব্যবহৃত হয় শ্রেণী বা প্রকার বোঝাতে। তাই বক্তব্যটি দাঁড়াবে— বিভিন্ন শ্রেণীর বা রকমের ফেরেশতাগণকে হাজির করাও।

এর পরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— 'অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে। কিন্তু তোমার আকাশারোহণ আমরা কখনো বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ তুমি আমাদের উপর এক কিতাব অবতীর্ণ না করবে, যা আমরা পাঠ করবো।' উদ্ধৃত বক্তব্যটি ছিলো কুরায়েশ নেতা আবদুল্লাহ্ বিন উমাইয়ার। 'যুখরুফ' অর্থ সাজ-সজ্জা। এখানে কথাটির অর্থ

হবে— স্বর্ণ-নির্মিত গৃহ। 'কিতাবান্ নাক্বরাউহু' অর্থ একটি কিতাব যার মধ্যে থাকবে তোমার নবুয়তের স্বীকৃতি, যা স্বচক্ষে দেখে পাঠ করবো আমরা এবং সরাসরি আমাদের প্রতি তোমার আনুগত্য করার নির্দেশ।

শেষে বলা হয়েছে— 'বলো, পবিত্র মহান প্রতিপালক! আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রসুল।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কুরায়েশ গোত্রাধিনায়কদেরকে বিস্ময় প্রকাশার্থে বলে দিন, আমার মহিমময় প্রভুপালনকর্তা পবিত্রাতিপবিত্র। আমি তো কেবল একজন মানুষ। তোমরা যা করতে বলো, তা মানুষের সাধ্য বহির্ভূত। আর আমি একজন সত্য রসুলও। কোনো রসুল কখনো স্বশক্তিতে কোনো মোজেজা প্রদর্শন করেন না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর রসুলের মাধ্যমে তিনি এর চেয়েও অধিক অলৌকিকত্ব প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা প্রয়োগের ব্যাপারে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র, চিরঅমুখাপেক্ষী। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ইচ্ছামতো মোজেজা প্রকাশ করা তাঁর নিয়ম নয়। কারণ ইমান আনার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই তারা মোজেজার অভিলাষী হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী কুরায়েশদের দাবির জবাব দেয়া হয়েছে অতি সংক্ষেপে। কারণ তারা মূর্খ ও চিরভ্রষ্ট। ইমান তাদের অদৃষ্টেই নেই। তাই অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে— ১. 'যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও অবতীর্ণ করতাম।' ২. 'যদি ওদের জন্য আকাশের দুয়ার খুলে দেই।' ৩. 'কিছু যদি হয়ে যায় (কোরআনের মাধ্যমে যদি পাহাড় চলতে থাকে অথবা যদি পৃথিবীকে গুঁটিয়ে নেয়া হয় এবং মৃতকে জীবিত করার পর তারা কথা বলে), তবুও তারা ইমান আনবে না; সকল কাজের এখতিয়ার আল্লাহ্‌র হাতে।'

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ

اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ○ قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ

لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ○ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ○ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ

فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ط

❐ 'আল্লাহ্ কি মানুষকে রসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন,' উহাদিগের এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হইতে লোকদিগকে বিরত রাখে, যখন উহাদিগের নিকট আসে পথ-নির্দেশ।

❐ বল, 'ফেরেশতাগণ যদি নিশ্চিন্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিত তবে আমি আকাশ হইতে ফেরেশতাই উহাদিগের নিকট রসূল করিয়া পাঠাইতাম।'

❐ বল, 'আমার ও তোমাদিগের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট; তিনি তো তাঁহার দাসদিগকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।'

❐ আল্লাহ্ যাহাদিগকে পথ-নির্দেশ করেন তাহারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাহাদিগকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও উহাদিগের অভিভাবক পাইবে না, কিয়ামতের দিন আমি উহাদিগকে সমবেত করিব উহাদিগের মুখে-ভর দিয়া-চলা অবস্থায় অন্ধ, মুক ও বধির করিয়া। উহাদিগের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই উহা স্তিমিত হইবে আমি তখন উহাদিগের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করিয়া দিব।

❐ ইহাই উহাদিগের প্রতিফল, কারণ উহারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল ও বলিয়াছিল, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলেও কি নূতন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হইব?'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! দেখুন অংশীবাদী কুরায়েশেরা কতোই না অজ্ঞ ও উন্নাসিক। তাদের প্রতি রসুলরূপে প্রেরিত হয়েছেন আপনি। আর আপনার উপর অবতীর্ণ হয়ে চলেছে আল কোরআন। এমতাবস্থায় তাদের দায়িত্ব ছিলো আপনাকে ও কোরআনকে নির্বিবাদে মেনে চলা। কিন্তু তা না করে তারা উল্টো প্রশ্ন করে বসে, আল্লাহ্ মানুষকে কি রসুল করে পাঠিয়েছেন! এরকম অপকথনের কারণে তারা অবশ্যই হয়েছে পথভ্রষ্ট। আরো হয়েছে অন্যের হেদায়েতের পথের প্রতিবন্ধক। কিন্তু তারা এই সহজ কথাটি কেনো বোঝে না যে, সমগোত্রীয় না হলে উপকার আদান-প্রদান বিঘ্নিত হয়। তাইতো মানুষের হেদায়েতের জন্য রসুল হিসেবে প্রেরণ করি মানুষকে।

পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'বলো, ফেরেশতাগণ যদি নিশ্চিন্তে পৃথিবীতে বিচরণ করতো, তবে আমি আকাশ থেকে ফেরেশতাকেই তাদের জন্য

রসুল করে পাঠাতাম। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে একথা উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করুন যে, পৃথিবীতে বাস করে মানুষ, ফেরেশতা নয়। ফেরেশতা যদি এখানে বসবাস করতো তবে তো তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য ফেরেশতাকেই পাঠাতাম।

এর পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে— 'বলো, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল অর্বাচীনদেরকে বলুন, আমার রেসালতের পক্ষে আল্লাহ্র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনিই উত্তমরূপে অবগত যে, আমি তার রসুল কিনা। তোমাদের অস্বীকৃতিতে আমার কিইবা এসে যায়। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, আমি বার্তাবাহকের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করেছি, তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি আল্লাহ্র পয়গাম। অথচ তোমরা স্পষ্টরূপে সত্য প্রকাশিত হবার পরও আমার বিরোধিতা করে চলেছো। ঠিক আছে, আল্লাহ্ই এ ব্যাপারে আমার ও তোমাদের বিষয়ে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত দান করবেন। যথাসময়ে পুণ্য প্রদান করবেন সত্যাধিষ্ঠিতদেরকে, আর শাস্তি দান করবেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তো তাঁর দাসদেরকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা যিনি সত্যের বাণী পৌঁছাচ্ছেন এবং যাদেরকে বাণী পৌঁছানো হচ্ছে উভয়ের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। সকলেই তাঁর অতুলনীয় পর্যবেক্ষণ ও অবহিতির আওতাভূত। যথাসময়ে অবশ্যই উভয়ের জন্য নির্ধারণ করা হবে সাফল্য ও বৈফল্য। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে রসুল স.কে দেয়া হয়েছে সান্ত্বনা, আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দেয়া হয়েছে শাস্তির হুমকি।

এর পরের আয়াতে (৯৭) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাদেরকে পথনির্দেশ করেন, তারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনোই তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকে তাদের অভিভাবক পাবে না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনে রাখুন, আল্লাহ্ হেদায়েত না করা পর্যন্ত কেউ হেদায়েত পায় না। আর যাদেরকে তিনি হেদায়েত করতে চান না তারা অবশ্যই হয় পথভ্রষ্ট। আল্লাহ্ ছাড়া অভিভাবক ও সাহায্যকারী কেউ নেই। আর একথা সুনিশ্চিত যে, পথভ্রষ্টরা আল্লাহ্র সাহায্যচ্যুত।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করবো তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ, মূক ও বধির করে।'

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! কিয়ামতের দিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা মুখে ভর দিয়ে চলবে কীভাবে? তিনি স. বললেন, যে আল্লাহ্ তাদেরকে এখন পায়ের সাহায্যে চলাফেরা করাচ্ছেন, তিনি কি তখন তাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চালিত করতে পারবেন না? বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হাশরের প্রান্তরে মানুষ উপনীত হবে তিন রকম অবস্থায়। কেউ থাকবে বাহনে আরোহণ করে। কেউ থাকবে পায়ের উপরে দণ্ডায়মান হয়ে। আবার কেউ চলবে মুখে ভর করে। এক লোক জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! মুখে ভর দিয়ে চলা আবার কীরকম? তিনি স. বললেন, যিনি মানুষকে পৃথিবীতে পায়ে ভর করে চালিয়েছেন, তিনি নিশ্চয় মুখে ভর করে চালাতে সক্ষম। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তমসূত্রবিশিষ্ট। হজরত মুয়াবিয়া বিন জুনদুব থেকেও এরকম একটি বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, তোমাদের হাশর হবে বাহনারোহী হওয়া অবস্থায়, পায়ের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং মুখে ভর করে দাঁড়ানো অবস্থায়।

হজরত আবু জর সূত্রে নাসাঈ, হাকেম ও বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিন মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে তিনটি দলে বিভক্ত করে। এক দল থাকবে পানাহারে পরিতৃপ্ত, বস্ত্র পরিহিত ও বাহনে আরোহণ করা অবস্থায়। আরেক দল চলবে পায়ে হেঁটে, দৌড়ে এবং অন্য আরেক দলকে মুখে ভর দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় ফেরেশতারা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলবে।

'অন্ধ, মুক ও বধির করে' কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— সে দিন এমন কোনো দৃশ্য তারা দেখতে পাবে না, যাতে করে তাদের চক্ষু জুড়িয়ে যায়। এমন কোনো কথাও তখন তারা বলতে পারবে না, যা হবে গ্রহণযোগ্য এবং শ্রুতিসুখকর কোনো সংবাদও সেদিন তাদের কর্ণগোচর হবে না। কেননা পৃথিবীতে তারা সত্য দর্শন থেকে তাদের চোখকে বন্ধ করে রেখেছিলো। সত্যবাণী শ্রবণ করা থেকে শ্রুতিকে করে রেখেছিলো বধির। আর তাদের রসনা ছিলো সত্যের বাণী উচ্চারণ করা থেকে মুক। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এভাবেই আলোচ্য বাক্যটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ সে দিন তারা পরিত্রাণপ্রদায়ক কোনো দৃশ্য, আশাব্যঞ্জক কোনো বাণী এবং আনন্দপ্রকাশক কোনো ধ্বনি দেখা, শোনা ও উচ্চারণ করা থেকে হবে বঞ্চিত। এর বিপরীত সকল কিছুই তারা দেখবে, শুনবে ও উচ্চারণ করবে। তাই কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে— ১. পাপিষ্ঠরা দোজখ দেখবে। ২. সেখানে ধ্বংসকেই আহ্বান করা হবে। ৩. তারা

তখন শুনবে রোষজাত শব্দ ও হুমকি। ৪. সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা তো সবকিছু দেখলাম ও শুনলাম। এখন আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও, আমরা পুণ্যকর্ম করবো।

কিন্তু কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, প্রকৃত অর্থেই সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হবে অন্ধ, বধির ও মুক। তবে দোজখের সামনাসামনি হলে তারা পুনরায় ফিরে পাবে তাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, হিসাব গ্রহণ শেষে যখন তাদেরকে দোজখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে তখন অন্তর্হিত হয়ে যাবে তাদের দৃষ্টিক্ষমতা, বাকক্ষমতা ও শ্রবণক্ষমতা।

সাঈদ ইবনে মানসুর ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, দোজখের মধ্যে দোজখীরা কথা বলতে পারবে মাত্র পাঁচবার। আর প্রতিবারই তাদের প্রশ্ন ও আবেদন-নিবেদনের জবাব দান করবেন আল্লাহ্ স্বয়ং। যেমন— ১. দোজখী বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা তুমি দুই দুইবার আমাদের প্রাণ হরণ করার পরে পুনরায় প্রাণ দান করেছো। আমরা স্বীকার করছি আমাদের অপরাধ। এখন এখান থেকে আমাদের নিষ্ক্রমণের কোনো উপায় রয়েছে কি? আল্লাহ্ বলবেন— তোমাদের এই শাস্তি তো এই জন্য যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ডাকা হতো, তখন তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে (সুরা মু'মিনূন)। ২. দোজখীরা বলবে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমরা সবকিছু দেখেছি ও শুনেছি। এখন আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন। আমরা নেককাজ করবো এবং নিশ্চয় হবো বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ বলবেন— তবে শাস্তি আস্বাদন করো। কারণ, আজকের এই সাক্ষাতের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে, আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়েছি (সুরা সাজদা)। ৩. দোজখীরা নিবেদন করবে— হে আমাদের প্রভুপালয়িতা! আমাদেরকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও। আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিবো এবং রসুলগণের অনুসরণ করবো। উত্তরে আল্লাহ্ ঘোষণা করবেন— তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? (সুরা ইবরাহীম)। ৪. জাহান্নামীরা কাকুতি-মিনতি করে বলবে— হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে এই নরক থেকে নিষ্কৃতি দাও। আমরা যে কাজ করে এখানে এসেছি, এখন থেকে তার বিপরীত কাজ করবো। আল্লাহ্ জানাবেন— আমি কি তোমাদেরকে পৃথিবীর আয়ুষ্কাল দেইনি? একথার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণকারীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। ৫. এরপর নরকবাসীরা আর্তনাদ করে বলবে— হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিলো এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে

আমাদের প্রভুপালয়িতা। এই অসহ্য আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো। এরপর আমরা যদি পুনরায় সত্যপ্রত্যাখ্যান করি, তবে তো আমরা অবশ্যই হবো সীমালংঘনকারী। আল্লাহ্ তখন তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন এভাবে— 'ওর মধ্যে থেকে অপদস্থ হও। আমার সঙ্গে কথা বোলো না'— এরপর থেকে দোজখবাসীরা আর কথা বলবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই তা স্তিমিত হবে, আমি তখন তাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দিবো।' এ কথার অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চিরস্থায়ী আবাস হচ্ছে জাহান্নাম। যখন জাহান্নামের আগুনে তাদের চর্ম-অস্থি-মাংস জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাবে এবং অগ্নিশিখা হয়ে যাবে কিছুটা স্তিমিত, তখন তাদের শরীরে পুনরায় স্থাপন করা হবে চর্ম, অস্থি ও মাংস। আর অগ্নিশিখাকেও করে দেয়া হবে অধিকতর উত্তপ্ত। এভাবেই পালাক্রমে চলতে থাকবে তাদের অনন্ত শাস্তি। আর এভাবেই পুনঃপুনঃ তাদেরকে একবার করা হবে মৃতপ্রায়, আর একবার করা হবে পুনর্জীবিত। কেননা তারা ছিলো পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী। পরবর্তী আয়াতে (৯৮) সে কথাই স্পষ্টাক্ষরে বলে দেয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে— 'এটাই তাদের প্রতিফল, কারণ তারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছিলো ও বলেছিলো, আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো?'

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৯৯, ১০০

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۞

❐ উহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহাদিগের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে ক্ষমতাবান? তিনি উহাদিগের জন্য স্থির করিয়াছেন এক নির্দিষ্ট কাল, যাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তথাপি সীমা লংঘনকারীগণ সত্যপ্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত সবই অস্বীকার করে।

❒ বল, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হইতে তবুও তোমরা 'ব্যয় হইয়া যাইবে' এই আশংকায় উহা ধরিয়া রাখিতে; মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।"

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান?'

একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সুবিশাল আকাশ ও বিশাল পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না কেনো? আকৃতিগত দিক থেকে এই দু'টি বিশাল ও রহস্যময় সৃষ্টির তুলনায় মানুষ সৃষ্টি তো একটি নগণ্য বিষয়। যে আল্লাহ্ পূর্বদৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে আকাশ ও ভুবন সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ্ কি মানুষের মতো একটি ক্ষুদ্র সৃষ্টিকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারবেন না? প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টিতো আরো সহজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন এক নির্দিষ্টকাল, যাতে কোনো সন্দেহ নেই।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন একটি নির্দিষ্ট সময়। এতে সন্দেহ মাত্র নেই। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'আজ্বালা' (নির্দিষ্টকাল বা সময়) বলে বুঝানো হয়েছে মৃত্যুর সময়কে। আবার কেউ বলেছেন, এখানে নির্দিষ্টকাল বা সময় অর্থ কিয়ামত বা মহাপ্রলয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তথাপি সীমালংঘনকারীরা সত্যপ্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত সবই অস্বীকার করে।' এখানে 'জলিমুন' অর্থ সীমালংঘনকারীরা। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে এ কথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই সীমালংঘনকারী। তারা কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করে। অথচ তাদের এমতো আচরণ সম্পূর্ণ নিরর্থক।

পরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে— 'বলো, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হতে, তবুও তোমরা ব্যয় হয়ে যাবে এই আশংকায় তা ধরে রাখতে। মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।' এখানে 'দয়ার ভাণ্ডার' অর্থ রিজিক ও অন্যান্য নেয়ামতের ভাণ্ডার। 'ব্যয় হয়ে যাবে এই আশংকায়'— কথাটির অর্থ সম্পদ ব্যয় হয়ে গেলে নিঃস্ব হয়ে যাবে এই ভয়ে। 'ক্বাতূরা' অর্থ কার্পণ্য, সংকীর্ণচিত্ততা। উল্লেখ্য যে, মানুষ তার সঞ্চয় পুরোপুরি বিলিয়ে দিতে ভয় পায়। কারণ সে প্রকৃত অর্থে ধনী বা সম্পদশালী নয়। প্রকৃত সম্পদশালী হচ্ছেন আল্লাহ্। তিনিই সকল সম্পদের স্রষ্টা। তিনি যত দান করেন, ততই বা ততোধিক সম্পদ সৃষ্টিও করতে পারেন তিনি। কারণ তিনিই সকল কিছুর একক স্রষ্টা এবং সকল গ্রহীতার একমাত্র দাতা । তাঁর ধনভাণ্ডার অনিঃশেষ। কিন্তু মানুষ কিছুতেই

তাঁর মতো নয়। প্রকৃত অর্থে সে দাতাও নয়। বরং গ্রহীতা। তাই সে অতিশয় কৃপণ। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হতে, তবুও তোমরা স্বভাবগত কৃপণতার ফলে সম্পদ কমে যাওয়ার আশংকায় তা ধরে রাখতে চাইতে। কারণ তোমরা অতিশয় কৃপণ।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ۞ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ۞ فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ۞ وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ۞

❒ তুমি বনি ইস্‌রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, আমি মুসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়াছিলাম; যখন সে তাহাদিগের নিকট আসিয়াছিল ফেরাউন তাহাকে বলিয়াছিল 'হে মূসা! আমি তো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।'

❒ মূসা বলিয়াছিল, 'তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করিয়াছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। হে ফেরাউন ! আমি তো দেখিতেছি তুমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছ।'

❒ অতঃপর ফেরাউন তাহাদিগকে দেশ হইতে উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করিল; তখন আমি ফেরাউন ও তাহার সংগীগণ সকলকে নিমজ্জিত করিলাম।

❒ ইহার পর আমি বনি ইসরাঈলকে বলিলাম, 'তোমরা এই দেশে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হইবে তখন তোমাদিগের সকলকে আমি একত্রিত করিয়া উপস্থিত করিব।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি বনী ইসরাইলকে জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি মুসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! স্মরণ করুন, আমি নবী মুসাকে দিয়েছিলাম নয়টি স্পষ্ট মোজেজা।

হজরত মুসাকে প্রদত্ত নয়টি মোজেজা নির্ধারণ নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস ও জুহাক বলেছেন, ওই নয়টি মোজেজা ছিলো—১. অলৌকিক লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া। ২. হাত বগলে রেখে বের করে আনলে তা শুভ্র ও আলোকজ্জ্বল হওয়া। ৩. জিহ্বার জড়তা দূর হওয়া। ৪. লাঠির আঘাতে সমুদ্র-সলিল দ্বিধাবিভক্ত হওয়া। ৫. প্লাবন । ৬. পঙ্গপালের আক্রমণ। ৭. ব্যাঙের আযাব। ৮. রক্তের আযাব। ৯. যষ্টির আঘাতে প্রস্তর থেকে সলিলধারা নির্গত হওয়া। ইকরামা, মুজাহিদ ও আতা নয়টি মোজেজার তালিকা প্রণয়ন করেছেন এভাবে— প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত, লাঠি, শুভ্র ও আলোকজ্জ্বল হাত, দুর্ভিক্ষ ও অজন্মা। এছাড়া আরো নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিলো হজরত মুসার মাধ্যমে। যেমন এক কিবতী দম্পতি রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, সকালে হয়ে গিয়েছিলো পাথর। আর এক মহিলাও রুটি তৈরী করতে করতে পরিণত হয়েছিলো পাথরে। সম্ভবতঃ হজরত মুসার বদদোয়ার কারণেই এরকম ঘটেছিলো। তাই এই ঘটনা দু'টোসহ সমুদ্র-সলিল বিভক্ত হওয়া ও তুর পাহাড় বনী ইসরাইলদের মাথার উপরে তুলে ধরাকেও মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী নয়টি নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হজরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল বর্ণনা করেছেন, একবার এক ইহুদী অন্য এক ইহুদীকে বললো, চলো, মক্কা থেকে সদ্য আগত ওই নবীর কাছে যাই। সঙ্গী ইহুদীটি বললো, নবী নবী বোলো না। এ কথা তার কানে গেলে তার চার জোড়া চোখ হয়ে যাবে। দু'জনে উপস্থিত হলো রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। জানতে চাইলো, মুসা নবীর নয়টি নিদর্শন সম্পর্কে। রসুল স. বললেন, তাঁর নয়টি নিদর্শন ছিলো এরকম— ১. আল্লাহ্র সঙ্গে শিরিক কোরো না ২. চুরি কোরো না ৩. কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা, বিদ্রোহ অথবা অন্য কোনো অপবাদ দিয়ে বিচারকের কাছে নিয়ে যেয়ো না ৪. ব্যভিচার কোরো না ৫. অবৈধভাবে রক্তপাত ঘটিয়ো না ৬. যাদু কোরো না ৭. সুদ খেয়ো না ৮. সাধ্বী রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ো না এবং ৯. জেহাদ থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কোরো না। আরো শোনো, তোমাদের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ ছিলো শনিবারের সম্মান রক্ষা করা। একথা শুনেই ইহুদীদ্বয় রসুল স.এর হস্ত ও পবিত্র পদযুগল চুম্বন করলো। আবেগে আকুল হয়ে বলে উঠলো, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি— আপনি সত্যিকারের রসুল। তিনি স. বললেন, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করছো না কেনো? তারা বললো, হজরত দাউদ তাঁর প্রভুপ্রতিপালকের কাছে এই মর্মে দোয়া করেছিলেন, যেনো পরবর্তী সময়ের সকল নবী-রসুল তাঁর বংশ থেকেই আবির্ভূত হয়। তাই এই বিশ্বাসটি আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে যে, তাঁর বংশ ছাড়া অন্য কোনো বংশ থেকে কোনো নবী আবির্ভূত হবেন না। আমরা যদি আপনার অনুসরন করি তাহলে সম্প্রদায়ের লোকেরা বধ করবে আমাদেরকে। আবু দাউদ,

নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম। বর্ণনাটিকে উত্তমসূত্রবিশিষ্ট এবং বিশুদ্ধসূত্রবিশিষ্ট বলেছেন যথাক্রমে তিরমিজি ও হাকেম। হাকেম আরো মন্তব্য করেছেন, বর্ণনাটির সূত্র পরম্পরাকে ত্রুটিযুক্ত বলার কোনো অবকাশ নেই। বাগবীর বর্ণনায় ঘটনাটি এসেছে এভাবে— একবার এক ইহুদী তার সঙ্গীকে বললো, চলো ওই নবীর কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করি। সঙ্গীটি বললো, খবরদার! তাকে নবী বোলো না। একথা শুনতে পেলেই সে হয়ে যাবে চার চক্ষুবিশিষ্ট। একথা বলেই তারা হাজির হলো রসুল স. এর দরবারে। বললো, নয়টি জ্বলন্ত নিদর্শন সম্পর্কে আপনি কী জানেন? এর পরের বিবরণ পূর্বের বর্ণনার অনুরূপ। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে যে নয়টি নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে, তা বর্ণিত বর্ণনা দু'টোতে উল্লেখিত নয়টি নিদর্শন নয়। বরং ইহুদীদেরকে সদুপদেশ প্রদান করার নিমিত্তেই রসুল স. তাদেরকে ওরকমভাবে জবাব দিয়েছিলেন। তাছাড়া শনিবারের মৎস্য শিকারের নিষেধাজ্ঞাও নয়টি নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন সে তাদের নিকটে এসেছিলো; ফেরাউন তাকে বলেছিলো, হে মুসা! তুমি তো যাদুগ্রস্ত।' এখানে 'ফাস্আল' শব্দটির দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে হজরত মুসাকে। 'সুনান' গ্রন্থে সাঈদ ইবনে মানসুর এবং 'আজজুহুদ' গ্রন্থে ইমাম আহমদ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. 'ফাসআল' কথাটিকে অতীতকালবোধক শব্দরূপে পড়তেন 'ফাসাআলা'। অথবা এখানকার সম্বোধনটি করা হয়েছে রসুল স. এর প্রতি— এরকমও বলা যেতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি বনী ইসরাইলদেরকে ওই ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করুন, যা সংঘটিত হয়েছিলো ফেরাউন ও নবী মুসার মধ্যে। আর ওই নয়টি নিদর্শন সম্পর্কেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। এতে করে মক্কার মুশরিকেরা আপনার নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারবে। এছাড়া আপনি নিজেও এভাবে সান্ত্বনা পেতে পারবেন যে, বনী ইসরাইলেরা আপনাকে সত্য নবী হিসেবে জেনেও কেবল বিদ্বেষবশতঃ আপনাকে অস্বীকার করে চলেছে। পূর্ববর্তী উম্মতেরাও তাদের আপনাপন নবীকে এভাবে সত্য জেনেও প্রত্যাখ্যান করেছিলো। এটাও হবে আপনার আর একটি সান্ত্বনা। কিংবা কথাটিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় যে— হে আমার রসুল! বনী ইসরাইলদের নিকটে জিজ্ঞেস করে ওই নয়টি নিদর্শন সম্পর্কে জেনে নিন, যাতে করে আপনি তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। এরকম ব্যাখ্যাকে মেনে নিলে বলতে হয়, এখানকার 'ইজ জ্বাআহুম' (যখন তাদের নিকট এলো) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে 'আয়াতিনা' (নিদর্শনসমূহ) কথাটির সঙ্গে। এভাবে এর পরের বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— ফেরাউনকে যখন হজরত মুসা সত্য ধর্মের প্রতি

আহ্বান জানালেন, তখন সে গর্বভরে বললো, হে মুসা! তুমি যে এক অসম্ভব দাবি করে বসলে। সুস্থ-মস্তিষ্কধারী কোনো ব্যক্তি কখনো এভাবে কথা বলতে পারে না। আমি তো দেখছি, তুমি মানসিক ভারসাম্যহীন, যাদুগ্রস্ত। কালাবী বলেছেন, 'মাসহুরা' অর্থ সত্যত্যাগী হওয়া। ফার্‌রা এবং আবু উবায়দা বলেছেন, শব্দটির অর্থ— যাদুকর। মোহাম্মদ বিন জারীর বলেছেন, যাদুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। যদি তাই হয়, তবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে মুসা তোমাকে যাদু শিখিয়ে দেয়া হয়েছে, তাই তুমি এরকম উদ্ভট কথা বলে বেড়াচ্ছো। এসব যাদুর প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়।

পরের আয়াতে (১০২) বলা হয়েছে— 'মুসা বলেছিলো, তুমি অবশ্যই অবগত আছো যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। হে ফেরাউন! আমি তো দেখছি তুমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছো।'

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরাউন ভালোভাবেই জানতো যে হজরত মুসা যা বলেন, তা ঠিকই বলেন। কিন্তু দম্ভ ও বিদ্বেষবশতঃ সে তাঁকে অস্বীকার করতো। কোরআন মজীদেও একথার প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেন— 'তারা নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা বিশ্বাস করে।'

এখানকার 'বাসাইর' শব্দটি 'বাসীরত' এর বহুবচন। এর অর্থ প্রত্যক্ষ বা দৃষ্টিগ্রাহ্য। শব্দটির মাধ্যমে এখানে স্পষ্ট নিদর্শন সমূহকে বলা হয়েছে— প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

'মাছবূরা' অর্থ অভিশপ্ত। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— ধ্বংসপ্রাপ্ত। কাতাদা বলেছেন— ধ্বংসকৃত। ফার্‌রা বলেছেন, আরববাসীরা বলে— 'মা ছাবরাকা আন হাজা' (কোন্ বিষয় তোমাকে এ কর্ম থেকে বিরত রেখেছে)। এমতাবস্থায় 'মাছবূরা' অর্থ হবে— জন্মগতভাবে খারাপ স্বভাববিশিষ্ট শক্তি। ফেরাউনের স্বভাব ছিলো এরকম। তাই সে হজরত মুসাকেও খারাপ ভেবেছিলো। যে নিজে মন্দ, সে অন্যকে ভালো ভাবতে পারে না। পক্ষান্তরে হজরত মুসা জন্মগতভাবে ছিলেন পুণ্যবান। তাই তাঁর বক্তব্য ছিলো সুসঙ্গত, সুন্দর ও কল্যাণকর।

এর পরের আয়াতে (১০৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর ফেরাউন তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবার সংকল্প করলো, তখন আমি ফেরাউন ও তার সঙ্গীগণ সকলকে নিমজ্জিত করলাম।'

'আন্ ইয়াস্তাফিয্যাহুম' অর্থ উচ্ছেদ করবার সংকল্প করলো। অর্থাৎ ফেরাউন হুকুম দিলো— মুসা ও তাঁর সম্প্রদায়কে উৎখাত করো। 'আলআরদ্ব' কথাটির অর্থ এখানে মিসর রাজ্য। সমগ্র মিসর থেকেই বনী ইসরাইলদের হত্যা অথবা বহিষ্কারের মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত করবার সংকল্প করেছিলো ফেরাউন। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তার ওই ঘৃণ্য অভিলাষ পূরণ করার সুযোগ দেননি। তাকে এবং তার সকল অনুসারীকে দান করেছিলেন সলিল-সমাধি। তাই শেষে বলা হয়েছে— আমি ফেরাউন ও তার সকল অনুসারীকে নিমজ্জিত করলাম। করলাম সমূলে উৎপাটিত।

শেষোক্ত আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— 'এরপর আমি বনী ইসরাইলকে বললাম, তোমরা এই দেশে বসবাস করো এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্রিত করে উপস্থিত করবো।' একথার অর্থ— এরপর আমি বনী ইসরাইলদেরকে ওই দেশেই প্রতিষ্ঠিত করলাম, যেখান থেকে ফেরাউন তাদেরকে উৎখাত করতে চেয়েছিলো এবং আমার প্রিয় নবী মুসার মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দিলাম, তোমরা এই দেশেই বসবাস করো। আর মহাপ্রলয়ের পর মহাবিচারের দিবসে হাশর প্রান্তরে আমি তোমাদেরকে ও তোমাদের শত্রুদেরকে হিসাব গ্রহণের জন্য অবশ্যই একত্র করবো।

এখানে'আলআখিরাতি' অর্থ দ্বিতীয়বার বা কিয়ামতের পর।

'লাফীফা' অর্থ একত্রিত করে, সম্মিলিতভাবে। উল্লেখ্য যে, মহাবিচারের দিবসে পাপী-পুণ্যবান সকল মানুষকে এক স্থানে সমবেত করা হবে। তারপর বিচারের মাধ্যমে চিরদিনের জন্য পৃথক করে ফেলা হবে পুণ্যবান ও পাপীদেরকে। কালাবী বলেছেন, এখানে কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি অর্থ হজরত ঈসার আসমান থেকে অবতরণ। যদি তাই হয়, তবে 'জি'নাবিকুম লাফীফা' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— এদিক ওদিক চতুর্দিক থেকে তখন বিভিন্ন সম্প্রদায় আগমন করবে।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۘ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ۝ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ وَّيَقُوْلُوْنَ

سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۝ (السجدة . [illegible])

❐ আমি সত্য-সহই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং উহা সত্যসহই অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি।

❐ আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি খণ্ড খণ্ডভাবে যাহাতে তুমি উহা মানুষের নিকট পাঠ করিতে পার ক্রমে ক্রমে; এবং আমি উহা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করিয়াছি।

❐ বল, 'তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর, যাহাদিগকে ইহার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগের নিকট যখন ইহা পাঠ করা হয় তখনই তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়ে

❐ ও বলে; আমাদিগের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদিগের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হইয়াই থাকে।

❐ এবং তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে এবং ইহা উহাদিগের বিনয় বৃদ্ধি করে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আমি আপনার উপরে কোরআন অবতীর্ণ করেছি সত্য সহকারে এবং অবশ্যই সত্য পদ্ধতিতে। আর আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি কেবল জান্নাতের ও আমার সন্তুষ্টির শুভ সংবাদদাতা এবং জাহান্নাম ও আমার অসন্তুষ্টির ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে। মনে রাখবেন, কাউকে জোর করে হেদায়েত করা আপনার কাজ নয়।

এখানে 'হাক্ব' (সত্য) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে দু'বার। প্রথমটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে প্রজ্ঞা, উপযোগিতা ও প্রয়োজনের কথা। আর দ্বিতীয়টির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে কোরআনের অভ্যন্তরীণ ও চিরন্তন মহাসত্যের কথা। কোনো কোনো তাফসীরকার আবার 'সত্য' কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি সর্বোচ্চ সতর্কতা সহকারে, অসংখ্য ফেরেশতাদের অতন্দ্র প্রহরার মাধ্যমে, যাতে করে শয়তানের কুমন্ত্রণার দূরবর্তী কোনো প্রভাবও না থাকে।

পরের আয়াতে (১০৬) বলা হয়েছে— 'আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি খণ্ডখণ্ড ভাবে যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পারো ক্রমে ক্রমে এবং আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি

আপনার প্রতি একযোগে কোরআন অবতীর্ণ করিনি, অবতীর্ণ করেছি বিরতি সহকারে কিছু কিছু করে, বিশ বছর ধরে। এরকম করার কারণ এই যে, এতে আপনি ধীরে ধীরে মানুষের কাছে এর খণ্ড খণ্ড পাঠ বোধগম্য করে তুলতে পারেন। আর কোরআন স্মৃতিবদ্ধ করার কাজও এতে করে সহজ হয়। উল্লেখ্য যে, হেরা গিরিগহ্বরে রসুল স. এর নিকটে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় সুরা আলাকের পাঁচটি আয়াত। অতঃপর তিন বছর ওহী বন্ধ থাকে। এই তিন বছর বাদ দিলে রসুল স. এর মহাতিরোধান পর্যন্ত ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়সীমা বিশ বছরই হয়।

এখানে 'ফারাক্বনাহু' অর্থ অল্প অল্প করে, খণ্ড খণ্ড ভাবে বিরতি সহকারে। হাসান বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ— সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণ করে। 'মুকছিন' অর্থ ক্রমে ক্রমে, অবকাশ সহকারে।

এর পরের আয়াতে (১০৭) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা কোরআনে বিশ্বাস করো অথবা বিশ্বাস না করো, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এই কোরআন পাঠ করা হয়, তখনই তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিন যে, তোমাদের বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাসের কারণে কোরআনের কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। কোরআন তো স্বয়ংসম্পূর্ণ মুখাপেক্ষিতারহিত আল্লাহ্র কালাম। আনুরূপ্যবিহীন এই বাণীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলে লাভবান হবে তোমরাই। বিশ্বাস না করলে তোমরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। এতে করে কোরআনের কোনো কিছু যাবে আসবে না। তোমরা কোরআনকে প্রত্যাখ্যান করলেও নিশ্চিতরূপে জেনে রেখো যে, অনেক মানুষ কোরআনের উপরে ইমান আনবে। তারাই প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী। তারা আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করলে ভক্তিভরে সেজদাবনত হয়।

এখানে 'যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে পূর্ববর্তী জামানার আহলে কিতাবের সত্যাশ্রয়ী আলেমগণকে। তাঁরা আল্লাহ্র কালামের মর্যাদা সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তাই তাঁরা পেয়েছিলেন সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণায়ক জ্ঞান। শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কেও তারা পূর্ববর্তী কিতাবের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের জ্ঞানীগণ রসুল স. এর নবুয়তের সংবাদ জানার সঙ্গে সঙ্গে ইমান এনেছিলেন। ওই সকল সত্যান্বেষী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, হজরত জায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল, হজরত সালমান ফারসী, হজরত আবু জর গিফারী প্রমুখ।

এ রকমও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাসানো হয়নি। বরং এখানে রসুল স.কে এইমর্মে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে— হে আমার প্রিয় রসুল! ওই সকল মূর্খদের ব্যাপারে

আপনি চিন্তান্বিত হবেন না। কেনো হবেন? তারা তো চিরভ্রষ্ট। আরো দেখুন, তারা ইমান আনেনি সত্য। কিন্তু যারা জ্ঞানী তারাতো ইমান এনেছে। সুতরাং আপনি চিরভ্রষ্টদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করবেন না।

'তাদের নিকট যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখনই তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে' কথাটির অর্থ— কোরআনে বিঘোষিত আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এবং কোরআনের মতো মহাকল্যাণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তারা ভূলুণ্ঠিত হয়ে জানায় সেজদা। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন।

এর পরের আয়াতে (১০৮) বলা হয়েছে— 'এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে।' একথার অর্থ— এবং ওই সকল সেজদাকারী একথাও বলে যে, হে আমাদের প্রভুপালক! প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা থেকে তুমি পবিত্র, মহান । পূর্ববর্তী নবী রসুলগণের মাধ্যমে তুমি শেষ রসুল প্রেরণ ও কোরআন অবতরণের শুভ সংবাদ দিয়েছিলে। তোমার সেই পবিত্র প্রতিশ্রুতি আজ পূর্ণ হলো।

শেষোক্ত আয়াতে (১০৯) বলা হয়েছে— 'এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।' উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী আয়াতের (১০৭) মতো এই আয়াতেও ব্যবহৃত হয়েছে 'ইয়াখিররূনা' কথাটি। দু'টো শব্দের অর্থই— সেজদায় লুটিয়ে পড়া। কিন্তু সেজদায় লুটিয়ে পড়ার কারণ এখানে ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমোক্ত সেজদা ছিলো কৃতজ্ঞতাপ্রকাশক। আর দ্বিতীয় সেজদা হচ্ছে কোরআন পাঠের প্রতিক্রিয়াপ্রকাশক। অর্থাৎ কোরআনের বাণী শ্রবণের ফলে পাঠক ও শ্রোতার অন্তরে প্রবলতর হয় বিশ্বাস, জ্ঞান ও বিনয়।

নির্দেশনাঃ এই আয়াত যাঁরা আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সেজদা করে নিবেন।

মাসআলাঃ কোরআনের বাণী শ্রবণের সময় ক্রন্দন করা মোস্তাহাব। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র ভয়ে যে কাঁদে, সে কখনো দোজখে প্রবেশ করবে না, দুগ্ধ স্তনে প্রবেশ করলেও (স্তন থেকে বের হয়ে আসা দুধের যেমন স্তনে পুনঃ প্রবেশ অসম্ভব, আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারীরও তেমনি দোজখে প্রবেশ অসম্ভব) এবং আল্লাহ্র পথে যে ধূলি ধূসরিত হয়েছে, জাহান্নামের ধোঁয়া তার নাকে প্রবেশ করবে না (আল্লাহ্র রাস্তার ধূলা যার শরীরে লেগেছে, তার নাসিকারন্ধ্রে কখনো প্রবেশ করবে না জাহান্নামের ধুম্র)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বাগবী ও হাকেম। হাকেম বলেছেন হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। বায়হাকী কর্তৃকও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনাটি এরকম— আল্লাহ্ দুই শ্রেণীর চোখের জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিয়েছেন— ১. ওই

চোখ যা আল্লাহ্র ভয়ে রোদন করে ২. ওই নয়ন, যা রাতভর জাগ্রত থেকে হেফাজত করে ইসলাম ও মুসলমানকে। হজরত হাকিম বিন হিশাম বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে একথা বলতে শুনেছি যে, তিন ধরনের চোখের জন্য দোজখাগ্নি নিষিদ্ধ— ১. ওই অক্ষিযুগল, যা আল্লাহ্র ভয়ে রোদনার্ত হয় ২. ওই অক্ষিযুগল, যা জাগ্রত থাকে আল্লাহ্র পথে ৩. ওই যুগল নয়ন, যা বিরত থাকে আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত দৃশ্যসমূহ দর্শন থেকে।

হজরত আবু রায়হানা থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই চোখের প্রতি আগুন হারাম, যে চোখ আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে, ওই চোখের প্রতিও, যে চোখ জাগে আল্লাহ্র রাস্তায় এবং ওই চোখের প্রতিও, যে চোখ আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম ঘোষিত বস্তু দর্শন থেকে থাকে বিরত। এই হাদিসটি তিবরানী লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর আল কবির গ্রন্থে এবং মন্তব্য করেছেন, বর্ণনাটি যথাসূত্রসম্ভূত।

হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে বিশ্বাসীর নয়ন থেকে আল্লাহ্র ভয়ে অশ্রুনির্গত হয় এবং সে অশ্রুর পরিমাণ যদি মক্ষিকার মস্তকের মতো যৎকিঞ্চিতও হয়, তবুও তার জন্য আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন দোজখের অগ্নিকে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা, ইবনে মারদুবিয়া প্রমুখ উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একদিন নামাজ সমাপনের পর দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! হে রহমান! অংশীবাদীরা একথা শুনতে পেয়ে বললো, দেখো, দেখো। মোহাম্মদ আমাদেরকে একাধিক উপাস্যের উপাসনা নিষেধ করে। এখন আবার সে-ই দুই উপাস্যকে ডাকছে। একবার বলছে আল্লাহ্, আরেক বার বলছে রহমান। তাদের এমতো অপবচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১১০, ১১১

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ○ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ○

❒ বল, "তোমরা 'আল্লাহ্' নামে আহ্বান কর বা 'রহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর তাঁহার সকল নামই তো সুন্দর। সালাতে স্বর উচ্চ করিও না এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না, এই দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।"

❑ বল, 'প্রশংসা আল্লাহেরই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার সার্বভৌমিকত্বে কোন অংশী নাই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে কারণে তাঁহার অভিভাবকের প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আল্লাহ্ নামে আহ্বান করো বা রহমান নামে আহ্বান করো, তাঁর সকল নামই সুন্দর।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি সকলকে একথা জানিয়ে দিন যে, আল্লাহ্তায়ালার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। 'রহমান' নামটিও ওই সুন্দর নামসমূহের একটি । সুতরাং 'রহমান' নামে তাকে সম্বোধন করাতে দোষের কিছু নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, মক্কাবাসের সময় রসুল স. একদিন নামাজ পাঠের সময় সেজদাবনত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! হে রহমান! আবু জেহেল একথা শুনে বললো, দেখো, মোহাম্মদ একাধিক মাবুদকে ডাকতে নিষেধ করে। অথচ সে নিজেই দুই মাবুদের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। তার একথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। এখানে পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালার জাত বা সত্তা একক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু তাঁর আরো অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। ওই সুন্দর নামসমূহের যে কোনো একটি অথবা একাধিক নাম ধরে তাঁকে ডাকা যেতে পারে। এতে আপত্তির কিছুই নেই।

এখানে 'আও' (অথবা) শব্দটির মাধ্যমে এইমর্মে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্কে আল্লাহ্ অথবা রহমান কিংবা তাঁর অন্য যে কোনো এক বা একাধিক নাম ধরে আহ্বান করার অনুমতি রয়েছে। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, ইহুদীরা একবার রসুল স.কে 'রহমান' উচ্চারণ করতে শুনে বলেছিলো, তওরাত শরীফের বহু স্থানে তো এই নামের উল্লেখ রয়েছে। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। এমতাবস্থায় আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্র সকল নামই অত্যুত্তম। এ সকল নামের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর সিফাতে জালাল ও সিফাতে জামালের। একথাও প্রকাশ পায় যে, তিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র ও চির অমুখাপেক্ষী। স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্র সুন্দর নামাবলী বা আসমাউল হুসনা সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছি সুরা আ'রাফের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সালাতে স্বর উচ্চ কোরো না এবং অতিশয় ক্ষীণও কোরো না, এই দু'য়ের মধ্যপথ অবলম্বন করো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! নামাজে আপনি যখন কোরআন পাঠ করেন, তখন এতো উচ্চস্বরে পড়বেন না, যাতে দূরবর্তী মুশরিকেরা শুনতে পায়, আবার এতো নিম্নস্বরে পড়বেন না যাতে আপনার অনুগামী নামাজীরা শুনতে না পায়। আপনি বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পথকে গ্রহণ করুন। পরিহার করুন বাহুল্য ও ন্যূনতাকে।

এখানে 'আস্‌সালাত' বলে বুঝানো হয়েছে রাতের নামাজসমূহকে। অর্থাৎ মাগরিব, ইশা, ও তাহাজ্জুদকে। কেননা দিনের নামাজে— জোহর ও আসরে সর্বসম্মতিক্রমে কোরআন পাঠ করতে হয় ন্যূনতম আওয়াজে। উম্মতের সকল প্রখ্যাত আলেমও এই নিয়ম অনুসরণ করে এসেছেন। আলোচ্য বাক্যের অর্থ এরকমও হতে পারে যে— হে আমার রসুল! আপনি দিনের নামাজে এবং অংশীবাদীরা শুনতে পায় এমন স্থানে ক্বেরাত পাঠ করুন ন্যূনতম শব্দে এবং রাতের নামাজে ক্বেরাত পাঠ করুন সশব্দে।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে বোখারীর পদ্ধতিতে আবু বশীরের মধ্যস্থতায় বাগবী উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. যখন মক্কায় ছিলেন, তখন নামাজ পড়তেন উচ্চস্বরে। মুশরিকেরা তা শুনতো এবং কোরআন অবতীর্ণকারী এবং যার উপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে উভয়ের প্রতি গালি বর্ষণ করতো। তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন— 'এবং নামাজে স্বর উচ্চ কোরো না এবং অতিশয় ক্ষীণও কোরো না, এই দুই এর মধ্যবর্তী করো।' এর অর্থ— হে আমার রসুল ! আপনি এতো উচ্চকণ্ঠে নামাজ পাঠ করবেন না, যাতে মুশরিকেরা শুনে গালমন্দ করার সুযোগ পায়, আবার, এমন নিম্নকণ্ঠও হবেন না যাতে আপনার সাথীরাও শুনতে না পায়। আপনি বরং মধ্যম কণ্ঠে কোরআন পাঠ করুন যাতে মুশরিকেরা না শোনে এবং আপনার সাথীরা শোনে। বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'সালাত' বা নামাজ কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে দোয়া বা প্রার্থনাকে। জননী আয়েশা, ইব্রাহিম নাখয়ী, মুজাহিদ ও মাকহুল এই অভিমতের প্রবক্তা। বোখারী লিখেছেন, জননী আয়েশা আলোচ্য আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে দোয়া সম্পর্কে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীরও এরকম লিখেছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত বর্ণনাই অধিকতর দৃঢ়সূত্রসম্বলিত। ইমাম নববীও এমতের সমর্থক। শায়েখ ইবনে হাজার আবার উভয় বর্ণনার সামঞ্জস্য সাধনার্থে লিখেছেন, সম্ভবতঃ নামাজের অভ্যন্তরে পঠিত দোয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, রসুল স. কাবা প্রাঙ্গণে নামাজ পাঠকালে উচ্চকণ্ঠে দোয়া করতেন। তখন অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। আমি বলি, সামঞ্জস্য সাধনের এমতো প্রচেষ্টা আমার মনঃপুত নয়। কারণ নামাজের অভ্যন্তরে পাঠযোগ্য দোয়াগুলো, যেমন— দোয়া মাছুরা ইত্যাদি ফরজ, নফল সকল নামাজেই পাঠ করতে হয় ন্যূনতম কণ্ঠে। কেবল দোয়া কুনুত সম্পর্কে উচ্চস্বরে ও নিম্নস্বরে পড়ার ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। তাছাড়া দোয়া সম্পর্কে এক আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে— 'তোমরা তোমাদের প্রভুপালককে ডাকো বিনীতভাবে, নিম্নস্বরে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না।' এতে করে প্রমাণিত হয় যে, নামাজের ভিতরের ও বাইরের

সকল দোয়া পাঠ করতে হবে নিম্নকণ্ঠে। অতএব এক্ষেত্রে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা না করাই উত্তম। সামঞ্জস্যের বিষয়টিকে যদি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয় তবে বলা যেতে পারে যে, জননী আয়েশা ও হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় উল্লেখিত দোয়ার অর্থ সুরা ফাতিহা। কারণ সুরা ফাতিহার শেষাংশ (ইহ্‌দিনাস সিরাতুল মুসতাক্বীম থেকে শেষ পর্যন্ত) তো দোয়াই।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে আরো দু'টো বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু বর্ণনা দু'টো বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত বর্ণনার পরিপন্থী। (যেমন— ১. ইবনে জারীর ও হাকেম লিখেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, 'আল্লাহুম্মার হামনী' (হে আল্লাহ্! আমার প্রতি রহম করো) —এই দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে— 'সালাতে স্বর উচ্চ কোরো না এবং অতিশয় উচ্চ কোরো না।' ২. বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ বলেছেন, বনী তামীম গোত্রের এক লোক রসুল স. এর সালামের জবাবে অত্যন্ত উচ্চস্বরে বলতো, হে আল্লাহ্ আমাদেরকে সম্পদ ও সন্তানদান করো। তার ওই কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতাংশটি। — এই বর্ণনা দু'টো গ্রহণীয় নয়।

তিরমিজির মাধ্যমে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন রিবাহ্ আনসারী বলেছেন, রসুল স. একবার আবু বকরকে বললেন, আমি সেদিন দেখলাম, তুমি নিঃশব্দে কোরআন পাঠ করছো। আবু বকর বললেন, আমি যাকে শোনাতে চাই তিনি তো নিম্নস্বরের পাঠও শোনেন। রসুল স. বললেন, আওয়াজ আর একটু উচ্চ কোরো। এরপর তিনি স. ওমরকে বললেন, আর তুমি তো কোরআন পাঠের ব্যাপারে উচ্চকণ্ঠ। ওমর বললেন, ঘুমন্ত মানুষকে জাগ্রত করা এবং শয়তান বিতাড়নই আমার উদ্দেশ্য। রসুল স. বললেন, আর একটু নিম্নকণ্ঠ হয়ো। হজরত আবু কাতাদা থেকে আবু দাউদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। আমি সুরা আ'রাফের যথাস্থানে উচ্চস্বর ও নিম্নস্বরে কোরআন পাঠ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি।

রসুল স. এর ক্বেরাতের স্বরূপঃ হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. কোরআন পাঠ করতেন কখনো উচ্চস্বরে, আবার কখনো নিম্নস্বরে। আবু দাউদ।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তাঁর প্রকোষ্ঠে কোরআন পাঠ করলে গৃহবাসীরা সে পাঠ শুনতে পেতেন। আবু দাউদ।

জননী উম্মে সালমা রসুল স. এর মতো করে কোরআন পাঠ করে শুনিয়েছেন। তাঁর পাঠ শুনে বোঝা যেতো, রসুল স. পাঠ করতেন থেমে থেমে, প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ।

হজরত উম্মে হানী বর্ণনা করেছেন, আমি নিজ গৃহ থেকে শুনতে পেতাম রসুল স. এর কোরআন পাঠের আওয়াজ। তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস বলেছেন, আমি জননী আয়েশাকে একবার রসুল স. এর ক্বেরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বললাম, হে উম্মত জননী! রসুল স. কীভাবে কোরআন পাঠ করতেন? উচ্চ আওয়াজে, না নিম্নকণ্ঠে? জননী বললেন, দু'ভাবেই। কখনো উচ্চ কণ্ঠে, আবার কখনো অনুচ্চ আওয়াজে। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ, উত্তম ও দুর্লভ।

শেষ আয়াতে (১১১) বলা হয়েছে— 'বলো, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো অংশী নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।' এখানে 'আলমুল্‌ক' অর্থ সার্বভৌমত্ব, নিরঙ্কুশ প্রভুপালকত্ব। 'মুজিল্‌লাতুন' অর্থ দুর্দশাগ্রস্ত। আর 'ওয়ালী' অর্থ অভিভাবক বা সাহায্যকারী। এভাবে আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টরূপে আল্লাহ্‌র সন্তান গ্রহণ, অন্য কারো সাহায্য গ্রহণ ও প্রভুপালকত্বের ব্যাপারে অন্য কারো অংশীদারিত্বকে নাকচ করে দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় একথাটি সুপ্রমাণিত হয়েছে যে, যেহেতু তিনি অসহায়ত্ব, দুর্দশা ও সন্তান কিংবা অভিভাবকত্ব গ্রহণ থেকে চিরপবিত্র ও চিরঅমুখাপেক্ষী, তাই তিনিই একমাত্র প্রশংসার পাত্র, অন্য কেউ নয়।

ইমাম আহমদ তাঁর মসনদে তিবরানীর উত্তম সূত্র পরম্পরায় হজরত মুয়াজ জুহ্নী থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের নাম 'আয়াতে ইজ্জত' (মহাসম্মানিত আয়াত)। এই আয়াতের মাধ্যমে সকলকে এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, বান্দা যতো বেশী আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করুক এবং ইবাদত করুক না কেনো, তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সে আল্লাহ্‌র যথার্থ ও উপযুক্ত প্রশংসা ও ইবাদত করতে অক্ষম।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে ওই সকল লোককে সর্বপ্রথম জান্নাতের দিকে আহ্বান করা হবে, যারা সুখ দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র অত্যধিক প্রশংসা বর্ণনা করে। তিবরানী, বায়হাকী, হাকেম।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হামদ ও শোকর (প্রশংসা বর্ণনা ও কৃতজ্ঞতা) হচ্ছে ইবাদতের সর্বোচ্চ শিখর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশস্তি বর্ণনা করে না, সে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে না। বায়হাকী ও আবদুর রাজ্জাক কর্তৃকও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সর্বোৎকৃষ্ট দোয়া হচ্ছে, আলহামদু লিল্লাহ্ আর সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির হচ্ছে— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র কাছে চারটি বাক্য সব চেয়ে বেশী প্রিয়— ১. লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ২. সুবহানাল্লহ্ ৩. আলহামদুলিল্লাহ্ এবং ৪. আল্লাহু আকবর। এইবাক্য চতুষ্টয় যে কোনো খান থেকে শুরু করা যায় (ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অত্যাবশ্যক নয়)। বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম ও আহমদ। বাগবী এই প্রসঙ্গে উপরে বর্ণিত চারটি হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে। তাঁর নিকট থেকে আবার তিবরানী উল্লেখ করেছেন, মহাবিচারের দিবসে ওই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান হবে, যে অত্যধিক পরিমাণে বর্ণনা করে আল্লাহ্‌র স্তব-স্তুতি।

হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, বান্দার 'সুবহানাল্লাহ্' ও 'আলহামদুলিল্লাহ্' পাঠ আল্লাহ্‌র নিকটে খুবই প্রিয়। আহমদ, মুসলিম।

হজরত আনাস বলেছেন, আবদুল মুত্তালিবের পৌত্রের মুখে সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়— আলহামদুলিল্লাহিল্ লাজী লাম ইয়াত্তাখিজু ওয়ালাদা (প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি)। এই হাদিসটি ইবনে সুন্নী বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি' নামক গ্রন্থে। আর আমর বিন শোয়াইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আবার আমর বিন শোয়াইবের পিতামহ থেকে আপন আপন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আবুদর রাজ্জাক ও ইবনে আবী শায়বাও।

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন ওয়াসল্লাল্লাহু আ'লা খইরি খলকিহী মোহাম্মদিউঁ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন। আমিন। সূরা বানী ইসরাইলের তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ ৩রা রমজান, ১২০৩ হিজরী সনে।

সূরা কাহ্‌ফ

সুরা কাহ্‌ফ অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কিন্তু ১১০ আয়াত ও ১২ রুকু সম্বলিত এই সুরার ২৮ সংখ্যক এবং ৮৩ থেকে ১০১ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। আর সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে সুরা গাশিয়া'র পরে।

জনৈক মিসরী শায়েখের বরাত দিয়ে ইকরামা সূত্রে ইসহাকের মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কুরায়েশ গোত্রাধিনায়কেরা একবার নজর বিন হারেছ এবং উকবা বিন আবী মুয়ীতকে মদীনার ইহুদী আলেমদের কাছে পাঠালো। তাদেরকে বলে দিলো, তোমরা ইহুদী পণ্ডিতদেরকে মোহাম্মদ ও তার কথাবার্তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখো। তারা গ্রন্থধারী। তাই তারা মোহাম্মদ সম্পর্কে সঠিক তথ্য বলতে পারবে। তারা যা বলে তা শুনে এসে তোমরা আমাদেরকে জানিয়ো। নজর ও উকবা পৌঁছে গেলো

মদীনায়। রসুল স. সম্পর্কে সব কথা তারা খুলে বললো ইহুদী পণ্ডিতদের নিকট। পণ্ডিতেরা বললো, তোমরা তাকে এই তিনটি প্রশ্ন কোরো। প্রশ্ন তিনটির জবাব দিতে পারলে, মনে করবে তিনি সত্য নবী। আর জবাব দিতে না পারলে মনে করবে, সে ভণ্ড। প্রশ্ন তিনটি এই— ১. অতীত যুগের ওই সকল যুবক কারা, যারা পৃথিবীতে ঘটিয়েছিলো একটি অসাধারণ ঘটনা। ২. ওই ব্যক্তির পরিচয় কী, যে পরিভ্রমণ করেছিলো পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত। ৩. রূহ কী ?

নজর ও উকবা ফিরে এলো মক্কায়। গোত্রাধিনায়কদের বললো, এবার তবে মোহাম্মদের সঙ্গে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হয়েই যাক। তোমরা তাঁকে এই তিনটি প্রশ্ন করে দেখো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হলেন রসুল স. স্বয়ং। তারা তখন একে একে রসুল স.কে বর্ণিত প্রশ্ন তিনটি করলো। রসুল স. বললেন, তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবো আমি আগামীকাল। কিন্তু একথার সঙ্গে তিনি স. ইনশা আল্লাহ্ (আল্লাহ্ যদি চান) কথাটি উচ্চারণ করলেন না। পরিণতি হলো এই যে, একাধারে পনেরো দিন পর্যন্ত হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হলেন না। অবতীর্ণ হলো না কোনো প্রত্যাদেশও। রসুল স. বড়ই পেরেশান হয়ে পড়লেন। অংশীবাদিরা করতে লাগলো নানা রকম অপমন্তব্য। এমতাবস্থায় সুরা কাহ্ফ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন হজরত জিবরাইল। এতে সন্নিবেশিত করা হলো অংশীবাদিদের প্রশ্নত্রয়ের উত্তর। সেই সঙ্গে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা হলো অংশীবাদিদেরকে।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۙ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۙ وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۝ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝

❐ প্রশংসা আল্লাহেরই যিনি তাঁহার দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং ইহাতে তিনি অসংগতি রাখেন নাই;

❐ ইহাকে করিয়াছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁহার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিবার জন্য এবং বিশ্বাসিগণ, যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগকে এই সুসংবাদ দিবার জন্য যে তাহাদিগের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার,

❐ যাহাতে তাহারা হইবে চিরস্থায়ী,

❐ এবং সতর্ক করিবার জন্য উহাদিগকে যাহারা বলে যে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন,

❐ এই বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই এবং উহাদিগের পিতৃপুরুষদিগেরও ছিল না। উহাদিগের মুখ-নিঃসৃত বাক্য কী উদ্ভট! উহারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।

❐ উহারা এই বাণী বিশ্বাস না করিলে উহাদিগের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্ম-বিনাশী হইয়া পড়িবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি তাঁর দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।' একথার অর্থ— সেই আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি তাঁর প্রিয়তম বান্দা ও রসুলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন কোরআন মজীদ। বলাবাহুল্য যে, বিশ্বমানবতার পথ প্রদর্শনার্থে রসুল স. এর প্রতি অবতীর্ণ এই আল কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুদান। এতে রয়েছে কল্যাণ। কেবলই কল্যাণ। পৃথিবীর এবং পরবর্তী পৃথিবীর। তাই এই মহাকল্যাণের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্তায়ালা এখানে নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন। এভাবে তাঁর বান্দাদেরকেও তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করতে উৎসাহিত করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এতে তিনি অসঙ্গতি রাখেননি।' এখানে 'ইওয়াজা' অর্থ অসঙ্গতি বা বক্রতা। অর্থগত অসঙ্গতির জন্য শব্দটির 'আইন' অক্ষরটি হয় যেরযুক্ত। আর বাহ্যিক অসঙ্গতির জন্য 'আইন' অক্ষরটি হয় যবরযুক্ত। যেমন বলা হয়— ফী রাইহী ইওয়াজ (তার মতামতই অসঙ্গতিপূর্ণ)। ফী আসহু আ'ওয়াজ (তার লাঠিটি অসঙ্গতিপূর্ণ বা বক্র)। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায় এরকম— কোরআন মজীদের বিবরণ প্রবাহের মধ্যে অনিষ্টকর কিছু নেই। অসম্পূর্ণতা, বিপত্তি অথবা মতভেদজনিত কোনো কিছুও এর মধ্যে নেই। এর বক্তব্য বিষয় চিরন্তন, প্রজ্ঞাময় ও যুক্তিসিদ্ধ। হজরত ইবনে আব্বাস বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্র বাণী বা কোরআন অবিনাশী, কারণ তা সৃষ্ট নয়।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত।' হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ এই কোরআনকে করেছেন সংযত, সংহত ও নমনীয়। এর বিধান সমূহকে করেছেন সহজ— কাঠিন্য ও তারল্য বিবর্জিত। ফার্‌রা বাক্যটির মর্মার্থ করেছেন এভাবে— এই কোরআন সকল আসমানী কিতাবের বিশুদ্ধতার সাক্ষী এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কোনো কোনো বিধানকে রহিতকারী। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা অর্থ করেছেন এরকম— এই কোরআন মানুষের বিভ্রমসমূহের সংশোধক।

উল্লেখ্য যে, সুসংগত হওয়া ও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয় দু'টোকে পূর্ববর্তী আয়াতে এবং আলোচ্য বাক্যে দু'টি পৃথক শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এভাবে নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে কোরআনের সঙ্গতিহীনতা ও অচিরন্তনতার সকল সম্ভাবনাকে। একই সঙ্গে এখানকার বক্তব্য বিষয়টিকে করে তোলা হয়েছে চরম গুরুত্ববহ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করবার জন্য এবং বিশ্বাসীগণও যারা সৎকর্ম করে, তাদেরকে এই সুসংবাদ দিবার জন্য যে, তাদের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার।'

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী।' একথার অর্থ— এই কোরআনের মাধ্যমে দোজখের স্থায়ী শাস্তি সম্পর্কে অবিশ্বাসীদেরকে করা হয়েছে সতর্ক এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীগণকে দেয়া হয়েছে উত্তম পুরস্কাররূপী চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ।

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এবং সতর্ক করবার জন্য তাদেরকে, যারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' উল্লেখ্য যে, 'আল্লাহ্‌র সন্তান রয়েছে' এরকম উক্তি একটি জঘন্যতম সত্যপ্রত্যাখ্যানজনিত উক্তি। তাই এখানে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এরকম অপবিত্র উক্তি উচ্চারণকারীদের সম্পর্কে। বলা হয়েছে, তাদেরকে সতর্ক করাও কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার আর একটি উদ্দেশ্য।

এর পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'এই বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিলো না। তাদের মুখনিঃসৃত বাক্য কী উদ্ভট! তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র সন্তান রয়েছে, এরকম যারা বলে, তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা না জেনে না বুঝে অন্যের অন্ধ অনুকারক হয়ে নিতান্ত মূর্খতা ও খামখেয়ালি বশতঃ এরকম সাংঘাতিক কথা বলে থাকে। আর তাদের অংশীবাদী পূর্বসূরীরাও ছিলো তাদেরই মতো জ্ঞানহীন। তাই নিঃসন্দেহে অংশীবাদীদের পূর্বসূরী-উত্তরসূরী সকলেই মিথ্যাবাদী।

একটি প্রশ্নঃ অজ্ঞতাজনিত অপরাধ ক্ষমার্হ। সুতরাং অজ্ঞতাবশতঃ 'আল্লাহ্‌র সন্তান রয়েছে' এরকম কথা যদি কেউ বলে, তবে তাকে শাস্তিযোগ্য মনে করা হবে কেনো?

উত্তরঃ অজ্ঞতাজনিত অবস্থা হতে পারে দু'রকমের। ১. যার অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু যার সম্পর্কে জানা নেই। ২. যার অস্তিত্ব নেই এবং যার সম্পর্কে কোনো কিছু জানাও নেই। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ক্ষমার্হ হলেও হতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রের অজ্ঞতাজনিত উক্তি ক্ষমার অযোগ্য। কারণ এমতাবস্থায় অসম্ভব কোনো কিছু সম্ভব বলে ঘোষণা করা হয়। আল্লাহ্‌তায়ালার অংশীদার হওয়া অসম্ভব। অথচ অংশীবাদীরা বলে 'আল্লাহ্‌র সন্তান রয়েছে।' নিঃসন্দেহে এমতো উক্তি উদ্ভট, অযৌক্তিক ও দুঃসাহসিক।

বাক্য উচ্চারিত হয় মুখ থেকেই। তাই 'তাদের কথা বা বাক্য কী উদ্ভট' এরকম বললেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু এখানে শুধু 'বাক্য' না বলে বলা হয়েছে 'মুখ-নিঃসৃত বাক্য।' চরমতম জঘন্য ও ভিন্ন বাক্যাবলীও অংশীবাদীরা অবলীলাক্রমে বলে যায়। তাদের ওই মূর্খজনোচিত দুঃসাহসিকতাকে সুচিহ্নিত করার জন্যই এখানে বলা হয়েছে 'মুখ-নিঃসৃত বাক্য।' এরকম অপবচন অবশ্যই সত্যবিবর্জিত। তাই শেষে বলা হয়েছে— 'তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।'

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রবীয়ার দুই পুত্র উত্‌বা ও শায়বা, আবু জেহেল বিন হিশাম, নজর বিন হারেছ, আ'স বিন ওয়ায়েল, আসওয়াদ বিন মুত্তালিব এবং আবুল বুখতারী মদীনার ইহুদী পণ্ডিতদের পরামর্শক্রমে রসুল স. এর সঙ্গে একদিন প্রচণ্ড বচসায় লিপ্ত হলো। রসুল স. তাদের কথায় মর্মাহত হলেন। তখন তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে আল্লাহ্‌তায়ালা অবতীর্ণ করলেন আলোচ্য আয়াত ষষ্ঠকের শেষোক্তটি।

তাই শেষোক্ত আয়াতে (৬) বলা হয়েছে — 'তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্ম-বিনাশী হয়ে পড়বে।' এখানে 'আসাফা' অর্থ দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে প্রিয়জনের বিরহ-কাতরতা সহ্য করতে না পেরে তিলে তিলে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার অবস্থাকে। প্রতিবেশী ও নিকটজনের পুনঃ পুনঃ সত্যপ্রত্যাখ্যানের ফলে রসুল স. এরও সেরকম শোচনীয় অবস্থা হয়েছিলো। কারণ তাদের ইসলাম গ্রহণ ছিলো তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তা ও কামনা। এই উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্য তাঁর শুভ প্রচেষ্টার কোনো অন্ত ছিলো না। অথচ তাদের ঘৃণ্য প্রত্যাখ্যানের আঘাতে তাঁর কোমল ও পবিত্র হৃদয় বার বার হচ্ছিলো রক্তাক্ত ও ক্ষতার্ত। তাঁর ওই অপরিসীম মনোবেদনা প্রশমনার্থে তাই আল্লাহ্‌তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন আলোচ্য আয়াত। যেনো বলেছেন— হে আমার প্রিয়তম রসুল! কারো

সত্যপ্রত্যাখ্যানের দায়-দায়িত্ব বহন তো আপনার কর্তব্যভূত নয়। সুতরাং তাদেরকে অযথা ভালোবেসে আপনি দুঃখ পাবেন কেনো? তারা তো আপনার দয়া ও ভালোবাসা গ্রহণের যোগ্যতারহিত। সুতরাং আত্ম-বিনাশন প্রবৃত্তিকে পরিহার করুন। আপনি তো আমার প্রিয়তম রসুল। আমিও তো আপনার প্রতি সতত প্রসন্ন।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

❒ পৃথিবীর উপর যাহা কিছু আছে আমি সেই গুলিকে উহার শোভা করিয়াছি মানুষকে এই পরীক্ষা করিবার জন্য যে, উহাদিগের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।

❒ উহার উপর যাহা কিছু আছে তাহা অবশ্যই আমি উদ্ভিদ-শূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করিব।

❒ তুমি মনে কর না যে, গুহা ও রকিমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে, আমি সেগুলোকে তার শোভা করেছি।' একথার অর্থ— মানুষ, উদ্ভিদরাজি, প্রাণীকুল ইত্যাদি দিয়ে আমি সাজিয়ে দিয়েছি পৃথিবীকে।

প্রশ্ন হতে পারে— পৃথিবীতে তো সর্প, ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্রপ্রাণীও বাস করে। তাছাড়া শয়তানও বিচরণ করে পৃথিবীতে। এগুলোকেও কি পৃথিবীর শোভা বলা যায়? একথার অর্থ— সকল সৃষ্টি আল্লাহ্তায়ালার সত্তা ও নাম-গুণাবলীর প্রমাণ। সুতরাং সুন্দর অসুন্দর নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল কিছু পৃথিবীর শোভাবর্ধনের উপকরণ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'মা আ'লালআরদ্বি' (পৃথিবীর উপরে যা কিছু আছে) বলে বুঝানো হয়েছে কেবল মানুষকে। কোনো কোনো কোরআন-ভাষ্যকারের মতে কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে কেবল জ্ঞানী ও পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গকে। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য পৃথিবীর শ্যামল সবুজ বৃক্ষরাজি, যেগুলো বাতাসে আন্দোলিত হয়। অন্য এক আয়াতে এরকমই বলা হয়েছে। যেমন— 'অতঃপর ভূমি যখন তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়।' কারো কারো মতে প্রাসাদ, বাগ-বাগিচা, মূল্যবান তৈজসপত্র— এগুলোই হচ্ছে পৃথিবীর শোভা।

আমি বলি, সৌন্দর্যের সামগ্রিকতাই আলোচ্য বাক্যের উদ্দেশ্য। একথা তো অনস্বীকার্য যে, অসুন্দরের অস্তিত্ব না থাকলে সুন্দরও হয়ে পড়তো মূল্যহীন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পৃথিবীর সকল কিছুই সুন্দর।

এরপর বলা হয়েছে— 'মানুষকে এই পরীক্ষা করবার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।' একথার অর্থ— পৃথিবীর এই শোভাবর্ধনের মাধ্যমে আমি এটাই পরীক্ষা করতে চাই যে, কে আমার সৃষ্ট এই সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে আমার কথা ভুলে যায় এবং কে আমাকে স্মরণ করে সকৃতজ্ঞচিত্তে। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করা এবং এর মাধ্যমে বৈধ পন্থায় নিজের ও অন্যের প্রয়োজন মেটানোতে দোষের কিছু নেই। লোভের বশবর্তী হয়ে বিত্তবৈভবকে কুক্ষিগত করা এবং আল্লাহ্‌র স্মরণচ্যুত হওয়াটাই দোষের। রসুল স. বলেছেন, দুনিয়া চিত্তাকর্ষক ও লোভ উদ্রেককারী। আল্লাহ্ তোমাদের বংশপরম্পরাকে ক্রমাগত পৃথিবীতে প্রেরণ করেন পরীক্ষা করবার জন্য— কে কর্মে উত্তম, কে নয়।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'এর উপর যা কিছু আছে, তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করবো।' একথার অর্থ— কিয়ামতের দিন আমি পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিবো। সৃষ্টি করবো নতুন এক পৃথিবী, যেখানে থাকবেনা কোনো বৃক্ষ অথবা অন্য কোনো শোভাবর্ধনের উপকরণ।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তুমি মনে কোরো না যে, গুহা ও রক্বীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কি মনে করেন কেবল গুহা ও রক্বীমবাসীদের ঘটনাই আমার বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের অন্যতম? কখনোই নয়। বরং আমার অগণিত নিদর্শনরাজির মধ্যে গুহাবাসীদের ঘটনাও একটি নিদর্শন। আমার নিদর্শনাবলীর সংখ্যা অজস্র, অসংখ্য। লক্ষ্য করুন, সকল বিস্ময়ের এক সময় অবসান হয়। সকল কিছুর অবশেষ প্রত্যাবর্তন ঘটে আমার দিকেই। সুতরাং আমার দিকে সকল কিছুর প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিই সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময় উদ্রেককারী নিদর্শন নয় কি?

'কাহ্‌ফ' অর্থ পর্বত-গহ্বর। কিন্তু 'রক্বীম' অর্থ কি— সে সম্পর্কে রয়েছে নানা কথা। তবে এ প্রসঙ্গে হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের উক্তিটিই অধিকতর উত্তম। তিনি বলেন, রক্বীম হচ্ছে একটি দস্তা অথবা প্রস্তরনির্মিত ফলক। ওই ফলকে খোদাই করা ছিলো গুহাবাসীদের (আসহাবে কাহফের) নাম ও ঘটনার সার-সংক্ষেপ। এই অভিমতটিকে গ্রহণ করা হলে বলতে হয়, রক্বীম শব্দটি উৎকলিত হয়েছে 'রকুম' থেকে— যার অর্থ লিপিবদ্ধ করা, মুদ্রিত করা বা খোদাই করা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রক্বীম ওই মরুদ্যানের নাম, যেখানে

অবস্থিত ছিলো আসহাবে কাহ্‌ফের গুহা। যদি তাই হয় তবে বলতে হয়, শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে 'রক্বমাতুল ওয়াদি' (মরুদ্যানের প্রান্ত) থেকে । হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, রক্বীম একটি জনপদের নাম। সেখানেই আবির্ভূত হয়েছিলো আসহাবে কাহ্‌ফ বা গুহাবাসীরা। কেউ কেউ আবার বলেছেন, ওই পর্বতের নাম রক্বীম যার গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলো ওই গুহাবাসীরা। এসকল উক্তির মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, গুহাবাসী ও রক্বীমবাসীরা একই। আর গুহা ও রক্বীম একই স্থানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কোনো কোনো আলেমের মতে গুহাবাসী ও রক্বীমবাসীদের ঘটনা দু'টো পৃথক।

হজরত নোমান বিন বশীর থেকে আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে মুনজির, তিবরানী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রক্বীমবাসীরা ছিলো তিনজন। তারা প্রবেশ করেছিলো একটি পর্বত গহ্বরে।

সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে ইমাম আহমদ ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, অতীত যুগের তিন বন্ধু আয়-উপার্জনের উদ্দেশ্যে দূরদেশে রওনা হলো। পথিমধ্যে এক স্থানে শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা আশ্রয় গ্রহণ করলো নিকটবর্তী এক পর্বত গুহায়। তারা গুহায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় পাথর গড়িয়ে পড়লো গুহামুখে। বন্ধ হয়ে গেলো তাদের বহির্গমনের পথ। অনেক চেষ্টা করেও তারা সেটিকে সরাতে পারলো না। তখন এক বন্ধু বললো, আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্য ছাড়া এখন আমাদের কোনো উপায় নেই। সুতরাং এসো আমরা একে একে আমাদের জীবনের কোনো একটি পুণ্যকর্মের কথা স্মরণ করে আল্লাহ্‌র কাছে মুক্তি প্রার্থনা করি। নিশ্চয় আল্লাহ্ রহম করবেন। একজন হাত তুলে বললো, হে আমার আল্লাহ্! আমি একদিন আমার পারিবারিক কর্ম সম্পাদনের জন্য তিন জন শ্রমিক নিযুক্ত করলাম। তাদের মধ্যে একজন কাজ শুরু করলো অর্ধেক দিন গত হওয়ার পর। কিন্তু সে কাজ করলো অন্য দুজনের সমান। আমি তাকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিলাম। যে দু'জন সারাদিন কাজ করেছিলো, তাদের একজন মনে করলো, পরে কাজ শুরু করা শ্রমিককে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিয়ে আমি ঠিক কাজ করিনি। তাই সে তার পারিশ্রমিক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাগ করে চলে গেলো। আমি তার ফেলে দেয়া পারিশ্রমিকের অর্থ এক স্থানে জমা করে রাখলাম। কিছু দিন পর ওই অর্থ দিয়ে আমি কিনলাম একটি বকরীর মাদী বাচ্চা। বাচ্চাটি ক্রমে বড় হলো। তার বংশবৃদ্ধি হতে লাগলো ক্রমে ক্রমে। এভাবে হয়ে গেলো অনেক ছাগল। দীর্ঘদিন পর ওই শ্রমিকটি ফিরে এলো। সে তখন হয়ে গিয়েছিলো বৃদ্ধ ও দুর্বল। আমি তাকে চিনতে পারলাম না। সে বললো, আপনার কাছে আমার কিছু পাওনা আছে। তার সব কথা শুনে আমি

তাকে চিনতে পারলাম এবং সকল ছাগল দিয়ে বিদায় করলাম তাকে। হে আমার দয়াময় প্রভুপ্রতিপালক! আমি তো একাজ করেছি কেবল তোমার সন্তোষ সাধনার্থে। আমার এ পুণ্যকর্মের অসিলায় তুমি আমাদের বন্ধ পথকে উন্মুক্ত করে দাও। দোয়া শেষ হলে দেখা গেলো গুহামুখের পাথরটি কিছু সরে গেলো। দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো বাইরের আলো।

দ্বিতীয় বন্ধু তার প্রার্থনায় বললো, হে আমার আল্লাহ্! এক সময় আমাদের এলাকায় দেখা দিলো চরম খাদ্যাভাব। একদিন এক রমণী আমার নিকটে সাহায্য প্রার্থিনী হলো। আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হলাম। বললাম, সাহায্য দিতে পারি, কিন্তু বিনিময়ে আমার অভিলাষ পূর্ণ করতে হবে। রমণীটি আমার প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে চলে গেলো। নিরুপায় হয়ে পুনরায় সে এলো। আমি পুনরায় আমার অভিলাষের কথা জানালাম। কিন্তু এবারও সে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তার স্বামীর নিকটে গিয়ে সবকিছু খুলে বললো। তার স্বামী বললো, কী করবে, বাচ্চাদেরকে তো বাঁচাতে হবে। ক্ষুধার তাড়নায় তারা ছটফট করছে। সুতরাং তুমি তার প্রস্তাব মেনে নাও। অসহায় রমণী তার ছোট ছোট সন্তান-সন্ততিকে বাঁচাবার জন্য শেষে এসে ধরা দিলো আমার কাছে। আমি তার বস্ত্র উন্মোচন করতে গিয়ে দেখলাম, সে থর থর করে কাঁপছে। বললাম, কাঁপছো কেনো? সে বললো, আল্লাহ্র ভয়ে। আমি সচকিত হয়ে বললাম, কী আশ্চর্য! তুমি দুঃসময়েও আল্লাহ্র ভয়ে কাঁপছো, আর আমি সুসময়ে কেমন নির্বিকার। আল্লাহ্র ভয়ে তো আমারই বেশী করে কাঁপতে থাকা উচিত। একথা বলে আমি বিরত রইলাম অসৎকর্ম থেকে। প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে সসম্মানে বিদায় করলাম তাকে। হে আমার পরম করুণাপরবশ প্রভুপালনকর্তা! আমিতো তোমারই প্রসন্নতা কামনায় পাপকর্ম থেকে বিরত হয়েছিলাম সেদিন। সুতরাং ওই পুণ্যকর্মটিকে উপলক্ষ করে আজ আমাদের পরিত্রাণ দাও। প্রার্থনা শেষ হলো। দেখা গেলো পাথরটি আরো খানিকটা সরে গিয়েছে। গুহাভ্যন্তর ভরে গিয়েছে বাইরের আলোয়। সে আলোয় স্পষ্ট রূপে নেত্র গোচর হলো নিজেদের চেহারা।

তৃতীয়জন হাত তুলে বললো, হে আমার জীবনাধিকারী আল্লাহ্! আমি তো ছিলাম একসময় অনেক ছাগলের মালিক। আমার বৃদ্ধ মাতা ও পিতা তখন বেঁচেছিলেন। আমি তাদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করে পানাহার করিয়ে বেরিয়ে যেতাম ছাগলের পাল নিয়ে। ফিরে এসে আবার তাদের কাজকর্ম সেরে তাদেরকে নিজ হাতে পানাহার করাতাম আমি। একদিন আমার কিছু ছাগল হারিয়ে গেলো। হারানো ছাগল খুঁজে বের করতে বিলম্ব হয়ে গেলো অনেক। ফিরে এসে দেখি আমার অসহায় জনক-জননী না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি পাত্রভর্তি দুধ নিয়ে তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলাম সারারাত। ভাবলাম, তাঁদের

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই যেনো আমি তাদেরকে দুধ পান করাতে পারি। তাঁরা জাগ্রত হলেন সকালে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে দুধ পান করালাম। হে আমার প্রভুপালক! আমার ওই নেক আমলটি যদি তোমার মনোপুত হয়ে থাকে, তবে তুমি তার অসিলায় আমাদেরকে এখান থেকে মুক্তি দান করো। দোয়া সমাপ্ত হলো। গুহা-মুখের পাথরটি সরে গেলো পুরোপুরি। তিন বন্ধু গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন সকৃতজ্ঞচিত্তে। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا

❐ যখন যুবকেরা গুহায় আশ্রয় লইল তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি নিজ হইতে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদিগের জন্য আমাদিগের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।'

❐ অতঃপর আমি উহাদিগকে গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখিলাম,

❐ পরে আমি উহাদিগকে জাগরিত করিলাম জানিবার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন্টি উহাদিগের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারে।

এখান থেকে শুরু হয়েছে আসহাবে কাহফ বা গুহাবাসীদের কাহিনী। প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইজ্আওয়াল ফিতইয়াতু ইলাল কাহ্ফি' (যখন যুবকেরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলো)। বাগবী লিখেছেন, ওই গুহাটি ছিলো বিজলুস পাহাড়ে। আর গুহাটির নাম ছিলো জীরম।

এরপর বলা হয়েছে— 'তখন তারা বলেছিলো, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো।' এখানে অনুগ্রহ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'রহমত' শব্দটি। 'রহমত' হচ্ছে একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সৎপথ প্রাপ্তি, ক্ষমা, জীবনোপকরণের প্রাচুর্য, সর্বাত্মক নিরাপত্তা— সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করো।' একথার অর্থ ওই গুহানিবাসী যুবকেরা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! সত্যপ্রত্যাখ্যানের আগ্রাসন থেকে আমাদের বিশ্বাসকে

সুরক্ষার কোনো প্রকৃষ্ট পথ আমাদেরকে দেখিয়ে দাও। এমতো মর্মার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, এখানকার 'আমরিনা' শব্দটির অর্থ অবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে বিশ্বাসের উপরে দৃঢ়পদ থাকা। অথবা আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— আমাদেরকে সকল কর্মে এবং সকল অবস্থায় সত্যাধিষ্ঠিত রাখো।

'রআইতু মিনকা রশাদা' একটি আরবী বাগধারা। এর অর্থ— আমি তোমাকে সত্যাধিষ্ঠিত অবস্থায় দর্শন করেছি। 'কামুস' গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। 'রশাদা' বাবে নাসারা এবং বাবে সামিয়া দু'দিক থেকেই আসে। শব্দটির ধাতুমূল তিনটি, যেমন— 'রুশদুন' 'রশ্দুন' এবং 'রশাদুন'। 'রশাদা' অর্থ হেদায়েতপ্রাপ্ত বা সুপথপ্রাপ্ত। বাবে ইসতিফআল 'রাশাদা' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এবং এর অর্থ 'সৎপথ অন্বেষণকারী' ও হয়। আর আল্লাহ্র নাম 'রশীদ' ব্যবহৃত হয় 'হাদী' (হেদায়েত বা পথের দিশাদানকারী) অর্থে।

বাগবী লিখেছেন, আসহাবে কাহ্ফ পর্বত-গহ্বরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন কেনো— সে সম্পর্কে বিদ্বজ্জণ অনেক কথা বলেছেন। মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, তখন সমগ্র খৃষ্টসাম্রাজ্যে ঘটে গিয়েছিলো ধর্ম-বিপর্যয়। মূর্তি-পূজার প্রসার ঘটেছিলো ব্যাপকভাবে। দেব-দেবীর নামে কোরবানী, মান্নত ইত্যাদি অংশীবাদিতা ছড়িয়ে পড়েছিলো যত্রতত্র। তাদের রাজাও হয়ে গিয়েছিলো অবাধ্য ও ধর্ম-ভ্রষ্ট। এমতো অনাসৃষ্টির মধ্যেও কিছু সংখ্যক লোক ছিলো বিশুদ্ধ-চিত্ত বিশ্বাসী। এক আল্লাহ্ ছাড়া তারা অন্য কারো উপাসনা করতো না। তখনকার রোম সম্রাট দাকিয়ানুস ছিলো ঘোর প্রতিমাপূজক। সে এক আল্লাহ্র উপাসকদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করতো। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদেরকে সে নিজেই যাচাই বাছাই করে দেখতো। এভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তৌহিদবাদী কাউকে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে ফেলতো সে। ফলে জনমনে সৃষ্টি হলো আতংক। বিশ্বাসীরা যে যেখানে পারলো আত্মগোপন করে রইলো, অথবা করলো দেশ ত্যাগ। বিশ্বাসীদেরকে সে কেবল হত্যা করেই ক্ষান্ত হতো না, হত্যার পর তাদের শরীরকে টুকরো টুকরো করে ঝুলিয়ে দিতো শহরের দেয়ালে দেয়ালে অথবা গৃহের দরজায়। এক অঞ্চলে ছিলো আটজন ইমানদারের একটি ক্ষুদ্র দল। তারা সকলেই ছিলো বিত্তশালী পিতার পুত্র। ছিল সত্য ধর্মের অনুরাগী। ছিলো বড়ই ইবাদতপ্রিয়। সম্রাটের নিষ্ঠুরতা দেখে শংকিত হয়ে পড়লো তারা। কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানালো— আকাশ ও পৃথিবীর একক স্রষ্টা হে আমাদের প্রিয় প্রভুপালনকর্তা! তুমি ব্যতীত আমরা কখনোই অন্য কারো ইবাদত করবো না। আমরা একথা জানি ও সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি যে, যারা তোমার উপাসনা থেকে বিমুখ, তারা সীমালংঘনকারী। হে আমাদের আপনতম প্রভুপালক!

তুমি তোমার বিশ্বাসী দাসবর্গকে উদ্ভূত অনাসৃষ্টি থেকে রক্ষা করো। দূর করে দাও ধর্মদ্রোহিতা, যেনো তারা প্রকাশ্যে তোমার ইবাদত বন্দেগী করতে বাধাগ্রস্ত না হয়। তারা সকলে একটি উপাসনাগৃহে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে বার বার এই প্রার্থনাটি উচ্চারণ করতে লাগলো। রাজ-কর্মচারীরা এ দৃশ্য দেখে তাদেরকে ঘিরে ফেললো এবং বন্দী করে নিয়ে গেলো সম্রাট দাকিয়ানুসের দরবারে। বললো, রাজন! আপনি তো আপনার পরমপূজনীয় দেব-দেবীদের মনোতুষ্টির জন্য একত্ববাদীদের হত্যা করেন। অথচ আপনার আমীর ওমরাহগণের পুত্র এই সকল যুবক আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করে না। এখন এদের ব্যাপারে আপনি কী করবেন করুন। সম্রাট বললো, হে ধর্মভ্রষ্ট যুবকবৃন্দ! তোমাদের পিতাগণ এ রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজপুরুষ। আর তারা সকলে দেব-দেবীর উপাসক। পরমপূজনীয় দেব-মূর্তি সমূহের উদ্দেশ্যে তারা কোরবানীও করে। কিন্তু তোমরা এভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠলে কেনো? কেনো পরিত্যাগ করলে বিগ্রহবন্দনা ও তাদের উদ্দেশ্যে পশু বলি দেয়ার প্রথাকে? কেনো পরিত্যাগ করলে তোমাদের পিতৃপুরুষদের আচরণ ও বেশভূষাকে? হে অবিমৃশ্য তরুণের দল! আমি তোমাদেরকে শেষ সুযোগ দিচ্ছি, এখন থেকে তোমরা অবশ্যই হবে বিগ্রহ-পূজারী। যদি এরকম না হও, তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই হত্যা করবো। যুবকদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন মাকসালমীনা। তিনি বললেন, সমগ্র আকাশ যার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় মুখর, আমরা সেই একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র উপাসনা করি। সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা কেবল তাঁর। আমরা শরণ যাচ্ঞা করি কেবল তাঁরই নিকটে এটাই আমাদের ধর্ম। সুতরাং দেব-দেবীদের উপাসনা আমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। মাকসালমীনার সঙ্গীসাথীরাও এরকম স্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করলো। সম্রাট হুকুম দিলো, এই মুহূর্তে এই ধর্মদ্রোহীদের শরীর থেকে রাজকীয় পরিচ্ছদ খুলে নেয়া হোক। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। সম্রাট বললো, হে যুথবদ্ধ বিভ্রান্ত যুবক! তোমরা অবশ্যই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতে চাই না। গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবার জন্য আমি তোমাদেরকে কিছুকাল অবকাশ দিতে চাই। এরপর সম্রাটের নির্দেশে ফিরিয়ে দেয়া হলো তাদের রাজকীয় পরিচ্ছদ। সম্রাট বললো, আমি এখন গমন করবো অন্য এক অঞ্চলের দিকে। কিছুদিন পর পুনরায় এখানে এসে দেখবো, তোমরা সংশোধিত হলে কিনা। সম্রাটের চলে যাওয়ার পর আট যুবক নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে ঠিক করলো, সম্রাটের পুনরাগমনের পূর্বেই এই স্থান ত্যাগ করতে হবে। প্রত্যেকে তখন আপন আপন গৃহ থেকে কিছু মুদ্রা নিয়ে এলো। ওই মুদ্রাসমূহের কিছু অংশ বণ্টন করে দিলো দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে। অবশিষ্ট

মুদ্রাগুলো নিয়ে তারা গিয়ে আশ্রয় নিলো শহরের অনতিদূরের বিজ্‌লুস পর্বতের একটি নিভৃত গুহায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, এই গোপন গহ্বরে আমরা একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন হবো। সম্রাটের আগমনের সংবাদ পেলে আমরা আবার গিয়ে দাঁড়াবো তার সম্মুখে। সে যা করতে পারে করবে আমরা তার বিষয়ে মোটেই চিন্তিত হবো না। একটি কুকুর তাদেরকে ভালোবাসতো খুব। সে-ও সঙ্গ নিলো তাদের। যুবকেরা পর্বত-গহ্বরে প্রবেশ করে নিমগ্ন হলো ইবাদত বন্দেগীতে। হজরত কা'ব আহ্বারের বর্ণনায় এসেছে, পথিমধ্যে একটি কুকুর তাদের পিছু নিলো। তারা কয়েকবার কুকুরটিকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্ট করলো। কুকুরটি বলে উঠলো, হে আল্লাহ্‌প্রেমিকগণ! আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না। আমি আল্লাহ্‌প্রেমিকগণকে ভালোবাসি। তোমরা পর্বত গহ্বরে নিদ্রামগ্ন হলে আমিই হবো তোমাদের প্রহরী।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, ওই যুবকেরা ছিলো সাতজন। পথিমধ্যে তাদের দেখা হলো একজন রাখালের সঙ্গে। তার সঙ্গে ছিলো একটি কুকুর। ওই রাখাল ও তার কুকুরটিও যুবকদের সঙ্গী হলো। এভাবে আটজন মিলে গুহায় গিয়ে শুরু করলো আল্লাহ্‌র নিরবচ্ছিন্ন উপাসনা।

যুবকগণের একজনের নাম ছিলো তামলিখা। তিনি ছিলেন সাহসী ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বাধিকারী। তিনি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করে মাঝে মাঝে শহরে গিয়ে সকলের জন্য আহার্য সামগ্রী ক্রয় করে আনতেন এবং জেনে আসতেন শহরবাসীরা তাদের সম্পর্কে কোনো আলাপ আলোচনা করে কিনা। এভাবে অতিবাহিত হলো দীর্ঘকাল। তারপর একদিন সম্রাট দাকিয়ানুস ওই শহরে ফিরে এলো। শহরের প্রধান ব্যক্তিবর্গকে এইমর্মে আদেশ দিলো যে, সবাইকে দেবতার নামে কোরবানী করতে হবে। সশংকিত শহরবাসীরা সম্রাটের আজ্ঞা পালনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত ভিখারীর বেশে তামলিখাও তখন ছিলেন শহরাভ্যন্তরে। খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি স্বচক্ষে দেখে এলেন সবকিছু। গুহায় ফিরে এসে সাথীদেরকে বললেন, জালেম সম্রাট আবার ফিরে এসেছে। সে ও তার পারিষদবর্গ আমাদের খোঁজ করছে। একথা শুনে সকলে সেজদায় পতিত হলেন। রোদনসিক্ত নয়নে যাচ্ঞা করলেন আল্লাহ্‌র শরণ এবং পরিত্রাণ চাইলেন উদ্ভূত বিপর্যয় থেকে। তামলিখা বললেন, সাথীবৃন্দ! মস্তক উত্তোলন করো। আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হও। পানাহার করো। সকলে মস্তক উত্তোলন করলেন। সকলের চোখ থেকে তখনও নির্গত হচ্ছিলো অশ্রুর ধারা। তখন সূর্য অস্তমিত প্রায়। পানাহার পর্বের পর শুরু হলো তাদের পরামর্শ বিনিময়। কথাবার্তা বলার সময়েই আল্লাহ্‌ তাদের উপর অবতীর্ণ করলেন ঘনঘোর নিদ্রা।

ঘুমিয়ে পড়লেন সকলে। কুকুরটি ছিলো তখন গুহামুখে সম্মুখের পা প্রসারিত অবস্থায়। সেও ঘুমিয়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। ওদিকে সম্রাট ও তার লোকজন অনেক তালাশ করলো তাদেরকে। কিন্তু কেউই সম্রাটকে তাদের সন্ধান দিতে পারলো না। সম্রাট বললো, ধর্মদ্রোহী যুবকগুলো তো আমাকে পেরেশান করে ফেললো। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম। তারা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করলে আমি তো তাদেরকে কিছু বলতাম না। শহরের গণ্যমান্য লোকেরা বললো, সম্রাট অযথার্থ পাত্রে তার অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। কিন্তু তারা তো অবাধ্য। সংশোধিত হওয়ার অভিপ্রায় থাকলে তারা এভাবে উধাও হয়ে যেতো না। তাদের কথা শুনে সম্রাট হয়ে উঠলো রোষতপ্ত। সে তৎক্ষণাৎ ডেকে আনলো যুবকগণের পিতৃবর্গকে। বললো, বলো, তোমাদের সন্তানেরা কোথায়? কী দুঃসাহস তাদের! যুবকগণের পিতারা বললো, মহামান্য রাজন! আমরা তো আপনার অবাধ্য নই। সুতরাং আপনি তাদের অবাধ্যতার কারণে আমাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন না। আর তারা তো পালিয়ে যাওয়ার আগে আরেক কাণ্ড ঘটিয়েছে। আমাদের অনেক ধন-সম্পদ তারা দান করে গিয়েছে অভাবগ্রস্ত জনসাধারণকে। একথা শুনে সম্রাট তাদেরকে ছেড়ে দিলো এবং বিজ্‌লুস পাহাড়ের দিকে প্রেরণ করলো একটি অনুসন্ধানী দলকে। নির্দেশ দিলো, তাদেরকে খুঁজে পাও আর না পাও, পাহাড়ের সবগুলো গুহার প্রবেশমুখ বন্ধ করে দিয়ে এসো।

কিন্তু আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ছিলো অন্যরকম। তিনি আসহাবে কাহ্‌ফকে মর্যাদায়িত করতে চেয়েছিলেন। অনাগত মানবতার জন্য তাদেরকে করতে চেয়েছিলেন তাঁর অপার পরাক্রমের এক বিশেষ নিদর্শন। আর ওই নিদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে একথাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। শতাব্দির পর শতাব্দি মৃতবৎ পড়ে থাকার পর যেমন করে তারা পুনরায় জাগ্রত হয়েছিলেন, তেমনি করে মহাপ্রলয়ের পর পুনরুত্থিত হবে সকল মানুষ। সম্রাট দাকিয়ানুস চেয়েছিলো যে গুহায় তারা প্রবেশ করে থাকুক না কেনো, সে গুহাই যেনো হয় তাদের কবর। বন্ধ গুহায় যেনো তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অতিষ্ঠ হয়ে ধুঁকে ধুঁকে প্রাণ ত্যাগ করে। সম্রাটের লোকেরা ভেবেছিলো, আসহাবে কাহ্‌ফ জাগ্রত এবং গুহার মুখ বন্ধ করা সম্পর্কে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে রেখেছিলেন মহানিদ্রায় আধনামে। তাদের রূহসমূহ রেখে দিয়েছিলেন আপন তত্ত্বাবধানে। কুকুরটিও হয়ে গিয়েছিলো তাদেরই মতো নিদ্রিত অথবা মৃতবৎ। কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমে তাদের সকলের শরীর কখনো এপাশে, আবার কখনো ওপাশে স্থাপিত হতো। এভাবেই মৃত্তিকার স্থায়ী আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা হয়েছিলো তাদের শরীরকে।

সম্রাট দাকিয়ানুসের পরিবারের দু'জন সদস্য ছিলো ইমানদার। কিন্তু তারা তাদের ইমানকে প্রকাশ করতো না। তাদের একজনের নাম ছিলো ইয়ানদুরুস এবং অপরজনের নাম ছিলো আইয়াশ। তারা দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করলো, আসহাবে কাহ্ফের এই বিস্ময়কর ঘটনার স্মৃতি অক্ষয় করে রাখতে হবে। আগামী পৃথিবীর বিশ্বাসবানেরা যেনো এ কাহিনী জেনে অভিভূত হয়। একথা ভেবে তারা একটি প্রস্তর ফলকে খোদাই করলো আসহাবে কাহ্ফের নাম, বংশপরিচয় এবং আল্লাহ্র পথে হিজরতের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। তারপর তারা প্রস্তর ফলকটিকে মাটিতে পুঁতে রাখলো। বয়ে যায় রহস্যময় সময়। শেষ হয়ে যায় সম্রাট দাকিয়ানুসের জামানা। আসহাবে কাহ্ফের বিস্ময়কর নিদ্রা তবুও ভঙ্গ হয় না।

উবায়েদ ইবনে উমায়ের বর্ণনা করেছেন, আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা ছিলো একাধিক। প্রথমে তারা ছিলো সৌখিন যুবক। মূর্তিপূজক ছিলো তারা। গলায় ছিলো তাদের মূল্যবান হার ও হাতে ছিলো চুরি। একটি শিকারী কুকুর ছিলো তাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। একদিন তারা সঙ্গে কয়েকটি মূর্তি নিয়ে সেজেগুজে ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হলো একটি বার্ষিক মেলায়। কিন্তু আল্লাহ্ নিতান্ত অনুগ্রহপরবশ হয়ে তাদের হৃদয়ে দান করলেন ইমান। তাদের মধ্যে একজন আবার ছিলো মন্ত্রী। সেও মনে মনে হয়ে গেলো ইমানদার। কিন্তু তারা কেউ তাদের ইমানের কথা মুখে প্রকাশ করলো না। মনে মনে সকলেই ভাবলো, কাফেরদের সঙ্গ পরিত্যাগ না করলে আল্লাহ্র আযাব এসে পড়তে পারে। একথা ভেবেই তারা একে অন্যকে ছেড়ে পৃথক হয়ে গেলো। দূরত্ব বজায় রেখে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো একে অপরকে। একদিন তাদের একজন বসেছিলো একটি নির্জন বৃক্ষের ছায়ায়। আর একজন দূর থেকে তাকে দেখে ভাবলো, আমার মতো সে-ও তো মনে মনে ইমানদার হয়ে যেতে পারে। সে এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসে পড়লো। কিন্তু মুখে কিছু বললো না। দূর থেকে দু'জনকে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে গেলো আরেকজন। এভাবে তারা সকলেই একত্র হলো ওই বৃক্ষটির নিচে। একজন সাহস করে বললো, কী ব্যাপার? তোমরা এভাবে এখানে সমবেত হলে কেনো? কেউ কোনো জবাব দিলো না। সকলে উচ্চারণ করলো একই প্রশ্ন। কিন্তু কেউ জবাব দিলো না। এরপর তারা জোড়ায় জোড়ায় পৃথক হয়ে ভয়ে ভয়ে পরস্পরের নিকট প্রকাশ করলো তাদের ইমানকে। এভাবে প্রথমে জোড়ায় জোড়ায় এবং পরে সমবেতভাবে সকলেই বুঝতে পারলো তাদের অন্তরের পরিচয়। নিকটেই ছিলো একটি পাহাড়। ওই পাহাড়ের নির্জনতম একটি গহ্বরে তারা মগ্ন হলো আল্লাহ্র ইবাদতে। একটি শিকারী কুকুরও তাদের সঙ্গ নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলো গুহামুখে। একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লো সকলে। তাদের আত্মীয় স্বজনেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদেরকে পেলো না। আল্লাহ্ স্বয়ং

তাদেরকে আড়াল করে নিলেন জনপদবাসীদের দৃষ্টি থেকে। জনপদবাসীরা তখন হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া ওই যুবকদের নাম ও বংশপরিচয় খোদাই করলো একটি ফলকে। তাতে লেখা হলো অমুক বাদশাহ্র শাসনকালে অমুক অমুক রাজপুরুষের পুত্র অমুক তারিখ থেকে নিখোঁজ। অনেক অনুসন্ধান করেও তাদের সম্পর্কে কিছু জানা গেলো না ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলকটি রেখে দেয়া হলো মুসাফিরখানায়। ওদিকে পর্বতের এক গোপন গহ্বরে আসহাবে কাহ্ফ ও তাদের কুকুর গভীর নিদ্রায় মগ্ন। পৃথিবীতে বয়ে চললো দিবস-যামিনীর নিয়মিত আবর্তন-বিবর্তন। একে একে মৃত্যুবরণ করলো সেই জামানার বাদশাহ্ ও প্রজাসাধারণ। শুরু হলো নতুন জামানা। শেষ হলো শতাব্দী। শতাব্দীর পর শতাব্দী। এভাবে সুদীর্ঘ তিন শত নয় বছর পর জেগে উঠলো আসহাবে কাহ্ফ।

ওহাব বিন মুনাববাহ্, বর্ণনা করেছেন, হজরত ঈসার এক হাওয়ারী (সাহাবী) ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে একবার গেলেন আসহাবে কাহ্ফের শহরে। শহরের প্রবেশ দ্বারে পৌঁছতেই একজন বললো, শহরাভ্যন্তরে প্রবেশ করার পূর্বে এখানকার এই মূর্তিটিকে সেজদা করে নিতে হয়। হাওয়ারী লোকটির কথা মান্য করলেন না। শহরে না ঢুকে তিনি গেলেন নিকটবর্তী একটি হাম্মামখানায়। সেখানে মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গ্রহণ করলেন হাম্মামখানার তত্ত্বাবধায়কের চাকুরী। কয়েকদিনের মধ্যেই হাম্মামখানার মালিক টের পেলো, তার আয়-উপার্জন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং সে তার নতুন কর্মচারীর উপরে খুবই প্রসন্ন হলো। স্থানীয় কয়েকজন যুবকের সঙ্গে পরিচয় হলো হাওয়ারীর। হৃদ্যতাও গড়ে উঠলো তাদের মধ্যে। হাওয়ারী তাদেরকে আসমান জমিনের বিষয়ে বিভিন্ন কথা শোনালেন। যুবকেরা আকৃষ্ট হলো। এভাবে একসময় তারা গ্রহণ করলো খৃষ্টান ধর্মমত। হাওয়ারী হাম্মামখানার মালিকের সঙ্গে শুরুতেই এই শর্ত করে নিয়েছিলো যে, রাতে তাকে কোনো ব্যাপারে ডাকা যাবে না। কারণ রাতে তাকে বিশেষভাবে নামাজে লিপ্ত থাকতে হয়। একদিন ঘটলো একটি অনভিপ্রেত ঘটনা। সন্ধ্যার পর এক মহিলাকে নিয়ে সেখানে হাজির হলো সেখানকার এক রাজপুত্র। হাওয়ারী বললেন, আপনি রাজপুত্র হয়ে কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই রমণীকে এখানে এনেছেন? রাজপুত্র লজ্জিত হয়ে ফিরে গেলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পুনরায় মহিলাকে নিয়ে হাজির হলো সেখানে। এবার সে হাওয়ারীর কথায় ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলো না। দু'জনেই প্রবেশ করলো হাম্মামখানায়। এর মধ্যে কীভাবে যেনো রাজার কাছে সংবাদ পৌঁছলো, হাম্মামখানার মালিক রাজপুত্রকে হত্যা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবার থেকে ছুটে এলো সিপাই-শান্ত্রী। তারা আসার আগেই ভয়ে পালিয়ে গেলো হাম্মামখানার মালিক। সিপাইরা বললো, কর্মচারী কোথায়? তার সাথে নাকি কয়েকজন যুবক থাকে। তারাই বা কোথায়? খোঁজ করে দেখা গেলো নব্য

খৃষ্টান যুবকদের সঙ্গে নিয়ে হাওয়ারী উধাও হয়েছে। ওদিকে হাওয়ারীর সঙ্গী যুবকেরা আর একজন খৃষ্টান যুবককে নিয়ে পৌছলো একটি পর্বতের গুহায়। তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটি কুকুরও গিয়ে উপস্থিত হলো। সকলে মিলে ঠিক করলো, রাতটা ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে গুহাতেই কাটিয়ে দেয়া যাক। সকালে নেয়া যাবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত। তারা আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন হলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হলো তারা। মাটিতে পড়ে রইলো মৃত মানুষের মতো। ওদিকে রাজা স্বয়ং তার লোকজন নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে উপস্থিত হলো ওই গুহাটির নিকটে। সকলেই বুঝতে পারলো পলাতকেরা এই গুহার মধ্যেই রয়েছে। রাজার লোকজন গুহায় প্রবেশ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলো সকলে। গুহামধ্যে প্রবেশ করার সাহস কারো হলো না। রাজার এক সঙ্গী বললো, মহামান্য রাজন! আপনি তো তাদেরকে হত্যাই করতে চান। রাজা বললো, হ্যাঁ। সঙ্গীটি বললো, তাহলে এখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে গুহামুখটি বন্ধ করে দিন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় অতিষ্ঠ হয়ে তারা অবরুদ্ধ গুহাতে অবশ্যই মারা পড়বে। আপনার উদ্দেশ্য সাধনের এটাই প্রকৃষ্ট উপায়।

ওহাব আরো বর্ণনা করেছেন, আসহাবে কাহফ দীর্ঘদিন ধরে নিদ্রাভিভূত হয়ে রইলেন অবরুদ্ধ গুহায়। কেটে গেলো যুগের পর যুগ। শতাব্দির পর শতাব্দি। তারপর একদিন এক রাখাল তার ছাগল ও মেষগুলো চরাতে চরাতে উপস্থিত হলো গুহাটির সন্নিকটে। সহসা শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে সে গুহামুখে দাঁড়িয়ে দেখলো তার পথ রোধ করে আছে দীর্ঘ দিনের পুরনো একটি প্রাচীর। প্রাচীরটিতে ধাক্কা ধাক্কি করতেই ধসে পড়লো তার একাংশ। সেই ভগ্ন অংশ গলিয়ে সে প্রবেশ করলো ভিতরে। সারারাত ধরে চললো তুমুল বর্ষণ। ঘুম থেকে জেগে উঠলেন আসহাবে কাহ্ফ। একরাত্রি ঘুমিয়েছেন এরকম মনে হলো তাদের।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক লিখেছেন, তখন চলছিলো রাজা বিদুসীসের রাজত্ব। তিনি ছিলেন পুণ্যবান। কিন্তু তাঁর শাসনকালের আটষট্টি বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর প্রজাসাধারণ বিভক্ত হলো দুইভাগে— মুমিন ও কাফের। মুমিনেরা বিশ্বাস করতো আল্লাহ্কে এবং কিয়ামতকে। কিন্তু আল্লাহ্ ও কিয়ামতের প্রতি কাফেরদের কোনো আস্থা রইলো না। রাজা বিদুসীস তাদের এমতো পদস্খলন দেখে ব্যথিত হলেন। অনেক কাকুতি মিনতি করে তাদের হেদায়েতের জন্য প্রার্থনা জানালেন আল্লাহ্তায়ালার মহান দরবারে। কিন্তু তাঁর প্রার্থনা কবুল করা হলো না। দিন দিন কাফেরদের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো। শারীরিকভাবে নয়, কিয়ামত হবে রূহানীভাবে— এই ছিলো তাদের বিশ্বাস। এ কথা ভেবেই তারা গা ভাসিয়ে দিলো ভোগ-বিলাসের সর্বনাশা স্রোতে। একদিন বিদুসীস পুণ্যবানদেরকে

ডেকে মানুষের হেদায়েতের ব্যাপারে পরামর্শ বিনিময় করলেন। তাদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলতে গিয়ে বিদুসীস সবিস্ময়ে দেখলেন, প্রকাশ্যতঃ মুমিন মনে হলেও ভিতরে ভিতরে তারা কাফের। কিয়ামতের প্রতি তাদেরও কোনো আস্থা নেই এবং তারাও মনে প্রাণে চায় যে, হাওয়ারীগণের ধর্ম ও মতাদর্শ থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিক। বিদুসীস মনের দুঃখে পরামর্শ সভা থেকে প্রস্থান করলেন। ফিরে এলেন তাঁর নিজস্ব প্রকোষ্ঠে। বন্ধ করে দিলেন সকল দরজা ও জানালা। রাজকীয় পরিচ্ছদ খুলে ফেলে পরিধান করলেন কম্বলের পোশাক। এক কোনে ছাই বিছিয়ে বসে পড়লেন তার উপর। দিনরাত রোদনার্ত কণ্ঠে দোয়া করতে লাগলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি প্রজাসাধারণের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে অধিক অবগত। দয়া করে তুমি তাদের অন্তরে শুভবোধ জাগ্রত করে দাও। প্রকাশ করো কোনো বিরল নিদর্শন, যার মাধ্যমে অপনোদিত হয় তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস। হে আমার পরম করুণাপরবশ প্রভুপালক! তোমার রোদনরত বান্দা বিদুসীসের প্রার্থনা মঞ্জুর করো। তোমার বান্দাদের ধ্বংস হওয়া তুমিও তো পছন্দ করো না। আল্লাহ্পাক এবার বিদুসীসের করুণ প্রার্থনা কবুল করলেন। আসহাবে কাহফের অবরুদ্ধ গুহার নিকটে বসবাসকারী এক লোকের অন্তরে এই চিন্তার উদয় হলো যে, গুহামুখের প্রাচীরটি ভেঙে দিয়ে গুহাটিকে সহজেই তো ছাগল ও মেষের থাকার ব্যবস্থা করা যায়। লোকটির নাম ছিলো আওলিয়াস। সে দু'জন শ্রমিক নিয়ে ভেঙে ফেললো গুহামুখের প্রাচীর। গুহায় প্রবেশ করেই সে দেখলো আসহাবে কাহফের সকলে জেগে উঠে বসেছেন। সকলেই বেশ হাসিখুসি। মনে হচ্ছিলো গতরাতে ঘুমানোর পর স্বাভাবিকভাবে তারা জেগে উঠেছেন। অভ্যাস অনুযায়ী সকলে নামাজ পাঠ করলেন। তারপর তাদের মনে হলো রাজা দাকিয়ানুসের কথা। মনে হলো, রাজার লোকেরা নিশ্চয় আমাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাঁদের আরো মনে হলো গত রাতের ঘুম ছিলো কিছুটা প্রলম্বিত। তাই তাঁরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম আমরা? কেউ বললেন, একদিন একরাত্রি। আবার কেউ বললেন, না তার চেয়েও কম। এভাবে কথা-বার্তা বলতে বলতে শেষে সকলে একযোগে বলে উঠলেন, আল্লাহ্ই জানেন, কতোকাল ঘুমিয়েছিলাম আমরা। তাদের একজনের নাম ছিলো তামলিখা। তাঁর কাছে জমা ছিলো সকলের অর্থকড়ি। তাই তাঁকে উদ্দেশ্য করে একজন বললেন, যাও শহরের বাজারে গিয়ে কিছু আহার্য দ্রব্য ক্রয় করে নিয়ে এসো। সেই সঙ্গে জেনে এসো, আমাদের সম্পর্কে কে কী আলোচনা করছে। তামলিখা বললেন, আমরা তো রাজার এলাকার মধ্যেই। রাজার লোকদের কোনো ক্রুর দৃষ্টি হয়তো আমাদেরকে অনুসন্ধান করে ফিরছে। কিন্তু আমরা তো কেবল আল্লাহ্র সাহায্যপ্রার্থী। সুতরাং তোমরা চিন্তিত হয়ো না। তাদের আর একজনের নাম ছিলো মুলসালমিনা। তিনি

বললেন, বন্ধুগণ! আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত। সুতরাং মৃত্যুভয়ে ভীত হওয়া আমাদের জন্য শোভন নয়। আমাদের তো কেবল একটিই ভয়, দুশমনদের অত্যাচারে আমরা যেনো ঈমানহারা হয়ে না যাই। সুতরাং হে তামলিখা! ছদ্মবেশ ধারণ করে তুমি শহরাভ্যন্তরে যাও। কিনে নিয়ে এসো একটু বেশী আহার্য সামগ্রী। সাবধান! বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্মসম্পাদন কোরো। তোমার গতিবিধি অনুসরণ করে কেউ যেনো আবার আমাদের এই আত্মগোপনের স্থানে এসে না পড়ে। তামলিখা প্রস্তুত হলেন। শরীর থেকে খুলে ফেললেন মূল্যবান পোশাক। তারপর ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে কিছু মুদ্রা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন গুহামুখের দিকে। সবিস্ময়ে দেখলেন, গুহার প্রবেশ পথে রয়েছে একটি ভগ্ন প্রাচীর। কিন্তু তিনি আর পিছনে ফিরলেন না। দুঃস্থ মানুষের মতো ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলেন শহরে। কেউ তাঁকে চিনে ফেলে কিনা, একথা ভেবে তিনি সভয়ে এদিকে ওদিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। তিনি একথা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না যে, ইতোমধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে সুদীর্ঘ তিনশত বছর। শহরের প্রবেশ পথে পৌঁছে তিনি দেখলেন, সেখানে মূর্তিটূর্তি কিছুই নেই। যতোই ভিতরে প্রবেশ করেন, ততোই তাঁর মনে হয়, এ শহর কি সেই শহর! শহরের লোকজনদের চেহারা সুরত কথা-বার্তা সবকিছুই কেমন অচেনা। একবার তাঁর মনে হলো, তবে কী ভুল রাস্তায় এলাম? তবে কি যা দেখছি তা স্বপ্ন? এরকম নানা কথা ভাবতে ভাবতে তিনি উপস্থিত হলেন বাজারে। দেখলেন, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কেউ কেউ হজরত ঈসার নামে কসম খাচ্ছে। একটি প্রাচীরে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ভাবলেন, কী বিস্ময়! গতকালই আমরা দেখে গেলাম এই শহরে হজরত ঈসা ইবনে মরিয়মের নাম উচ্চারণ করার মতো কেউই ছিলো না। অথচ আজ তাঁর নামে কসম, কথা-বার্তা সবই চলেছে। তবে কি এটা অন্য কোনো শহর! এক যুবককে তিনি সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন, এই শহরের নাম কি? যুবকটির উত্তর শুনে আরো বেশী অবাক হয়ে গেলেন তিনি। নাম তো ঠিকই আছে। কিন্তু এ শহর এতো অচেনা কেনো? এই অচেনা পরিবেশ থেকে মনে হয় এক্ষুণি বেরিয়ে যাওয়া উচিত। তার আগে কিছু খাবার কেনা দরকার। তিনি এগিয়ে গেলেন একটি রুটির দোকানের দিকে। আস্তিন থেকে কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা বের করে রুটিওয়ালাকে দিয়ে বললেন, আমাকে কয়েকটা রুটি দিন। রুটিওয়ালা মুদ্রা হাতে নিয়ে তাজ্জব হয়ে গেলো। উল্টেপাল্টে দেখে মুদ্রাগুলো দিলো পাশের দোকানদারকে। সেও অবাক হয়ে দেখতে লাগলো মুদ্রাগুলোকে। তারপর সে সেগুলোকে দিলো পাশের আর এক দোকানীকে। তারপর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, সম্ভবতঃ এই লোকটি গুপ্তধন পেয়েছে। মুদ্রাগুলোতো বহুকাল পূর্বের। তাদের কথা-বার্তা শুনে তামলিখা ভীত হলেন। ভাবলেন, লোকগুলো মনে হয় তাঁকে চিনে ফেলেছে।

এক্ষুণি তারা হয়তো তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে যাবে রাজা দাকিয়ানুসের দরবারে। দোকানীদের কথা-বার্তা শুনে সেখানে আরো লোক জড় হলো। তারা তামলিখাকে চিনতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই চিনতে পারলো না। তামলিখা ভীত হয়ে বললেন, তোমরা আমার মুদ্রাগুলো নিয়ে নিলে, খাবারও দিলে না। ঠিক আছে। এখন আমাকে দয়া করে যেতে দাও। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছো? তবে তুমি যে-ই হও না কেনো, তুমি নিশ্চয় গুপ্তধন পেয়েছো। সুতরাং আমাদের কাছ থেকে তুমি তা গোপন রাখতে পারবে না। এক্ষুণি আমাদেরকে মৃত্তিকায় প্রোথিত ওই গুপ্তধনভাণ্ডারের কাছে নিয়ে চলো। আমাদেরকেও ওই সম্পদের ভাগ দিতে হবে। নতুবা আমরা তোমাকে বিচারকের হাতে সোপর্দ করবো। বিচারক তো তোমাকে মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারেন। ভীত বিহ্বল তামলিখা হতবাক হয়ে গেলেন। লোকেরা তাঁর শরীরের চাদর তাঁর গলায় পেঁচিয়ে তাঁকে নিয়ে গেলো শহরের এক গলিতে। গলির লোকেরা বললো, কি ব্যাপার? একে এভাবে গ্রেপ্তার করেছো কেনো? তারা বললো, এ লোকের কাছে রয়েছে প্রাচীনকালের ধনভাণ্ডার। লোকজনের মুখে মুখে একথা ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। ছোট-বড় সকলে ভিড় জমালো তামলিখাকে কেন্দ্র করে। অনেকে বললো, এ লোক তো আমাদের শহরের বাসিন্দাই নয়। আমরা কেউই তো তাকে চিনতে পারছি না। তামলিখা নিশ্চুপ। তখন তাঁর অন্তরে বার বার কেবল একথার উদয় হচ্ছিলো যে, নিশ্চয় অল্পক্ষণের মধ্যে এসে পড়বেন তাঁর পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা। তারা তো এই শহরের গণ্যমান্য লোক। সুতরাং তারা তাঁকে নিশ্চয় এদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারবে। দু'জন সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন ওই শহরের স্বনামধন্য বিচারকর্তা। তাঁদের এক জনের নাম আরইউস এবং আরেক জনের নাম আস্তিউস। তামলিখাকে শেষে তাঁদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। যাবার সময় পিতা ও ভ্রাতাদেরকে দেখার উদ্দেশ্যে তিনি বার বার এদিকে ওদিকে তাকালেন। আর তাঁর ওই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে লোকেরা ভাবলো, তিনি পাগল। এই নিয়ে তারা যথেষ্ট হাসিতামাশাও করলো। তামলিখা কেঁদে ফেললেন। আকাশের দিকে মুখ উত্তোলন করে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! হে আকাশ ও পৃথিবীর চিরঅমুখাপেক্ষী সৃজয়িতা! আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করে দাও ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায়। তোমার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী হিসেবে অবতীর্ণ করো তোমার প্রিয়ভাজন ফেরেশতা জিবরাইলকে। অথবা আমার পরিত্রাণার্থে প্রেরণ করো অন্য কোনো অদৃশ্য শরণ। প্রার্থনা শেষে তিনি মনে মনে ভাবলেন, হায়! বন্ধুবর্গ যদি এখন আমার সঙ্গে থাকতো। আমরা তো এইমর্মে অংগীকার করেছিলাম যে, জীবনে মরণে আমরা কেউ কারো কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না। বিচারকদ্বয়ের সামনে হাজির হয়ে তামলিখা কিছুটা প্রকৃস্থিত হলেন। দেখলেন, দাকিয়ানুস নয়,

তিনি এখন মুখোমুখি হয়েছেন দু'জন অচেনা বিচারকের । মহামান্য বিচারক আরইউস ও আস্‌তিউস মুদ্রাগুলো নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। প্রশ্ন করলেন, হে অচেনা ব্যক্তি! আপনি কোথায় পেয়েছেন এই গুপ্ত ধনভাণ্ডার? তামলিখা বললেন, এই মুদ্রাগুলো কোনো গুপ্ত ধনভাণ্ডারের নয়। এই শহরের টাকশাল থেকেই এগুলো তৈরী হয়েছে। আর এগুলো আমি সংগ্রহ করেছি আমার পিতার নিকট থেকে। কিন্তু এখন যে আমি কোনো কিছুই বুঝতে পারছি না। কি বলবো, তাও ভেবে পাচ্ছি না। বিচারকদ্বয়ের একজন বললেন, আপনার পরিচয়? তামলিখা বললেন, আমি এই শহরেরই অধিবাসী। আরেক জন বিচারপতি বললেন, পিতৃপরিচয়? এখানে এমন কেউ কি রয়েছে যে আপনাকে চেনে? তামলিখা তাঁর পিতার নাম বললেন। কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের দিকে লক্ষ্য করে পরিচিত কাউকেই দেখতে পেলেন না। বিচারপতি বললেন, আপনার বচন অসত্য। তামলিখা তাঁর মস্তক কিঞ্চিত আন্দোলিত করলেন। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলেন না। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের একজন বললো, লোকটি মনে হয় উন্মাদ। আরেক জন বললো, না, ছাড়া পাওয়ার জন্য উন্মাদের ভান করছে। বিচারপতি তামলিখার দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করে বললেন, আপনি কি মনে করেন, আপনাকে আমরা ছেড়ে দিবো? একথাও কি আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে, মুদ্রাগুলো আপনি পেয়েছেন আপনার পিতার নিকট থেকে? মুদ্রাগুলোতে রয়েছে তিনশতাধিক বছরের পূর্বের সিলমোহর। আপনি যুবক। আর আমরা বয়োপ্রবীণ। আর আমাদের স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে ন্যায় বিচারের ভার। এখানকার গুপ্ত ধনভাণ্ডারের অধিকারী ব্যক্তিগতভাবে কেউ হতে পারে না। সুতরাং সত্য প্রকাশ না করা পর্যন্ত আপনাকে বন্দী করে রাখাই ন্যায়সংগত বলে মনে হয়। তামলিখা এবার মুখ খুললেন। বললেন, মহামান্য বিচারপতি! একটি প্রশ্ন রয়েছে আমার। প্রশ্নটির উত্তর পেলে আমিও আপনাকে সব কথা খুলে বলবো। আমি জানতে চাই রাজা দাকিয়ানুস এখন কোথায়? উপস্থিত লোকেরা বললো, সেতো বহুকাল পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে। এখন পৃথিবীতে এ নামে অন্য কোনো রাজা বাদশাহ্ নেই। তামলিখা বললেন, তাহলে নিশ্চয় পথ ভুলে আপনাদের দেশে এসেছি। এখানে কে আমার কথা বিশ্বাস করবে? প্রকৃত ঘটনা শুনুন— আমরা কয়েকজন যুবক ছিলাম সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত। রাজা দাকিয়ানুস আমাদেরকে মূর্তি পূজার নির্দেশ দিলো। আমরা তার কথা মানতে চাইনি। তাই গতকাল সন্ধ্যায় আমরা পালিয়ে গিয়েছিলাম এবং অনতিদূরের এক পর্বত গহ্বরে আত্মগোপন করেছিলাম। সেখানে কখন যেনো আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে জেগে উঠে খাদ্য বস্তু ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে শহরে এসে এভাবে ধরা পড়ে গেলাম

আপনাদের কাছে। আমার কথা সত্য কি না, তা যদি প্রমাণ করতে চান, তবে এক্ষুণি আপনারা চলুন বিজলুস পাহাড়ের ওই গুহায়। দেখবেন, আমার সঙ্গীগণ সেখানে আমার জন্য অপেক্ষমান। তামলিখার কথা শুনে আরইউস, আস্তিউস এবং শহরের সকল লোক তামলিখার সঙ্গে চললো বিজলুস পাহাড় অভিমুখে। ওদিকে তামলিখার সঙ্গীগণ তামলিখার ফিরতে দেরী দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, তামলিখা নিশ্চয় দাকিয়ানুসের লোকদের কাছে ধরা পড়েছে। একথা ভাবতে ভাবতে তাঁরা শুনতে পেলেন অনেক লোকের শোরগোল ও ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। ভাবলেন, নিশ্চয় দাকিয়ানুসের লোকেরা এবার আমাদেরকে বন্দী করতে এসেছে। আল্লাহ্র সাহায্য লাভের নিমিত্তে তখন সকলে নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। আল্লাহ্ সকাশে আবেদন জানালেন নিরাপত্তার।

বিচারপতি আরইউসের নেতৃত্বে শহরবাসীরা উপস্থিত হলেন গুহামুখে। প্রথমে গুহায় প্রবেশ করলেন তামলিখা। সাথীদেরকে সংক্ষেপে সবকিছু খুলে বললেন। তখন সকলে বুঝতে পারলেন যে, তারা আল্লাহ্র হুকুমে দীর্ঘ তিন শত বছরের বেশী ঘুমিয়েছিলেন। এখন আবার তাঁর হুকুমেই তাঁরা জেগে উঠেছেন। আর আল্লাহ্ তাঁদেরকে করতে চান কিয়ামত ও হাশরের (মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের) একটি নিদর্শন। নিদ্রা মৃত্যুতুল্য। তিনশত বছর ধরে কেউ নিদ্রাভিভূত থাকে না। মৃত্যুর পরে কেউ যেমন পুনর্জীবিত হয় না, তেমনি তিনশত বছরের মৃত্যুতুল্য নিদ্রার পর জাগ্রত হওয়াও অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা থাকলে সবই হয়। কিয়ামতও অনুষ্ঠিত হবে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছায়। সুতরাং তা সত্য। আর আসহাবে কাহফের এই ঘটনাটি সেই কিয়ামতের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তামলিখার পর গুহায় প্রবেশ করলেন বিচারপতি আরইউস। তিনি দেখতে পেলেন প্রবেশমুখের পাশেই একটি তামার সিন্দুক। তিনি সিন্দুকটি খুলতে নির্দেশ দিলেন একজনকে। সকলের সামনে সিন্দুকটি খোলা হলো। দেখা গেলো, তার মধ্যে রয়েছে দুটি দস্তার ফলক। ফলক দু'টোতে লেখা রয়েছে— এখানে আত্মগোপন করে রয়েছেন আটজন পুণ্যবান যুবক। তাদের নাম মাকসালসীনা, মাখশালমীণা, তামলিখা, মারতুনাস, বাশারতুনাস, বীরবুহ, দাইউমাস এবং ইয়াতুনমাস। অত্যাচারী রাজা দাকিয়ানুস তাদেরকে জোর করে মূর্তিপূজক বানাতে চেয়েছিলো। তাই তাঁরা পালিয়ে এসে আত্মগোপন করেছে এই গুহায়। পরে রাজনির্দেশে গুহামুখে নির্মিত হয় প্রাচীর। চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে পুণ্যবান গুহাবাসীরা। আমরা তাদের কয়েকজন শুভাকাঙ্খী তাদের এই কাহিনী খোদাই করে রাখলাম, যেনো আগামী পৃথিবীর মানুষ তাদের আত্মত্যাগের এই ঘটনা জানতে পারে। বিচারপতি আরইউস ও অন্যান্যরা বিস্মিত হলো। আল্লাহ্তায়ালার এই বিরল নিদর্শন স্বচক্ষে দর্শন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো

তাঁরই দরবারে। এরপর আরইউস ও তাঁর সঙ্গীরা গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন পরম পুণ্যবান যুবকগণের দিকে। তাঁদের অবয়ব ছিলো জ্যোতিস্নাত। পোশাক পরিচ্ছদও ছিলো নতুন ও ঝকঝকে। তিনশত নয় বছরের সময়ের পরিসর তাঁদের উপরে কোনো প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারেনি।

আরইউস এবার দূত মারফত একটি পত্র প্রেরণ করলেন রাজা বিদুসীসের নিকটে। লিখলেন, মহামান্য রাজন! আল্লাহ্তায়ালার এক অভূতপূর্ব নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে এখানে। অতি শীঘ্র আগমন করুন এবং স্বচক্ষে দর্শন করুন তিনশত নয় বছর পূর্বের কয়েকজন পুণ্যবান যুবককে। রাজা বিদুসীস ছিলেন বিশ্বাসী ও পুণ্যপ্রবণ। পত্র পেয়ে তিনি আর কালবিলম্ব করলেন না। উপস্থিত হলেন আসহাবে কাহফের গুহায়। স্বচক্ষে তাঁদেরকে দেখে আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করলেন। বললেন, হে আমার আল্লাহ্! হে আকাশ ও পৃথিবীর নিরঙ্কুশ অধিকর্তা। আমি তোমারই উপাসনা করি। শরণ প্রার্থনা করি তোমারই সকাশে। তুমি পবিত্রতম। মহামহিম। আমার পুণ্যবান পিতা পিতামহের মতো এই অযোগ্য দাসের প্রতিও দয়া করে তুমি জারী রেখেছো তোমার সতত অনুগ্রহের নিরর্গল প্রবাহ।

দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো আসহাবে কাহফের বিস্ময়কর কাহিনী। দলে দলে লোক এসে দেখে যেতে লাগলো তাঁদেরকে। রাজা বিদুসীসকে পেয়ে আসহাবে কাহফ খুশী হলেন খুব। আলিঙ্গন করলেন তাঁকে। মাটিতে বসেই কিছুক্ষণ বাক্যালাপ করলেন রাজা বিদুসীসের সঙ্গে। তারপর বললেন, পুণ্যমতি সম্রাট! এবার বিদায়। আপনার উপরে বর্ষিত হোক আল্লাহ্র বিশেষ কৃপা ও নিরাপত্তা। আল্লাহ্ আপনার সাম্রাজ্যকে অসৎ মানুষ ও জ্বিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। ফী আমানিল্লাহ্। বিদুসীসকে গুহামুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন আসহাবে কাহফ। পুনরায় ফিরে এলেন স্বস্থানে। আল্লাহ্র প্রতি বিশেষভাবে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ইন্তেকাল করলেন তাঁরা। রাজা তাঁদের স্মরণে উড়িয়ে দিলেন অনেক নিশান। তারপর তাঁদেরকে শুইয়ে দিলেন পৃথক পৃথক আটটি স্বর্ণ নির্মিত তক্তায়। এভাবে তাঁদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের পর রাজা বিদুসীস ফিরে এলেন তাঁর মহলে। রাতে স্বপ্ন দেখলেন আসহাবে কাহফকে। তাঁরা বললেন, প্রিয় বিদুসীস! পৃথিবীর জীবন শেষে মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করাই নিয়ম। কিয়ামত শেষে মাটি থেকেই পুনরুত্থিত হবো আমরা। তুমি আমাদেরকে স্বর্ণাবদ্ধ করেছো কেনো? রাজা জেগে উঠে আপন কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত হলেন। এবার তিনি নির্মাণ করিয়ে নিলেন সার নামক একপ্রকার গাছের তক্তানির্মিত সিন্দুক। ওই সিন্দুকগুলোতে আসহাবে কাহফের পবিত্র মরদেহ রক্ষা করে সেগুলোকে প্রোথিত করলেন মৃত্তিকায়। এভাবে আল্লাহ্ তাঁদেরকে চিরদিনের জন্য আড়াল করে দিলেন জনদৃষ্টি থেকে। রাজা বিদুসীস

সেখানে বানিয়ে দিলেন একটি মসজিদ। নির্দেশ দিলেন আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সকলে যেনো প্রতিবছর অন্ততঃ একবার উপস্থিত হয় সেখানে।

এক বর্ণনায় এসেছে, তামলিখাকে বাজার থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো রাজার কাছে। রাজা বললেন, তুমি কে? তামলিখা বললেন, আমি এই শহরেরই বাসিন্দা। অমুক মহল্লায় আমার বাড়ী। আমি গতকাল বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আজ সকালে এসেছি। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তামলিখার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু কেউই তাকে চিনতে পারলো না। রাজার হঠাৎ মনে পড়লো রাষ্ট্রীয় মহাফিজ খানায় নাকি এমন কয়েকজন যুবকের বিবরণ আছে, যাদেরকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর পাওয়া যায়নি। রাজনির্দেশে তৎক্ষণাৎ কথিত ফলক আনা হলো। রাজা পড়ে দেখলেন, সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে তামলিখা ও আরো কয়েকজনের নাম। তামলিখা বললেন, অন্য নামগুলো আমার সঙ্গীদের। তারা এক পর্বত গুহায় আমার জন্য প্রতীক্ষমান। তাদেরকে দেখতে চাইলে চলুন আমার সঙ্গে। রাজা তামলিখার সঙ্গে উপস্থিত হলেন আসহাবে কাহফের গুহার সম্মুখে। তামলিখা বললেন, রাজন! প্রথমে আমাকে প্রবেশ করতে দিন। নতুবা তারা ভয় পেয়ে যাবে। একথা বলেই তামলিখা গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে সকলকে সম্ভাষণ জানালেন। পরক্ষণেই আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে দান করলেন মৃত্যু। আর সেই সঙ্গে তাঁদেরকে অদৃশ্য করে দিলেন লোকচক্ষু থেকে। ওই গুহাবাসীদের কাহিনীই শুরু হয়েছে আলোচ্য আয়াত থেকে।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম।' একথার অর্থ— জালেম রাজার অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে যখন ওই পুণ্যবান যুবকেরা পর্বতগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করলো, তখন আমি তাদের উপরে অবতীর্ণ করলাম গভীর, গভীরতর নিদ্রা। ফলে তারা হয়ে গেলো পার্থিব অনুভূতি ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এভাবে অতিবাহিত হয়ে গেলো অনেক কয়টি বছর। এখানে 'সিনীনা' শব্দটির পরে বসানো হয়েছে 'আদাদা'। এভাবে বোঝানো হয়েছে অতিক্রান্ত বছরের সংখ্যা অনেক, অল্প নয়। আর এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, অধিক সংখ্যাই গণনাযোগ্য, অল্পসংখ্যা নয়।

এর পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'পরে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম জানবার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোনটি তাদের অবস্থিতি কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।' এখানে 'আলহিযবাইনি' অর্থ দুই দল। আর 'আমাদান' অর্থ অবস্থিতিকাল। আর এখানে 'এলেম' অর্থ বর্তমানের ওই জ্ঞান যা সম্পৃক্ত ভবিষ্যতের সাথে।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ۝ وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا۟ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ۝ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝

❐ আমি তোমার নিকট উহাদিগের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করিতেছিঃ উহারা ছিল কয়েকজন যুবক, উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল এবং আমি উহাদিগের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলাম,

❐ এবং আমি উহাদিগের চিত্ত দৃঢ় করিয়া দিলাম; উহারা যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তখন বলিল, 'আমাদিগের প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক; আমরা কখনই তাঁহার পরিবর্তে অন্য কোন ইলাহ্কে আহ্বান করিব না; যদি করিয়া বসি, তবে উহা অতিশয় গর্হিত হইবে;

❐ আমাদিগেরই এই স্বজাতিগণ, তাঁহার পরিবর্তে অনেক ইলাহ্ গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা এই সমস্ত ইলাহ্ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তাহা অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে?'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আমি আপনার নিকটে আসহাবে কাহফের কাহিনী যথাযথরূপে বিবৃত করছি। তারা ছিলো কতিপয় ইমানদার যুবক। আমি তাদের পুণ্যকর্ম করবার সামর্থ্য বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম। এখানে 'আল-হাক্ব' অর্থ যথাযথরূপে। আর এখানকার 'ফিত্ইয়াতুন্' (যুবক) শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'ফাতিউন্'। যেমন, 'সাবিয়্যাতুন্' এর একবচন হচ্ছে 'সাবিউন্'। আর 'আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম' কথাটির অর্থ— আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম হাকিকী ইমান (প্রকৃত বিশ্বাস)। উল্লেখ্য যে, হাকিকী ইমান লাভ হয় কুপ্রবৃত্তি বিনাশনের (ফানায়ে নফসের) পর।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম' একথার অর্থ— ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন, ধন-দৌলত ইত্যাদি পরিত্যাগ করেছিলো তারা কেবল ইমান রক্ষার জন্য। তাই আমি তাদেরকে করে দিলাম

বিশুদ্ধ চিত্ত ও ধৈর্যশীল। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্তায়ালা আসহাবে কাহফের হৃদয় থেকে পার্থিব মোহ-মমতা চিরদিনের জন্য অপসারিত করে দিয়েছিলেন। তাই তাঁরা উন্নীত হয়েছিলেন আত্মবিনাশনের স্তরে (ফানায়ে কলবের মাকামে)। সে কারনেই তাঁদের হৃদয়ে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস, ভয় ও ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছু আর অবশিষ্ট ছিলো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যখন উঠে দাঁড়ালো তখন বললো, আমাদের প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আমরা কখনোই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোনো ইলাহ্কে আহ্বান করবো না; যদি করি, তবে তা হবে অতিশয় গর্হিত।' একথার অর্থ— অত্যাচারী রাজা দাকিয়ানুস মূর্তিপূজার প্রতি বিমুখ আসহাবে কাহফকে যখন তিরস্কার করলো, তখন তাঁরা দণ্ডায়মান হলেন এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বললেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যিনি একক সৃজয়িতা, তিনিই আমাদের প্রভুপালনকর্তা। আমরা কখনোই তাঁর পরিবর্তে অন্য কারো উপাসনা করবো না। যদি করি, তবে তা হবে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গর্হিত। এখানে 'শাত্বাত্বা' অর্থ অতিশয় গর্হিত, সত্যের সীমালংঘন।

এর পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আমাদেরই এ স্বজাতিগণ, তাঁর পরিবর্তে অনেক ইলাহ্ গ্রহণ করেছে। তারা এ সমস্ত ইলাহ্ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেনো?' একথার অর্থ— দৃঢ়চেতা ওই যুবকগণ আরো বললো, আমাদের সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক আল্লাহ্র ইবাদত পরিত্যাগ করে হয়ে গিয়েছে অংশীবাদী। পূজা পার্বণ শুরু করে দিয়েছে কল্পিত দেব-দেবীদের। অথচ তাদের এমতো অপকর্মের পক্ষে স্পষ্ট কোনো প্রমাণই নেই। প্রমাণহীন বিষয় যে পরিত্যাজ্য, সে কথাও তো তারা বোঝে না। বুঝলেও বিশ্বাস করতে চায় না। কারণ তারা অজ্ঞ ও মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।

শেষে বলা হয়েছে— 'যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী আর কে?' একথার অর্থ— যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী ও কার্যকলাপের সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার বানায়, 'আল্লাহ্র সন্তান রয়েছে', 'দেব-দেবীরা আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করবে'— এরকম মিথ্যার যারা উদ্ভাবক, তারাই সর্বাপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী। সীমালংঘনের ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে অধিক অগ্রণী আর কে?

যুবকদের অংশীবাদিতা প্রত্যাখ্যান ও এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসজ্ঞাপক বক্তব্য শোনা সত্ত্বেও রাজা দাকিয়ানুস উত্তেজিত হলো না। বললো, তোমরা তরুণ। স্বভাবগত চঞ্চলমতিত্বের কারণে বিভ্রান্ত হওয়া তোমাদের জন্য বিচিত্র কিছু নয়। তাই বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখবার জন্য তোমাদেরকে কিছুকাল অবকাশ দেয়া হলো। আশা করি, তোমাদের বোধোদয় ঘটবে। একথা বলে রাজা চলে গেলো অন্য এক অঞ্চলের দিকে। তার চলে যাবার পর যুবকবৃন্দ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয়ের জন্য নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় শুরু করলো। একজন বললো—

وَاِذِ اعۡتَزَلۡتُمُوۡهُمۡ وَمَا یَعۡبُدُوۡنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاۡوٗۤا اِلَی الۡكَهۡفِ یَنۡشُرۡ لَكُمۡ رَبُّكُمۡ مِّنۡ رَّحۡمَتِهٖ وَیُهَیِّئۡ لَكُمۡ مِّنۡ اَمۡرِكُمۡ مِّرۡفَقًا ۝ وَتَرَی الشَّمۡسَ اِذَا طَلَعَتۡ تَّزٰوَرُ عَنۡ كَهۡفِهِمۡ ذَاتَ الۡیَمِیۡنِ وَاِذَا غَرَبَتۡ تَّقۡرِضُهُمۡ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمۡ فِیۡ فَجۡوَةٍ مِّنۡهُ ؕ ذٰلِكَ مِنۡ اٰیٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنۡ یَّهۡدِ اللّٰهُ فَهُوَ الۡمُهۡتَدِ ۚ وَمَنۡ یُّضۡلِلۡ فَلَنۡ تَجِدَ لَهٗ وَلِیًّا مُّرۡشِدًا

❑ তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হইলে উহাদিগ হইতে ও উহারা আল্লাহের পরিবর্তে যাহাদিগের ইবাদত করে তাহাদিগ হইতে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের জন্য তাঁহার দয়া বিস্তার করিবেন এবং তিনি তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

❑ দেখিলে দেখিতে— উহারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে উহাদিগের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া আছে এবং অস্তকালে উহাদিগকে অতিক্রম করিতেছে বাম পার্শ্ব দিয়া, এই সমস্ত আল্লাহের নিদর্শন। আল্লাহ্ যাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাহার কোন পথ-প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাইবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যুবক বললেন, আমরা তো এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী। সুতরাং যারা অংশীবাদী, তাদের সঙ্গে আমাদের সংশ্রব ছিন্ন করা একান্ত প্রয়োজন। তাই হে বন্ধুবর্গ! আমার পরামর্শ শ্রবণ করো। আশ্রয় গ্রহণ করো পর্বতের কোনো গোপন গুহায়। পরিত্যাগ করো বিষণ্ণতা। নিশ্চিত জেনো, তোমাদের প্রভুপালক তোমাদের প্রতি তাঁর বিশেষ দয়া বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে করবেন সফল। উল্লেখ্য যে, আসহাবে কাহফের সম্প্রদায়ের লোকেরা মূর্তিপূজকদের মতো মূর্তিপূজা করতো বটে, কিন্তু একই সঙ্গে তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতও করতো। তাই এখানে 'ইল্লাল্লহ্' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ 'তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে'। অথবা এরকমও হতে পারে যে— এখানকার 'মা ইয়া'বুদুনা ইল্লাল্লহ্' হতে পারে আল্লাহ্‌র উক্তি— যা ওই যুবকের বক্তব্যের মধ্যে উদ্ধৃত হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে এখানকার 'মা' হবে না বাচক। এবং 'ইয়া'বুদুনা' এর সর্বনাম সম্পর্কিত হবে আসহাবে কাহ্ফের প্রতি। তখন কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— আসহাবে কাহফ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করতো না।

'ইলাল কাহ্ফি' অর্থ গুহার আশ্রয় গ্রহণ করো। অর্থাৎ পর্বত গহ্বরে এমনভাবে আত্মগোপন করো যেনো অংশীবাদীরা তোমাদের সন্ধান না পায়।

এখানকার 'মির্ফাক্বা' শব্দটি 'ইসমে আলা' (করণ কারক) অর্থাৎ ওই মাধ্যম বা ব্যবস্থা যার দ্বারা উপকার লাভ হয়। উল্লেখ্য যে, আসহাবে কাহফ ছিলেন দৃঢ়চিত্ত বিশ্বাসী। তাই তাঁদের কথা তাঁদের এক সাথীর মুখ দিয়ে দৃঢ় আশাব্যঞ্জকরূপে উচ্চারিত হতে পেরেছে এভাবে—'তোমাদের প্রভুপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করবার ব্যবস্থা করবেন।'

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'দেখলে দেখতে— তারা গুহার প্রশস্ত চত্তরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলে আছে এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করছে বাম পাশ দিয়ে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আসহাবে কাহফের ওই গুহার নিকটে গেলে দেখতে পেতেন গুহাটি অবস্থিত রয়েছে একটি প্রশস্ত চত্বরে। সেখানে উদয়কালে সূর্য হেলে পড়ে দক্ষিণে এবং অস্তকালে হেলে যায় বামে। এখানে 'তাযাওয়ারু' অর্থ হেলে যাওয়া বা ঝুঁকে পড়া। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'যাওরুন' থেকে। 'জাতাল ইয়ামীন' অর্থ দক্ষিণ পাশে। আর 'জাতাশ্ শিমাল' অর্থ বাম পাশে। অর্থাৎ গুহাটির ডানে ও বামে।

'তাক্বরিদু' অর্থ অতিক্রম করা। আর 'ফাজ্ওয়াতিন' অর্থ প্রশস্ত চত্বর বা বিস্তৃত স্থান।

ইবনে কুতাইবা লিখেছেন, গুহাটির মুখ ছিলো সপ্তর্ষিমণ্ডলীর দিকে। পূর্ব পশ্চিমে প্রলম্বিত বিষুব রেখায়। তাই উদয়ের সময় সূর্য হেলে থাকতো ডান পাশে। আর অস্তমিত হওয়ার সময়ে ঝুঁকে পড়তো বাম পাশে। ফলে গুহার দু'পাশেই পুরোপুরি সূর্য-কিরণ পতিত হতো। তাই পচন, দুর্গন্ধ, বাতাসের স্বল্পতা — এ সকল কিছু ঘটতো না। আবার আসহাবে কাহফের শরীরেও সরাসরি সূর্যের আলো পড়তে পারতো না। এভাবে তাদের শরীরকে রক্ষা করা হতো প্রখর রোদ থেকে। সেই সঙ্গে তাদের পরিধেয় বস্ত্রও রক্ষা পেতো মালিন্য থেকে।

কোনো কোনো আলেম ইবনে কুতাইবার এমতো ভৌগোলিক ব্যাখ্যাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেননি। তাঁরা বলেছেন, বিষয়টি মূলতঃ ছিলো আল্লাহ্র অপার পরাক্রমের বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তী বাক্যে তাই বলা হয়েছে— 'এ সবই আল্লাহ্র নিদর্শন।' এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে আসহাবে কাহফের পরিচয় ও তাদের অবস্থান স্থলের যথাযথ বিবরণ প্রদানের মাধ্যমে প্রকারান্তরে একথাই প্রমাণ করা হয়েছে যে, এই কোরআন আল্লাহ্তায়ালার সত্যবাণী। না হলে আসহাবে কাহফের এরকম নিখুঁত বর্ণনা এখানে এভাবে উপস্থাপিত হতে পারতো না।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনোই তাঁর কোনো পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এই তত্ত্বটি আপনার জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, পথ-প্রাপ্তি ও পথ-ভ্রষ্টতা সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় নির্ভর। তিনি যাকে চান, তাকে করেন পথপ্রাপ্ত। আর পথভ্রষ্ট করতে চান যাকে, সে অবশ্যই হয় পথচ্যুত। আর যারা পথচ্যুত, তারা কখনো পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পায় না।

আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকারান্তরে আসহাবে কাহফের প্রশংসা করা হয়েছে। এইমর্মে সতর্কও করে দেয়া হয়েছে যে, আসহাবে কাহফের এই ঘটনাসহ আরো অনেক নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ্‌র । কিন্তু ওই সকল নিদর্শনের মাধ্যমে হেদায়েত লাভ করতে পারে কেবল তারা, যাদেরকে তিনি দিয়েছেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সুবিবেচনা।

সূরা কাহ্‌ফ ঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۝ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا
ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۚ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى
اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ۝ سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ
كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَ
يَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا
يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۪ وَّلَا تَسْتَفْتِ
فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ۝

❐ তুমি মনে করিতে, উহারা জাগ্রত কিন্তু উহারা ছিল নিদ্রিত। আমি উহাদিগকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাইতাম দক্ষিণে ও বামে এবং উহাদিগের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দুইটি গুহাদ্বারে প্রসারিত করিয়া। তাকাইয়া উহাদিগকে দেখিলে তুমি পিছন ফিরিয়া পলায়ন করিতে ও উহাদিগের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িতে;

❐ এবং এই ভাবেই আমি উহাদিগকে জাগরিত করিলাম যাহাতে উহারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। উহাদিগের একজন বলিল, 'তোমরা কত কাল অবস্থান করিয়াছ।' কেহ কেহ বলিল, 'একদিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ।' কেহ কেহ বলিল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করিয়াছ তাহা তোমাদিগের প্রতিপালকই ভাল জানেন। এখন তোমাদিগের একজনকে তোমাদিগের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম ও উহা হইতে যেন কিছু খাদ্য লইয়া আসে তোমাদিগের জন্য; সে যেন বিচক্ষণতার সহিত কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদিগের সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু জানিতে না দেয়।'

❐ 'উহারা যদি তোমাদিগের বিষয় জানিতে পারে তবে তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিবে অথবা তোমাদিগকে উহাদিগের ধর্মে ফিরাইয়া লইবে এবং সে ক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করিবে না।'

❐ এবং এই ভাবে আমি মানুষকে উহাদিগের বিষয় জানাইয়া দিলাম যাহাতে তাহারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহের প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নাই। যখন তাহারা তাহাদিগের কর্তব্য বিষয়ে নিজদিগের মধ্যে বিতর্ক করিতেছিল

তখন অনেকে বলিল, 'উহাদিগের উপর সৌধ নির্মাণ কর।' উহাদিগের প্রতিপালক উহাদিগের বিষয় ভাল জানেন। তাহাদিগের কর্তব্য বিষয়ে যাহাদিগের মত প্রবল হইল তাহারা বলিল, 'আমরা তো নিশ্চয়ই উহাদিগের উপর মসজিদ নির্মাণ করিব।'

❒ অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ বলিবে, 'উহারা ছিল তিন জন, উহাদিগের চতুর্থটি ছিল উহাদিগের কুকুর। 'এবং কেহ কেহ বলে, 'উহারা ছিল পাঁচজন, উহাদিগের ষষ্ঠটি ছিল উহাদিগের কুকুর।' আবার কেহ কেহ বলে, 'উহারা ছিল সাত জন, উহাদিগের অষ্টমটি ছিল উহাদিগের কুকুর।' বল, 'আমার প্রতিপালকই উহাদিগের সংখ্যা ভাল জানেন; উহাদিগের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি উহাদিগের বিষয়ে বিতর্ক করিও না এবং ইহাদিগের কাহাকেও উহাদিগের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিও না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি মনে করতে, তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিলো নিদ্রিত।' এখানকার 'আইক্বাজ' শব্দটি 'ইয়াক্বীজুন' এর বহুবচন এবং রুকুদুন' বহুবচন 'রকিুদ্' এর। যেমন— 'কুউদুন' বহুবচন 'ক্বাইদ' এর। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আসহাবে কাহফকে দেখলে আপনি মনে করতেন, তারা বুঝি জেগেই আছে। কিন্তু না, তারা ছিলো নিদ্রিত। ঘুমের ঘোরে কখনো কখনো পার্শ্ব পরিবর্তন করতো মাত্র।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে ও বামে।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, আসহাবে কাহফ ঘুমের মধ্যেই মাঝে মাঝে পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন। মাটি যাতে তাদের শরীরকে ভক্ষণ না করতে পারে, সেজন্যই আল্লাহ্ করে দিয়েছিলেন ওই বিশেষ ব্যবস্থা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, তারা পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন আশুরার দিবসে। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, তাঁরা পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন বছরে মাত্র একবার।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের কুকুর ছিলো সম্মুখের পা দু'টি গুহা-দ্বারে প্রসারিত করে।' মুজাহিদ ও জুহাক বলেছেন, 'ওয়াসীদ্' অর্থ গুহার আঙ্গিনা বা উঠোন। আতা বলেছেন, 'দহলিজ'বা বহির্বাটি। সুদ্দী বলেছেন, শব্দটির অর্থ দরজা। ইকরামার এক বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমত এরকম। অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, আসহাবে কাহফের সঙ্গী জন্তুটি ছিলো কুকুর। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বাঘ। কেননা প্রত্যেক হিংস্র প্রাণীকেই বলা হয় 'কালব'। রসুল স. উত্বা ইবনে আবু লাহাবকে বদদোয়া দিয়েছিলেন একথা বলে যে, হে আমার আল্লাহ্! আপনার কোনো 'কালবকে' (হিংস্র জন্তুকে) তার উপরে বিজয়ী করে দিন। এর কিছুদিন পরে একটি বাঘ উতবাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললো। কিন্তু অধিকতর প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, জন্তুটি ছিলো কুকুরই। ইবনে

জুরাইজ আবার শেষোক্ত অভিমতের সমর্থক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সেটি ছিলো একটি বৃহদাকৃতির কুকুর। এক বর্ণনায় এসেছে, কুকুরটি ছিলো মাঝারী ধরনের। মুকাতিল বলেছেন, সেটির রঙ ছিলো হলুদ। কুরতুবী বলেছেন, গাঢ় হলুদ। কালাবী বলেছেন, তার লোম ছিলো ধুনিত পশম অথবা তুলার ন্যায়। কেউ কেউ বলেছেন, কুকুরটি ছিলো প্রস্তরের মতো ধূসর।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কুকুরটির নাম ছিলো কিতমীর। হজরত আলী বলেছেন, নাম ছিলো তার রাইয়্যান। আওজায়ী বলেছেন, তাকুর। সুদ্দী বলেছেন, ছাত্তর। কা'ব বলেছেন, সাহ্বা।

খালেদ বিন মাদান বলেছেন, আসহাবে কাহফের কুকুর ও বালআম বাউরের গাধা ব্যতীত অন্য কোনো চতুষ্পদ জন্তু বেহেশতে প্রবেশ করবে না। সুদ্দী বলেছেন, আসহাবে কাহফ যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন, তখন কুকুরটিও পার্শ্ব পরিবর্তন করতো। তাঁরা ডান কাত হয়ে শুলে কুকুরটিও শুয়ে পড়তো ডান কাত হয়ে। আবার যখন তাঁরা বাম কাত হতেন, তখন কুকুরটিও বাম কাত হয়ে শুয়ে থাকতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাকিয়ে তাদেরকে দেখলে তুমি পিছনে ফিরে পলায়ন করতে ও তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! নিদ্রিত আসহাবে কাহফকে দেখলে যে কেউ ভয় পেয়ে যেতো। আপনিও নিশ্চয় ভয় পেতেন। ভয়ে ও আতংকে পলায়ন করতেন সেখান থেকে। কারণ ওই স্থানটি ছিলো ভয়াবহ রকমের নির্জন।

কালাবী বলেছেন, আসহাবে কাহফের চক্ষু ছিলো জাগ্রত মানুষের মতো খোলা। দেখলে মনে হতো এক্ষুণি তারা হয়তো কথা বলে উঠবেন। আর তাদের চোখের দৃষ্টি ছিলো ভয়ংকর। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের মাথার চুল হয়ে গিয়েছিলো অস্বাভাবিক রকমের লম্বা এবং হাতের নখও হয়ে গিয়েছিলো অতি দীর্ঘ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, তাদেরকে দেখে ভয় লাগতো বলেই কোনো মানুষজন সেখানে যেতো না। তাছাড়া অতি নিভৃত একটি পর্বত গুহায় প্রবেশ করা নিঃসন্দেহে ভীতিপ্রদ ব্যাপার। এই অভিমতটিই যথার্থ বলে মনে হয়।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি আমীর মুয়াবিয়ার সাহায্যার্থে রোমের জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলাম। পথিমধ্যে পড়লো আসহাবে কাহফের সেই ঐতিহাসিক গুহা। মুয়াবিয়া বললেন, গুহামুখের প্রাচীর ভেঙে দেয়া হলে আমরা আসহাবে কাহফকে দেখতে পেতাম। আমি বললাম, তারা তো ছিলেন আপনার চেয়েও উত্তম। এ কথা বলে তাকে নিবৃত্ত করা হলো। বলা হলো, আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন—

লাবিত্ব ত্বালায়াত্ আ'লাইহিম লাওয়াল্লাইতা মিনহুম ফিরারা (তাকাইয়া উহাদিগকে দেখিলে তুমি পিছন ফিরিয়া পলায়ন করিতে)। মুয়াবিয়া তবু আমার কথা শুনলেন না। কিছু লোককে গুহার খবর নিতে পাঠালেন। তারা গুহায় প্রবেশ করলো। কিন্তু সেখানকার বিষাক্ত হাওয়া সহ্য করতে না পেরে প্রাণ ত্যাগ করলো অল্পক্ষণের মধ্যে। বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম' এ কথার অর্থ— যেভাবে আমি ওই গুহাবাসীদের সুদীর্ঘ সময়ের নিদ্রাকে আমার অতুলনীয় শক্তিমত্তার একটি বিশেষ নিদর্শন করেছিলাম, সেভাবে আর একটি বিশেষ নিদর্শন প্রকাশার্থে সেই মৃত্যুসদৃশ নিদ্রা থেকে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে।' একথার অর্থ— আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম এ কারণে যে, যেনো তারা পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে আমার এই বিরল নিদর্শনটির প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হয়। একথা যেনো স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, যিনি শতাব্দির পর শতাব্দি পড়ে থাকা মৃতবৎ মানুষকে জাগ্রত করতে পারেন। তিনি অবশ্যই মহাপ্রলয়ের পর পুনরুত্থিত করতেও সক্ষম। এভাবে তাদের বিশ্বাস যেনো হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিশিষ্ট। আলোচ্য বাক্যের এমতো ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, এখানকার 'লিইয়াতাসাআলু' (তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে) কথাটির 'লাম' কারণ প্রকাশক। অর্থাৎ পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়ার কারণেই তাদেরকে জাগ্রত করা হয়েছিলো। কিন্তু বাগবী লিখেছেন, এখানকার এই 'লাম'টি পরিণতি প্রকাশক। তিনি এ কথাও লিখেছেন যে, তাঁদেরকে জাগ্রত করার পরিণাম এই হলো যে, তারা নিজেদের মধ্যে শুরু করে দিলো জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, কেবল জিজ্ঞাসাবাদই তাঁদের জাগ্রত হওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো না। উদ্দেশ্য ছিলো বিরল নিদর্শনটির তত্ত্বোদ্ধার।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের একজন বললো, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছো? কেউ কেউ বললো, একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ।' একথার অর্থ— জেগে ওঠার পর তাঁদের মনে হলো, তাঁদের নিদ্রা ছিলো স্বাভাবিক নিদ্রার চেয়ে কিছুটা গভীর ও প্রলম্বিত। কিন্তু তার সময় সীমা সম্পর্কে তাঁরা আন্দাজ করতে পারলেন না। তাই বিষয়টি স্পষ্ট করে নেয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করলেন তাঁরা। প্রথমে একজন বললেন, বলতে পারো, কতক্ষণ ধরে আমরা ঘুমিয়েছি? আরেকজন জবাব দিলেন, মনে হয় একদিন অথবা

একদিনের কিছু অংশ। এক বর্ণনায় এসেছে, জেগে উঠে তাঁরা বুঝতে পারলেন নামাজের সময় উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই আক্ষেপ প্রকাশার্থে তাঁরা নিজেদের মধ্যে শুরু করে দিলেন এমতো বাক্যালাপ। উল্লেখ্য যে, তাঁরা গুহায় প্রবেশ করেছিলেন সকালে এবং জাগ্রত হয়েছিলেন সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে। তাই তাঁদের একজন বলেছিলেন, পুরো একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। বলা বাহুল্য যে, তাদের মন্তব্য ছিলো অনুমাননির্ভর। এরকম অনুমাননির্ভর মন্তব্য গ্রহণীয় নয়। কথা বলা উচিত সুনিশ্চিত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে। অথবা বলা উচিত আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

এরপর বলা হয়েছে— 'কেউ কেউ বললো, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছো, তা তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন।' একথার অর্থ— তাঁদের আর একজন সঙ্গী বার বার তাকাচ্ছিলেন তাদের লম্বা লম্বা চুল ও বড় বড় নখগুলোর দিকে। তাই তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন যে, তাঁদের নিদ্রা ছিলো বহুকালের। কিন্তু কতকালের, তা জানার কোনো উপায় ছিলো না। তাই তিনি বললেন, বন্ধুবর্গ! আমাদের এখানকার নিদ্রাভিভূত অবস্থা ও অবস্থানের প্রকৃত জ্ঞান রাখেন কেবল আল্লাহ্। এক বর্ণনায় এসেছে, মাকসালমীনা ছিলেন তাঁদের দলপতি। সঙ্গীগণের বিতর্ক প্রশমনার্থে তিনিই তখন বলে উঠেছিলেন— তোমাদের নিদ্রার অবস্থা, অবস্থান ও পরিসর সম্পর্কে আল্লাহ্ই সমধিক পরিজ্ঞাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ করো।' এ কথার অর্থ— যিনি 'আল্লাহ্র প্রকৃত তত্ত্ব অবগত'— একথা বলে বিতর্কের অবসান ঘটালেন, তিনি অথবা তাঁদের অন্য একজন বললেন, সঙ্গে করে যে মুদ্রাগুলো আমরা নিয়ে এসেছি, সেই মুদ্রাগুলো থেকে কিছু মুদ্রাসহ আমাদের মধ্যে যে কোনো একজনকে খাদ্য ক্রয়ের জন্য নগরে প্রেরণ করা হোক। উল্লেখ্য যে, তিন শতাব্দি পূর্বে যখন তারা বেরিয়ে এসেছিলেন, তখন নগরীর নাম ছিলো আফসুস। তাই তাঁদের মুদ্রাগুলোতে অংকিত ছিলো ওই নাম ও তৎকালীন রাজার নাম। নগরীটি তখন ছিলো মূর্তিপূজক জনগোষ্ঠী প্রভাবিত। পরে ধীরে ধীরে নগরবাসীরা হয়ে যায় এক আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী। নগরীর নামও তখন পরিবর্তিত হয়ে যায়। আফসুসের বদলে নতুন নামকরণ করা হয় তারতুশ। আসহাবে কাহফের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার সময়ে ওই নামই বহাল ছিলো। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে আরেকটি কথা প্রমাণিত হয় যে, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন মাফিক কিছু পাথেয় অথবা কিছু অর্থ-বিত্ত সঞ্চয় রাখা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্ নির্ভরতা বিরোধী নয়। বরং এরকম করাই আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীলগণের স্বভাব।

এরপর বলা হয়েছে—'সে যেনো দেখে কোন খাদ্য উত্তম এবং তা থেকে যেনো কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য; সে যেনো বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করে ও কিছুতেই যেনো তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে কিছু জানতে না দেয়।' একথার অর্থ— আমাদের প্রেরিত খাদ্য সংগ্রাহকের দায়িত্ব হবে হালাল ও উত্তম খাদ্য সংগ্রহ করা এবং এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে কর্মসম্পাদন করা যেনো আমাদের আত্মগোপনের বিষয়টি প্রকাশ না হয়।

জুহাক বলেছেন, এখানকার 'আয্‌কা' শব্দটির অর্থ পবিত্র। মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, সর্বোত্তম। ইকরামা বলেছেন, অধিক পরিমাণ। কেননা জাকাত শব্দটির অর্থ প্রাচুর্য, প্রবৃদ্ধি। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'আয্‌কা' শব্দটির অর্থ সস্তা।

এর পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'তারা যদি তোমাদের বিষয়ে জানতে পারে, তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনোই সাফল্যলাভ করতে পারবে না।' একথার অর্থ— খাদ্য সংগ্রাহক বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সঙ্গে কার্যসম্পাদন না করলে আমরা সেখানকার বিগ্রহপূজারী রাজা অথবা জনতার কাছে ধরা পড়ে যাবো। তখন তারা আমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলবেই অথবা বলপূর্বক করবে ধর্মান্তরিত। আর এরকম হলে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমরা কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আসহাবে কাহফ সত্যধর্ম গ্রহণের পূর্বে ছিলেন বিগ্রহপূজকদের ধর্মানুসারী। তাই এখানে বলা হয়েছে 'তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে'। কথাটির অর্থ এরকম হতে পারে যে— তারা তোমাদেরকে জবরদস্তি করে তাদের অপবিত্র ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত করবে। এই মর্মার্থটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, এখানকার 'আও ইউয়ীদু' কথাটির অর্থ 'ফিরিয়ে নিবে' না হয়ে হবে 'অন্তর্ভুক্ত করে নিবে।'

এর পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এবং এভাবে আমি মানুষকে তাদের বিষয়ে জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোনো সন্দেহ নেই।' একথার অর্থ— এভাবে আমি আসহাবে কাহফের ঘটনাটি ধীরে ধীরে জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিলাম, যাতে করে মানুষ মৃত্যুপরবর্তী কবরের জীবন ও কিয়ামত সম্পর্কে অবলোকন করতে পারে একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন। যেনো একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে জীবনদান এবং কিয়ামত সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, তা সত্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিলো তখন অনেকে বললো, তাদের উপর সৌধ নির্মাণ করো। তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয় ভালো জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো তারা বললো, 'আমরা তো নিশ্চয়ই তাদের উপর মসজিদ নির্মাণ করবো।'

আমি বলি, এখানকার 'নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিলো' কথাটির অর্থ— যে সময় আসহাবে কাহফ জাগ্রত হলেন, সেই সময়ের মানুষ ধর্মের মৌলিক কিছু বিষয়ে প্রায়শই বাদানুবাদ করতো। ইকরামা বলেছেন, তারা তর্কবিতর্ক করতো মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান সম্পর্কে। কেউ কেউ বলতো কিয়ামত, হাশর, নশর ইত্যাদি হবে রূহানীভাবে। আর প্রকৃত বিশ্বাসীরা বলতো শরীরসহ রূহানীভাবে অথবা রূহ্সহ শারীরিকভাবে। আসহাবে কাহফের ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা কথাটির প্রমাণ দিয়েছেন।

এরকমও হতে পারে যে— তাদের মতভেদ দেখা দিয়েছিলো আসহাবে কাহফকে কেন্দ্র করে। জাগ্রত হওয়ার পর যখন তাঁদের মৃত্যু ঘটলো, তখন কেউ কেউ বলতে শুরু করলো, মৃত্যু তাদের হয়নি, আগের মতো পুনরায় তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন মাত্র। আবার কেউ কেউ বললো, ইতোপূর্বে তারা দীর্ঘকাল ধরে ঘুমিয়ে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু এখন তাঁরা সত্যিকার অর্থেই পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আসহাবে কাহফের পরলোক গমনের পর বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেলো প্রচণ্ড বচসা। বিশ্বাসীরা বললো, আমরা এখানে মসজিদ নির্মাণ করবো। কারণ তাঁরা ছিলেন আমাদের পূর্বসূরী। অবিশ্বাসীরা বললো, মসজিদ নয়, এখানে নির্মাণ করতে হবে একটি স্মৃতি সৌধ। তাঁদের পুণ্যময় স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখার নিমিত্তে এরকমই করা উচিত। কারণ তাঁরা ছিলেন আমাদের ধর্মমতানুসারী।

এখানে বিতণ্ডা উপস্থিতকারী দল দু'টোর বক্তব্যের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে এভাবে— 'তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয় ভালো জানেন।' এভাবে উভয়দলের বক্তব্যকে এখানে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যেনো বলে দেয়া হয়েছে— হে অবিশ্বাসীর দল! আসহাবে কাহফ কখনো তোমাদের দলভূত হতে পারে না। কারণ তারা ছিলো এক আল্লাহ্র উপাসক। আর হে বিশ্বাসীর দল! তোমাদেরও একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে তারা তোমাদের মতো সাধারণ পর্যায়ের বিশ্বাসবান। না, কখনোই তা নয়। তারা আমার একান্ত প্রিয়ভাজন। সুতরাং তাদের মর্যাদা তোমাদের চেয়ে অনেক উচ্চে।

উল্লেখ্য যে, সামাজিকভাবে আল্লাহ্র প্রিয়ভাজনগণও সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণভাবে জীবন-যাপন করেন। কিন্তু আত্মিক উৎকর্ষতার দিক থেকে তাঁরা সর্ব

সাধারণের কাতারভুক্ত নন। সুতরাং তাঁরা বাহ্যিকভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা সত্ত্বেও আত্মিক দিক থেকে স্বতন্ত্র ও পৃথক। মাওলানা রুমী তাই বলেছেন—

হরকেসে দর জানে খোদ সুদ ইয়ারেমান
হরকেসে দর জানে খোদ সুদ ইয়ারেমান
ওয়াজদারুনে মান নাজুমতে ইসরারে মান।

অর্থঃ কেউ কেউ স্বধারণার বশবর্তী হয়ে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়, কিন্তু সে তো আমার অভ্যন্তরীণ রহস্য অনুসন্ধান করতে চায় না।

এরকমও হতে পারে যে, বিতণ্ডাকারীরা আসহাবে কাহফের অবস্থা ও অবস্থানের বিষয়ে যখন ঐকমত্যাগত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না, তখন তারা একথা বলতে বাধ্য হলো যে 'তাঁদের প্রতিপালক তাঁদের বিষয়ে ভালো জানেন।' যদি তাই হয়, তবে বলতে হয়, আলোচ্য উক্তিটি ছিলো বিতণ্ডাকারীদের, আল্লাহ্‌র নয়।

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আউলিয়া কেরামের মাজারের পাশে নামাজ পাঠের জন্য মসজিদ বানানো জায়েয। তাদের মাজার থেকে বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে ওই সকল মসজিদে নামাজ পাঠ করার মধ্যে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু আমার উস্তাদ (শাহ্ওলিউল্লাহ্ দেহলবী) এর মতে এরকম করা মাকরূহ। তাঁর অভিমতের সমর্থনে রয়েছে নিম্নে বর্ণিত হাদিসসমূহ—

মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আবুল হিয়াজ আসাদী বর্ণনা করেছেন, আমাকে হজরত আলী বলেছেন, রসুল স. আমাকে যা করতে বলেছেন, আমি তো তোমাকে তা-ই করতে বলবো। সুতরাং মূর্তি দেখতে পেলেই তা ধ্বংস করে দেবে এবং উঁচু কোনো সমাধি দেখতে পেলে তা সমতল না করে ছাড়বে না। হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে ও ইমারত নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

জননী আয়েশা ও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, অন্তিম যাত্রার সময় রসুল স. পীড়িত হলেন। মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে লাগলেন তিনি। রোগ যন্ত্রণার প্রকোপে একবার তিনি স. চাদর দিয়ে মুখ ঢাকছিলেন, আরেকবার তা সরিয়ে ফেলছিলেন। ওই অবস্থায় তিনি বললেন, ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপরে আল্লাহ্‌র অভিশাপ, তারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিলো। জননী আয়েশা আরো বলেছেন, রসুল স. তার উম্মতের জন্য ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুসরণ নিষিদ্ধ করেছেন।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে কবর পাকা করা, উঁচু করা ও কবরের উপর আড়ম্বরপূর্ণ ইমারত নির্মাণ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, কবরের নিকটে মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ। রসুল স. কবরকে মসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু তিনি স. কবরের পাশে মসজিদ বানাতে নিষেধ করেননি। আর ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে তিনি অভিশপ্ত বলেছেন একারণে যে, তারা কবরকে সেজদা করতে শুরু করেছিলো। একথা সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে, কবরকে সেজদা করা হারাম। হজরত আবু মুরছাদ গুনুবী থেকে মুসলিম কর্তৃক সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা কবরের উপরে উপবেশন কোরো না এবং কবরের দিকে মুখ করে নামাজও পাঠ কোরো না।

এর পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ বলে, তারা ছিলো তিন জন, তাদের চতুর্থটি ছিলো তাদের কুকুর। এবং কেউ কেউ বলে, তারা ছিলো পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিলো তাদের কুকুর। আবার কেউ কেউ বলে, তারা ছিলো সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিলো তাদের কুকুর।'

উল্লেখ্য যে, রসুল স. এর সময়ে আসহাবে কাহফের সংখ্যা নিয়ে শুরু হয়েছিলো তুমুল বিতর্ক। কেউ কেউ বলতো, তারা ছিলো তিনজন এবং তাদের সঙ্গে ছিলো একটি কুকুর। কেউ কেউ বলতো, পাঁচজন ছিলো তারা। আর কুকুরটি ছিলো ষষ্ঠ। কেউ কেউ আবার বলতো, না; মোটমাট তারা ছিলো আটজন— সাতজন যুবক ও একটি কুকুর। বলা বাহুল্য যে, এসকল মন্তব্য ছিলো সম্পূর্ণতই অনুমান নির্ভর। তাদের মতামতের পক্ষে কারো কাছেই কোনো প্রমাণ ছিলো না।

বাগবী লিখেছেন, নাজরানে বাস করতো ইয়াকুবিয়া ও নাসতুরিয়া সম্প্রদায়ের খৃষ্টানেরা। ওই সম্প্রদায়ভূত সাইয়েদ ও আকেব একবার রসুল স. এর দরবারে আসহাবে কাহফ সম্পর্কে আলোচনা তুললো। সাইয়েদ বললো, তারা ছিলো তিনজন এবং তাদের চতুর্থটি ছিলো তাদের কুকুর। আকেব বললো, না। তারা ছিলো পাঁচজন এবং তাদের ষষ্ঠটি ছিলো তাদের কুকুর। আলোচ্য আয়াতাংশে ওই দু'জনের উক্তিই উল্লেখ করা হয়েছে।

'রজমুন' অর্থ তীর নিক্ষেপ করা। 'আলগইব' অর্থ অদৃশ্য। এভাবে এখানে বলা হয়েছে, আসহাবে কাহফ সম্পর্কে খৃষ্টানদের বর্ণিত উক্তি শূন্যে তীর নিক্ষেপ করা বা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো। এভাবে অনুমানের মাধ্যমে সত্যোদ্ধার করা যায় না। উল্লেখ্য যে আসহাবে কাহফ সম্পর্কে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানেরাও অনুমানের ভিত্তিতে তাঁদের সংখ্যা নিরূপণ করতে শুরু করে দিলেন। সে কথাই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— 'আবার কেউ কেউ বলে, তারা ছিলো সাতজন আর অষ্টমটি ছিলো তাদের কুকুর।

'ওয়া ছামিনুহুম কালবুহুম' (অষ্টমটি ছিলো তাদের কুকুর) কথাটি এখানে গুণবাচক, যা 'সাব্‌আতুন' (সাত) এর সিফাত বা বৈশিষ্ট্য। সিফাত সবসময় তার মওসুফের (বিশেষ্যের) সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। এভাবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— অষ্টমটি ছিলো তাদের কুকুর।

কোনো কোনো আলেম ধারণা করেন, এখানে 'ওয়া ছামিনুহুম কালবুহুম' কথাটির 'ওয়া' (এবং) অব্যয়টি বস্তুবাচক। আরববাসীদের রীতি হচ্ছে তাঁরা সাত সংখ্যা গণনা পর্যন্ত কোনো সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করেন না। সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করেন আট সংখ্যা থেকে। যেমন — এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত এবং আট। কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে— আত্তাইবুনা, আলআবিদূনা, আলহামিদূনা, আস্‌সা-ইহুনা, আর্‌রকিউনা, আস্‌সাজিদূনা, আলআমিরূনা বিল মা'রূফ ওয়ান্‌ নাহুনা আনিল্‌ মুনকার। এখানে অষ্টম কথাটির (ওয়ান্‌নাহুনা আনিল মুনকার) কথাটির পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে 'ওয়াও' বা এবং। অন্যত্র উল্লেখিত হয়েছে— মুসলিমাতুন-মু'মিনাতুন-ক্বানিতাতুন-তাইবাতুন-আবিদাতুন-ছাইহাতুন-সায়্যিবার্তিওয়া আব্‌কারা। এখানে শেষোক্ত (অষ্টম) শব্দটির পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে 'ওয়াও' বা এবং।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা ভালো জানেন; তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানেন।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল বচসাপ্রবণ খৃষ্টানদেরকে বলুন, আসহাবে কাহফের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে তোমাদের সম্প্রদায়ের অল্প কয়েকজন মাত্র। আর মুসলমানদেরও কেউ কেউ আমার মাধ্যমে তাদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে অবগত।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি ওই স্বল্প সংখ্যক লোকদের মধ্যে একজন, যে আসহাবে কাহফের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত। তাঁরা ছিলেন সাতজন। বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন ইবনে জারীর, ফারইয়াবী প্রমুখ। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তাঁরা ছিলেন সাতজন এবং তাঁদের অষ্টমটি ছিলো তাঁদের কুকুর।

বায়যাবী লিখেছেন, আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে তিন রকম উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয় প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে একথা বলে যে, 'অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ বলবে।' কিন্তু শেষোক্ত উক্তিটিকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। সুতরাং 'তারা ছিলো সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিলো তাদের 'কুকুর' এই উক্তিটিই যথার্থ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই সাতজন আসহাবে কাহফের নাম হচ্ছে— মাকসালমীনা, তামলিখা, মারতুনাস, সানুনাস, সারিনুনাস,

জুনায়াস, কাআস্ ও তাতীয়ুনাস। শেষোক্তজন ছিলেন রাখাল। তিনি তাঁদের দলভুক্ত হয়েছিলেন পরে। যথাযথসূত্রে তিবরানী তাঁর আওতাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, শায়েখ ইবনে হাজার তাঁর শরহে বোখারী পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, বর্ণিত নামগুলো সম্পর্কে রয়েছে অনেক মতভেদ। সুতরাং তা সর্বজনগ্রাহ্য নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক কোরো না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আসহাবে কাহফের সংখ্যা নিরূপণের প্রসংগটিকে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবেন না। কোথাও এ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বিভিন্ন রকম মন্তব্য শুনেও এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সমাধান দেয়ার ব্যাপারে ব্যগ্র হবেন না। বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যাবশ্যকীয় কিছু নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক পরিহার্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের কাউকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ কোরো না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আসহাবে কাহফের সংখ্যা ও তাদের কাহিনী সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে আপনাকে যতটুকু জানানো হলো তাই-ই যথেষ্ট। আর এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে অন্য কেউই বেশী জানে না। সুতরাং অন্য কাউকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিরর্থক। তাছাড়া স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে নির্জবাব করে দেয়াও আপনার কাজ নয়। অযথা কাউকে বিব্রত করাও আপনার মহান মর্যাদার পক্ষে শোভন নয়।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. একবার 'ইনশাআল্লাহ্ ' না বলেই কোনো এক বিষয়ে অঙ্গীকার করেছিলেন। ফলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁর নিকটে কোনো প্রত্যাদেশ এলো না। প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো চল্লিশ দিন পর এভাবে—

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۔ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ۔ وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ۔ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اَبۡصِرۡ بِهٖ وَاَسۡمِعۡ مَا لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّلِيٍّ وَّلَا يُشۡرِكُ فِيۡ حُكۡمِهٖۤ اَحَدًا ۝ وَاتۡلُ مَاۤ اُوۡحِيَ اِلَيۡكَ مِنۡ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ وَلَنۡ تَجِدَ مِنۡ دُوۡنِهٖ مُلۡتَحَدًا ۝ وَاصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ الَّذِيۡنَ يَدۡعُوۡنَ رَبَّهُمۡ بِالۡغَدٰوةِ وَالۡعَشِيِّ يُرِيۡدُوۡنَ وَجۡهَهٗ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنٰكَ عَنۡهُمۡ تُرِيۡدُ زِيۡنَةَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَلَا تُطِعۡ مَنۡ اَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهٗ عَنۡ ذِكۡرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمۡرُهٗ فُرُطًا ۝

❒ কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলিও না, "আমি উহা আগামী কাল করিব,

❒ 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে' এই কথা না বলিয়া।" যদি ভুলিয়া যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিও ও বলিও, 'সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করিবেন।'

❒ উহারা উহাদিগের গুহায় ছিল তিনশত বৎসর, আরও নয় বৎসর।

❒ তুমি বল, 'তাহারা কত কাল ছিল তাহা আল্লাহ্ই ভাল জানেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁহারই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা। তিনি ব্যতীত উহাদিগের অন্য কোন অভিভাবক নাই। তিনি কাহাকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।

❒ তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব আবৃত্তি কর। তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহই নাই। তুমি কখনই তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাইবে না।

❒ তুমি নিজকে রাখিবে উহাদিগেরই সংসর্গে যাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে উহাদিগের প্রতিপালককে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করিয়া উহাদিগ হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইও না। যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তাহার আনুগত্য করিও না।

এখানকার প্রথমোক্ত আয়াতের বক্তব্য প্রলম্বিত হয়েছে পরবর্তী আয়াত (২৪) পর্যন্ত। বলা হয়েছে 'কখনোই তুমি কোনো বিষয়ে বোলো না, আমি এটা করবো আগামীকাল, 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে' এ কথা না বলে।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! 'ইনশাআল্লাহ্' উচ্চারণ ব্যতিরেকে আপনি এরকম কখনো বলবেন না যে, আমি এই বিষয় সম্পর্কে আগামীকাল বলবো অথবা এই কাজ আগামীকাল করবো।

ইবনে মুনজির মুজাহিদ সূত্রে বলেছেন, মদীনার ইহুদীরা মক্কার কুরায়েশদের প্রেরিত দূতকে বলেছিলো, তোমরা নবুয়তের দাবি উত্থাপনকারী লোকটিকে রূহ, আসহাবে কাহ্ফ ও জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখো। কুরায়েশেরা তাই করলো। রসুল স. বললেন, আমি আগামীকাল তোমাদের প্রশ্নের জবাব দিবো। কিন্তু এ কথা বলার সময় তিনি 'ইনশাআল্লাহ্' উচ্চারণ করলেন না। রসুল স. ভেবেছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করে তিনি কুরায়েশদের প্রশ্নের জবাব দিবেন। কিন্তু পরদিন কোনো প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো না। এভাবে দশ দিন অপেক্ষা করেও কোনো প্রত্যাদেশ না পেয়ে তিনি স. অস্থির হয়ে পড়লেন। এদিকে কুরায়েশেরা বলতে শুরু করলো, তুমি মিথ্যাবাদী। এমতাবস্থায় দশদিন পর অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। এই সুরার প্রারম্ভে এ প্রসঙ্গে আমি ইবনে জারীরের একটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি। আর সুরা বানী ইসরাইলের 'ওয়া ইয়াসআলুনাকা আ'নির্রূহ্' আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশেও আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ওই দুই স্থানেও রসুল স.কে 'ইনশাআল্লাহ্' উচ্চারণ ব্যতিরেকে কোনো অঙ্গীকার করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব এ কথা অনস্বীকার্য যে, দৃঢ়ভাবে কোনো কথা বলা বা কাজ করার ইচ্ছা করলে সেই ইচ্ছার সঙ্গে ইনশাআল্লাহ্ বলে আল্লাহ্র ইচ্ছাকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি ভুলে যাও, তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কোরো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি যদি ইনশাআল্লাহ্ ছাড়া কোনো কথা বা কাজের ঘোষণা দেন, তবে আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসার বর্ণনা এবং ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করবেন। অথবা এমতো অনবধনতার কারণে আল্লাহ্র বিরাগভাজনতার কথা স্মরণ করে অনুতপ্ত হবেন। কিংবা এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্কে স্মরণ করবেন যেনো তিনি আপনার বিস্মৃতিপ্রবণতাকে দূর করে দেন এবং আপনার স্মরণশক্তিকে করে দেন প্রখর।

ইকরামা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে এই মর্মে সদুপদেশ দেয়া হয়েছে, যখন তোমরা রাগান্বিত হও তখন আল্লাহ্কে স্মরণ কোরো। ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, ইঞ্জিল শরীফে উল্লেখিত হয়েছে— হে আদম সন্তান! তোমরা

রোষ প্রভাবিত হলে আমাকে স্মরণ কোরো (তাহলে রোষ প্রশমিত হবে)। এরকম করলে আমার রোষতপ্ত অবস্থায়ও আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো (ক্ষমা করবো তোমাদের অপারগতাকে)। জুহাক এবং সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনাটি নামাজের হুকুমের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে— 'নামাজের মধ্যে যখন তোমরা কোনো করণীয় আমলের কথা ভুলে যাও, তবে আল্লাহ্কে স্মরণ কোরো'। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— নামাজ পাঠের কথা যদি তোমরা ভুলে যাও, তবে স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নামাজ আদায় করে নিয়ো। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যে ব্যক্তি নামাজ পড়তে ভুলে যায়, সে যেনো স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আদায় করে নেয়। বাগবী, বোখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিজি। নাসাঈর বর্ণনায় বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— বিস্মৃতি অথবা নিদ্রার কারণে যদি কারো নামাজ যথাসময়ে পঠিত না হয়, তবে তার কর্তব্যকর্ম হচ্ছে, স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তার বাদ পড়ে যাওয়া নামাজ আদায় করে নেবে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, যে ব্যক্তি বিতির নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে যায় অথবা বিতির পড়তে ভুলে যায়, সে যেনো ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে অথবা স্মৃতি জাগ্রত হওয়ার পরক্ষণেই তার পরিত্যক্ত নামাজ পাঠ করে নেয়। আহমদ এবং হাকেম একে বিশুদ্ধ বলেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মুজাহিদ ও হাসান বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকম— ইনশাআল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে, পরে যখনই স্মরণ হবে, তখনই ইনশাআল্লাহ্ বলে নিতে হবে। এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই বলেছেন, ভুলে যাওয়া 'ইনশাআল্লাহ্'র কথা এক বছর পরেও স্মরণ হলে 'ইনশাআল্লাহ্' পড়ে নেয়া জায়েয, যদি এর মধ্যে অঙ্গীকৃত কথার বিপরীত কিছু না করা হয়। এই অভিমতের সমর্থনে ইবনে মারদুবিয়াও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে একটি বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দশদিন অথবা চল্লিশ দিন পরে আল্লাহ্ কর্তৃক স্মরণ করিয়ে দেয়া মাত্র রসুল স. 'ইনশাআল্লাহ্' পড়ে নিয়েছিলেন।

প্রখ্যাত ফেকাহ্বিদগণের অভিমত আবার হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতের বিপরীত। তাঁদের মতে অভিন্ন কোনো বাক্যের পরের অংশ যদি প্রথমাংশের বক্তব্যের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করে, তাহলে বাক্যটি পৃথকভাবে উচ্চারণ করা যাবে না। অর্থাৎ বাক্যটিকে উচ্চারণ করতে হবে সম্মিলিতভাবে। যেমন কোনো ঘরের মধ্যে জায়েদ বললো, ওমরের কাছে আমার এতো টাকা পাওনা আছে। তারপর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে বললো, কিন্তু ওমর যদি এর বদলে আমাকে

অমুক বস্তু দিয়ে দেয়.....। অথবা সে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার দুই ঘণ্টা পর কিংবা তার গোলাম আজাদ করার তিন ঘণ্টা পর কোনো শর্ত আরোপ করে তালাক ও আজাদ করাকে অকার্যকর করে দিলো। এরকম বিলম্বিত শর্ত সংযোজন অসিদ্ধ। কারণ জায়েদ আবার পরের দিন অন্য কোনো শর্তও আরোপ করতে পারে। এভাবে কখনোই বোঝা যাবে না যে, তার কোন কথাটা সত্য— আগেরটা, না পরেরটা। এ সম্পর্কে এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি এই— ... খলিফা আল মনসুরকে একজন লোক এইমর্মে সংবাদ দিলো যে, ইমাম আবু হানিফা আপনার পিতামহ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বিপরীত ফতওয়া দিয়ে থাকেন। বলে থাকেন ইনশাআল্লাহ্ বলতে হবে উচ্চারিত বাক্যের সঙ্গে সম্মিলিতরূপে। পরে ইনশাআল্লাহ্ বললে তা গ্রহণীয় হবে না। একথা শুনে খলিফা আল মনসুর ইমাম আবু হানিফাকে ডেকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। ইমাম আবু হানিফা বললেন, হজরত ইবনে আব্বাসের ফতওয়াতো আপনারও বিরুদ্ধে যায়। আপনি প্রজা সাধারণের নিকট থেকে আনুগত্যের অংগীকার গ্রহণ করেন। অঙ্গীকার করে যদি তারা আপনার দরবার ত্যাগ করার পর ইনশাআল্লাহ্ (যদি আল্লাহ্ চান) বলে, তবে কি তা গ্রহণযোগ্য হবে? খলিফা আল মনসুরের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেলো। তিনি ইমাম আবু হানিফার অভিমতকেই গ্রহণ করলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে উস্কানিদাতাকে বের করে দিলেন দরবার থেকে।

এখন বাকী রইল আর একটি কথা। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, রসুল স. ইনশাআল্লাহ্ বলেছিলেন অনেক পরে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। কিন্তু কথাটির মাধ্যমে এটা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলেছিলেন তাঁর দশদিন বা চল্লিশদিন পূর্বের বাক্যের সংযোজকরূপে। বরং একথা বলাই যুক্তি সঙ্গত যে, তিনি স. তখন ইনশাআল্লাহ্ বলেছিলেন এই অর্থে— ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ্ বলার এই হুকুম তিনি অবশ্যই পালন করে যাবেন।

সুফিয়ানে কেরাম আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এক সারগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরূপ— যখন তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল কিছুর কথা ভুলে যাও, তখন আল্লাহ্র কথা স্মরণ কোরো বিশুদ্ধ অন্তরে। তাঁরা আরো বলেন গাইরুল্লাহ্র স্মরণ থেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিশুদ্ধ হৃদয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করা যায় না। কারণ মানুষের হৃদয় একটিই। সুতরাং একথা কিছুতেই বলা যায় না যে, হৃদয়ে একই সঙ্গে জাগ্রত থাকবে আল্লাহ্ এবং গাইরুল্লাহ্র স্মরণ। হৃদয়কে যদি আল্লাহ্র ভালোবাসায়

সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করা যায়, তাহলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও রঞ্জিত হবে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও স্মরণে। এই অবস্থার নাম আত্মবিনাশন বা ফানায়ে কলব। এই ফানায়ে কলব অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সুফিয়ানে কেরাম কাউকে তওহীদপন্থী বা এক আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী মনে করেন না। আমি বলি, সুফিয়ানে কেরামের ব্যাখ্যাই কোরআন মজীদের স্পষ্ট বর্ণনা ও আরবী ব্যাকরণ এবং অভিধানের অনুকূল। দেখুন, এখানে প্রথমে বলা হয়েছে, 'যদি ভুলে যাও'। তারপর বলা হয়েছে 'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কোরো'। এভাবে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, বিস্মরণ ও স্মরণ বিপরীত ধর্মী দু'টি বিষয়। এ দু'টোর একত্রায়ন হওয়া সম্ভবই নয়। সুতরাং এ দু'টো ক্রিয়ার একটিকে পরোক্ষ অর্থে এবং আরেকটিকে প্রত্যক্ষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে, যেনো কোনো অবাস্তব অর্থ গ্রহণ করতে না হয়। সুতরাং এ কথা মানতেই হবে যে, এ ক্ষেত্রে সুফিয়ানে কেরামের বক্তব্য বাস্তবচিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বোলো, সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! ইনশাআল্লাহ্ বলা অথবা আল্লাহ্‌র কোনো হুকুম পালনের কথা যদি আপনি কখনো ভুলে যান, তবে আপনি তসবিহ্ পাঠ করবেন, ইসতেগফার করবেন এবং একথা বলবেন যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ্ আমাকে এমন কিছুর দিকে পথ-নির্দেশ করবেন, যা হবে বিস্মৃত বাক্য অথবা কর্ম অপেক্ষা উত্তম। এখানে 'আকুরাবু' এবং 'রাশাদা' কথা দু'টোর মাধ্যমে সেই উত্তমতর পথ-নির্দেশের কথাই বলা হয়েছে।

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, অবশেষে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রসুলকে কুরায়েশদের প্রশ্নের জবাবরূপে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আসহাবে কাহফের ঘটনা জানালেন। সবশেষে একথাটিও জানিয়ে দিলেন যে, আসহাবে কাহফের ঘটনার চেয়েও অনেক উত্তম ও বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী আল্লাহ্ তাঁর নবী-রসুলগণকে দান করেছেন। আর বিশেষ করে শেষ রসুলকে দান করেছেন অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক বিস্ময়কর তত্ত্ব ও তথ্যাবলী। কোনো কোনো আলেম আবার লিখেছেন, এখানে আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে এবং রসুলের মাধ্যমে সকল বিশ্বাসীকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ইনশাআল্লাহ্ বলা ভুলে গেলে যখনই একথা স্মরণ হবে, তখনই ইনশাআল্লাহ্ বলে নিতে হবে। ভুলের জন্য হতে হবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত। এমতো আশাও অন্তরে পোষণ করতে হবে যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ্ আমাদেরকে আমাদের বিস্মৃত বিষয় অপেক্ষা অধিকতর উত্তম কোনো কল্যাণ দান করবেন। লজ্জা ও অনুতাপের বিনিময়ে দান করবেন তাঁর বিশেষ নৈকট্য।

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তারা তাদের গুহায় ছিলো তিনশত বছর, আরো অধিক নয় বছর ।' উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে একাদশ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছিলো 'অতঃপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম।' তারপর এই আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হলো যে, আসহাবে কাহফ পর্বত গহ্বরে নিদ্রাভিভূত হয়েছিলেন তিনশত নয় বছর।

খৃষ্টানেরা বলতো, আসহাবে কাহফ গুহায় নিদ্রিত অবস্থায় কাটিয়েছিলেন তিনশত নয় বছর। তাদের অভিমতটিই আলোচ্য আয়াতে অবিকল উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতের (২৬) শুরুতে এভাবে— 'তুমি বলো, তারা কতকাল ছিলো তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।' এরকম না হলে আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতের উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে কিছুতেই সামঞ্জস্য সাধিত হয় না।

আমি বলি, প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই সঠিক। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত উক্তি খৃষ্টানদের নয়, আল্লাহ্র। আর পরবর্তী আয়াতে উদ্ধৃত বাক্যটির উদ্দেশ্য হবে এখানে এরকম— আসহাবে কাহফ তাদের গুহায় তিনশত নয় বছর ঘুমিয়েছিলেন। এই তথ্যটিই সকলকে মেনে নিতে হবে। কারণ এটা প্রত্যা-দেশিত। এরপরেও যদি কেউ এ নিয়ে বিবাদ উপস্থিত করে, তবে হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে একথা জানিয়ে দিন যে, তারা কতকাল ছিলো তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। সুতরাং অযথা বিবাদ বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়ার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা মনে করতো, আসহাবে কাহফ গুহায় প্রবেশ করার সময় থেকে রসুল স. এর জামানা পর্যন্ত অতিবাহিত হয়েছে তিনশত নয় বছর। তাদের ওই অপধারণাকেই পরবর্তী আয়াতে নাকচ করে দেয়া হয়েছে এভাবে— 'তারা কতকাল ছিলো তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।'

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া এবং জুহাক সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, প্রথমে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো এভাবে— 'তারা তাদের গুহায় ছিলো তিনশত বছর।' সাহাবীগণ তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কথাটির প্রকৃত অর্থ কী? তিন বছর না তিন মাস। তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয় বর্তমানরূপে। অর্থাৎ 'আরো নয় বছর' কথাটি যুক্ত হয়ে।

এ সম্পর্কে কালাবী বলেছেন, আলোচ্য আয়াত শুনে নাজরানের খৃষ্টানেরা বলেছিলো, আমরা জানতাম তিন শ' বছরের কথা। অতিরিক্ত নয় বছরের কথা আমরা জানতাম না। তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

এর পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'তুমি বলো, তারা কতকাল ছিলো তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।' বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, সৌর বৎসরের হিসেবে আসহাবে কাহফ নিদ্রিত ছিলেন তিনশত বছর। আর চান্দ্র

বৎসরের হিসেবে তিনশত নয় বছর। একশত সৌর বৎসর অতিবাহিত হলে চান্দ্র বৎসর অতিবাহিত হয় একশত তিন বৎসর। এই হিসেবে তিনশত সৌর বৎসর হয় তিনশত নয় চান্দ্র বৎসর। অতএব বুঝতে হবে, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে চান্দ্র বৎসরের হিসাব।

এরপর বলা হয়েছে— 'আকাশ ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁর-ই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তাই তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কিছু জানেন। সেই সঙ্গে তিনি সকল কিছু দেখেন ও শোনেন। কেননা তিনিই প্রকৃত অর্থে সর্বোত্তম শ্রোতা ও দ্রষ্টা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি ব্যতীত তাদের অন্য কোনো অভিভাবক নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালাই সমগ্র সৃষ্টির একক ও অবিসংবাদিত অভিভাবক। সকল কিছুর উপরে তাঁর কর্তৃত্ব ও অধিকার নিরঙ্কুশ। তাঁর এই নিরঙ্কুশতার মধ্যে অন্য কারো কোনো প্রকার অংশীদারিত্ব নেই। হওয়া সম্ভবও নয়।

রসুল স. প্রথমে আসহাবে কাহফের বিষয়ে কিছুই জানতেন না। তাঁকে বিষয়টি জানানো হয়েছিলো প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। ফলে এ সম্পর্কিত আয়াতগুলো হয়ে গেলো তাঁর ও কোরআনের একটি মোজেজা। তাই কোরআনের অন্যান্য আয়াতের মতো এতদসংক্রান্ত আয়াতগুলোকেও অনুরাগ ভরে আবৃত্তি করার নির্দেশ দেয়া হলো। পরবর্তী আয়াতে ঘটেছে সেই নির্দেশের প্রতিফলন।

এর পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদৃষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব আবৃত্তি করো। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করবার কেউই নেই।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ এই মহাগ্রন্থ আপনি আন্তরিক অনুরাগ ভরে পাঠ করুন এবং এর নির্দেশানুসারে জীবন-যাপন করুন। আর ওই সকল লোকের কথায় ভ্রূক্ষেপ করবেন না, যারা কোরআনের মধ্যে সন্দেহের অনুপ্রবেশ ঘটাতে চায় অথবা পরিবর্তন করতে চায় এর বাণী ও মর্ম। নিশ্চিত জানবেন, শত সহস্র কৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেও একক অথবা সম্মিলিতভাবে কেউ কোনো দিনও আল্লাহ্র এই চিরন্তন বাণীকে কিছুমাত্র পরিবর্তন করতে পারবে না। কারণ এই কোরআন হচ্ছে মহানিসর্গের একক স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালার আনুরূপ্যবিহীন বাণী। আর আল্লাহ্র বাণী অপরিবর্তনীয়। 'তার বাক্য পরিবর্তন করবার কেউই নেই' কথাটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে— এই কোরআনে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তি সম্পর্কে যে বিবরণ দেয়া হয়েছে, সেই শাস্তি পরিবর্তন করবার কেউই নেই। সুতরাং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আখেরাতে অথবা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে শাস্তি ভোগ করতে হবেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি কখনোই তাঁকে ব্যতীত অন্য কোনো আশ্রয় পাবে না।'একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোথাও কারো কোনো আশ্রয়স্থল নেই। সুতরাং এই মুহূর্তে তোমরা আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশাদিকে সর্বান্তকরণে কবুল করে নাও।

এর পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তুমি নিজেকে রাখবে তাদেরই সংসর্গে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।' এখানে 'ওয়াস্‌বির নাফসাকা' কথাটির অর্থ— নিজেকে আবদ্ধ রাখবেন। 'বিলগাদাতি ওয়ালআশিয়্যি' অর্থ সকাল ও সন্ধ্যায়। অর্থাৎ সকল সময়। 'ইউরিদূনা' অর্থ ইবাদতের উদ্দেশ্যে বা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে। আর এখানকার 'ওয়াজহাহু' শব্দটির 'ওয়াজহুন' হচ্ছে অতিরিক্ত। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'ওয়া ইয়াব্‌ক্বা ওয়াজহু রব্বিকা'। এখানকার 'ওয়াজহু' শব্দটিও অতিরিক্ত। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি নিজেকে ওই সকল লোকের সংসর্গে আবদ্ধ রাখবেন, যারা সকল সময় দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ লাভার্থে আল্লাহ্র স্মরণে মগ্ন থাকে।

বাগবী লিখেছেন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উয়াইনা বিন হোসাইন ফাজরীকে কেন্দ্র করে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সে একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলো। তখন কতিপয় নিঃস্ব সাহাবী বসেছিলেন তাঁর নিকটে। হজরত সালমান ফারসীও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। ছোট একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে উপবিষ্ট ছিলেন তিনি। উয়াইনা বললো, মোহাম্মদ! এদের ঘামের গন্ধে কি আপনার কষ্ট হয় না? আমি তো মুজার গোত্রের সরদার। আমি ইসলাম গ্রহণ করলে আমার গোত্রের সকল লোক আমাকে অনুসরণ করবে। কিন্তু আমিতো এরকম নোংরা লোকের পাশে বসতে পারবো না। যদি আপনি এদেরকে অন্যত্র গমনের নির্দেশ দেন, তবেই কেবল আমার পক্ষে আপনার সান্নিধ্যে উপবেশন করা সম্ভব। তার এমতো অপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

কাতাদা বলেছেন 'যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে' বলে এখানে বোঝানো হয়েছে আসহাবে সুফ্‌ফাকে। সর্বহারা ছিলেন তাঁরা। রসুল স. তাঁদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মসজিদের বারান্দার এক কোণে। তাঁদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে সাতশত পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। ওই নিঃস্ব সাহাবীবৃন্দ সারাক্ষণ জিকির আযকারের মাধ্যমে সময় কাটাতেন। এক ওয়াক্তের নামাজ শেষে প্রতীক্ষা করতেন পরবর্তী ওয়াক্তের নামাজের। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল

স. বলেছিলেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন পুণ্যবান লোক সৃষ্টি করেছেন, যাদের সংসর্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে। এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি সুরা আনআমের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না।' একথার অর্থ— এবং হে আমার রসুল! সম্পদশালীদেরকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে আপনি আপনার আল্লাহ্ অন্তপ্রাণ নিঃস্ব সহচরবৃন্দদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না। বিত্তহীন পুণ্যবানদের চেয়ে পুণ্যবিবর্জিত বিত্তশালীদেরকে প্রদান করবেন না অধিক গুরুত্ব।

এরপর বলা হয়েছে— 'যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে, তুমি তার আনুগত্য কোরো না।'

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যে দেয়া হয়েছে উয়াইনার বিবরণ। বলা হয়েছে, হে আমার রসুল! আমি উয়াইনার চিত্তকে আমার স্মরণ থেকে বঞ্চিত করেছি। সে তার প্রবৃত্তিজাত খেয়ালের অনুসারী এবং তার কার্যকলাপ সীমালংঘনের দায়ে দুষ্ট। অতএব আপনি তার কথায় আকৃষ্ট হবেন না। কিন্তু ইবনে মারদুবিয়া ও জুহাকের বর্ণনায় এসেছে আলোচ্য বাক্যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে উমাইয়া বিন খালফ জামুহীর। সে একবার রসুল স.কে বলেছিলো, মোহাম্মদ! তোমার দরিদ্র সহচরদের দূর করে দিয়ে তদস্থলে বসাও মক্কার নেতৃবৃন্দকে। বলা বাহুল্য যে, তার এরকম গর্হিত বক্তব্য আল্লাহ্ পছন্দ করেননি। সে কথা জানিয়ে দেয়ার জন্যই তিনি অবতীর্ণ করেছেন আলোচ্য আয়াত। ইবনে বুরাইদার বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন হজরত সালমান ফারসী। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো উয়াইনা। বললো, আমরা যারা অভিজাত, তারা আপনার নিকটে উপবেশন করার অভিলাষী। তাই আপনি ওই অনভিজাতদের তাড়িয়ে দিন। তখন অবতীর্ণ হলো— যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি .... । আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, অভিজাত নেতৃবৃন্দের আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে হবে দু'টি কারণে। ১. তাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন । অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রাপ্তির ন্যূনতম অনুরাগও তাদের হৃদয়ে নেই। ২. তারা অনুসরণ করে তাদের প্রবৃত্তির এবং তাদের কার্যকলাপ অতিক্রম করে শরিয়তের সীমানা। উল্লেখ্য যে, পার্থিব প্রতাপ ও বংশমর্যাদার অহংকার দূর না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের নৈকট্য লাভ করা যায় না। সুতরাং যাদের কলব আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল এবং যারা নফসের একনিষ্ঠ অনুসারী, তাদের অনুসরণ নিষিদ্ধ।

মুতাজিলারা বলে, আল্লাহ্ কেবল শুভকর্মের স্রষ্টা, মন্দ কর্মের নয়। কিন্তু এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 'যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি'। এতে করে বুঝা যায়, আল্লাহ্তায়ালা শুভ-অশুভ সকল কর্মের একক সৃজয়িতা। এরকম না বলা হলে একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে এবং তা অবশ্যই হবে স্পষ্টতঃ অংশীবাদিতা বা শিরিক। তাই বিশুদ্ধ বিশ্বাস বহনকারী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলেন, একাধিক সৃজকের অস্তিত্ব যেহেতু অসম্ভব, তাই একথা মেনে নিতেই হবে যে, আল্লাহ্তায়ালা ভালো ও মন্দ সকল কাজের একক স্রষ্টা।

লক্ষণীয় যে, পরক্ষণেই আবার বলা হয়েছে, 'যে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে'। এতে করে বুঝা যায়, বান্দাগণ তাদের কর্মের নির্মাতা। তারা জড় পদার্থতুল্য নয়। তাই বলতে হয়, সৃজন আল্লাহ্র, কিন্তু নির্মাণ মানুষের। তাই তারা পুরোপুরি অকর্মণ্য যেমন নয়, তেমনি নয় সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা আপনাপন কর্মের জন্য সে কারণেই দায়ী। কেননা সৃষ্টি আল্লাহ্র হলেও অর্জন বান্দার।

'ফুরুত্বা' অর্থ দ্বিয়্যাআ (বিনষ্ট) অর্থাৎ ধ্বংস করা বা নষ্ট করা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ্র স্মরণে অমনোযোগী এবং যারা প্রবৃত্তির অনুসারী, তাদের কার্যকলাপ নিষ্ফল (ফুরুত্বা)। কেউ কেউ বলেছেন এখানে ফুরুত্বা শব্দটির অর্থ লজ্জাজনক। মুকাতিল এবং আখফাস বলেছেন, সীমাতিক্রম। কেউ কেউ বলেছেন, বাতিল বা বরবাদ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সত্যের বিপরীত। ফার্রা অর্থ করেছেন, পরিত্যক্ত। বায়যাবী লিখেছেন, সত্যকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী। যে অশ্ব অন্য সকল অশ্বকে পিছনে ফেলে অতি দ্রুত অগ্রসর হয়, তাকে বলে 'ফারাসুন ফুরুত্বুন'। আর 'ফারাত্বুন' বলা হয় সম্মুখবর্তী তাঁবু ও সকল অগ্রণীকে। এই 'ফারাত্বুন' থেকেই পরিগঠিত হয়েছে 'ফুরুত্বা'।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ২৯, ৩০, ৩১

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا
يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ
مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ

اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۝ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۗ نِعْمَ الثَّوَابُ ۗ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝

❒ বল, 'সত্য তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত; সুতরাং যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যাহার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।' আমি সীমা লঙ্ঘনকারীদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি অগ্নি, যাহার বেষ্টনী উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিবে। উহারা পানীয় চাহিলে উহাদিগকে দেওয়া হইবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যাহা উহাদিগের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করিবে, ইহা নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়।

❒ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি তাহাদিগকে পুরস্কৃত করি, যে সৎকর্ম করে আমি তাহার শ্রমফল নষ্ট করি না;

❒ উহাদিগরেই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় উহাদিগকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হইবে, উহারা পরিধান করিবে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হইবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যা আসে, তা-ই চিরন্তন সত্য। মানুষের খেয়ালখুশিজাত কোনো চিন্তা বা দর্শন কখনো চিরন্তন সত্য নয়। সুতরাং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ কোরআন এবং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত রসুল সত্য।

এরপর বলা হয়েছে— সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।' একথার অর্থ— অতএব মানুষ কী করবে, তা তারা নিজেরাই নির্ধারণ করুক। সত্য গ্রহণ করুক, অথবা করুক প্রত্যাখ্যান। আল্লাহ্‌র এতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কারণ কোনো বিষয়েই তিনি তাঁর সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে উয়াইনার অপপ্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সে রসুল স.কে এইমর্মে প্রস্তাব দিয়েছিলো, নিঃস্ব ও নোংরা লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিলে আমি ও আমার গোত্রের লোকেরা আপনার বিশেষ

সান্নিধ্য ও ইসলাম গ্রহণ করতে পারি। তার ওই কথাকে প্রত্যাখ্যান করে এখানে স্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের বেলায় এরকম শর্ত করার অধিকার কারো নেই। ইসলামে অনুপ্রবেশ করতে হবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, স্বেচ্ছায়, শর্তবিহীনভাবে। যে এরকম করবে সে উপকৃত হবে। আর যে করবে না, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে।' ছোট ছোট কুড়ে ঘর ও তাঁবুর চতুস্পার্শ্বে যে বেড়া দেয়া হয়, তাকে বলে 'সুরাদিক্ব'। নেহায়া প্রণেতা লিখেছেন, 'সুরাদিক্ব' বলে সকল প্রকার বেষ্টনীকে। শব্দটি মু'রাব (রূপান্তরক্ষম) এবং মুফরাদ (একবচন)। আরবীতে প্রথম দুই অক্ষরের পর আলিফ এবং আলিফের পর আবার দুই অক্ষর— এরকম শব্দ আরবী ভাষায় নেই। তাই শব্দটিকে রূপান্তরক্ষম একবচন শব্দ বলা হয়েছে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, শব্দটি 'সুরদাক্ব' এর বহুবচন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, তিরমিজি ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, দোজখের বেষ্টনী বা প্রাচীর হবে চারটি। প্রতিটি প্রাচীর পুরু হবে দুই শত চল্লিশ বছরের পথের দূরত্বের সমান।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দোজখের প্রাচীরগুলো হবে আগুনের। কালাবী বলেছেন, ওই প্রাচীর বা বেড়াগুলো আসলে আগুনের প্রলেপ যা চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে রাখবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বেড়াগুলো হবে ধুম্র নির্মিত। এ সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'চলো তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে'।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়; যা তাদের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করবে।' হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, তিরমিজি, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দোজখীদের পানীয় হবে উত্তপ্ত তেলের গাদের মতো। ওই পানীয় মুখের কাছে নিলে খসে পড়বে মুখের চামড়া।

হজরত আবু উমামা থেকে আহমদ, তিরমিজি, নাসায়ী, হাকেম, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনজির, ইবনে আবীদ্ দুনইয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. দোজখীদের পানীয় সম্পর্কে বলেছেন, ওই উত্তপ্ত পানীয় তাদের সামনে নেয়া হলে তারা খুবই বিব্রত বোধ করবে। নিরুপায় হয়ে যখন মুখের কাছে আনবে, তখন মুখমণ্ডল ও মাথার চামড়া জ্বলে পুড়ে পড়ে যাবে। আর

তা পান করার সঙ্গে সঙ্গে নাড়িভুঁড়ি গলে বেরিয়ে যাবে পশ্চাদ্দার দিয়ে। আল্লাহ্ তাই এরশাদ করেছেন— 'তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করবে।'

ইবনে তালহার পদ্ধতিতে ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জাহান্নামীদের পানীয় হবে যয়তুন তেলের গাছের মতো কালো। তাঁর উক্তিরূপে আবার বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জাহান্নামীদের পানীয় হবে গাঢ়, যয়তুন তেলের তলানীর মতো। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়' বলে বুঝানো হয়েছে রক্ত ও পুঁজকে। অর্থাৎ নরকবাসীদের পানীয় হবে রক্ত ও পুঁজ, যা গলিত ধাতুর মতো।

হজরত ইবনে মাসউদকে একবার নরকবাসীদের পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি কিছু সোনা ও রূপা চেয়ে নিয়ে আগুনের উত্তাপে সেগুলোকে তরল করে ফেললেন এবং বললেন, নরকবাসীদের পানীয় হবে এরকম— গলিত ধাতুর মতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওই পানীয় কত নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্নি কতো নিকৃষ্ট আশ্রয়।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নিকৃষ্ট আশ্রয় বা আবাস বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মুরতাফাক্বা' শব্দটি। মুজাহিদ বলেছেন, 'মুরতাফাক্বা' অর্থ সমাবেশ স্থল। আতা বলেছেন, আবাসস্থল। আর কুতাইবি বলেছেন, বৈঠকস্থল। 'ইরতিফাক্ব' অর্থ কনুই সোজা করে হাতের উপরে আরামে মুখ রাখা। তাই অভিধানগত ব্যাখ্যা হবে— এরকম আরামের স্থান, যেখানে কনুই সোজা রেখে আরামে হাতে মুখ বা মাথা রেখে বসা যায়। স্মর্তব্য যে, নরক কখনো আরামের স্থান নয়। কিন্তু স্বর্গকে আশ্রয়স্থল বললে নরককেও আশ্রয়স্থল বলতে হয় এবং স্বর্গ হচ্ছে উৎকৃষ্ট আশ্রয়স্থল। আর নরক নিকৃষ্ট। তাই এখানে বলা হয়েছে— অগ্নি কতো নিকৃষ্ট আশ্রয়।

পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি; যে সৎকর্ম করে আমি তার শ্রমফল নষ্ট করি না।'

শেষোক্ত আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'তাদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।' এখানে 'আদনিন' অর্থ স্থায়ী বা স্থির। যেমন বলা হয়—'আদানাল মাউ বিল মাকানি' (পানি অমুক স্থানে গিয়ে স্থির হয়েছে)। এভাবে 'জান্নাতু আদনিন' বলে বুঝানো হয়েছে বিশ্বাসীদের ওই চিরস্থির বা চিরস্থায়ী আবাসস্থল বেহেশতকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে।' 'সিওয়ারুন' অর্থ কংকন। এর বহুবচন হচ্ছে 'আস্ওয়ারুন' বা 'আস্বিরাতুন'। আর বহুবচনের বহুবচন হচ্ছে 'আস্বীরাতুন'। শব্দটি এখানে এভাবেই উল্লেখিত

হয়েছে। লক্ষণীয় যে, 'আস্‌বিরাতুন' এবং 'জাহাব' (স্বর্ণ) শব্দ দু'টোকে এখানে বলা হচ্ছে নাকেরা বা অনির্দিষ্টবাচক। এমতো শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ওই স্বর্ণকংকনের সৌন্দর্য ও অলংকরণ হবে নয়নায়ত্তের অতীত। সৌন্দর্য চেতনারও উর্ধ্বে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিবরানী তাঁর আওসাত পুস্তকে এবং বায়হাকী উত্তম সূত্রপরম্পরায় উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অপেক্ষাকৃত কম উত্তম কোনো জান্নাতবাসীর আভরণের ওজন হবে সমগ্র পৃথিবীর সকল গহনাপত্রের চেয়ে বেশী।

আবু শায়েখ তাঁর 'আলউজমা' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, আল্লাহ্‌র এক ফেরেশতা তার জন্মলগ্ন থেকে নির্মাণ করে চলেছে জান্নাতবাসীদের অলংকার। তার এই নির্মাণকার্য চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। ওই অলংকার সমূহের যে কোনো একটি পৃথিবীতে আনা হলে তার জ্যোতিতে সূর্যকিরণ হয়ে যাবে নিষ্প্রভ ও বিবর্ণ।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র এবং সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কতো সুন্দর পুরস্কার ও কতো সুন্দর আশ্রয়স্থল।'

ইবনুস্‌ সুন্নী ও আবু নাঈম 'তিববুন্‌ নববী' নামক পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. পছন্দ করতেন সবুজ রঙ। এখানে 'সুন্‌দুস্‌' অর্থ পাতলা রেশমী বস্ত্র। আর 'ইস্‌তাবরাক্ব' অর্থ মোটা বা পুরু রেশমী পরিচ্ছদ। 'বাগবী লিখেছেন, জান্নাতীদের পোশাক স্থূল বা মোটা হওয়ার অর্থ সেগুলো বানানো হবে অত্যন্ত ঘনবদ্ধ ও মজবুতভাবে। ওমর হারবী বলেছেন, 'সুনদুস্‌' অর্থ ডোরা ডোরা দাগ কাটা পোশাক।

হজরত ইবনে ওমর থেকে উত্তম সূত্র পরম্পরায় নাসাঈ, আবু দাউদ, বায্‌যার ও বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, একবার জনৈক ব্যক্তি রসুল স. এর মহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! দয়া করে বলুন, জান্নাতীদের পোশাক কী ধরনের হবে— বুনানো, না সরাসরি আল্লাহ্‌র হুকুমে সৃষ্ট। লোকটির কথা শুনে এক ব্যক্তির হাসি পেলো। তিনি স. বললেন, এক অনবগত যদি এক অবগতকে প্রশ্ন করে, তবে কি তা হাস্যকর হয়? জান্নাতের পোশাক প্রস্তুতকৃত অবস্থায় নির্গত হবে জান্নাতের ফল থেকে। আবু ইয়ালী এবং তিবরানী আবুল খায়ের মুরছাদ বিন আবদুল্লাহর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে উদ্‌গত রেশম নিয়ে প্রস্তুত করা হবে জান্নাতীদের পোশাক।

এখানকার 'আলআরায়িকা' শব্দটি 'আল-আরীকাতুন' এর বহুবচন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, চতুর্দিক আবৃত হওয়া সত্ত্বেও শয়ন স্থানে যদি মশারী না থাকে অথবা শয্যা থাকা সত্ত্বেও যদি শয্যার বেষ্টনী না থাকে, তবে তাকে 'আরায়িকা' বলা যায় না। 'আরীকাহ' বলে পর্দাবিশিষ্ট মশারীকে। বায়যাবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, বেহেশতের মশারী হবে মোতি ও ইয়াকুতের। এখানে বেহেশতের ওই মহামূল্যবান মশারীবিশিষ্ট শয্যাকেই বলা হয়েছে সুসজ্জিত আসন।

'ছাওয়াব' অর্থ এখানে সুন্দর পুরস্কার। আর 'মুরতাফাক্ব' অর্থ উত্তম আশ্রয়স্থল। 'উত্তম আশ্রয়স্থল' কথাটির মাধ্যমেও এখানে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, জান্নাতীদের আসন হবে কতোইনা সুন্দর ও সুসজ্জিত।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ
أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ○ كِلْتَا
الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ○
وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ
مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ○ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا
أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ○

❐ তুমি উহাদিগের নিকট পেশ কর একটি উপমা, দুই ব্যক্তির উপমাঃ উহাদিগের একজনকে আমি দিয়াছিলাম দুইটি দ্রাক্ষা উদ্যান এবং এই দুইটিকে আমি খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলাম ও এই দুইয়ের মধ্যবর্তীস্থানকে করিয়াছিলাম শস্যক্ষেত্র।

❐ উভয় উদ্যানই ফলদান করিত এবং ইহাতে কোন ত্রুটি করিত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করিয়াছিলাম নহর।

❐ এবং তাহার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তাহার বন্ধুকে বলিল, 'ধন-সম্পদে আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী।'

❑ এইভাবে নিজের প্রতি জুলুম করিয়া সে তাহার উদ্যানে প্রবেশ করিল, সে বলিল, 'আমি মনে করি না যে ইহা কখনও ধ্বংস হইয়া যাইবে;

বাগবী লিখেছেন, বনী মাখজুম গোত্রের দুই ভাই ছিলো মক্কার অধিবাসী। এক ভাই ছিলো মুমিন এবং অন্যজন ছিলো কাফের। মুমিন ভাইয়ের নাম ছিলো আবু সালমা আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল আসওয়াদ। আর কাফের ভাইয়ের নাম ছিলো আসওয়াদ বিন আবদুল আসওয়াদ। ওই দুই ভাইয়ের ঘটনাই বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে । কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, উয়াইনা এবং হজরত সালমান ফারসীর অবস্থা বুঝাবার জন্য আলোচ্য আয়াতসমূহে উপমাস্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে বিগত যুগের বনী ইসরাইলের দুই ভ্রাতার কাহিনী। তাদের একজনের নাম হজরত ইবনে আব্বাসের মতানুযায়ী ইয়াহুদা এবং মুজাহিদের উক্তি অনুযায়ী তামলিখা। আর দ্বিতীয় জনের নাম ছিলো কাতরুস। ওহাব বলেছেন, কাতফর। প্রথম জন ছিলেন বিশ্বাসী এবং দ্বিতীয় জন ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। সুরা ওয়াস্ সাফফাতের তাফসীরেও এই দুই ভ্রাতার বিবরণ দেয়া হয়েছে। মুআম্মার আতা খোরাসানীর বিবরণানুসারে তাদের ঘটনাটি ছিলো নিম্নরূপ—

দুই পুত্র রেখে এক লোক পরলোকগমন করলো। তার পরিত্যক্ত সম্পদ ছিলো আট হাজার দীনার। পুত্রদ্বয় ওই অর্থ সমানভাবে ভাগ করে নিলো। একভাই তার সম্পদের এক হাজার দীনার দিয়ে ক্রয় করলো এক খণ্ড জমি। আর এক ভাই এক হাজার দীনার দান করে দিলো দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে। বললো, হে আমার আল্লাহ্! আমার ভাই এক হাজার দীনার দিয়ে পৃথিবীর ভূমি ক্রয় করেছে, আর আমি এক হাজার দীনারের মাধ্যমে ক্রয় করলাম বেহেশতের জমিন। এরপর প্রথম ভাই আরো এক হাজার দীনার ব্যয় করে নির্মাণ করলো একটি বাড়ী। দ্বিতীয় ভাই তখন আরো এক হাজার দীনার বণ্টন করে দিলো দুঃস্থ জনসাধারণের মধ্যে এবং দোয়া করলো, হে আমার পালনকর্তা! আমার ভাই এক হাজার দীনার দিয়ে বাড়ী তৈরী করলো পৃথিবীতে। আর আমি আমার এক হাজার দিনার দিয়ে বাড়ী ক্রয় করলাম জান্নাতে। এরপর পুনরায় একহাজার দীনার খরচ করে প্রথম জন বিয়ে করলো। তখন দ্বিতীয় জন আল্লাহ্র পথে হাজার দীনার খরচ করে প্রার্থনা করলো, হে আল্লাহ্! আমার এবারের অর্থের বিনিময়ে তুমি জান্নাতবাসিনী কোনো মহিলার সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়ে দিয়ো। তারপর প্রথম জন পুনরায় একহাজার দীনার খরচ করে ক্রয় করলো দাস-দাসী ও তৈজসপত্র। দ্বিতীয় জন তখন এক হাজার দীনার দান করে দিয়ে প্রার্থনা জানালো, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! এই এক হাজারের বিনিময়ে আমি আবেদন জানালাম জান্নাতের পরিচারক-পরিচারিকা ও আসবাবপত্রের ।

কিছুদিন পরের ঘটনা। প্রথম জন পার্থিব বিষয়ে উন্নতি করলো খুব। দ্বিতীয় জন হয়ে পড়লো নিঃস্ব। উপায়ন্তর না দেখে সে তার সম্পদশালী ভাইয়ের বাড়ীর কাছে এক রাস্তায় বসে পড়লো। যাতায়াতের পথে বসে থাকা ভাইটিকে চিনতে পারলো তার ধনী ভাই। বললো, কী ব্যাপার। তুমি এখানে এভাবে বসে রয়েছো কেনো? দরিদ্র ভাই বললো, আমি এখন নিঃস্ব। তোমার কাছে এসেছি সাহায্যের আশা নিয়ে। ধনী ভাই বললো, উত্তরাধিকার সূত্রে তুমি আমি দুজনেই তো সমান সম্পদ পেয়েছিলাম। সেগুলো দিয়ে কী করলে? দরিদ্র ভাই তখন খুলে বললো সকল ঘটনা। ধনী ভাই বললো, তুমি স্বেচ্ছায় পথে বসেছো। সুতরাং তোমাকে আমি কিছুই দিবো না। এর কিছু দিন পরে দু'জনেই তারা মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তখন তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো—'ফাক্বালা বা'দুহুম আ'লা বা'দ্বিই ইয়া তাসাআলুন (জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হলো)।

এক বর্ণনায় এসেছে, তখন ধনী ভাই তার গরীব ভাইটিকে অন্দরমহলে নিয়ে গেলো এবং তার সম্পদরাজি দেখালো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ওই দুই ভাইয়ের কাহিনীই প্রথমোক্ত আয়াতে শুরু করা হয়েছে এভাবে— 'তুমি তাদের নিকট পেশ করো একটি উপমা, দুই ব্যক্তির উপমাঃ তাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দু'টি দ্রাক্ষা উদ্যান এবং এই দু'টিকে আমি খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম ও এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র।'

এখানকার 'ওয়াদ্বরিব লাহুম' কথাটির 'হুম' সর্বনাম মুমিন ও কাফের উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'মাছালা' অর্থ এখানে উপমা। আর 'রজুলাইনি' (দুই ব্যক্তির) বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই দুই ভাইয়ের কথা যারা রসুল স. এর সময়ে জীবিত ছিলো, অথবা বিগত যুগের বনী ইসরাইলের উপরে বর্ণিত দুই ভাইয়ের কথা। এখানে কাউকেই সুনির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ নিরেট কাহিনী বর্ণনা করা আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। বরং উপমার মাধ্যমে সদুপদেশ উপস্থাপন করাই এখানে মূল উদ্দেশ্য।

'তাদের একজনকে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে কাফের ব্যক্তিটিকে। অর্থাৎ তাকেই আল্লাহ্ দিয়েছিলেন দু'টি আঙুরের বাগান। বাগান দু'টো পরিবেষ্টিত ছিলো খেজুরের বাগান দ্বারা। আর খেজুর বৃক্ষবেষ্টিত আঙ্গুরের বাগান দু'টোর মাঝখানে আবার ছিলো শস্যক্ষেত্র। আর 'ওয়াজায়ালনা বাইনাহুমা' কথাটির মাধ্যমে এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, দুই বাগানের মধ্যবর্তী ভূমি পতিত ছিলো না, ছিলো শস্যময়।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'উভয় উদ্যানই ফলদান করতো এবং এতে কোনো ত্রুটি করতো না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর।' একথার অর্থ— বাগান দু'টো ছিলো ফলে ভরপুর। কোনো মওসুমে বেশী

এবং কোনো মওসুমে কম উৎপাদন— এধরনের কোনো দোষ ছিলো না বাগান দু'টোতে। আর বাগান দু'টোর ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে প্রবহমান করে দেয়া হয়েছিলো নহর বা ঝর্ণা। ফলে বাগানের বৃক্ষ ও ক্ষেত্রের শস্যসম্ভার সব সময় থাকতো সতেজ।

এর পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিলো।' 'ছামারুন' অর্থ প্রচুর ধনসম্পদ। শব্দটি 'ছামারাতুন্' এর বহুবচন। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'ছামারাতুন' অর্থ বৃক্ষের ফল অথবা বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ। 'ছামারাতুন' ও 'ছামুরাতুন' একবচনবোধক। এ দু'টোর বহুবচন হচ্ছে 'ছামারুন' এবং 'ছিমারুন'। তার বহুবচন হচ্ছে 'ইছমারুন।' স্বর্ণ, রৌপ্য, গৃহপালিত পশু, সন্তান-সন্ততি— এসকল কিছুকেও বলা হয় 'ছামারাতুন' বা সম্পদ।

আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওই ব্যক্তির নিকটে বর্ণিত বাগান দু'টো ছাড়াও অন্যান্য ধন-সম্পদ ছিলো। 'ছামুরা মালুহু' অর্থ তার সম্পদ অত্যধিক। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'ছামারুন' অর্থ স্বর্ণ ও রৌপ্য। বাগবী লিখেছেন, 'ছামারুন' শব্দটি 'ছামারাতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ বৃক্ষের ভক্ষণযোগ্য ফল। শব্দটিকে যদি 'ছামারু' পড়া হয়, তবে অর্থ হবে ক্রমান্বয়ে অর্জিত বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে অভাবী মুমিন ভাইকে বললো, ধন-সম্পদে আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমার চেয়ে শক্তিশালী।' একথার অর্থ— বাগানের কাফের মালিক একদিন কথাপ্রসঙ্গে তার নিঃস্ব মুমিন ভাইকে বললো, আমি বিত্ত-বৈভবের দিক থেকে তোমার চেয়ে যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি শ্রেষ্ঠ দাস-দাসীর মালিকানার দিক থেকেও। এখানে 'নাফারুন' শব্দটির অর্থ দাস-দাসী বা পরিচারক-পরিচারিকা। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ সন্তান। কেননা তার মুমিন বন্ধু তার আলোচ্য কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলো 'তুমি যখন ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমা অপেক্ষা কম দেখলে' (আয়াত ৩৯)।

শেষোক্ত আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করলো, সে বললো, আমি মনে করি না যে, এই বাগান ও সম্পদ কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র কথা বিস্মৃত হওয়া এবং অতিরিক্ত আত্মপ্রসাদের কারণে বাগানের মালিক অহংকারী হয়ে পড়লো এবং সে তার নয়নাভিরাম বাগানে প্রবেশ করে দর্পিত কণ্ঠে বললো, এই মনোমুগ্ধকর উদ্যান ও সঞ্চিত স্বর্ণ রৌপ্য আমার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে— এরকম কথা আমার মনেই আসে না। উল্লেখ্য যে, বাগানের মালিকের আলোচ্য উক্তির অর্থ এরকম নয় যে, সে মনে করেছিলো সে চির অমর ও সঞ্চিত ধনসম্পদের চির

অধিকর্তা। বরং তার কথার উদ্দেশ্য ছিলো এরকম— যতদিন আমি বাঁচি ততদিন আমার ধনসম্পদ থাকবে আমারই অধিকারে, এগুলো আমার হাতছাড়া হবে বলে মনে হয় না। তার উক্তির এরকম অর্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ মুমিনদের মতো কাফেরেরাও এ ব্যাপারে স্থিরনিশ্চিত যে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ক্ষমতা-মদমত্ততা ও সম্পদলিপ্সার কারণে তারা মৃত্যু সম্পর্কে থাকে উদাসীন। তাই তাদের কখনো কখনো মনে হয়, তারা ও তাদের বিত্ত-বৈভব বুঝি বা চিরন্তন।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭, ৩৮

وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۝ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ۝ لٰكِنَّا۟ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا ۝

❐ 'আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হইবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাইব।'

❐ তদুত্তরে তাহার ভাই তাহাকে বলিল, 'তুমি কি তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হইতে এবং তাহার পর পূর্ণাংগ করিয়াছেন মনুষ্য আকৃতিতে?'

❐ কিন্তু আমি বলি, 'আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আত্মপ্রসাদে আপাদমস্তক নিমজ্জিত ওই দর্পিত উদ্যানাধিকারী একথাও বললো, আমি মনে করিনা যে মহাপ্রলয় কখনো সংঘটিত হবে। তোমরা যেমন মনে করো সেরকম কিছু যদি হয়েই যায়, মহাপ্রলয়ের পর যদি আমি পুনরুত্থিত হই-ই, তবে নিশ্চয় আমি বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা হবো অধিক মর্যাদামণ্ডিত।

এখানে 'মুনকালাবা' অর্থ প্রত্যাবর্তনের স্থান, পরিণাম। বিত্তশালীরা সাধারণতঃ মনে করে থাকে তাদের ধন-সম্পদসমূহ আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রমাণ। তাই তারা

সাধারণতঃ এই ধারণার বশবর্তী হয় যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্ যেমন ধনসম্পদ দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন, তেমনি সম্মানিত করবেন আখেরাতেও। আলোচ্য আয়াতের উক্তিতে উদ্যানাধিকারীর এমতো মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'তদুত্তরে তার ভাই তাকে বললো, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র থেকে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে?'

মানুষের শরীর যে সকল উপাদান দ্বারা পরিগঠিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে মৃত্তিকার ভূমিকাই প্রধান। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে।' এরকমও হতে পারে যে— প্রথম মানুষের অবয়ব সৃষ্টি করা হয়েছিলো মাটি দ্বারা। তাই এখানে বলা হয়েছে মৃত্তিকা থেকে মানুষ সৃষ্টি করার কথা। মাটির মানুষ থেকে আবার সৃষ্টি হয় শুক্র। তাই এখানে মাটির পর উল্লেখ এসেছে শুক্রের। উল্লেখ্য যে, শুক্র হচ্ছে মনুষ্য অবয়বের নিকটবর্তী বা প্রত্যক্ষ উপাদান।

'সাওয়াকা ' অর্থ সঠিকাকৃতিসম্পন্ন মানুষ। আর 'রজুলা' অর্থ পূর্ণাঙ্গ মানুষ। এভাবে 'ছুম্মা' সাওয়াকা রজুলা' কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে।

কিয়ামত অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ্র অপার পরাক্রম ও শক্তিমত্তাকে অস্বীকার করা। প্রকারান্তরে আল্লাহ্কেই অস্বীকার করা অথচ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি তো দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম। কারণ, প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি অধিকতর সহজ। তাই এখানে প্রথম সৃষ্টির বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণরূপে উপস্থাপন করে বিশ্বাসবান বন্ধুটি তার অবিশ্বাসী বন্ধুটিকে বলেছেন— তুমি কি অস্বীকার করছো সেই আনুরূপ্যবিহীন শক্তিমত্তার অধিকারী আল্লাহ্কে যিনি তোমাকে প্রথমে মাটি ও পরে শুক্র থেকে সৃষ্টি করে ক্রমান্বয়ে পরিপূর্ণ মনুষ্য আকৃতি পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন?

এর পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'কিন্তু আমি বলি আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরীক করি না।' বাগবী লিখেছেন, ক্বারী কাসায়ী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যবিন্যাসের মধ্যে কিছুটা অগ্র-পশ্চাৎ ঘটেছে। অর্থাৎ 'লাকিন্না হুওয়াল্লহু রব্বী' কথাটির বিশুদ্ধ বিন্যাস হবে 'লাকিন্নাল্লহা হুয়া রব্বী'। আমি বলি, এরকম বলার কোনো কারণই এখানে নেই। তবে বলা যেতে পারে 'লাকিন্না' কথাটির আলিফ এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত।

وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ۚ فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ۙ اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ۝ وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ۝ وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۝ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ۗ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ۝

❒ তুমি যখন ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমা অপেক্ষা কম দেখিলে তখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তুমি কেন বলিলে না, 'আল্লাহ্ যাহা চাহিয়াছেন তাহাই হইয়াছে, আল্লাহের সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নাই।'

❒ 'সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ হইতে অগ্নি বর্ষণ করিবেন যাহার ফলে উহা উদ্ভিদ শূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হইবে।'

❒ 'অথবা উহার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইবে এবং তুমি কখনও উহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না।'

❒ 'তাহার ধন-সম্পদ ধ্বংস হইয়া গেল এবং সে উহাতে যাহা ব্যয় করিয়াছিল তাহার জন্য হাতে হাত রাখিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল যখন উহা ধ্বংস হইয়া গেলো।' সে বলিতে লাগিল, 'হায়, আমি যদি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না করিতাম।'

❒ এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাকে সাহায্য করিবার কোন লোক জন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হইল না।

❒ এই ক্ষেত্রে সাহায্য করিবার অধিকার আল্লাহেরই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশ্বাসবান লোকটি বললো, ধনে ও সন্তানে তুমি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তুমি অহংকারী হয়ে পড়লে। অস্বীকার করলে আল্লাহ্‌কে, কিয়ামতকে। অথচ তোমার বিপুল ফলের সম্ভার শোভিত বাগানে প্রবেশের পর তোমার বলা উচিত ছিলো, আল্লাহ্ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে তিনি এই বাগানকে ফলবান রাখবেন। অথবা ইচ্ছে করলে তিনি এ বাগান ধ্বংস করে দিবেন। কিন্তু তুমি তো এরকম বললে না।

বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে হজরত আনাস থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো কিছু দেখে পছন্দ হলে কেউ যদি বলে 'মাশাআল্লহু লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্' তবে আর কোনো ক্ষতি হবে না (পড়বে না কোনো কুদৃষ্টির প্রভাব এবং হবে না কোনো দুর্ঘটনা)। ইবনুস্ সুন্নীর বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এসেছে, ওই বস্তুর উপর কোনো অশুভ দৃষ্টি পড়বেই না।

বাগবী লিখেছেন, হিশাম বিন ওরওয়া বর্ণনা করেছেন, ওরওয়া বিস্ময়কর ও সুন্দর কোনো কিছু দেখলে অথবা কোনো বাগানে প্রবেশ করলে বলতেন, মাশাআল্লহু লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্।

পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ থেকে অগ্নি বর্ষণ করবেন, যার ফলে ওই উদ্যান উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে।' একথার অর্থ বিশ্বাসবান লোকটি আরো বললো, শোনো হে দর্পিত উদ্যানাধিকারী! এমনোতো হতে পারে যে, আল্লাহ্ আমাকে তোমার বাগানের চেয়েও উত্তম কোনো কিছু দান করবেন এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানের শাস্তিরূপে তোমার বাগিচায় আকাশ থেকে আপদ বর্ষণ করবেন। ফলে তা হয়ে যাবে উদ্ভিদশূন্য এক বিরান মৃত্তিকাখণ্ড।

কাতাদা বলেছেন, এখানকার 'হুস্‌বান' শব্দটির অর্থ বিপর্যয়রূপ শাস্তি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আগুন। কুতাইবী বলেছেন, পাথরের ঝড় এবং বায়যাবী বলেছেন বজ্রপাত। বায়যাবী আরো বলেছেন, 'হুস্‌বান' শব্দটি 'হুসবানাতুন' এর বহুবচন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শব্দটি ধাতুমূল এবং এর অর্থ হিসাব। আর এই হিসাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাপের সমপরিমাণ শাস্তি অথবা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত আযাব।

'সঈদান যালাক্বা' অর্থ উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকা। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— বালুকাময় ধূধূ মরুভূমি।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'অথবা তার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনো তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।' একথার অর্থ— অথবা অকস্মাৎ পানির স্তর নেমে যাবে অনেক নিচে। জলবতী ঝর্ণাগুলো তখন শুকিয়ে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। তুমিও তখন ভূগর্ভে অন্তর্হিত ওই পানির স্তরকে টেনে তোলার কোনো উপায় খুঁজে পাবে না।

এর পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলো এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিলো তার জন্যে হাতে হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগলো, যখন তা ধ্বংস হয়ে গেলো।' একথার অর্থ— অবশেষে তাই হলো। ধ্বংস হয়ে গেলো তার ধন-সম্পদ ও ফলের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ বাগান। ফলে কেবল আক্ষেপ করা ব্যতীত তার আর কোনো উপায় রইলো না।

এখানে 'উহীত্বা' অর্থ বিজয়ী হওয়া, প্রাধান্য বা প্রভাব বিস্তার করা অথবা ধ্বংস করে দেয়া। আক্রমণকারী তার হাতের কাছে যা পায় তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে অথবা তা ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ্‌র আযাবকে এখানে এই অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে।

'ইউক্বাল্লিবু কাফ্ফাইহি' অর্থ হাতে হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগলো। অর্থাৎ সম্পদ হারানোর দুঃখে মুহ্যমান হয়ে নিজের হাত উল্টিয়ে অথবা হাতের উল্টো পিঠ কামড়াতে কামড়াতে আফসোস করতে লাগলো।

এরপর বলা হয়েছে—'সে বলতে লাগলো, হায়, আমি যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম।' একথার অর্থ— নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখে সে বললো, অথবা কবরে, কিয়ামতের দিনে কিংবা মহাবিচারের দিবসে কৃত অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সে বলবে, হায়, আমি যদি কাউকে আমার প্রভুপালনকর্তার শরীক না করতাম, তবে কতোই না উত্তম হতো।

এর পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করবার কোনো লোকজন ছিলো না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না।' একথার অর্থ— পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর বিপদ থেকে পরিত্রাণ দিতে পারেন কেবল আল্লাহ্। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ওই বাগিচার মালিক সে কথা মানেনি। তাই সে সাহায্যকারী হিসেবে কাউকে পায়নি। নিজের পক্ষ থেকেও প্রতিকারের কোনো চেষ্টা করতে সমর্থ হয়নি।

শেষোক্ত আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— এক্ষেত্রে সাহায্য করবার অধিকার আল্লাহ্‌রই, যিনি সত্য।' একথার অর্থ— পুনরুত্থান দিবসে যখন বিচারের জন্য সকলকে একত্র করা হবে, তখন সাহায্য করার অধিকার থাকবে কেবল আল্লাহ্‌র, যিনি সত্য ও শাশ্বত। ক্বারী হামজা ও ক্বারী কাসায়ী এখানকার 'আলওয়ালাইয়াতু' শব্দটিকে পড়েছেন 'আলবিলাইয়াতু' (ওয়াও অক্ষরের নিচে যের সহযোগে)। এরকম উচ্চারণ করলে কথাটির অর্থ হয়— বিজয়ের জন্য সহায়তা। আর জমহুরের ক্বেরাত হচ্ছে— 'আলওয়ালাইয়াতু' (ওয়াও অক্ষরের উপরে যবর সহযোগে)। এরকম উচ্চারণ করলে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়— বন্ধুত্ব বা সাহায্য। এখানে অবশ্য এই উচ্চারণটিই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

'আল্লহু ওয়ালিয়্যুল লাজীনা আমানূ' (আল্লাহ্ মুমিনগণের অভিভাবক) এই আয়াতে বেলায়েতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্র অভিভাবকত্ব, বন্ধুত্ব এবং সাহায্যের কথা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'ওয়ালাইয়াতু' অর্থ প্রভুত্ব, রাজত্ব বা নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব।

এরকমও হতে পারে যে, আলোচ্য বাক্যটি ধ্বংস হয়ে যাওয়া ওই বাগানের মালিকের । সে অবশেষে তার বিশ্বাসবান ভাইয়ের সদুপোদেশ ও আল্লাহ্র অপার পরাক্রম দর্শনে সত্যপোলব্ধি করতে পেরেছিলো। তওবা করেছিলো সত্য-প্রত্যাখ্যান থেকে। একথাও ভালোভাবে বুঝেছিলো যে, যারা শিরিক করে তারা কখনো সফল হয় না। লজ্জা ও অনুতাপের সঙ্গে সে তাই উচ্চারণ করেছিলো 'হায়, আমি যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম।' সাথে সাথে একথাও উচ্চারণ করেছিলো যে 'এক্ষেত্রে সাহায্য করবার অধিকার আল্লাহ্র, যিনি সত্য।' এভাবে পরিণামে সে হয়ে গিয়েছিলো ইমানদার।

শেষে বলা হয়েছে— 'পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।' একথার অর্থ— তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে পুণ্যবানদেরকে পুরস্কার প্রদান করেন এবং এককভাবে তিনিই নির্ধারণ করেন সকলের পরিণাম।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝

❒ উহাদিগের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনেরঃ ইহা পানির ন্যায় যাহা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্দারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদ্গত হয়, অতঃপর উহা বিশুষ্ক হইয়া এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস উহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

❒ ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সৎকর্ম, যাহার ফল স্থায়ী, উহা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছালাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি মানুষের নিকট নশ্বর পার্থিবতার উপমা উপস্থাপন করুন এভাবে— পৃথিবীর জীবন হচ্ছে আকাশ থেকে বর্ষিত বৃষ্টির মতো। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত ওই বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে ভূমি থেকে উদ্গত হয় ঘনসন্নিবিষ্ট তৃণগুল্ম ও বৃক্ষরাজি। এরপর ঘটতে থাকে সেগুলোর প্রবৃদ্ধি। শেষে এক সময় সেগুলো হয়ে যায় বিশুষ্ক ও চূর্ণ-বিচূর্ণ। মৃত্তিকার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত ওই মৃত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তৃণরাজি ও বৃক্ষের স্তূপকে সহজেই উড়িয়ে নিয়ে যায় দমকা বাতাস। হজরত আবু উবায়দা এরকম বলেছেন। এতে করে কি অতি সহজে একথা প্রমাণিত হয় না যে— আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান?

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সৎকর্ম, যার ফল স্থায়ী, তা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছালাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট।' একথার অর্থ— বিত্ত-বৈভব ও সন্তান-সন্ততি ওয়াইনা ও তার মতো লোকদের জন্য পার্থিব জীবনের গর্ব-প্রদর্শক সৌন্দর্য। অথচ তারা জানে না, অচিরেই এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ নশ্বরতাই পার্থিবতার পরিণাম। অপর পক্ষে পুণ্যকর্মসমূহ হচ্ছে আখেরাতের স্থায়ী সম্পদ, যার কোনো বিনাশ নেই। আল্লাহ্র নিকটে এগুলোই পুরস্কার প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এবং অভিলাষ পরিপূরণের জন্যও এগুলো সর্বোৎকৃষ্ট।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের ফসল এবং পুণ্যকর্মসমূহ হচ্ছে আখেরাতের ফসল। আর আল্লাহ্ কোনো কোনো লোককে উভয় প্রকার ফসল দানে ধন্য করেন। হজরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও মুজাহিদ বলেছেন, 'বাক্বীইয়াতুস্ সলিহাত' (স্থায়ী পুণ্যকর্ম) হচ্ছে— সুবহানআল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন তোমরা 'বাক্বীইয়াতুস্ সলিহাত' অধিকসংখ্যক পাঠ করো। সহচরবৃন্দ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! 'বাক্বীইয়াতুস্-সলিহাত' কী? তিনি স. বললেন—সুবহানআল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহুআকবার এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্।

হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্ অত্যধিক পরিমাণে পাঠ কোরো। এর মাধ্যমে রুদ্ধ হয়ে যায় নিরানব্বই প্রকার বিপর্যয়। তন্মধ্যে সর্বনিম্নমানের বিপর্যয় হচ্ছে দুশ্চিন্তা। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন উকাইলী। তিনি হজরত নোমান বিন বাশীর থেকেও এ প্রসংগে একটি সুপরিণত হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি এই—

সুবহান আল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার—ই হচ্ছে বাক্বীইয়াতুস্ সলিহাত। তিবরানী এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত সা'দ বিন উবাদা থেকে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সর্বোত্তম বাক্য হচ্ছে সুবহানআল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্ এবং লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। জনৈক সাহাবী থেকেও ইবনে জারীর এরকম হাদিস এনেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সুবহানআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ্ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলা আমার নিকটে ওই সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয়, সেগুলোর উপরে সূর্য কিরণ পতিত হয়। মুসলিম, তিরমিজি।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, মাসরুক ও ইব্রাহিম নাখয়ীর মতে 'বাক্বীইয়াতুস্ সলিহাত' হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। হজরত ইবনে আব্বাসেরও এরকম একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অপর এক বর্ণনানুসারে তাঁর অভিমত হচ্ছে— বাক্বীইয়াতুস সলিহাত অর্থ পূণ্যকর্মসমূহ। কাতাদাও এরকম বলেছেন।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮, ৪৯

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ○ وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ○ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ○

❒ স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করিব উন্মূলিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখিবে একটি শূন্য প্রান্তর; সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করিব এবং উহাদিগের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না,

❐ এবং উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হইবে, তোমাদিগকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলাম সেইভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ; অথচ তোমরা মনে করিতে যে তোমাদিগের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি উপস্থিত করিব না।

❐ এবং সেই দিন উপস্থিত করা হইবে আমলনামা এবং উহাতে যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহার কারণে তুমি অপরাধীগণকে দেখিবে আতংকগ্রস্ত এবং উহারা বলিবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদিগের। ইহা কেমন গ্রন্থ। উহা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না বরং উহা সমস্ত হিসাব রাখিয়াছে।' উহারা উহাদিগের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাইবে; তোমার প্রতিপালক কাহারও প্রতি জুলুম করেন না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! স্মরণ করুন, সেই মহাপ্রলয় দিবসের মহাবিপর্যয়ের কথা। সেদিন আমি পর্বতসমূহকে করবো ভিত্তি বিবর্জিত। তখন আপনি পৃথিবীকে দেখতে পাবেন একটি সুবিশাল শূন্য প্রান্তররূপে। তারপর আসবে মহাবিচারের দিবস। ন্যায় বিচার সমাপনের জন্য আমি তখন ওই সুবিশাল প্রান্তরে সকল মানুষকে সমবেত করবো। অব্যাহতি কাউকেই দিবো না।

'ওয়া তারাল আরদ্ব বারিযাতান' অর্থ পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর। ইবনে আবী হাতেম ও কাতাদা এরকম বলেছেন। কিন্তু আতা বলেছেন, এখানে 'বারিযাতান' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, ভূগর্ভস্থিত সকল কিছু তখন বের হয়ে আসবে। সুতরাং কেউই তখন থাকতে পারবে না তাদের সমাধির অভ্যন্তরে।

উল্লেখ্য যে, এখানে 'মানুষকে আমি একত্র করবো' এবং 'তাদের কাউকেও অব্যাহতি দিবো না' কথা দু'টোর মাধ্যমে সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়, তখন কবর থেকে না উঠিয়ে কাউকেই ছেড়ে দেয়া হবে না।

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে।' এখানে 'উরিদ্বু' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, বাদশাহর সামনে যেমন সেনাসমাবেশ ঘটানো হয়, তেমনি আল্লাহ্ সমীপে জনসমাবেশ ঘটানো হবে মহাবিচারের দিবসে। তবে কথিত সেনাসমাবেশের উদ্দেশ্য থাকে পরিচিতি বিনিময় , কিন্তু হাশর প্রান্তরের সমাবেশের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্র নির্দেশের বাস্তবায়ন। আর 'সফ্‌ফা' অর্থ সারিবদ্ধভাবে। ওই সারিসন্নিবেশন এমন হবে যে, সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার বেলায় কেউ কারো অন্তরায় হবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বলা হবে, তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম, সেইভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছো।' একথার অর্থ—

সেখানে সারিবদ্ধভাবে সকলকে দাঁড় করিয়ে ঘোষণা করা হবে, জন্মের সময় যেমন তোমরা ছিলে নগ্ন, নিঃস্ব ও খতনাবিহীন, তেমনি অবস্থায় আজ এখানে তোমাদেরকে উপস্থিত করানো হয়েছে।

বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজি তাদের আপনাপন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. একবার তাঁর ভাষণে বললেন, হে জনতা! অবগত হও, কিয়ামতের পর তোমাদেরকে তোমাদের সমাধি থেকে ওঠানো হবে নগ্ন, নিঃস্ব ও খতনাবিহীন অবস্থায়। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন— 'যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো' (সূরা আম্বিয়া)। তারপর সর্বপ্রথম বস্ত্রাবৃত করানো হবে নবী ইব্রাহিমকে।

জননী আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে তোমাদেরকে উত্তোলিত করা হবে খালি গায়ে, খালি পায়ে ও খতনাহীন অবস্থায়। জননী আয়েশা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! পুরুষ-নারী সকলেরই তখন একই অবস্থা হবে? তারা কি একে অপরের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না? রসুল স. বললেন, আয়েশা! ওই সময় তো অত্যন্ত ভয়াবহ (অন্যের দিকে তাকাবার মনোবৃত্তি ও ফুরসত কোনোকিছুই তখন কারো থাকবে না)। তিবরানী তাঁর 'আলআওসাত' গ্রন্থে যথাসূত্র পরম্পরায় জননী উম্মে সালমা থেকেও এরকম একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটিতে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে, জননী উম্মে সালমা বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! তা হলে তো বিষয়টি খুবই অসুন্দর। সবাই একে অপরের দিকে তাকাবে। রসুল স. বললেন, সবাই তো থাকবে তখন অনিশ্চিত পরিণাম চিন্তায় অস্থির। জননী বললেন, কী নিয়ে তখন ব্যস্ত থাকবে মানুষ। রসুল স. বললেন, ব্যস্ত থাকবে আপনাপন আমলনামা নিয়ে। সেখানে পিপীলিকা ও শস্যদানার মতো ক্ষুদ্র আমলগুলোও লিপিবদ্ধ থাকবে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকীও এরকম হাদিস উল্লেখ করেছেন। এই হাদিসের শেষেও বলা হয়েছে, রসুল স. বললেন, আরে সেদিন তো সকলেই ব্যস্ত থাকবে নিজেকে নিয়ে। হজরত সহল বিন সা'দ থেকে তিরমিজিও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম হোসাইন থেকে সুপরিণত সূত্রে বর্ণিত এক হাদিসের শেষাংশেও বলা হয়েছে, রসুল স. তাঁর এক সহধর্মিণীর প্রশ্নের জবাবে বললেন, তখন ভয়ে ও আতংকে সকলের দৃষ্টি থাকবে উর্ধ্বমুখী। একথা বলার সময় রসুল স. তাঁর দৃষ্টি উপরের দিকে করে দেখালেন।

তিবরানী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, জননী সাওদা বলেছেন, রসুল স. একবার বললেন, পুনরুত্থান দিবসে মানুষ উঠবে নগ্ন শরীর, নগ্ন পা ও খতনাবিবর্জিত অবস্থায়। ঘামের পানিতে ডুবে যাবে কারো মুখ, কারো কানের

লতি। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! তাহলে তো ব্যাপারটি হবে অত্যন্ত মন্দ। একে অন্যকে দেখবে। রসুল স. বললেন, তখন তো পরিণাম চিন্তায় সকলে থাকবে ভীতসন্ত্রস্ত। অন্যের প্রতি তাকাবার ফুরসত কেউ পাবে না।

কুরতুবী লিখেছেন, কেউ কেউ বলেন, কোনো কোনো হাদিসে বলা হয়েছে, মৃত ব্যক্তিরা কাফনের কাপড় পরে একে অপরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করবে। আবার উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহে দেখা গেলো কিয়ামতের পরে কবরবাসীরা পুনরুত্থিত হবে উলঙ্গ অবস্থায়। এরকম বৈসাদৃশ্যের কারণ তাহলে কী? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, এখানে বৈসাদৃশ্যের কিছু নেই। দু'টো বক্তব্যই সত্য। কবরবাসীরা তাদের কবর জীবনে কাফন পরে থাকবে ঠিকই, কিন্তু তারা পুনরুত্থিত হবে উলঙ্গ অবস্থায়। তবে নিম্নে বর্ণিত হাদিসগুলো উলঙ্গ অবস্থায় পুনরুত্থানের বিপরীত। যেমন—

আবু দাউদ, হাকেম, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরীর পরলোকগমনের সময় যখন উপস্থিত হলো, তখন তিনি নতুন বস্ত্র চেয়ে নিয়ে পরিধান করলেন এবং বললেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যে বস্ত্র পরিধান অবস্থায় মৃত্যু ঘটবে, পুনরুত্থানও হবে ওই বস্ত্র পরিহিত অবস্থায়। উত্তমসূত্র পরম্পরায় ইবনে আবীদ্ দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল তার প্রয়াত মাতাকে নতুন কাপড় পরিয়ে দাফন করলেন এবং উপস্থিত জনতাকে বললেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে নতুন পরিচ্ছদে আবৃত করে দাফন কোরো। কেননা ওই কাপড় পরিহিত অবস্থায় তাকে ওঠানো হবে হাশরের ময়দানে। সাঈদ ইবনে মনসুর তাঁর সুনানে লিখেছেন, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে উত্তম বস্ত্রের কাফন দিবে। কেননা ওই কাফনে জড়িত করেই তাকে ওঠানো হবে।

কুরতুবী লিখেছেন, কোনে কোনো আলেম বর্ণিত হাদিস সমূহের বাহ্যিক বিবরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। মনে করেছেন নির্দেশনাটি সাধারণ। কিন্তু কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, নির্দেশনাটি কেবল শহীদগণের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। শহীদগণকে তাঁদের শাহাদাতের সময়ের বস্ত্রসহই দাফন করতে বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ সম্মানিত সাহাবী হজরত আবু সাঈদ বিষয়টিকে সাধারণ নির্দেশনা মনে করেছিলেন। তাই তাঁর মাতাকে পরিয়েছিলেন নতুন কাফনের কাপড় এবং অন্যদেরকেও দিয়েছিলেন এমতো নির্দেশনা। বায়হাকী আবার এ সম্পর্কিত বিবরণসমূহের সামঞ্জস্য সাধনার্থে মন্তব্য করেছেন, সেদিন কাউকে কাউকে বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় এবং কাউকে কাউকে বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থায় ওঠানো হবে। আমি বলি, এমতো ব্যাখ্যাই উত্তম। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করলেই এ সম্পর্কে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের চিরপরিসমাপ্তি ঘটে। যেমন—

এরপর বলা হয়েছে— 'অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি উপস্থিত করবো না।' একথায় পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি উপস্থাপন করা হয়েছে কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে, যারা কিয়ামত ও হাশর বিশ্বাস করে না। অতএব বলা যেতে পারে, কাফেরদেরকেই সেদিন ওঠানো হবে বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থায়। এখানে 'মাওই'দা অর্থ প্রতিশ্রুত ক্ষণ বা হাশরের সময়। আর 'বাল' (অথচ) দ্বারা এখানে ঘটানো হয়েছে প্রসঙ্গান্তর। অর্থাৎ 'বাল' শব্দটির মাধ্যমে এখানে বলা হয়েছে তাদের কিয়ামতের প্রতি অবিশ্বাসের কথা।

উল্লেখ্য যে, রসুল স. বলেছেন, সেদিন তাদের দৃষ্টি থাকবে উর্ধ্বমুখী। আর আল্লাহ্তায়ালা এক আয়াতে বলেছেন— 'সেদিন তাদের প্রত্যেকের অবস্থা হবে এমন গুরুতর, যা তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।' আল্লাহ্র রসুলের বাণীর মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, ভয়ে ও আতংকে সেদিন উদভ্রান্ত সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের দৃষ্টি হবে উর্ধ্বমুখী। পুণ্যবান বিশ্বাসীদের অবস্থা এরকম হবে না। এর পরেও কিন্তু আর একটি সমস্যা রয়েই যায়। সমস্যাটি এই— হাদিস শরীফে এ-ও বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম বস্ত্র পরিধান করানো হবে নবী ইব্রাহিমকে। তাহলে কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থায় উত্থিত হবে— একথা কীভাবে বলা যেতে পারে? এই প্রশ্নটির উত্তরে বলা যায়— পুণ্যবানদেরকে বস্ত্র পরিধান করানো হবে কবরের জগতে, পুনরুত্থানের পূর্বে। অর্থাৎ বিশেষ সম্মান প্রদর্শনার্থে কবরে বিশ্বাসীদেরকে পরানো হবে নতুন পরিধেয়। আর সর্বপ্রথম নতুন পরিচ্ছদে আবৃত করা হবে নবী ইব্রাহিমকে। অবশ্য এমতো উত্তর পুরোপুরি দুর্বলতামুক্ত নয়।

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, 'মৃত্যুকালীন পোশাকে পুনরুত্থান করা হবে'—হাদিস শরীফের এই বক্তব্যটির অর্থ হবে— মৃত্যুকালীন আমলের অবস্থার উপরে ঘটবে মৃত ব্যক্তির পুনরুত্থান। কারণ আমলকেও কোরআন মজীদের এক স্থানে পোশাক বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন— 'ওয়ালিবাসুত্ তাক্বওয়া জালিকা খইর' (আর সংযমীদের গাত্রাবরণ, তা হবে উত্তম)।

এর পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'এবং সেই দিন উপস্থিত করা হবে আমলনামা।' এখানকার 'আলকিতাব' কথাটির অর্থ পাপ-পুণ্যের বিবরণ বিশিষ্ট কিতাব বা আমলনামা। আর এখানকার 'আলিফ লাম' হচ্ছে জিনসী বা জাতিবাচক। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— এবং সেদিন আমলনামা দেয়া হবে পুণ্যবানদের ডান হাতে, পাপীদের বাম হাতে অথবা তা রেখে দেয়া হবে মীযানে কিংবা উপস্থিত করা হবে আল্লাহ্ সকাশে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে, তার কারণে তুমি অপরাধীগণকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে, এটা কেমন গ্রন্থ, এ গ্রন্থ যে ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না; বরং এ গ্রন্থ যে সমস্ত হিসাব রেখেছে।'

এখানে 'আলমুজরিমীনা' অর্থ অপরাধীগণ, যাদেরকে আমলনামা দেয়া হবে বাম হাতে। 'মিম্‌মা ফীহ্' অর্থ ওই সকল পাপ যা লেখা থাকবে তাদের আমলনামায়। 'লাওয়াইলাতানা' কথাটির 'ওয়াইলুন' শব্দের অর্থ ধ্বংস, বিপর্যয় বা আতংক। অর্থাৎ তারা সেদিন হয়ে পড়বে আতংকগ্রস্ত।

'মালি হাজাল কিতাব' অর্থ— এ কেমন গ্রন্থ? উল্লেখ্য যে, বাক্যটি প্রশ্নাকৃতির হলেও আসলে তা প্রশ্ন নয়। বরং এ রকম প্রশ্ন করে পাপিষ্ঠরা সেদিন প্রকাশ করবে বিস্ময়।

'লা ইউগদিরু সগিরাতাঁও ওয়ালা কাবীরাতান্' অর্থ ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না। বাক্যটির ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সগিরাতুন' অর্থ অনাবশ্যক হাসি এবং 'কাবীরাতুন' অর্থ অট্টহাসি। হজরত ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানকার 'সগিরাতুন' অর্থ পর নারীকে স্পর্শ করা বা চুম্বন করা। আর 'কাবীরাতুন' অর্থ অবৈধ যৌনচরিতার্থতা। আমি সুরা নিসার একটি আয়াতের তাফসীরে ছোট ও বড় পাপ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেছি। আয়াতটি এই— 'তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরু, তা থেকে বিরত থাকলে আমি লঘু পাপসমূহকে মোচন করবো'।

'ইল্লা আহসাহা' অর্থ 'সমস্ত হিসাব রেখেছে।' অর্থাৎ এই আমলনামা লঘু গুরু সকল পাপের হিসাব লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। হজরত সহল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা ছোট ছোট পাপ থেকেও বিরত থেকো। ছোট গোনাহগুলো এরকম— যেনো পথযাত্রীরা এক স্থানে যাত্রা স্থগিত রেখে ছোট ছোট কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করলো। পরে সে-গুলোকে একত্র করে আগুন জ্বালিয়ে ওই আগুনের তাপে প্রস্তুত করলো তাদের আহার্য। বাগবী লিখেছেন, ছোট পাপ গুলোকে ছোট মনে করে অবহেলা করলে ক্রমে ক্রমে তা সংখ্যাগতভাবে হয়ে যায় বিপুল। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সা'দ ইবনে উবাদা বলেছেন, হুনায়েন যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তন কালে আমরা যাত্রা স্থগিত করলাম তৃণলতাহীন ও পানিবিহীন এক বিরান উপত্যকায়। রসুল স. বললেন, তোমরা যা কিছু পাও নিয়ে এসো। আমরা তুচ্ছ ও অনুল্লেখ্য বস্তু সমূহ যে যা পেলাম এনে একত্র করলাম। দেখা গেলো তুচ্ছ বস্তুসমূহ পরিণত হয়েছে একটি বিশাল স্তুপে। তিনি স. তখন বললেন, এভাবেই মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ ধারণ করে বিশাল আকার। সুতরাং হে আমার সহচরবৃন্দ! তোমাদের উচিত আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং বড় বড় গোনাহ পরিত্যাগ করার সাথে সাথে ছোট ছোট গোনাহ সমূহকেও পরিত্যাগ করা।

জননী আয়েশা থেকে নাসাঈ, ইবনে মাজা ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, যে পাপগুলোকে তুচ্ছ মনে করা হয়, তোমরা সে সকল পাপকে পরিহার কোরো। কেননা মহাবিচারের দিবসে তুচ্ছ পাপসমূহেরও সন্ধান করা হবে।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত আনাস উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা অনেকেই ছোট পাপকে মনে করো কেশ অপেক্ষা তুচ্ছ। কিন্তু রসুল স. এর সময়ে আমরা এগুলোকে বিধ্বংসী অপরাধ বলে গণ্য করতাম। যথাযথ সূত্র পরম্পরায় ইমাম আহমদও এরকম বর্ণনা করেছেন।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না।' একথার অর্থ— বিনা পাপে কারো পাপ লেখা হয় না। আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি কারো প্রাপ্য মন্দ বিনিময়ের বৃদ্ধি ঘটাবেন। এমতো অন্যায় থেকে তিনি সতত পবিত্র।

রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে জনগণ সম্মুখীন হবে তিনটি পদ্ধতিতে। দু'টো পদ্ধতি হবে প্রশ্নোত্তর ও ওজর আপত্তি উপস্থাপনের সুযোগ সম্বলিত। তৃতীয়টি হবে, উড়ন্ত আমলনামা, কেউ তা গ্রহণ করবে ডান হাতে, আবার কেউ বাম হাতে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে, তিরমিজি হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং বায়হাকী অপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে। হাকেম ও তিরমিজি বলেছেন, প্রথম বিষয়টি হবে বাদানুবাদ সম্পর্কিত। অর্থাৎ বান্দারা তখন শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করবে বিভিন্ন প্রকার অনুযোগ এবং এমতো দুরাশাও করবে যে, এভাবে হয়তো সে লাভ করতে পারবে পরিত্রাণ। দ্বিতীয় বিষয়টি অনুষ্ঠিত হবে হজরত আদম ও অন্যান্য নবী রসুলগণের সামনে। তাঁদের সামনেই অপরাধীদেরকে প্রমাণ করা হবে শাস্তির উপযোগীরূপে। এরপর তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে দোজখে। আর তৃতীয় বিষয়টি অনুষ্ঠিত হবে কেবল পাপী বিশ্বাসীগণকে কেন্দ্র করে। আল্লাহ্ তাদেরকে গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং কৃত পাপের জন্য করবেন তিরস্কার। তারা হবে লজ্জিত ও মর্মাহত। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করে দিবেন এবং প্রসন্ন হবেন তাদের প্রতি।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহাবিচারের দিবসে প্রথমে সকল আমলনামা জমা করা হবে আরশের নিচে। তারপর প্রবল এক বাতাসে সেগুলো উড়ে এসে পড়বে বিচারের জন্য অপেক্ষমানদের ডান অথবা বাম হাতে। আমলনামার শুরুতে লেখা থাকবে— আমলনামা পড়ো, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাবের জন্য যথেষ্ট। কাতাদা বলেছেন, দুনিয়ার নিরক্ষর ব্যক্তিরাও তখন পড়তে সক্ষম হবে তাদের আমলনামা।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ۝ مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ۝ وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝

❒ এবং স্মরণ কর আমি যখন ফেরেশতাগণকে বলিয়াছিলাম, 'আদমের প্রতি নত হও; তখন সকলেই নত হইল ইবলিস ব্যতীত; সে জিনদিগের একজন, সে তাহার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে উহাকে এবং উহার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতেছ? উহারা তো তোমাদিগের শত্রু। সীমালংঘনকারিগণ যে আল্লাহের পরিবর্তে অন্যদিগকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছে উহা কত নিকৃষ্ট!

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি উহাদিগকে ডাকি নাই এবং উহাদিগের সৃজনকালেও নহে, এবং আমি বিভ্রান্তকারীদিগের সাহায্য গ্রহণ করিবার নহি।

❒ এবং সেই দিনের কথা স্মরণ কর যেদিন তিনি বলিবেন, 'তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক মনে করিতে তাহাদিগকে আহ্বান কর।' উহারা তখন তাহাদিগকে আহ্বান করিবে কিন্তু তাহারা উহাদিগের আহ্বানে সাড়া দিবে না এবং উহাদিগের উভয়ের মধ্যস্থলে রাখিয়া দিব এক ধ্বংস-গহ্বর।

❒ অপরাধীরা আগুন দেখিয়া বুঝিবে যে উহারা তথায় পতিত হইতেছে এবং উহারা উহা হইতে কোন পরিত্রাণ স্থল পাইবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং স্মরণ করো, আমি যখন ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম, আদমের প্রতি নত হও; তখন সকলেই নত হলো ইবলিস ব্যতীত।' পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উপক্রমণিকা

অথবা উপসংহাররূপে হজরত আদমের প্রতি ফেরেশতাদের নত হওয়া ও ইবলিসের নত হতে অস্বীকার করার প্রসংগটি উল্লেখ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে অহংকারী এক উদ্যানাধিকারীর প্রসঙ্গ ধরে অহংকার ও সত্যপ্রত্যাখ্যানের অপপরিণতি সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা করার পর আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অহংকার ও অবাধ্যতা হচ্ছে ইবলিসের স্বভাব। সুতরাং তা পরিহার্য। এরকমও বলা যায় যে, এতোক্ষণ ধরে পৃথিবীর প্রতি মোহগ্রস্তদের স্বভাব ও পরিণাম সম্পর্কে আলোকপাত করবার পর আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, প্রতারক পৃথিবীর প্রতি অতি আসক্তির কারণ হচ্ছে প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতা ও ইবলিসের ধোকা। প্রথমে বলে দেয়া হয়েছে, ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সৎকর্মের ফল স্থায়ী। তারপর দেয়া হয়েছে মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান দিবসের বিবরণ। তারপর এসেছে ইবলিসের অপকর্ম ও নিন্দাবাদ। এভাবে প্রচ্ছন্নরূপে এই সদুপদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, ইবলিসের কাম্য পার্থিবতা নিন্দিত এবং আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় আখেরাত নন্দিত। এভাবে কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আলোচ্য বিষয়টি আলোচিত হয়েছে সদুপদেশদানের ভিন্ন ভিন্ন অনুসঙ্গরূপে। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞাময়তার এক বিশেষ নিদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে জ্বিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো।' একথার অর্থ— ইবলিস ফেরেশতা ছিলো না, ছিলো জ্বিন। তাই সে ফেরেশতাদের মতো আল্লাহ্‌র নির্দেশের অনুগত হলো না। লংঘন করলো তাঁর আদেশ।

এখানে 'আমরি' শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, ফেরেশতাদের সঙ্গে ইবলিসও ছিলো সেজদার নির্দেশ প্রাপ্ত। 'ফাফাসাক্বা' কথাটির 'ফা' এখানে কারণ প্রকাশক। অর্থাৎ জ্বিন সম্প্রদায়ভূত হওয়ার কারণেই সে আদমকে সেজদা করতে অস্বীকৃত হয়েছিলো। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র সতত অনুগত। অনানুগত্য তাদের স্বভাবেই নেই। কিন্তু ইবলিসের স্বভাব এরকম নয়। তাই সে অমান্য করতে পেরেছিলো আল্লাহ্‌র আদেশ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইবলিস ছিলো ফেরেশতাদেরই একটি শাখা গোত্রভূত। ওই গোত্রটির নাম জ্বিন। তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে। হাসান বসরী বলেছেন, জ্বিনেরা ফেরেশতা সম্প্রদায়ভূত নয়। তারা একটি আলাদা সম্প্রদায়। বাবা আদম যেমন সকল মানুষের মূল, তেমনি সকল জ্বিনের মূল ইবলিস। আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন—

'আমি জ্বিন ও মানুষকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।' এই আয়াত এবং সুরা রহমান ও সুরা জ্বিনের আয়াত থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের মতো জ্বিনদের মধ্যেও রয়েছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, পুণ্যবান-পাপী। পুণ্যবান জ্বিনেরা ইবলিসের অনুসারী নয়। কিন্তু এই অভিমতটি কীভাবে মেনে নেয়া যায়? কারণ পরবর্তী বাক্যে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবলিসের বংশধরেরা সকলেই তার অনুসারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছো? তারা তো তোমাদের শত্রু।' আলোচ্য প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে মানুষ! আমিই তোমাদের একমাত্র স্রষ্টা, পালনকর্তা ও অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ইবলিস ও তার বংশধরকে বন্ধু অথবা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারো না। তারা তো তোমাদের চিরশত্রু। আর চিরশত্রু কখনো বন্ধু হয় না।

এরপর বলা হয়েছে— 'সীমালংঘনকারীদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট।' এ কথার অর্থ— সীমালংঘনকারীরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে ইবলিস ও তার বংশধরের সঙ্গে। ওই বন্ধুত্ব ও তার বিনিময় কতই না অপকৃষ্ট।

বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদের বর্ণনায় এসেছে, শা'বী বলেছেন, একবার আমি এক স্থানে বসেছিলাম। এমন সময় এক দিনমজুর এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, শয়তানের সহধর্মিণী আছে কি? আমি বললাম, জানি না। একটু পরেই আমার মনে পড়লো 'তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে ও তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে?' এই আয়াত মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝলাম, শয়তানের সহধর্মিণী অবশ্যই আছে। কারণ স্ত্রী ছাড়া কখনো সন্তান হয় না। তাছাড়া আর এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র সন্তান কোথা থেকে হবে, যখন তার স্ত্রী নেই।' এ কথা মনে পড়ার সাথে সাথে আমি প্রশ্নকারীকে বললাম, হ্যাঁ ইবলিসের স্ত্রী আছে।

কাতাদা বলেছেন, মানুষের মতো ইবলিসেরও সন্তান-সন্ততি হয়। কেউ কেউ বলেছেন, সে তার নিজের নিঃশ্বাস তার পশ্চাদ্দারে প্রবেশ করিয়ে দেয়। ফলে সৃষ্টি হয় ডিম্ব এবং ওই ডিম্বগুলো ফেটে বের হয় বিভিন্ন ধরনের শয়তান। মুজাহিদ বলেছেন, ওই বিভিন্ন ধরনের শয়তানগুলোর নাম— লাকীন, ওয়ালহান্, হাফাফ, মুর্‌রাহ্, যালনাবুর, আউর, মাতুস, ইয়াছুর এবং দাসিম। ওয়ালহান্ গোত্রীয় শয়তানেরা কুমন্ত্রণা দেয়, ওজু, গোসল ও নামাজের মধ্যে। আর ইবলিস নিজেই মুর্‌রাহ্। কারণ তার ডাক নাম আবু মুর্‌রাহ্। যালনাবুর বাজারের মধ্যে ক্রেতা-

বিক্রেতাকে মিথ্যা শপথের প্রতি প্ররোচিত করে। পণ্যাধিকারীকে দিয়ে তার পণ্যের মিথ্যা প্রশংসা করিয়ে নেয়। আউর উৎসাহ দেয় অবৈধ যৌনচরিতার্থতার দিকে। ফুৎকার দেয় পুরুষাঙ্গে ও রমণীদের নিতম্বে। মাতুস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় মিথ্যা গুজব। স্বজন-বিয়োগের শোকে মুখে আঘাত করা, পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করা ইত্যাদির মাধ্যমে বিলাপ প্রকাশের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে ইয়াছুর। গৃহে প্রবেশকালে গৃহকর্তাকে গৃহবাসীদের প্রতি সালাম করা থেকে এবং আল্লাহ্র জিকির করা থেকে বিরত রাখে দাসিম। আর তার দৃষ্টিতে সৃষ্টি করে বিভ্রম। ফলে সে দেখতে পায় গৃহসামগ্রীসমূহ অবিন্যস্ত ও ইতস্তঃত বিক্ষিপ্ত। এরকম ভুল দর্শনের কারণে সে ক্রোধান্বিত হয় অথবা প্রদর্শন করে কড়া মেজাজ। আর বিসমিল্লাহ্ উচ্চারণ ব্যতিরেকে যে আহার করে, সেও আহার করে তার সঙ্গে। আ'মাস বলেছেন, একবার গৃহে প্রবেশকালে আমি সালাম বলতে ভুলে গেলাম। দেখলাম, আমার ওজুর বদনা যথাস্থানে নেই। অন্য স্থানে সেটিকে দেখতে পেয়ে আমি গৃহিনীর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলাম। চিৎকার করে বললাম, এক্ষুণি বদনাটা সরাও। একটু পরে সম্বিত ফিরে পেয়েই আমি বললাম, আরে এটাতো দাসিম। হজরত উবাই ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ওয়ালহান শয়তান ওজুর মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে। তোমরা পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার সন্দেহের প্রভাব থেকে রক্ষা পাও। তিরমিজি, ইবনে মাজা। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য। হাদিস বিশারদগণের দৃষ্টিতে এর সূত্রপরম্পরা সুদৃঢ় নয়।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওসমান বিন আবীল আস একবার রসুল স. এর সুমহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! শয়তান আমার নামাজে এবং ক্বেরাতে অনুপ্রবেশ করে এবং নামাজকে করে সন্দেহায়িত (মনে থাকে না কয় রাকাত পড়লাম)। রসুল স. বললেন, ওই শয়তানের নাম খানযাব। ওর প্রভাব অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র কাছে পরিত্রাণ চেয়ো (আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম পাঠ কোরো) এবং বাম দিকে তিন তিন বার থু ফেলো। হজরত ওসমান বর্ণনা করেছেন, এরপর থেকে আমি তাই করতাম। এভাবে আল্লাহ্ আমাকে তার প্রভাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। মুসলিম।

হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স.বলেছেন, ইবলিস তার আসন পাতে পানির উপর। তারপর সেখান থেকে তাঁর সতীর্থদেরকে পাঠায় স্থলভাগের দিকে। তাদের মধ্যে যারা ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারে, তারাই হয় ইবলিসের প্রিয়ভাজন। বিভিন্ন জন এসে তার নিকটে বিভিন্ন রকমের অপকর্মের বিবরণ দেয়। তখন সে তাদেরকে বলে, তুমি কিছুই করোনি। কিন্তু কেউ যদি বলে, আমি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছি, তখন সে বলে, তুমি উত্তম

কাজ করেছো। তারপর সে তাকে কাছে টেনে নেয়। আ'মাস বলেছেন, আমার মনে হয় বর্ণনাকারী শেষে একথাও বলেছেন, তারপর ইবলিস তাকে জড়িয়ে ধরে। মুসলিম।

পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি কালে আমি তাদেরকে ডাকিনি এবং তাদের সৃজনকালেও নয়।' এ কথার অর্থ— আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী অথবা অন্য কোনো সৃষ্টিকে অস্তিত্বায়িত করার সময় আমি তাদেরকে এরকম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করিনি যাতে তারা হয়ে যায় ইবাদত ও আনুগত্য গ্রহণের উপযোগী। কারণ সৃষ্টি কখনোই উপাস্য হতে পারে না। উপাস্য হতে পারেন কেবল আল্লাহ্ যিনি সকল কিছুর একক স্রষ্টা ও পালনকর্তা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করবার নই।' এ কথার অর্থ— আর আমি এমতো শক্তিহীন নই যে, সৃজনকালে পথভ্রষ্টকারীদেরকে আমি আমার সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করবো।

এখানে 'আল্‌মুদ্বিল্লীন' অর্থ বিভ্রান্তকারী বা পথ-ভ্রষ্টকারী অর্থাৎ শয়তান 'আ'দুদা' অর্থ সাহায্যকারী।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'মা আশ্‌হাদ্‌তুহুম' এর 'হুম' সর্বনামটি শয়তানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সম্পর্কিত মুশরিকদের সঙ্গে। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায় এরকম— আমি ওই মুশরিকদেরকে এমন কোনো অদৃশ্য জ্ঞান দান করিনি যাতে করে তারা বলতে পারে, আমি বা আমরা ইসলাম গ্রহণ করলে আমাদের গোত্রের সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করবে। এরকম দাবি ভিত্তিহীন। তাই আমার রসুল তাদের কথার কোনো গুরুত্ব প্রদান করেননি। তাদের দ্বারা ধর্মের কোনো সাহায্য হোক সে ইচ্ছাও প্রকাশ করেননি। আমিও এ ধরনের বিভ্রান্তদেরকে ধর্মের সাহায্যকারীরূপে কবুল করি না।

কালাবী বলেছেন, এখানকার 'হুম' সর্বনামটি সম্পর্কিত হবে ফেরেশতাদের সঙ্গে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— আমি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির সঙ্গে ফেরেশতাদেরকে আমার সৃষ্টিকর্মের অংশীদার করিনি। সুতরাং তোমরা কেনো তাদের পূজা করবে? কেনো বলবে, 'ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা'? এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয় এখানকার 'এবং আমি বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করবার নই' বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। এমতাবস্থায় পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— আমি এই বিশাল সৃষ্টি সৃজনকালে শয়তানের সহযোগিতা যেমন নেইনি, তেমনি সাহায্য নেইনি ফেরেশতাদেরও।

এর পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'এবং সেই দিনের কথা স্মরণ করো যে দিন তিনি বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে

আহ্বান করো। তারা তখন তাদেরকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না এবং তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দিবে ধ্বংস গহ্বর।'

এখানে 'যাআ'মতুম' অর্থ তোমরা মনে করতে। অর্থাৎ তোমরা একথা ধারণা করতে যে, তোমাদের পূজ্য প্রতিমাগুলো আমার নিকটে সুপারিশ করে শাস্তি থেকে তোমাদের বাঁচাবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে শয়তান ও তার বংশধরকে।

'ফাদাআওহুম' অর্থ তাদেরকে আহ্বান করো। অর্থাৎ তাদেরকে আহ্বান করো সুপারিশ করার জন্য। 'ফালাম ইয়াসতাজীবু' অর্থ কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না, সুপারিশ করবে না। 'ওয়া জাআ'লনা বাইনাহুম মাওবিক্বা' অর্থ এবং উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দিবো এক ধ্বংসগহ্বর। ধ্বংসগহ্বর বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মাওবিক্বা' শব্দটি। এরকম বলেছেন আতা ও জুহাক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মাওবিক্ব' হচ্ছে দোজখের একটি উপত্যকা। মুজাহিদ বলেছেন উত্তপ্ত পানির সরোবর। ইকরামা বলেছেন, অগ্নি-সমুদ্র, যেখানে সতত প্রবাহিত হয় আগুন। আর ওই অনলসাগরের পাড়ের কাছে রয়েছে খচ্চরের আকৃতিবিশিষ্ট বিষধর সাপ। ইবনে আরাবী বলেছেন, দুটি বস্তুর মধ্যস্থিত প্রতিবন্ধককে বলে 'মাওবিক্ব'।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'মাওবিক্ব' শব্দটি ধাতুমূল। ফাররা বলেছেন 'বাইনা' অর্থ সম্পর্ক বা মিল। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় অংশীবাদী ও তাদের উপাস্য সমূহের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিলো, সেই সম্পর্ককে আখেরাতে পরিণত করে দেয়া হবে ধ্বংসগহ্বরে। এ ধরনের বক্তব্য অন্য আয়াতেও এসেছে। যেমন— 'লাক্বদ্ তাক্বাত্ত্বআ বাইনাকুম' (তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আজ হয়ে গিয়েছে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন)।

শেষোক্ত আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে যে, তারা সেখানে পতিত হচ্ছে এবং তারা তা থেকে কোনো পরিত্রাণ স্থল পাবে না।'

এখানে 'আলমুজরিমূনা' বা অপরাধীগণ বলে বুঝানো হয়েছে অংশী-বাদীদেরকে। 'ফাজনন্নু' অর্থ বুঝবে বা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে। 'মুয়া'কিউ'হা' অর্থ পতিত হচ্ছে বা হবে।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যারূপে বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে বিচারের অপেক্ষায় দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। তারা জাহান্নাম দেখতে পাবে এবং জাহান্নামের চল্লিশ বছরের পথের দূরত্বে অবস্থান করেও বুঝতে পারবে, জাহান্নামের শাস্তি অনিবার্য।

'মাসরিফা' অর্থ পরিত্রাণ স্থল। শব্দটি ধাতুমূল এবং ইসমে জরফ (অধিকরণ কারক)। অর্থাৎ কোনো স্থান যেখানে তারা আশ্রয় পেতে পারে। এভাবে স্পষ্টাক্ষরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিত্রাণকে নাকচ করা হয়েছে। বলা হয়েছে — 'তারা ওই জাহান্নাম থেকে কোনো পরিত্রাণ স্থল পাবে না।'

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ
الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ
الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ
الْعَذَابُ قُبُلًا ۝ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا
آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ
عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن
يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ۝ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا
كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن
دُونِهِ مَوْئِلًا ۝ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا
لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ۝

❑ আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।

❑ যখন উহাদিগের নিকট পথ-নির্দেশ আসে তখন উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের অবস্থা উহাদিগের কখন হইবে অথবা কখন উপস্থিত হইবে বিবিধ শাস্তি এই প্রতীক্ষাই উহাদিগকে বিশ্বাস স্থাপন হইতে ও উহাদিগের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা হইতে উহাদিগকে বিরত রাখে।

❑ আমি কেবল সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপেই রসূলগণকে পাঠাইয়া থাকি, কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে উহা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যদ্দ্বারা উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে সেই সমস্তকে উহারা বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

❑ কোন ব্যক্তিকে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করাইয়া দেওয়ার পর সে যদি উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং তাহার কৃতকর্মসমূহ ভুলিয়া যায় তবে তাহার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি উহাদিগের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন উহারা কুরআন বুঝিতে না পারে এবং উহাদিগকে বধির করিয়াছি; তুমি উহাদিগকে সৎপথে আহ্বান করিলেও উহারা কখনও সৎপথে আসিবে না।

❑ এবং তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়াবান, উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য তিনি উহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহিলে তিনি উহাদিগের শাস্তি ত্বরান্বিত করিতেন; কিন্তু উহাদিগের জন্য রহিয়াছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, যাহা হইতে উহাদিগের পরিত্রাণ নাই।

❑ ঐ সব জনপদ— উহাদিগের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম যখন উহারা সীমালংঘন করিয়াছিল এবং উহাদিগের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করিয়াছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।

প্রথমোক্ত আয়াতের 'আল ইনসান' (মানুষ) দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে নজর বিন হারেছকে। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। কালাবী বলেছেন, উবাই বিন খালফকে। কেউ কেউ বলেছেন, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানুষকে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকেই এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে 'আল ইনসান' কথাটির মাধ্যমে। যেমন ৫৬ সংখ্যক আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে 'কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে'।

হজরত আলী বলেছেন, এক রাতে রসুল স. আমার ও ফাতেমার কাছে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ বা অন্য কোনো নফল) পড়ো না? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! যার অধিকারে আমাদের জীবন, তিনি আমাদেরকে যখন চান জাগ্রত করে দেন। একথা শুনে তিনি স. ফিরে যেতে যেতে আবৃত্তি করলেন 'মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।'

পরের আয়াতে (৫৫)বলা হয়েছে—'যখন তাদের নিকট পথনির্দেশ আসে তখন তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা তাদের কখন হবে অথবা কখন উপস্থিত হবে বিবিধ শাস্তি। এই প্রতীক্ষাই তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন থেকে ও তাদের প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা থেকে তাদেরকে বিরত রাখে।'

এখানে 'আল হুদা' বা 'পথনির্দেশ' দ্বারা বুঝানো হয়েছে কোরআন অথবা ইসলামকে। কিংবা রসুল স. এর পবিত্র উপস্থিতিকে। 'সুন্নাতুল আউয়ালীন' অর্থ আল্লাহ্র আযাবের পূর্বে প্রবর্তিত রীতি, যা প্রয়োগ করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিলো অতীত যুগের কাফেরদেরকে। 'ক্কুবুলা' অর্থ কখন সামনাসামনি হবে। অর্থাৎ কখন উপস্থিত হবে। বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। মুজাহিদ বলেছেন, কখন হঠাৎ আসবে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— যখন তাদের নিকট পথ-নির্দেশরূপে কোরআন, ইসলাম অথবা আল্লাহ্র রসুলকে প্রেরণ করা হয়, তখন তারা সে পথনির্দেশকে অস্বীকার করে। দম্ভভরে প্রতীক্ষা করতে থাকে শাস্তির, যেমন শাস্তি আপতিত হয়েছিলো পূর্ববর্তী জামানার অবাধ্যদের উপর। তাদের ওই প্রতীক্ষাই তাদেরকে বিরত রাখে ইমান আনা থেকে এবং যথাসময়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা থেকে।

এর পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'আমি কেবল সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারীরূপেই রসুলগণকে প্রেরণ করে থাকি।' একথার অর্থ— বিশ্বাসবানদেরকে বেহেশতের শুভ প্রজ্ঞাপন প্রদান ও অবিশ্বাসীদেরকে দোজখাগ্নি থেকে সতর্ককরণের উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরণ করি আমার বার্তাবাহকগণকে। তাঁদেরকে আমি এমতো দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেইনি যে, অবিশ্বাসীদের আবদার অনুসারে স্বেচ্ছায় ও স্বক্ষমতায় কোনো অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করতে পারবে। অথবা এ উদ্দেশ্যেও তাদেরকে প্রেরণ করিনি যে, স্বেচ্ছায় ও স্বশক্তিতে তাঁরা কাউকে করতে পারবে হেদায়েত বা পথপ্রাপ্ত।

এরপর বলা হয়েছে — 'কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিবার জন্য।' নিঃসন্দেহে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যাশ্রয়ী ও কুটতর্কপ্রবণ। তাই তারা বিভিন্ন কথা বলে সত্যের প্রতিরোধ করতে চায়। যেমন কখনো বলে 'আল্লাহ্ কি তবে মানুষকেই রসুল করে পাঠালেন।' কখনো বলে 'তুমিতো আমাদের মতই মানুষ বৈ অন্য কিছু নও'। কখনো আবার বলে 'যদি আল্লাহ চাইতেন তবে আমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য ফেরেশতা অবতীর্ণ করতেন'। আবার কখনো কখনো বলে 'এই কোরআন এই দুই জনপদের (মক্কা ও তায়েফের) কোনো খ্যাতিমান লোকের উপর অবতীর্ণ হলো না কেনো' ইত্যাদি। এভাবে বিতর্কের অবতারণা করে তারা সত্যের প্রকাশকে ব্যর্থ করে দিতে চায়।

'লিইউদহিদ্বু' অর্থ এখানে ব্যর্থ করে দিবার জন্য। অর্থাৎ এভাবে প্রতর্কবিদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়ে সত্যোচ্চারণকে স্তব্ধ করে দিবার জন্য।

এরপর বলা হয়েছে— এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যদ্দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেই সমস্তকে তারা বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকে।' এখানে আয়াত অর্থ সকল নিদর্শন যা সন্নিবেশিত হয়েছে কোরআনে। 'হুযুওয়া' অর্থ

বিদ্রূপের বিষয়। উল্লেখ্য যে, মক্কার অংশীবাদীরা কোরআনের বচনবৈভবকে নিয়ে বিভিন্নভাবে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। যেমন কখনো বলতো 'আমরাও ইচ্ছে করলে এরকম বাক্য রচনা করতে পারি।' কখনো বলতো 'নিশ্চয় কোনো মানুষ তাকে কোরআন শিখিয়ে দেয়।' আবার কখনো বলতো 'এগুলো তো অতীত যুগের উপাখ্যান ভিন্ন অন্য কিছু নয়।' আযাবের বিবরণ বিশিষ্ট আয়াত সম্পর্কে বলতো 'আমাদের মন্তব্যের কারণে তাহলে আল্লাহ্ আযাব অবতীর্ণ করেন না কেনো?' দোজখীদের খাদ্য যাক্কুম সম্পর্কে বলতো 'যাক্কুম তো বলা হয় উন্নতমানের খেজুর ও মাখনকে।'

এর পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'কোনো ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্ম সমূহ ভুলে যায়, তবে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে?' একথার অর্থ— যার প্রতি কোরআনের আহ্বান পৌঁছানো হয়। স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় আল্লাহ্র বিভিন্ন নিদর্শনাবলী। উন্মোচন করে দেয়া হয় এর রচনা শৈলী ও বক্তব্যভঙ্গির অলৌকিকত্বকে, সে যদি জেনে শুনে বুঝেও এ সকল কিছুকে প্রত্যাখ্যান করে, ভুলে যায় দায়বদ্ধতার কথা তবে তার চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী হতে পারে আর কে?

এরপর বলা হয়েছ— 'আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেনো তারা কোরআন বুঝতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি; তুমি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না।'

এখানে 'ইন্না জায়া'লনা' কথাটির মাধ্যমে এ কথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কৃতকর্ম সমূহের বিস্মৃতিই হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর আচ্ছাদিত হওয়ার কারণ। আর বিদ্রূপ করার কারণেই তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে কোরআনের অন্তর্নিহিত জ্ঞান থেকে। আর একথা স্পষ্ট করে বলেই দেয়া হয়েছে যে 'আমি তাদের অন্তরে আবরণ দিয়েছি, যেনো তারা কোরআন বুঝতে না পারে। আলোচ্য আয়াতে 'আয়াতি' বা আল্লাহর নিদর্শন দ্বারা বুঝানো হয়েছে কোরআনকে। তাই আলোচ্য বাক্যে 'হু' সর্বনামটি বসেছে কোরআনেরই সর্বনামরূপে।

'ওয়াক্বরা' অর্থ ভার। এখানে বলা হয়েছে 'এবং' তাদেরকে বধির করেছি।' অর্থাৎ সত্য বচনের অন্তর্নিহিত ধ্বনি শ্রবণ থেকে আমি তাদেরকে রেখেছি বঞ্চিত। এভাবে চিরভ্রষ্টদের সম্পর্কে দেয়া হয়েছে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তটি হচ্ছে— চিরভ্রষ্ট যারা, তারা প্রকৃত অন্তরানুভূতি ও শ্রুতিশক্তিহীন। সুতরাং তারা কস্মিনকালেও ইমান আনবে না। তাই শেষে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না।

এর পরের আয়াতে(৫৮) বলা হয়েছে— 'এবং তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়াবান, তাদের কৃতকর্মের জন্য তিনি শাস্তি দিতে চাইলে তিনি তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, যা থেকে

তাদের পরিত্রাণ নেই।' এখানে 'আল গফুর' অর্থ অত্যধিক ক্ষমাপরায়ণ। 'জুর্‌রহ্‌মাতি' অর্থ পরম দয়ার্দ্র। মক্কার অংশীবাদীরা রসুল স.কে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করতো। তৎসত্ত্বেও আল্লাহ্ তাদের প্রতি তাৎক্ষণিক শাস্তি অবতীর্ণ করেননি। এটাই ছিলো তাঁর অত্যধিক ক্ষমাপরায়ণতা ও পরম দয়ার নিদর্শন। তাই এখানে বলা হয়েছে 'তাদের কৃতকর্মের জন্য তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে চাইলে তিনি শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন।' কিন্তু তিনি তা করেননি।

'প্রতিশ্রুত মুহূর্ত' কথাটির অর্থ এখানে পৃথিবীতে বদর যুদ্ধের দিন অথবা আখেরাতে মহা বিচারের দিবসে। অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে শাস্তি না দেয়া হলেও পৃথিবীতে বদর প্রান্তরে এবং আখেরাতে হাশরের ময়দানে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবেই।

এর পরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'ওইসব জনপদ— তাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন তারা সীমালংঘন করেছিলো এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।' একথার অর্থ— নবী নুহের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়, অবাধ্য আদ ও ছামুদ জাতিসহ অন্যান্য অবিশ্বাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। কারণ তারা সীমালংঘন করেছিলো। প্রত্যাখ্যান করেছিলো আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীবাহকগণকে। প্রতিটি জনপদবাসীর মূলোৎপাটনের জন্য আমি নির্ধারণ করেছিলাম নির্দিষ্ট সময়। ওই সময়কে কিঞ্চিত অগ্র-পশ্চাত করবার ক্ষমতা কারো ছিলো না।

এখানে 'আল কুরা' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে নবী নুহের সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী জনতা এবং আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়ের মতো অন্যান্য অবাধ্য জনগোষ্ঠীকে। 'লাম্‌মা জলামূ' অর্থ সীমা লংঘন করেছিলো। আর 'লিমাহ্‌লিকিহিম' অর্থ তাদের ধ্বংসের জন্য।

সূরা কাহ্‌ফ ঃ আয়াত ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَاۤ اَبْرَحُ حَتّٰۤى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ

حُقُبًا ○ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى

الْبَحْرِ سَرَبًا ○ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ

سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ○ قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ

الْحُوْتَ وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى

الْبَحْرِ عَجَبًا ۝ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰۤى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا
فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَاۤ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ
لَّدُنَّا عِلْمًا ۝ قَالَ لَهٗ مُوسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰۤى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا
عُلِّمْتَ رُشْدًا ۝ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ
عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ۝ قَالَ سَتَجِدُنِىْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا
وَّلَاۤ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا ۝ قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْـَٔلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ
حَتّٰۤى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

❒ স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন মূসা তাহার সংগীকে বলিয়াছিল, 'দুই সমুদ্রের মধ্যস্থলে না পৌঁছিয়া আমি থামিব না— আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব।'

❒ উহারা যখন উভয়ের সংগমস্থলে পৌঁছিল উহারা নিজদিগের মাছের কথা ভুলিয়া গেল; উহা সুড়ংগের মত পথ করিয়া সমদ্রে নামিয়া গেল।

❒ যখন উহারা আরো অগ্রসর হইল মূসা তাহার সংগীকে বলিল, 'আমাদিগের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদিগের এই সফরে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।'

❒ সে বলিল, 'আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করিতেছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম? শয়তানই উহার কথা বলিতে আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করিয়া নামিয়া গেল সমুদ্রে।'

❒ মূসা বলিল, 'আমরা তো এই স্থানটিরই অনুসন্ধান করিতেছিলাম।' অতঃপর উহারা নিজদিগের পদচিহ্ন ধরিয়া ফিরিয়া চলিল।

❒ অতঃপর উহারা সাক্ষাৎ পাইল আমার দাসদিগের মধ্যে এক জনের যাহাকে আমি আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ দান করিয়াছিলাম ও আমার নিকট হইতে দিয়াছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।

❒ মূসা তাহাকে বলিল, 'সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হইয়াছে তাহা হইতে আমাকে শিক্ষা দিবেন— এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করিব কি?'

❏ সে বলিল, 'তুমি কিছুতেই আমার সংগে ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবে না,'

❏ 'যে বিষয় তোমার জ্ঞানায়ত্ত নহে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করিবে কেমন করিয়া?'

❏ মূসা বলিল, 'আল্লাহ্ চাহিলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করিব না।'

❏ সে বলিল, 'আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ কর-ই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিও না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! ওই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন নবী মুসা তাঁর সঙ্গী ইউশাকে তার এক ভ্রমণকালে বলেছিলো, আমাদের গন্তব্য দুই সমুদ্রের মিলনস্থল। যুগ যুগ ধরে যদি পথ চলতে হয়, তবুও সেখানে আমাদেরকে পৌঁছতেই হবে।

হজরত মুসার পিতার নাম ছিলো ইমরান। বিশুদ্ধ হাদিসে এরকমই বলা হয়েছে। 'ফাতা' (সঙ্গী) বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ইউশা ইবনে নুন ইবনে ইফরাইম ইবনে ইউসুফ আ. কে। আমি বলি, সম্ভবতঃ ইউশার পিতা নুন ইফরাইমের বংশভুত ছিলেন, সরাসরি পুত্র ছিলেন না। কেননা ইফরাইমের জামানা ছিলো নুনের জামানার অনেক পূর্বে।

'লা আবরাহু' অর্থ চলতেই থাকবো। 'মাজমাআ'ল বাহরাইন' অর্থ দুই সমুদ্রের মিলনস্থল। কাতাদা বলেছেন, পারস্য সাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল (বর্তমানে যাকে বলা হয় শাতিল আরব)। মোহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, স্থানটি তানজাহ্। হজরত উবাই ইবনে কা'বের মতে আফ্রিকা সাগর।

'হুক্বুবা' অর্থ যুগ যুগ ধরে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'হুক্বুবা' বলে আশি বছর অথবা এর চেয়ে কিছু বেশী সময়কে। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'হুক্বুবা' অর্থ সুদীর্ঘকাল। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, 'হুক্বুবা' অর্থ আশি বছর। কেউ কেউ বলেছেন 'হুক্বুবা' বলে সত্তর বছর সময়কে।

বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, সা'ঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আমি একবার ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, নাওফ বুকালীর ধারণা খিজিরের সঙ্গী মুসা বনী ইসরাইলদের নবী মুসা নন। তিনি বললেন, সে অসত্যভাষী। উবাই বিন কা'ব বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, একদিন বনী ইসরাইলের এক সমাবেশে নবী মুসা বক্তৃতা প্রদানের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হলেন। একলোক বললো, হে আল্লাহ্র নবী! বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী কে? মুসা কলিমুল্লাহ্ বললেন, আমি। তাঁর এমতো জবাব আল্লাহ্র পছন্দ হলো না। আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করলেন, তোমার চেয়ে অধিকজ্ঞানী একজন আছে। তাকে পাওয়া যাবে দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে। নবী মুসা বললেন, কীভাবে আমি তার সাক্ষাৎ পাবো? আল্লাহ্ জানালেন, একটি ভাজা মাছ সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করো। যেখানে মাছটিকে

নিজে নিজে সমুদ্রসলিলে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখবে, সেখানেই সাক্ষাৎ পাবে তার। নবী মুসা একটি ভাজা মাছ নিয়ে সমুদ্র সৈকত ধরে রওনা হলেন। সহযাত্রীরূপে সঙ্গে ছিলেন ইউশা ইবনে নূন। একটানা পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তাঁরা। ক্লান্তি নিবারণের জন্য একস্থানে পাথরে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। ঘুমিয়েও গেলেন একসময়। ওই সময় ভাজা মাছটি নিজে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়লো সাগরে। পানির মধ্যে তার গতিপথ হয়ে গেলো সুড়ঙ্গের মতো। ইউশা হঠাৎ জেগে উঠেছিলেন। এরকম অদ্ভুত দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। পুনরায় নিদ্রাভিভূত হলেন। দু'জনে যখন জাগলেন তখন দিবাবসানের খুব বেশী দেরী নেই। পথ চললেন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। রাতের বিশ্রাম শেষে পুনরায় শুরু হলো পথ চলা। শ্রান্তি নিবারণের জন্য একস্থানে থেমে মুসা বললেন, ইউশা! কিছু আহারের বন্দোবস্ত করো। উল্লেখ্য, মাছ সমুদ্রে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করেননি। ইউশার মাছ চলে যাওয়ার ঘটনাটি মনেই ছিলো না। হঠাৎ মনে পড়তেই বললেন, সঙ্গের ভাজা মাছটি তো নেই। গতকাল দ্বিপ্রহরের পর যেখানে আমরা শুয়েছিলাম, সেখানেই মাছটি লাফিয়ে পড়েছে সাগরে। আমি তখন হঠাৎ জেগে উঠেছিলাম। আপনি ছিলেন নিদ্রাভিভূত। মুসা বললেন, আরে ওই স্থানটিই তো আমাদের গন্তব্যস্থল। ফিরে চললেন তাঁরা। একসময় উপস্থিত হলেন নির্দিষ্ট স্থানে। দেখলেন, সেখানে আপাদমস্তক চাদরাবৃত হয়ে শুয়ে আছেন খিজির। মুসা তাঁকে সালাম বললেন। খিজির চাদর থেকে মুখ বের করে জিজ্ঞেস করলেন, এ অঞ্চলে আবার সালামের প্রচলন আছে নাকি? মুসা বললেন, আমি মুসা। খিজির বললেন, বনী ইসরাইলের মুসা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি আপনার কাছেই এসেছি। উদ্দেশ্য— আল্লাহ্ আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, সেই জ্ঞান থেকে কিছু আহরণ করা। খিজির বললেন, কিন্তু আপনি তো আমার সঙ্গে থাকতে পছন্দ করবেন না। আমাকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, সে জ্ঞান আপনাকে দেয়া হয়নি, আবার আপনাকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, সে জ্ঞান আমার নেই। মুসা বললেন, ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলরূপে পাবেন। খিজির বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে আমি যাই কিছু করি না কেনো আপনি সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না। মুসা তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তারপর তাঁরা দু'জনে একদিকে যাত্রা করলেন। চলতে চলতে উপস্থিত হলেন এক নদীর কিনারায়। দেখলেন পারাপারের জন্য ঘাটে বাঁধা রয়েছে একটি নৌকা। নৌকার মাঝি খিজিরকে চিনতো। তাই সে বিনা ভাড়ায় খিজির ও তাঁর সঙ্গীকে নদী পার করে দিলো। তীরে নামার আগে খিজির একটি পেরেক ঠুকে নৌকার তলা ফুটো করে দিলেন। তারপর নেমে পড়লেন তটভূমিতে। মূসাও অনুসরণ করলেন তাঁকে। কিন্তু তিনি সহসা বলে উঠলেন, আপনি তো আজব লোক! লোকটা বিনা ভাড়ায় আমাদেরকে পার করলো, আর আপনি তার ক্ষতি করলেন। এক্ষুণি তার নৌকা ডুবে যাবে। এভাবে একটা ভালো লোকের আয় উপার্জন বন্ধ করা কি ঠিক হলো? খিজির বললেন, আমি তো আগেই বলেছিলাম, আপনি আমার সঙ্গে থাকতে

পারবেন না। মুসা বললেন, সত্যিই আমার ভুল হয়েছে। আর এভাবে আপনাকে প্রশ্ন করবো না। খিজির এবার তাকালেন নৌকাটির দিকে। একটি চড়ুই পাখি হঠাৎ এসে বসলো নৌকায়। একটু পরে পাখিটি নদীর পানি পান করলো। খিজির বললেন, দেখুন পাখিটির দিকে। চঞ্চু দ্বারা সে যতটুকু পানি পান করলো, আপনার ও আমার জ্ঞান ততটুকুই। আর আল্লাহ্‌র জ্ঞান সীমাহীন সমুদ্রের মতো। আমরা যতই সেখান থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করি না কেনো, আল্লাহ্‌র জ্ঞান তাতে করে একটুও কমে না। পথ চলা শুরু হলো পুনরায়। একস্থানে তাঁরা দেখলেন, কয়েকটি বালক খেলাধুলায় মত্ত। খিজির ওই বালকদের মধ্যে একজনকে ধরে ফেললেন। তারপর নিজ হাতে ছিন্ন করলেন তার মস্তক। মুসা চিৎকার করে বললেন, কী করলেন আপনি! একটি নিষ্পাপ বালকের জীবন সংহার করলেন! খিজির বললেন, আবার? কী চুক্তি ছিলো আমাদের মধ্যে? মুসা আত্মসংবরণ করলেন। বললেন, ভুল হয়েছে। ঠিক আছে, আর এরকম করবো না। আবার যদি এরকম করি তবে আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন।

পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন তাঁরা। চলতে চলতে পৌঁছলেন এক গ্রামে। দু'জনেই তখন ক্ষুধার্ত। গ্রামবাসীদের নিকট কিছু খাবার চাইলেন খিজির। গ্রামবাসীরা কেউই তাঁর আবেদনে সাড়া দিলো না। তাঁরা দেখতে পেলেন, অদূরেই একটি গৃহের প্রাচীর ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। খিজির এগিয়ে গিয়ে প্রাচীরটি যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন। মুসা বললেন, গ্রামবাসীরা মেহমানদারী করলো না। আপনিও বিনা মজুরীতে একজনের প্রাচীর ঠিক করে দিলেন। এদিকে আমরা ক্ষুধার্ত। আপনার এমতো রহস্যময় আচরণের কারণ কী? খিজির তখন একে একে তাঁর কাজের রহস্য ভেদ করলেন। তারপর বললেন, এবার বুঝলেন তো, কোন কাজের কী রহস্য। এবার বিদায়। এ পর্যন্ত বলে রসুল স. মন্তব্য করলেন, মুসা যদি ধৈর্য ধরে তাঁর সাথে থাকতে পারতেন, তবে দেখতে পেতেন আরো অনেক রহস্যময় কার্যকলাপ, লাভ করতে পারতেন আরো বেশী জ্ঞান। আল্লাহ্‌ও সেগুলো আমাকে জানিয়ে দিতেন।

ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম তাঁদের স্ব স্ব তাফসীরে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস উল্লেখ করেছেন, একবার নবী মুসা তাঁর প্রভুপালনকর্তার নিকটে নিবেদন করলেন, হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালক। তোমার বান্দাগণেরে মধ্যে তোমার নিকটে সর্বাপেক্ষা প্রিয়ভাজন কে? আল্লাহ্ বললেন, যে আমাকে অধিক স্মরণ করে। নবী মুসা জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার আল্লাহ্! তোমার বান্দাগণের মধ্যে তোমার কাছে সর্বোত্তম কে? আল্লাহ্ বললেন, যে তার প্রবৃত্তির অনুসারী নয় এবং যে সিদ্ধান্ত দান করে সত্যের অনুকূলে। নবী মুসা

বললেন, আর সর্বাপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ? আল্লাহ্ বললেন, ওই ব্যক্তি যে নিজের জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে নেয় অন্যের জ্ঞান। নবী মুসা বললেন, হে আমার জীবনাধিকারী আল্লাহ্! বর্তমানে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞান যদি কারো থাকে তবে তার সন্ধান আমাকে দাও। আল্লাহ্ বললেন, হ্যাঁ, আছে। তার নাম খিজির। নবী মুসা বললেন, আমি তাকে কোথায় খুঁজে পাবো? আল্লাহ্ বললেন, সাগর পাড়ে পাথরের কাছে। মুসা বললেন, কীভাবে তাকে পাবো? আল্লাহ্ বললেন, একটি মাছ ভেজে নিয়ে রওয়ানা হয়ো। যেখানে ওই মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই পেয়ে যাবে তাকে। মুসা তখন একটি মাছ ভেজে নিলেন। তারপর একটি থলিতে ভাজা মাছটি পুরে নিয়ে একজন খাদেম সহকারে যাত্রা করলেন সাগরের পাড় ধরে। খাদেমকে বললেন, মাছটির প্রতি খেয়াল রেখো। কোথাও মাছটি হারিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানিয়ো।

পরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— 'তারা যখন উভয়ের সঙ্গমস্থলে পৌঁছলো, তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলো; মাছটি সুড়ঙ্গের মতো পথ করে সমুদ্রে নেমে গেলো।' একথার অর্থ— হজরত মুসা ও তাঁর সহচর ইউশা যখন দুই সমুদ্রের সন্ধিস্থলের নিকটে পৌঁছলেন, তখন দু'জনেই ভুলে গেলেন থলির মধ্যে রাখা ভর্জিত মৎস্যটির কথা। ইত্যবসরে মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরী করে সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে নেমে গেলো সমুদ্রের গভীরে।

সুফিয়ান বলেছেন, কেউ কেউ ধারণা করেন, ওই পাথরের নিকটেই ছিলো আবে হায়াতের (সঞ্জিবনী সলিলের) প্রস্রবণ। ওই আবে হায়াতের স্পর্শেই ভাজা মাছটি জীবিত হয়ে উঠেছিলো এবং নেমে গিয়েছিলো সমুদ্রের পানিতে। কালাবী বলেছেন, ইউশা ইবনে নুন ওই সঞ্জিবনী সলিল দ্বারা ওজু করে লবন ছিটিয়ে দিয়েছিলেন মাছটির উপরে। ফলে মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রাভ্যন্তরে চলে যায়। মাছটির নিঃশ্বাসে সমুদ্রের পানি সরে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছিলো পথ বা সুড়ঙ্গ।

'তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলো' কথাটির অর্থ— সমুদ্রতীরস্থিত ওই পাথরটির নিকটে গিয়ে হজরত মুসা মাছটির কথা বিস্মৃত হলেন এবং হজরত ইউশা মাছটির জীবিত হওয়া ও সমুদ্রাভ্যন্তরে চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখেও হজরত মুসাকে তা জানাতে ভুলে গেলেন।

বাগবী লিখেছেন, মাছটি ছিলো হজরত ইউশার জিম্মায়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ভুলে গিয়েছিলেন মাছটি জীবিত হওয়া ও সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু যেহেতু মাছটি ছিলো উভয়ের পাথেয়, তাই এখানে বলা হয়েছে 'তারা দু'জনেই নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলো।'

'মাছটি সুড়ঙ্গের মতো পথ করে সমুদ্রে নেমে গেলো' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্‌র হুকুমে মাছটি সমুদ্রবক্ষ ভেদ করে তৈরী করলো একটি সুড়ঙ্গের মতো পথ, আর ওই পথ ধরে সে নেমে গেলো সমুদ্রের গভীরে। এখানে 'সারাবা' অর্থ চলার পথ। যেমন বলা হয়— 'সারিবুম বিন্‌নাহার' (দিনে চলাচলকারী)। কোনো কোনো অভিধানবিশারদ লিখেছেন, 'সারাবা' অর্থ লম্বিতভাবে বিদীর্ণ করা বা চিরে ফেলা। অর্থাৎ মাছটি পানি চিরে চিরে প্রস্তুত করে নিয়েছিলো তার প্রলম্বিত পথ। একটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, মৎস্যটি যখন সমুদ্রসলিলে প্রবেশ করলো, তখন আল্লাহ্ তার গমন পথের চতুষ্পার্শ্বের তরঙ্গসমূহকে থামিয়ে দিলেন। ফলে নির্মিত হলো একটি সুড়ঙ্গসদৃশ সুদীর্ঘ পথ।

এর পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'যখন তারা আরো অগ্রসর হলো, মুসা তার সঙ্গীকে বললো, আমাদের প্রাতঃরাশ আনো, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' এ কথার অর্থ— হজরত মুসা ও তাঁর সঙ্গী হজরত ইউশা একদিন এক রাত্রি এবং পরের দিন দুপুর পর্যন্ত পথ চললেন। অতিক্রম করে গেলেন দুই সমুদ্রের সন্ধিস্থল। তারপর ক্লান্ত হয়ে একস্থানে থেমে হজরত মুসা তাঁর সঙ্গীকে বললেন, আমরা এখন ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। সুতরাং আমাদের আহার্য উপস্থিত করো। উল্লেখ্য যে, দুই সমুদ্রের মিলনস্থলের পথটি অতিক্রম করে যাবার পর থেকেই হজরত মুসা ও হজরত ইউশা অনুভব করলেন ক্লান্তি ও ক্ষুধা। ক্ষুধা নিবারণার্থে তখন তাঁদের ভর্জিত মৎসটির কথা মনে পড়ে যায়। তারপর তাঁরা সেখান থেকে ফিরে আসেন পাথরটির নিকটে। বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরাসম্বলিত হাদিসে এসেছে, গন্তব্যস্থল অতিক্রম না করা পর্যন্ত হজরত মুসা শ্রান্তি ও ক্ষুধা অনুভব করেননি।

এর পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'সে বললো, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই তার কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিলো।' একথার অর্থ— হজরত ইউশা তখন বললেন, মাছটি তো নেই। দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে প্রস্তরখণ্ডের নিকটে আমরা যখন বিশ্রাম করছিলাম, তখনই সেটি জীবিত হয়ে সাগরাভ্যন্তরে চলে যায়। অথচ আশ্চর্য। সেটির সাগর গমনের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেও আমি আপনাকে তা জানাতে ভুলে গিয়েছি। নিশ্চয় শয়তানের প্রভাবেই ঘটেছে আমার এমতো বিস্মৃতি। আপনি কি এটা লক্ষ্য করেছেন?

'আস্‌সখ্‌রাতি' অর্থ ওই শিলাখণ্ড, যেখানে আমরা বিশ্রাম করেছিলাম বা শুয়েছিলাম। হাকাল বিন যিয়াদ সূত্রে বাগবী লিখেছেন, শিলাখণ্ডটি ছিলো পীত সমুদ্রের পশ্চাদ্‌ভাগে।

'নাসীতুল্ হূতা' অর্থ আমি মাছের কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম অথবা আমি মৎস্যটি হারিয়ে ফেলেছি কিংবা ছেড়ে এসেছি। বাগবী লিখেছেন, মাছটি সমুদ্রগমনের সময়েই হজরত ইউশা হজরত মুসাকে ঘটনাটি জানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হজরত মুসা তখন ছিলেন নিদ্রিত। যখন তিনি জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা বিস্মৃত হলেন ঘটনাটি। দু'জনে পথ চলতে শুরু করলেন পুনরায়। দ্বিপ্রহরের সময় একস্থানে থেমে নামাজ পাঠ করলেন তাঁরা। তারপর হজরত মুসা যখন খাদ্য উপস্থিত করার কথা বললেন, তখন ইউশার মনে পড়লো সমুদ্রগামী মৎস্যটির কথা।

'ইল্লাশ্ শাইত্বনু' অর্থ শয়তানই ভুলিয়ে দিয়েছে আমাকে। বায়যাবী লিখেছেন, হজরত ইউশা তখন আল্লাহ্র অপার পরাক্রমের এক বিরল নিদর্শন দেখে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সকল মনোযোগ বিলিন হয়ে গিয়েছিলো আল্লাহ্র অপার কুদরতের মাধ্যমে। তাই তিনি ভুলে গিয়েছিলেন ভাজা মাছটির কথা। কিন্তু বিনয় ও আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ তিনি ওই ভুলকে সম্পৃক্ত করে দিলেন নিজের সঙ্গে। আর এক্ষেত্রে ঔদাসিন্যের ভাবটিকে সম্পর্কিত করেছিলেন শয়তানের সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে— 'মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নেমে গেলো সমুদ্রে।' এখানে 'আ'জাবা' (আশ্চর্যজনকভাবে) কথাটির মওসুফ (বিশেষ্য) রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত মওসুফ সহকারে কথাটি দাঁড়াবে এরকম— 'সাবীলান্ আ'জাবা (ধরেছিলো আশ্চর্যজনক পথ) অথবা 'ইত্তাখাজান আ'জাবা (ধরেছিলো আশ্চর্যজনকভাবে)।' কেউ কেউ বলেছেন, 'আ'জাবান কথাটি বলেছিলেন হজরত মুসা। ইউশা যখন হজরত মুসাকে মাছটির সমুদ্রগমনের কথা জানালেন তখন হজরত মুসা বললেন, 'আ'জাবান' (আশ্চর্যতো)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'ইত্তাখাজা' শব্দটির সর্বনাম সম্পৃক্ত হবে হজরত মুসার সঙ্গে। অর্থাৎ ভর্জিত মৎস্যের সমুদ্রাভ্যন্তরে গমনের বিষয়টি সম্পর্কেই হজরত মুসা বলেছিলেন আশ্চর্যতো?

এরপরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আমরা তো এই স্থানটিই অনুসন্ধান করছিলাম।' একথার অর্থ— হজরত মুসা তখন বললেন, হে ইউশা! ওই স্থানটিই তো আমাদের গন্তব্য। সেখানেই দেখা হবে আল্লাহ্র সেই জ্ঞানী বান্দা খিজিরের সঙ্গে। একথা বলেই তাঁরা দু'জনে তাঁদের পদচিহ্ন দেখে দেখে ফিরে গেলেন ওই নির্ধারিত স্থানে।

এরপরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেলো আমার দাসদের মধ্যে একজনের।' এখানে 'দাসদের মধ্যে একজন' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত খিজিরকে। এরকম বলেছেন জমহুর উলামা। বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত হাদিসসমূহে এরকমই বর্ণিত হয়েছে। খিজির ছিলো তাঁর উপাধি। আসল নাম ছিলো বলইয়ান বিন মালাকান অথবা আলইয়াসা কিংবা ইলইয়াস। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হিসাম ইবনে মুনাব্বাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিনি

কোনো শুষ্ক ভূমিতে বসে পড়লে সেখানে জন্ম নিতো সবুজ তৃণ ও উদ্ভিদ। তাই তাঁকে বলা হয় খিজির। মুজাহিদ বলেছেন, যে স্থানে খিজির নামাজ পড়তেন তার চতুষ্পার্শ্বে দেখা দিতো সবুজের সমারোহ। বাগবী তাঁকে ইসরাইল বংশভূত বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন রাজপুত্র, কিন্তু সংসার বিরাগী। আমি বলি, তিনি ইসরাইল বংশভূত ছিলেন না। ইসরাইলী হলে হজরত মুসার আনুগত্য করা তাঁর জন্য হতো অত্যাবশ্যক। কারণ হজরত মুসা ছিলেন বনী ইসরাইলের পয়গম্বর। তাছাড়া বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, প্রথম সাক্ষাতের সময় হজরত মুসা তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন, আমি মুসা। হজরত খিজির বলেছিলেন, বনী ইসরাইলের মুসা? হজরত মুসা বলেছিলেন, হ্যাঁ। এই কথোপকথনের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইসরাইল বংশভূত নন।

এক বর্ণনায় এসেছে, নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে হজরত মুসা দেখলেন, এক লোক আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত অবস্থায় চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছেন। বস্ত্রের কিছু অংশ রয়েছে তাঁর মস্তকের নিচে এবং কিছু অংশ তাঁর পায়ের গোড়ালীর নিচে। অপর এক বর্ণনায় এ কথাও এসেছে যে, ওই সময় হজরত খিজির সমুদ্রবক্ষে একটি সবুজ জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পাঠ করছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাকে আমি আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমার নিকট থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।' এ কথার অর্থ— যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে দান করেছি প্রত্যাদেশ বা নবুয়ত এবং আমার নিকট থেকে দিয়েছি সাধনালব্ধ জ্ঞানের অতীত এক বিশেষ ধরনের জ্ঞান। উল্লেখ্য যে, এই বিশেষ ধরনের জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর রহস্য সম্পর্কীয় জ্ঞান।

বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ আলেম হজরত খিজিরকে নবী বলে মনে করেন না। আমি বলি, এক্ষেত্রে আলেমগণের অভিমতসমূহ বেশ জটিল। নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ হয় প্রত্যাদেশ বা ওহী, যা নিঃসন্দিগ্ধ ও অবশ্য অনুসরণীয়। আর আউলিয়াগণের প্রতি অবতীর্ণ হয় ইলহাম বা অনুপ্রেরণা, যা সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ যেমন নয়, তেমনি নয় অবশ্য অনুসরণীয়। তাঁকে যদি নবী মেনে না নেয়া হয় তবে একথার জবাব কী হতে পারে যে— ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে হজরত খিজির একটি বালককে হত্যা করেছিলেন, এ ধরনের আমল প্রত্যাদেশ ছাড়া কী করে সম্ভব?

এর পরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'মুসা তাকে বললো, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন, এই শর্তে আমি আপনাকে অনুসরণ করবো কি?' উল্লেখ্য যে, সৌজন্য ও শিষ্টাচারিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে হজরত মুসা এভাবে এখানে হজরত খিজিরের সঙ্গলাভের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন।

'রুশ্‌দা' অর্থ সত্যপথের দিশা। 'রুশ্‌দা' এবং 'রাশ্‌দা' শব্দ দু'টো সমার্থক। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, সাধারণভাবে উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নপর্যায়ের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও কোনো এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারে। এমতো ক্ষেত্রে উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যদি ওই বিশেষ জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁর চেয়ে নিম্নজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির শরণাপন্ন হন, তবে তাতে করে তাঁর মর্যাদাহানি ঘটে না। বরং এভাবে বিভিন্ন জনের নিকট থেকে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান সংগ্রহ করাই প্রকৃত জ্ঞানীর স্বভাব। ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, নবী মুসা আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞেস করলেন, সবচেয়ে বড় আলেম কে? আল্লাহ্ বললেন, ওই ব্যক্তি, যে অন্যের নিকট থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করে নিজের জ্ঞানকে সম্মৃদ্ধ করে নেয়। উত্তম সূত্র সহযোগে হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি ও ইবনে মাজা এবং হজরত আলী থেকে ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রজ্ঞা হচ্ছে বিশ্বাসীদের হারানো ধন। সুতরাং যেখানে তা পাওয়া যায়, বিশ্বাসীরা যেনো সেখান থেকেই তা সংগ্রহ করে। এটা তাদের অধিকার। দরূদে ইব্রাহিমে রসুল স. ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর হজরত ইব্রাহিম ও তাঁর পরিবারবর্গের মতো যে রহমত কামনা করা হয়েছে, সেই রহমতও হারানো ধন সদৃশ।

বাগবী লিখেছেন, অন্যান্য হাদিসে এসেছে, হজরত মুসা যখন হজরত খিজিরের সঙ্গ কামনা করলেন, তখন হজরত খিজির বললেন, জ্ঞান শিক্ষার জন্য তওরাতই যথেষ্ট। আর পুণ্য কর্মের জন্য বনী ইসরাইলের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালনই যথেষ্ট। দু'টোই আপনার রয়েছে। সুতরাং আমার সঙ্গলাভের প্রয়োজন কী? হজরত মুসা বললেন, আল্লাহ্ আমাকে এরকম নির্দেশ করেছেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রাপ্ত হলেও নিজেকে শিক্ষার্থীরূপে উপস্থিত করাই জ্ঞান চর্চার একটি আদব। আর ওই আদব প্রদর্শনার্থেই হজরত মুসা অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন এভাবে— সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন, এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করতে পারি কি?

এরপরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'সে বললো, তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না।' উল্লেখ্য যে, হজরত খিজির এ কথা বলেছিলেন বেশ জোর দিয়ে। বক্তব্যকে জোর প্রদানের জন্যই তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইন্‌না' (সুনিশ্চিত) এবং 'লান'(কিছুতেই না) শব্দদ্বয়।

এরপরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'যে বিষয় তোমার জ্ঞানায়ত্ব নয়, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করবে কেমন করে? আলোচ্য উক্তিটিও হজরত খিজিরের। এখানে 'খুবরা' শব্দটির অর্থ 'ইলম' (জ্ঞান, সংবাদ বা বিজ্ঞপ্তি)। হজরত খিজির

নিশ্চিত জানতেন, অচিরেই এমন কিছু কাজ তাঁকে করতে হবে, যা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ও মন্দ। নবী ও রসুলগণের শরিয়তে প্রকাশ্য দিকটি অবশ্য পালনীয়। তাই প্রকাশ্য দৃষ্টিতে যা শরিয়ত বিরুদ্ধ, তার বিরুদ্ধাচরণ তো তাঁরা করবেনই। হজরত খিজির কথাটি ভালোভাবেই জানতেন। তাই তিনি বলেছিলেন, হে মুসা! আপনি তো রসুল। আপনি তো সাধারণ মানুষের সংশোধন'কর্মে জড়িত, কিন্তু বাহ্যিক কর্মকাণ্ডসমূহেরও অন্তর্নিহিত একটি রহস্য রয়েছে। সে রহস্য আপনার জানা নেই। আমি প্রধানতঃ বিচরণ করি ওই রহস্যের জগতেই। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমার আচরণ ও কর্মসমূহ আপনার নিকটে আশোভন ও অন্যায় মনে হতেই পারে। তাই আমি বলি, সেরকম কিছু ঘটলে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কীভাবে?

আমি বলি, সর্বসাধারণের জন্য আইন বা বিধান এক রকমই হয়। বিভিন্ন জনের জন্য বিভিন্ন আইন প্রণীত হলে মানুষের সমাজ সংসার বলে আর কিছু থাকে না। তাই ভালো ও মন্দের ধারণা ও বিধান সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজন প্রযোজ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শরিয়ত হচ্ছে এরকম সর্বজন প্রযোজ্য বিধানাবলীর সমষ্টি। আর সর্বসাধারণের সংশোধনের দায়িত্ব যেহেতু নবী ও রসুলগণকে পালন করতে হয়, সেহেতু প্রত্যাদেশের মাধ্যমে শরিয়তের বিধিবিধান জানানো হয় তাঁদেরকেই। ওই শরিয়তানুসারে যেমন তারা নিজেরা পরিচালিত হন, তেমনি পরিচালিত করেন আপামর জনসাধারণকে। তাই শরিয়তের প্রতি অসঙ্গতিপূর্ণ রহস্যময়তা অথবা অরহস্যময়তার তাঁরা বিরোধিতা করেন। এটা নবী রসুলগণের একটি স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। হজরত খিজির ছিলেন অন্তর্নিহিত এক রহস্যময় জগতের নায়ক। জনসম্পৃক্ততা ও সর্বসাধারণের সংশোধনকর্ম তাঁর দায়িত্বভূত বিষয় নয়। তাই তাঁর আচরণ ও কর্মকাণ্ড সর্বজনগ্রাহ্য না হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, হজরত মুসা তাঁর আপাতঃ বিসদৃশ কর্মকাণ্ড সহ্য করতে পারবেন না। ফলে তাঁর সাহচর্য্যের মাধ্যমে হজরত মুসার উপকার লাভেরও সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি হজরত মুসাকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন একথা বলে যে, —যা আপনার জ্ঞানায়ত্ব নয়, তা আপনি সহ্য করবেন কীভাবে? এ কারণেই কামেল সূফীগণ বলেন, মুরীদের যদি তাঁর পীর সম্পর্কে এমতো বিশ্বাস থাকে যে, তিনি একজন প্রকৃত আল্লাহ্‌র পরিচয়ধন্য ব্যক্তিত্ব, তবে পীরের আপাতঃ বিসদৃশ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই হবে তার জন্য সমীচীন। যদি সে এরকম করতে না পারে, তবে বর্তমান পীরের প্রতি উত্তম ধারণা রেখে অন্য কোনো পীরের নিকটে গমন করাই হবে তার কর্তব্য।

একটি প্রশ্নঃ শরিয়তে মোহাম্মদী সকল মানুষের উপরে সমভাবে প্রযোজ্য। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না বলে এই শরিয়তের মধ্যে আর কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন অথবা সংযোজন-বিয়োজনের কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং কোনো পীরকে শরিয়ত বিরোধী কিছু বলতে বা করতে দেখেও তাকে কামেল আরেফ বা আল্লাহ্র পরিচয়ধন্য ব্যক্তিত্ব মনে করা যেতে পারে কীভাবে?

উত্তরঃ নিঃসন্দেহে শরিয়ত বিরোধী কিছু করার অধিকার কারোই নেই। ইলহাম বা অনুপ্রেরণা অনুসারে একটি বালক হত্যা করা হজরত খিজিরের জন্য সিদ্ধ ছিলো বটে কিন্তু এই উম্মতের কারো জন্যই তা সিদ্ধ নয়। আর কামালিয়াতের নাম করে এরকম কর্ম কেউ করেনও না। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, মতপৃথকতাজনিত মাসআলার দু'টি দিক সতত বিদ্যমান— ইতিবাচক ও নেতিবাচক। আর প্রতিটি দিকের নিশ্চয় কোনো না কোনো কারণও রয়েছে। সুতরাং মুজতাহিদ ইমামগণের মতপার্থক্য জনিত মাসআলাগুলোকে যেমন শরিয়ত বিরোধী বলা যায় না, তেমনি আল্লাহ্র পরিচয়প্রাপ্ত অলি-আল্লাহ্গণের ব্যাখ্যাসমূহকেও শরিয়তের পরিপন্থীরূপে সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কখনো কখনো আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের প্রশস্তিসূচক সামা বা সংগীতাদি নিয়ে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁদের সকল কাজ শরিয়ত সম্মত হওয়ার পরেও এমতো কিছু বিসদৃশ আচরণের কারণে তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করা ঠিক নয়। বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই চূড়ান্ত কোনো মাপ-কাঠি নয়। যেমন কেউ যদি কাচের গ্লাসে মদের রঙ বিশিষ্ট শরবত পান করে, তবে একথা বলা যাবে না যে, ওই লোকটি মদ্যপায়ী। পূর্ববর্তী জামানার কোনো কোনো সুফী এ ধরনের আমল করতেন এই উদ্দেশ্যে যে, সর্বসাধারণ যেনো এভাবে তাঁদেরকে ভুল বুঝে দূরে সরে যায় এবং তাঁদের জিকির-ফিকির ও ইবাদত বন্দেগী যেনো হয় নিরুপদ্রব। তাদের এমতো আমলকে শরিয়ত বিরোধী বলা যায় কি?

কামেল পীরগণের মাধ্যমে সগীরা গোনাহ্ প্রকাশ পাওয়াও একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা এসকল অনুল্লেখ্য স্খলন থেকে মুক্ত থাকার জন্য চেষ্টা ও সতর্কতাও তো অবলম্বন করেন। এর পরেও তাঁদের ছিদ্রান্বেষণ করার হেতু কীভাবে থাকতে পারে? তাঁরা তো নবী নন, যে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হতে পারবেন। সুতরাং প্রকৃত মুরীদের কর্তব্য হচ্ছে, সে তাঁর পীর মোর্শেদের এমতো কর্মের অনুসরণ থেকে বিরত থাকবে, কিন্তু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে না এবং এই সন্দেহটিকেও প্রশ্রয় দিবে না যে, তিনি আরেফে কামেল নন।

বিশ্ববিশ্রুত কতিপয় সুফী সাধকগণের কোনো কোনো উক্তি আপাতঃদৃষ্টিতে শরিয়তের পরিপন্থী বলে মনে হয়। যেমন, শায়েখ ইবনে আরাবী, ইবনে সাবঈন, ইবনে ফারেজ প্রমুখ। তাঁদের ওই সকল উক্তি কাশ্‌ফ বা আত্মিক দর্শনজাত। আলেমগণের উচিত ওই সকল উক্তিসমূহকে শরিয়তের অনুকূলে ব্যাখ্যা করা, তাঁদের প্রতি অসৎধারণাকে প্রশ্রয় না দেয়া। আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'একথা শোনার পর মুমিন পুরুষ ও নারী কেনো নিজেদের বিষয়ে সৎধারণা করেনি' (সূরা নূর)। সুতরাং তাঁদের উক্তিসমূহকে শরিয়তের অনুকূলে ব্যাখ্যা না করা গেলে এমতো ধারণা রাখতে হবে যে, তাঁদের ওই উক্তিগুলো ছিলো আধ্যাত্মিক মত্ততাজাত। আর মত্ততা তো একটি উপেক্ষণীয় বিষয়। ফকীহ্‌গণ বলেন, বৈধ আহার্য বা পানীয়ের মাধ্যমেও যদি কারো মত্ততা উদ্ভূত হয় এবং ওই মত্ত অবস্থায় যদি কেউ তালাক দেয়, তবে তা শুদ্ধ হবে না। যদি তাই হয়, তবে প্রেমসাগরে সতত সন্তরণরত আল্লাহ্‌র অলীগণের প্রেমোন্মত্ততাকে কীভাবে দূষণীয় বলা যায়? প্রায়শঃ এরকম ঘটে থাকে যে, পাঠক ও শ্রোতা তাঁদের বক্তব্যের মর্মার্থই অনুধাবন করতে পারে না। তাঁদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য থাকে এক রকম, আর পাঠক ও শ্রোতা বুঝে ফেলে অন্য রকম। একথাতো অনস্বীকার্য যে, সুসংগত ও যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণ ছাড়া বোধ্য ও অবোধ্য কোনো বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায় না। এর মধ্যে আবার অবোধ্য বিষয়সমূহ অধিকতর সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর। যেমন, আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত বিষয়। এসকল বিষয়ের জ্ঞান ও প্রতিক্রিয়া প্রকৃত আল্লাহ্‌ প্রেমিকের হৃদয়ে প্রতিবিম্বত হয়। তিনি তখন বিষয়টিকে প্রকাশ করতে চান, কিন্তু উপযুক্ত কোনো ভাষা খুঁজে পান না। কারণ ভাষা ওই অসীম ও অতুলনীয় জ্ঞান ধারণ করতে অক্ষম। তাই আল্লাহ্‌র পরিচয়ধন্য ব্যক্তি তখন তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেন রূপকভাবে। অপূর্ণাঙ্গ তুলনা প্রয়োগ করা ছাড়া তখন তাঁর বক্তব্য প্রকাশের আর কোনো উপায় থাকে না। সুতরাং তাঁদের রূপকাশ্রয়ী বক্তব্যকে শাব্দিক বা আভিধানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা বৈধ নয়। এরকমও বলা ঠিক নয় যে, তাঁদের বক্তব্য বা বিশ্বাস আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকায়েদের বিপরীত। লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের বাণী সম্ভারের মধ্যেও অবোধ্য বিষয়াবলীর অনেক রূপকাশ্রয়ী বক্তব্য এসেছে। যেমন— 'আর্‌রহমানু আ'লাল আরশিস্‌ তাওয়া' (রহমান আরশের উপরে সমাসীন)। 'ইয়াদুল্লাহি ফাওক্বা আইদিহিম' (আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর)। এগুলো হচ্ছে কোরআনের আয়াত। কোরআনের কোনো আয়াতকে অস্বীকার করলে হয়ে যেতে হয় কাফের। আবার এ ধরনের আয়াতের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করলেও কাফের হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। কারণ আল্লাহ্‌ অবয়বাতীত, স্থানাতীত, কালাতীত ও দৃষ্টান্তাতীত। সুতরাং কোনো স্থানে সমাসীন হওয়া অথবা কারো হাতের উপর হাত রাখা থেকে তিনি চিরমুক্ত, চির পবিত্র। তাই আল্লাহ্‌র ওলীগণের মারেফাত সম্পর্কিত অবোধ্য বিষয়াবলীর বিবরণ ও এরকম উক্তিগুলো প্রত্যাখ্যানযোগ্য যেমন নয়, তেমনি সেগুলোর শাব্দিক বা প্রকাশ্য অর্থও নয় গ্রহণীয়।

এর পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোনো আদেশ আমি অমান্য করবো না।' উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে হজরত মুসা নিজের উপরে আস্থাশীল ছিলেন না। তাই তিনি বলেছিলেন, 'ইনশাআল্লাহ্' বা আল্লাহ্ চাইলে। পরবর্তী সময়ে তাঁর এমতো আস্থাহীনতাই পরিগ্রহ করেছিলো বাস্তবরূপ। আরো উল্লেখ্য যে, হজরত মুসা যদি ওই রহস্যময় পুরুষের কার্যকলাপ দৃষ্টে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারতেন, তবে তিনি নিশ্চয় লাভ করতে পারতেন অনেক রহস্যাচ্ছন্ন জ্ঞান। আর জ্ঞানার্জনের জন্যই হজরত খিজিরের নিকটে তাঁকে গমন করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন আল্লাহ্ স্বয়ং।

শেষোক্ত আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'সে বললো, আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ করো-ই তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন কোরো না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি।' এ কথার অর্থ— হজরত খিজির বললেন, হে বনী ইসরাইলের নবী! আপনি যদি আমার অনুসরণ করতেই চান, তবে নিরবে আমার অনুসরণ করবেন। আমি যা কিছুই করি না কেনো, সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আমি স্বেচ্ছায় আপনাকে কিছু বলি। উল্লেখ্য যে, সন্দেহের বাতিক ও প্রশ্নপ্রবণতা গোপন বিষয়ের জ্ঞানার্জনের অন্তরায়।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪

فَانْطَلَقَا ۥ حَتّٰىٓ اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۗ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ۔ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ۝ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ۝ فَانْطَلَقَا ۥ حَتّٰىٓ اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ۭ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ۔

❒ অতঃপর উহারা যাত্রা করিল, পরে যখন উহারা নৌকায় আরোহণ করিল তখন সে উহাতে ছিদ্র করিয়া দিল। মূসা বলিল, 'আপনি কি আরোহীদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্য উহাতে ছিদ্র করিলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করিলেন।'

❒ সে বলিল 'আমি কি বলি নাই যে তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করিতে পারিবে না?'

❒ মূসা বলিল, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করিবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করিবেন না।'

❒ অতঃপর উহারা চলিতে লাগিল, চলিতে চলিতে উহাদিগের সহিত এক বালকের সাক্ষাৎ হইলে সে উহাকে হত্যা করিল। তখন মূসা বলিল, 'আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করিলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করিলেন।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত মুসাকে নিয়ে হজরত খিজির তাঁর যাত্রা শুরু করলেন। চলতে চলতে উপস্থিত হলেন বিশালাকায় একটি নদীর কিনারে। দেখলেন, মাঝি ও একদল যাত্রীসহ নৌকাটি ছাড়বো ছাড়বো করছে। তাঁরাও নৌকায় উঠলেন। নদীর অপর পাড়ে পৌঁছে যাত্রীদল নেমে গেলে হজরত খিজির নৌকা থেকে নামার সময় নৌকার তলদেশের একাংশ ফুটো করে দিলেন। হজরত মুসা ওই দৃশ্য দেখে আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, এ আপনি কী করলেন! এই নৌকার আরোহীরা তো নদীবক্ষে নিমজ্জিত হবে। না, না। এটাতো গুরুতর অন্যায়।

বাগবী লিখেছেন, তাঁরা দু'জনে যখন নৌকায় উঠলেন, তখন আরোহীরা বললো, এই লোক দু'টো মনে হয় অপহারক। এদেরকে নৌকা থেকে ফেলে দাও। চালক ছিলো নৌকার মালিক নিজেই। সে বললো, না, না। এঁদের চেহারা তো নবীগণের মতো। কিন্তু হজরত উবাই ইবনে কা'ব কর্তৃক ইতোপূর্বে বর্ণিত যথাসূত্রসম্বলিত বোখারী, মুসলিমে উল্লেখিত এক হাদিসে এসেছে, হজরত মুসা ও হজরত খিজির নৌকার নিকটবর্তী হলেন। নৌকার মালিক হজরত খিজিরকে চিনতে পারলেন এবং তাঁদেরকে ডেকে তাঁর নৌকায় উঠিয়ে নিলেন। একথাও ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, পারাপারের পর হজরত খিজির একটি পেরেক দ্বারা নৌকাটির তলদেশ ছিদ্র করে দিলেন।

'লাক্বদ্ জি'তা শাইআন ইমরা' অর্থ আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। বাগবী লিখেছেন, 'ইমরান' অর্থ গুরুতর বা কঠিন। যেমন 'আমিরল আমরু' অর্থ বিষয়টি বড়ই কঠিনরূপ ধারণ করলো। কুতাইবি বলেছেন, 'ইমরান' অর্থ বিস্ময়কর। বাগবী লিখেছেন, নৌকাটি ছিদ্র করার পর হজরত খিজির একটি বড় সীসার পাত ছিদ্রস্থানটিতে লাগিয়ে দিলেন। ফলে নৌকার ভিতরে আর পানি প্রবেশ করতে পারলো না। জালালউদ্দিন মাহাল্লী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, ছিদ্র করে দেয়া সত্ত্বেও নৌকাটিতে পানি প্রবেশ করেনি। এটা ছিলো হজরত খিজিরের মোজেজা।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে—'সে বললো, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না?

এর পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।' একথার অর্থ— আপত্তি উত্থাপনের পরে হজরত মুসা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন একটি বড় ছিদ্র করে দেয়া সত্ত্বেও সেই ছিদ্র দিয়ে নৌকার অভ্যন্তরে কোনো পানি প্রবেশ করছে না। তখন তিনি লজ্জিত হয়ে বললেন, আমার ভুল হয়েছে। সর্বান্তঃকরণে আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমাকে এব্যাপারে আর অভিযুক্ত করবেন না। আরোপ করবেন না কোনো কঠোরতা।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, এখানকার 'ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না' কথাটির অর্থ হবে— হে জ্ঞানী প্রবর! আপনার নির্দেশ লংঘন করে আমি যে ভুল করেছি, সেকারণে আপনি আমাকে অপরাধী বিবেচনা করবেন না। হজরত উবাই ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত যথাসূত্রবিশিষ্ট হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, নবী মুসার তখনকার প্রথম শর্ত ভঙ্গটি ছিলো ভুলের কারণে। দ্বিতীয় শর্ত ভঙ্গটিও ছিলো ভ্রমজনিত। কিন্তু তৃতীয়টি ছিলো ইচ্ছাকৃত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসা ভুলবশতঃ তখন শর্ত ভঙ্গ করেননি। করেছিলেন তার অন্যায়বিরোধী স্বভাবগত বিদ্বেষের কারণে।

শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা চলতে লাগলো, চলতে চলতে তাদের সঙ্গে এক বালকের সাক্ষাত হলে সে তাকে হত্যা করলো।' মুফাস্-সিরগণ লিখেছেন, হজরত খিজির যে বালকটিকে হত্যা করেছিলেন, সেই বালকটি ছিলো সুন্দর ও মিষ্টভাষী। সুদ্দী বলেছেন, বালকদের দলমধ্যে সে-ই ছিলো সবচেয়ে সুন্দর ও লাবণ্যময়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হজরত খিজির বালকটিকে ছুরি দিয়ে জবাই করেছিলেন। যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসে একথাও এসেছে যে, তার মস্তক শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিলো। আবার এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, পাথর মেরে তার মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, দেয়ালে বার বার আঘাত করে তার মাথা থেতলে ফেলা হয়েছিলো। আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত খিজির তাঁর তিন আঙ্গুলের ইশারায় বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস এবং অধিকাংশ মুফাস্সির বলেছেন, বালকটি ছিলো অপ্রাপ্তবয়স্ক। আলোচ্য আয়াতে তাই তাকে বলা হয়েছে 'গুলাম'। প্রাপ্তবয়স্ককে কখনো গুলাম বলা হয় না। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসা তখন আতঙ্কে ও ক্রোধে বলে উঠেছিলেন, আপনিতো এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন। এতে করে বুঝা যায় বালকটি অপ্রাপ্তবয়স্কই ছিলো। নতুবা হজরত মুসা তাকে 'নিষ্পাপ জীবন' বলতেন না।

হাসান বলেছেন, সে ছিলো একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। কালাবী বলেছেন, একজন নওজোয়ান, যে তার পিতা-মাতার আশ্রয়ে অকর্মণ্য জীবন যাপন করতো। রাস্তায় ঘুরাফেরা ছাড়া সে আর কোনো কিছুই করতো না। জুহাক বলেছেন, বালকটি ছিলো কলহপ্রবণ। তার উগ্র আচরণে তার মাতাপিতাও কষ্ট পেতো।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, খিজির যে বালকটিকে হত্যা করেছিলো, সে ছিলো জন্মগতভাবে কাফের। সে বেঁচে থাকলে তার জনক জননীকেও কাফের বানিয়ে ছাড়তো। উল্লেখ্য যে, হজরত খিজির বালকটিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে ফেলেছিলেন। 'ফাক্বতালাহ্' শব্দটিতে সংযোজিত 'ফা' অক্ষরটির মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে— তখন মুসা বললো, আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনিতো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন! এখানে 'যাকিয়্যাতান' শব্দটিকে কোনো কোনো ক্বারী উচ্চারণ করেছেন 'যাকিয়াতান'। কিন্তু কুফাবাসী আলেম ও ক্বারী ইবনে আমের 'যাকিয়্যাতান'ই পড়েছেন। ক্বারী কাসায়ী এবং ফার্‌রা্ বলেছেন শব্দ দু'টো সমার্থক। এখানে এই উচ্চারণটিই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আবু আমর বিন আলা বলেছেন, যে জীবনে কখনোই কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়নি, সেই জীবনকেই বলে 'নাফ্‌সান্ যাকিয়াতান' বা নিষ্পাপ জীবন। অপরাধ করার পরে যদি কেউ খাঁটি নিয়তে তওবা করে নেয়, তবে তাকে 'যাকিয়াতান' বলা যায়।

'বিগইরি নাফ্‌সিন' অর্থ সে এমন কোনো আচরণ করেনি, যার কারণে হত্যা করা যায়। অর্থাৎ সে কাউকে হত্যা করেনি অথবা ধর্মচ্যুতও হয়নি। তাই এখানে বলা হয়েছে— 'হত্যার অপরাধ (কাউকে হত্যা অথবা ধর্মচ্যুত) ছাড়াই।'

'নুকরা' অর্থ ওই সকল কাজ যা শরিয়তের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ। কাতাদা বলেছেন, 'নুকরা' অর্থ মন্দ। মন্দ বোঝাতে ৭১ সংখ্যক আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইমরা' শব্দটি। আর আলোচ্য আয়াতের মন্দ বা গুরুতর অন্যায় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'নুকরা'। উল্লেখ্য যে, 'ইমরা' অপেক্ষা 'নুকরা' অধিকতর মন্দ অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ 'ইমরা' অর্থ যদি মন্দ হয়, তবে 'নুকরা' অর্থ হবে অত্যধিক মন্দ। এক্ষেত্রে অপরাধের তারতম্যানুসারে শব্দ ব্যবহার হয়েছে। নৌকা ছিদ্র করার ব্যাপারটি অবশ্যই অন্যায় ছিলো, কিন্তু হত্যা কাণ্ডটি ছিলো তদপেক্ষা অধিক গুরুতর অন্যায়। তাই প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইমরা' এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে 'নুকরা'। কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'ইমরা' শব্দটিই অধিকতর অন্যায় অর্থপ্রকাশক। কারণ ওই ভাঙা নৌকায় চড়লে অনেক আরোহীর একসঙ্গে সলিল সমাধি হওয়ার আশংকা ছিলো। আর হত্যাকাণ্ডটি ছিলো মাত্র একজনের মৃত্যুর কারণ। সে কারণেই প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইমরা' এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে 'নুকরা'।

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ
عَنْ شَىْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِىْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا ۝ فَانْطَلَقَا
حَتّٰىٓ اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ۣ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا
فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ قَالَ لَوْ شِئْتَ
لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ۝ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ سَاُنَبِّئُكَ
بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۝ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ
يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ
كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ۝ وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ
اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۝ فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ
زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ۝ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى
الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا فَاَرَادَ رَبُّكَ
اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ وَمَا
فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۝

❒ সে বলিল, 'আমি কি বলি নাই যে তুমি আমার সংগে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না?

❒ মূসা বলিল, 'ইহার পর, যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে আপনি আমাকে সংগে রাখিবেন না; আমার ওজর-আপত্তির চূড়ান্ত হইয়াছে।'

❒ অতঃপর উহারা চলিতে লাগিল; চলিতে চলিতে উহারা এক জনপদের অধিবাসীদিগের নিকট পৌঁছিয়া তাহাদিগের নিকট খাদ্য চাহিল; কিন্তু তাহারা উহাদিগের আতিথেয়তা করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তথায় উহারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিতে পাইল এবং মূসার সংগী উহাকে সুদৃঢ় করিয়া দিল। মূসা বলিল, 'আপনি তো ইচ্ছা করিলে ইহার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন।'

❒ মূসার সংগী বলিল, 'এইখানে তোমার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হইল; যে-বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করিতে পার নাই আমি তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি;

❒ নৌকাটির ব্যাপারে— ইহা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির উহারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করিত; আমি ইচ্ছা করিলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করিতে' কারণ উহাদিগের সম্মুখে ছিল এক রাজা যে বলপ্রয়োগে নৌকা সকল ছিনাইয়া লইত।

❒ 'আর কিশোরটি, তাহার পিতামাতা ছিল বিশ্বাসী— আমি আশংকা করিলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও সত্য-প্রত্যাখ্যান দ্বারা উহাদিগকে বিব্রত করিবে।

❒ 'অতঃপর আমি চাহিলাম যে উহাদিগের প্রতিপালক যেন উহাদিগকে উহার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হইবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর।

❒ 'আর ঐ প্রাচীরটি— ইহা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, ইহার নিম্ন দেশে ছিল উহাদিগের গুপ্তধন এবং উহাদিগের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি; সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হইয়া ইচ্ছা করিলেন যে উহারা বয়োপ্রাপ্ত হউক এবং উহারা উহাদিগের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হইতে কিছু করি নাই; ইহাই, তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য-ধারণে অপারগ হইয়াছিলে তাহার ব্যাখ্যা।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না?' আলোচ্য বক্তব্যটি হজরত খিজিরের। লক্ষণীয় যে, তাঁর বক্তব্যে পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার নিমিত্তে ভর্ৎসনার স্বর সুপ্রকট। 'লাকা' শব্দটি তিনি তাঁর বক্তব্যে ব্যবহার করেছেন এ কারণেই।

পরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আমার ওজর-আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে।' হজরত মুসা পরপর দুইবার কথা দিয়েও তাঁর কথা রাখতে পারেননি। তাই তিনি এবার এরকম করে বললেন।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার ভ্রাতা মুসা ও আমার উপরে আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুন। তিনি যদি নীরবে খিজিরের অনুসরণ করতেন, তবে অবলোকন করতে পারতেন আরো অনেক বিস্ময়কর ঘটনাবলী। কিন্তু তিনি তাঁর কথা রাখতে পারেননি বলেই লজ্জিত হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন— এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করি, তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আমার ওজর আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে। ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার ভ্রাতা মুসার প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। তিনি খিজিরকে কথা দিয়েও তা রাখতে পারেন নি। যদি পারতেন, তবে দেখতে পেতেন আরো অনেক আশ্চর্যজনক বিষয়।

এর পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা চলতে লাগলো; চলতে চলতে তারা জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে তাদের নিকট খাদ্য চাইলো; কিন্তু তারা তাদের আতিথিয়েতা করতে অস্বীকার করলো।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই জনপদটির নাম ছিলো ইন্তাকিয়াহ্। ইবনে সিরীন বলেছেন, আইকাহ্। কেউ কেউ বলেছেন, বুরকাহ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী লিখেছেন, জনপদটি ছিলো স্পেনের একটি জনপদ।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে বাগবী লিখেছেন, ওই জনপদবাসীরা ছিলো কৃপণ। তাই তারা হজরত খিজির ও হজরত মুসার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলো। অতিথি সৎকারের জন্য তারা আগ্রহী ছিলো না মোটেও। কাতাদা বলেছেন, ওই জনপদের লোকেরা ছিলো খুব মন্দ স্বভাবের। মেহমানদের আনা গোনা তারা মোটেও পছন্দ করতো না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী উল্লেখ করেছেন, হজরত খিজির ও হজরত মুসা প্রথমে খাদ্য চেয়েছিলেন সেখানকার পুরুষদের কাছে। কিন্তু তারা তাঁদের আবেদনে কর্ণপাত করেনি। শেষে তাঁরা এক ভদ্র মহিলার কাছে খাবার চেয়েছিলেন। তিনিই খাদ্য প্রদান করেছিলেন তাঁদেরকে। তাঁরা তখন ওই ভদ্র মহিলার জন্য দোয়া করেছিলেন এবং বদ্‌দোয়া করেছিলেন সেখানকার পুরুষদের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তথায় তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলো এবং মুসার সঙ্গী তাকে সুদৃঢ় করে দিলো।' এ কথার অর্থ— পানাহার সমাপনের পর হজরত খিজির ও হজরত মুসা পুনরায় পথ চলতে শুরু করলেন। অল্প কয়েক পা সামনে যেতেই দেখলেন একটি বাড়ীর প্রাচীর ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। একটু পরেই নির্ঘাত প্রাচীরটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। হজরত খিজির একটু এগিয়ে গিয়ে প্রাচীরটিকে সোজা করে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন।

হজরত উবাই বিন কা'ব থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, খিজির প্রাচীরটিকে সোজা করে দিয়েছিলেন হাতের ইশারায়। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, স্পর্শ করা মাত্র দেয়ালটি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত খিজির ওই প্রাচীরটিকে ভেঙে নতুন একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সুদ্দী বলেছেন, ভিত্তি নির্মাণ করে তিনি গেঁথেছিলেন প্রাচীর।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আপনি তো ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।' হজরত মুসার এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, হজরত খিজিরের প্রাচীর পুনঃস্থাপনের কাজটি ছিলো শ্রমসাধ্য। অর্থাৎ বেশ পরিশ্রম করে তিনি প্রাচীরটি পুনঃনির্মাণ করে দিয়েছিলেন। যদি তিনি মোজেজার মাধ্যমে হাতের ইশারায় এরকম করতেন, তাহলে হজরত মুসা নিশ্চয় তাঁকে পারিশ্রমিক গ্রহণের কথা বলতেন না।

এর পরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'মুসার সঙ্গী বললো, এখানে তোমার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো।' একথার অর্থ—হজরত মুসা পারিশ্রমিকের কথা তুলেছিলেন যুক্তিসিদ্ধতার আলোকে, অন্যায়ের প্রতি তাঁর প্রতিবাদমুখর হওয়ার স্বভাবজ বৈশিষ্ট্যের কারণে। কিন্তু যে কারণেই হোক এতে করে তাঁর নিশ্চুপ থাকার অঙ্গীকার তো অবশ্যই ভঙ্গ হয়েছিলো। তৃতীয়বারে তিনি একথাও বলেছিলেন, 'এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না।' তাই পারিশ্রমিকের কথা উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হজরত খিজির বললেন, এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো। এবার বিদায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারোনি, আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।' একথার অর্থ— হে বনী ইসরাইলের সম্মানিত পয়গম্বর! আপনার দৃষ্টিতে আমার কার্যকলাপসমূহ শরিয়তবিরোধী বলে মনে হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা শরিয়তবিরোধী নয়। কারণ এই বিশ্ব সংসার সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে সতত সচল রয়েছে এক গোপন ও গভীর ব্যবস্থাপনা। আমি সেই ব্যবস্থাপনার এক নগণ্য প্রতিচ্ছন্দক মাত্র। বাগবী লিখেছেন, কতিপয় তাফসীরকারের মতে হজরত মুসা তখন হজরত খিজিরের পরিধেয় বস্ত্র আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং বলেছিলেন, হে রহস্যময় পুরুষ! আপনি তবে অনুগ্রহ করে এবার আপনার কৃতকর্মসমূহের রহস্য উন্মোচন করুন।

পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'নৌকাটির ব্যাপারে— এটা ছিলো কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করতো। আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে। কারণ, সম্মুখে ছিলো এক রাজা। যে

বলপ্রয়োগে নৌকাসকল ছিনিয়ে নিতো।' একথার অর্থ— হজরত খিজির বললেন, প্রথমে শুনুন নৌকার ব্যাপারটি। নৌকাটি ছিলো কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা ওই নৌকা নিয়ে সমুদ্রে লোক পারাপার করে। এভাবে নির্বাহ করে তাদের জীবিকা। এখানে রয়েছে এক অত্যাচারী রাজা। নতুন নৌকা দেখলেই ছিনিয়ে নেয়া তার অভ্যাস। তাই রাজার লোকেরা যেখানে পায় সেখান থেকেই নতুন নৌকা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। একটু পরেই সেখানে এসে পড়তো রাজার লোকেরা। তাই আমি নৌকাটিকে ছিদ্র করে দিলাম, রাজার লোকেরা নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত দেখে অন্যত্র চলে যাবে। ছিদ্রটিও সামান্য। তাই নৌকার মাঝিরা সহজেই সেটিকে মেরামত করে নিয়ে কাজে লাগাতে পারবে। তাদের জীবিকা অর্জনও বিঘ্নিত হবে না। এটাই ছিলো আমার নৌকা ছিদ্র করার কারণ।

হজরত কা'ব বলেছেন, নৌকাটি ছিলো দশজন দরিদ্র সহোদর ভ্রাতার। তার মধ্যে পাঁচজন ছিলো পঙ্গু। বাকি পাঁচজন নৌকাটির মাধ্যমে আয় উপার্জন করে সংসার চালাতো। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনীয় কিছু সম্পদের অধিকারী হলেও তাকে 'মিসকিন' বা দরিদ্র বলা যায়, যদি উদ্বৃত্ত কিছু না থাকে। সেকারণেই নৌকার মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে এখানে মিসকিন বলা হয়েছে।

'ওয়ারআ' শব্দটির অর্থ সম্মুখে। যেমন, 'মিন ওয়ারইহিম জাহান্নাম' এই আয়াতে 'ওয়ারআ' বলে বুঝানো হয়েছে সম্মুখে। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ পশ্চাতে। প্রথমোক্ত অর্থটি গ্রহণ করলে বলতে হয়, তাদের সম্মুখে ছিলো এক রাজা। আর শেষোক্ত অর্থটি গ্রহণ করলে বলতে হয় তাদের পশ্চাতে ছিলো এক রাজা এবং বক্তব্যটি দাঁড়াতো এরকম— প্রত্যাবর্তনের সময় অত্যাচারী রাজার এলাকা দিয়ে ওই মাঝিদেরকে নৌকা নিয়ে যেতে হতো। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতটিই সঠিক। বঙ্গানুবাদে সে রকমই অর্থ করা হয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস 'ওয়ারআহুম' কথাটির স্থলে পড়তেন 'আমামাহুম' (সামনা সামনি)।

'কুল্লা সাফীনাতিন' অর্থ ত্রুটিমুক্ত নৌকাসকল। অর্থাৎ জালেম রাজার লোকেরা নিখুঁত নৌকা দেখলেই তা ছিনিয়ে নিতো। তাই হজরত খিজির নৌকাটি খুঁতযুক্ত করে দিয়েছিলেন, যাতে রাজার লোকেরা নৌকাটি নিতে আগ্রহী না হয়। ওই রাজার নাম ছিলো জালীদী বিন কারকার। মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, সুলাহ্ বিন জালীদ ইয়্দী। শোয়াইব বলেছেন, হাদ্দাদ বিন বাদাদ। বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত খিজির মাঝিদের নিকটে নৌকা ভাঙার কারণ বর্ণনা করেছিলেন। তাই তারা এ ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করেনি। একটু পরেই সেখানে রাজার লোকেরা এসেছিলো এবং নৌকাটিকে ছিদ্রযুক্ত দেখতে পেয়ে যথারীতি

ফিরেও গিয়েছিলো। তারা চলে যাবার পর অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকাটিকে মেরামত করে নিয়েছিলো তারা। কেউ কেউ বলেছেন, আলকাতরা দিয়ে তারা ছিদ্রস্থানটিকে পালিশ করে নিয়েছিলো। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ছিদ্রস্থানটি তারা ঢেকে দিয়েছিলো সীসা দিয়ে। কিন্তু বর্ণনাটি কোরআনের আয়াতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ মাঝিদের কাছে নৌকা ভাঙার কারণ বর্ণনা করলে হজরত মুসা নিশ্চয়ই এরকম বলতেন না যে, 'আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।' প্রকৃত কথা হচ্ছে, হজরত খিজির তাঁর কার্যকলাপের রহস্য উন্মোচন করেছিলেন, সকল ঘটনার শেষে, বিদায়ের প্রাক্কালে।

এর পরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— 'আর কিশোরটি, তার পিতা-মাতা ছিলো বিশ্বাসী— আমি আশংকা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও সত্যপ্রত্যাখ্যান দ্বারা তাদেরকে বিব্রত করবে।' একথার অর্থ— হজরত খিজির আরো বললেন, এবার শুনুন ওই কিশোরটির কথা, যাকে আমি হত্যা করেছিলাম। সে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও ভবিষ্যতে সে হয়ে উঠতো আরো বেশী উন্নাসিক। তার জন্য বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়তো তার পুণ্যবান পিতা-মাতা। সে তো বল প্রয়োগের মাধ্যমে তার পিতা-মাতাকেও বানিয়ে ফেলতো কাফের। অথবা সন্তান-বাৎসল্যের প্রভাবে তার স্নেহপ্রবণ পিতামাতার কাফের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো প্রবল।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হজরত খিজির তখন বলেছিলেন, আমার মনে এই মর্মে আশংকা হয়েছিলো যে, পুত্র-বাৎসল্যের কারণে তার পিতামাতা যেনো শেষ পর্যন্ত কাফের না হয়ে যায়। এমতো আশংকার কারণেই আমি হত্যা করেছিলাম কিশোরটিকে। উল্লেখ্য যে, হজরত খিজিরের ওই আশংকাটি বিবেকপ্রসূত কোনো আশংকা মাত্র ছিলো না। বরং ওই আশংকা তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত করে দেয়া হয়েছিলো প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এবং হত্যাকাণ্ডটিও ছিলো প্রত্যাদেশায়িত।

জায়েদ ইবনে হুরমুজ সূত্রে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, নাজাদাহ্ খারেজী একবার পত্রের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের নিকটে জানতে চাইলো, হজরত খিজির বালকটিকে হত্যা করেছিলেন কোন বিধানের বলে? রসুল স. তো অকারণ শিশু হত্যাকে নিষিদ্ধ করেছেন। তবে কি ইতোপূর্বে এরকম করা বৈধ ছিলো? হজরত ইবনে আব্বাস তাঁর প্রশ্নের উত্তরে লিখলেন, তুমি যদি নিশ্চিত হতে পারো যে, তোমার সন্তান ভবিষ্যতে তোমার ইমানের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করবে, তবে তুমিও তোমার বালক-সন্তানকে হত্যা করতে পারবে। কিন্তু ওহী বা প্রত্যাদেশ ছাড়া এরকম নিশ্চিত জ্ঞান কারো পক্ষে কখনোই লাভ করার সুযোগ আর নেই। রসুল স. এর মহাতিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে সে পথ রুদ্ধ হয়ে

গিয়েছে। এখন আর আগাম আশংকা বা অনুমানের কারণে কোনো বালককে হত্যা করা বৈধ নয়। ইলহাম অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমেও এরকম আমল সিদ্ধ হতে পারে না। হজরত খিজির হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র নির্দেশে ওহীর মাধ্যমে। আর তিনি রসুল স. এর শরিয়তের আওতাভূতও নন। তাই রসুল স. এর নিষেধাজ্ঞা তাঁর উপরে কার্যকর নয়।

একটি প্রশ্নঃ যে জ্ঞান বাস্তব রূপ লাভ করে না, সে জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যেতে পারে কী ভাবে? আল্লাহ্ জানতেন যে, ওই কিশোরটি তার পিতামাতার ইমানের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করবে। কিন্তু তাকে তো বাঁচতেই দেয়া হলো না। সুতরাং তার অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের বিষয়টি প্রকাশিতও হলো না। হজরত খিজির তার আগেই তাকে হত্য করে ফেললেন। এতে করে কি একথা প্রমাণিত হলো না যে, আল্লাহ্‌র জ্ঞান কাল্পনিক একটি বিষয়, যা বাস্তবায়নযোগ্যও কিছু নয়?

উত্তরঃ সৃষ্টির জ্ঞান জানিত বিষয়ের বাস্তবায়নের মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ বাস্তব জগতে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ সে সম্পর্কে কোনো ধারণা লাভ করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র জ্ঞান এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ বাস্তব জগতে যা কিছু প্রকাশিত হয়, তা আল্লাহ্‌র অপার ও আনুরূপ্যবিহীন জ্ঞানের অনুগত। আল্লাহ্‌র জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং আমরা যে সকল জ্ঞান অর্জন করি তা আল্লাহ্‌র ওই চির অমুখাপেক্ষী জ্ঞানের অনুগত বা বাধ্যগত।

আমি বলি, এরকম উত্তর প্রদানের প্রয়োজন আসলে নেই। কারণ এর দ্বারা উদ্ভূত সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় না। জ্ঞান অনুগত হোক অথবা না হোক সর্বাবস্থায় জ্ঞান ও জানিত বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং জ্ঞানের প্রকাশ না ঘটলে সাদৃশ্যের সুযোগই বা আসবে কোথেকে? সমস্যাই বা সৃষ্টি হবে কেমন করে? হজরত খিজিরের মাধ্যমে নিহত কিশোরটি তো প্রাপ্তবয়স্ক হলোই না। তার দ্বারা প্রকাশিতও হলো না অবাধ্যতা ও সত্যপ্রত্যাখ্যানজনিত কোনো অপরাধ। সুতরাং যার কোনো অস্তিত্বই নেই, তার সঙ্গে জ্ঞানের কোনো বিশুদ্ধ সম্পর্ক হওয়া কীভাবে সম্ভব? তাই এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হচ্ছে— শর্ত ও সম্পর্কই এখানে মূল বিবেচ্য বিষয়। তাই শর্ত ও প্রতিফলের মধ্যে প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হলেই সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ সম্ভব। সুতরাং শর্ত যদি অসম্ভব হয় এবং প্রতিফল যদি প্রকাশ না-ও পায়, তবুও তা জ্ঞান লাভের কোনো অন্তরায় হতে পারে না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যদি আকাশ এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য থাকতো তাহালে উভয় স্থানে বিশৃংখলা দেখা দিতো।' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা যদি একাধিক হতো, তবে অবশ্যই আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতো। এমতোক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার একাধিকত্ব যেমন সম্ভব নয়, তেমনি অন্য কারো দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হওয়াও সম্ভব নয়। অথচ এখানে এক

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও আকাশ পৃথিবীর ধ্বংস না হওয়ার সম্পর্কটি ঠিকই আছে এবং এটি একটি প্রকৃষ্ট জ্ঞান নয় কি? আবার দেখুন, এক স্থানে বলা হয়েছে— 'যখন সূর্য উঠবে তখন দিন হবে।' এক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় সম্বন্ধটি অটুট। এখন যদি সূর্য উদিত হওয়ার শর্তটি প্রকাশিত হয় তবে তার প্রতিফলরূপে দিবসও অস্তিত্বশীল হবে। আর যদি কখনোই উদিত না হয় তখন দিবসও কখনোই অস্তিত্বশীল হবে না। সুতরাং বুঝা গেলো বাস্তব জগতে অস্তিত্বশীল হওয়া না হওয়ার উপরে জ্ঞান নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ যা অস্তিত্বশীল হয় না, তাকে জ্ঞান বলা যায় না— এরকম কথা কিছুতেই বলা যেতে পারে না।

একটি নতুন প্রশ্ন ও তার সমাধান ঃ দু'টি বস্তুর মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাহলে একটি বস্তুর অস্তিত্ব হবে অপর বস্তুটির পূর্ণত্বের কারণ। যেমন সূর্যোদয় দিবস হওয়ার কারণ। অথবা বস্তু দু'টো হবে তৃতীয় কোনো কারণের মুখাপেক্ষী। ওই কারণটি তখন হবে কারণের কারণ বা কারণের উৎস। ওই উৎসই বস্তু দু'টোর মধ্যে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়। যেমন দু'টো ইট তেরসাভাবে একটিকে অপরটির উপরে নির্ভরশীল করে দেয়া হলো। এভাবে দণ্ডায়মান ইট দু'টোর মধ্য থেকে যদি একটিকে সরিয়ে নেয়া হয় তবে অপর ইটটিও আর যথাস্থানে দণ্ডায়মান থাকতে পারবে না। লক্ষণীয় যে, ইট দু'টো কিন্তু নিজেরা একত্র হতে অথবা পরস্পরকে নির্ভর করে দণ্ডায়মান হতে সক্ষম হয়নি। তাদেরকে দণ্ডায়মান করিয়ে দিয়েছিলো কোনো রাজমিস্ত্রী বা নির্মাতা। এখন যে কিশোরটিকে হজরত খিজির হত্যা করেছিলেন, তার বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করা যাক। তার বেঁচে থাকা ও জুলুম করার বিষয়টি ছিলো পরস্পরকে নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা ইট দু'টোর মতো। আর এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বা সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন আল্লাহ্‌। ওই সম্পর্কের কারণেই সে বেঁচে থাকলে কুফরী ও সীমালংঘন ছাড়া বেঁচে থাকতে পারতো না।

বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তাসাউফপন্থীগণের জ্ঞানের মাপকাঠিতে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। তাঁরা বলেন, দৃশ্যমান সকল সৃষ্টি অস্তিত্বশীল হয় প্রকাশ্য অবয়ব ধারণের পূর্বেই। সৃষ্ট বস্তুসমূহের ওই অপ্রকাশ্য অস্তিত্বকে বলে 'হাকায়েকে ইমকানিয়াহ' (সম্ভাব্য তত্ত্ব) এবং 'আ'ইয়ানে ছাবেতাহ' বা স্থিতির মৌল। আর ওই আ'ইয়ানে ছাবেতা হচ্ছে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর প্রতিবিম্ব বা ছায়া। আবার ওই ছায়ার উৎস বা মূল হচ্ছে আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণাবলী। আল্লাহ্‌র সিফাত আবার বিভিন্ন রকমের। যেমন, হেদায়েত করা ও পথভ্রষ্ট করা দু'টোই আল্লাহ্‌র সিফাত। তাই আল্লাহ্‌র এক নাম 'আল হাদী' এবং আর এক নাম 'আল মুদ্বিল্লু'। এভাবে যার অস্তিত্বে মূল প্রতিবিম্ব বা আ'ইয়ানে ছাবেতার উপরে আল হাদী নামের বৈশিষ্ট্য পরিচিহ্নিত হয়, সে পায় হেদায়েত। আর যার আ'ইয়ানে

ছাবেতার প্রতি পতিত হয় 'আল মুদ্বিল্লু' নামের প্রতিক্রিয়া, সে হয়ে যায় গোমরাহ্ ও পথভ্রষ্ট। এভাবে বহির্জগত হয় অন্তর্জগতের প্রতিবিম্ব বা অনুগত। তাই সকল অবহিত ও দর্শিত বিষয়সমূহকে বলা হয় আল্লাহ্র জ্ঞানের মতো। অর্থাৎ আল্লাহ্র জ্ঞানই মূল এবং সমগ্র সৃষ্টি ওই জ্ঞানের অনুসৃতি মাত্র। সুতরাং যার 'মাবদায়ে তা'য়ুন' (সূচনাস্থল) আল্লাহ্র 'আল মুদ্বিল্লু' নামের প্রতিবিম্ব-প্রভাবিত, পথভ্রষ্ট হতে সে বাধ্য। আর যার মাবদায়ে তা'য়ুন আল্লাহ্র 'আল হাদী' নামের প্রতিবিম্ব-প্রভাবিত, হেদায়েত লাভও তার জন্য অনিবার্য। এ কারণেই রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেকের জন্য ওই পথকে সহজ করে দেয়া হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সৃষ্টিগতভাবে পুণ্যবান, তার জন্য পুণ্যকর্মসমূহকে করে দেয়া হয় সহজ। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট, পাপ কর্মসমূহকে করে দেয়া হয় তার জন্য সহজ। হজরত আলী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম।

হজরত খিজির কর্তৃক নিহত বালকটির 'মাবদায়ে তা'য়ুন' ছিলো সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্র 'আল্মুদ্বিল্লু' নামের প্রতিবিম্ব-পরিচিহ্নিত। তাই বেঁচে থাকলে সে কোনো দিনও পথপ্রাপ্ত হতো না। অতএব মৃত্যুই ছিলো তার জন্য কল্যাণকর এবং তার মাতাপিতার জন্যও মঙ্গলজনক। তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত দান আল্লাহ্র অনুগ্রহ বই অন্য কিছু নয়। কিন্তু এরকম অনুগ্রহ করতে আল্লাহ্ কখনো বাধ্য নন। যদি বাধ্য হতেন (যেমন মোতাজিলারা বলে), তাহলে তো সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে আল্লাহ্ বালক বয়সে মৃত্যুদান করতেন। সুতরাং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সম্পূর্ণতই তাঁরই অভিপ্রায়নির্ভর। তিনি ইচ্ছে করলে, কাউকে কল্যাণ দান করবেন। ইচ্ছে না করলে করবেন না। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

এর পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি চাইলাম যে তাদের প্রতিপালক যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন।' এখানে 'ফাআরদনা' (আমি ইচ্ছা করলাম) শব্দটি বহুবচনবোধক। হজরত খিজির তার ইচ্ছাকে এখানে আল্লাহ্র ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র ইচ্ছার সম্পর্ক তাঁর কাজের সঙ্গে হতে পারে, হজরত খিজিরের সঙ্গে নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র ইচ্ছা ও কাজ কখনো হজরত খিজিরের ইচ্ছার অনুকূল নয়। হজরত খিজিরের ইচ্ছায় আল্লাহ্র কাজ সম্পাদিত হয় না। তাই এখানে হজরত খিজির এরাদা করলেন বা ইচ্ছা করলেন কথাটির ধাত্যর্থ বিঘ্নিত হয়ে গৃহীত হবে রূপকার্থে। সে কারণেই এখানে 'আমি চাইলাম' কথাটির অর্থ হবে 'আমি মনে মনে নিবেদন করলাম বা প্রার্থনা জানালাম।'

প্রথম সন্তানকে ধ্বংস করে তদস্থলে দ্বিতীয় সন্তানকে সৃষ্টি করা একটি বৃহৎ পরিবর্তন। তাই এখানে বলা হয়েছে 'ইউব্দিলা হুমা' (তার পরিবর্তে)। উল্লেখ্য যে, প্রথম সন্তানকে অপসারিত করা হয়েছিলো হজরত খিজিরের মাধ্যমে। কিন্তু পরের সন্তান সৃষ্টি করার কাজটি ছিলো স্থলাভিষিক্ত করণ। এক্ষেত্রে হজরত

খিজিরের কোনো ভূমিকা ছিলো না। তাই 'ইউব্‌দিলা' ক্রিয়াটির সম্পর্ক ঘটেছে কেবল আল্লাহ্‌র সঙ্গে। আর 'ইউব্‌দিলা' এর স্থলে 'ইউবাদ্‌দিলা'ও একটি প্রসিদ্ধ পাঠ (ক্বেরাত)। কেননা 'ইবদাল' ও 'তাবদীল' শব্দ দু'টো সমার্থসম্পন্ন। বাগবী লিখেছেন, 'তাবদীল' শব্দটি একটি সাধারণ শব্দ। আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত উভয় প্রকার পরিবর্তনকে বলে 'তাবদীল'। আর 'ইবদাল' বলে বস্তুর অস্তিত্বগত পরিবর্তনকে। বাগবীর এই অভিমতটি ঠিক নয়। ঠিক হলে ভিন্ন পাঠটি এতো প্রসিদ্ধ হতো না। পাঠভিন্নতার কারণে তখন অর্থের মধ্যেও পার্থক্য সূচিত হতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর।' এখানে 'রুহ্‌মা' কথাটির অর্থ রহমত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'রহিমা' থেকে। তাই তাঁরা শব্দটির অর্থ করেছেন নৈকট্য। কাতাদা বলেছেন, শব্দটির অর্থ রক্তের সম্পর্ক রক্ষাকারী, পিতা-মাতার একান্ত অনুগত ও সেবক।

বাগবী লিখেছেন, কালাবী বলেছেন, আল্লাহ্‌ নিহত বালকটির পরিবর্তে তার পিতা-মাতাকে দিয়েছিলেন একটি কন্যাসন্তান। পরবর্তী সময়ে ওই কন্যার পানি গ্রহণ করেছিলেন জনৈক নবী এবং তিনি হয়েছিলেন আর এক নবীর জননী, যিনি পথ প্রদর্শন করেছিলেন একটি বৃহৎ সম্প্রদায়কে। জাফর বিন মোহাম্মদ বলেছেন, ওই পুণ্যময়ী কন্যার বংশে জন্ম নিয়েছিলেন সত্তরজন নবী।

ইবনে জুরাইজ বলেছেন, নিহত পুত্রের পরিবর্তে আল্লাহ্‌ ওই দম্পতিকে দিয়েছিলেন একজন নেককার সন্তান। ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, আতিয়া বলেছেন, আল্লাহ্‌ তাদেরকে দিয়েছিলেন এক পুণ্যময়ী সন্ততি, যিনি পরবর্তীতে হয়েছিলেন একজন পয়গম্বরের জনয়িত্রী। হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম অভিমত পোষণ করেন। ভিন্ন সূত্রে ইবনে মুনজির ইউসুফ বিন ওমরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌ মৃত বালকের পরিবর্তে ওই দম্পতিকে দান করেছিলেন এক পুণ্যময়ী আত্মজা, যার বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অনেক নবী। বোখারী তাঁর ইতিহাসে এবং তিরমিজি ও হাকেম হজরত আবু দারদা থেকে সুপরিণত সূত্রে এরকমই বর্ণনা করেছেন। আর হাকেম বর্ণনাটির সূত্রপরম্পরাকে বিশুদ্ধ বলেই আখ্যা দিয়েছেন।

মাত্‌রাফ বলেছেন, প্রথম সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তার পিতামাতা খুবই খুশী হয়েছিলেন। কিন্তু বালক বয়সে তাকে যখন হত্যা করা হলো, তখন তারা হয়ে পড়েছিলেন শোকাকুল। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। তাই আল্লাহ্‌ তাদের গৃহ আলোকিত করে প্রেরণ করেছিলেন এক পুণ্যময়ী কন্যা। অতএব বিশ্বাসবানগণের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি সতত সন্তুষ্ট থাকা। এমতো বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ্‌র সকল সিদ্ধান্তই কল্যাণকর।

আমি বলি, অভিপ্রেত ও অনভিপ্রেত উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র গোপন সিদ্ধান্তকে ভয় করে চলাই প্রকৃত বিশ্বাসীদের স্বভাব। সুতরাং সর্বাবস্থায় রাখতে হবে তাঁর রহমতের প্রত্যাশা। আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে কেবল তাঁরই নিকটে। তাঁর সকল সিদ্ধান্তের প্রতি প্রদর্শন করতে হবে অনুযোগ-অভিযোগহীন সন্তোষ।

শেষোক্ত আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'আর ওই প্রাচীরটি, ওটি ছিলো নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, তার নিম্নদেশে ছিলো তাদের গুপ্তধন।'

বাগবী লিখেছেন, ওই দুই পিতৃহীন কিশোরের নাম ছিলো ইসরাম এবং সরীম। হজরত ইকরামা এখানকার 'কান্‌জুন' শব্দটির অর্থ করেছেন মাল বা সম্পদ। হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ওই প্রাচীরের নিচে ছিলো সোনা ও রূপার ভাণ্ডার। হাদিসটি বোখারী উল্লেখ করেছেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে। হাকেমও হাদিসটির বর্ণনাকারী এবং তিনি বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেও আখ্যা দিয়েছেন। হজরত আবু দারদার বিবরণ উল্লেখ করে তিবরানী লিখেছেন, ওই সময়ের গুপ্ত সম্পদ ছিলো হালাল এবং হারাম ছিলো গণিমতের মাল। কিন্তু আমাদের জন্য গণিমত হালাল ও গুপ্তধন হারাম।

আমি বলি, জাকাত প্রদান ব্যতিরেকে সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা আমাদের শরিয়তে নিষিদ্ধ। তাই আমাদের জন্য গুপ্তধন হারাম। আল্লাহ্‌ এরশাদ করেছেন— 'যারা সোনা রূপা সঞ্চয় করে রাখে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয়, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।'

হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, যে সম্পদের জাকাত দেয়া হয়, তা গুপ্তধন নয়, যদিও তা মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। আর জাকাতবিহীন সম্পদ গুপ্তধন তুল্য, মাটিতে পুঁতে রাখা না হলেও। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ওই জনপদবাসীদের উপরে জাকাত ফরজ ছিলো না। হজরত আবু দারদা বলেছেন, গুপ্তধন হিসেবে মাটিতে সম্পদ পুঁতে রাখা ছিলো তাদের জন্য হালাল। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের উদ্ধৃতি সহকারে বাগবী লিখেছেন, ওই গুপ্তধন রাখা হয়েছিলো সহীফার আকৃতিতে। সুতরাং বলা যেতে পারে ওই গুপ্তধন ছিলো এলেমের খনি। বিশুদ্ধসূত্র পরম্পরায় হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই গুপ্তধন স্বর্ণ- রৌপ্যের ছিলো না, ছিলো এলেমের। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, রবী বিন আনাসও এরকম বলেছেন। ভিন্নসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, গুপ্তধনরূপে মাটিতে প্রোথিত ছিলো একটি স্বর্ণের তখতা। ওই তখতায় লেখা ছিলো— কী আশ্চর্য! যে মৃত্যুকে জানে, সে কীভাবে উল্লসিত হয়। কী আশ্চর্য! যে তকদীরকে মানে, সে কীভাবে বিমর্ষ ও নিরানন্দ হয়। কী বিস্ময়! রিজিক সুনির্ধারিত, একথা যে বিশ্বাস করে সে কীভাবে রিজিকের চিন্তায় পেরেশান হয়ে

পড়ে। কী বিস্ময়! আখেরাতের প্রতি যে আস্থাশীল, সে কীভাবে হয় দায়িত্ববোধ বিবর্জিত এবং কিয়ামতের প্রতি যার প্রত্যয় রয়েছে, সে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে পরিতৃপ্তই বা হয় কী করে! আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর প্রেরিত রসুল। তখতার অপর পৃষ্ঠায় লেখা ছিলো— আমিই আল্লাহ্। আমি এক। আমার কোনো শরীক নেই। আমি ভালো ও মন্দ উভয়ের সৃষ্টিকর্তা। ওই ব্যক্তির অবস্থা কতোই না কল্যাণকর, যার মাধ্যমে আমি প্রসারিত করেছি শুভ ও মহত্তর কর্মকাণ্ড সমূহকে। শিথিলসূত্র পরম্পরায় সুপরিণতরূপে হজরত আবু জর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায্যার। ইবনে মারদুবিয়াও হজরত আলী থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, বর্ণনাটি সুপরিণত। কিন্তু খারাবিতী তাঁর কামউল হিরস গ্রন্থে লিখেছেন, বর্ণনাটি আসলে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি।

জুজায বলেছেন, 'কান্‌জ' শব্দটি যদি এখানে সম্বন্ধপদ মুক্ত রূপে উল্লেখ করা হতো, তবে এর অর্থ কেবল ধনসম্পদের ভাণ্ডারই হতো, আর শব্দটিকে যদি সম্বন্ধপদ যুক্ত রূপে উল্লেখ হতো তবে তার অর্থান্তর ঘটতো অবশ্যই। যেমন 'কান্‌জুল ইল্‌ম' অর্থ জ্ঞান-ভাণ্ডার। আলোচ্য বাক্যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অবিচ্ছিন্নরূপে (কান্‌জুললাহুমা)। অতএব বুঝতে হবে, ওই গুপ্ত ভাণ্ডারটি একই সঙ্গে ছিলো পার্থিব ও পারলৌকিক সম্পদের ভাণ্ডার। অর্থাৎ স্বর্ণের পাতে লিপিবদ্ধ ছিলো দুর্লভ জ্ঞানের বিবরণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের পিতা ছিলো সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওই ব্যক্তির নাম ছিলো কাশাহ্। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কিশোরদ্বয়ের পিতা পুণ্যবান ছিলেন বলেই আল্লাহ্ তাদের সম্পদ রক্ষার নিমিত্তে পতনোন্মুখ প্রাচীরটি ঠিক করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন হজরত খিজিরকে। মোহাম্মদ বিন মুনকাদার বলেছেন, যে পুণ্যবান, আল্লাহ্ তার সন্তান, সন্তানের সন্তান, গোত্র ও সঙ্গীসাথীদেরকেও হেফাজত করেন। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, নামাজ পাঠের প্রাক্কালে আমার সন্তান-সন্ততিদের কথা মনে পড়ে। তখন আমি নামাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেই (যেনো নামাজের কারণে হেফাজতে থাকে আমার সন্তানেরা)।

এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, ওই পুণ্যবান লোকটি পিতৃহীন কিশোরদ্বয়ের পিতা ছিলেন না, ছিলেন সপ্তমতম পূর্বপুরুষ। একথায় প্রতীয়মান হয় যে, পুণ্যের প্রতিক্রিয়া প্রবহমান থাকে অধঃস্তন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত। সোলায়মান বিন সালিম সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, পুণ্যবানদের পুণ্যের প্রভাব প্রবহমান থাকে পরবর্তী সাত শতাব্দির উত্তর পুরুষগণের মধ্যে। আর পাপিষ্ঠদের পাপের প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে পরবর্তী সাত শতাব্দির বংশধরদের মধ্যে।

উল্লেখিত আয়াতে প্রতীয়মান হয় যে— প্রত্যেক মুসলমান পুণ্যবানদের জন্য অত্যাবশ্যক যে— স্বীয় সন্তান-সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা। কিন্তু শর্ত হচ্ছে— তারা যেন আল্লাহ্ দ্রোহী ও কাফের না হয়। যদি তারা কাফের ও আল্লাহ্দ্রোহী হয়, তবে কঠিন শাস্তির যোগ্য হবে। অপরাপর সাধারণ জনগণ থেকে তাদের সন্তান-সন্ততির উপর আরোপ করতে হবে অধিক কঠোরতা। ভবিষ্যতে অবিশ্বাসী হয়ে যাওয়া; এবং তার প্রতিক্রিয়া পিতা মাতার উপর আপতিত হওয়ার আশংকাতেইতো হজরত খিজির হত্যা করেছিলেন ছেলেটিকে। সে কথারই পোষকতা হচ্ছে আলোচ্য আয়াতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়োপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক।'

'আশাদ্দু' অর্থ এখানে পুরোপুরি বোধশক্তিসম্পন্ন। মানুষ পুরোপুরি শক্তিসম্পন্ন হয় আঠারো বছর বয়সে। আর তার বিবেক-বুদ্ধি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয় পঁচিশ বছর বয়সে, এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। এই পরিপূর্ণতাকে বলে 'কামালে রুশদ।' পঁচিশ বছর বয়সে যদি কেউ কামালে রুশদ পর্যন্ত উপনীত না হয়, তবে পরবর্তী জীবনে তা আশা করা বৃথা। কেননা আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন— 'তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে'। (সুরা নিসা)। আমি বলি, মানুষ কামালে রুশদ (পূর্ণ বিচক্ষণতা) পর্যন্ত পৌঁছে চল্লিশ বছর বয়সে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন— 'ক্রমে সে পূর্ণশক্তি প্রাপ্ত হয় এবং উপনীত হয় চল্লিশ বছর বয়সে।' (সূরা আহ্কাফ)।

বায়যাবী লিখেছেন, হজরত খিজির নৌকা ছিদ্র করার কাজটির সঙ্গে তাঁর নিজের ইচ্ছাকে সম্পৃক্ত করেছেন। বলেছেন, 'আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে।' বালক হত্যা সম্পর্কে বলেছেন, 'অতঃপর আমি চাইলাম যে তাদের প্রতিপালক যেনো তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন।' এভাবে তিনি আল্লাহ্র ইচ্ছার সঙ্গে নিজের কাজকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আর প্রাচীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বলেছেন, 'সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়োপ্রাপ্ত হোক।' এভাবে দেখা যায় তিনি প্রথম কাজটিকে সরাসরি নিজের ইচ্ছার সঙ্গে, দ্বিতীয় কাজটি আল্লাহ্র ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে এবং তৃতীয় কাজটি সরাসরি আল্লাহ্র ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনটি কাজই ছিলো কল্যাণকর। কিন্তু প্রথমটিতে কল্যাণের প্রসঙ্গটি ছিলো আপেক্ষিক, তৃতীয়টি ছিলো সরাসরি মঙ্গলজনক এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে মিশ্রিত ছিলো ভালো ও মন্দ দু'টোই। এভাবে তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছাকে কখনো করেছেন মাধ্যমযুক্ত, কখনো করেছেন মাধ্যম ও মাধ্যমবিহীনতার মিশ্রণ, আবার

কখনো করেছেন সম্পূর্ণরূপে মাধ্যম বিবর্জিত। এতে করে বুঝা যায়, আল্লাহ্র পরিচয়প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হাল বা অবস্থা বিভিন্ন রকমের হয়। কখনো তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় মধ্যস্থতার প্রতি, কখনো মধ্যস্থতা ও মধ্যস্থতাহীনতার মিশ্রণের প্রতি, আবার কখনো সম্পূর্ণরূপে মধ্যস্থতা বিবর্জিত অবস্থার প্রতি।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি নিজ থেকে কিছু করিনি। এটাই, তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য-ধারণে অপারগ হয়েছিলে তার ব্যাখ্যা।'

বাগবী লিখেছেন, বিদায় বেলায় হজরত মুসা বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। হজরত খিজির বললেন, অপরের নিকটে জ্ঞান প্রদর্শনের জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করবেন না। জ্ঞান অন্বেষণ করবেন জ্ঞানানুযায়ী আমল করবার জন্য। বায়যাবী লিখেছেন, নিজের জ্ঞান সম্পর্কে অহংকার না করা, কোনো কিছু পছন্দ না হলে তা অস্বীকার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে না পড়া, এমতো ধারণা রাখা যে, ওই অপছন্দনীয় বিষয়ের ভিতরেও কোনো না কোনো সূক্ষ্ম বাস্তবতা নিহিত থাকতে পারে— এসকল কিছু হচ্ছে বর্ণিত ঘটনাবলীর শিক্ষা।

আমি বলি, শিক্ষক যদি আলেম, মুত্তাকী ও ধর্মপ্রাণ হয়, আর তার মতবাদ যদি অবিশুদ্ধ হয়, তবে তার কথাকে তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকার করা অনুচিত। শিক্ষকের প্রতি হওয়া উচিত সতত শ্রদ্ধাবনত। কথা-বার্তা ও আচরণকে করা উচিত মার্জিত ও শোভন। ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আদব সহকারে তাঁকে সচেতন করা এবং ত্রুটি গুরুতর না হলে তা উপেক্ষা করাই সমীচীন। যদি তাঁর মাধ্যমে বার বার দোষ প্রকাশিত হতে থাকে, তবে সসম্ভ্রমে তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করাই ছাত্রের কর্তব্য। হজরত মুসা ও হজরত খিজিরের ঘটনার মধ্যে রয়েছে এই সকল শিক্ষা।

হজরত খিজির জীবিত না মৃতঃ বাগবী লিখেছেন, এ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত খিজির ও হজরত ইলিয়াস এখনো জীবিত। প্রতিবছর হজের সময়ে দু'জনের দেখা-সাক্ষাত হয়। হজরত খিজির পান করেছেন আবে হায়াত। আবে হায়াতের সন্ধানে সম্রাট জুলকারনাইন যখন অভিযান শুরু করেন, তখন হজরত খিজির ছিলেন তাঁর সঙ্গে। বরাবর এক হাত আগে তিনি পথ চলেছিলেন। এভাবে পথ চলতে চলতে একসময় হজরত খিজির পৌঁছে গিয়েছিলেন আবে হায়াতের ঝর্ণার কাছে। ওই আবে হায়াত বা সঞ্জিবনী সলিলে তিনি অবগাহন করেছিলেন এবং তা পান করে আল্লাহ্র শোকরও আদায় করেছিলেন। কিন্তু সম্রাট জুলকারনাইন পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং ফিরে এসেছিলেন নিরাশ হয়ে। অধিকাংশ আলেম মনে করেন, অন্য সকল সৃষ্টির মতো হজরত খিজিরও স্বাভাবিকভাবে পরলোকগমন করেছেন। কেননা আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন— 'আপনার পূর্বে আমি কোনো মানুষকে চিরদিন অবশিষ্ট রাখিনি।' বর্ণিত হয়েছে, একবার ইশার নামাজের পর রসুল স. বললেন, এখন থেকে একশত বছর পরে বর্তমান পৃথিবীর সকল মানুষ পরলোকগমন করবে। হেসনি হাসীন রচয়িতা তাঁর আত্তাযীয়া গ্রন্থে হাদিসটি

উল্লেখ করেছেন। হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর উপস্থিত হলেন এক অপরিচিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রু বিশিষ্ট, স্থূলকায় ও সুদর্শন। কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রুবিসর্জন করলেন তিনি। তারপর সাহাবীগণের দিকে তাকিয়ে বললেন, মুসিবতের সান্ত্বনা, হৃত সম্পদের বিনিময় এবং প্রস্থানিত ব্যক্তিত্বের স্থলাভিষিক্তি রয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র নিকটে। সুতরাং তাঁর দিকেই সকলে প্রত্যাবর্তনোদ্যত হও। তিনি তো দেখছেন, তোমরা কীরূপ বিপদগ্রস্ত। প্রতীক্ষা করো, এ শোক কখনো দূর হবার নয়। একথা বলেই তিনি চলে গেলেন। হজরত আবু বকর ও হজরত আলী বললেন, ইনি হজরত খিজির।

হজরত খিজিরের সঙ্গে বিভিন্ন আউলিয়ার সাক্ষাত ও ফয়েজ লাভের ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। সুতরাং বলা যেতে পারে, তিনি এখনো জীবিত। কিন্তু তিনি যদি জীবিতই থাকতেন, তবে রসুল স. এর মহিমময় সাহচর্য গ্রহণ করলেন না কেনো? রসুল স. তো সকলের জন্য প্রেরিত বার্তা-বাহক। তাহলে হজরত খিজির এর ব্যতিক্রম হন কী করে? কীভাবে তিনি রসুল স. এর মহান সংসর্গ থেকে বিরত থাকতে পারেন? আর রসুল স. তো স্পষ্ট করেই বলেছেন, আমার যুগে নবী মুসাও যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসারী হওয়া ভিন্ন তাঁর কোনো উপায় থাকতো না। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আহমদ ও বায়হাকী। স্মরণ করা যেতে পারে যে, হজরত ঈসার পুনরাবির্ভাব ঘটলে তিনিও হবেন উম্মতে মোহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত। রসুল স. এর বিশিষ্ট প্রতিনিধি ইমাম মেহেদীর পশ্চাতে তিনি নামাজও আদায় করবেন। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

উল্লেখ্য যে, এ প্রসঙ্গে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির একটি বিস্ময়কর বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেছেন— আমার নিকটে যখন হজরত খিজির জীবিত না মৃত সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন আমি আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণরূপে মনোনিবেশ করলাম এবং প্রার্থনা করলাম একটি সুষ্ঠু সমাধান। এরপর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখলাম আমার সামনে দণ্ডায়মান হজরত খিজির। আমি তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন আমি ও ইলিয়াস উভয়েই মৃত। তবে আল্লাহ্ আমাদের রূহকে এমনভাবে শক্তি দান করেছেন যে, আমরা পার্থিব দেহ বিশিষ্টদের মতো পথ-ভ্রষ্টকে পথের সন্ধান ও বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে পারি, যদি আল্লাহ্ তা চান। যারা ইলমে লাদুন্নী প্রাপ্ত, তাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের বিশেষ মৈত্রী। আর আমরা আল্লাহ্‌র হুকুমে কুতুবে মাদারের সাহায্যকারী। কুতুবে মাদার হচ্ছেন মাদারে আলম। তাঁর অস্তিত্বের বরকতে সুসম্পন্ন হয় মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনা। তিনি অবস্থান করেন ইয়েমেন দেশে। আর তিনি শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী। আমরা তাঁকে সাহায্য করি বলে আমাদেরকেও ইমাম শাফেয়ীর মাজহাব অনুসারে নামাজ পড়তে হয়।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۝
اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ۝ فَاَتْبَعَ
سَبَبًا ۝ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ
حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ
وَاِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ۝ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ
ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ۝ وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ۝ ثُمَّ اَتْبَعَ
سَبَبًا ۝ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ
نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ۝ كَذٰلِكَ ؕ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ
خُبْرًا ۝ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ۝ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ
مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۝ قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ
اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ
خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ
رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ
الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى
اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝

❐ উহারা তোমাকে জুল-কারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল,'আমি তোমাদিগের নিকট তাহার বিষয় বর্ণনা করিব।'

❐ আমি তাহাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়াছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করিয়াছিলাম।

❐ সে এক পথ অবলম্বন করিল।

❐ চলিতে চলিতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছিল তখন সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করিতে দেখিল এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইল। আমি বলিলাম, 'হে জুল্‌কারনাইন! তুমি ইহাদিগকে শাস্তি দিতে পার অথবা ইহাদিগকে সদয়ভাবে গ্রহণ করিতে পার।'

❐ সে বলিল, 'যে-কেহ সীমা লংঘন করিবে আমি তাহাকে শাস্তি দিব, অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে এবং তিনি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।'

❐ 'তবে যে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তাহার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তাহার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলিব।'

❐ আবার সে এক পথ ধরিল,

❐ চলিতে চলিতে যখন যে সূর্যোদয়স্থলে পৌঁছিল তখন সে দেখিল উহা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হইতেছে যাহাদিগের জন্য সূর্য তাপ হইতে আত্মরক্ষার কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করি নাই;

❐ প্রকৃত ঘটনা ইহাই তাহার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।

❐ আবার সে এক পথ ধরিল,

❐ চলিতে চলিতে সে যখন পর্বতপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছিল তখন তথায় সে এক সম্প্রদায়কে পাইল যাহারা তাহার কথা একেবারেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

❐ উহারা বলিল, 'হে জুল্‌কারনাইন। ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে, আমরা কি তোমাকে কর দিব এই শর্তে যে তুমি আমাদিগের ও উহাদিগের মধ্যে এক প্রাচীর গড়িয়া দিবে?'

❐ সে বলিল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন তাহাই উৎকৃষ্ট; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদিগের ও উহাদিগের মধ্যস্থলে এক মজবুত প্রাচীর গড়িয়া দিব।'

❐ 'তোমরা আমার নিকট লৌহ পিণ্ড সমূহ আনয়ন কর' অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থান পূর্ণ হইয়া যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হইল তখন সে বলিল, তোমরা হাপরে দম দিতে থাক।' যখন উহা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইল তখন সে বলিল, 'তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর আমি উহা ঢালিয়া দিই ইহার উপর।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিক অথবা মদীনার ইহুদীরা আপনার নবুয়তের সত্যতা যাচাই করার জন্য আপনাকে জুল-কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি তাদেরকে বলুন, আমি তোমাদের নিকট তাঁর বিষয়ে বর্ণনা করবো।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো আলেম বলেছেন, জুল-কারনাইনের আসল নাম ছিলো মারযুবান বিন মারযিয়্যাহ্। তিনি ছিলেন গ্রীস দেশীয় এবং ছিলেন হজরত নূহের বংশধর। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন রোমের অধিবাসী এবং তাঁর নাম ছিলো সেকেন্দার বিন কিবলিস বিন ফিলকাওস। আমার মতে শেষোক্ত উক্তিটি অধিকতর বিশুদ্ধ। শীরাজী তাঁর আলআলকাব গ্রন্থে এবং ইবনে ইসহাক, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম তাঁদের আপনাপন বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ইতিহাস বিশারদ; তাঁর মতে জুল-কারনাইন ছিলো রোমীয়। তিনি ছিলেন তাঁর বৃদ্ধ পিতার একমাত্র সন্তান। তাঁর আর এক নাম ছিলো সেকেন্দার। ইবনে মুনজির উল্লেখ করেছেন, কাতাদা বলেছেন, সেকেন্দার ও জুল-কারনাইন একই ব্যক্তি।

বাগবী লিখেছেন, জুল-কারনাইন নবী ছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে রয়েছে বিস্তর মতপ্রভেদ। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন নবী। আবু তুফাইল বর্ণনা করেছেন, হজরত আলীকে একবার তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তিনি নবী অথবা বাদশাহ্ কোনোটাই ছিলেন না। ছিলেন পুণ্যবান। তিনি আল্লাহ্কে ভালোবাসতেন এবং আল্লাহ্ও ভালোবাসতেন তাঁকে। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ অন্তর বিশিষ্ট এবং আল্লাহ্র সতত অনুগত। আল্লাহ্ তাঁকে দান করেছিলেন কল্যাণ।

ইবনে মারদুবিয়া সালেম বিন আবীল জাআ'দ সূত্রে উল্লেখ করেছেন, হজরত আলীর নিকটে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, জুল-কারনাইন কি নবী ছিলেন? তিনি বললেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, জুল-কারনাইন ছিলেন আল্লাহ্র একান্ত অনুগত এক বান্দা। আল্লাহ্ তাঁর বিশুদ্ধচিত্ততার যথাযথ বিনিময় দান করেছেন। বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত ওমর একবার শুনলেন, একলোক আরেক লোককে জুল-কারনাইন বলে ডাকছে। তিনি তখন বললেন, তোমরা পয়গম্বরের নামে নাম রেখেও সন্তুষ্ট হতে পারলে না। এখন আবার নিজেদের নাম রাখতে শুরু করছো ফেরেশতাদের নামে। অধিকাংশ আলেমের ধারণা জুল-কারনাইন ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মপ্রাণ রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর নামকরণ প্রসঙ্গে বাগবী উল্লেখ করেছেন বেশ কয়েকটি অভিমত। যেমন— ১. পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। ২. তিনি ছিলেন রোম ও পারস্য রাজ্যের সম্রাট। ৩. আলো ও অন্ধকার দু'দিকেই ভ্রমণ

করেছিলেন তিনি (সম্ভবতঃ একথার উদ্দেশ্য হচ্ছে আফ্রিকার সুদান রাজ্য ও রোম)। ৪. তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি আঁকড়ে ধরে রয়েছেন সূর্যের দুই প্রান্ত। ৫. তাঁর মস্তকে ছিলো শিঙসদৃশ অতীব সুন্দর দু'টি কেশ গুচ্ছ। ৬. জুলকারনাইন অর্থ দুই শিঙ বিশিষ্ট। ওই শিঙ দু'টোকে তিনি ঢেকে রাখতেন পাগড়ি দিয়ে। ইউনুস ইবনে ওবাইদ সূত্রে ইবনে আবদুল হাকাম এবং কাতাদা সূত্রে শীরাজী এরকম বিবরণ উপস্থাপন করেছেন।

আবু তুফাইলের বর্ণনায় এসেছে, জুল-কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে হজরত আলী বলেছিলেন, তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র ভয় প্রদর্শন করতেন। একবার তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর মাথার ডানপাশে আঘাত করলো। ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে পুনরায় জীবিত করে দিলেন। তিনিও পুনরায় আল্লাহ্‌কে ভয় করার উপদেশ দিতে লাগলেন। এবার তাঁর গোত্রের লোকেরা আঘাত করলো তাঁর মাথার বাম পাশে। এর ফলে পুনরায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে পুনরায় জীবিত করে দিলেন। ওই দুই আঘাতের কারণে তাঁর মাথার ডান ও বাম দিক শিঙ এর মতো উঁচু হয়ে উঠেছিলো।

আজজুহুদ গ্রন্থে আহমদ এবং আল উজমা গ্রন্থে ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ আবুল ওরাকা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলীকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো জুল-কারনাইনের শিঙ দু'টো কেমন ছিলো? তিনি বললেন, তোমরা কি মনে করেছো শিঙ দু'টো ছিলো সোনা অথবা রূপার? না, এমন নয়। তিনি ছিলেন একজন নবী। আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য। তিনি যথারীতি মানুষকে আহ্বান জানাতেন আল্লাহ্‌র পথে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একবার তাঁর মস্তকের বাম পাশে আঘাত করলো। ফলে তিনি প্রাণ হারালেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে জীবন দান করলেন এবং মানুষকে পুনরায় সত্য পথের দিকে আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিলেন। তিনিও যথারীতি নির্দেশ প্রতিপালন করে চললেন। এবার তাঁর গোত্রের লোকেরা আঘাত করলো মস্তকের ডান পাশে। ফলে তিনি পরলোক গমন করলেন। আল্লাহ্ তাঁর নাম রেখেছিলেন জুলকারনাইন।

অতঃপর আল্লাহ্‌পাক পরের আয়াতাংশে রসুল স. কে আজ্ঞা করলেন— 'হে নবী! আপনি বলুন; তার ইতিবৃত্ত থেকে কিছু অংশ আমি আবৃত্তি করছি।'

এর পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'আমি পৃথিবীতে তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম।' বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, মেঘমালাকে তাঁর অধীন করে দেয়া হয়েছিলো। তিনি ইচ্ছে করলে মেঘের উপরে আরোহণ করে ভ্রমণ করতে পারতেন। তাঁর জন্য আলোককে প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিলো। অর্থাৎ

রজনীও ছিলো তাঁর জন্য দিবসের মতো আলোকময়। 'পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম' কথাটির মর্মার্থ এরকমই। অর্থাৎ পৃথিবীতে তাঁর পরিভ্রমণ ছিলো অত্যন্ত সহজ। তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিলো পৃথিবীর সকল পথ। ফলে দিবস-রজনী অথবা ঋতুবিবর্তন তাঁর চলার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা রচনা করতে পারতো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম।' একথার অর্থ— আমি তাকে দান করেছিলাম তার অভিলাষ ও উদ্দেশ্য পূরণের সকল পন্থা ও মাধ্যম। অর্থাৎ তার প্রয়োজন সমূহ আমি কখনো অপূর্ণ রাখতাম না। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, যুদ্ধ ও বিজয়ের জন্য যা কিছু প্রয়োজন হয়, তার সকল কিছুই আমি দান করেছিলাম তাঁকে। কেউ কেউ আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ করেছেন এরকম— আমি পৃথিবীর দুই প্রান্তকে করে দিয়েছিলাম তাঁর নিকটবর্তী। বাগবী ও হাসান বসরী এখানকার 'সাবাবান' কথাটির অর্থ করেছেন 'বালাগান'। অর্থাৎ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর সকল উপকরণ আমি দান করেছিলাম তাকে।

এর পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'ফাআত্‌বাআ' সাবাবান' (সে এক পথ অবলম্বন করলো)। একথার মর্মার্থ— অতঃপর উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য তিনি যাত্রা শুরু করলেন এবং পৌঁছেও গেলেন। যেমন বলা হয়— 'মাযিল্‌তু ইত্তাবা'তুহূ হাত্তা আতবা'তুহূ' (আমি সর্বদাই তার অনুসরণ করেছি, এমন কি তার নিকটে পৌঁছেও গিয়েছি)। এরকম অর্থ বর্ণনা করেছেন রুমী, আল আসমায়ী থেকে। 'সাবাবান' কথাটির অর্থ এখানে পথ। অর্থাৎ পশ্চিম দিকের পথ। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন অবস্থানস্থল, মঞ্জিল।

এর পরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'চলতে চলতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছালো, তখন সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখলো এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলো।'

এখানে 'হামিয়াতিন' অর্থ পঙ্কিল, কর্দমাক্ত। বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত মুয়াবিয়া হজরত কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কীভাবে অস্তমিত হয়? তওরাতে তোমরা এ সম্পর্কে কোনো কিছু দেখেছো নাকি? তিনি বললেন, তওরাতে লেখা রয়েছে, সূর্য অস্তমিত হয় পানি ও কাদার মধ্যে। বায়যাবী লিখেছেন, সম্ভবতঃ জুল-কারনাইন পৌঁছে গিয়েছিলেন কোনো মহাসাগরের পাড়ে এবং সূর্যকে অস্তমিত হতে দেখেছিলেন মহাসাগরের অগাধ জলরাশির মধ্যে। তাঁর ওই দৃষ্টিকোনকেই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে এভাবে— সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখলো। কুতাইবিও এরকম বলেছেন।

'সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলো'— এ সম্পর্কে বায়যাবী লিখেছেন, ওই মহাসমুদ্রের পাড়ে বাস করতো চামড়ার পোশাক পরিহিত একদল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। জোয়ারের সময় সমুদ্র থেকে যে সকল মৃত মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণী তটভূমিতে এসে আটকে যেতো, সেগুলোকেই ভক্ষণ করতো তারা।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি বললাম, হে জুল-কারনাইন! তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পারো অথবা এদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারো।' একথার অর্থ— আমি প্রত্যাদেশ করলাম, হে জুল-কারনাইন! তুমি ওই সম্প্রদায়কে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাও। যদি তারা তোমার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাদেরকে শাস্তি দাও। আর যদি তোমার আহ্বানকে গ্রহণ করে তারা ইমানদার হয়ে যায়, তবে তাদের প্রতি প্রদর্শন করো সদয় আচরণ। তাদেরকে শিক্ষা দাও আল্লাহ্র বিধান।

এখানে 'ইম্মা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'তাকসীম' (ভেদ) এর জন্য। প্রত্যাখ্যানের জন্য নয়। যেমন এই আয়াতে 'আও' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাকসীমের (বিভেদ সৃষ্টির লক্ষে) জন্য— ইন্নামা জাযাউ ল্লাজীনা ইউহারিবূনাল্লহা ওয়া রসুলাহু ওয়া ইয়াসআ'ওনা ফীল আরদ্বি ফাসাদান আঁইয়্যুক্বত্তালূ আও ইউসাল্লাবু আও তুক্বাত্ত্বাআ' আইদীহিম ওয়া আরজুলুহুম মিন খিলাফিন আও ইউনফাও মিনাল আরদ্বি (বিভিন্ন অবস্থার জন্য বিভিন্ন রকম বিধান; যদি তারা তওবা করে নেয়, তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করো; আর যদি তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপর অনড় থাকে, তাহলে তাদেরকে শাস্তি দান করো)।

কোনো কোনো আলেম মনে করেন, এখানে 'ইম্মা' পদটি বিয়োজক অব্যয়। এক্ষেত্রে বক্তব্য বিষয়ে কর্তার ইচ্ছার স্বাধীনতা সন্নিহিত থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ জুলকারনাইনকে এখানে এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যে তিনি ওই সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা করতে পারবেন অথবা দিতে পারবেন সত্য ধর্মের দাওয়াত। কেউ কেউ বলেছেন, জুল-কারনাইনকে এখানে এই মর্মে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, তিনি তাদেরকে হত্যা করবেন অথবা করবেন বন্দী। হত্যা অপেক্ষা বন্দীত্বতো উত্তম। তাই শেষে বলা হয়েছে— অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারো।

এর পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'সে বললো, যে কেউ সীমালংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিবো, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্র নির্দেশ পাওয়ার পর জুল-কারনাইন তাদেরকে সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান জানালেন এবং বললেন, আমার এই আহ্বান যে গ্রহণ করবে না, সে সীমালংঘনকারী। আমি তাকে শাস্তি দিবো। কারণ সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। আর মৃত্যুদণ্ডের পরেও তাদের রক্ষা নেই। মৃত্যু-উত্তর জীবনে পুনরায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সরাসরি শুরু হবে কঠিনতর শাস্তি।

এর পরের আয়াতে (৮৮) বলা হয়েছে— 'তবে যে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলবো।' এখানে 'ইউস্‌রা' শব্দটির অর্থ সহজ বা নম্র। মুজাহিদ বলেছেন শব্দটির অর্থ উত্তম। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ জুল-কারনাইনকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের প্রতি নম্র আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এরকম নির্দেশ সাধারণতঃ নবীদেরকে দেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নবী।

বাগবী লিখেছেন, প্রকৃত কথা এই যে তিনি নবী ছিলেন না। আলোচ্য আয়াত সমূহের নির্দেশগুলো তাঁকে প্রত্যাদেশ বা ওহীর মাধ্যমে দেয়া হয়নি। দেয়া হয়েছিলো ইলহামের মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ্‌র অলীগণকে দেয়া হয়ে থাকে। আমি বলি, সম্ভবতঃ তিনি কোনো নবীর মাধ্যমে আলোচ্য আয়াত সমূহের প্রত্যাদেশগুলো পেয়েছিলেন। অথবা কোনো নবী প্রত্যাদেশগুলোর দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে নির্বাচন করেছিলেন প্রতিনিধিরূপে। এভাবে তাঁকে নবীর প্রতিনিধি স্বরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিলো সত্য ধর্ম প্রচারের।

এর পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'আবার সে এক পথ ধরলো।' একথার অর্থ জুলকারনাইন এবার যাত্রা করলেন অন্য এক রাজ্যের দিকে।

এর পরের আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে— 'চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয়স্থলে পৌঁছলো, তখন সে দেখলো তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে, যাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোনো অন্তরায় আমি সৃষ্টি করিনি।' একথার অর্থ— জুলকারনাইন এবার পথ চলতে শুরু করলেন পূর্ব দিকে। চলতে চলতে পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন এক জনপদ। বিস্ময়ের সঙ্গে আরো দেখলেন জনপদবাসীদের শরীর ও সূর্যের মধ্যে কোনো আড়াল নেই। অর্থাৎ তাদের ঘরবাড়ী যেমন নেই, তেমনি নেই কোনো পোশাক আশাক। সভ্য সমাজের সঙ্গে তারা সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত।

এর পরের আয়াতে (৯১)বলা হয়েছে — 'প্রকৃত ঘটনা এটাই'। একথার অর্থ— জুল-কারনাইনের পশ্চিম ও পূর্বের এই অভিযানের মধ্যেই বিবৃত হয়েছে প্রকৃত কাহিনী। অর্থাৎ এজগতে তার কর্তৃত্ব বিস্তৃত করে দেয়া হয়েছিলো পৃথিবীর উভয় প্রান্ত পর্যন্ত। অথবা কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— তিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের অধিবাসীদের সঙ্গে একই রকম আচরণ করেছিলেন। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দিয়েছিলেন শাস্তি এবং বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের সঙ্গে করেছিলেন সদয় আচরণ। এটাই হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা। আবার কথাটির মর্মার্থ এরকম হওয়া সম্ভব যে— পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে জুল-কারনাইন যেভাবে সূর্যকে পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখেছিলেন, সে রকমই কর্দমাক্ত জলধি থেকে পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে সূর্যকে উদিত হতেও দেখেছিলেন তিনি। কিংবা মর্মার্থ হবে—

পৃথিবীর পশ্চিমপ্রান্তবাসীদের জন্য যেমন সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি, তেমনি অন্তরাল সৃষ্টি করিনি পূর্বপ্রান্তবাসীদের জন্যও। এটাই হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।' একথার অর্থ— কেবল আমিই জানি জুল-কারনাইনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা। তার সেনাসংখ্যা, সমরাস্ত্র, ধনসম্পদ, তার জ্ঞানের পরিধি ইত্যাদি সম্পর্কে অন্য কেউই কোনো কিছু জানে না। জানি শুধু আমি।

এখানে 'আহাত্বনা' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে জুল-কারনাইনের বিপুল সংখ্যক সৈন্য, বিশাল সমরসম্ভার ও সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের কথা।

এর পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'আর সে এক পথ ধরলো।' একথার অর্থ— জুল-কারনাইন এবার ধরলো নতুন এক পথ। চলতে শুরু করলো দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

পরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— 'চলতে চলতে সে যখন পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছলো, তখন তথায় সে এক সম্প্রদায়কে পেলো, যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিলো না।' এ কথার অর্থ— পথ চলতে চলতে জুলকারনাইন এবার এসে পৌঁছলেন দু'টি বৃহৎ পর্বতের মধ্যস্থলে। সেখানে দেখলেন অনেক লোকের বসবাস। কিন্তু তাদের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করা হয়ে পড়লো কঠিন। কারণ তাদের ভাষা দুর্বোধ্য।

সুদ্দা ও সাদ্দা শব্দ দু'টো সমার্থক। এর অর্থ প্রাচীর বা প্রতিবন্ধক। ইকরামা বলেছেন, মানব নির্মিত প্রতিবন্ধককে বলে সাদ্দা এবং সুদ্দা বলে প্রাকৃতিক অন্তরায়কে। এখানে 'সাদ্দাইনি' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে দুই বৃহৎ পর্বতের মধ্যবর্তী ওই স্থানকে, যেখানে তিনি ইয়াজুজ-মাজুজের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন একটি সুবৃহৎ প্রাচীর। উল্লেখ যে, ওই সুবৃহৎ প্রাচীরটি নির্মিত হয়েছিলো আর্মিনিয়া ও আজারবাইজানে। ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস এরকমই বলেছেন। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন মন্তব্য করেছেন, তুরস্কের শেষ প্রান্তে রয়েছে দু'টি বৃহৎ পর্বতমালা। ওই পর্বতমালার অপর পাশে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজদের বসবাস। আলোচ্য আয়াতে ওই পর্বতমালার কথাই বলা হয়েছে। এই মন্তব্যটি উল্লেখ করেছেন সাঈদ ইবনে মানসুর তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে এবং ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম তাঁদের আপনাপন তাফসীরে।

'মিনদূনিহিমা' অর্থ দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে। 'লা ইয়াফ্কুহুনা ক্বওলা' অর্থ যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিলো না। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাদের কথা অন্য অঞ্চলের লোক বুঝতো না। তারাও বুঝতো না অন্য এলাকার লোকের ভাষা।

এর পরের আয়াতে (৯৪) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে জুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে।' একথার অর্থ— ওই এলাকার লোকেরা প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের আগমনে আনন্দিত হলো এবং আবেদন জানালো; হে মহামান্য জুল-কারনাইন! আমরা তো দীর্ঘদিন ধরে পর্বতমালার ওপার থেকে আসা দুর্ধর্ষ ইয়াজুজ ও মাজুজের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। মাঝে মাঝেই তারা এদিকে এসে হত্যাকাণ্ড ঘটায়। সম্পদ ধ্বংস করে। আমাদের ক্ষেতের ফসলাদিও নষ্ট করে চলে যায়।

কালাবী বলেছেন, ইয়াজুজ মাজুজেরা আসতো বসন্তকালে। এ পারের অধিবাসীদের ফলমূল তরি-তরকারী খেয়ে ও নিয়ে আবার ফিরে যেতো। ফলে এপারের অধিবাসীদেরকে বড়ই দুর্ভোগ পোহাতে হতো। কেউ কেউ বলেছেন, তারা মানুষও খেতো।

ইয়াজুজ ও মাজুজ শব্দ দু'টো অনারবী। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দ দু'টো আরবী। আরববাসীরা বলে থাকে 'আজুজ জুলমু।' অর্থাৎ আসরাউ' (দ্রুতগতিসম্পন্ন)। বাগবী লিখেছেন, ইয়াজুজ ও মাজুজ শব্দ দু'টোর উৎকলন ঘটেছে 'আজীজুন্ নার' থেকে। আজীজুন্ নার অর্থ অগ্নিকুণ্ড, অগ্নি-দহন; ক্ষতিগ্রস্ততা। ইয়াজুজ মাজুজেরা ছিলো অসংখ্য। তাই তাদেরকে তুলনা করা হয়েছে আগুনের ঝলক, অগ্নিকুণ্ড এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঙ্গে।

বাগবী আরো লিখেছেন, তারা হজরত নুহের পুত্র ইয়াফেসের বংশধর। জুহাক বলেছেন, তারা তুর্কী বংশোদ্ভূত। সুদ্দী বলেছেন, তুর্কী ইয়াজুজের একটি সেনাদল ছিলো ওই এলাকায়। জুল-কারনাইন সেখানে পৌঁছলে তারা ওই দুই পর্বতমালার ওপারে সরে যায়। সকল তুর্কী তাদেরই বংশধর। কাতাদা বলেছেন, ইয়াজুজদের শাখা গোত্র ছিলো বাইশটি। জুল-কারনাইন যখন সেখানে প্রাচীর নির্মাণ করলেন, তখন একটি গোত্র রইল এপারে। আর ওপারে আটকা পড়ে গেলো অবশিষ্ট একুশটি গোত্র। এপারের গোত্রটি তুর্কী। কেননা ইয়াজুজদের মূল জনগোষ্ঠী এদেরকে ত্যাগ করেছিলো। এভাবে পরিত্যক্ত হওয়ার কারণেই এদের নাম হয়েছে তুর্কী।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হজরত নুহের ছিলো তিন পুত্র— শাম, হাম, ইয়াফেস। আরব, পারস্য ও রোমের অধিবাসীরা শামের বংশধর। আবিসিনিয়া, জুনাজ ও নাওবার অধিবাসীরা হচ্ছে হামের বংশধর। আর ইয়াফেসের বংশধরেরা হচ্ছে তুর্কী, খুরজ, সআলিয়াহ্ ও ইয়াজুজ-মাজুজ।

আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে ইয়াজুজ মাজুজদের সংখ্যা দশগুণ বেশী। সুপরিণতসূত্রে হজরত হুজায়ফা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ইয়াজুজ ও মাজুজ ভিন্ন ভিন্ন

দু'টো সম্প্রদায়। তাদের সংখ্যা চার লক্ষ। তারাও বাবা আদমের বংশভূত। ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মরে না, যতক্ষণ না তাদের বংশের একহাজার সন্তান অস্ত্রধারণের উপযোগী হয়। তারা পৃথিবীর অনাবাদী অঞ্চলের দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

আমি বলি, সম্ভবতঃ হাদিসটির মর্মার্থ এই— যখন সম্রাট জুল-কারনাইন প্রাচীর নির্মাণ করলেন তখন তাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো দু'টো দল। একটি ওপারের এবং আরেকটি এপারের। এরপরে তাদের সংখ্যা কতো বৃদ্ধি পেয়েছে, তা অননুমানীয়। কারণ হাদিসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, তাদের বংশের একহাজার সন্তান যৌবনে পদার্পন না করা পর্যন্ত তাদের কারো মৃত্যু হয় না। কিয়ামতের প্রাক্কালে তারা ওই প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে পৃথিবীর সমভূমিতে। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

বাগবী লিখেছেন, ইয়াজুজ মাজুজেরা তিনভাগে বিভক্ত। এক শ্রেণীর ইয়াজুজ মাজুজ আরজ বৃক্ষের সমান লম্বা। অর্থাৎ তাদের উচ্চতা একশত বিশ হাত। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য একশত ত্রিশ হাত। প্রস্থও তাই। তাদের আঘাতে পাহাড় স্বস্থানে স্থির থাকতে পারে না। তৃতীয় শ্রেণীর ইয়াজুজ মাজুজেরা তাদের একটি কান বিছিয়ে দেয় এবং আরেকটি কান নড়া চড়া করতে থাকে। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তারা বের হয়ে এসে ঘোড়া, শুকর এবং বন্য জন্তুসমূহ খেয়ে ফেলবে। মৃত জীবিত কোনো কিছু বাছ বিচার করবে না। তাদের অগ্রবর্তী দল যখন সিরিয়ায় পৌঁছবে, তখন পশ্চাদ্বর্তী দল থাকবে খোরাসানে। তারা পান করবে সকল নদী ও মৃত সাগরের পানি। বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, তাদের কারো কারো উচ্চতা হবে এক বিঘত এবং প্রস্থ হবে এক হাত। আবার কেউ কেউ হবে এর চেয়ে অধিক লম্বা।

হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, আদম সন্তানগণের মধ্যে তারা এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। কথিত আছে, একদিন স্বপ্নে হজরত আদমের বীর্য স্খলিত হলো। আর ওই স্খলিত বীর্য থেকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করলেন ইয়াজুজ মাজুজকে। সুতরাং পিতৃসম্পর্কের দিক থেকে তারা আমাদের ভাই কিন্তু মাতৃ সম্পর্কের দিক থেকে তারা আমাদের কেউ নয়। ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ্ সূত্রে বাগবী লিখেছেন, জুল-কারনাইন ছিলেন রোম দেশের অধিবাসী। জনৈক বৃদ্ধের একমাত্র সন্তান ছিলেন তিনি। যৌবন কালেই তিনি হয়ে ওঠেন পুণ্যবান। ওই সময় আল্লাহ্ তাকে বললেন, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এমন এক সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে আমি তোমাকে প্রেরণ করবো। তাদের মধ্যে একটি গোত্র থাকবে পৃথিবীর পশ্চিমতম প্রান্তে। আরেকটি গোত্র থাকবে পূর্বতম প্রান্তে। পশ্চিমতম প্রান্তের লোকদেরকে বলা হবে নাসেক। আর পূর্বতম প্রান্তের অধিবাসীদের নাম হবে মানসাক। আরো দু'টো গোত্র থাকবে তাদের। একটি সর্বাপেক্ষা উত্তরে। আরেকটি সর্বাপেক্ষা দক্ষিণে।

উত্তরের লোকদের নাম হাবিল। আর দক্ষিণের লোকদের নাম কাবিল। তাদের অবশিষ্ট শাখা গোত্রসমূহ থাকবে পৃথিবীর মধ্যভাগে জ্বিন ও মানুষের সঙ্গে। জুল-কারনাইন বললেন, এরপরে আমি কোন্ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবো? আর কথা বলবো তাদের সঙ্গে কোন ভাষায়? আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবো প্রবল পরাক্রান্তরূপে। তোমার ভাষাকেও করবো ব্যাপকভাবে প্রসারিত। কোনো কিছু তোমাকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারবে না। আমি তোমাকে পরিধান করাবো আতঙ্ক প্রকাশক পরিচ্ছদ। ফলে কেউ তোমার অন্তরায় সৃষ্টি করতে সাহস পাবে না। আলো ও অন্ধকারকে করে দিবো তোমার সহযোগী। আলো তোমাকে পথ দেখাবে এবং অন্ধকার অবস্থান করবে তোমার পশ্চাতে। এরপর জুল-কারনাইন শুরু করলেন তাঁর অভিযান। প্রথমে যাত্রা করলেন সূর্যাস্তের দিকে। চলতে চলতে গিয়ে পৌঁছলেন নাসেকদের কাছে। সেখানে কিছুকাল তিনি আল্লাহ্র ইবাদত করলেন। তারপর তাদেরকে আমন্ত্রণ জানালেন সত্য ধর্মের দিকে। কেউ কেউ তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো। আর কেউ কেউ হয়ে উঠলো বিদ্রোহী। জুল-কারনাইন তাদের উপরে অন্ধকারকে প্রবল করে দিলেন। অন্ধকার প্রকাশ করে দিলো তাদের শরীর ও গৃহের অভ্যন্তরভাগ। শেষে তারাও গ্রহণ করলো সত্যধর্মের আমন্ত্রণ। জুল-কারনাইন তখন তাদেরকে নিয়ে গঠন করলেন এক সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী। তারপর ওই সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন উত্তরতম প্রান্তের হাবিলদের নিকটে। সেখানেও একই নিয়মে বাস্তবায়ন করলেন তাঁর পরিকল্পনা। তারপর নাসেক ও হাবিলদের দ্বারা গঠিত সেনাদলকে নিয়ে তিনি গমন করলেন পূর্বতম প্রান্তের অধিবাসী মানসাকদের নিকটে। এখানেও তিনি পূর্বোক্ত নিয়মে গঠন করলেন সমরকর্মীর একটি দল। তারপর সকলকে নিয়ে হাজির হলেন সর্বদক্ষিণের কাবিলদের কাছে। সেখানেও তিনি গঠন করলেন একটি সেনাবাহিনী। তারপর সকলকে নিয়ে উপস্থিত হলেন পৃথিবীর মধ্যভাগে সেখান থেকে গিয়ে পৌঁছলেন তুরস্কের পূর্বসীমানায়। সেখানে বসবাস করতো একদল বিশ্বাসী পুণ্যবান। তারা বললো, হে জুল-কারনাইন! এখানকার এই দুই পর্বতমালার মধ্যবর্তী প্রবেশ পথটির দিকে লক্ষ্য করুন। এই পথ দিয়ে চতুষ্পদ জন্তুর মতো হিংস্র একদল মানুষ মাঝে মাঝে এসে আমাদের উপরে আক্রমণ চালায়। তাদের দাঁত হিংস্র প্রাণীর মতো সুতীক্ষ্ণ। তারা সাপ ও বিচ্ছু ধরে খায়। ঘোড়া, গাধা ও অন্যান্য বন্য পশুকেও চিরে ফেঁড়ে খেয়ে ফেলে। তাদের বংশ বৃদ্ধি হয় অত্যন্ত দ্রুত। তাই তাদের জনসংখ্যা অত্যধিক। হে মহামান্য সম্রাট! আপনি তাদের আক্রমণ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। এই প্রবেশ পথটিতে নির্মাণ করে দিন একটি সুদৃঢ় প্রাচীর। নির্মাণ ব্যয় জোগান দিবো আমরা। জুল-কারনাইন বললেন, আমার প্রভুপালনকর্তা আমাকে দান করেছেন বিপুল বিক্রম ও অঢেল সম্পদ। সুতরাং তোমাদেরকে নির্মাণ ব্যয় নিয়ে ভাবতে হবে না। তোমরা শুধু

পাথর, লোহা ও তামা সংগ্রহের কাজে শ্রমদান কোরো। তার আগে আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু জেনে নেয়ার চেষ্টা করি। একথা বলে জুল-কারনাইন সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন। প্রবেশ করলেন ইয়াজুজ মাজুজদের এলাকায়। দেখতে পেলেন, সেখানকার মানুষ সকলেই সমমাপের। তাদের সকলের শরীরের দৈর্ঘ্য সমতল ভূমির মানুষের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক। তাদের দাঁত হিংস্র প্রাণীর মতো সরু ও ধারালো। সমস্ত শরীরে রয়েছে ঘন ও মোটা পশম। ওই পশমের মাধ্যমেই তারা শরীরকে রক্ষা করে প্রচণ্ড গরম ও তীব্র শীতের প্রভাব থেকে। তাদের কান দু'টো বৃহদাকৃতির। অত্যধিক তাপ ও শৈত্যের সময় তারা একটি কান মাটিতে বিছিয়ে দেয় এবং অন্য কান দ্বারা আবৃত করে তাদের শরীর। যেখানেই তারা সমবেত হয়, সেখানেই লিপ্ত হয়ে পড়ে যৌনকর্মে। এসকল কিছু দেখে জুল-কারনাইন ফিরে এলেন এবং সেখানে সমবেত জনতাকে বললেন, এবার শুরু করতে হবে প্রাচীর নির্মাণের কাজ। প্রথমে মাটি খনন করতে হবে পানির স্তর পর্যন্ত। তারপর ওই বিশাল ও গভীর গহ্বর পূরণ করে দিতে হবে পাথরের টুকরা দিয়ে। তারপর ওই ভিত্তির উপর বিগলিত তামা ও অন্যান্য মালমসলা দিয়ে নির্মাণ করতে হবে সুদৃশ্য, সুগঠিত ও সুদীর্ঘ প্রাচীর। জুল-কারনাইনের পরিকল্পনা অনুসারে এক সময় শেষ হলো প্রাচীর নির্মাণের কাজ। প্রাচীরটি দেখে মনে হতে লাগলো, যেনো আর একটি দুর্ভেদ্য পর্বত জেগে উঠেছে মৃত্তিকাভ্যন্তর থেকে। বায়যাবী লিখেছেন, বর্ণিত কাহিনীটির মধ্যে রয়েছে বনী ইসরাইলদের অতিরঞ্জন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা কি তোমাকে কর দিবো এই শর্তে যে, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দিবে?' একথার অর্থ— সেখানকার অত্যাচারিত জনসাধারণ এইমর্মে আবেদন জানালো যে, হে মহামান্য জুল-কারনাইন! ইয়াজুজ-মাজুজদের প্রবেশ পথে একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণ করে আমাদেরকে রক্ষা করুন। এর জন্য আমরা সকলে কর দিতে প্রস্তুত। আপনি সেই কর দয়া করে গ্রহণ করবেন কি?

এখানে 'খারাজ' অর্থ কর, পারিশ্রমিক, বিনিময়। 'খারাজ' ও 'খিরাজ' শব্দ দু'টো সমার্থক। আবু ওমর বলেছেন, 'খারাজ' আদায় করা অত্যাবশ্যক। আর 'খারাজ' বলে ওই বস্তু বা সম্পদকে যা দেয়া হয় মনোরঞ্জনার্থে। কেউ কেউ বলেছেন, 'খারাজ' অর্থ ভূমি কর। আর 'খিরাজ' হচ্ছে ব্যক্তিগত কর বা চাঁদা। আরববাসীরা বলেন, 'আদ্দিরাজা র'সাকা ওয়া খিরাজা মাদীনাতাক (ব্যক্তিগত কর ও পৌরকর আদায় কর)। কেউ কেউ বলেছেন, যে কর ভূমির উপর আরোপ করা অনিবার্য হয় অথবা যা আদায় করা হয় ব্যক্তিগতভাবে, তাকে বলে খিরাজ। আর 'খারজান' হচ্ছে ধাতুমূল।

'সাদদান' অর্থ মজবুত বা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এখানে অর্থ হবে— ওই প্রাচীর যা ভেদ করা ইয়াজুজ-মাজুজদের জন্য হবে অসম্ভব।

এর পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'সে বললো আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তা-ই উৎকৃষ্ট; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য করো, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দিবো।'

এখনে 'মা মাক্কান্নী' কথাটির মাধ্যমে সম্রাট জুল-কারনাইন এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে— আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন বিপুল বৈভব। সুতরাং বৈভবগত কোনো সমস্যা এখানে নেই। আর আমাকে প্রদত্ত আল্লাহ্র করুণাসঞ্জাত বিত্তবৈভব নিশ্চয় তোমাদের পরিশ্রমার্জিত বৈভব অপেক্ষা উত্তম। 'কুওয়াতু' অর্থ এখানে শ্রম, শ্রমিক অথবা শ্রমোপকরণ।

পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে— 'তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ড সমূহ আনয়ন করো।' এখনে 'যুবারাল হাদীদ' অর্থ লৌহপিণ্ড বা বড় বড় লোহার টুকরা। 'যুবুর' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'যুবরাতুন'। উল্লেখ্য যে, সম্রাটের নির্দেশানুসারে লোকেরা সেখানে এনে জমা করলো বিপুল সংখ্যক লৌহপিণ্ড, কয়লা ও কাঠ। এরপর তাঁর নির্দেশে সেগুলোকে সন্নিবেশিত করা হলো ধাপে ধাপে স্তরে স্তরে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকস্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহ স্তুপ দুই পর্বতের সমান হলো তখন সে বললো, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাকো। যখন তা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হলো তখন সে বললো, তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন করো, আমি তা ঢেলে দেই নির্মীয়মাণ প্রাচীরের উপর।'

'সদাফাইনি' অর্থ দুই প্রান্তর । 'সদ্ফুন' অর্থ ঝুঁকে যাওয়া বা আকৃষ্ট হওয়া। 'তাসাদিফ' অর্থ সামনাসামনি হওয়া। 'উফরিগ' অর্থ ফেলে দেওয়া, বইয়ে দেওয়া, ভাগ করে দেয়া বা ঢেলে দেয়া। 'ক্বিত্বরান' অর্থ গলিত তামা। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— তারপর যখন লৌহপিণ্ডের মাধ্যমে নির্মিত প্রাকার দুই প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হলো, তখন জুল-কারনাইন বললেন, এবার তোমরা এর উপরে কাষ্ঠখণ্ড একত্র করে সেগুলোতে আগুন জালিয়ে দাও এবং বিভিন্ন স্থানে হাঁপর স্থাপন করে সেগুলোতে সকলে মিলে দম দিতে থাকো। সকলে তাই করলো। বিশাল লোহার দেয়ালটি হয়ে গেলো আগুনের মতো লাল ও উত্তপ্ত। তখন তিনি বললেন, এবার তোমরা নিয়ে এসো বিগলিত তাম্র। আর ওই তরল তাম্রকে ঢেলে দাও প্রাচীরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত, যেভাবে আমি ঢেলে দিতে বলি। উল্লেখ্য যে, এভাবে সম্রাট জুল-কারনাইনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নির্মিত হলো একটি বিশালাকায় পর্বত-সদৃশ সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর। বাগবী লিখেছেন প্রাচীরটির উচ্চতা ছিলো একশত হাত, প্রশস্ততা পঞ্চাশ হাত এবং দৈর্ঘ্য এক ফারসাখ।

فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ○ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ○ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ○ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ○ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا

❒ ইহার পর ইয়াজুজ্ মাজুজ্ উহা অতিক্রম করিতে পারিল না, বা ভেদ করিতে পারিল না।

❒ জুল্-কারনাইন বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।'

❒ সেই দিন আমি উহাদিগকে ছাড়িয়া দিব দলের পর দলে, তরংগের আকারে এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। অতঃপর আমি উহাদিগের সকলকেই একত্রিত করিব।

❒ এবং সেই দিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করিব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের নিকট,

❒ যাহাদিগের চক্ষু ছিল অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যাহারা শুনিতেও ছিল অপারগ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই অনতিক্রম্য প্রাচীরের ওপারে ইয়াজুজ-মাজুজেরা চিরদিনের জন্য আটকা পড়ে গেলো। ওই প্রাচীর পার হওয়া অথবা ভেদ করার সাধ্য আর তাদের হলো না।

পরের আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'জুলকারনাইন বললো, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি প্রাচীরটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন।' একথার অর্থ— সম্রাট জুলকারনাইন তখন উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বললেন, এটা হচ্ছে আমার প্রভুপালনকর্তার একটি অনবদ্য অনুগ্রহ। তাঁর বিশেষ প্রশ্রয়, অনুমোদন ও সাহায্যের দ্বারাই আজ সফলভাবে সমাপ্ত হলো এই মহত্তর নির্মাণ কর্মটি। সুতরাং তাঁর প্রতি প্রকাশ করো আন্তরিক

কৃতজ্ঞতা। আর একটি বিষয়ও ভালো করে জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন, ততদিন এই প্রাচীর অটুট থাকবে। তারপর তাঁর প্রতিশ্রুত সময়ে একদিন অবশ্যই ভেঙে পড়বে এই সুদৃঢ় প্রতিবন্ধকটি। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তখন এই ভেঙে পড়া প্রাচীরটি অতিক্রম করে সমভূমিতে নেমে আসবে ইয়াজুজ মাজুজের সংহারপ্রবণ বিশাল জনস্রোত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।' একথার অর্থ— জুলকারনাইন আরো বললেন, একথাও ভালো করে জেনে নাও হে নির্মাণসফল ও আত্মতৃপ্ত জনতা! কিয়ামত আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত একটি বিষয়। সুতরাং যথাসময়ে তা সংঘটিত হবেই। কারণ তাঁর প্রতিশ্রুতি চিরায়ত, চিরন্তন।

বাগবী লিখেছেন, জুলকারনাইনের কর্মমুখর জীবনে এরপর নেমে এলো যবনিকা। রহস্যময় এক অন্ধকারে প্রবেশ করে পুনরায় ফিরে এলেন তিনি। এরপর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন জুর নামক এক শহরে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, জুলকারনাইনের বয়স তখন হয়েছিলো ত্রিশ বছরের কিছু বেশী।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে সুপরিণত সূত্রে বাগবী আরো লিখেছেন, ইয়াজুজ মাজুজেরা প্রতিদিন ওই প্রাচীরটিকে কেটে ফেলতে চেষ্টা করে। আঘাতে আঘাতে খোদাই করে ফেলে প্রাচীরের বিভিন্ন অংশ। দিনান্তে তাদের নেতা তাদের পরিশ্রান্ত জনতাকে বলে এবার ক্ষান্ত হও। বাকী কাজটুকু আমরা সেরে ফেলবো আগামীকাল। পরদিন তারা এসে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে প্রাচীরটি পূর্ববৎ নিটোল ও অটল। তবুও তারা পূর্ণোদ্দমে শুরু করে প্রাচীর ভঙ্গের কাজ। সন্ধ্যায় আবার ফিরে যায়। পরদিন এসে দেখে প্রাচীরটি আগের মতোই নিচ্ছিদ্র ও নিখুঁত। প্রতিদিনই এরকম হতে থাকে। কিন্তু তাদের চেষ্টাও চলতে থাকে বিরামহীনভাবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী এক সময় ফিরে যাবার আগে তাদের সর্দার বলবে, আজ এ পর্যন্তই থাক, ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল বাকী কাজটুকু সমাপ্ত করবো। ইনশাআল্লাহ্ বলার কারণে পরদিন এসে তারা দেখবে তারা যেভাবে আগের দিন প্রাচীরটিকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রেখে গিয়েছিলো, সেভাবেই প্রাচীরটি দাঁড়িয়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে উল্লসিত হয়ে পড়বে তারা। এভাবে উপর্যুপরি প্রচেষ্টা তাদের সফল হবে। এক সময় প্রাচীরটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে তারা দলে দলে নেমে আসবে সমভূমিতে। নিঃশেষ করে ফেলবে সকল জলাশয়, ঝর্ণা, হ্রদ, কূপ ও নদীর পানি। তাদের ভয়ে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করবে অর্গলবদ্ধ গৃহে অথবা দুর্গে। আসমানের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে তারা। আল্লাহ্ তাদের তীরে রক্ত মাখিয়ে দিবেন। রক্তমাখা পতিত তীর দেখে তারা বলবে, আমরা এখন পৃথিবীবাসী ও আকাশবাসী সকলের উপরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি। আল্লাহ্ তখন তাদের ঘাড়ের উপরে সৃষ্টি করে দিবেন যন্ত্রণা ও মৃত্যুপ্রদায়ক এক ধরনের ফোঁড়া। যখন ফোঁড়াগুলো পরিণত হবে, তখনই ঘটবে তাদের মৃত্যু।

হজরত নাওয়াস ইবনে সামআন থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তখন সকাল। রসুল স. শুরু করলেন দাজ্জালের আলোচনা। তাঁর কণ্ঠস্বর হয়ে যাচ্ছিলো ক্রমশঃ নিম্নগামী। বার বার তিনি প্রস্থানোদ্যত হতে চেষ্টা করছিলেন। তাঁর আচরণ দেখে আমাদের মনে হলো দাজ্জাল হয়তো অতি নিকটে কোথাও বিদ্যমান। আমরা আতংকিত হলাম। তিনি স. বললেন, কী হলো তোমাদের? আমরা বললাম হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমরা দাজ্জালের আলোচনা শুনলাম। সবিস্ময়ে ও সভয়ে লক্ষ্য করলাম একবার আপনার কণ্ঠস্বর পৌঁছে যাচ্ছে উচ্চ গ্রামে, একবার আপনি হয়ে পড়ছেন নিম্নকণ্ঠ। আপনার এমতো অবস্থা দেখে আমাদের মনে হচ্ছে দাজ্জাল হয়তো আশে পাশে কোথাও রয়েছে। রসুল স. বললেন, আরো একটি বিষয় রয়েছে, যা দাজ্জাল অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ। দাজ্জাল যদি আমার উপস্থিতিতে আবির্ভূত হয়, তবে আমি স্বয়ং তার মোকাবিলা করবো। আর আমি চলে যাওয়ার পর যদি সে আসে, তবে তোমাদেরকেই নিতে হবে মোকাবিলার দায়িত্ব। অবশ্য আল্লাহ্ তখন আমার পক্ষ থেকেই প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করবেন। দাজ্জাল হবে অবিন্যস্ত কেশবিশিষ্ট এক যুবক। তার এক চোখ হবে বিস্ফোরিত। মনে হবে চক্ষুটি বুঝি এই মুহূর্তে বেরিয়ে আসবে কোটর থেকে। আমার মতে আবদুল উজ্জা বিন কাতানের সঙ্গে রয়েছে তার অবয়বগত সাদৃশ্য। তার সঙ্গে সাক্ষাত ঘটলে পাঠ করে নিতে হবে সুরা কাহফের প্রথম দিককার কয়েকটি আয়াত। তার আবির্ভাব স্থল হবে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তীতে। তার ডান ও বামের অনেক কিছুই সে ধ্বংস করে ফেলতে থাকবে। হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! বিশ্বাসের উপরে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্যকর্ম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! পৃথিবীতে সে কতদিন থাকবে? তিনি স. বললেন, চল্লিশ দিন। কিন্তু প্রথম দিনটি হবে এক বৎসরের সমান। পরের দিনটি হবে এক মাসের সমান। তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের সমান। বাকী দিনগুলো হবে এখনকার দিনগুলোর মতো। আমরা বললাম, বছরের সমান দিনটিতে কি আমরা এখনকার একদিনের মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বো? তিনি স. বললেন, না। অনুমানে ওয়াক্ত নির্ধারণ করে নিয়ে নিয়মিত সব ওয়াক্তের নামাজ পড়তে হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র বাণীপ্রচারক! সে চলাচল করবে কীভাবে? তিনি স. বললেন, বৃষ্টির সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় যেভাবে চলে। সে যাকে দেখবে, তাকে তার উপর ইমান আনতে বলবে। এক জনপদের লোকেরা তাকে মানবে। সে মেঘকে বলবে, বৃষ্টি বর্ষণ করো। মেঘ তখন বৃষ্টি বর্ষণ করবে। মাটিকে হুকুম দিবে, উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগম ঘটাও। মাটিও তার নির্দেশ পালন করবে। তার উপর যারা ইমান আনবে তাদের উটগুলো চারণভূমি থেকে ফিরে আসবে পরিতৃপ্ত অবস্থায়। উটগুলোর থাকবে উঁচু কুঁজ। উটনীগুলোর ওলান হবে

দুধে পরিপূর্ণ। এরপর সে গমন করবে আর একটি জনপদে। কিন্তু সেখানকার লোকেরা তার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করবে। কিন্তু দাজ্জাল সেখান থেকে চলে যাবার পর তারা হবে দুর্ভিক্ষকবলিত ও নিঃস্ব। এরপর সে ফিরে আসবে সেই উৎসন্ন জনপদে। সেখানে গিয়ে সে মাটিকে হুকুম দিবে, তোমার অভ্যন্তরের সকল সম্পদ বের করে দাও। মাটি তার হুকুম তামিল করবে। তখন সে ডাকবে এক যুবককে। তারপর তাকে দ্বিখণ্ডিত করে খণ্ড দু'টোকে রেখে দিবে তীরের দূরত্বের দুই প্রান্তে। তারপর সে ওই যুবকের নাম ধরে ডাকবে। তৎক্ষণাৎ তার শরীরের খণ্ড দু'টো একত্র হবে এবং সে হয়ে যাবে জীবিত। এরপর আকাশ থেকে অবতরণ করবেন ঈসা ইবনে মরিয়ম। দামেস্কের পূর্বপ্রান্তে শাদা মিনারের উপরে দুই ফেরেশতার কাঁধে ভর করে অবনত মস্তকে নেমে আসবেন তিনি। তাঁর শরীরের স্বেদবিন্দু চমকাতে থাকবে মোতির মতো। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে তাঁর নিঃশ্বাসের সৌরভ। তিনি নেমেই দাজ্জালকে খুঁজতে থাকবেন। খুঁজতে খুঁজতে তাকে পেয়ে যাবেন ফিলিস্তিনের লুদ নামক স্থানে এবং তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করে ফেলবেন। তখন দাজ্জালের বিশৃংখলা থেকে মুক্ত হবে মানবতা। এভাবে তিনি দূর করে দিবেন মানুষের বিষণ্নতা ও মলিনতা। সকলকে সুসংবাদ দান করবেন জান্নাতের। ওই সময় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁকে জানানো হবে জুলকারনাইনের প্রাচীরের মাধ্যমে এতদিন যাদেরকে আটকে রাখা হয়েছিলো, তারা প্রাচীর ভেঙে প্রবল বেগে মানুষের জনপদ সমূহের দিকে ছুটে আসছে। তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করো। ঈসা ইবনে মরিয়ম তাই করবেন। ইত্যবসরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে ইয়াজুজ মাজুজের দল। তাদের অগ্রগামী দলটি নিঃশেষে পান করে ফেলবে মৃত সাগরের পানি। পশ্চাতবর্তী দল সেখানে পৌঁছে শুষ্ক সাগর দেখে মন্তব্য করবে, মনে হয় এখানে আগে পানি ছিলো। ওদিকে হজরত ঈসা তাঁর পর্বতাশ্রয়ের জীবনে খাদ্য সংকটে পতিত হবেন। খাদ্য সামগ্রী হয়ে পড়বে মহার্ঘ। তখন স্বর্ণমুদ্রার চেয়েও অধিক মূল্যবান হবে গরু বা ষাঁড়ের রান। ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে তিনি তখন তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা জানাবেন। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে। আল্লাহ্ ইয়াজুজ-মাজুজের ঘাড়ে সৃষ্টি করে দিবেন অসংখ্য কীটবিশিষ্ট এক ধরনের ঘা। ওই ঘায়ের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হবে সকল ইয়াজুজ-মাজুজ। ঈসা রূহুল্লাহ্ তখন নেমে আসবেন তুর পর্বতমালা থেকে। দেখবেন, সারা পৃথিবী আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজদের মরদেহে। তিনি তখন তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে আল্লাহ্‌র সাহায্যার্থী হবেন। প্রার্থনা করবেন, হে আমাদের আল্লাহ্! উটের মতো গলদেশবিশিষ্ট বৃহদাকৃতির অসংখ্য পাখি প্রেরণ করো। তাঁর ওই প্রার্থনাও কবুল করা হবে।

ত্রাণকর্মীরূপে ওই পাখিরা ইয়াজুজ-মাজুজদের লাশগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে ফেলে দিবে অজ্ঞাত স্থানে। তারপর আল্লাহ্র অভিপ্রায়ানুসারে শুরু হবে তুমুল বৃষ্টি। কোনো তাঁবু বা গৃহের ছাদই সে বৃষ্টিকে ঠেকাতে পারবে না। বৃষ্টি পৃথিবীর সকল স্থান ধুয়ে মুছে সাফ করে দিবে। পৃথিবীতে নতুন করে দেখা দিবে ফল ও ফসলের বিপুল সমারোহ। পৃথিবীর সকল উৎপাদন হবে বরকতময়। ফল-মূল এত বড় হবে যে একটি আনার খাদ্যের প্রয়োজন মিটাতে পারবে একটি গোত্রের এবং তার খোসা ছায়াদান করতে পারবে একটি দলকে। বহু মানুষ পান করে পরিতৃপ্ত হতে পারবে একটি উটের দুধ। এভাবে একটি গাভীর দুধ পরিতৃপ্ত করতে পারবে একটি গোত্রকে এবং একটি ছাগলের দুধ পরিতৃপ্ত করতে পারবে একটি শাখা গোত্রকে। কিছুকাল কেটে যাবে এভাবে। তারপর আল্লাহ্ প্রবাহিত করে দিবেন এক প্রকার সুবাসিত বাতাস। ওই বাতাস স্পর্শ করবে প্রত্যেকের বুকের পাঁজর। রূহে ওই বাতাসের আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে পরলোকগমন করবে মুমিনেরা। এভাবে সমস্ত পৃথিবী হয়ে যাবে মুমিনশূন্য। বেঁচে থাকবে কেবল কাফেরেরা। তারা গাধার মতো চিৎকার করবে এবং নিজেদের মধ্যে শুরু করবে বিরতিহীন যুদ্ধ। এর কিছুদিন পরেই শুরু হবে মহাপ্রলয়।

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, পানিবিহীন মৃত সাগরের পাড়ে এসে ইয়াজুজ-মাজুজদের পশ্চাতবর্তী দলটি বলবে, এখানে হয়তো কখনো পানির অস্তিত্ব ছিলো। এরপর তারা পৌঁছবে খামর পর্যন্ত। বাইতুল মাকদিসের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম খামর। সেখানে পৌঁছে তারা বলবে, আমরা তো পৃথিবীবাসীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। এসো, এবার আমরা আকাশবাসীদেরকে হত্যা করি। একথা বলেই তারা আকাশের দিকে তাদের ছোট্ট ছোট্ট তীর নিক্ষেপ করতে থাকবে। আল্লাহ্ তাদের তীরগুলোকে রক্তরঞ্জিত করে দিবেন। মাটিতে পতিত রক্তরঞ্জিত তীরগুলো দেখে তারা খুব খুশি হয়ে যাবে।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, বিশাল আকৃতির পক্ষিকুল ইয়াজুজ-মাজুজদের লাশগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করবে বিভিন্ন গহ্বর ও গুহায়। মুসলমানেরা তাদের পরিত্যক্ত তীর, তূন ও ধনুকগুলো জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করবে সাত বছর ধরে। হাদিসটি বর্ণনার পর বাগবী লিখেছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছে নিঃশেষে পান করে ফেলবে সাগরের সকল পানি ও খেয়ে ফেলবে সকল প্রাণী। গাছ, কাঠ, মানুষ সকলকেই খেয়ে ফেলবে তারা। কিন্তু তারা মক্কা মদীনা ও বাইতুল মাকদিসে পৌঁছতে পারবে না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর পুনরায় পালন করা যাবে হজ ও ওমরা।

এর পরের আয়াতে (৯৯) বলা হয়েছে— 'সেইদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিবো দলের পর দলে তরঙ্গের আকারে।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ইয়াজুজ-মাজুজদের প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসার সময়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে, তারা ওই প্রাচীর ভেঙে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মতো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সংখ্যায় অসংখ্য বলেই তারা বিশৃংখলভাবে একে অপরকে ঠেলে ফেলে অগ্রসর হতে থাকবে সামনের দিকে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এরকম ঘটনা ঘটবে কবর থেকে পুনরুত্থানের সময়ও। অর্থাৎ তখন সকল কবরবাসী তরঙ্গের আকারে পুনরুত্থিত হবে। জ্বিনেরাও থাকবে ওই মহা তরঙ্গের মধ্যে। পরবর্তী বাক্যটির কারণেই এরকম তাফসীরের অবকাশ বিদ্যমান। এরপর বলা হয়েছে— 'এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্রিত করবো।' একথার অর্থ— ইসরাফিল ফেরেশতার দ্বিতীয় ফুৎকারের পর সকল সমাধি বিদীর্ণ করে উত্থিত হবে সকল মানুষ। আমি তখন তাদেরকে হিসাব গ্রহণের নিমিত্তে সমবেত করবো সমতল হাশর প্রান্তরে।

এর পরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে— 'এবং সেই দিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করবো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট।

এর পরের আয়াতে (১০১)বলা হয়েছে— 'যাদের চক্ষু ছিলো অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি।' এখানে 'গিত্বআন' শব্দটির অর্থ কোনো কিছুকে আচ্ছন্নকারী বা আবৃতকারী, অন্তরাল। আর এখানে 'জিকরি' অর্থ ওই সকল নিদর্শন যা বিবেচিত হয় আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও গুণাবলীর প্রমাণরূপে। অর্থাৎ যাদের চোখ ছিলো ওই সকল প্রমাণ দর্শন থেকে অন্ধ— মূর্খতা, বিরূপ মনোভাব ও তাচ্ছিল্যপ্রবণতা দ্বারা আবৃত। এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যারা শুনতেও ছিলো অপারগ।' একথার অর্থ— এবং যাদের শ্রুতি ছিলো সত্য উচ্চারণ ও সত্যের আহ্বান শুনতে অনভ্যস্ত ও অক্ষম। এভাবে পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— সত্যদর্শন ও সত্যশ্রবণ থেকে যাদের চক্ষু ও কর্ণ অন্ধ ও বধির, সেই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সামনে মহাবিচারের দিবসে আমি উপস্থিত করবো জ্বলন্ত জাহান্নামকে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্তায়ালাই রসুল স. এর দুশমনদের ললাটে লিখে দিয়েছেন চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্য। তাই তারা রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন। তাদের মাবদায়ে তা'য়ুন (সূচনা স্থল) ছিলো আল্লাহ্র গুণবাচক নাম 'আলমুদ্বিল্লু' (পথভ্রষ্টকারী)। সুতরাং সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাই তাদের হেদায়েত প্রাপ্তি ছিলো অসম্ভব। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ হচ্ছে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর প্রতিবিম্ব অথবা প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব। সুতরাং যে

তাঁর সূচনালগ্নে আল্লাহ্‌র 'আলহাদী' (হেদায়েত দানকারী) নামের প্রতিবিম্ব ধারণ করেছে, সেই পেয়েছে হেদায়েত। আর যে তার উৎসলগ্নে ধারণ করেছে আল্লাহ্‌র 'আল মুদ্বিল্লু' (গোমরাহ্‌কারী) নামের প্রতিচ্ছায়া, সে অবশ্যই হয়েছে পথভ্রষ্ট। সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তিবর্গের যেমন পথভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব, তেমনি শেষোক্ত ব্যক্তিদের পথপ্রাপ্ত হওয়াও একটি অসম্ভব ব্যাপার। এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে আমি বিষয়টিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছি।

সূরা কাহ্‌ফ ঃ আয়াত ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ
اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ○ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ
اَعْمَالًا ○ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ
اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ
لِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ○ ذٰلِكَ
جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا ○

❑ যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা কি মনে করে যে তাহারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদিগকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিবে? আমি সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদিগের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জাহান্নাম।

❑ বল, 'আমি কি তোমাদিগকে সংবাদ দিব তাহাদিগের যাহারা কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত?

❑ উহারাই তাহারা,পার্থিব জীবনে যাহাদিগের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তাহারা মনে করে যে তাহারা সৎকর্ম করিতেছে,

❑ 'উহারাই তাহারা, যাহারা অস্বীকার করে উহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁহার সহিত উহাদিগের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে, উহাদিগের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়, সুতরাং কিয়ামতের দিন উহাদিগের কোন গুরুত্ব রাখিব না।

❑ 'জাহান্নাম, —ইহাই উহাদিগের প্রতিফল, যেহেতু উহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে গ্রহণ করিয়াছে বিদ্রূপের বিষয় স্বরূপ।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে?' এখানে 'আমার দাসদেরকে' বলে বোঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা বলে ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা অথবা যারা বলে নবী ঈসা ও নবী উযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে ওই শয়তানকে, অংশীবাদীরা যার উপাসনা করে। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে অংশীবাদীদের দ্বারা পূজিত দেব-দেবীদের প্রতিমাসমূহ। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— ইন্নাল্লাজীনা তাদ্‌উ'না মিন্‌দূনিল্লাহি ইবাদুন আমছালুকুম। এখানেও 'ইবাদুন' বলে বোঝানো হয়েছে দেব-মূর্তিগুলোকে।

'আউলিয়াআ' অর্থ অভিভাবক, সুপারিশকারী অথবা শাফায়াতকারী। আলোচ্য বাক্যটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মিথ্যা ও কাল্পনিক উপাস্যসমূহের অভিভাবক ও সুপারিশকারী হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের কাল্পনিক ও মিথ্যা উপাস্যসমূহকে অভিভাবক ও বন্ধু মনে করে। কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে তাদের বন্ধু নয়, তাদের শত্রু। মহাবিচারের দিবসে তাদের পূজিত শয়তান ও দেবতারাও তাদেরকে অস্বীকার করবে এবং অভিসম্পাত বর্ষণ করবে একে অপরের প্রতি।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম।' এখানে 'নুযুলা' অর্থ অবতীর্ণ হওয়ার স্থান অথবা অতিথিগণের আহার্য। আলোচ্য বাক্যে কাফেরদের জন্য এভাবে অতিথি সৎকার বা অভ্যর্থনার কথা বলা হয়েছে উপহাসচ্ছলে। বিদ্রূপের স্বরে বলা হয়েছে— 'আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম।'

পরের আয়াতে (১০৩) বলা হয়েছে— 'বলো, আমি কি তোমাদের সংবাদ দিবো তাদের, যারা কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত?' হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত' কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টানকে, যারা নিজেদেরকে সত্যাধিষ্ঠিত বলে মনে করে অথচ তাদের শরিয়ত রহিত। কেউ কেউ বলেছেন, সংসারত্যাগী খৃষ্টান পুরোহিতেরাই আলোচ্য কথাটির উদ্দেশ্য, যারা সাধনার বশবর্তী হয়ে মনে করে তারা পথপ্রাপ্ত, অথচ তারা অস্বীকার করে শেষ রসুলের শরিয়তকে। নিঃসন্দেহে তাদের সকল পরিশ্রম ও সাধনা পর্যবসিত হবে ব্যর্থতায়। হজরত আলী বলেছেন, 'বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত' বলে এখানে বোঝানো হয়েছে খারেজীদেরকে, যারা রসুল স. এর সাহাবীগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে মনে করে বৈধ। কেবল খারেজীদের

ক্ষেত্রেই হজরত আলীর উক্তিটি সীমাবদ্ধ নয়। সত্যাধিষ্ঠিত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সকল বিরুদ্ধবাদী দল-উপদলগুলোও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন— মোতাজিলা, শিয়া (বর্তমান জামানার কাদিয়ানী, মওদুদী) ইত্যাদি।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যারা মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান দিবসে অবিশ্বাসী এবং যারা পার্থিবতার পূজক, তারাই আলোচ্য আয়াতের 'বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত' কথাটির লক্ষ্য। যেদিকে তারা দুনিয়ার কোনো লাভ দেখতে পায়, সেদিকেই তারা পরিচালিত করে তাদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ডকে। তারা মনে করে, এই পৃথিবীর পরে আর কোনো কিছুই নেই। বলে, আখেরাতের আশায় যারা পার্থিব ক্ষতিকে মেনে নেয়, তারা নির্বোধ।

এর পরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— 'ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে তারা সৎকর্ম করেছে।'

এর পরের আয়াতে (১০৫) বলা হয়েছে— 'ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের বিষয়।' একথার অর্থ— ওই সকল লোকই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, যারা পৃথিবীকে পরবর্তী পৃথিবীর উপরে প্রাধ্যান্য দেয়, উদাসীন থাকে মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান সম্পর্কে এবং অস্বীকার করে মহাবিচারের দিনের বিচারানুষ্ঠানকে। রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তিই সত্যাশ্রয়ী ও সচেতন যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে এবং যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করেছে মৃত্যু-উত্তর জীবনের জন্য। আর ওই ব্যক্তি মিথ্যাচারী ও নির্বোধ, যে স্বপ্রবৃত্তির অনুসারী এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী। যথাসূত্রপরম্পরায় হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য যদি ইহুদী ও খৃষ্টান হয়, তবে এখানে নিদর্শনাবলী অস্বীকার করার অর্থ হবে— তারা পুনরুত্থান দিবসকে স্বীকার করলেও ওই সময়ের ঘটিতব্য বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রদান করে মনগড়া ব্যাখ্যা। যেমন তারা মনে করে সেখানে তাদের কোনো আযাব হবে না। হলেও তা হবে কেবল চল্লিশ দিনের জন্য। নিঃসন্দেহে এমতো ধারণা ও উক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার নামান্তর।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফলে, তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়, সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের কোনো গুরুত্ব রাখবো না।' এখানে 'আ'মালুহুম' অর্থ ওই সকল কর্ম, যা তারা করেছিলো দুনিয়া অর্জনের জন্য। অথবা ওই সকল আমল, যা তারা করেছিলো পুণ্য অর্জনের জন্য। কিন্তু সেগুলোর দ্বারা তারা কোনো পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। কারণ পুণ্যকর্ম কবুল হওয়ার মূল শর্তই হচ্ছে ইমান। কিন্তু তারা ছিলো বেইমান। আর এখানকার 'ওয়ায্‌না' শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ সেদিন তাদেরকে কোনো প্রকার গুরুত্ব প্রদান করবেন না। অর্থাৎ তাদের আমলগুলোকে তিনি গণনযোগ্য বলে মনেই করবেন না।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে কোনো কোনো স্থূলকায় লোকের ওজন মশার ডানার সমানও হবে না। তার প্রমাণ হচ্ছে— 'ফালা নুকীমু লাহুম ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ওয়ায্না' (সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের কোনো গুরুত্ব রাখবো না)। বোখারী, মুসলিম।

আবু নাঈম ও আজরী আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে উপস্থাপন করেছেন হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস। হাদিসটি এই—রসুল স. বলেছেন, শক্তিশালী দেহবিশিষ্ট কোনো কোনো লোককে মহাবিচারের দিবসে মীযানের এক পাল্লায় রাখা হবে, কিন্তু তাদের ওজন যবের একটি দানার পরিমাণও হবে না। ফেরেশতারা এরকম সত্তর হাজার ব্যক্তিকে এক ধাক্কায় ফেলে দিবেন। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— এ ধরনের লোকের আমল ওজনই করা হবে না। বিনা বিচারেই তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে নরকাগ্নিতে। অথবা অর্থ হবে— যে আমলগুলোকে তারা আমল বলে মনে করে সে আমলগুলোকে মীযানে তুলে দিলে দেখা যাবে, সেগুলোর কোনো ওজনই নেই।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, বিচারের দিবসে মানুষ তাদের আপনাপন আমল নিয়ে হাজির হবে। কারো কারো দৃষ্টিতে তাদের পুণ্যকর্মসমূহকে মনে হবে টিহামা পাহাড় সদৃশ। কিন্তু মীযানের পাল্লায় তুলে দিলে দেখা যাবে সেগুলো ওজনহীন। ওই দৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এখানে বলা হয়েছে— সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের কোনো গুরুত্ব রাখবো না।

সুয়ূ্তী লিখেছেন, সেদিন ইমানদারদের আমল ওজন করা হবে, না শুধু ওজন করা হবে কাফেরদের আমল— সে সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সেদিন বিচার অনুষ্ঠিত হবে কেবল ইমানদারদের, কাফেরদের নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সেদিন ওজন করা হবে সকলের আমল। প্রথমোক্ত দল তাদের অভিমতের সপক্ষে উপস্থাপন করেন আলোচ্য আয়াতের এই অংশটি 'সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের কোনো গুরুত্ব রাখবো না।' শেষোক্ত দলটির অভিমত হচ্ছে, আমল ওজন করা হবে না— আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকম নয়। বরং মর্মার্থ হবে— তাদের আমল গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে— এবং যাদের পাল্লা হাল্‌কা হবে, তারা নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে (সুরা মু'মিনুন)। কিন্তু কুরতুবীর কথা উল্লেখ করে সুয়ূ্তী বলেছেন, সেদিন সকলের আমল ওজন করার প্রয়োজন হবে না। যে বিশ্বাসবানেরা বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে এবং যে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিনা

হিসাবে দোজখে প্রবেশ করবে, তাদের আমলের কোনো ওজন হবে না। হিসাবই যাদের নেই, তাদের আমলের আবার ওজন করার প্রয়োজন পড়বে কেনো? এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'পাপিষ্ঠদেরকে তাদের চেহারা দেখে চেনা যাবে'। সুয়ূতী আরো বলেছেন, এই প্রসঙ্গে কুরতুবীর অভিমতটিই যথার্থ। আর এতে করে উদ্ভূত মতবিরোধেরও নিরসন হয়। সুতরাং একথাই বলা যুক্তিযুক্ত যে, বিনা হিসাবের জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে বাদ দিয়ে অনুষ্ঠিত হবে অবশিষ্ট ইমানদার ও কাফেরদের বিচার। তাদের জন্যই প্রতিষ্ঠিত করা হবে মীযান।

আমি বলি, যে কাফেরদের কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তারা হচ্ছে মুনাফিক ও আহলে কিতাব। হিসাব-নিকাশের পূর্বে মুনাফিকেরা মিশে থাকবে ইমানদারদের দলে। আর কাফেরেরা থাকবে আলাদা অবস্থানে। মুশরিকদের সঙ্গে তারা থাকবে না।

শেষোক্ত আয়াতে (১০৬) বলা হয়েছে— 'জাহান্নাম, এটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসুলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রূপের বিষয়স্বরূপ।' এখানে 'জালিকা' অর্থ এটাই। 'বিমা কাফারূ'(সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে) কথাটির দ্বিতীয় অক্ষর 'মা' হচ্ছে মায়ে মাসদারী (ধাতুমূল) এবং প্রথম অক্ষর 'বা' হচ্ছে কারণ প্রকাশক। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— সত্যপ্রত্যাখ্যান, আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অস্বীকৃতি এবং আমার বার্তাবাহকগণের প্রতি বিদ্রূপ করার কারণে ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতিফল হবে জাহান্নাম। 'হুযুওয়ান' বলে ওই ব্যক্তি বা বস্তুকে যাকে বানানো হয় বিদ্রূপের পাত্র বা বিদ্রূপের বিষয়।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ১০৭, ১০৮

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

❐ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান,

❐ সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে; ইহার পরিবর্তে অন্য স্থান কামনা করিবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে ফেরদাউসের উদ্যান।' এখানে 'কানাত্লাহুম' কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, আল্লাহ্র পূর্ব সিদ্ধান্ত বা অঙ্গীকারানুসারে বিশ্বাসী ও

সৎকর্মপরায়ণগণের চিরস্থায়ী ঠিকানা নির্ণীত হয়েছে ফেরদাউস নামক বেহেশতের উদ্যান। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা কালে ফেরদাউস জান্নাত চেয়ো। ফেরদাউসই হচ্ছে জান্নাতের কেন্দ্র। অন্যান্য জান্নাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ওই জান্নাতের উপরে রয়েছে আল্লাহ্‌র আরশ এবং সেখান থেকে জান্নাতের স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হয়।

হজরত উবাদা ইবনে ছামেত থেকে তিরমিজি ও হাকেম এবং হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একশতটি স্তর রয়েছে জান্নাতের। প্রতিটি স্তরের মধ্যবর্তী ব্যবধান আকাশ ও পৃথিবীর অন্তর্বর্তী দূরত্বের সমান। আর জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে ফেরদাউস। সেখান থেকেই অন্যান্য বেহেশতের দিকে প্রবাহিত হয় চারটি নহর। আর ফেরদাউসের উপরে রয়েছে আল্লাহ্‌র আরশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌ সকাশে জান্নাতুল ফেরদাউস যাচ্ঞা কোরো।

হজরত ইরবাজ ইবনে সারিয়াহ্‌ থেকে বায্‌যার এবং হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে তিবরানী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, প্রার্থনার সময় তোমরা জান্নাতুল ফেরদাউসের প্রার্থী হয়ো। কারণ ওই জান্নাত সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। হজরত আবু উমামার বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসীরা আরশের আওয়াজ শুনতে পাবে (মাঝখানে কোনো অন্তরায় থাকবে না)।

বাগবী লিখেছেন, হজরত কা'ব বলেছেন জান্নাতুল ফেরদাউস অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কোনো জান্নাত নেই। ওই জান্নাতে প্রবেশ করবে সৎকর্মের নির্দেশদাতা ও অসৎকর্মের প্রতিরোধকারী। মুকাতিল বলেছেন, ফেরদাউস হচ্ছে জান্নাতের উচ্চভূমি ও সর্বাধিক কল্যাণ বিশিষ্ট। হজরত আবু মুসা থেকে আহমদ তায়ালাসি ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন— ফেরদাউসে রয়েছে চারটি বেহেশত। তন্মধ্যে দু'টি বেহেশত স্বর্ণের। সেখানকার অট্টালিকা ও অন্যান্য সামগ্রীও স্বর্ণের। বাকী দু'টো বেহেশত ও তাদের উপকরণসমূহ রৌপ্যনির্মিত।

আমি বলি, উপরে বর্ণিত হাদিস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লেখিত চারটি বেহেশতের নাম ফেরদাউস। কিন্তু একথা ঠিক নয়। কারণ তৎপূর্বে বর্ণিত হয়েছে ফেরদাউস একটি বিশেষ জান্নাতের নাম। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, চারটি জান্নাতুল ফেরদাউসের কথা এসেছে বর্ণনাকারীর ভুলে। অথবা 'ফেরদাউস' এর শাব্দিক অর্থই এখানে উদ্দেশ্য। হজরত কা'ব বলেছেন, আভিধানিক অর্থে ফেরদাউস বলা হয় দ্রাক্ষা কাননকে। ইকরামা বলেছেন, আবিসিনীয় ভাষায় ঘনবদ্ধ অরণ্যকে বলে ফেরদাউস। জুজায বলেছেন, শব্দটি রোমীয়। কিন্তু

বিদেশী ভাষার এই শব্দটি আরবীতেও ব্যবহৃত হয়। জুহাক বলেছেন, ঘন ঘন বৃক্ষবিশিষ্ট বাগানকে বলে ফেরদাউস। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফেরদাউস বলা হয় সকল কান্তিময় কাননকে। কেউ কেউ বলেছেন, বিভিন্ন রকমের ফল ও ফসলের বাগানকে বলা হয় ফেরদাউস। এর বহুবচন হচ্ছে ফারাদীস।

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত সকল অর্থই সন্নিবেশিত রয়েছে হাদিসে উল্লেখিত ফেরদাউস এর মধ্যে। সকল কিছু নিয়েই ফেরদাউস হয়েছে জান্নাতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম। আলোচ্য আয়াতে ফেরদাউসের শাব্দিক অর্থই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সাধারণভাবে সকল ইমানদার হবে ওই জান্নাতের অধিবাসী। আর ফেরদাউস যদি কোনো বিশেষ জান্নাত হয়, তবে তার অধিবাসী হবে বিশেষ শ্রেণীর ইমানদারগণ। হজরত আনাস থেকে বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর আনুরূপ্যবিহীন অলৌকিক হস্তে সৃষ্টি করেছেন ফেরদাউস। মদ্যপায়ী ও মুশরিকদের জন্য ওই জান্নাত হারাম।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হারেছ বিন নওফেল থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর আপন হাতে নির্মাণ করেছেন তিনটি বস্তুকে— ১. বাবা আদম ২. মহাগ্রন্থ তওরাত এবং ৩. ফেরদাউস। ফেরদাউস সৃষ্টির প্রাক্কালে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, আমার মর্যাদা ও মহত্ত্বের শপথ! এই জান্নাতে কখনোই প্রবেশ করবে না নিয়মিত মদ্যপায়ী ও দাইয়ুস। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! দাইয়ুস কি? তিনি স. বললেন ওই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীকে মন্দকর্মে প্ররোচিত করে।

পরের আয়াতে (১০৮) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা স্থায়ী হবে; এর পরিবর্তে অন্য স্থান কামনা করবে না।' একথার অর্থ— বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলগণ হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের চিরস্থায়ী অধিবাসী। অন্যত্র বসবাসের চিন্তা তারা কখনোই করবে না। কারণ এর চেয়ে উত্তম স্থান আর নেই।

হাকেম প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার কুরায়েশদের প্রেরিত দূত মদীনায় গিয়ে সেখানকার ইহুদীদেরকে বললো, আমাদেরকে কিছু প্রশ্ন বলে দাও। আমরা ফিরে গিয়ে ওই প্রশ্নসমূহের মাধ্যমে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্কে পরীক্ষা করবো। ইহুদীরা বললো, আপনারা তাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। দূত মক্কা ফিরে আসার পর কুরায়েশ গোত্র প্রধানেরা তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তখন অবতীর্ণ হলো 'তারা আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে রূহ সম্পর্কে। আপনি বলুন রূহ হচ্ছে আমার প্রতিপালকের একটি আদেশ। আর তোমরা অত্যল্প জ্ঞানই প্রদত্ত হয়েছো'। ইহুদীদের নিকটে এই সংবাদ পৌঁছলে তারা বলতে লাগলো, আমাদেরকে দেয়া হয়েছে তওরাত। তাই আমরা পেয়েছি বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার ও প্রভূত কল্যাণ। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ○ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ○

❒ বল, 'আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে— সাহায্যার্থে ইহার মত আরেকটি সমুদ্র আনিলেও।'

❒ বল, 'আমি তো তোমাদিগের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদিগের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। সুতরাং যে তাহার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তাহার প্রতিপালকের ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল অজ্ঞ, অবিমৃশ্য ও উন্নাসিক ইহুদীদেরকে বলে দিন, আমার প্রভুপালনকর্তার প্রজ্ঞা ও বাণী তো অনন্ত। কোনো ভাষা সে আনুরূপ্যবিহীন বচন প্রকাশ করে শেষ করতে পারে না। সমুদ্রসমূহের পানিকে যদি তোমরা কালি বানাও এবং সেই কালি দিয়ে আল্লাহ্‌র বাণী লিখতে শুরু করো, তবে দেখবে সে কালি নিঃশেষ হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণী অনিঃশেষ। কারণ কালি তো এক সময় শেষ হয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণী অন্তহীন। এভাবে যত সমুদ্রই তোমরা একত্র করো না কেনো, শেষ পর্যন্ত সবই শেষ হবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র বচনবৈভব রয়ে যাবে আগের মতোই অক্ষয় ও অশেষ।

এখানে 'মাদাদ' অর্থ ওই বস্তু যার দ্বারা অন্য কোনো বস্তুর সহায়তা হয়। যেমন প্রদীপের জন্য তেল ও কলমের জন্য কালি। আর এর আভিধানিক অর্থ আধিক্য, নিরবচ্ছিন্নতা। আমি বলি, সাত সমুদ্রের পানি এবং তার সঙ্গে আরো অনেক সমুদ্রের পানি সংযোগ করে সেগুলো যদি কালিতে পরিণত করা হয় এবং সেই কালি দিয়ে আল্লাহ্‌র কালাম লিপিবদ্ধ করা শুরু হয় তবে দেখা যাবে এক সময় কালি নিঃশেষ হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণী রয়ে গিয়েছে পূর্ববৎ অনিঃশেষ। কেননা সসীম কখনো অসীমকে আয়ত্ত করতে পারে না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইহুদীরা একবার রসুল স.কে বললো, আপনি তো নিজেই বলেন, আমাদেরকে প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাব দেয়া হয়েছে। আর একথা আপনার কিতাবেই লেখা আছে যে, যাকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাকে দান করা হয়েছে প্রভূত কল্যাণ। তাহলে আপনার সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব কোথায়? তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এভাবে তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র বচনরূপী কল্যাণ অন্তহীন। সকল সমুদ্রের পানি কালি বানালেও সে আনুরূপ্যবিহীন, অক্ষয় ও অনন্ত বাণীর অক্ষরায়ণ কখনো সমাপ্ত হবার নয়। সুতরাং হে অজ্ঞ ইহুদীকুল! তোমরা আল্লাহ্‌র বাণীর অনন্ত ধারাবাহিকতা ও অসীমতাকে মান্য করো। প্রসারিত করো বিশ্বাসের বলয়। তওরাতকে যেমন মান্য করছো, তেমনি মান্য করো কোরআনকে। তওরাত যাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁকে যেমন বিশ্বাস করেছো, তেমনি বিশ্বাস করো তাঁকে, যাঁর উপরে অবতীর্ণ হয়েছে কোরআন। এ পথেই রয়েছে প্রকৃত ও প্রভূত কল্যাণ। সকল দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের অবসান।

পরের আয়াতে (১১০) বলা হয়েছে— 'বলো, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ধ্বনিত হয়েছে বিশ্বাসের মূল বাণী এবং নবী রসুলগণের প্রকৃত মর্যাদার কথা। নবী রসুলগণ একই সঙ্গে মানুষ ও নবী। কারণ তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ হয় ওহী বা প্রত্যাদেশ। এখানেও তেমনি প্রত্যাদেশে বলা হয়েছে, হে আমার রসুল! আপনি পৃথিবীবাসীদের নিকটে আপনার প্রকৃত পরিচয় উন্মোচন করুন এভাবে— হে মনুষ্য সমাজ! উত্তমরূপে অবগত হও যে, আমিও তোমাদের মতো মনুষ্য সম্প্রদায়ভূত। কিন্তু আমাকে বিশেষায়িত করা হয়েছে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। সেই নিঃসন্দিগ্ধ নির্দেশানুসারেই আমি করে চলেছি সত্যের প্রচার, যার মূল মর্ম হচ্ছে তোমাদের ও আমার আল্লাহ্ এক, একক, অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য ও আনুরূপ্যবিহীন। তাঁর সত্তা, গুণাবলী, কার্যাবলী কোনো কিছুতেই কারো কোনো প্রকার অংশীদারিত্ব নেই। ফলকথা, রসুল স.কে বিনয় নম্রতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

আমি বলি, আলোচ্য নির্দেশনাটির মাধ্যমে একটি বৃহৎ বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে, যে বিশৃঙ্খলার মধ্যে এখনো নিমজ্জিত রয়েছে অজ্ঞ, অবিবেচক ও উন্নাসিক খৃষ্টানেরা। হজরত ঈসা জন্মান্ধকে দৃষ্টি দান করতেন। কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করতেন। মৃতকেও করতেন পুনর্জীবিত। তাঁর এ সফল অলৌকিকত্ব দেখে খৃষ্টানেরা হয়ে গেলো বিপথগামী। কেউ তাঁকে বললো আল্লাহ্‌র পুত্র। কেউ বললো তিনি আল্লাহ্‌র অংশ। শেষতম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.কেও আল্লাহ্ দান করেছেন অনেক অলৌকিকত্ব। এতে করে অতি মুগ্ধ ও অপরিণামদর্শী

অনেকের স্খলনের সম্ভাবনাও ছিলো প্রচুর। তাই আল্লাহ্ দয়া করে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে সে সম্ভাবনার মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন। তাঁর প্রিয়তম রসুলকে বলতে বলেছেন— বলুন, হে আমার প্রিয়ভাজন বচনবাহক! হে জনতা! শোনো আমি কিন্তু মানুষ। তবে বিশিষ্ট মানুষ। প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই আমাকে করা হয়েছে অসাধারণ ও অগ্রণী। আর এই সত্যটি প্রচারের আদেশ আমাকে দেয়া হয়েছে যে, বিশ্বসমূহের পালনকর্তা আল্লাহ্ এক। তাঁর কোনো শরীক নেই।

সবশেষে বলা হয়েছে— 'সুতরাং যে আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেনো সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।'

এখানে 'ইয়ারজু' অর্থ আল্লাহ্ সকাশে যেতে যে ভীত হয় এবং যে চায় তাঁর দীদার ও সওয়াব। বাগবী লিখেছেন, 'রিজা' অর্থ ভয় ও আশা দু'টোই। জনৈক কবি তাঁর এক কবিতায় শব্দটিকে দু'বার, দুই অর্থে উল্লেখ করেছেন। যেমন—

ফালা কুল্লা মা তারজু মিনাল খইরি কায়িনুন
ওয়ালা কুললু মা তারজু মিনাশ্শাররি ওয়াক্বি'

অর্থঃ আকাংখিত কল্যাণ পরিপূরিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, আবার এ বিষয়েও তুমি নিশ্চিত নও যে, তুমি যা আশংকা করছো, তা বাস্তবায়িত হবেই।

'আমালান সলিহান' অর্থ সে যেনো সৎকর্ম করে। 'ওয়ালা ইউশরিক' অর্থ তার প্রভুপালকের ইবাদতে যেনো সে অন্য কাউকে শরীক না করে। অর্থাৎ সে যেনো ইবাদত না করে জনপ্রদর্শন ও জনমনোরঞ্জনের জন্য। আল্লাহ্র সন্তোষার্থেই যেনো সম্পাদিত হয় তার ইবাদতসমূহ।

ইবনে আবীদ্ দুন্ইয়া তাঁর কিতাবুল ইখলাসে এবং ইবনে আবী হাতেম তাঁর তাউসে লিখেছেন, রসুল স. এর কাছে এক ব্যক্তি একবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমি আল্লাহ্র তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হজ করি। সাথে সাথে আবার এ খেয়ালও করি যে, আমার এই আমল সকলে দেখুক। রসুল স. নিশ্চুপ রইলেন। তখন অবতীর্ণ হলো— 'সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেনো সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।' হাদিসটি অপরিণত বা অবিন্যস্ত (মুরসাল) সূত্রসম্বলিত। হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে বর্ণনাটিকে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি বলে মন্তব্য করেছেন এবং সূত্রবিচার করেছেন বোখারী ও মুসলিমের সূত্রানুসারে।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, এক মুসলমান জেহাদ করতো, সাথে সাথে এটাও পছন্দ করতো যে, মানুষ তার সাহস ও আত্মত্যাগ দেখুক। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতাংশটি।

ইবনে আসাকের ও আবু নাঈমের বর্ণনায় কালাবীর মাধ্যমে আবু সালেহ সূত্রে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, জুনদুব বিন জুহায়ের নামাজ, রোজা, ও সদকা-খয়রাত সবই করতেন। লোকেরা তাঁর আমলগুলো সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি তা শুনে খুশী হতেন খুব। আমলের পরিমাণও দিতেন বাড়িয়ে। তাঁর সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

একটি প্রশ্নঃ ১. হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একবার আমি রসুল স.কে বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! একবার নামাজ পাঠকালে এক লোকের আগমন ঘটলো। আমার অন্তর তখন এ কারণে আনন্দিত হলো যে, সে আমার নামাজ দেখেছে। রসুল স. বললেন, হে আবু হোরায়রা! তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। একগুণ গোপনীয়তার জন্য আর একগুণ প্রকাশ হয়ে যাওয়ার জন্য। তিরমিজি। ২. হজরত আবু জর গিফারী থেকে মুসলিম উল্লেখ করেছেন, রসুল স.কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! যদি কোনো লোক পুণ্যকর্ম করে, আর লোকেরা তার প্রশংসাও করে, তবে কি তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে। তিনি স. বললেন, এটা তো বিশ্বাসীগণের জন্য পার্থিব শুভসমাচার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে— এই হাদিস দু'টো কি আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়?

উত্তরঃ এক্ষেত্রে পরিপন্থী হওয়া অথবা দ্বন্দ্ব সন্দেহের অবকাশ আসলে নেই। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে ইবাদত করতে হবে সম্পূর্ণ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। লোক দেখানো লোক-প্রশংসা কখনোই ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংমিশ্রিত করা যাবে না। করলে তা হবে শিরিকে খফি (গোপন শিরিক) বা রিয়া (অহংকার)। আর মূল উদ্দেশ্য ঠিক রাখা সত্ত্বেও যদি অন্যেরা তা দেখে ফেলে সে কাজের সুনাম বর্ণনা করে, তবে তা শিরিকে খফি হবে না। কারণ এমতো ক্ষেত্রে কারো প্রশংসা বা কারো নিকট থেকে কিছু প্রাপ্তির আশা মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়নি। ইবাদত সম্পাদিত হয়েছে বিশুদ্ধ নিয়ত সহকারেই। তাই এমতো ক্ষেত্রে সুনাম বা সুখ্যাতি হবে পার্থিব সুসংবাদ বা অতিরিক্ত পাওনা। তাই হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব— একটি গোপনীয়তার জন্য, আর একটি প্রকাশ হয়ে পড়ার জন্য। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

হজরত জুনদুব থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে শোনানোর জন্য পুণ্যকর্ম করে, আল্লাহ্ তাকে জনশ্রুতির সঙ্গেই রেখে দেন। আর যে লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করে তাকেও রেখে দেন লোকচক্ষুর সঙ্গে (তাকে ও তার আমল গ্রহণ করেন না)।

হজরত মাহমুদ বিন লবীদ থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের বিষয়ে আমি সবচেয়ে বেশী ভয় পাই ছোট শিরিককে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ছোটো শিরিক কী? তিনি স. বললেন, রিয়া

(অহংবোধ)। বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে এর সঙ্গে আরো উল্লেখ করেছেন, যখন আল্লাহ্ আমলের বিনিময় প্রদান করবেন, তখন তাদেরকে বলবেন, তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর জন্য তোমরা আমল করেছিলে। গিয়ে দেখো, তাদের নিকট থেকে কোনো বিনিময় পাও কিনা। হজরত আবু হোরায়রাকে একবার কিছু লোক জিজ্ঞেস করলো, ছোট শিরিক কী? তিনি বললেন, আত্মম্ভরিতা। ইবনে মারদুবিয়া হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর তারগীব ওয়াত্তারহীব গ্রন্থে।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমি শিরিক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। যে ব্যক্তি তার কোনো পুণ্য কর্মে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি তাকে ওই শরীকের সঙ্গেই রেখে দিই। ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, আমি ওই ব্যক্তির প্রতি ক্ষুব্ধ, যে শিরিক করে। আমি তাকে তার সঙ্গেই রাখি, যার সন্তোষের জন্য সে আমল করে। মুসলিম। হজরত আবু সাঈদ বিন ফুজালার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, হাশরের ময়দানে আল্লাহ্র নির্দেশে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যে ব্যক্তি তার নেক আমলের মধ্যে আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক করেছে, সে যেনো ওই শরীকের কাছে তার বিনিময় চেয়ে নেয়। আল্লাহ্ শিরিক থেকে পূর্ণরূপে পবিত্র। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, জনশ্রুত হওয়ার নিমিত্তে যে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তাকে রেখে দেন ওই জনশ্রুতির সঙ্গে। আল্লাহ্ তাকে করবেন অপমানিত, অপদস্থ ও হীন। আহমদ, বায়হাকী।

হজরত শাদ্দাদ বিন আওস বর্ণনা করেন, আমি স্বকর্ণে রসুল স.কে বলতে শুনেছি— যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করে সে শিরিক করে। যে ব্যক্তি প্রদর্শনের নিমিত্তে রোজা রাখে, সে শিরিক করে। আর যে ব্যক্তি জনগণ-প্রদর্শন নিমিত্তে দান খয়রাত করে সে শিরিক করে।

হজরত আনাস থেকে ইমাম আহমদ উল্লেখ করেছেন, মহাবিচারের দিবসে কোনো কোনো লোক অপমানজনক আমলনামা নিয়ে উপস্থিত হবে। আল্লাহ্ বলবেন, এগুলো নিক্ষেপ করো, ওগুলো কবুল করো (কিছু আমল নিক্ষেপ করো এবং কিছু আমল গ্রহণ করো)। আমল লেখক ফেরেশতারা বলবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তোমার মহাসম্মানের শপথ! সে যা করেছে আমরা তো তা-ই লিপিবদ্ধ করেছি। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা জানো না, সে এই এই আমলগুলো করেছিলো অন্যের উদ্দেশ্যে। আমি তো গ্রহণ করি কেবল ওই আমল যা বিশুদ্ধ নিয়তে কেবল আমার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়।

তিবরানীর আল আওসাতে, ইস্পাহানীর তারগীব এবং শহর বিন আতিয়া সূত্রে বায্যার ও দারাকুতনীর বর্ণনায় এসেছে, মহাবিচারের দিন কিছু লোকের আমলনামা হবে পর্বত পরিমাণ পুণ্যে পরিপূর্ণ। আল্লাহ্ তাদেরকে একে একে বলবেন, লোকে তোমাকে নামাজী বলবে, এই উদ্দেশ্যে তুমি অমুক দিন নামাজ পড়েছিলে। আমি আল্লাহ্। আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সকল আমল আমার পরিতোষার্থে সম্পাদিত হওয়া অত্যাবশ্যক। তারপর বলবেন, লোকে তোমাকে রোজাদার বলবে, এই উদ্দেশ্যে তুমি অমুক দিন রোজা পালন করেছিলে। আমিই আল্লাহ্। আমি ছাড়া উপাস্য কেউ নেই। আমল সমূহ আমার তুষ্টি সাধনার্থে সম্পন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এভাবে আল্লাহ্ একে একে তার সকল আমল প্রত্যাখ্যান করবেন। ফেরেশতা তাকে বলবে, তুমি তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য আমল করতে।

হজরত শাদ্দাদ বিন আওস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ হাশর প্রান্তরে যখন সকলকে সমবেত করবেন তখন এক ঘোষক উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করবে, আল্লাহ্ বলেন, আমি শিরিক থেকে সতত পবিত্র। পৃথিবীতে যে তার পুণ্য কর্মে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার করেছে, আমি আজ তাকে যুক্ত করবো ওই অসত্য অংশীদারের সঙ্গে। আজ আমি গ্রহণ করবো কেবল তাদের কর্ম, যারা তা সম্পাদন করেছে কেবল আমারই জন্য। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইস্পাহানী।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হিসাব গ্রহণের দিন আল্লাহ্ বলবেন, যে ব্যক্তি অন্য কারো মনোরঞ্জনার্থে পুণ্যকর্ম করেছে আমি তাকে সম্পৃক্ত করবো ওই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সঙ্গেই। আরো বলবেন, অবনত হও, অসত্য অংশীদার আজ তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে সুফীসাধকগণের ব্যাখ্যাঃ 'যে তার প্রভুপালকের সাহায্য কামনা করে' অর্থ যে কামনা করে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য ও সন্দর্শন, সে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় ওই অবস্থায় যে অবস্থার কথা কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে 'ক্বাবা ক্বাওসাইনি আও আদ্না' (দুই ধনুকের জ্যা'র মতো নিকটে অথবা তদপেক্ষা আরো নিকটে)। এরকম অবস্থায় পৌঁছতে গেলে প্রথমে বিলীন বা ফানা করতে হবে তার প্রবৃত্তি। কারণ নফসের ফানা হওয়ার পরেই করা সম্ভব বিশুদ্ধ ইবাদত, যা আল্লাহ্ কর্তৃক যথাসমাদরে গৃহীত হয়। আর 'সে যেনো তার প্রভুপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' কথাটির অর্থ সে যেনো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আন্তরিক ভালোবাসার সম্পর্ক না রাখে। এরকম অবস্থা অর্জন করতে গেলে অন্তরে জাগ্রত রাখতে হবে সার্বক্ষণিক জিকির। এই জিকির ও ভালোবাসাই বিশুদ্ধ ইবাদতের ভিত্তি।

একটি প্রশ্নঃ মানুষের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক তো নবী-আউলিয়াগণও রক্ষা করেন। তাহলে 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো সঙ্গে ভালোবাসা না রাখে' কথাটির অর্থ কী?

জবাবঃ কলবের ফানা হওয়ার পরেও শরিয়তের দায়িত্ব মানুষের স্কন্ধে থেকেই যায়। তাই বান্দার অধিকার রক্ষা করার জন্য অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না। আর আল্লাহ্র জন্যই আল্লাহ্র বান্দাগণের প্রতি মায়ামমতা ভালোবাসা রাখতে হয়। কিন্তু ভালোবাসার মূল সম্পর্ক তো আল্লাহ্র সঙ্গেই। অন্য সকল সম্পর্ক তো আনুসঙ্গিক ও দায়িত্বনির্ভর একটি ব্যাপার।

উপযোগঃ হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সুরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত যে মুখস্ত করবে, আল্লাহ্ তাকে দাজ্জালের ফেত্না থেকে রক্ষা করবেন। আহমদ, আবু দাউদ, মুসলিম, নাসাঈ। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, সুরা কাহফের প্রথম তিন আয়াত যে নিয়মিত পড়বে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে থাকবে মুক্ত। তিনি বর্ণনাটিকে আখ্যা দিয়েছেন উত্তমসূত্রসম্বলিত। আহমদ, মুসলিম ও নাসাঈর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা কাহফের শেষ দশটি আয়াত নিয়মিত পাঠ করবে, সে নিরাপদ থাকবে দাজ্জালের বিশৃংখলা থেকে।

হজরত আনাস থেকে সহল বিন মুয়াজ উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সুরা কাহফের প্রথম ও শেষ আয়াত যে পাঠ করবে তার আপাদমস্তক হবে জ্যোতির্ময় এবং যে সম্পূর্ণ সুরা কাহফ পাঠ করবে, তার জন্য পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত হবে নূর। বায়হাকী, ইবনে সুন্নী তাঁর আমালুল ইওম ওয়াল লাইল গ্রন্থে এবং ইমাম আহমদের মসনদে এসেছে, যে ব্যক্তি শয়নকালে সুরা কাহফ পাঠ করবে তার শয্যা থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত জ্বল জ্বল করতে থাকবে একটি স্বর্ণ সদৃশ নূর। আর ওই নূরের মধ্যে ফেরেশতারা সমবেত হয়ে তার জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহ্র রহমত প্রার্থনা করতে থাকবে। ইবনে মারদুবিয়াও হাদিসটির বর্ণনাকারী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন সুরা কাহফ পাঠ করে, পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত তার জন্য চমকাতে থাকে একটি নূর। হাকেম, বায়হাকী। বায়হাকীর শো'বুল ইমানে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন সুরা কাহফ পাঠ করে, তার নিকট থেকে কাবা শরীফ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যায় একটি জ্বল জ্বলে নূর।

হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, এক ব্যক্তি রাতে সুরা কাহফ পাঠ করছিলো। তাই তার উপরে ছায়াপাত করেছিলো একটি নূরানী মেঘ। মেঘটি আবর্তিত হচ্ছিলো চক্রাকারে এবং ক্রমশঃ তা নেমে আসছিলো নিচে। নিকটেই

বাঁধা ছিলো একটি ঘোড়া। অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখে ঘোড়াটি চিৎকার করতে শুরু করলো। তিনি তাঁর তেলাওয়াত বন্ধ করলেন। ঘোড়াটিও নিশ্চুপ হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ থেমে পুনরায় তেলওয়াত শুরু করলেন তিনি। ঘোড়াটিও তখন চিৎকার করতে শুরু করলো। পরদিন সকালে তিনি রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বিবৃত করলেন। রসুল স. বললেন, ওই মেঘটি ছিলো প্রশান্তিপ্রদায়ক নূর (নূরে সাকিনা), যা অবতীর্ণ হয়েছিলো কোরআন তেলাওয়াতের কারণে। বোখারী, মুসলিম।

'বিহামদিহি ওয়া আওনিহি'। আল্লাহ্‌র সাহায্যে সুরা কাহফের তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ, ৫ই জিলহজ মঙ্গলবার ১২০২ হিজরী সনে।

সূরা মার্‌য়াম

সুরা মার্‌য়াম অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। এই সুরায় রয়েছে ৬টি রুকু ও ৯৮টি আয়াত। সম্পূর্ণ সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হলেও ৫৮ ও ৭১ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায় এবং সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে সুরা ফাতিরের পরে।

সূরা মার্‌য়াম ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

كٓهٰيٰعٓصٓ ۝ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّآ ۝ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝ وَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۝ يَّرِثُنِيْ وَ يَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝

❒ কাফ্-হা-ইয়া-আঈন্-সদ;

❒ ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁহার দাস জাকারিয়ার প্রতি,

❒ যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়াছিল নিভৃতে,

❒ সে বলিয়াছিল, 'আমার অস্থি দুর্বল হইয়াছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হইয়াছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করিয়া আমি কখনও ব্যর্থকাম হই নাই।

❒ 'আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্ররা দ্বীনকে ধ্বংস করিয়া দিবে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী,

❒ যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করিবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করিবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাহাকে করিও সন্তোষভাজন।

প্রথম আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি— কাফ হা ইয়া আঈন সদ। কোরআন মজীদের অনেক সুরার প্রথমে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি পরিদৃশ্যমান হয়। এগুলোর মর্ম রহস্যাচ্ছন্ন। আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও যারা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন), তারাই কেবল এমতো বর্ণনাসমূহের রহস্য ভেদ করতে সক্ষম।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'এটা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর দাস জাকারিয়ার প্রতি।' প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহের মর্মার্থ যদি কোরআন অথবা এই সুরা হয়, তবে তা হবে উদ্দেশ্য আর 'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ' হবে বিধেয়। অথবা বলা যেতে পারে উদ্দেশ্য এখানে অনুক্ত এবং ওই অনুক্ত উদ্দেশ্যটি হচ্ছে হাজা (এটি)। অর্থাৎ হাজা জিকর। কিংবা বলা যেতে পারে 'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ' কথাটি এখানে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় এখানে অনুক্ত। আর রহমত (অনুগ্রহ) কথাটি এখানে জিকরু (বিবরণ) এর কর্মপদ এবং 'তাঁর বান্দা জাকারিয়ার প্রতি' এর স্থলাভিষিক্ত।

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিলো নিভৃতে।' একথার অর্থ— যখন নবী জাকারিয়া তাঁর নির্জন প্রকোষ্ঠে রাত্রিকালে গোপনে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, চুপি চুপি দোয়া করা সুন্নত। এরকম দোয়ার মধ্যে থাকে একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা।

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'সে বলেছিলো, আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে'। এখানে 'ওয়াহানাল আ'জমু' অর্থ আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে। অর্থাৎ আমি এখন বার্ধক্যকবলিত ও দুর্বল। উল্লেখ্য, অস্থি হচ্ছে শরীরের ভিত্তি। তাই অস্থি দুর্বল হলে শরীরও দুর্বল হয়। 'আল আ'জমু' এখানে ইসমে জিনস (নামপদ)। 'ওয়াশ্তায়ালার্ র'সু শাইবান' অর্থ বার্ধক্যে আমার মস্তক হয়েছে শুভ্রোজ্জ্বল, শ্বেতশুভ্রপক্ককেশবিশিষ্ট।

হজরত জাকারিয়ার বয়স তখন কতো হয়েছিলো, সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক বলেছেন, ষাট বছর। ইবনে আবী হাতেম ও সুফিয়ান সওরী বলেছেন, সত্তর বছর। ভিন্ন বর্ণনানুসারে আবদুর রাজ্জাক ও ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, একশত দশ বছর এবং তাঁর সহধর্মিণীর বয়স তখন ছিলো আটানব্বই বছর।

এরপর বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি।' একথার অর্থ— হজরত জাকারিয়া তাঁর প্রার্থনায় বললেন, হে আমার পরম দয়াপরবশ প্রভুপালনকর্তা! আমার বিগত জীবনের কোনো প্রার্থনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি। তুমি দয়া করে আমার সকল দোয়াই কবুল করে নিয়েছো। তাই আমি দৃঢ় আশা পোষণ করি যে, আমার এখনকার এই প্রার্থনাও তুমি কবুল করে নিবে। কারণ প্রকৃত ও একমাত্র দাতা কখনো অনুগত ও মুখাপেক্ষী প্রার্থীকে বিমুখ করেন না।

এখানে 'দুআ'ইকা' (আপনাকে আহ্বান করে) কথাটির শেষের অক্ষর 'কাফ' এর সম্বন্ধ ঘটেছে দোয়া করার সঙ্গে। অর্থাৎ এই 'কাফ' হচ্ছে এখানে দোয়ার কর্ম। আবার এরকমও হতে পারে যে, সর্বনামরূপী 'কাফ' হবে এখানে 'দোয়া' শব্দটির কর্তা। এভাবে দোয়া করা কর্মটির সম্বন্ধ ঘটবে তার কর্তার সঙ্গে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— হে আমার আল্লাহ্! পূর্বাহ্নে তুমি আমাকে দিয়েছো ইমান। আমি তোমার ওই দান সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছি। তোমার ওই অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করে আমি ব্যর্থ ও দুর্ভাগা হইনি। এখন সেই ইমানের অনুকূলেই আমি আমার প্রার্থনাকে উপস্থাপন করলাম এই আশায় যে, এবারও আমি বিফল মনোরথ হবো না।

এর পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্ররা দ্বীনকে ধ্বংস করে দিবে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে দান করো উত্তরাধিকারী।' এখানে আমার স্বগোত্ররা অর্থ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বা এ ধরনের বংশীয় উত্তরপুরুষেরা, যারা হবে আমার স্থলাভিষিক্ত। এভাবে হজরত জাকারিয়ার আলোচ্য বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— আমার আশংকা হয় আমার ভ্রাতৃবংশের উত্তরপুরুষেরা আমার পরলোকগমনের পর স্বাভাবিক নিয়মে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে, কিন্তু তারা সত্যধর্ম প্রচারের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে অনীহ হবে, অথবা হবে অনুপযুক্ত। এভাবে ইয়াকুব বংশে যে নবুয়তের নেয়ামত দান করেছো তার পুরুষানুক্রমিক প্রচার হবে বিঘ্নিত, বিকৃত। সুতরাং হে আমার প্রভুপালনকর্তা। আমি চাই তুমি আমাকে দান করো

এক উপযুক্ত পুত্র সন্তান, যে হতে পারবে নবুয়তের শিক্ষার যথার্থ প্রচারক। প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আমার স্ত্রী যদিও বন্ধ্যা, কিন্তু তুমিতো সর্বশক্তিধর। অসম্ভব বলে কোনো কিছুই তো তোমার নিকটে নেই।

এর পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুব বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে কোরো সন্তোষভাজন।' এখানে 'উত্তরাধিকারিত্ব করবে' বলে পার্থিব ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারিত্বের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে নবুয়তের এলেমের উত্তরাধিকারিত্বের কথা। কারণ নবী-রসুলগণের পার্থিব উত্তরাধিকারী কেউ হয় না। বিত্ত-বৈভব জমা করে রেখে যাওয়া তাঁদের জন্য নিষিদ্ধ।

রসুল স. জানিয়েছেন, আলেমগণই নবী-রসুলগণের উত্তরাধিকারী। কারণ তারা ধন-সম্পদ রেখে যায় না। রেখে যায় জ্ঞান। প্রত্যাদেশিত ওই জ্ঞান যে অর্জন করে, সে-ই পায় সর্বোচ্চ উত্তরাধিকার। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। দারেমী বলেছেন, হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কাছীর বিন কায়েস। আর তিরমিজি বলেছেন কায়েস বিন কাছীর।

নবীনন্দিনী হজরত ফাতেমা যখন খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দীকের নিকটে উত্তরাধিকারী হিসাবে একটি বাগান দাবি করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর দাবিকে গ্রহণ করেননি। আর ঐকমত্যাগত সিদ্ধান্ত এই যে, অন্যান্য নবীর মতো রসুল স. এরও মীরাছ বা উত্তরাধিকার বলে কিছু নেই।

জননী আয়েশা থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আমার পিতার নিকটে উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে উপস্থিত হলেন নবী তনয়া ফাতেমা ও নবী-পিতৃব্য আব্বাস। আমার পিতা তখন বললেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আমি কোনো মীরাছ রেখে যাবো না। যদি এরকম কিছু রেখে যাই তবে তা হবে সর্বসাধারণের জন্য দান। বোখারীর বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর উম্মত জননীগণ তাঁদের দাবী উপস্থাপনের জন্য খলিফার দরবারে প্রেরণ করলেন হজরত ওসমানকে। খলিফা বললেন, রসুল স. কি একথা বলেননি— আমার মীরাছ নেই। যদি থাকে তবে তা হবে সদকা।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, মালিক বিন আওস বলেছেন, আমি একবার খলিফা হজরত ওমরের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর বিশেষ দারোয়ান ইয়ারফা এসে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! হজরত ওসমান, হজরত আবদুর

রহমান, হজরত যোবায়ের ও হজরত সা'দ আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান। হজরত ওমর বললেন, আসতে বলো। একটু পরেই দরবারে প্রবেশ করলেন সাক্ষাতপ্রার্থী সাহাবীবৃন্দ। ইয়ারফা পুনরায় এসে বললেন, হজরত আলী ও হজরত আব্বাসও এসেছেন। হজরত ওমর বললেন, তাঁদেরকেওডেকে আনো। তাঁরাও সেখানে এলেন অল্পক্ষণের মধ্যে। হজরত আব্বাস হজরত আলীকে দেখিয়ে বললেন, তার ও আমার মধ্যে উদ্ভূত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত জটিলতার সমাধান করে দিন। হজরত ওমর তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে উপস্থিত সাহাবীবৃন্দের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদেরকে ওই আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, যাঁর হুকুমে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে জমিন ও আসমান। আপনারা কি জানেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি কোনো উত্তরাধিকার রেখে যাবো না। যদি দেখো, কোনো সম্পদ রেখে গিয়েছি, তবে মনে করবে তা উত্তরাধিকার নয়। দুঃস্থ মুসলমানদের জন্য দান। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, নিঃসন্দেহে রসুল স. এরকম বলেছেন। হজরত আলী এবং হজরত আব্বাসও একথার স্বীকৃতি দিলেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আমার কোনো পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করবে না। সংসারিক ব্যয় নির্বাহের পর আমি যদি কিছু ছেড়ে যাই, তবে তা হবে খয়রাত। উল্লেখ্য যে, হজরত হুজায়ফা বিন ইয়ামন, হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম এবং হজরত আবু দারদা থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

শিয়া সম্প্রদায় এই হাদিসটিকে অস্বীকার করে। অথচ মোহাম্মদ বিন ইয়াকুব কালিনী তাঁর 'জামে' পুস্তকে আবু আবদুল্লাহ্, ইমাম জাফর সাদেক সূত্রে এই মর্মে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নবী-রসুলগণ মীরাছরূপে কোনো দীনার দিরহাম রেখে যাননি, রেখে গিয়েছেন তাঁদের বাণী।

উপরে বর্ণিত হাদিসের আলোকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াতে উত্তরাধিকারিত্ব বলে পার্থিব কোনো সম্পদের উত্তরাধিকারিত্বের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে নবুয়তের উত্তরাধিকারিত্বের কথা। আর হজরত জাকারিয়াও এমতো আশংকা করেননি যে, তাঁর পুত্রসন্তান না থাকলে তাঁর পার্থিব সম্পত্তির অধিকারী হবে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রেরা।

'ওয়াজআ'লহু রব্বি রদ্বীয়্যাহ্' অর্থ তাকে কোরো তোমার সন্তোষভাজন। এখানে 'রদ্বীয়্যাহ্' অর্থ মারদ্বীয়্যাহ্' বা আল্লাহ্‌র সন্তোষপ্রাপ্ত। অথবা সন্তুষ্ট। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! সে যেনো সুখে-দুঃখে থাকে তোমার প্রতি পরিতুষ্ট।

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۣاسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝

❒ তিনি বলিলেন, 'হে জাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি তাহার নাম হইবে ইয়াহ্‌ইয়া; এই নামে পূর্বে আমি কাহারও নামকরণ করি নাই।'

❒ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত।

❒ তিনি বলিলেন 'এইরূপই হইবে।' তোমার প্রতিপালক বলিলেন, 'ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।'

❒ জাকারিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বলিলেন, তোমার নিদর্শন এই যে তুমি সুস্থাবস্থায় কাহারও সহিত তিন দিন বাক্যালাপ করিবে না'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ বললেন, হে জাকারিয়া! তোমার প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করলাম এবং এই মর্মে শুভসংবাদ দান করলাম যে, অচিরেই তোমার পত্নী গর্ভধারণ করবে এবং যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হবে তোমার এক পুত্র সন্তান। তার নাম রাখতে হবে ইয়াহ্‌ইয়া। তার পূর্বে এরকম নাম আর কারো ছিলো না।

কাতাদা এবং কালাবী 'সামীয়্যান' কথাটির অর্থ করেছেন— এই নামে এবং স্পষ্ট করে বলেছেন, ইতোপূর্বে অন্য কারো নাম ইয়াহ্‌ইয়া ছিলো না। এভাবে আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, অসাধারণ ও অভূতপূর্ব নাম বিশেষ মর্যাদা প্রকাশক।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও আতা 'সামীয়্যান' শব্দটির অর্থ করেছেন 'শাবীহাহ্' (তুল্য), মাছালুন (অনুরূপ)। যেমন এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— 'হাল তা'লামু লাহু সামীয়্যাহ্' (তৎতুল্য তুমি জানো?)। এখানে 'সামীয়্যা' অর্থ 'মাছালুন' (অনুরূপ) বা 'মুশাবাহ্' (সদৃশ)। এমতাবস্থায় বাগবীর উক্তি অনুসারে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— পাপাকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকার বিষয়ে হজরত ইয়াহ্ইয়ার মতো ইতোপূর্বে আর কেউ ছিলো না। আমি বলি, সম্ভবতঃ এখানে শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, হজরত ইয়াহ্ইয়া হবেন অতুলনীয় এক বিশেষ ফযীলতের অধিকারী, যা তার পূর্বে আর কেউ পাননি। অর্থাৎ তিনি হবেন পয়গম্বরকুলের মধ্যে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। তবে একথার অর্থ এই নয় যে, সামগ্রিক বিচারে তিনি তাঁর পূর্বসূরীগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ ও হজরত মুসা কলিমুল্লাহ্র মতো অসাধারণ নবী আর্বিভূত হয়েছিলেন তাঁর পূর্বে। নিঃসন্দেহে তাঁরা ছিলেন হজরত ইয়াহ্ইয়ার তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তির অনুসরণে আলী ইবনে আবী তালহা উল্লেখ করেছেন, 'এই নামে পূর্বে আমি কারো নামকরণ করিনি' কথাটির অর্থ হবে— ইতোপূর্বে কোনো বন্ধ্যা নারীই হজরত ইয়াহ্ইয়ার মতো ফযীলত প্রাপ্ত কোনো সন্তানের জন্ম দান করেননি। এই ব্যাখ্যাটি যথাযথ নয়। কারণ হজরত ইব্রাহিমের সহধর্মিণী হজরত সারাও ছিলেন বন্ধ্যা। তিনিও বৃদ্ধ বয়সে হয়েছিলেন হজরত ইসহাকের জননী। আর হজরত ইয়াহ্ইয়া যে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ— সে রকম কোনো প্রমাণও নেই।

বায়যাবী লিখেছেন, ইয়াহ্ইয়া' শব্দটি অনারব। যদি আরবী হয়, তবে শব্দটি উৎসারিত হয়েছে কোনো ক্রিয়াবাচক শব্দ থেকে। যেমন— 'ইয়াঈশু', 'ইউআ'ম্মারু'। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর কারণে তাঁর মায়ের উদরে সৃষ্টি হয়েছিলো প্রাণের উন্মেষ, তাই তাঁর নাম ইয়াহ্ইয়া। অথবা তাঁর মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে উঠেছিলো আল্লাহ্র ধর্মাদর্শ, তাই তার নাম ইয়াহ্ইয়া বা সঞ্জীবক।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'সে বললো হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত।' এখানে 'আন্না' অর্থ কেমন করে। কথাটি কোনো অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন নয়। বরং কৌতূহল ও বিস্ময় নিবারণের আকাংখা প্রকাশক। অর্থাৎ 'কেমন করে' কথাটির মাধ্যমে হজরত জাকারিয়া বিষয়টির স্বরূপ জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। বলতে চেয়েছিলেন— হে আমার আল্লাহ্! পুত্রসন্তান আমাদের হবে

কীভাবে? আমাদেরকে যুবক-যুবতী করে দেয়া হবে, না এরকম বৃদ্ধাবস্থায়ই আমরা হবো পুত্রসন্তানের জনক ও জননী? এভাবে হজরত জাকারিয়া আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত প্রকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল নিবারণ করতে চেয়েছিলেন মাত্র। আল্লাহ্র অপার ক্ষমতার প্রতি কোনোপ্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেননি। কেনো করবেন? তিনি যে নবী।

'ইতিয়্যান' শব্দটির প্রকৃতরূপ ছিলো 'উতুওবুন।' 'উতুওবুন' শব্দটির অর্থ অবাধ্য। এখানে শব্দটির অর্থ হবে বিদ্রোহী। অর্থাৎ অতি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে আমার অস্থিসমূহ আমার অননুগত। উল্লেখ্য, বয়স বেশী হলে শরীর স্বশাসনে থাকে না। কাতাদা বলেছেন, এখানে কথাটির মাধ্যমে শরীরের অস্থি-দৌর্বল্যের কথাই প্রকাশ করা হয়েছে। 'আ'তী' বলা হয় ওই বৃদ্ধকে, যার অস্থিসমূহ নিরস ও নির্জীব। 'আ'তা শাইখ' অর্থ ওই বৃদ্ধের বয়স পৌঁছে গিয়েছে শেষ সীমানায়।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, এরকমই হবে। তোমার প্রতিপালক বললেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য, আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ অথবা তাঁর শুভসংবাদপ্রদাতা কোনো ফেরেশতা বললেন, হে নবী জাকারিয়া! আল্লাহ্ যেরকম প্রত্যাদেশ করেছেন, সেরকমই ঘটবে। এরপর আল্লাহ্ বললেন, এরকম করা আমার জন্য অত্যন্ত সহজ। তোমারও তো একসময় অস্তিত্ব ছিলো না। এভাবেই আমি কখনো সরাসরি, আবার কখনো আমার সৃষ্ট কোনো মাধ্যমের দ্বারা অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করি।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— জাকারিয়া বললো, 'হে আমার প্রতিপালক আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বললেন তোমার নির্দশন এই যে, তুমি সুস্থাবস্থায় কারো সাথে তিনদিন বাক্যালাপ করবে না'। একথার অর্থ, হজরত জাকারিয়া বললেন, হে আমার প্রভুপালক! আমার পুত্রসন্তান জন্মের একটি নিদর্শন আমাকে দাও। আল্লাহ্ অথবা শুভসংবাদপ্রদাতা ফেরেশতা বললেন, একদিন হঠাৎ দেখবে কোনো রোগ-ব্যাধি না হওয়া সত্ত্বেও তুমি একাধারে তিন দিন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারছো না। সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে এই ঘটনাটির বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'তিনদিন বাক্যালাপ করতে পারবে না' অর্থ শারীরিক সুস্থতা ও বাকশক্তি থাকা সত্ত্বেও তুমি তিনদিন মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারবে না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'সাবীয়্যা' অর্থ ধারাবাহিকভাবে বা একাধারে। কিন্তু প্রথমোক্ত অর্থটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۞ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۞ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَّبَرًّۢا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۞ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۞

❒ অতঃপর সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আসিল ও ইঙ্গিতে তাহাদিগকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে বলিল।

❒ আমি বলিলাম, 'হে ইয়াহ্‌ইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর।' আমি তাহাকে শৈশবেই দান করিয়াছিলাম জ্ঞান,

❒ এবং আমার নিকট হইতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল সাবধানী,

❒ পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, অবাধ্য ছিলো না।

❒ তাহার প্রতি ছিলো শান্তি যে দিন সে জন্ম লাভ করে ও শান্তি থাকিবে যেদিন তাহার মৃত্যু হইবে ও যেদিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলো। হজরত জাকারিয়া বুঝলেন, তিনি তাঁর রসনা সঞ্চালন করতে পারছেন না। আপন প্রকোষ্ঠ ছেড়ে বাইরে এলেন তিনি। সমবেত জনতাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, তোমরা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।

এখানে 'আলমিহরাব' অর্থ কক্ষ, প্রকোষ্ঠ। শাব্দিক অর্থ লড়াই করার স্থান। মসজিদই হচ্ছে শয়তানের সঙ্গে লড়াই করার প্রকৃষ্ট স্থান। তাই শব্দটির অর্থ মসজিদও হতে পারে। 'কামুস' প্রণেতা লিখেছেন, শব্দটির অর্থ বালাখানা, প্রকোষ্ঠ বা কক্ষের উৎকৃষ্ট অংশ। অথবা বাদশাহ'র নির্জন প্রকোষ্ঠ।

বাগবী লিখেছেন, লোকেরা মসজিদের বাইরে অপেক্ষমান ছিলো। মসজিদ ছিলো অর্গলবদ্ধ। হজরত জাকারিয়া ছিলেন মসজিদের অভ্যন্তরে। তিনি হঠাৎ দরজা খুলে বাইরে এলেন। লোকেরা সবিস্ময়ে দেখলো হজরত জাকারিয়ার চেহারা স্বাভাবিক নয়। তারা তাঁর এরকম হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলো। তিনি তখন ইশারায় সবাইকে সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করার

নির্দেশ দিলেন। এখানে 'আওহা' অর্থ ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলেন। মুজাহিদ বলেছেন, নিদের্শটি তিনি লিখে দিয়েছিলেন মাটির উপর। 'সাব্বিহু' অর্থ আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করো।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আমি বললাম হে ইয়াহ্ইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করো। আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান।' একথার অর্থ— যথাসময়ে হজরত ইয়াহ্ইয়া জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি যখন কিছুটা বড় হলেন, তখন আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করলেন, হে ইয়াহ্ইয়া! এই হচ্ছে তওরাত কিতাব। তুমি এই কিতাব দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ করো।

মাহাল্লী বলেছেন, হজরত ইয়াহ্ইয়ার বয়স দুই বছর হলে তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছিলো আলোচ্য বাক্যটি। এখানে 'কিতাব' শব্দটির অর্থ তওরাত। 'কুওয়াত' অর্থ দৃঢ়তার সঙ্গে বা দৃঢ় প্রচেষ্টার সঙ্গে। অথবা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সামর্থ্য বা তওফিক প্রার্থনার সঙ্গে। 'আলহুক্মা' অর্থ হেকমত, প্রজ্ঞা, জ্ঞান। এভাবে 'আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— আমি তাকে তিন বছর বয়সে দিয়েছিলাম তওরাত পাঠের ও অনুধাবনের যোগ্যতা। উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের প্রতি দৃষ্টি রেখেই বলা হয়, যে কোরআন পাঠ করেছে, সে হয়ে গিয়েছে হজরত ইয়াহ্ইয়ার এই অলৌকিকত্বের সাক্ষী। এক বর্ণনায় এসেছে, সমবয়সী শিশুরা তাঁকে খেলাধূলার জন্য আহ্বান জানাতো। তিনি জবাব দিতেন, আমাকে খেলাধূলার জন্য প্রেরণ করা হয়নি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'আলহুক্মা' কথাটির অর্থ হবে— নবুয়ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁকে নবী বানিয়েছিলেন তাঁর শিশুকালেই।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এবং আমার নিকট থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিলো সাবধানী'। একথার অর্থ— আমি তাঁকে আরো দিয়েছিলাম আমার পক্ষ থেকে রহমত ও পবিত্রতা। এখানে রহমত প্রদানের অর্থ হতে পারে দু'রকমের— ১. তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ করা হয়েছিলো আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে, অথবা ২. তাঁর হৃদয়ে সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিলো তাঁর জনক-জননীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। পরবর্তী আয়াতে অবশ্য সে কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'হানানা' অর্থ রহমত, রিজিক, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, সম্ভ্রম, মাহাত্ম্য অথবা বরকত। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, 'হানানা'র অনুরূপ শব্দ 'সাহাবান'। এভাবে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়— রহমত, রিজিক, ভয়, সম্ভ্রম, মাহাত্ম্য ও হৃদয়ের কোমলতা। 'হানানা' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে আল্লাহ্র গুণবাচক নাম 'আল হান্নান' থেকে। শব্দটি তাঁর 'আররহীম' নামের নিকটবর্তী অর্থবোধক।

'যাকাতাহ্' অর্থ পাপ থেকে পবিত্র হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, আনুগত্য ও বিশুদ্ধচিত্ততা। কাতাদা ও জুহাক বলেছেন, পুণ্যকর্ম। কালাবী বলেছেন, শব্দটির অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি বিশেষ নেয়ামত, যা ইয়াহ্ইয়ারূপে দান করা হয়েছিলো তাঁর পিতা-মাতাকে।

'ওয়াকানা তাক্বিয়্যা' অর্থ— এবং সে ছিলো সাবধানী বা সংযমী। অর্থাৎ তিনি কখনো গোনাহ্ তো করেনইনি, গোনাহ্র ধারণাও তাঁর হৃদয়ে কখনো উদিত হতে পারেনি।

এর পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'পিতামাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলো না।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'জাব্বারান' অর্থ ওই ব্যক্তি, যে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অন্যকে আঘাত করে এবং হত্যাকাণ্ড ঘটায়। এভাবে এখানে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হজরত ইয়াহ্ইয়া কখনোই সেরকম নিষ্ঠুর, উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলেন না।

এর পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'তাঁর প্রতি ছিলো শান্তি যে দিন সে জন্মলাভ করে ও শান্তি থাকবে যে দিন তার মৃত্যু হবে ও যে দিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।'

'সালামুন আলাইহি' কথাটির মাধ্যমে এখানে এরকমই বলা হয়েছে যে, দুঃখ ক্লেশ সকল অবস্থায় হজরত ইয়াহ্ইয়া ছিলেন ও থাকবেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিরাপদ। এটা হচ্ছে জুমলায়ে মুতারিজাহ্ (প্রসঙ্গান্তর)।

'তার প্রতি ছিলো শান্তি যেদিন সে জন্মলাভ করে' কথাটির অর্থ— প্রতিটি নবজাতককে শয়তান স্পর্শ করে। সেই স্পর্শ থেকে তাঁকে রাখা হয়েছিলো নিরাপদ। 'শান্তি থাকবে যে দিন তার মৃত্যু হবে' কথাটির অর্থ পরলোকগমনের সময়ও তাঁর ঈমানকে রাখা হবে নিরাপদ। আর 'যেদিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে' কথাটির অর্থ— কবর থেকে পুনরুত্থানের পরেও তাঁকে মুক্ত রাখা হবে আল্লাহ্র অসন্তোষ ও দোজখের আযাব থেকে।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, মানুষের জন্য এই তিনটি অবস্থাই বিস্ময়কর— ১. মাতৃ-উদর থেকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর। ২. কবরের জগতে প্রবেশ করার পর। ৩. পুনর্জীবিত হয়ে হাশরের প্রান্তরে উপস্থিত হওয়ার সময়। এই তিনটি অবস্থাতেই হজরত ইয়াহ্ইয়া ছিলেন ও থাকবেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত।

এখানে জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান— এই তিনটির সঙ্গে উহ্য রয়েছে একটি ক্রিয়ার আধার, যার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে 'আলাইহি' শব্দটি।

একটি সন্দেহঃ কুফাবাসী আলেমগণ বলেন, 'জরফে মুসতাকার' সম্পর্কিত হয় বিশেষণবাচক শব্দরূপের সঙ্গে। যেমন, মুসতাকাররুন আলাইহি অথবা হাসিলুন আলাইহি। কিন্তু বসরাবাসী আলেমগণ বলেন, জরফে মুসতাকারের সম্পর্ক ঘটে উহ্য ক্রিয়াবাচক শব্দরূপের সঙ্গে। যেমন— 'ইসতাক্বাররা আলাইহি' অথবা 'হাসালা আলাইহি'। এখন অতীতকালবোধক শব্দরূপের সঙ্গে যদি 'ইয়াওমা' কথাটি সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করা হয়, তাহলে তাঁর জন্মের সঙ্গে ওই মর্মার্থ হবে যথাযথ। অর্থাৎ জন্মের সময় তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ করেছিলেন পূর্ণ নিরাপত্তা। কিন্তু মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয় দু'টো এখানে উল্লেখিত হয়েছে ভবিষ্যতকালবাচক শব্দরূপে। সুতরাং অতীতকালবোধক ও ভবিষ্যতকালবোধক শব্দরূপগুলোকে এখানে কীভাবে 'আলাইহি' কথাটির মাধ্যমে যুক্ত করা যেতে পারে? কুফাবাসী আলেমদের কথা মেনে নিলে বলতে হয়, এখানকার উহ্য বিশেষণবাচক শব্দরূপটি ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমানকালের অর্থে। যদি তাই হয়, 'মুসতাকার আলাইহি'র সম্পর্ক শুদ্ধ হবে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বেলায়। কিন্তু জন্মের সঙ্গে এরকম সম্পর্ক আর থাকবে না। কারণ এখানকার 'জন্মলাভ করে' শব্দরূপটি অতীতকালবোধক।

সন্দেহের অপনোদন ঃ ব্যাকরণবিশারদগণ বলেছেন, ক্রিয়ার আধারের উপর কার্যকর হয় কেবল অর্থবোধক কার্যরীতি। অর্থাৎ শুধুমাত্র ধাতুগত অর্থ কার্যকর হয়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক ঘটে না। এ কারণেই 'হাজা যায়দুন ক্বইমান'(এইতো যায়েদ দণ্ডায়মান) বাক্যে কোনো একটি নির্দিষ্টকাল বুঝায় না। সুতরাং বলতে হয় কুফাবাসী আলেমগণের 'মুসতাক্বাররুন' এবং বসরাবাসী আলেমগণের 'ইসতাক্বার্‌রা' শব্দদ্বয়ের ব্যবহৃত ব্যাকরণনীতি পরোক্ষ। সুতরাং তাদের কথিত বিশেষণবাচক ও ক্রিয়াবাচক শব্দরূপের সংযুক্তির কথাটি যদি আমরা মেনেও নেই, তবুও 'আলাইহি' কথাটি এখানে হয়ে যাবে বিশেষ কোনো সময়ের সম্পর্ক থেকে মুক্ত। কেননা এখানে ক্রিয়ার আধার হয়ে গিয়েছে বিশেষণের স্থলাভিষিক্ত। এভাবে ক্রিয়াটি প্রভাব বিস্তার করেছে জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান— সাধারণভাবে তিনটি অবস্থার উপরেই। কোনো বিশেষ সময়ের উপরে নয়।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۚ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ قَالَتْ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِأَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ۝ قَالَتْ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

❒ বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লেখিত মরিয়মের কথা, যখন সে তাহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া নিরালায় পূর্ব দিকে একস্থানে আশ্রয় লইল,

❒ অতঃপর উহাদিগ হইতে নিজকে আড়াল করিবার জন্য সে পর্দা করিল। অতঃপর আমি তাহার নিকট আমার রূহকে পাঠাইলাম, সে তাহার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্ম-প্রকাশ করিল।

❒ মরিয়ম বলিল, 'তুমি যদি আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে আমি তোমা হইতে দয়াময়ের শরণ লইতেছি।'

❒ সে বলিল, 'আমি তো কেবল তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করিবার জন্য ।'

❒ মরিয়ম বলিল, 'কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই ও আমি ব্যভিচারিণীও নহি?'

❒ সে বলিল, 'এই রূপই হইবে।' তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, 'ইহা আমার জন্য সহজ-সাধ্য এবং আমি উহাকে এই জন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হইতে এক অনুগ্রহ; উহা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বর্ণনা করো এই কিতাবে উল্লেখিত মরিয়মের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে একস্থানে আশ্রয় নিলো।' এখানে 'আলকিতাব' (এই কিতাব) অর্থ আল কোরআন। আর 'মারয়াম' কথাটির দ্বারা এখানে শুরু করা হয়েছে হজরত ঈসার পবিত্রা জননী হজরত মরিয়মের কাহিনী।

'ইজিন্তাবাজাত' অর্থ পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন, দূরে গিয়েছিলেন। 'নাব্জুন' অর্থ নিক্ষেপ করা। অর্থাৎ নিক্ষেপিত বস্তুর দূরে গমন করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে এখানকার 'ইন্তাবাজাত' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— হজরত মরিয়ম তাঁর পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। 'মাকানা শারক্বিয়্যা' অর্থ আশ্রয় নিলেন জনপদের পূর্বদিকের একস্থানে। এভাবে সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়— অবস্থা এমন অসহনীয় হয়ে উঠলো যে, হজরত মরিয়ম তাঁর পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং আশ্রয় গ্রহণ করলেন পূর্ব দিকের এক নিরালা স্থানে। তখন ছিলো শীতকাল। তাই তিনি তখন পূর্ব দিকে পতিত সকালের রোদে চুল আঁচড়াতে বসেছিলেন। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, ঋতুবতী অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার গোসল সমাপনের জন্য তিনি তখন তাঁর পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে কোনো এক নির্জনস্থানে গমন করেছিলেন। কারো কারো ধারণা, তিনি এভাবে পূর্বদিকের একস্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন একাগ্রচিত্ত উপাসনা সম্পাদনার্থে। হাসান বলেছেন, এ কারণে খৃষ্টানেরা পূর্বদিকে মুখ করে ইবাদত করে।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করবার জন্য সে পর্দা করলো।' হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'হিজাবা' শব্দটির অর্থ করেছেন পর্দা। কেউ কেউ বলেছেন, দেয়ালের আড়াল। মুকাতিল বলেছেন, পাহাড়ের আড়াল। ইকরামা বলেছেন, হজরত মরিয়ম থাকতেন মসজিদের এক প্রকোষ্ঠে। ঋতুস্রাবকালে তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতেন তাঁর খালার গৃহে। ঋতুবতী অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার পর পুনরায় চলে যেতেন মসজিদে। একদিন একান্ত নির্জনে গোসল করার সময় বাবরী চুল বিশিষ্ট মধ্যমদেহী এক যুবকের বেশে সেখানে হাজির হলেন হজরত জিবরাইল। সে কথাই পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে এভাবে—

'অতঃপর আমি তাঁর নিকট আমার রূহ্কে পাঠালাম, সে তাঁর নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলো।' এখানে 'রূহ' অর্থ হজরত জিবরাইল। 'আমার রূহ' বলে এখানে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সম্মানিত করেছেন। এরকম সম্বন্ধ সম্মান অথবা অসম্মানের কারণ হয়। যেমন 'বাদশার ছেলে' সম্মানার্হ, 'নাপিতের ছেলে' ঘৃণার্হ। 'সবিয়্যা' অর্থ পূর্ণ মানবাকৃতিকে, পূর্ণাঙ্গ যুবকের আকারে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে রূহ দ্বারা বুঝানো হয়েছে হজরত ঈসা রূহুল্লাহ্কে, যিনি মানবাকৃতিতে এসেছিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত তাফসীরটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'মরিয়ম বললো, তুমি যদি আল্লাহ্কে ভয় করো তবে আমি তোমার নিকট থেকে দয়াময়ের শরণ গ্রহণ করছি।' একথার অর্থ— হজরত মরিয়ম বললেন, হে অচেনা আগন্তুক! আল্লাহ্কে ভয় করো। আল্লাহ্ভীরু যদি হও, তবে আর অগ্রসর হয়ো না। আমি তোমার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র শরণ যাচ্ঞা করি। হজরত মরিয়ম যখন হজরত জিবরাইলকে তাঁর দিকে আগমনোদ্যত দেখলেন, তখন তাঁকে মানব মনে করেই একথা বলেছিলেন। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— তুমি আল্লাহ্ভীরু হও আর না হও, সর্বাবস্থায় আমি তোমার আগমন থেকে আল্লাহ্র নিকটে পরিত্রাণ প্রার্থনা করি। এরকম হওয়াও সম্ভব যে, এখানকার 'ইন্' অব্যয়টি যদি শর্তসাপেক্ষ হয় তবে সে ক্ষেত্রে তার পরিণতিকে মনে করতে হবে উহ্য।। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— তুমি আল্লাহ্ভীরু নও। তাই তোমার ক্ষতি থেকে আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থিনী।

এর পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি তো কেবল তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করবার জন্য।' একথার অর্থ— হজরত জিবরাইল বললেন, হে পবিত্রা রমণী! আমি মানুষ নই; ফেরেশতা। আপনাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করবার জন্য আল্লাহ্ আমাকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আপনি আমাকে ভয় পাবেন না। এখানে 'যাকিয়্যা' অর্থ পবিত্র, নিষ্পাপ, কল্যাণময়। অর্থাৎ যার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস ধ্বনিত হয় শুভ প্রচেষ্টার দিকে, নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ যাত্রার দিকে। এদিকে লক্ষ্য রেখে সুফী সম্প্রদায় বলেন, যে ব্যক্তির দুই দিন এক রকম (পরের দিন আগের দিন অপেক্ষা উন্নত নয়) সে ক্ষতিগ্রস্ত।

এর পরের আয়াতে (২০)বলা হয়েছে— 'মরিয়ম বললো, কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি ও আমি ব্যভিচারিণীও নই?' এখানে 'ইয়ামসাসনী' 'মাস'(স্পর্শ) শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিবাহিত স্বামী স্ত্রীর মিলনের ক্ষেত্রে। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে 'মাস' শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। বরং ব্যবহৃত হয় অশ্লীলকর্মে। একথাটি তাই পৃথকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— আমি ব্যভিচারিণীও নই। এভাবে হজরত মরিয়মের উদ্ধৃত বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— বিবাহের মাধ্যমে কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। ব্যভিচারের সঙ্গেও আমি সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুতা। সুতরাং হে আল্লাহ্ প্রেরিত দূত! আমি জননী হবো কীভাবে।

শেষোক্ত আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'সে বললো, এরকমই হবে। তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ সাধ্য।' একথার অর্থ— হজরত জিবরাইল বললেন, হে সৌভাগ্যশালিনী! এরকম করাই আল্লাহ্র অভিপ্রায়। পুরুষের সঙ্গ ব্যতিরেকেই আল্লাহ্ আপনাকে এক পবিত্র পুত্রের জননী করতে চান। আল্লাহ্ একথাও বলেছেন, এরকম করা আমার জন্য অত্যন্ত সহজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাকে এজন্য সৃষ্টি করবো, যেনো সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট থেকে এক অনুগ্রহ; এটাতো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।' এখানে 'আয়াতাল্ লিন্নাস' অর্থ মানুষের জন্য এক নিদর্শন। 'ওয়া রহমাতান' অর্থ আমার নিকট থেকে এক অনুগ্রহ। 'ওয়া কানা আমরাম মাক্বদ্বিয়্যা' অর্থ এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। অর্থাৎ আপনি যে এক পবিত্র পুত্রের পবিত্র জননী হবেন, সে কথা লওহে মাহফুজে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সূরা মারয়াম ঃ আয়াত ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ۝ فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ۝ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝ وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۝ فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ۝

❒ অতঃপর সে গর্ভে সন্তান ধারণ করিল ও তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলিয়া গেল;

❒ প্রসব-বেদনা তাহাকে এক খর্জুর-বৃক্ষ তলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল। সে বলিল, 'হায়, ইহার পূর্বে আমি যদি মরিয়া যাইতাম ও লোকের স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতাম।'

❒ ফেরেশতা তাহার নিম্ন পার্শ্ব হইতে আহ্বান করিয়া তাহাকে বলিল যে, 'তুমি দুঃখ করিও না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করিয়াছেন;'

❒ 'তুমি তোমার দিকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, উহা তোমাকে সুপক্ক তাজা খর্জুর দান করিবে।'

❑ 'সুতরাং, আহার কর, পান কর ও চক্ষু জুড়াও। মানুষের মধ্যে কাহাকেও যদি তুমি দেখ তখন বলিও, 'আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতাবলম্বনের মানত করিয়াছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সহিত বাক্যালাপ করিব না।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে গর্ভে সন্তান ধারণ করলো ও তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলো।' আলোচ্য বক্তব্যটি একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। ওই উহ্য ক্রিয়াসহ বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— হজরত জিবরাইলের কথায় হজরত মরিয়মের হৃদয় প্রশান্ত হলো। হজরত জিবরাইল ফুৎকার দিলেন তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের স্কন্ধদেশ সংলগ্ন অংশে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ফুৎকার দিয়েছিলেন হজরত মরিয়মের জামার হাতে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তিনি ফুৎকার দিয়েছিলেন তাঁর মুখে। কারো কারো মত হচ্ছে, হজরত জিবরাইল ফুৎকার দিয়েছিলেন দূর থেকে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, যেভাবেই ফুৎকার দেয়া হোক না কেনো, ওই ফুৎকারের ফলেই হজরত মরিয়ম গর্ভবতী হলেন এবং ওই অবস্থায় সকলের অগোচরে চলে গেলেন দূরের এক নির্জন জায়গায়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মানুষের অপবাদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বাইতুল মাকদিসের সীমানার বাইরের এক উপত্যকায়। বাগবী বলেন, তাঁর গর্ভধারণের সময় সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের ঘটনা ঘটেছিলো এক ঘন্টার মধ্যে। কেউ কেউ বলেছেন, সাধারণ নিয়মে নয় মাস মাতৃ-উদরে অবস্থান করার পরে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন হজরত ঈসা। কেউ কেউ বলেছেন আট মাসের কথা। আবার কেউ কেউ বলেছেন ছয় মাস। মুকাতিল বিন সুলায়মান বলেছেন, তিনি গর্ভবতী হয়েছেন এক ঘন্টার মধ্যে। দ্বিতীয় ঘন্টায় মাতৃ-জঠরে গঠিত হয়েছিলো হজরত ঈসার অবয়ব। আর তৃতীয় ঘন্টায় সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন হজরত ঈসা। ওই সময়ে হজরত মরিয়মের বয়স হয়েছিলো দশ বছর এবং গর্ভবতী হওয়ার পূর্বে তিনি ঋতুগ্রস্ত হয়েছিলেন মাত্র দুইবার।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'প্রসব-বেদনা তাকে এক খর্জুর বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলো।' এখানে 'আজাআ' শব্দটি বাবে ইফ্‌য়ালের রীতিতে অতীতকালবোধক। মূল শব্দ 'জাআ'। এর সঙ্গে 'হামযা' অক্ষরটি সংযোজন করে শব্দটিকে বানানো হয়েছে তিন অক্ষরবিশিষ্ট সকর্মক ক্রিয়া। কিন্তু শব্দটির অর্থ এখানে কেবল আশ্রয় গ্রহণ করা নয়, আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়া।

'মাখাদু' (প্রসব-বেদনা) শব্দটি এখানে ধাতুমূল। বক্তব্যকে পূর্ণ করার জন্য শব্দটিকে অন্য শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন— 'মাখাদ্বতিল মারআ'তু' (মহিলার পেট থেকে বাচ্চাটি বের হওয়ার জন্য নড়াচড়া করলো)। 'মাখাদু' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে পরোক্ষার্থে। অর্থাৎ প্রসব বেদনার কারণেই তিনি উপস্থিত হলেন দূরের নির্জনে একটি শুকনো খেজুর গাছের আড়ালে। 'জিজইন নাখলাতে' অর্থ শাখাহীন গাছের ছায়ায় বা আড়ালে। আবু রওকের বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, হজরত মরিয়ম এমন একটি খেজুর গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, যা ছিলো পত্র-পল্লবহীন, বিশুষ্ক।

বায়যাবী লিখেছেন, ওই বিশুষ্ক বৃক্ষের নিকটে যাওয়ার অনুপ্রেরণা আল্লাহ্ই তাঁর হৃদয়ে ঢেলে দিয়েছিলেন। ওই শুকনো খেজুর গাছ থেকে তাজা ও পাকা খেজুর বের করার অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে হজরত মরিয়মের ভয়-ভীতি-আশংকা দূর করাই ছিলো আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা। আর রমণীকুলের জন্য খেজুর একটি আকর্ষণীয় আহার্যও বটে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, হায়, এর পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম ও লোকের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম।' লোকলজ্জার ভয়ে হজরত মরিয়ম এভাবে তখন মৃত্যু কামনা করেছিলেন।

'নিসইয়ান' অর্থ সর্বপ্রকার বিস্মৃতি— ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, স্মৃতি দৌর্বল্যজনিত অথবা আলস্যজাত। ইচ্ছাকৃত ভুল নিন্দার্হ। তাই আল্লাহ্ বলেছেন— 'তবে শাস্তি আস্বাদন করো, কারণ অদ্যকার এই সাক্ষাতকারের কথা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে'(সুরা সেজদা)। অনিচ্ছাকৃত ভুল ক্ষমার্হ। তাই রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের অনিচ্ছাকৃত বিস্মৃতিকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আবার ভুলের সম্পর্ক যদি আল্লাহ্র সঙ্গে করা হয়, তবে তার অর্থ হবে পরিত্যাগ করা বা ছেড়ে দেয়া। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন— 'নাসুল্লহা ফানাসিয়াহুম'(তারা আল্লাহ্কে ভুলে গিয়েছে, তাই আল্লাহ্ও তাদেরকে পরিত্যাগ করেছেন)।

আরবী পরিভাষানুসারে 'নাসিউন' অর্থ বিস্মৃত বস্তু। যেমন 'নিক্বদুন' বলা হয় ওই বস্তুকে যা ভেঙে ফেলা হয়েছে। 'নিসইউন' এর প্রচলিত অর্থ— ভ্রূক্ষেপ অথবা মনোযোগের অযোগ্য কোনো কিছু। শব্দটির প্রথম অক্ষর 'নূন' যবর সহযোগে পড়লেও শব্দটির কোনো অর্থান্তর ঘটে না। যেমন 'উইত্রুন 'ওয়াত্রুন' এবং 'হিব্সুন' 'হাব্সুন'। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটিকে পড়তে হবে যবর সহযোগে। তাহলে তা হবে ধাতুগত কর্মকারকের অর্থ প্রকাশক। আলোচ্য আয়াতে 'নিসইউন' বা 'নাসিউন' এর মর্মার্থ হবে ধাতুগত অর্থে। তবে প্রচলিত অর্থ গ্রহণের সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিলো। তাই এখানে শব্দটিকে প্রকাশ করা হয়েছে 'মানসিয়্যান' রূপে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— লোকের স্মৃতি থেকে যদি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম।

বাগবী লিখেছেন, 'নাসউন' অর্থ নিক্ষেপিত, পরিত্যক্ত, তুচ্ছ হওয়ার কারণে অনুল্লেখ্য। আর 'মানসিয়্যান' অর্থ স্মৃতিচ্যুত বা স্মৃতিপট থেকে বিলুপ্ত। কাতাদা বলেছেন, 'নাসইয়ান' অর্থ আলোচনার অযোগ্য ও অজ্ঞতা। ইকরামা, জুহাক ও মুজাহিদ বলেছেন, মৃত বস্তু যা ফেলে দেয়া হয়েছে তাই 'নাস্ইয়ান'। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'কুনতু নাসইয়ান' কথাটির অর্থ হবে— আমি যদি জন্মগ্রহণই না করতাম।

একটি প্রশ্নঃ মৃত্যুকামনা নিষিদ্ধ। ইতোপূর্বে সুরা বাকারার তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনাও করা হয়েছে। তাহলে হজরত মরিয়ম এভাবে মৃত্যুকামনা করেছিলেন কেনো?

উত্তরঃ বনী ইসরাইলদের শরিয়তে মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ হয়েছিলো অনেক পরে। আর আলোচ্য ঘটনাটি ঘটেছিলো সেই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার অনেক পূর্বে। অথবা চরম লজ্জার চাপে পিষ্ট হয়ে অসহনীয় মুহূর্তে তাঁর মুখ থেকে অকস্মাৎ বের হয়ে এসেছিলো 'আমি যদি মরে যেতাম' কথাটি। কিংবা হজরত মরিয়ম তখন স্বীয় ধর্মাদর্শের অধঃপতনের চিন্তায় চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন। ধর্ম রক্ষার্থেই তিনি উচ্চারণ করেছিলেন ঈদৃশ বচন। লজ্জা ও অপমান থেকে রক্ষা পেতে মানুষ প্রায়শই ছলনা অথবা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলে সে হয়ে পড়ে পাপী। ওই পাপ বা ফেত্না থেকে আত্মরক্ষার কারণেই হজরত মরিয়ম হয়তো তখন মৃত্যু কামনা করে থাকবেন। এরকম সঙ্গীন পরিস্থিতিতে মৃত্যু কামনা সিদ্ধ। সুরা বাকারার তাফসীরে আমি এ কথাটিও লিখে দিয়েছি । যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এর পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'ফেরেশতা তার নিম্ন পার্শ্ব থেকে আহ্বান করে তাকে বললো, তুমি দুঃখ কোরো না।' হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, জুহাক ও সুদ্দী বলেছেন, হজরত মরিয়ম তখন ছিলেন একটি টিলার উপরিভাগের দিকে। আর হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়েছিলেন টিলাটির পাদদেশে, নিম্নভূমির দিকে। তাই এখানে বলা হয়েছে 'ফেরেশতা তার নিম্ন পার্শ্ব থেকে আহ্বান করে তাকে বললো'। সকল অবস্থায় এখানকার 'তাহ্তিহা' কথাটির 'হা' সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে হজরত মরিয়মের সঙ্গে। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সর্বনামটির সম্পৃক্তি ঘটেছে 'নাখলাহ্' (খর্জুর বৃক্ষ) এর সঙ্গে। মুজাহিদ এবং হাসান বলেছেন, হজরত ঈসা যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তখন হজরত জিবরাইল বলেছিলেন, 'দুঃখ কোরো না'।

'আল্লা তাহজানি' অর্থ দুঃখ কোরো না। অর্থাৎ সঙ্গে পানাহার না থাকার জন্য এবং লোকলজ্জার ভয়ে দুঃখ বোধ কোরো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন।' 'সারিয়্যা' অর্থ ছোট জলাধার বা নালা। তিবরানী তাঁর 'মুয়াজ্জামে সগীর' পুস্তকে সুপরিণত সূত্রে হজরত বারা বিন আজীব থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। তিবরানী আবার একথাও বলেছেন যে, আবু ইসহাকের বর্ণনা থেকে আবু সানান ব্যতীত অন্য কেউ এর সূত্রপরম্পরাকে সুপরিণত বলেননি। ইবনে আদী তাঁর 'আত্তাকামূল' পুস্তকে লিখেছেন, মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া এই সূত্র প্রবাহটিকে বলেছেন বিপর্যস্ত। আর ইবনে মুঈন, নাসাঈ ও ইবনুল মাদিনী সূত্রটিকে আখ্যা দিয়েছেন শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। হজরত বারা থেকে বর্ণিত এই হাদিসটিকে বিপর্যস্ত সূত্রবিশিষ্ট বলে বোখারীও মন্তব্য করেছেন। কারণ এর প্রথম দিককার এক বর্ণনাকারী অপরিচিত। আর আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুবিয়া তাঁদের আপনাপন তাফসীরে এই বর্ণনাটি বলেছেন অপরিণত। হাকেমও তাঁর মুসতাদরাকে বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং মুসলিমের শর্তানুসারে একে আখ্যা দিয়েছেন বিশুদ্ধ সূত্রবিশিষ্ট বলে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিবরানী ও 'হুলিয়া' রচয়িতা আবু নাঈম লিখেছেন আল্লাহ্ তখন সেখানে প্রবাহিত করে দিলেন একটি ঝর্ণা, যাতে হজরত ঈসার জননী সেই ঝর্ণার পানি দিয়ে তাঁর পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারেন। এই বর্ণনার মধ্যে আইয়ুব বিন নাহিক নামের এক অনুপযুক্ত বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাঁকে অনুপযুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন আবু জারআ ও ইবনে আবী হাতেম।

কোনো কোনো আলেম এখানকার 'তাহতাকি' কথাটির অর্থ করেছেন তোমার নির্দেশে। অর্থাৎ ওই ঝর্ণাটিকে করে দেয়া হলো তোমার নির্দেশের অধীন। তোমার নির্দেশেই ঝর্ণাটি হবে কখনো প্রবহমান, কখনো রুদ্ধ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নহর বা ঝর্ণাটি প্রবাহিত হয়েছিলো হজরত জিবরাইল অথবা সদ্যজাত হজরত ঈসার চরণাঘাতে। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, সেখানে আগে থেকেই ছিলো একটি মৃত ঝর্ণা। হজরত মরিয়মের কারণে সেই মৃত নহরটিকেই আল্লাহ্ জলবতী করে দিয়েছিলেন। আর সেখানকার বৃক্ষটিকে করে দিয়েছিলেন সবুজ ও ফলবান। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'সারিয়্যা' অর্থ অধিনায়ক। শব্দটি সংকলিত হয়েছে 'সারু' থেকে। শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে মানুষের মহান অধিনায়ক হজরত ঈসাকে। হাসান বসরী বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ! হজরত ঈসা অবশ্যই ছিলেন মানব-সর্দার, মহিমময় নৃনায়ক।

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তুমি তোমার দিকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, ওই কাণ্ড তোমাকে সুপক্ক তাজা খেজুর দান করবে।' এখানে 'হুজ্জী ইলাইকি' অর্থ নাড়া দাও, ঝাঁকি দাও বা দোলা দাও। 'বিজিজ্‌ই' (তোমার দিকে) শব্দটির 'বা' অক্ষরটি এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। আর 'রুত্বাবান জ্বানিয়্যা' অর্থ সুপক্ক তাজা খেজুর । উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র আলোচ্য নির্দেশ পেয়ে হজরত মরিয়ম শুকনো খেজুর গাছটি ধরে নাড়া দিয়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গাছটি হয়ে গিয়েছিলো সবুজ পত্রপল্লববিশিষ্ট ও ফলবান । আর তাজা ও পাকা খেজুর ঝরে পড়েছিলো তাঁর আহার্যরূপে।

শেষোক্ত আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'সুতরাং আহার করো, পান করো ও চক্ষু জুড়াও।' একথার অর্থ— হে মহাপুণ্যবতী মরিয়ম! তোমার পানাহারের আয়োজন করা হলো আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। সুতরাং বৃক্ষ থেকে পতিত খেজুর এবং প্রবহমান ঝর্ণার পানি পান করে তুমি পরিতৃপ্ত হও। আর এই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে চোখ জুড়াও। পরিত্যাগ করো বিষণ্নতা।

এখানকার 'ক্বররি' (জুড়াও) শব্দটি এসেছে 'ক্বরার' থেকে। মনোরম দৃশ্য চোখকে করে পরিতৃপ্ত। এমতাবস্থায় দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হয়ই না। তাই বলা হয়—'ক্বাররল্লহু আইনাকা' (আল্লাহ্ তোমার দৃষ্টিকে পরিচ্ছন্ন রাখুন)। 'ক্বররল্লাহু ফুআদাকা' (আল্লাহ্ তোমার অন্তরকে অনিন্দিত রাখুন, যেনো তা অন্যদিকে আকৃষ্ট না হয়)। এভাবেই এখানকার 'আক্বাররল্লহু আইনাহু' কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— চক্ষু জুড়াও। অথবা এখানকার 'ক্বররা' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে কুর্‌রাতন্ থেকে। উল্লেখ্য যে, আনন্দাশ্রু চোখকে শীতল করে। কারণ তা শীতল ও শান্তিদায়ক। আর বেদনাশ্রু হয় তপ্ত। তাই প্রিয়জনকে বলা হয় 'কুররতুল আ'ইনি' (চোখের শান্তি)। আর দুঃখ বিপদজনিত অশ্রুপাতকে বলে 'সানাখাতুল আইনি'।

এরপর বলা হয়েছে— 'মানুষের মধ্যে কাউকে যদি তুমি দেখ, তখন বোলো, আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করবো না।'

এখানে 'সওমান' শব্দটির ধাতুগত অর্থ পানাহার থেকে বিরত থাকা। এখানে মর্মার্থ হবে বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকা। তাই শব্দটির অর্থ হবে মৌনতাবলম্বনের মানত। সুদ্দী বলেছেন, এরকম মানত বনী ইসরাইলদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। এরকম মানত করলে তারা রোজাদারের মতো সারাদিন পানাহার করতো না,আবার কারো সঙ্গে কথাবার্তাও বলতো না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক হজরত মরিয়মকে বাক্যালাপ করতে বলেছিলেন ইশারায়। কারণ মুখের কথায় সৃষ্টি হয় বিতণ্ডার। তাছাড়া এভাবে শিশু ঈসাকে কথা বলার সুযোগ দেয়াও ছিলো একটি উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, তখন লোকজনের কথার জবাব দিয়েছিলেন শিশু ঈসা স্বয়ং। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, আলোচ্য উক্তিটি মুখে উচ্চারণের অনুমতি তাঁকে দেয়া হয়েছিলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। তারপর দেয়া হয়েছিলো মৌনতাবলম্বনের নির্দেশ। এক বর্ণনায় এসেছে মৌনতাবলম্বনের সময় হজরত মরিয়ম ফেরেশতার সঙ্গে কথা বলতেন, মানুষের সঙ্গে বলতেন না।

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ○
يٰۤاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ○
فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ○
قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ○ وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا
اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ○ وَّبَرًّا
بِوَالِدَتِىْ ۫ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ○ وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ
وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ○

❒ অতঃপর সে সন্তানকে লইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইল; উহারা বলিল, 'হে মরিয়ম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিয়াছ।'

❒ 'হে হারুন-ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী।'

❒ অতঃপর মরিয়ম ইংগিতে সন্তানকে দেখাইল। উহারা বলিল, 'যে কোলের শিশু তাহার সহিত আমরা কেমন করিয়া কথা বলিব?'

❒ সে বলিল, 'আমি তো আল্লাহের দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন, আমাকে নবী করিয়াছেন'

❒ 'যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে আশিস-ভাজন করিয়াছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যত দিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও জাকাত আদায় করিতে ও আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকিতে,'

❒ 'এবং তিনি আমাকে করেন নাই উদ্ধত ও হতভাগ্য;

❒ আমার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি ও শান্তি থাকিবে যেদিন আমার মৃত্যু হইবে ও যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হইব।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে তার সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকটে উপস্থিত হলো।' এক বর্ণনায় এসেছে, সন্তান জন্মদানের পরপরই হজরত মরিয়ম শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে তাঁর আপন জনপদে ফিরে গিয়েছিলেন। কালাবীর

বর্ণনায় এসেছে, ইউসুফ নাজ্জার বলেছেন, সদ্যজাত শিশুপুত্রকে নিয়ে হজরত মরিয়ম আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন একটি গুহায়। চল্লিশ দিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর লোকালয়ে। পথে যেতে যেতে শিশু ঈসা তাঁর জননীকে বলেছিলেন, শ্রদ্ধার্হ জনয়িত্রী আমার! একটি সুসংবাদ শ্রবণ করো। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও মসীহ্। হজরত মরিয়মের জনপদের লোকেরা ছিলো ধর্মভীরু। তারা তাপসী হিসেবে হজরত মরিয়মকেও শ্রদ্ধা করতো খুব। তাই তাঁর কোলে সন্তান দেখে তারা মর্মাহত হলো এবং কেঁদেই ফেললো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে মরিয়ম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছো।'

'ফার্ইউল জালদি' অর্থ চামড়া চিরে ফেলা। কবি সাহাবী হজরত হাস্‌সান বলেছিলেন 'লাআফরিইয়ান্নাহুম' (আমি অবশ্যই তার চামড়া খুলে ফেলবো)। অর্থাৎ কঠিন নিন্দা ও বিদ্রূপ করবো। কোরআন মজীদের অনেক স্থানে 'ইফতারা' শব্দটি মিথ্যাচার, শিরিক ও জুলুম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— ১. 'ওয়ামান আজলামু মিম মানিফ্‌তারা আলাল্লহিল কাজিবা' (আল্লাহ্ সম্পর্কে যে মিথ্যা বলে, তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে)। ২. 'ওয়া মাঁইউশরিক বিল্লাহি ফাকাদিফ্‌তারা ইছমান আজীমা' (যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করে, সে খুব বড় পাপাচারী)। মানুষ যখন সদুপদেশ গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে এবং হয়ে ওঠে আনুগত্য বিমুখ, তখনই তার দ্বারা সংঘটিত হয় শিরিক। তাই এখানে বলা হয়েছে 'ইফতারা'।

কোনো কোনো আলেম এখানকার 'ফারিয়্যা' শব্দটির অর্থ করেছেন বড়ই আশ্চর্যজনক। যেমন রসুল স. হজরত ওমর সম্পর্কে একবার বলেছিলেন— 'ফালাম আরা আবক্বারিয়্যা ইয়াফরী ফিরাইয়্যা' (আমি ওমরের মতো আশ্চর্যজনক আমলকারী কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি)।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'হে হারূন-ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলো না এবং তোমার মাতাও ছিলো না ব্যভিচারিণী।' হজরত মরিয়ম ছিলেন হজরত মুসার ভ্রাতা হজরত হারূনের বংশদ্ভূতা। তাই এখানে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে 'হারূনের ভগ্নি' বলে। যেমন তামীম গোত্রভূতদেরকে বলা হয় তামীমের ভাই। ইবনে আবী হাতেম এই ব্যাখ্যাটিকে আলী বীন আবী তালহার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। কালাবী বলেছেন, হজরত মরিয়মের এক সৎভাইয়ের নাম ছিলো হারূন। তিনি ছিলেন পুণ্যবান ও ধর্মপ্রাণ। বাগবী লিখেছেন, হজরত মুগীরা ইবনে শো'বা বর্ণনা করেছেন, একবার আমি গেলাম নাজরানে। সেখানকার লোকেরা আমাকে দেখে বললো, তোমরা কোরআনে পড়ো 'হে হারূন-ভগ্নি!' অথচ হজরত হারূনের জামানা ছিলো হজরত ঈসার জামানার

অনেক পূর্বে। আমি মদীনায় ফিরে এসে একথা রসুল স.কে জানালাম। তিনি স. বললেন, তখনকার লোকেরা তাদের সন্তানের নাম রাখতো তাদের পূর্বসূরী কোনো নবী অথবা কোনো পুণ্যবান ব্যক্তির নামে। মুসলিম।

বাগবী একথাও লিখেছেন যে, কাতাদা প্রমুখ বলেছেন, বনী ইসরাইলদের মধ্যে এক মহাপুণ্যবান ব্যক্তির নাম ছিলো হারুন। তার পরলোকগমনের পর তাঁর জানাযায় হাজির হয়েছিলেন চব্বিশ হাজার লোক। তাদের সকলের নাম ছিলো হারুন। হজরত মরিয়মও ছিলেন মহাপুণ্যবতী। তাই লোকেরা তাঁকে সম্বোধন করেছিলো হারুনের ভগ্নি বলে। তিনি যে হারুনের আপন বোন ছিলেন তা নয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই'। শয়তানের মতো স্বভাবসম্পন্ন বলেই এখানে অপব্যয়কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে। এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, শয়তান তাদের আপন ভাই। কাতাদা থেকে আবদ ইবনে হুমাইদ এবং আবদুর রাজ্জাকও এরকম বর্ণনা করেছেন। এরকমও হতে পারে যে, তারা পরোক্ষার্থে অথবা উপহাসচ্ছলে এরকম বলেছিলো। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে আবী হাতেম এরকমই বর্ণনা করেছেন। আসলে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত সম্পূর্ণ বাক্যই তিরস্কারমূলক। কেননা পুণ্যবানদের পুণ্যরহিত সন্তান-সন্ততিরা হয় অধিক নিন্দিত।

এমনও বলা হয়েছে— ইসরাইলীয় এক ব্যক্তি ছিলো বড়ই দুষ্ট প্রকৃতির। তার নামও ছিলো হারুন। ওই দুষ্ট লোকের বোন বলে তখন জনসমক্ষে নিন্দিত করা হয়েছিলো হজরত মরিয়মকে।

এর পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'অতঃপর মরিয়ম ইঙ্গিতে সন্তানকে দেখালো। তারা বললো, যে কোলের শিশু তার সঙ্গে আমরা কেমন করে কথা বলবো?' হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, হজরত মরিয়মের নিকটে বিনা পিতায় সন্তান জন্ম লাভের পক্ষে কোনো প্রমাণ ছিলো না। তাই তিনি তাঁর দোলনার শিশুকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যেনো ওই শিশুর অলৌকিক বচনে লোকেরা হতচকিত হয়ে আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের প্রতি ইমান আনয়ন করে। এক বর্ণনায় এসেছে, মহাপুণ্যবতী মরিয়ম যখন তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশুর সঙ্গে সকলকে কথা বলার ইঙ্গিত দিলেন, তখন লোকেরা ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, শিশুর সঙ্গে আমরা কথা বলবো কেমন করে? তুমি কি আমাদের সঙ্গে উপহাস করতে চাও?

এখানে 'মান কানা' কথাটির 'কানা' অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। অন্যত্রও এরূপ শব্দব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'হাল কুনতু ইল্লা বাশারার রসুলা।' অথবা 'কানা' শব্দটি এখানে পূর্ণতাপ্রকাশক। কিংবা স্থায়িত্বজ্ঞাপক।

'মাহ্‌দি' অর্থ মায়ের কোল, অথবা দোলনা। এভাবে লোকদের উদ্ধত কথার মর্মার্থ দাঁড়ায়— কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কি কখনো দোলনার বা মায়ের কোলের শিশুর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে বাক্যবিনিময় করতে পারে? 'ফিল মাহ্‌দি' কথাটির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, শিশুটি ছিলো কোলের অথবা দোলনার অবুঝ এক শিশু, কথা বলার যোগ্যতাই যার সৃষ্টি হয়নি।

সুদ্দী বলেছেন, লোকদের কথা শুনে শিশু নবী দুগ্ধপান বন্ধ করলেন এবং তাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে লাগলেন। অপর বর্ণনায় এসেছে, যখনই মহাপুণ্যবতী জনয়িত্রী তাঁর পবিত্র পুত্রের দিকে ইশারা করলেন, তখনই তিনি দুগ্ধপান বন্ধ করে কিছুটা বামে সরে গেলেন এবং ডান হাত দিয়ে জনতার দিকে ইশারা করে কথা বলতে শুরু করলেন।

এর পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি তো আল্লাহ্‌র দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন।' লোকেরা শিশু নবীর জন্মকে খারাপ নজরে দেখেছিলো। তাই তিনি প্রথমেই দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন— আমি তো আল্লাহ্‌র দাস। অর্থাৎ আমি তো অবশ্যই আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্যে এক মহাসম্মানিত বান্দা। কারণ আমি কিতাবধারী এক নবী।

ওহাব বলেছেন, লোকদের সঙ্গে হজরত মরিয়মের কথোপকথনের সময় সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত জাকারিয়া। শিশু নবীর দিকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, তুমি যদি নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে থাকো, তবে তুমি নিজে নিজেই তোমার প্রমাণ উপস্থাপন করো। এরপর হজরত ঈসা কথা বলতে শুরু করলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো চল্লিশ দিন। মুকাতিল বলেছেন, তিনি জন্মগ্রহণ করার পরক্ষণেই তাঁর বান্দা হওয়ার কথা প্রকাশ করেছিলেন। মানুষ যেনো তাঁকে উপাস্য বলে স্থির না করে, তাই তিনি বলেছিলেন আমি তো আল্লাহ্‌র দাস।

এখানে 'আলকিতাব' অর্থ তওরাত শরীফ। হাসান এরকম বলেছেন। মাতৃজঠরে অবস্থানের সময়েই আল্লাহ্‌ তাঁকে তওরাতের জ্ঞান দান করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম বলেন, এখানে 'আল কিতাব' অর্থ ইঞ্জিল শরীফ। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই তাঁকে ইঞ্জিল শরীফ দান করা হয়েছিলো। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, এখানে 'তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন' কথাটির অর্থ হবে আল্লাহ্‌ আমাকে কিতাব দান করবেন। আর 'আমাকে নবী করেছেন' কথাটির মর্মার্থ হবে— তিনি আমাকে নবী বানাবেন। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ঈসাকে তখন দেয়া হয়েছিলো লওহে মাহফুজে লিখিত সংবাদ। এমতাবস্থায় কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— লওহে মাহফুজের নির্ধারণানুসারে আমি নবী। যেমন রসুল স.কে 'আপনি কখন থেকে নবী'— এরকম প্রশ্ন করা হলে তিনি স. বলেছিলেন, তখন থেকে, যখন বাবা আদম ছিলেন রূহ ও শরীরের মধ্যবর্তী স্থানে (অর্থাৎ যখন তাঁকে সৃষ্টিই করা হয়নি)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে সা'দ ও আবু নাঈম, হজরত মায়সারা বিন সা'দ আবিল জুদআ থেকে এবং তিবরানী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

এর পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'যেখানেই আমি থাকিনা কেনো, তিনি আমাকে আশিস-ভাজন করেছেন।' একথার অর্থ— আমি আকাশে অথবা পৃথিবীতে, যেখানেই থাকি না কেনো, সেখানেই আমি আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন। হজরত ঈসার এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, আকাশের ফেরেশতা ও পৃথিবীর মানুষ— সকলের জন্যেই তাঁর উপস্থিতি কল্যাণকর। এখানে ব্যবহৃত 'মুবারাকান' কথাটির মাধ্যমে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা কথাটির মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতি যে অত্যধিক বরকতময়, সে কথাই বলে দেয়া হয়েছে। যেমন, দোয়ার মধ্যে বলা হয়— আল্লাহুম্মা বারিক ফীআত্বাইক' (হে আল্লাহ্! তোমার দান বৃদ্ধি করো)। কিংবা 'মুবারাকান' কথাটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বকে। ওই মহত্ত্বের কারণেই তিনি বিবেচিত হয়েছেন অন্যদের বরকত বা কল্যাণ লাভের মাধ্যমরূপে। যেমন বলা হয়, এই উপকারটি এসেছে অমুক ব্যক্তির বরকতে। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, তিনি অন্যদেরকে উপকার পৌছান— এ কথা বুঝাতেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মুবারাকান'। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে, তিনি মানবতার উত্তম শিক্ষক। আতা বলেছেন, মানুষকে আল্লাহ্র এককত্ব ও উপাসনার দিকে আহ্বানকারী। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— আল্লাহ্ আমাকে ওই সকল লোকের জন্য কল্যাণপ্রদায়করূপে প্রেরণ করেছেন, যারা হবে আমার অনুগত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন আমি জীবিত থাকি, ততদিন সালাত ও জাকাত আদায় করতে ও আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকতে।'

বাগবী বলেছেন এখানে এই সন্দেহটির উদ্রেক হতে পারে যে, হজরত ঈসার নিকটে কখনোই কোনো পুঞ্জীভূত সম্পদ ছিলো না, তাহলে তাঁকে জাকাত আদায় করতে বলা হবে কেনো? এর উত্তরে অনেকে বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য হবে এরকম— যদি আমার কাছে কখনো সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়, তখন জাকাত আদায়ের জন্য আমি নির্দেশপ্রাপ্ত। কেউ কেউ বলেন, এখানে জাকাত বলে মালের জাকাতের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে অধিকতর পুণ্যকর্ম করার কথা। কেউ কেউ আবার বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— আল্লাহ্ আমাকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, আমি যেনো তোমাদেরকে নামাজ পাঠ করার এবং জাকাত আদায় করার কথা বলি।

এর পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগ্য' একথার অর্থ— যে সকল হতভাগ্য লোক তাদের মাতা-পিতার সঙ্গে উদ্ধত আচরণ করে, আল্লাহ্ আমাকে সেভাবে সৃষ্টি করেননি। তাই আমি উদ্ধত যেমন নই, তেমনি নই হতভাগ্যও।

শেষোক্ত আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'আমার প্রতি ছিলো শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি ও শান্তি থাকবে যেদিন আমার মৃত্যু হবে ও যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হবো।' একথার অর্থ— আমার জন্ম শান্তিময়, মৃত্যু শান্তিময় এবং পুনরুত্থানও হবে শান্তিময়। তাই আল্লাহ্ আমাকে জন্মকালে রক্ষা করেছেন শয়তানের স্পর্শ ও প্রভাব থেকে। এভাবে তিনি আমার মৃত্যু ও মৃত্যু-উত্তর কবরের আযাব ও কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকেও রাখবেন নিরাপদ। আর আখেরাতেও নিরাপদ রাখবেন তাঁর অপরিতোষ ও জাহান্নামের আগুন থেকে। উল্লেখ্য যে, হজরত ঈসার একথায় প্রমাণিত হয় যে, তাঁকে যারা বিশ্বাস করে ভালোবাসে ও অনুসরণ করে, তাদের জীবন, মৃত্যু, মৃত্যুপরবর্তী পুনরুত্থানও হবে শান্তিময়। আর যারা তাঁকে শত্রুতাবশতঃ প্রত্যাখ্যান করবে তাদের উপর নেমে আসবে অশান্তি ও অভিসম্পাত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ওয়াস্সালামু আ'লা মানিত্ তাবায়াল হুদা'(এবং শান্তি তাদের উপর যারা হেদায়েতের পথ অনুসরণ করেছে)। কথাটির মধ্যে এই বক্তব্যটিও নিহিত রয়েছে যে, যারা হেদায়েতের পথে চলবে না, তাদের উপরে পতিত হবে অশান্তি ও অভিশাপ।

বাগবী বলেছেন, শিশু নবীর কথা শুনে জনতা হতবাক হয়ে গেলো এবং একথা বুঝতে বাধ্য হলো যে, হজরত মরিয়ম নিষ্কলুষ ও মহাপুণ্যবতী। এরপর থেকে কথা বলার বয়সে না পৌঁছানো পর্যন্ত হজরত ঈসা আর কথা বলেননি।

সূরা মার্য়াম ঃ আয়াত ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ○ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○ اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ○

❒ এই-ই মরিয়ম-তনয় ঈসা। আমি বলিলাম সত্য কথা, যে-বিষয়ে উহারা বিতর্ক করে।

❒ সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহের কাজ নহে, তিনি পবিত্র, মহিমময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।

❒ আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক ও তোমাদিগের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁহার ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।

❒ অতঃপর দলগুলি নিজদিগের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করিল; সুতরাং দুর্ভোগ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের মহা দিবস আগমন কালে।

❒ উহারা যেদিন আমার নিকট আসিবে সেই দিন উহারা কত স্পষ্ট শুনিবে ও দেখিবে। কিন্তু সীমালংঘনকারীগণ আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

❒ উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে। এখন উহারা অনবধান এবং উহারা বিশ্বাস করিবে না।

❒ চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী আমি, পৃথিবীর ও তাহার উপর যাহারা আছে তাহাদিগের এবং উহারা আমারই নিকট প্রত্যানীত হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মরিয়ম-তনয় নবী ঈসার যে ঘটনা আমি আপনাকে জানালাম, এটাই তার সত্যিকারের পরিচয়। অথচ এই সত্যি কথা না মেনে খৃষ্টান ও ইহুদীরা অযথার্থ বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে হজরত ঈসা সম্পর্কে ইহুদী ও খৃষ্টানদের অপবিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ইহুদীরা তাঁকে বলে ব্যভিচারিণীর পুত্র। আর খৃষ্টানেরা বলে, তিনি আল্লাহ্র পুত্র। অথচ উভয় দলই মিথ্যাবাদী।

এর পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্র কাজ নয়, তিনি পবিত্র, মহিমময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।' একথার অর্থ — আল্লাহ্ চির অমুখাপেক্ষী। তাই তিনি স্ত্রী ও সন্তানের মুখাপেক্ষী কখনোই নন। তিনি স্রষ্টা, জন্মদাতা নন। তিনি পবিত্র, মহিমময়। তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলে, কেবল বলেন 'হও' — তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।

এর পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁর ইবাদত করো, এটাই সরল পথ।' এখানে 'ইন্নাল্লহা রব্বি ওয়া রব্বুকুম' কথাটির মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালাই যে সকলের ও সকল কিছুর প্রভুপালনকর্তা, এই বিশ্বাসটিকে দৃঢ়বদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং 'তাঁর ইবাদত করো' কথাটির মাধ্যমে মান্য করতে বলা হয়েছে তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাকে। এভাবে বিশ্বাস ও কর্মকে সংশোধন করাই হচ্ছে সরলপথ। তাই শেষে বলা হয়েছে— 'এটাই সরল পথ'।

এর পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'অতঃপর দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলো।' এখানে 'আল আহযাব' (দলগুলো) বলে বুঝানো হয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে, অথবা খৃষ্টানদের তিনটি দল— নাস্তুরীয়া, ইয়াকুবিয়া ও মালাকাইয়াহ্কে। নাস্তুরিয়ারা বলে, ঈসা আল্লাহ্র পুত্র। ইয়াকুবিয়ারা বলে, ঈসা স্বয়ং আল্লাহ্ এবং মানবরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করার পর পুনরায় তিনি আকাশে উঠে গিয়েছেন। আর মালাকাইয়ারা বলতো ঈসা আল্লাহ্র বান্দা ও রসুল।

এখানে 'মিম্ বাইনিহিম' (নিজেদের মধ্যে) কথাটির 'মিন্' অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— হজরত ঈসার সহচরবর্গ সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। অথবা মতভেদ দেখা দিলো হজরত ঈসার মর্যাদা ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং দুর্ভোগ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মহাদিবস আগমনকালে।' এখানকার 'ওয়াইলুন' শব্দটি ধাতুমূল। এর অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। কথাটি জুমলায়ে ফেলিয়ার (ক্রিয়াবাচক বাক্য) স্থলাভিষিক্ত এবং সঙ্গত কারণেই কথাটি এখানে উদ্দেশ্য বা মুবতাদা। সেকারণে এই ক্রিয়াটি স্থায়ী। কোনো নির্দিষ্ট কালের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা প্রকাশিত হবে পরে— মহাদিবস বা কিয়ামতের সময়। এখানে 'ইয়াওমিন আজীম' (মহাদিবস) অর্থ কিয়ামতের দিবস। আর 'মাশহাদি' এখানে ধাতুমূলের অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ যেদিন গ্রহণ করা হবে হিসাব এবং দেয়া হবে পুরস্কার ও শাস্তি। অথবা কথাটি জরফে জামান (কালাধিকরণ কারক)। অর্থাৎ শুহুদের বা সাক্ষ্যদানের সময়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কিয়ামতের দিন অথবা মহাবিচারের দিবসে হবে চরম দুর্ভোগের মুখোমুখি, যখন ফেরেশতাগণ, নবীগণ ও তাদের নিজেদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের সাক্ষ্য প্রদান করবে।

এর পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'তারা যে দিন আমার নিকট আসবে, সেদিন কতো স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে।' এখানে 'কতো স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে' ক্রিয়া দু'টো বিস্ময়প্রকাশক, কিন্তু আল্লাহ্ সকল প্রকার বিস্ময়বোধ থেকে পবিত্র। তাই প্রসিদ্ধ তাফসীরকারগণ আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন— তাদের অবস্থা বিস্ময়ের উপযোগী। কারণ তারা দুনিয়ায় চোখ থাকতেও অন্ধ এবং কান থাকতেও বধির। তাই তারা দেখতে পায় না সত্যের স্বরূপ এবং শুনতে পায় না সত্যের আহ্বান। কিন্তু কিয়ামতের দিন সত্যের আহ্বান তারা যেমন স্পষ্টভাবে শুনবে, তেমনি স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারবে সত্যের স্বরূপ। কিন্তু এমতো

সঠিক দর্শন ও শ্রবণ সেদিন তাদের কোনো উপকারে আসবে না। অথবা বিস্ময় প্রকাশক ক্রিয়ার মাধ্যমে এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সতর্ক করে ভয় দেখানোই উদ্দেশ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মহাবিচারের দিবসে তারা প্রত্যক্ষ করবে তিরস্কার ও শাস্তি এবং শুনবে চিরহতাশার বাণী— যে কথা তাদেরকে পূর্বাহ্নেই জানানো হয়েছিলো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার ক্রিয়া দু'টি (দেখা ও শোনা) বিস্ময়প্রকাশক নয়। বরং নির্দেশ প্রকাশক। অর্থাৎ রসুল স.কে এখানে এইমর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হে আমার রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সত্যপ্রত্যাখ্যানের স্বরূপ দেখিয়ে দিন এবং শুনিয়ে দিন তাদের অপপরিণতির কথা, যা সুনির্ধারিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু সীমালংঘনকারীগণ আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।' এখানে 'সীমালংঘন' কথাটির উল্লেখ করে এ কথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, পৃথিবীতে তারা তাদের দৃষ্টি ও শ্রুতিকে যথাযথরূপে ব্যবহার করেনি। বরং এ সম্পর্কে উদাসীন থেকে পড়ে রয়েছে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।

এর পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে।' উল্লেখ্য যে, সকলের হিসাব-নিকাশ সমাপনের পর একদল চলে যাবে জান্নাতে এবং আরেক দল চলে যাবে দোজখে। তারপর জবাই করা হবে মৃত্যুকে। ফলে জান্নাতবাসী ও দোজখবাসী কেউই আর মৃত্যুবরণ করবে না। তাই ওই দিবস হবে বড়ই পরিতাপের, যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। সেই চূড়ান্ত পরিণতির কথাই আলোচ্য বাক্যে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ওই পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিন, যখন দান করা হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হাশর প্রান্তরে মৃত্যুকে হাজির করা হবে ভেড়ার আকৃতিতে। এক আহ্বানকারী তখন জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে, তোমরা কি একে চিনতে পারছো? জান্নাতবাসীরা বলবে হ্যাঁ, এতো মৃত্যু। এরপর সকলের সামনে ভেড়ার আকৃতি বিশিষ্ট মৃত্যুকে জবাই করা হবে। আহ্বানকারী বলবে, হে জান্নাতবাসী! জান্নাত হচ্ছে তোমাদের চিরস্থায়ী আবাস, তোমরা আর কখনো মৃত্যুমুখে পতিত হবে না। এরপর আহ্বানকারী দোজখবাসীদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের দোজখবাসও চিরস্থায়ী এবং তোমরাও অমর। এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন

'তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপ দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে।' বোখারী ও মুসলিম। হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হজরত ইবনে ওমরের হাদিসটিতে আবৃত্তি করার প্রসঙ্গটি নেই।

হজরত আনাস থেকে আবু ইয়ালী, বায্যার ও তিবরানী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাকেম ও ইবনে হাব্বানও এরকম হাদিস উল্লেখ করেছেন। এ হাদিসটিতেও আবৃত্তি করার উল্লেখ নেই।

'পরিতাপের দিবস' সম্পর্কে বায়যাবী লিখেছেন, ওই দিন সকলেই পরিতাপ বা আক্ষেপ করতে থাকবে। পাপিষ্ঠরা আক্ষেপ করতে থাকবে পাপের কারণে এবং পুণ্যবানেরা আক্ষেপ করতে থাকবে পুণ্যকর্ম কম করার কারণে।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে তিবরানী ও আবু ইয়ালী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, জান্নাতবাসীরা দুঃখ প্রকাশ করতে থাকবে ওই সময়ের জন্য, যে সময় তারা অতিবাহিত করেছিলো আল্লাহ্‌র স্মরণবিচ্যুত অবস্থায়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, পরলোকগত সকলেই অনুতপ্ত হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কীভাবে? তিনি স. বললেন, পুণ্যবানেরা অনুতপ্ত হবে এই ভেবে যে, হায় আরো অধিক পুণ্যকর্ম করলাম না কেনো? আর পাপিষ্ঠরা অনুতাপানলে দগ্ধ হতে থাকবে একথা ভেবে যে, হায়! কেনো বিরত থাকতে পারলাম না পাপ কর্ম থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এখন তারা অনবধান এবং তারা বিশ্বাস করবে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন, এখনো তারা পাপমগ্ন, এখনো অজ্ঞ ও অসতর্ক পরকালের ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে। তাদের উদাসীনতা অনড়। তাই আপনি চাইলেও তারা আপনার কথা বিশ্বাস করবে না।

শেষোক্ত আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী আমি, পৃথিবীর ও তার উপরে যারা আছে তাদের এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যানীত হবে।' একথার অর্থ— পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমিই হবো সব কিছুর চূড়ান্ত মালিক। শেষ পর্যন্ত সকলকে ফিরে আসতে হবে আমার নিকটেই। আমি তখন প্রত্যেকের কর্মফল অনুসারে কাউকে করবো পুরস্কৃত এবং কাউকে করবো তিরস্কৃত।

এখানে 'মান' শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে সকল সৃষ্টিকে। অথবা বিবেকবান ও বিবেকহীন সকল প্রাণীকে। এভাবে বলা হয়েছে, চূড়ান্ত মালিকানা কেবল আল্লাহ্‌র, অন্য কারো নয়। আর সকলের অবশেষ প্রত্যাবর্তন কেবল আল্লাহ্‌র নিকটেই।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ۝ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝ يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۝ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۝

❒ বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লেখিত ইব্রাহীমের কথা; সে ছিল সত্যবাদী ও নবী।

❒ যখন সে তাহার পিতাকে বলিল, 'হে আমার পিতা! যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না তুমি তাহার ইবাদত কর কেন?

❒ 'হে আমার পিতা! আমার নিকট তো আসিয়াছে জ্ঞান যাহা তোমার নিকট আসে নাই, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাইব।'

❒ 'হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করিও না। শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য।'

❒ 'হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করিবে এবং তুমি শয়তানের সাথী হইয়া পড়িবে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বর্ণনা করো, এই কিতাবে উল্লেখিত ইব্রাহিমের কথা; সে ছিলো সত্যবাদী ও নবী।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এই কোরআনে বর্ণিত নবী ইব্রাহিমের কথা জনসমক্ষে প্রচার করুন, যিনি ছিলেন সত্যবাদী।

এখানে 'সিদ্দীক্ব' কথাটির অর্থ সত্যবাদী। এখন কথা হচ্ছে, সত্যবাদী বলে কাকে? এসম্পর্কে বিভিন্ন আলেম বিভিন্ন কথা বলেছেন, যেমন— ১. অত্যন্ত সত্যপরায়ণ। ২. যিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। ৩. যিনি সত্য উচ্চারণে সতত অভ্যস্ত, যার কারণে তার নিকট থেকে কখনো মিথ্যা প্রকাশিত হতে পারে না। ৪. যার বিশ্বাস, বাক্য ও কর্ম সম্পূর্ণরূপে সত্যের অনুকূল। ৫. যিনি আল্লাহ্,

পূর্ববর্তী নবী-রসুল, ফেরেশতা, কিয়ামত ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়াবলীকে সত্য বলে জানেন এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাকে জানেন শুভ ও অশুভরূপে। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যিনি সতত অনুগত।

আমি বলি, অত্যধিক সত্যপরায়ণতার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, বিশ্বাস্য বিষয়সমূহকে তিনি বিস্তারিতভাবে জানেন। বাগবীর বর্ণনানুসারে বাহ্যত একথাই অনুমিত হয়। রসুল স. কর্তৃক আনীত ধর্মাদর্শ, আকায়েদ ও আমলের প্রতি বিশ্বাস রাখা সকল মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যক, যদিও রসুল স. এর কোনো একটি আদর্শকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যেতে হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রকৃত বিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের সকল কথা মেনে নেয় এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়। যাদের এই উদ্যোগ সফল হয়, তাঁরাই পুণ্যবান বা সলিহীন। কিন্তু তাঁরা সিদ্দীক নন। সিদ্দীকিয়াত বা সত্যবাদিতার মর্যাদা এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। প্রচণ্ড ইমানী শক্তি ব্যতিরেকে ওই স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। নবী-রসুলগণ ওই প্রচণ্ডতম ইমানী শক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ করেন সরাসরি, মাধ্যম বিবর্জিতরূপে। আর উম্মতেরা তা লাভ করেন তাঁদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অর্থাৎ সামগ্রিক আনুগত্যের মাধ্যমে। তাঁরা যখন কামালাতে নবুয়তের নূরে নিমগ্ন হন, তখন উত্তরাধিকারিত্বের সূত্রে তাঁদের উপরেও বর্ষিত হয় আল্লাহ্‌র সত্তাগত বিচ্ছুরণ (জাতি তাজাল্লি)। আর ওই সময়েই তাঁরা উন্নীত হতে পারেন সত্যবাদিতার স্তরে। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌ ও রসুলের একনিষ্ঠ অনুসারীরা, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেছেন, সেই সকল সিদ্দীক, শহীদ ও সলিহীনের সঙ্গী হবে' (সুরা নিসা)। এই আয়াতে স্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহধন্য, ব্যক্তিগণ চার শ্রেণীর— নবী, সিদ্দীক, শহীদ, সলিহীন। আরো সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তাঁদের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসীরাও হবেন তাঁদের সঙ্গী। সুরা নিসার তাফসীরে যথাস্থানে বিষয়টির বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর সুরা ওয়াকিয়ায় সিদ্দীক সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'ছুল্লাতুম মিনাল আউয়ালীন ওয়া কুলীলুম্‌ মিনাল আখিরীন' (বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে)। এই আয়াতের ব্যাখ্যাও যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করা হবে ইনশাআল্লাহ্‌তায়ালা।

নবী-রসুলগণের পরে শেষ রসুল স. এর সাহাবীগণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ সিদ্দীক পর্যায়ভূত। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। আর তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠজন ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক। রসুল স. স্বয়ং তাঁকে সিদ্দীক আখ্যা দিয়েছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমগণ এ বিষয়ে একমত। হজরত আবু বকর স্বয়ং বলেছেন, আমিই সিদ্দীকে আকবর (সত্যবাদী শ্রেষ্ঠ)। আমার পরে যে সত্যবাদী শ্রেষ্ঠ বলে নিজেকে জাহির করবে, সে মিথ্যাবাদী।

এখানকার 'নাবিউন' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'নবুওয়াত' থেকে। এর অর্থ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যাঁকে নির্বাচন করা হয়েছে তাঁর বাণী প্রচারকরূপে। নবুওয়াত কথাটির শাব্দিক অর্থ টিলা, মাটি ঠেলে ওঠা উঁচু অংশ। অথবা শব্দটি সংগৃহীত হয়েছে 'নাবাউন' (সংবাদ) থেকে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যিনি সত্য ধর্মের সংবাদ পরিজ্ঞাত, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যাকে দেয়া হয় সত্যের সংবাদ।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'যখন সে তার পিতাকে বললো, হে আমার পিতা! যে শোনে না, দেখে না, এবং তোমার কোনো কাজে আসে না তুমি তার ইবাদত করো কেনো?' একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতাকে বললেন, হে আমার জনয়িতা! যে আপনার প্রার্থনা ও আকুতি শুনতে পায় না, দেখতে পায় না আপনার উপাসনা ও অন্যান্য অবস্থা এবং যে আপনার উপকার করার সামর্থ্যও রাখে না, সেই জড় প্রতিমাগুলোর উপাসনা আপনি করেন কেনো?

লক্ষণীয় যে, হজরত ইব্রাহিম এখানে তাঁর পিতাকে সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন নিতান্ত আদব ও সম্মানের সঙ্গে। কঠোর কণ্ঠে তাকে সরাসরি গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করেননি। পরোক্ষভাবে একথাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, প্রতিমাপূজা করা বুদ্ধিবিরোধী একটি অসংগত আচরণ। উপাসনা তো করা উচিত ওই পবিত্র সত্তার, যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী। যিনি সুখ ও দুঃখের মালিক। সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা ও সর্বশক্তিধর। যিনি তাঁর উপাসকদের কল্যাণ দান করতে ও তাদের ক্ষতি প্রতিরোধ করতে সক্ষম। জীবন মৃত্যু, জীবিকা দান করা না করা এবং শাস্তি ও স্বস্তির নির্ধারণ যার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। এভাবে নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলো কেবল নয়, সপ্রাণ সৃষ্টিকুলের কেউ অথবা কোনো কিছুই উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, যদিও তাদের মধ্যে কারো কারো রয়েছে শ্রুতি, দৃষ্টি, অনুভূতি, বাকশক্তি এবং উপকার প্রদানের সাময়িক স্বাধীনতা। কারণ তারাও তাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য সেই চির অমুখাপেক্ষী আনুরূপ্যবিহীন স্রষ্টা ও প্রভুপালনকর্তার মুখাপেক্ষী। বিশুদ্ধ বিবেক তাই কখনোই গায়রুল্লাহ্‌র উপাসনাকে সমর্থন করে না। ফেরেশতা ও পয়গম্বরের মতো মহা সম্মানার্হ সৃষ্টিও তাই উপাস্য হওয়ার যোগ্যতারহিত।

এর পরের আয়াতে(৪৩) বলা হয়েছে— 'হে আমার পিতা! আমার নিকট তো এসেছে জ্ঞান যা তোমার নিকট আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাবো।' এ কথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম বললেন, হে আমার জনক! লক্ষ্য করুন, আমার নিকট এসেছে আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণবত্তা ও তাঁর

আজ্ঞা-নিষেধাজ্ঞাসমূহের জ্ঞান। এই জ্ঞান আপনার নিকটে নেই। সুতরাং আপনি আমাকে অনুসরণ করে এই জ্ঞান ও যথার্থ পথনির্দেশনাকে গ্রহণ করুন। পথ-প্রদর্শকরূপে মান্য করুন আমাকে। আমি আপনাকে প্রদর্শন করবো সরলতার পথ। লক্ষণীয় যে, এখানেও হজরত ইব্রাহিম সরাসরি নিজেকে জ্ঞানী এবং তাঁর পিতাকে অজ্ঞ বলে আখ্যা দেননি। বরং তিনি অত্যন্ত নম্র ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর প্রিয় পিতাকে আহ্বান জানিয়েছেন আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জ্ঞান ও আল্লাহ্ প্রদত্ত সরল পথের দিকে।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত কোরো না। শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য।' একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম বললেন, হে আমার জনক! শয়তানই আপনাকে প্রতিমা পূজার প্রতি প্ররোচিত করেছে। তাই প্রতিমার উপাসনা মূলতঃ শয়তানেরই উপাসনা। শয়তান কখনো কারো আরাধ্য হতে পারে না। সুতরাং আপনি শয়তানের উপাসনা করবেন না। কারণ সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য। অবাধ্য ও অবাধ্যদের অনুসারীরা কখনোই আল্লাহ্‌র নৈকট্য, ভালোবাসা ও পরিতোষ লাভ করতে পারে না।

শেষের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শয়তানের সাথী হয়ে পড়বে।' একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম আরো বললেন, হে আমার পিতৃপ্রবর! আপনি যদি প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ না করেন, তবে আমি আশংকা করি পৃথিবীতে অথবা পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় স্থানে আপনি হবেন আল্লাহ্‌র শাস্তিগ্রস্ত। হয়ে যাবেন শয়তানের চিরসাথী। কেননা আল্লাহ্ পরম দয়াপরবশ বিশ্বাসীদের প্রতি। কিন্তু অবিশ্বাসীদের প্রতি তিনি অত্যন্ত নির্মম, কঠোর। অতএব আপনি তাঁর প্রতি আনয়ন করুন বিশুদ্ধ বিশ্বাস।

বায়যাবী লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে কেবল শয়তানের অবাধ্য হওয়ার কথা। তার অন্য কোনো পাপের কথা পূর্ববর্তী আয়াতে যেমন আসেনি, তেমনি আসেনি আলোচ্য আয়াতেও। সম্ভবতঃ এর কারণ এই যে, অবাধ্যাচরণই সকল অপরাধের মূল। অন্য সকল অপরাধই অবাধ্যতার অন্তর্গত। অথবা শয়তানের অবাধ্যতার কথা প্রকাশ করে তার সাথী বা অনুসারী হতে এখানে নিষেধ করা হয়েছে এই মর্মে যে, শয়তান কেবল আল্লাহ্‌র অবাধ্য নয়, একই সঙ্গে তোমাদের প্রথম পিতা আদমেরও শত্রু। সুতরাং তার অনুসরণ মানুষের জন্য শোভন হতে পারে কীরূপে?

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِیْ یٰۤاِبْرٰهِیْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِیْ مَلِیًّا○ قَالَ سَلٰمٌ عَلَیْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّیْ اِنَّهٗ كَانَ بِیْ حَفِیًّا○ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّیْ عَسٰۤی اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّیْ شَقِیًّا○ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا یَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِیًّا○ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا○

❒ পিতা বলিল, 'হে ইব্‌রাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হইতে বিমুখ হইতেছ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করিবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাও।'

❒ ইব্‌রাহীম বলিল, তোমার নিকট হইতে বিদায়। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।

❒ 'আমি তোমাদিগ হইতে ও তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগের ইবাদত কর তাহাদিগ হইতে পৃথক হইতেছি; আমি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করি; আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া আমি ব্যর্থকাম হইব না।'

❒ অতঃপর সে যখন তাহাদিগ হইতে ও তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগের ইবাদত করিত সেই সকল হইতে পৃথক হইয়া গেল তখন আমি তাহাকে দান করিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করিলাম।

❒ এবং তাহাদিগকে আমি দান করিলাম আমার অনুগ্রহ ও তাহদিগকে দিলাম সমুচ্চ যশ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পিতা বললো, হে ইব্রাহিম! তুমি কি আমার দেব-দেবী থেকে বিমুখ হচ্ছো?' একথার অর্থ— বিস্ময় ও ক্রোধের সঙ্গে পিতা বললো, আমার পরম আরাধ্য দেব-দেবী সম্পর্কে তুমি এরকম কটূক্তি করলে কোন সাহসে? তবে কি তুমি তাদেরকে অস্বীকার করো? লক্ষণীয় যে, হজরত ইব্রাহিম এতক্ষণ ধরে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করে এসেছেন 'হে আমার পিতা'— এরকম

সম্মানজনক সম্বোধনের মাধ্যমে। কিন্তু তাঁর পিতা 'হে আমার পুত্র'— এরকম স্নেহ-বাৎসল্যভরা কণ্ঠে কথা বলেননি। তাচ্ছিল্য, ঘৃণা ও উত্তেজনার সুরে সরাসরি বলেছেন, 'হে ইব্রাহিম'। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানে জ্ঞানী ও আল্লাহ্‌র প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসস্থাপনকারীগণই প্রকৃত জ্ঞানী, আর সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীরা প্রকৃত অর্থেই অজ্ঞ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি প্রস্তরের আঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবোই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও।' কালাবী, মুকাতিল ও জুহাক 'লাআরজুমান্নাকা' কথাটির অর্থ করেছেন— আমি তোমাকে গালি দিবো, কঠোর ভাষায় আক্রমণ করবো, বকা-ঝকা করে বের করে দিবো। এরকম অর্থ করা হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতানুসারে। হাসান কথাটির অর্থ করেছেন— আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবো।

কালাবীর মতে 'ওয়াহ্‌জুরনী মালিয়্যা' কথাটির অর্থে— আমার নিকট থেকে চিরতরে পৃথক হয়ে যাও। মুজাহিদ ও ইকরামা 'মালিয়্যা' শব্দটির অর্থ করেছেন, সুদীর্ঘ সময়। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, সকল সময়, চিরদিন। 'মালী' কথাটির শাব্দিক অর্থ অবস্থান করা। যেমন বলা হয় 'তাম্‌লাইতু হীনা' (আমি কিছুকাল অবস্থান করেছি)। 'মালাওয়ান' অর্থ দিবস-রজনী। কাতাদা ও আতা বলেছেন, 'তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও' কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে তুমি চিরদিনের জন্য আমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো। কোনোদিন আর এমুখো হয়ো না।

এর পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'ইব্রাহিম বললো, তোমার নিকট থেকে বিদায়। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।' এখানে বিদায় সম্ভাষণ জানানো হয়েছে 'সালামুন আলাইকা' কথাটির মাধ্যমে। বিশ্বাসী, জ্ঞানী ও প্রতিভাধর ব্যক্তিবর্গ মূর্খতার বিপরীতে এভাবেই শিষ্টাচার প্রদর্শন করে থাকেন। আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশও এরকম। যেমন— 'তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে সালাম।' 'সালামুন আলাইকা' বলার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে, আমার পক্ষ থেকে আপনার কোনো অনিষ্ট হবার আশংকা নেই। আপনি আমার সঙ্গে যত রূঢ় আচরণই করুন না কেনো, আমি ক্রমাগত আপনার জন্য আমার প্রভুপালনকর্তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো।

অধিকাংশ তাফসীরবিশারদ 'আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো' সম্পর্কে বলেছেন, কথাটির অর্থ এরকম নয় যে, আপনি যা কিছুই করুন না কেনো, আমি আল্লাহ্‌র কাছে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। বরং অর্থ হবে এরকম— আমি আমার প্রভুপালকের নিকটে এইমর্মে প্রার্থনা জানাবো যে, তিনি যেনো দয়া করে আপনাকে তওবা করার সুযোগ দান করেন এবং প্রদান করেন ইসলাম গ্রহণের তৌফিক, যা হবে আপনার ক্ষমার কারণ। উল্লেখ্য যে, বিধর্মীদের জন্য ইসলাম গ্রহণের তৌফিক চেয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করা যায়।

আমি বলি, বর্ণিত ব্যাখ্যাটি ভুল। কারণ আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন— তোমাদের জন্য ইব্রাহিম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ (সুরা মুমতাহিনা)। এই আয়াতে হজরত ইব্রাহিমের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং শেষে একথাও জানানো হয়েছে যে, অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়ে তোমরা নবী ইব্রাহিমের অনুসরণ কোরো না, যদিও তাদের জন্য ইমানের তৌফিক বা সামর্থ্য চেয়ে দোয়া করা যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে, এখানে হজরত ইব্রাহিমের অনুসরণের নির্দেশ দেয়ার পরে তাঁর দোয়া করার ব্যাপারটি আবার ব্যতিক্রমরূপে চিহ্নিত করা হলো কেনো? এর উত্তরে বলতে হয়, হজরত ইব্রাহিমের তখনো পর্যন্ত একথা জানা ছিলো না যে, মুশরিকদের জন্য প্রার্থনা অবৈধ। বিষয়টি সম্পর্কে যখন তাঁকে জানানো হলো, তখন তিনি বিরত রইলেন ক্ষমা প্রার্থনা থেকে এবং চিরদিনের জন্য তাঁর পিতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটালেন। রসুল স.ও তাঁর প্রিয় পিতৃব্য আবু তালেবকে একবার বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাকবো, যতক্ষণ না এ সম্পর্কে আমাকে নিষেধ করা হয়। এরপর অবতীর্ণ হলো— 'নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য মুশরিকদের ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা অশোভন' (সুরা তওবা)। যথাস্থানে এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, নবী-রসুলগণের বিশেষ দোয়া কবুল করা হয়। হজরত ইব্রাহিমও তাঁর পিতার ইমান গ্রহণের তৌফিক প্রার্থনা করলে তা পূরণ করা হতো। কিন্তু তাঁর পিতা আজরের তকদীরে ইমান ছিলোই না। তাই হজরত ইব্রাহিমকে তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা থেকে বিরত রাখা হয়েছিলো, যেমন বিরত রাখা হয়েছিলো রসুল স.কে তাঁর পিতৃব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা থেকে।

কালাবী বলেছেন, 'হাফিয়্যা' কথাটির অর্থ— তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। তিনি আমার প্রার্থনা সম্পর্কে জ্ঞাত ও তিনি তা গ্রহণও করে থাকেন। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— তিনি আমাকে কবুল হওয়ার যোগ্য প্রার্থনায় অভ্যস্ত করেছেন, তাই আমার দোয়া ও বদ্‌দোয়া দু'টোই গৃহীত হয়।

এর পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'আমি তোমাদের নিকট থেকে ও তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করো, তাদের নিকট থেকে পৃথক হচ্ছি।' মুকাতিল বলেছেন, একথা বলে হজরত ইব্রাহিম তাঁর আপন পরিবার ও ওই জনপদের সকল মুশরিকদের নিকট থেকে চলে গিয়েছিলেন অনেক দূরে এক অংশীবাদিতামুক্ত স্থানে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করি; আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহ্বান করে আমি ব্যর্থকাম হবো না।' একথার অর্থ— হে মুশরিক সম্প্রদায়! দেব-দেবীদের উপাসনা করে তোমরা যেমন বরবাদ হয়ে গিয়েছো, সেরকম বরবাদ আমি কস্মিনকালেও হবো না। কারণ আমি এক ও অংশীবিহীন আল্লাহ্র উপাসক, যিনি চির অক্ষয়, চির অমুখাপেক্ষী। উল্লেখ্য যে, এখানে কেবল বিনয় প্রকাশার্থে হজরত ইব্রাহিম তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাসকে 'আশা করি' কথাটির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং এরকম ধারণা এখানে অসঙ্গত যে, তিনি তাঁর সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। তাঁর এমতো বিনয়াবনত উচ্চারণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, দোয়া কবুল করা এবং পুণ্যপ্রদান করার বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র দয়া ও অভিপ্রায়নির্ভর। এরকম করতে তিনি বাধ্য নন। সীমাবদ্ধতা ও বাধ্যতার অধীন তিনি কখনোই নন। আরো একটি কথা এখানে প্রমাণিত হয় যে, শুভ সমাপ্তির উপরেই নির্ভর করে প্রকৃত পরিণতি এবং ভবিষ্যতে কি হবে, তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না।

এর পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে যখন তাদের নিকট থেকে ও তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করতো, সেই সকল থেকে পৃথক হয়ে গেলো, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইব্রাহিমের হিজরতের সিদ্ধান্তে প্রসন্ন হলেন। হজরত ইব্রাহিম তাঁর কাফের আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে চলে গেলেন সিরিয়ায়। সেখানে আল্লাহ্ তাঁর বংশে দান করলেন দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে এবং দু'জনকেই তিনি করলেন তাঁর প্রিয়ভাজন নবী।

বায়যাবী লিখেছেন, হজরত ইব্রাহিমের বংশে অনেক নবী আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু হজরত ইসহাক ও হজরত ইয়াকুব ছিলেন ওই সকল নবী-রসুলের স্বনামধন্য পূর্বসূরী। তাঁর প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইলের কথা এখানে সম্ভবতঃ একারণে উল্লেখ করা হয়নি যে, তাঁর আলোচনা উল্লেখিত হবে পৃথকরূপে অনন্যসাধারণ বিবরণে। কারণ তাঁর বংশে সুদীর্ঘকাল পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন শেষতম, পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.।

শেষের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে আমি দান করলাম আমার অনুগ্রহ।' একথার অর্থ— আমি ওই তিনজনকেই দান করেছিলাম আমার অফুরন্ত রহমত। কালাবী বলেছেন, এখানে 'রহমত' (অনুগ্রহ) কথাটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে সম্মান ও সম্পদবিশিষ্ট সন্তানকে। কেউ কেউ বলেছেন, কিতাব ও নবুয়তকে।

শেষে বলা হয়েছে— 'ও তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ যশ।' 'লিসানা সিদ্‌ক্ব' অর্থ এখানে সমুচ্চ যশ। যে যশ ও সাধুবাদ রসনা সহযোগে উচ্চারিত হয়, সেই সুনাম বা সুখ্যাতির কথাই বলা হয়েছে কথাটির মাধ্যমে। সমুচ্চ যশ অর্থ ওই খ্যাতিমানতা যা সকল মতাদর্শের লোকেরা যুগে যুগে প্রশংসাচ্ছলে উচ্চারণ করে থাকে। হজরত ইব্রাহিমও আল্লাহ্‌র নিকটে এরকম যশ প্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁর ওই প্রার্থনার কথা এক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— 'আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করো' (সুরা শুআরা)। বলা বাহুল্য যে, আল্লাহ্‌পাক তাঁর এই দোয়া কবুল করেছিলেন।

সূরা মার্‌য়াম ঃ আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝ وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ۝ وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ۝ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝ وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۪ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ۝

❒ এই কিতাবে উল্লেখিত মূসার কথা বর্ণনা কর, সে ছিল বিশুদ্ধচিত্ত এবং সে ছিল রসূল, নবী।

❒ তাহাকে আমি আহ্বান করিয়াছিলাম তূর্‌ পর্বতের দক্ষিণ দিক হইতে এবং আমি গূঢ়তত্ত্ব আলোচনা-রত অবস্থায় তাহাকে নিকটবর্তী করিয়াছিলাম।

❒ আমি নিজ অনুগ্রহে তাহাকে দিলাম তাহার ভ্রাতা হারুনকে নবীরূপে।

❒ এই কিতাবে উল্লেখিত ইস্‌মাইলের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী, এবং সে ছিল রসূল, নবী;

❒ সে তাহার পরিজনবর্গকে সালাত ও জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত ও সে ছিল তাহার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি এই কোরআনে উল্লেখিত মুসার কথা মানুষকে জানিয়ে দিন, তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধচিত্ত নবী ও রসুল।

এখানে 'মুখলিসান' অর্থ বিশুদ্ধচিত্ত। অর্থাৎ তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ অভিমুখী, অন্যের আকর্ষণ থেকে তাঁর হৃদয় ছিলো সতত মুক্ত। আল্লাহ্ কর্তৃক বিশেষভাবে নির্বাচিত বলেই তিনি হতে পেরেছিলেন এরকম বিশুদ্ধ ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী।

'রসুলান নাবীয়্যা' অর্থ রসুল ও নবী। উল্লেখ্য যে, নবী অপেক্ষা রসুল অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। তাই এখানে প্রথমে 'রসুলান' উল্লেখ করার পর উল্লেখ করা হয়েছে 'নাবীয়্যান' শব্দটি। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ যাঁকে ইচ্ছা করেন তাঁকেই দান করেন নবী ও রসুলের মতো মহা সম্মানিত পদমর্যাদা। হজরত মুসাও ছিলেন তেমনি এক মহা সম্মানিত নবী ও রসুল।

এর পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'তাকে আমি আহ্বান করেছিলাম তুর পর্বতের দক্ষিণ দিক থেকে।' মিসর ও মাদায়েনের মধ্যবর্তী এক পাহাড়ের নাম তুর। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওই পাহাড়ের আরেকটি নাম জোবায়ের। হজরত মুসা তখন মাদায়েন থেকে যাচ্ছিলেন মিসরের দিকে। ডান পাশে ছিলো তুর পাহাড়। যখন সেখানে রাত্রি হলো, তখন তিনি দূর থেকে দেখলেন তুর পাহাড়ে জ্বলছে একটি আগুন। তিনি সেদিকে রওনা দিলেন। আগুনের কাছাকাছি হতেই শুনতে পেলেন— হে মুসা! নিশ্চয় আমিই আল্লাহ্, যিনি মহা বিশ্বের প্রভুপ্রতিপালক। হজরত মুসা সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গেলেন ওই অলৌকিক আগুনের দিকে। সেই সময়ের কথাই আলোচ্য আয়াতের শুরুতে বিবৃত হয়েছে এভাবে— তাকে আমি আহ্বান করেছিলাম তুর পর্বতের দক্ষিণ দিক থেকে।

এখানকার 'আইমান' কথাটির অর্থ 'দক্ষিণ দিক থেকে' না হয়ে 'বরকতময় দিক থেকে'ও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তাকে আমি আহ্বান করেছিলাম তুর পর্বতের বরকতময় দিক থেকে, যেদিক থেকে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন আল্লাহ্র কালাম।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি গূঢ় তত্ত্ব আলোচনারত অবস্থায় তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম।' একথার অর্থ— আমি তখন তার সঙ্গে করেছিলাম নিগূঢ় তত্ত্বালোচনা এবং দান করেছিলাম আনুরূপ্যবিহীন এক নৈকট্য।

এর পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভ্রাতা হারুনকে নবীরূপে।' হজরত হারুন ছিলেন হজরত মুসার অগ্রজ। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরকম হতে পারে না যে, হজরত মুসার কারণে আল্লাহ্ তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। বরং প্রকৃত কথা এই যে, হজরত মুসা তাঁর নবুয়ত লাভের জন্য দোয়া করেছিলেন। আর সে দোয়া কবুল করে নিয়েছিলেন

আল্লাহ্পাক। এটা ছিলো তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। তাই এখানে বলা হয়েছে— আমি নিজ অনুগ্রহে হারুনকে করলাম নবী এবং তার একান্ত সঙ্গী। বাগবী লিখেছেন, একারণে হজরত হারুনের এক নাম 'হিবাতুল্লাহ্' (আল্লাহ্র দান)।

এর পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'এই কিতাবে উল্লেখিত ইসমাইলের কথা বর্ণনা করো, সে ছিলো প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিলো রসুল, নবী।' হজরত ইসমাইল ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের প্রিয় পুত্র এবং শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর পূর্ব পুরুষ, আর ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সততা ও নিষ্ঠার এক পরম পরাকাষ্ঠা। মুজাহিদ বলেছেন, তিনি তাঁর অঙ্গীকারসমূহ প্রতিপালন করেছিলেন নিখুঁতভাবে।

মুকাতিল বলেছেন, হজরত ইসমাইল একবার এক ব্যক্তির সঙ্গে এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকবো। ওই ব্যক্তি ফিরে এলো তিনদিন পর। কালাবীর বর্ণনানুসারে এক বছর পর। ফিরে এসে ওই লোকটি দেখলো হজরত ইসমাইল তখনো সেখানে তার জন্যে অপেক্ষমান। হজরত ইব্রাহিম যখন প্রিয়পুত্রকে কোরবানী করবার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখনো তিনি ছিলেন তাঁর প্রতিজ্ঞাপালনে অনড় ও অবিচল। বলেছিলেন— 'ইনশাআল্লাহ্, আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভূত হিসেবে দেখবেন।'

বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, শরিয়ত-প্রবর্তক হওয়া সকল নবীর বৈশিষ্ট্য নয়। হজরত ইসমাইল ছিলেন রসুল। তৎসত্ত্বেও তিনি ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের শরিয়তের অনুসারী। একইভাবে তাঁর অপর সন্তানও ছিলেন তাঁরই শরিয়তের অনুগামী।

শেষের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতো ও সে ছিলো তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।' বিশ্বাসীগণের দায়িত্ব হচ্ছে প্রথমে নিজেকে সংশোধন করা। তারপর সংশোধন করা পরিবার পরিজনকে। তারপর অন্যান্য নিকটজনকে। তাই হজরত ইসমাইল তাঁর পরিজনবর্গকে নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন। আল্লাহ্র নির্দেশও এরকম। বিভিন্ন আয়াতে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— ১. এবং তুমি তোমার পরিজন ও নিকটবর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করো। ২. তোমার পরিজনদেরকে নামাজের আদেশ দাও। ৩. দোজখ থেকে নিজে বাঁচো এবং পরিবার পরিজনদেরকে বাঁচাও। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'আহল' (পরিজনবর্গ) কথাটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে সমস্ত উম্মতকে। কারণ নবী-রসুলগণ তাঁদের আপন আপন উম্মতের পিতাসদৃশ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে নামাজ ও জাকাত দ্বারা ওই শরিয়তকেই বোঝানো হয়েছে, যার বাস্তবায়ন ফরজ ছিলো হজরত ইসমাইলের উপরে এবং একই সঙ্গে যা ছিলো হজরত ইব্রাহিমেরও ফরজ দায়িত্বভূত। উল্লেখ্য যে, শারীরিক ইবাদতের মধ্যে নামাজ এবং সম্পদগত ইবাদতের মধ্যে জাকাতই সর্বোত্তম। তাই বিশেষভাবে এখানে এ দু'টোর উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ দু'টোর মাধ্যমেই বোঝানো হয়েছে সমগ্র শরিয়তকে।

'মারদ্বিয়্যা' অর্থ সন্তোষভাজন। হজরত ইসমাইল ছিলেন আল্লাহ্র নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার প্রতি সতত অনুগত ও সুদৃঢ়। তাই তিনি ছিলেন আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন। সেকথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে— 'সে ছিলো তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।'

সূরা মার্য়াম ঃ আয়াত ৫৬, ৫৭, ৫৮

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝ وَّرَفَعْنٰهُ
مَكَانًا عَلِيًّا ۝ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ
ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۚ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۚ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرٰهِيْمَ وَ
إِسْرَآءِيْلَ ۚ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ
الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ۝ (السجدة)

❑ এই কিতাবে উল্লেখিত ইদ্রীসের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল সত্যবাদী, নবী;

❑ এবং আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম উচ্চ মর্যাদা।

❑ নবীদিগের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করিয়াছেন ইহারাই তাহারা, আদমের ও যাহাদিগকে তিনি নূহের সহিত নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন তাহাদিগের বংশোদ্ভূত, ইবরাহীম ও ইসরাইলের বংশোদ্ভূত ও যাহাদিগকে তিনি পথ-নির্দেশ করিয়াছিলেন ও মনোনীত করিয়াছিলেন তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত; তাহাদিগের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্ত হইলে তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়িত ও ক্রন্দন করিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এই কোরআনে বর্ণিত নবী ইদ্রিসের কথা আপনি জনসমক্ষে প্রচার করুন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নবী। হজরত ইদ্রিস ছিলেন হজরত নুহের প্রপিতামহ এবং হজরত শীশের

দৌহিত্র। তাঁর আরেক নাম ছিলো আখনুখ। তিনি অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছে ইদ্রিস। বায়যাবী লিখেছেন, 'ইদ্রিস' শব্দটি অনারব। যদি তাই হয় তবে আরবী রীতিতে দরস (পাঠ বা অধ্যয়ন) থেকে শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে— একথা বলার কোনো মানে হয় না। তবে এরকম হতে পারে যে, যে ভাষা থেকে ইদ্রিস নামটি সংগৃহীত হয়েছে, সে ভাষাতেও হয়তো শব্দটির অর্থ পাঠক বা অধ্যয়নশীল। কিন্তু শব্দটি আরবী অর্থেরও অনুকূল।

আল্লাহ্পাক হজরত ইদ্রিসের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন তিরিশ খানা সহীফা বা আকাশী পুস্তিকা। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইদ্রিসই প্রথম কলম দ্বারা লেখার প্রচলন করেন এবং আবিষ্কার করেন সেলাই করা কাপড় পরিধানের প্রথা। এর পূর্বে মানুষ চামড়ার পোশাক পরিধান করতো। আবার তিনিই প্রথম নির্মাণ করেছিলেন যুদ্ধাস্ত্র এবং তা দিয়ে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামও করেছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যা ও অংক শাস্ত্রেরও আবিষ্কারক ছিলেন তিনি।

এর পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাকে দান করেছিলাম উচ্চ মর্যাদা।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'মাকানান আলিয়্যা' (উচ্চ মর্যাদা) কথাটির অর্থ নবুয়ত ও আল্লাহ্র বিশেষ নৈকট্য। কেউ কেউ বলেছেন, জান্নাত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, চতুর্থ অথবা ষষ্ঠ আসমান। হজরত আনাস বিন মালিক, হজরত মালিক বিন সা'সাআহ্ থেকে উল্লেখ করেছেন, মেরাজ রজনীতে রসুল স. হজরত ইদ্রিসকে দেখেছিলেন চতুর্থ আসমানে। সুরা বানী ইসরাইল ও সুরা আন্নাজম-এর তাফসীরে হাদিসটির উল্লেখ রয়েছে।

হজরত ইদ্রিসের আকাশারোহণের ঘটনাঃ হজরত কা'ব আহবার প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, একদিন হজরত ইদ্রিস প্রখর রোদের মধ্যে সারাদিন পথ চললেন। শেষে ক্লান্ত হয়ে বললেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! একদিন পথ চলতেই আমি এতো ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু যে দিন সকলে পাঁচশত বছরের পথ অতিক্রম করতে বাধ্য হবে, সেদিন তাদের কি দূরবস্থাই না হবে। তাই তোমার সকাশে আমার প্রার্থনা— তুমি সূর্যের উত্তাপকে কিছুটা স্তিমিত করে দাও। পরদিন সকালে সূর্য পরিচালনাকারী ফেরেশতা অনুভব করলো সূর্যের উত্তাপ অনেকটা স্তিমিত। সে আল্লাহ্ সকাশে জিজ্ঞেস করলো, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! সূর্যের উত্তাপ স্তিমিত হওয়ার কারণ কি। আল্লাহ্ বললেন, আমি এরকম করেছি আমার প্রিয়বান্দা ইদ্রিসের প্রার্থনার কারণে। ফেরেশতা বললো, হে পরোয়ারদিগার! তুমি তাকে আমার বন্ধু করে দাও। আল্লাহ্ বন্ধুত্বের অনুমতি দিলেন। ফেরেশতা উপস্থিত হলো হজরত ইদ্রিসের নিকটে। হজরত ইদ্রিস তাঁর পরিচয় পেয়ে

বললেন, আমি জানি আপনি মহাসম্মানিত এক ফেরেশতা। মৃত্যুর ফেরেশতা আজরাইলও আপনাকে সমীহ করেন। তাই আমি বলি, আপনি তার নিকট আমার জন্য এইমর্মে সুপারিশ করুন যেনো তিনি আমার মৃত্যুর সময় কিছুটা পিছিয়ে দেন। আর বর্ধিত আয়ু পেয়ে আমি যেনো আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি এবং করতে পারি আরো অধিক ইবাদত। ফেরেশতা বললো, মৃত্যুর সময়তো সুনির্ধারিত। তবুও আমি মৃত্যুর ফেরেশতার নিকট আপনার আবেদনটি উত্থাপন করবো। এরপরে সূর্যের ফেরেশতা হজরত ইদ্রিসকে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে গেলো। সূর্যের কাছাকাছি একস্থানে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে সে উপস্থিত হলো মৃত্যুর ফেরেশতার কাছে। বললো, আদম সন্তানদের মধ্যে একজন বন্ধু রয়েছেন আমার। তিনি আমাকে তার মৃত্যুর সময় কিছুটা পিছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আপনার কাছে সুপারিশ করতে বলেছেন। মৃত্যুর ফেরেশতা বললো, এরকম করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমি কেবল তাঁর মৃত্যুলগ্নের কথা পূর্বাহ্নে জানিয়ে দিতে পারি। এতে করে তিনি মৃত্যুর জন্য যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবেন। একথা বলে মৃত্যুর ফেরেশতা তার দপ্তর খুলে বসলো। তারপর বললো, আপনি এমন এক লোকের কথা বলছেন, যার মৃত্যুর কোনো তারিখ আমার দপ্তরে নেই। তার মৃত্যু পৃথিবীতে হবে না। হবে আকাশে। সুতরাং আপনি গিয়ে দেখুন, তিনি আর জীবিত নেই। সূর্যের ফেরেশতা তখন হজরত ইদ্রিসের নিকটে গিয়ে দেখলো, সত্যিই তিনি মৃত।

ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, আকাশে হজরত ইদ্রিস জীবিত অবস্থায় রয়েছেন না মৃত অবস্থায় — সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্নরকম মন্তব্য করেছেন। একদল বলেছেন, তিনি আকাশে জীবিত অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর মতো মৃত্যুহীন জীবনপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন চারজন। তন্মধ্যে দু'জন রয়েছেন আকাশে এবং অবশিষ্ট দু'জন রয়েছেন পৃথিবীতে। আকাশের অমর নবীদ্বয়ের নাম হজরত ইদ্রিস ও হজরত ঈসা। আর পৃথিবীর অমর নবীযুগল হচ্ছেন হজরত খিজির ও হজরত ইলিয়াস। ওয়াহাব আরো বলেছেন, হজরত ইদ্রিস ছিলেন অত্যধিক ইবাদত গুজার। তখনকার বিশ্বাসীগণের সম্মিলিত ইবাদতের সমান ইবাদত করতেন তিনি একাই। ফেরেশতারা একথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলো। কৌতূহলী হয়ে আল্লাহ্র অনুমতি সাপেক্ষে মৃত্যুর ফেরেশতা হজরত ইদ্রিসের সঙ্গে সাক্ষাত করলো। হজরত ইদ্রিস নিয়মিত রোজা রাখতেন। তাই ইফতারের সময় তিনি মানবরূপী ফেরেশতা মেহমানকে যথারীতি ইফতার করতে বললেন। কিন্তু মেহমান তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলো না। পরপর তিনদিন এরকম ঘটলো। শেষে হজরত ইদ্রিস জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রিয় অতিথি! আপনার পরিচয় দিন। সে বললো, আমি

মৃত্যুর ফেরেশতা। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমি আপনার সঙ্গলাভের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত। হজরত ইদ্রিস বললেন, তবে আমার একটি কাজ করে দিন। অতিথি বললো, কি কাজ? হজরত ইদ্রিস বললেন, আমার প্রাণ হরণ করুন। আল্লাহ্‌র হুকুমে মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁর জান কবজ করলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আল্লাহ্‌র হুকুমে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠলেন। অতিথি বললো, এরকম ঘটলো কেনো? হজরত ইদ্রিস বললেন, আমি মৃত্যুর আস্বাদ পেতে চেয়েছিলাম। মৃত্যুবরণ করা আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। আল্লাহ্ আমার ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। এখন আমি যথাসময়ে মৃত্যুবরণ করার যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবো। কারণ মৃত্যুর স্মৃতি আমার স্মরণপটে থাকবে সদা জাগরূক। এখন আপনি আরো একটি কাজ করে দিন আমার। আমাকে নিয়ে চলুন আকাশে। দেখিয়ে দিন বেহেশত ও দোজখ। মৃত্যুর ফেরেশতা এবারও অনুমতি পেলো। হজরত ইদ্রিসকে নিয়ে প্রথমে গেলো দোজখের দ্বারপ্রান্তে। হজরত ইদ্রিস বললেন, দোজখের প্রধান প্রহরীকে বলে দরজা খোলার ব্যবস্থা করুন। তাই করা হলো। হজরত ইদ্রিস ভালো করে দেখে নিলেন দোজখের অভ্যন্তর ভাগ। তারপর বললেন, দোজখ তো দেখা হলো। এবার আমাকে নিয়ে চলুন বেহেশতে। মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁকে নিয়ে উপস্থিত হলো বেহেশতে। আল্লাহ্‌র নির্দেশে ও তাঁর অনুরোধে বেহেশতের দরজাও খুলে দেয়া হলো। হজরত ইদ্রিস ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন, বেহেশতের অপরূপ রূপ। মৃত্যুর ফেরেশতা বললো, এবার ফিরে চলুন। হজরত ইদ্রিস একটি বৃক্ষের ডাল আঁকড়ে ধরে বললেন, আমি এখান থেকে কোথাও যাবো না। আল্লাহ্‌র নির্দেশে তখন সেখানে উপস্থিত হলো আর একজন ফেরেশতা। বললো, আপনি ফিরে যেতে রাজি হচ্ছেন না কেনো? হজরত ইদ্রিস বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন, সকলকেই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমি তা আস্বাদন করেছি। আল্লাহ্ আরো বলেছেন, সকলকেই দেখানো হবে দোজখ। তা-ও অবলোকন করেছি আমি। একথাও তিনি বলেছেন, বেহেশতে প্রবেশকারীরা আর কখনো বহিষ্কৃত হবে না। আমি তো সেই জান্নাতেই প্রবেশ করেছি। সুতরাং আমি এখান থেকে বের হবো কেনো? আল্লাহ্ তখন মৃত্যুর ফেরেশতাকে জানালেন, আমার অনুমতিক্রমেই তো সে বেহেশতে প্রবেশ করেছে। সেখান থেকে বের হতে হলে আমার অনুমতিক্রমেই তা হবে। তোমাদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আর কোনো চেষ্টা কোরো না। এভাবেই হজরত ইদ্রিস লাভ করেছেন এক ব্যতিক্রমী উচ্চ মর্যাদা। তাঁর ওই মর্যাদার কথাই বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

এর পরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— নবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেছেন, এরাই তারা, আদমের ও যাদেরকে তিনি নুহের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলেন তাদের বংশভূত, ইব্রাহিম ও ইসমাইলের বংশভূত ও যাদেরকে তিনি পথ-নির্দেশ করেছিলেন ও মনোনীত করেছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত।' এখানে উলায়িকা (যাদেরকে) বলে বোঝানো হয়েছে হজরত ইদ্রিস থেকে হজরত জাকারিয়া পর্যন্ত প্রেরিত নবীগণকে। আর এখানকার 'পুরস্কৃত করেছেন' কথাটির অর্থ দান করেছেন দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। 'আদমের বংশভূত' বলে এখানে বোঝানো হয়েছে হজরত ইদ্রিসের মতো সৌভাগ্যবান নবীগণকে। আর নুহের সঙ্গে নৌকায় আরোহীগণ বলে এখানে বোঝানো হয়েছে তাঁর বংশভূত হজরত ইব্রাহিম, হজরত ইসমাইল প্রমুখ নবীগণকে। আর 'ইব্রাহিম ও ইসমাইলের বংশভূত' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত ইসমাইল, হজরত ইসহাক ও তাঁদের বংশীয় নবীগণকে। উল্লেখ্য যে, ইসরাইল বা ইয়াকুবের বংশভূত নবীগণের মধ্যে ছিলেন হজরত মুসা, হজরত হারুন, হজরত জাকারিয়া, হজরত ইয়াহ্ইয়া, হজরত ঈসা প্রমুখ। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, কন্যাসন্তানও বংশভূতদের অন্তর্ভুক্ত। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মিন্ জুররিয়্যাতি' কথাটি। 'ওয়াজ্তাবাইনা' (মনোনীত করেছিলাম) কথাটির অর্থ— তাঁদেরকে মনোনীত করেছিলেন নবুয়তের পদমর্যাদা প্রদানের জন্য এবং পথ-নির্দেশ করবার জন্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্ত হলে তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়তো ও ক্রন্দন করতো।' উল্লেখ্য যে, এটাই হচ্ছে অভিজাত, উচ্চমর্যাদাবিশিষ্ট ও আল্লাহ্র বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের স্বভাববৈশিষ্ট্য। এখানে 'সুজ্জাদান' শব্দটি 'সাজিদ' এর বহুবচন। আর 'বুকিয়্যান' শব্দটি 'বাকী' এর বহুবচন। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়িয়েছে— ওই সকল আল্লাহ্র মনোনীত ও প্রিয়ভাজন নবী রসুলগণ পরম করুণাপরবশ আল্লাহ্র কথামৃত শুনতে পেলে আল্লাহ্র রহমতের আশায় সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে ক্রন্দন করতেন।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে ইবনে মাজা, ইসহাক, ইবনে রহ্ওয়াইহ্ ও বায্যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, কোরআন পড়ো এবং কাঁদো। কান্না না এলে কান্নার ভান করো।

নির্দেশনাঃ এই আয়াত যাঁরা আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সেজদা করে নিবেন।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ○ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ○ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدَ
الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ○ لَا يَسْمَعُوْنَ
فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ۚ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ○ تِلْكَ
الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ○

❒ উহাদিগের পরে আসিল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তাহারা সালাত নষ্ট করিল ও লালসা-পরবশ হইল। সুতরাং উহারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে।

❒ কিন্তু উহারা নহে যাহারা তওবা করিয়াছে, বিশ্বাস করিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে। উহারা তো জান্নাতে প্রবেশ করিবে। উহাদিগের প্রতি কোন জুলুম করা হইবে না।

❒ ইহা স্থায়ী জান্নাত, অদৃশ্য বিষয়; যাহার প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁহার দাসদিগকে দিয়াছেন। তাঁহার প্রতিশ্রুত বিষয় আসিয়াই থাকে।

❒ সেথায় তাহারা শান্তি ব্যতীত কোন অসার বাক্য শুনিবে না এবং সেথায় সকাল-সন্ধ্যা তাহাদিগের জন্য থাকিবে জীবনোপকরণ।

❒ এই-ই জান্নাত, যাহার অধিকারী করিব আমার দাসদিগের মধ্যে সাবধানীদিগকে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা সালাত নষ্ট করলো ও লালসাপরবশ হলো।' একথার অর্থ— ওই সকল নবী-রসুলগণের মহাপ্রস্থানের পর তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হলো অযোগ্য ও অপদার্থরা। তারা ছেড়ে দিলো নামাজ এবং হয়ে উঠলো লালসাপরায়ণ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তারা নামাজকে করতো বিলম্বিত। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, তারা জোহরের নামাজ আদায় করতো আসরের সময় এবং আসরের নামাজ আদায় করতো সন্ধ্যায়। আমি বলি, মাকরূহ

বা নিন্দিত পদ্ধতিতে নামাজ পাঠ করা এবং নামাজের আদব ও সুন্নতসমূহকে পরিত্যাগ করাও নামাজ নষ্ট করার সামিল। মোট কথা, তারা আল্লাহ্র আনুগত্যের অবমাননা করে অনুসারী হয়ে পড়েছিলো তাদের অপপ্রবৃত্তির ।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।' এখানে 'গাই' অর্থ নিক্ষেপ করা। বাগবী লিখেছেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ বলেছেন, জাহান্নামের একটি ভয়াবহ উপত্যকার নাম 'গাই'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই ভয়ংকর উপত্যকা থেকে জাহান্নাম নিজেই পরিত্রাণ প্রার্থনা করে। ওই উপত্যকাটি প্রস্তুত রাখা হয়েছে ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, সুদ ভক্ষণকারী, সুদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শনকারী, পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য ও মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানকারীদের জন্য। সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মারদুবিয়া। বাগবী লিখেছেন, আতা বলেছেন, 'গাই' হচ্ছে জাহান্নামের একটি উপত্যকা । যেখানে পানির পরিবর্তে প্রবাহিত হয় পুঁজ ও রক্তের স্রোত। হজরত কা'ব বলেছেন, জাহান্নামের এক প্রজ্জ্বলিত প্রান্তরে অবস্থিত একটি গভীর গহ্বরের নাম 'গাই'। একটি ভয়ংকর কূপও রয়েছে সেখানে। কূপটির নাম বাহীম। জাহান্নামের আগুন যখন কিছুটা নিস্তেজ হয়, তখন উন্মুক্ত করা হয় ওই কূপের মুখ। ফলে, সঙ্গে সঙ্গে জাহান্নাম হয়ে যায় পূর্ববৎ উত্তপ্ত ও জ্বলন্ত। বাগবী আরো লিখেছেন, জাকারিয়া বিন আবু মরিয়ম খাজায়ীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু উমামা বাহেলী বলেছেন, দোজখের তটদেশ থেকে তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছতে বিশালাকৃতির বোঝাবিশিষ্ট স্থূলকায় দশটি উটের সমপরিমাণ ওজনবিশিষ্ট একটি পাথরের পতনের সময় লাগে সত্তর বছর। একথা শুনে আবদুর রহমান বিন খালেদ বিন ওলিদের এক মুক্ত ক্রীতদাস জিজ্ঞেস করলেন, এর নিচেও কি কিছু রয়েছে? হজরত আবু উমামা বললেন, হ্যাঁ। সর্বনিম্নে রয়েছে 'গাই' এবং 'আছাম'।

বিভিন্ন সূত্রে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, সাঈদ ইবনে মনসুর, হান্নাদ, ফারইয়ানী, হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'গাই' হচ্ছে দোজখের একটি উপত্যকা অথবা একটি নহরের নাম। এক বর্ণনায় এসেছে, ওই উপত্যকা অতীব গভীর ও বিস্বাদময়। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, দোজখের এক অত্যুষ্ণ নহরের নাম 'গাই'। প্রবৃত্তিপূজককে নিক্ষেপ করা হবে সেখানে।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা বিন আজীব বলেছেন, গাই নরকের একটি গভীর ও দুর্গন্ধময় উপত্যকা। সুপরিণত সূত্রে হজরত বারা বিন আজীব থেকে তিবরানী ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দশ আউকিয়া ওজনের একটি পাথর দোজখের পাড় থেকে দোজখাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করা হলে সত্তর বছরেও ওই পাথর তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছবে না। তলদেশের নিচে

আবার রয়েছে 'গাই' ও 'আছাম'। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! 'গাই' ও 'আছাম' আবার কী? তিনি স. বললেন, জাহান্নামের অতলে অবস্থিত দু'টি নদী, যার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে নরকবাসীদের পুঁজ ও রক্ত। ওই নদীকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'গাই'। আর 'আছামা'র কথা অন্য এক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— 'মাঁই ইয়াফআ'ল জালিকা ইয়ালক্বা আছামা।'

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'গাই' এর শাব্দিক অর্থ—পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহী। এরকম অর্থ করলে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তারা হারিয়ে ফেলবে জান্নাতের পথ। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, পুণ্যবানদেরকে বলা হয় 'রাশাদ' এবং পাপিষ্ঠদেরকে বলা হয় 'গাই'। তাই জুহাক আলোচ্য বাক্যটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, 'গাই' অর্থ ধ্বংস। কেউ কেউ বলেছেন, ব্যর্থতা। সবগুলো অর্থই মন্দ। কোনো কোনো বিদ্বান আবার এখানকার মুজাফ (সম্বন্ধ পদ) কে উহ্য মনে করেন এবং বলেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণে পরকালে তারা পাবে তাদের কুকর্মের যথোপযুক্ত শাস্তি।

পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা নয়, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে। তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।' একথার অর্থ— যারা নামাজ বিনষ্ট করা এবং পৃথিবীর প্রতি লোভাতুর হওয়ার অপরাধ থেকে বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করবে, অবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে স্থিত হবে বিশুদ্ধ বিশ্বাসে এবং ওই বিশ্বাসানুসারে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করবে, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে। আর তাদের অধিকারও খর্ব করা হবে না। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিশুদ্ধ তওবা সহকারে ইমান আনলে পূর্বের পাপ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। রসুল স. বলেছেন, ইসলাম অতীতের পাপ বিলুপ্ত করে দেয়। হজরত আমর ইবনে আস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

আয়াতের শুরুতে 'কিন্তু তারা নয়'— এরকম উল্লেখ থাকার কারণে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, শাস্তি হবে কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপিষ্ঠদের জন্য। তওবাকারী ও ইমান আনয়নকারীদের জন্য রয়েছে কেবল জান্নাতের শুভ সমাচার। আমি বলি, কেবল ইমান আনয়নকারীদেরকে এখানে শাস্তি থেকে পৃথক করা হয়নি। পৃথক করা হয়েছে ইমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকে। তাই বলা হয়েছে, 'বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে'। অতএব পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত শাস্তি আপতিত হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে। সেই সঙ্গে পাপিষ্ঠ বিশ্বাসীদের উপরেও। ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে তাই বলা হয়েছে দোজখের 'গাই' নামক গহ্বরে নিপতিত হবে ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী ইত্যাদি কবীরা গোনাহকারীরা।'

এর পরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— এটা স্থায়ী জান্নাত; অদৃশ্য বিষয়; যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁর দাসদেরকে দিয়েছেন।' এখানে 'আদন্' শব্দটি একটি মূল শব্দ। এর অর্থ অবস্থান বা অবস্থিতি। অথবা এটি একটি জান্নাতের নাম। কিংবা জান্নাতের একটি বিশেষ অংশ। 'অদৃশ্য বিষয়' বলে এখানে অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় এসেই থাকে।' এখানে 'মাতিয়্যা' শব্দটি ইসমে জরফ (অধিকরণ কারক)। এভাবে উদ্ধৃত বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়— যারা জান্নাত-গমনের যোগ্য, তারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অথবা 'মাতিয়্যা' কথাটি এখানে কর্মকারক। কিন্তু কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। উদ্ধৃত অর্থ দু'টোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন আরবী পরিভাষায় বলা হয়— আমার উপর পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হয়েছে এবং আমি পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেছি। দু'টো বাক্যই সমার্থক।

এর পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা শান্তি ব্যতীত কোনো অসার বাক্য শুনবে না।' একথার অর্থ বেহেশতবাসীরা কোনো অসুন্দর ও চটুল কথা শুনবে না। শুনবে কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে শান্তি সম্ভাষণ। অথবা তারা শুনবে কেবল ওই সকল বচন, যা দোষক্রটি মুক্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সেখানে সকাল সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ।' অর্থাৎ সেখানকার পানাহার হবে অতীব আনন্দদায়ক। হাসান বসরী বলেছেন, সকাল সন্ধ্যায় পর্যাপ্ত আহারের আয়োজন দেখলে আরববাসীরা অত্যধিক আনন্দিত হয়। তাই এখানে বলা হয়েছে— সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ। সাঈদ ইবনে মনসুর এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস এ প্রসঙ্গে বলেছেন, দুনিয়ায় যেমন পানাহারের সামগ্রী পাওয়া যায়, সেখানেও তেমনি পাওয়া যাবে। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, জুহাক বলেছেন, রাত দিনের প্রয়োজনীয় পানাহারের সামগ্রী তারা সেখানে পাবে। ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে ওলীদ বিন মুসলিম বলেছেন, আমি জুহায়ের ইবনে মোহাম্মদের নিকটে এই বাক্যটির ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলাম। তিনি জবাবে বলেছিলেন, সেখানকার পরিবেশ তো হবে সতত জ্যোতির্ময়। রাত দিন অনুভূত হবে পর্দা ফেলে দেয়া ও অপসারণের কারণে।

হজরত আবু কেলাবাহ্ ও হজরত হাসান থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! বেহেশতে রাত আসবে কীভাবে? তিনি স. বললেন, সেখানে তো থাকবে কেবল নূর। তাই সকাল সন্ধ্যা হয়ে যাবে একাকার। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কেবল নামাজের সময়গুলোতে হাজির করা হবে বিস্ময়কর উপঢৌকন। আর ফেরেশতারাও জানাতে থাকবে শান্তি-সম্ভাষণ।

এর পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'এই-ই জান্নাত, যার অধিকারী করবো আমার দাসদের মধ্যে সাবধানীদেরকে।' এখানে 'নুরিছু' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, জান্নাত হচ্ছে তাক্বওয়া বা সাবধানতার ফসল। আর পরলোকগত ব্যক্তিদের উত্তর পুরুষেরা যেভাবে তাদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে তেমনি জান্নাতের স্বাভাবিক অধিকার লাভ করবে মুত্তাক্বীরা।

এখানে মুত্তাক্বীগণকে বেহেশতের সরাসরি মালিক না বলে 'উত্তরাধিকারী' বলার কারণ এই যে, উত্তরাধিকারিত্ব একটি শক্তিশালী ও অনড় মালিকানা। মৃতব্যক্তি নিজেও সে মালিকানা ফিরিয়ে নিতে পারে না। পৃথিবীর কোনো মানুষ এবং কোনো বিধানও পারে না উত্তরাধিকারীর অধিকার ক্ষুণ্ন করতে। তাকে অধিকারচ্যুত করা কোনোক্রমে ও কখনোই সম্ভব নয়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বেহেশতবাসীদের বেহেশতের কোনো কোনো অংশের মালিকানা হবে উত্তরাধিকার সদৃশ। ওই অংশগুলোর মালিক হতো দোজখবাসীরা, যদি তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী না হতো। দোজখ গমনের কারণে ওই সকল অংশের মালিক হবে জান্নাতীরা। তাই এখানে উত্থাপিত হয়েছে উত্তরাধিকারিত্বের প্রসঙ্গ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মাজা ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত যথাসূত্রসম্বলিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের বাসস্থান হবে দু'টি। একটি জান্নাতে, আর একটি জাহান্নামে। যে দোজখে যায়, তার জান্নাতের বাসস্থানের মালিক হয় কোনো এক জান্নাতী। অন্য এক আয়াতেও একথা ধ্বনিত হয়েছে এভাবে— 'উলায়িকা হুমুল ওয়ারিছুন'।

হজরত আনাস থেকে ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, উত্তরাধিকারিত্বের হক যে নষ্ট করবে, তার জান্নাতের কিছু অংশ আল্লাহ্ দিয়ে দিবেন ওই বঞ্চিত ব্যক্তিকে।

একবার রসুল স. হজরত জিবরাইলের প্রতি অনুযোগ উত্থাপন করে বললেন, ভ্রাতা জিবরাইল! আপনি নিয়মিত আসেন না কেনো? তাঁর এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ۝

❒ জিবরাইল বলিল, 'আমি তোমার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না; যাহা আমাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে ও যাহা এই দুই-এর অন্তর্বর্তী তাহা তাঁহারই এবং তোমার প্রতিপালক ভুলিবার নহেন।'

❒ তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবীর ও তাহাদিগের অন্তর্বর্তী যাহা কিছু, তাহার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহার ইবাদতে ধৈর্যশীল হও। তুমি কি তাঁহার সমগুণসম্পন্ন কাহাকেও জান?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'জিবরাইল বললো, আমি তোমার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না'। কিছু কিছু করে থেমে থেমে অবতীর্ণ হওয়াকে বলে 'তানায্‌যুলু'। বাবে তাফায়্‌যুলের রীতিতে কথাটির অর্থ কেবল অবতরণ (নুযুল)ও হয়। আর 'তানযীলুন' অর্থ অল্প অল্প করে অবতরণ। সুতরাং 'তানায্‌যালু' কথাটির অর্থ হবে বিরতি সহকারে অবতরণ। আবার কখনো কখনো 'তানযীলুন' শব্দটির অর্থ হয় কেবলই অবতরণ। এখানেও তাই 'তানায্‌যালু' এর শব্দার্থ করা হয়েছে— অবতরণ।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, একবার হজরত জিবরাইল রসুল স. সকাশে আবির্ভূত হয়েছিলেন চল্লিশ দিন পর। হজরত আনাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স.কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! কোন্ স্থান আল্লাহ্‌র সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং কোন স্থান সর্বাপেক্ষা অপ্রিয়? তিনি স. বললেন, জানি না। জিবরাইলের কাছ থেকে জেনে নিয়ে জানাবো। কিন্তু হজরত জিবরাইল আসতে দেরী করলেন অনেক। বিলম্বিত আবির্ভাবের কারণে তিনি স. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার দেরী দেখে ভাবছিলাম, আল্লাহ্ হয়তো আমার প্রতি বিরাগভাজন হয়েছেন। হজরত জিবরাইল তখন বললেন, আমি আপনার প্রভুপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না।

আবু নাঈম তাঁর দালায়েল পুস্তকে এবং ইবনে ইসহাক হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ করেছেন, কুরায়েশ গোত্রপতিরা একবার রসুল স.কে আসহাবে কাহফ, জুলকারনাইন ও রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে বসলো। রসুল স. বললেন, তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবো আমি আগামীকাল। তিনি স. ভেবেছিলেন, ইতোমধ্যে হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হবেন। তখন তাঁর কাছ থেকে প্রশ্নগুলোর জবাব জেনে নেয়া যাবে। কিন্তু পনেরো দিন পর্যন্ত হজরত জিবরাইল এলেন না। তারপর তিনি আবির্ভূত হতেই রসুল স. বিলম্বিত আগমনের হেতু জানতে চাইলেন তাঁর নিকটে ।

বাগবী লিখেছেন, জুহাক, ইকরামা, মুকাতিল, ও কালাবী বলেছেন, যখন মক্কাবাসীরা রসুল স. সকাশে আসহাবে কাহফ, জুলকারনাইন ও রূহ সম্পর্কে জানতে চাইলো, তখন তিনি স. বললেন, আগামীকাল আমি তোমাদেরকে এ সম্পর্কে জ্ঞাত করবো। একথা বলার সময় তিনি স. ইনশাআল্লাহ্ (আল্লাহ্ যদি চান) উচ্চারণ করলেন না। ফলে দীর্ঘকাল যাবত হজরত জিবরাইলের আগমন ঘটলো না। রসুল স. দিনাতিপাত করতে লাগলেন বিষণ্নচিত্তে। দীর্ঘ বিরতির পর তিনি এলে রসুল স. বললেন, দীর্ঘ বিরতি দেখে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। এতো বিলম্ব করলেন কেনো? হজরত জিবরাইল বললেন, ভ্রাতা মোহাম্মদ! আমিও ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম আপনার সন্দর্শনাকাংখায়। কিন্তু আল্লাহ্র আদেশ ব্যতীত আমি তো আগমন করতে পারি না। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত এবং সুরা 'ওয়াদ্দোহা'র এই আয়াতগুলো— 'প্রত্যুষের শপথ! শপথ নিশীথের, যখন তার অন্ধকার প্রগাঢ় হয়— আপনার প্রভুপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।'

এরপর বলা হয়েছে— 'যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে ও যা এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী তা তাঁরই এবং তোমার প্রতিপালক ভুলবার নন।' এখানে 'যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে অতীত ও ভবিষ্যতের সকল কিছুকে। 'মা খলাক্বনা' কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে অতীতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও বিবর্তিত কার্যাবলী। আর 'মা বাইনা জালিকা' (এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী) বলে বুঝানো হয়েছে সমসাময়িকতাকে, বর্তমানের বিষয়াবলীকে। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, 'মা বাইনা আইদীনা' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মৃত্তিকাকে, যখন আমরা তার উপরে অবতরণ করতে চাই। আর 'খলাক্বনা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে আকাশকে, যখন আমরা সেখান থেকে অবতরণের ইচ্ছা করি ও অবতরণ করি। আর 'মা বাইনা জালিকা' কথাটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে মধ্যবর্তী শূন্যতা ও বিস্তৃতিকে।

'তোমার প্রভুপালক ভুলবার নয়' কথাটির অর্থ এখানে এরকম— আপনার প্রভুপালক আপনার কথা ভুলে যাবেন, প্রত্যাদেশ প্রেরণ করবেন না, আমাকে আপনার নিকট পাঠাবেন না— এই চিন্তাগুলো ঠিক নয়। বরং আমাকে বিলম্বে প্রেরণের মধ্যেও রয়েছে তাঁর অপার প্রজ্ঞাময়তার এক বিশিষ্ট নিদর্শন। তিনিই সর্ববিষয়ের সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক পরিজ্ঞাতা।

পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবীর ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে, তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল হও।' আল্লাহ্ যে বিস্মৃতিপ্রবণতা থেকে পবিত্র সেকথার প্রমাণ হিসেবেই এখানে বলা হয়েছে আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর একক ও অংশীবিহীন প্রভুপালকত্বের কথা। অর্থাৎ যিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রভুপালনকর্তা, তিনি নিশ্চয় কখনোই ভুলবার নন। আর এখানে 'ফা'বুদ্হু ' ও 'ওয়াস্‌ত্বাবির' কথা দু'টোর মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। এভাবে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তো জানলেন, আপনার উপরে আপনার প্রভুপালকের রহমত ও বরকত কত অবাধ, অপার, অন্তহীন। সুতরাং কিছুতেই তিনি আপনার কথা ভুলতে পারেন না। এরকম বিস্মৃতি তাঁর মহান ও অতুলনীয় মর্যাদার অনুকূল নয়। সুতরাং আপনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে পরিপূর্ণ নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে তাঁর ইবাদতে মনোনিবেশ করুন। প্রত্যাদেশ আগমনে বিলম্ব হওয়ার কারণে চিন্তাক্লিষ্ট হবেন না। ভ্রূক্ষেপ করবেন না অংশীবাদীদের কটূ বাক্যের প্রতি।

'সবরুন' শব্দের পরে 'আলা' ব্যবহৃত হওয়াই আরবী ভাষার রীতি। কিন্তু এখানে 'ইসত্বাবির' কথাটির পর এসেছে 'লাম'। এরূপ শব্দ ব্যবহারের মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে— হে আমার রসুল! আপনি ইবাদত সম্পাদন করুন অনুরাগরঞ্জিত ও আস্বাদ্যরূপে, বিষাদায়িত বা চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে নয়। এ কারণেই রসুল স. এর ইবাদত ছিলো আস্বাদায়িত, প্রমিত, নমিত ও শান্তিদায়ক। তিনি স. স্বয়ং বলেছেন, নামাজকে করে দেয়া হয়েছে আমার চোখের শান্তি। অথবা বক্তব্যটির মর্মার্থ হতে পারে এরকম— হে আমার রসুল! ওই সকল অংশীবাদীদের বিদ্রূপ ও উপহাসকে আপনি উপেক্ষা করুন, সর্বাবস্থায় থাকুন ধৈর্যশীল ও অচঞ্চল, যেনো আপনার ইবাদতের নিমগ্নতা থাকে অটুট। এমতাবস্থায় এখানকার 'লি ইবাদাতিহী' কথাটির প্রথম অক্ষর লাম হবে লামে আজলিয়াহ্ (হেতুবাচক)।

শেষে বলা হয়েছে— 'তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকে জানো?' হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'সামিয়্যান' কথাটির অর্থ করেছেন এমন উপমেয় যা উপাস্য বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। কালাবী বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ

হবে— হে আমার রসুল! আপনি কি আল্লাহ্ ছাড়া এমন কাউকে পেয়েছেন, যার নাম আল্লাহ্। অংশীবাদীরা তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোকে বলতো মাবুদ বা উপাস্য। আল্লাহ্তায়ালার সত্তা ও গুণাবলী তাদের উপরে আরোপ করতো না। কারণ জড়প্রতিমা কখনোই আল্লাহ্র সমান্তরাল কোনো সত্তা বা গুণাবলী বিশিষ্ট নয়। তাই আল্লাহ্কে তারা আল্লাহ্ই বলতো। কিন্তু আল্লাহ্র ইবাদতে অংশপ্রদান করতো তাদের দেব-দেবীদের। তাই আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলকে এই নির্দেশনা দিয়েছেন যে, হে আমার রসুল! তারা যখন আল্লাহ্র সমান্তরাল হিসেবে কাউকে দাঁড় করাতে পারে না, তখন আপনি তাদের কথার মূল্য দিবেন কেনো? তারা যা কিছু বলুক, আপনি নিমগ্ন থাকুন আপনার ইবাদতে।

সূরা মার্‌য়াম ঃ আয়াত ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০

وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۝ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝

❐ মানুষ বলে, 'আমার মৃত্যু হইলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হইব।'

❐ মানুষ কি স্মরণ করে না যে আমি তাহাকে পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি যখন সে কিছু ছিল না?

❐ সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি তো উহাদিগকে শয়তানগণসহ একত্রে সমবেত করিবই ও পরে নতজানু অবস্থায় আমি উহাদিগকে জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করিবই।

❐ অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাহাকে টানিয়া বাহির করিবই।

❐ এবং আমি তো উহাদিগের মধ্যে যাহারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাহাদিগের বিষয় ভাল জানি।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী মানুষেরা বলে, আমরা আবার মৃত্যুর পর আপনাপন সমাধি থেকে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়ে সমুত্থিত হবো নাকি? মরার পর কেউ কি আবার জীবিত হয়?

এখানে 'মানুষ' (আল ইনসান) অর্থ মনুষ্য জাতি (আলিফ লাম জিনসী)। অথবা কোনো নির্দিষ্ট মানুষ (আলিফ লাম আহ্‌দি)। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'আল ইনসান' বলে বুঝানো হয়েছে উবাই ইবনে খালফ জামুহীকে। সে ছিলো কিয়ামতে অবিশ্বাসী। এক বর্ণনায় এসেছে, সে একবার একটি শুষ্ক অস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বললো, মোহাম্মদ বলে, মানুষ মরার পর আবার জীবিত হয়ে উঠবে। আমিও কি তবে মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে উঠবো? তার বক্তব্যটিই আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে।

এখানে 'উখরাজু' অর্থ পুনরুত্থিত হবো। 'হাইয়্যা' অর্থ জীবিত অবস্থায়। আর এখানে 'লাসাওফা' কথাটি বসানো হয়েছে কেবল গুরুত্ব প্রকাশার্থে। বর্তমান কাল বা অবস্থা বুঝানো এখানে উদ্দেশ্য নয়।

পরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছু ছিলো না।' একথার অর্থ— ওই সকল মানুষ একথা বোঝে না কেনো যে, তাদের তো একসময় কোনো প্রকার অস্তিত্বই ছিলো না। অস্তিত্ব প্রদান তো অসম্ভব ও অচিন্তনীয় একটি বিষয়। সেই অস্তিত্ব যিনি দিতে পারেন, তিনি কি অস্তিত্বপ্রাপ্ত কোনো কিছুর রূপান্তর ঘটাতে পারবেন না? জীবন দেয়ার পর তিনি যে জীবনকে মৃত্যুতে রূপান্তরিত করেছেন, সেই মৃত্যুকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না? কেনো পারবেন না? দ্বিতীয় সৃষ্টি তো প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা সহজতর।

এর পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে—'সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি তো তাদেরকে শয়তানদেরসহ সমবেত করবোই ও পরে নতজানু অবস্থায় আমি তাদেরকে জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবোই।'

এখানে 'ওয়াশ্ শাইয়াত্বীনা' কথাটি মাফউলে মায়াহু (সহ কর্মপদ) এবং কথাটি এখানে সম্মিলিত হয়েছে 'হুম' (তাদেরকে) সর্বনামটির সঙ্গে। বাগবী লিখেছেন, পুনরুত্থানের সময় প্রত্যেক কাফেরকে এক একটি শয়তানের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হবে। এভাবে তাদেরকে উপস্থিত করা হবে হাশরের প্রান্তরে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'জিছিয়্যা' অর্থ দলে দলে। শব্দটি 'জাছওয়াহ্' এর বহুবচন। হাসান ও জুহাক বলেছেন, 'জাছ' এর বহুবচন 'জাছিয়্যা'। এর অর্থ নতজানু হয়ে, হাঁটুর উপরে দণ্ডায়মান অবস্থায়। সুদ্দী অর্থ করেছেন— সংকীর্ণ স্থানের কারণে হাঁটুর উপর দাঁড় করিয়ে।

আমি বলি, সেদিন ভালো-মন্দ সকলকেই জাহান্নামের চতুর্দিকে একত্রিত করা হবে। পুণ্যবানদেরকে এভাবে জাহান্নাম দর্শন করানো হবে এই উদ্দেশ্যে যেনো তারা বুঝতে পারে কত ভয়ংকর শাস্তি থেকে আল্লাহ্ তাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। আবার পাপিষ্ঠদের দেখানো হবে তাদের আক্ষেপ ও দুঃখকে আরো বেশী বাড়িয়ে দেয়ার জন্য। এরপর পুণ্যবানেরা সেখান থেকে চলে যাবে জান্নাতে। আর পাপিষ্ঠদেরকে ঠেলে ফেলে দেয়া হবে জাহান্নামের গভীরে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবেতাহ থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার বললেন, ওই দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসছে, তোমরা আল কারামে (দোজখের পাড়ে) নতজানু হয়ে বসে আছো। একথার পর বর্ণনাকারী পাঠ করলেন— 'এবং পরে নতজানু অবস্থায় আমি তাদেরকে দোজখের চতুর্দিকে উপস্থিত করবোই।'

শায়েখ ইবনে হাজার বলেছেন, হাদিসে উল্লেখিত 'আল কারাম' কথাটির অর্থ দোজখের উঁচু পাড় যেখানে সমবেত করা হবে উম্মতে মোহাম্মদীকে। আর এখানে 'ছুম্মা' (পরে) শব্দটি সন্নিবেশিত হওয়ার কারণে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হাশর প্রান্তরে সকলকে একত্র করার বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সকলকে সমবেত করা হবে দোজখের কিনারায়। কেননা ইতোপূর্বে হাশরের প্রান্তরে বিচারের অপেক্ষায় সবাইকে দাঁড়িয়ে কাটাতে হবে দীর্ঘকাল।

এর পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাকে টেনে বের করবোই।'

'কুল্লি শীআতিন' অর্থ প্রত্যেক দলের মধ্যে। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর উম্মতের মধ্য থেকে আমি অবাধ্যদেরকে পৃথক করে ফেলবো। শীআহ্ অর্থ সাহায্যকারী, অনুগামী। এই শব্দটি একবচন-বহুবচন, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ সকল ক্ষেত্রে একইরূপে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি সংকলিত হয়েছে 'শাআ' ইয়াশিউ' শব্দরূপ 'দ্বরাবা ইয়াদ্বরিবু' থেকে এভাবে— শাইআন শাইয়াআন— শুয়ুআন- মুশাআ'ন— 'শাইয়ূআ'তান। শাআ' অর্থ প্রসারিত, বিস্তৃত, প্রসিদ্ধ। কামুস গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। আমি বলি, 'মুত্তাবিয়ীনা' (অনুগামী) ও 'আনসার' (সাহায্যকারী) কে শীআ'হ্ বলার কারণ এই যে, শুয়ুউ এবং বিস্তৃত হওয়া এখানে হয়ে পড়ে অপরিহার্য। আর এরকম ছড়িয়ে পড়া অনুগামীদের কারণে তাদের অধিনায়ক হয় অধিকতর শক্তিমত্তার অধিকারী। 'শাআ'ল ক্বওম' অর্থ সম্প্রদায়ের লোকেরা ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ তাদের সংখ্যা হয়ে গিয়েছে বিপুল। 'শাইয়্যা'তুন নারা বিল হাত্বাব' অর্থ আমি আগুনে কাঠ ফেলে দিয়ে আগুনকে করে দিয়েছি অধিকতর তেজস্কর।

'ই'তিয়্যা' অর্থ অবাধ্য, অবাধ্যচারিতায় সীমাতিক্রম, অথবা আনুগত্যবিমুখ। এরকম অর্থ করা হয়েছে 'কামুস' নামক অভিধানে। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ইতিয়্যা' অর্থ এখানে দুঃসাহসী। মুজাহিদ বলেছেন, পাপাচারী।

এর পরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তো তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য, তাদের বিষয়ে ভালো জানি।' এখানে আয়াতের শুরুতে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি বসানোর কারণে প্রতীয়মান হয় যে, দোজখীদেরকে প্রথমে দোজখের চতুর্দিকে সমবেত করা হবে, তারপর সকল দলের মধ্য থেকে বাছাই করা হবে বড় বড় অপরাধীদেরকে। তারপর আল্লাহ্ নির্ধারণ করবেন কাকে কাকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে। প্রশ্ন জাগে, এ বিষয়ে যদি আল্লাহ্পাক পূর্বাহ্নে না জানেন তবে তাদেরকে তিনি দোজখের চতুর্দিকে একত্র করবেন কী করে? কেমন করেই বা নির্ধারণ করবেন বড় বড় অপরাধী আসলে কে? এর জবাবে বলা যায়— ১. 'ছুম্মা' শব্দটি এখানে কালবিভাজনের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যের অগ্র-পশ্চাৎ নির্ধারণের জন্য। অন্য আয়াতেও 'ছুম্মা' শব্দটি এমতো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— 'ছুম্মা কানা মিনাল্ লাজীনা আমানু'। অথবা ২. এখানে জানার অর্থ শাস্তি প্রদান করা। কেননা শাস্তিই তো হবে জানার পরিণতি। প্রকাশ থাকে যে, তাদের শাস্তিদান শুরু হবে দোজখের চতুর্দিকে তাদেরকে একত্র করার পরেই। আগে নয়। 'ছুম্মা' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থেই।

একটি প্রশ্নঃ আ'লামু' (আমি ভালো জানি) কথাটি এখানে ইসমে তাফজীল (তুলনামূলক বিশেষণ)। তাহলে কি কে দোজখে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য, তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানবে?

উত্তরঃ ১. এখানে 'আ'লামু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'আ'লীমুন' (আমি সর্বজ্ঞ) অর্থে। অর্থাৎ আমিই কেবল জানি কে দোজখে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য। ২. এরকমও হতে পারে যে, আমল লেখক ফেরেশতারাও এখানে উল্লেখিত 'জানি' কথাটির অন্তর্ভুক্ত। তারাও একথা অবগত, কে পাপী কে পুণ্যবান, কে সৌভাগ্যশালী কে হতভাগ্য। দোজখে প্রবেশের অধিকতর উপযুক্ত কে? কিন্তু আল্লাহ্র জ্ঞান অবশ্যই এরকম নয় । তিনি সকলের ও সকল কিছুর প্রকাশ্য গোপন অতীত-ভবিষ্যত সবকিছুই পরিজ্ঞাত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। আমল লেখক ফেরেশতা কেবল মানুষের প্রকাশ্য আচরণ ও অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। পূর্ণ, পরিণত ও সর্বত্রগামী জ্ঞানের অধিকারী তারা কিছুতেই নয়।

পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত 'মিন কুললি শীআতিন' (প্রত্যেক দলের মধ্যে) কথাটির মধ্যে যদি মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সকলকেই অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় তবে ওই আয়াতেরই 'আশাদ্দু' শব্দের মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হবে, আল্লাহ্

অধিকাংশ পাপী বিশ্বাসীকে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু বাগবী প্রমুখ 'কুললি শীআতিন' কথাটির মাধ্যমে কেবল কাফেরদেরকেই বুঝিয়েছেন। অবশ্য আয়াতের বক্তব্যপ্রবাহ একথাই নির্দেশ করে। এভাবে পূর্বের আয়াত ও এই আয়াতের মিলিত অর্থ দাঁড়াবে— আমি কাফেরদের প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে অপরাধের তারতম্যানুসারে তাদেরকে প্রথমে পৃথক করে ফেলবো, তারপর তাদেরকে একে একে নিক্ষেপ করবো দোজখে। প্রথমে নিক্ষেপ করবো বড় বড় অপরাধীদেরকে। পরে প্রবেশ করাবো অপেক্ষাকৃত কম পাপিষ্ঠদেরকে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, সকল মানুষের বিচার সম্পন্ন হওয়ার পর ধারাবাহিকভাবে প্রথমে বড় তারপর ছোট তারপর তদপেক্ষা ছোট পাপীদেরকে দোজখের জন্য বাছাই করা হবে। হান্নাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত আহওয়াসের উক্তিও প্রায় এরকম।

সূরা মার্‌য়াম ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩,

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا لِلَّذِينَ اٰمَنُوْٓا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّأَحْسَنُ نَدِيًّا ۝

❒ এবং তোমাদিগের প্রত্যেকেই উহা অতিক্রম করিবে; ইহা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।

❒ পরে আমি সাবধানীদিগকে উদ্ধার করিব এবং সীমালংঘনকারীদিগকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রাখিয়া দিব।

❒ উহাদিগের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্ত হইলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিশ্বাসীদিগকে বলে, 'দুই দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসাবে কোন্‌টি উত্তম?'

প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।' একথার অর্থ— এরপর দোজখের জন্য বাছাইকৃত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে অতি অবশ্যই দোজখে প্রবেশ করানো হবে। কারণ এটাই আল্লাহ্‌র অবধারিত সিদ্ধান্ত। এখানকার

'হাত্‌মা' শব্দটি একটি গুণবাচক মূল শব্দ। এভাবে এখানে সুস্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে যে, দোজখের উপযুক্তদেরকে দোজখে প্রবেশ করানোর বিষয়টিকে আল্লাহ্‌পাক তাঁর নিজের জন্য অনিবার্য করে নিয়েছেন। সুতরাং এর কোনো অন্যথা হবার নয়।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে — 'পরে আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করবো এবং সীমালংঘনকারীদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিবো। একথার অর্থ— প্রথমাবস্থায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে পাপী বিশ্বাসীদেরকেও দোজখে প্রবেশ করানো হবে। তারপর কিছুকাল শাস্তি দিয়ে অথবা না দিয়ে পাপী বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করা হবে সেখান থেকে। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও অংশীবাদী অবিশ্বাসীদেরকে কস্মিনকালেও উদ্ধার করা হবে না। ওই সকল সীমালংঘনকারীকে নতজানু অবস্থায় অনন্তকাল রাখা হবে দোজখের অভ্যন্তরে।

'জিছিয়্যা' অর্থ সবাইকে। অর্থাৎ দোজখের মধ্যে সকল সীমালংঘনকারীকে নতজানু অবস্থায় শাস্তি প্রদান করা হবে। পূর্ববর্তী আয়াতে (৭১) উল্লেখিত হয়েছে 'উরূদ' (অতিক্রম) শব্দটি। অর্থাৎ সকলকেই সেদিন পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে। পুলসিরাত হচ্ছে দোজখের উপরে স্থাপিত একটি সেতু।

পথভ্রষ্ট মারজিয়াহ্‌ সম্প্রদায় বলে, গোনাহ্‌ কখনোই ইমানের ক্ষতি করতে পারে না। তাই ইমানদারেরা পাপ করলেও কখনো দোজখে প্রবেশ করবে না। তারা আরো বলে, 'উরূদ' শব্দটির অর্থ অতিক্রম করা বা প্রবেশ করা নয়, দোজখের কিনারায় উপস্থিত হওয়া। কথাটির মাধ্যমে কেবল বলা হয়েছে দোজখ দর্শনের কথা। বিচারের দিনে পুণ্যবান ও পাপী সকলেই তো একস্থানে থাকবে। আর জাহান্নাম থাকবে বিচারস্থলের নিকটেই। তাই সকলেই তখন দোজখকে দেখতে পাবে। মারজিয়াহ্‌রা আরো বলে, দোজখে যারা প্রবেশ করবে, তারা আর কখনো সেখান থেকে বের হতে পারবে না। তাই পাপী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাসীদেরকে কখনোই দোজখে প্রবেশ করানো হবে না। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন— 'যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্বাহ্নে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে, তাদেরকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে, তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না' (সুরা আম্বিয়া)। সুতরাং হিসাবের স্থানে উপস্থিত করার পর সেখান থেকেই আল্লাহ্‌তায়ালা পুণ্যবান ও পাপী সকল বিশ্বাসীকে জান্নাত গমনের নির্দেশ দিবেন এবং অবিশ্বাসীদেরকে প্রবেশ করাবেন দোজখে। আর 'উরূদ' শব্দের অর্থ যে নিকটবর্তী হওয়া বা কিনারায় উপস্থিত হওয়া, সে সম্পর্কেও অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে। যেমন— 'ওয়া লাম্মা ওয়ারাদা মাআ মাদ্‌ইয়ান' (যখন মুসা মাদায়েনের কূপের নিকটে অবতরণ করলেন)। এখানে 'উরূদ' শব্দটির মাধ্যমে একথা বলা হয়নি যে, হজরত মুসা ওই কূপের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বরং বলা হয়েছে, তিনি

উপনীত হলেন ওই কূপের কিনারায়। রসুল স. এর পবিত্র বাণীতেও একথার সমর্থন রয়েছে। গ্রহণযোগ্য সূত্র পরম্পরায় হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে আহমদ, আবু ইয়ালী ও তিবরানী কর্তৃক উল্লেখিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় অধিনায়কের নির্দেশ ছাড়াই জেহাদের সময় মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রহরী নিযুক্ত হবে, সে স্বচক্ষে কখনো দোজখ দেখতে পাবে না। কিন্তু মারজিয়াহ্দের এই অভিমত গ্রহণ করলে যে আল্লাহ্পাককে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বলতে হয়। কিন্তু তা কি কখনো সম্ভব? 'ওয়া ইম্ মিনকুম ইল্লা ওয়ারিদুহা' (এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে) এই আয়াতে উচ্চারিত হয়েছে আল্লাহ্র শপথ। আর কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ এ বিষয়ে একমত যে, এই বাক্যটি একটি অঙ্গীকার প্রকাশক বাক্য। আর আল্লাহ্ কখনোই অঙ্গীকার ভঙ্গকারী নন।

মারজিয়াহ্দের ভ্রম অপনোদনঃ আমরা বলি নিঃসন্দেহে 'উরূদ' শব্দটির পরোক্ষ অর্থ ঝুঁকে যাওয়া, দেখা, প্রান্তদেশে পৌঁছে যাওয়া এবং উপস্থিত হওয়া। কিন্তু শব্দটির প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ প্রবেশ করা। বিশেষ কোনো অত্যাবশ্যক কারণ ছাড়া পরোক্ষ অর্থ গ্রহণীয় নয়। আর এখানে সেরকম কোনো কারণের অস্তিত্ব নেই। আর এখানকার বক্তব্য-ভঙ্গিও পরোক্ষ অর্থ গ্রহণের বিপক্ষে। কারণ পরক্ষণেই বলা হয়েছে, 'পরে আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করবো।' একথায় বোঝা যায় 'উরূদ' শব্দটির মাধ্যমে দোজখে প্রবেশ করানোর কথাই বলা হয়েছে। সেকারণেই পরবর্তী বাক্যে এসেছে উদ্ধারের কথা। যে দোজখে প্রবেশ করেনি তাকে উদ্ধার করার অবকাশ কোথায়। আর মারজিয়াহ্রা তাদের অভিমতের স্বপক্ষে যে হাদিসটি উপস্থাপন করেছে, সেই হাদিসটিও তাদের পক্ষের কোনো প্রমাণ নয়। কারণ দোজখে প্রবেশ করা না করার কোনো সম্পর্ক ওই হাদিসের বক্তব্যভূত নয়।

এখন আলোচনা করা যেতে পারে 'উলাইকা আনহা' মুবআ'দুন' (তাদেরকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে) —এই আয়াত সম্পর্কে। এই আয়াতের অর্থ এরকম তো হতে পারে যে— পাপী বিশ্বাসীদেরকে দোজখ থেকে তুলে আনার পর চিরদিনের জন্য তাদেরকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে। আর তখন তারা দোজখের কোনো আওয়াজও শুনতে পাবে না। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, দোজখের আগুন তাদের জন্য করে দেয়া হবে শীতল। তাই তারা তখন দোজখাগ্নির ভয়ংকর শব্দ শুনতে পাবে না।

হান্নাদ, তিবরানী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, খালেদ বিন মাআদ বলেছেন, জান্নাতে পৌঁছে যাওয়ার পর দোজখ থেকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত ওই জান্নাতীরা নিবেদন করবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমি তো এইমর্মে অঙ্গীকার করেছিলে যে,

আমাদেরকে অবশ্যই দোজখে প্রবেশ করানো হবে। আল্লাহ্ বলবেন, হ্যাঁ। এরকম অঙ্গীকার আমি করেছিলাম। সেই অঙ্গীকারানুসারেই তো তোমাদেরকে দোজখে প্রবেশ করানো হয়েছিলো। কিন্তু দোজখের আগুনকে তোমাদের জন্য করে দেয়া হয়েছিলো শীতল। তাই তোমরা দোজখাগ্নির শাস্তি অনুভব করতে পারোনি। হজরত ইয়ালী বিন উমাইয়া থেকে ইবনে আদী ও তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পুলসিরাত অতিক্রমকালে দোজখের আগুন বিশ্বাসীগণকে বলবে, আমার উপর দিয়ে দ্রুত চলে যাও। তোমাদের নূর আমার দহনশক্তিকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে, 'উরূদ' শব্দটির অর্থ প্রবেশ করা, যদিও তা অতিক্রমের আকারে হয়। এর প্রমাণ রয়েছে ইমাম আহমদ, হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত আবু সুমাইয়ার বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, 'উরূদ' শব্দটির সুনির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতপৃথকতা দেখা দিয়েছে। কেউ বলেছেন, বিশ্বাসীরা কখনোই দোজখে প্রবেশ করবে না। আবার কেউ বলেছেন, সকলকেই একবার দোজখে প্রবেশ করতে হবে। তারপর শিরিক বিমুক্তদেরকে আল্লাহ্তায়ালা পরিত্রাণ দান করবেন। একবার আমি হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে এই মতানৈক্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। তিনি তাঁর দুই আঙ্গুল তাঁর কানের কাছে নিয়ে বললেন, এই কান বধির হয়ে যাবে, যদি না আমি রসুল স.কে একথা বলতে শুনি যে, পুণ্যবান পাপী নির্বিশেষে সকলকেই দোজখে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু বিশ্বাসীদের জন্য দোজখের আগুন হয়ে যাবে ঠাণ্ডা। তাই তারা দোজখ অতিক্রম করবে নিরাপদে, যেমন অগ্নিকুণ্ডে নিরাপদে ছিলেন হজরত ইব্রাহিম। দোজখ তখন চিৎকার করে বলবে— 'পরে আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করবো এবং সীমালংঘনকারীদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিবো।'

ইবনে উয়াইনিয়া সূত্রে আমর বিন দিনার থেকে বাগবী লিখেছেন, নাফে বিন আযরক একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে বললেন, 'উরূদ' শব্দটির অর্থ প্রবেশ করা নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— ইন্নাকুম ওয়া মা তা'বুদুনা মিন দুনিল্লাহি হাসবু জাহান্নামা আনতুম লাহা ওয়ারিদূন (তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করো তারা জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরা সকলে তাতে প্রবেশ করবে (সুরা আম্বিয়া)। এই আয়াতে 'উরূদ' শব্দটি কি প্রবেশ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি? প্রকৃত কথা হচ্ছে, তুমি আমি সকলেই দোজখে প্রবেশ করবো। কিন্তু আমি আশা রাখি আল্লাহ্ আমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করবেন। কিন্তু মনে হয় তোমাকে উদ্ধার করবেন না। কারণ তুমি প্রবেশ করাটাকেই অস্বীকার করছো।

সাঈদ ইবনে মনসুর, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মুজাহিদ বলেছেন, একবার 'উরূদ' শব্দের অর্থ নিয়ে নাফে বিন আযরক হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। হজরত ইবনে আব্বাস উপরে বর্ণিত আয়াত আবৃত্তি করার পর বললেন, এবার বলো, সকলে দোজখে প্রবেশ করবে কি করবে না? পুনরায় তিনি আবৃত্তি করলেন— ইয়াক্বদিমু কওমাহু ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ফাআওরাদা হুমুন্ নার (সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে তাদেরকে নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করবে, যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা কতো নিকৃষ্ট স্থান)। সুরা হুদের এই আয়াত তেলাওয়াত করার পর তিনি পুনরায় নাফেকে বললেন, এবার বলো, তারা কি দোজখে আপন আপন সম্প্রদায়কে নিয়ে প্রবেশ করবে, না করবে না? প্রকৃত কথা হচ্ছে, আমরা সকলেই সেখানে প্রবেশ করবো। এখন তুমিই বলো, সেখান থেকে বের হতে চাও, না চাও না?

আওফী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে' এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, পুণ্যবান ও পাপী সকলেই তখন দোজখে প্রবেশ করবে। তোমরা কি অবগত যে, 'উরূদ' অর্থ 'দুখুল' বা প্রবেশ করা? অন্যান্য আয়াতেও 'উরূদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থে। যেমন— ১. সে ওদেরকে নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করবে, যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা কতো নিকৃষ্ট স্থান (সুরা হুদ)। ২. এবং অপরাধীদেরকে পিপাসিত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবো (আয়াত ৮৬)।

হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদকে একবার 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে'— এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, এখানকার 'উরূদ' শব্দটির অর্থ প্রবেশ করা। ইকরামা সূত্রে বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, দোজখে প্রবেশ করা ব্যতীত কেউই বাঁচতে পারবে না।

ইমাম আহমদ, তিরমিজি, বায়হাকী ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, সকলে দোজখে অবতরণ করবে। এরপর কৃতকর্মের ভিত্তিতে কাউকে কাউকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা বের হয়ে আসবে বিদ্যুৎ গতিতে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা বের হবে বাতাসের গতিতে। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা বোঝা বিশিষ্ট উটের গতিতে, পঞ্চম শ্রেণীর লোকেরা মানুষের দৌড়ানোর গতিতে এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর লোকেরা মানুষের সাধারণ চলার গতিতে।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, সকল মানুষ পুলসিরাতে অবস্থান গ্রহণ করবে। তারপর নিজ নিজ আমলের শক্তি অনুসারে অতিক্রম করবে ওই সেতু। কেউ অতিক্রম করবে বিদ্যুৎ গতিতে, আবার কেউ অতিক্রম করবে দ্রুতগামী উটের গতিতে। কেউ দৌড়ে পার হবে, আবার কেউ পার হবে শ্লথ পদবিক্ষেপে। সর্বশেষ অতিক্রমকারী ব্যক্তি ওই সেতু পার হয়ে যাবে তার পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুলের উপর ভর করে করে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যার তিনটি শিশু সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে, তাকেও প্রবেশ করতে হবে দোজখে, যেহেতু এ বিষয়ে আল্লাহ্ অঙ্গীকার করেছেন। এরপর বর্ণনাকারী আবৃত্তি করলেন, 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে।' হজরত আবদুল্লাহ্ বিন বশীর আনসারী থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন— যার তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে, সে স্থায়ীভাবে দোজখে প্রবেশ করবে না। প্রবেশ করবে কেবল পুলসিরাত অতিক্রম করার সময়।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, গানীম বিন কায়েস বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত কা'বের উপস্থিতিতে লোকদের মধ্যে দোজখে প্রবেশ করা না করা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলো। হজরত কা'ব বললেন, তখন আগুন সকলের গতিরোধ করবে— পুণ্যবান, পাপী সকলের। ঘোষিত হবে— হে দোজখ, তোমার সঙ্গীদেরকে আটকাও এবং আমার বন্ধুদেরকে ছেড়ে দাও। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যারা দোজখের উপযুক্ত তারা দোজখে পতিত হবে। মানুষ যেমন করে তার আপন সন্তানকে চিনতে পারে, তেমনি করে দোজখ চিনতে পারবে তার অধিবাসীদেরকে। আর ইমানদারেরা সেখান থেকে চলে যাবে অবলীলায়।

সুয়ূতী লিখেছেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে, 'উরূদ' অর্থ প্রবেশ করা। কুরতুবীও এই অর্থটিকে প্রাধান্য প্রদান করেছেন এবং প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন হজরত জাবের ও অন্যদের বর্ণিত হাদিস। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের কোনো কোনো আলেম 'উরূদ' শব্দের অর্থ করেছেন অতিক্রম করা। ইমাম নববীও এই অর্থটিকে পছন্দ করেছেন এবং প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে পুলসিরাত অতিক্রম করার কথা। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও

একথার প্রমাণ রয়েছে। আমি বলি, পুলসিরাত অতিক্রম করার অর্থই প্রবেশ করা। কারণ প্রবেশ করার অর্থ এরকম নয় যে, আগুনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হবে। জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করাই হচ্ছে এখানে প্রবেশ করা। অর্থাৎ প্রবেশ করা ও অতিক্রম করা এখানে সমার্থক। কারণ ওই প্রবেশ হবে অতিক্রমাকারে। এটাই বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে সামঞ্জস্য সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা।

যদি এমতো সন্দেহ করা হয় যে, বায়হাকীর বর্ণনায় তো হাসান বসরীর উক্তিরূপে এসেছে, 'উরূদ' অর্থ প্রবেশ নয়, দোজখের উপর দিয়ে অতিক্রম করা এবং অতিক্রম করা ও প্রবেশ করা কখনো এক নয়। তবুও আমি বলবো, হজরত হাসানের বক্তব্যানুসারে প্রবেশ করার অর্থ আগুনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা বা পৌঁছে যাওয়া। তাই যদি হয়, তবে বলতেই হয় প্রবেশ ও অতিক্রম পৃথক দু'টি বিষয়। কিন্তু সাধারণ অর্থে প্রবেশ করার মধ্যে অতিক্রম করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। আর বিশেষ অর্থ অপেক্ষা এক্ষেত্রে সাধারণ অর্থই সর্বজনগ্রাহ্য।

হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, জননী হাফসা বলেছেন, একবার রসুল স. বললেন, আমি দৃঢ় আশা রাখি যারা বদর যুদ্ধে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আমার সঙ্গে ছিলো, তারা কখনো দোজখে প্রবেশ করবে না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্ কি বলেননি 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে।' রসুল স. বললেন, হাফসা, তুমি কি আল্লাহ্‌র এই ঘোষণা শোনোনি— 'পরে আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করবো এবং সীমালংঘনকারীদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রাখবো।' রসুল স. এর এই জবাবের মাধ্যমেও একথা প্রমাণিত হয় যে, দোজখাভ্যন্তরে প্রবেশ না করা অর্থ সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান না করা।

সুয়ূতী লিখেছেন, অধিকাংশ সলফে সলিহীন দোজখাভ্যন্তরে পতিত হওয়াকেই ভয় করতেন। কেননা তা নিঃসন্দেহে ভয়ংকর একটি বিষয়, যদিও এখানে বলা হয়েছে, 'পরে আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করবো।' কিন্তু একথার কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, ওই উদ্ধার পুলসিরাত অতিক্রমকালে হবে, না দোজখাভ্যন্তরে পতিত হওয়ার পর। এই অনিশ্চয়তাই ওই সকল সাধুপুরুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখতো।

আজ্‌জুহুদ গ্রন্থে ইমাম আহমদ এবং হজরত হাযেম বিন আবী হাযেম থেকে হান্নাদ, বায়হাকী, সাঈদ ইবনে মনসুর ও হাকেম উল্লেখ করেছেন, একবার হজরত আবদুল্লাহ্ বিন রহ্‌ওয়াহা কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেনো? তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি দোজখে প্রবেশ

করবো। কিন্তু আমাকে একথা নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি যে, সেখান থেকে আমি উদ্ধার পাবো কিনা। আবু ইসহাক সূত্রে হান্নাদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত আবু মায়সারাহ্ রাতে শয্যা গ্রহণকালে বলে উঠলেন, আমার জননী যদি আমাকে জন্মদান না করতেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, কেনো, কী হয়েছে? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তো আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন আমি অবশ্যই দোজখে প্রবেশ করবো। কিন্তু একথা নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, আমি তখন উদ্ধারপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো কিনা?

ইমাম আহমদ তাঁর আজ্‌জুহুদ গ্রন্থে লিখেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, এক লোক তার ভাইকে বললো, তুমি কি একথা জানো, সেদিন সকলকেই দোজখে প্রবেশ করতে হবে? তার ভাই জবাব দিলো, হ্যাঁ। লোকটি বললো, একথাও কি সুনিশ্চিতরূপে জানো যে, সেখান থেকে তুমি বের হয়ে আসতে পারবে? তার ভাই বললো, না। লোকটি বললো, তাহলে তুমি কীভাবে হাসো? একথা শুনে তার ভাই বিমর্ষ হয়ে গেলো। অবশিষ্ট জীবনে তাকে আর হাসতে দেখা যায়নি।

এর পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্ত হলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, দুইদলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসেবে কোনটি উত্তম?' একথার অর্থ— আমার রসুলের মাধ্যমে আমার স্পষ্ট আয়াত তাদের বোধগম্যরূপে আবৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও, অথবা তাঁর মাধ্যমে আমার অলৌকিক নিদর্শনরাজি দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা দরিদ্র ও মলিন পরিচ্ছদাবৃত বিশ্বাসীদেরকে বলে, দেখো, তোমাদের দল ও আমাদের দলের মধ্যে কতো পার্থক্য। তোমরা নিঃসম্বল, আমরা বিত্তশালী। তোমাদের শরীর ও পরিচ্ছদ অবিন্যস্ত ও অসুন্দর। আর আমরা সুবিন্যস্ত ও পরিপাটি। এবার তবে বলো, কোন দল মর্যাদায় অধিক শ্রেষ্ঠ এবং কোন দলের সমাবেশ অধিকতর উত্তম?

এখানে 'মাক্বাম' অর্থ অবস্থান বা মর্যাদা। আর 'নাদি' অর্থ মজলিস বা সমাবেশ। উল্লেখ্য যে, মক্কার মুশরিকেরা যখন যুক্তি ও বুদ্ধির মাধ্যমে ইসলামের ক্রমপ্রসরমানতাকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলো, তখন তারা সাহাবীগণকে বলতে শুরু করলো, দেখো তোমরা পার্থিব জীবনেই বিপদগ্রস্ত, আর আমরা প্রতাপশালী ও বিত্তাধিকারী। আল্লাহ্ই তো এভাবে আমাদের অবস্থান নির্ধারণ করেছেন। অতএব ভেবে দেখো, শ্রেষ্ঠ কারা? সর্বোত্তম সমাবেশই বা কাদের। আল্লাহ্তায়ালা তাদের এমতো ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতাকে সহ্য করলেন না। অবতীর্ণ করলেন নিম্নের আয়াত।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَّرِءْيًا ○ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضْعَفُ جُندًا ○ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَٰقِيَٰتُ الصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ○

❑ উহাদিগের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি— যাহারা উহাদিগের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।

❑ বল, 'যাহারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাহাদিগকে প্রচুর ঢিল দিবেন যতক্ষণ না তাহারা প্রত্যক্ষ করিবে তাহা যে বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইতেছে, উহা শাস্তি হউক অথবা কিয়ামতই হউক। অতঃপর তাহারা জানিতে পারিবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলেবলে দুর্বল।

❑ এবং যাহারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাহাদিগের পথনির্দেশে বৃদ্ধি দান করেন এবং সৎকর্ম, যাহার ফল স্থায়ী, উহা তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার-প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ ও প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরূপ মন্তব্য শুনে বিচলিত হবেন না। যে কোনো সময় আমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। তাদের চেয়ে অধিক সম্পদ ও প্রতাপের অধিকারী অনেক জনগোষ্ঠীকে তো ইতোপূর্বে আমি বিনাশ করেছি।

যুগসমূহ পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক যুগের মানুষকে বলা হয় 'ক্বারনিন'। এখানেও এই শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে অতীত যুগের অবাধ্য জনগোষ্ঠীকে। বাগবী লিখেছেন, এখানকার 'আছাছান' শব্দটির অর্থ— সম্পদ। মুকাতিল বলেছেন, পোশাক পরিচ্ছদ। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, গৃহ-সামগ্রী বা তৈজসপত্র। এক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে জাতিবাচকরূপে। জাতিবাচক বিশেষ্যের কখনো একবচন হয় না। 'সম্পদ' অর্থ গ্রহণ করলে আবার শব্দটির একবচন হবে 'আছাছাতুন'। আর এখানকার 'রী'ইয়া' শব্দটি এসেছে 'রূইয়াত'

থেকে। এর অর্থ দৃশ্যতঃ বা বাহ্যতঃ। অর্থাৎ বাহ্যতঃ আড়ম্বরপূর্ণ বা শ্রেষ্ঠ। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, শব্দটির অর্থ সতেজতা। অর্থাৎ সম্পদগত প্রাচুর্য।

পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'বলো, যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদের প্রচুর ঢিল দিবেন' এখানকার 'ফালইয়ামদুদ্' কথাটি নির্দেশসূচক। কিন্তু তা ব্যবহৃত হয়েছে বিধেয় এর অর্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— মানুষ বিভ্রান্তিতে যতবেশী জড়িত, আল্লাহ্ ততবেশী অবকাশ দান করেন তাদেরকে। বিধেয়রূপে কথাটি উপস্থাপনের মধ্যে এখানে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে দীর্ঘ অবকাশ দান করবেন এজন্য যে, তারা যেনো কোনো অজুহাত দেখাতে না পারে। যেনো না বলতে পারে সংশোধনের সুযোগ আমাদেরকে দেয়া হয়নি। এক আয়াতে বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বিবৃত হয়েছে এভাবে— 'আমি কি তোমাদের এতো দীর্ঘজীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে' (সুরা ফাতির)।

এরপর বলা হয়েছে— 'যতক্ষণ না তারা প্রত্যক্ষ করবে তা, যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে, তা শাস্তি হোক অথবা কিয়ামতই হোক।' এখানে 'শাস্তি' দ্বারা উদ্দেশ্য হত্যা অথবা বন্দিত্ব। আর 'আস্সাআত্' দ্বারা বুঝানো হয়েছে কিয়ামত বা আখেরাতের দুর্ভোগকে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আমি তাদেরকে ওই সময় পর্যন্ত সংশোধনের অথবা অধিকতর শাস্তির উপযোগী হওয়ার অবকাশ দান করবো, যতক্ষণ না তাদের উপরে আপতিত করি মুসলমানদের হাতে নিহত অথবা বন্দী হওয়ার শাস্তি, কিংবা মৃত্যু পরবর্তী আযাব।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা জানতে পারবে কে নিকৃষ্ট ও কে দলে বলে দুর্বল।' এখানে 'জুনদা' অর্থ সৈন্য, সাহায্যকারী। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সাহায্যকারী শয়তান। আর বিশ্বাসীদের সাহায্যকারী ফেরেশতা। আলোচ্য বাক্যের দ্বারা 'দুই দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিশ হিসেবে কোনটি উত্তম' সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের এ কথাকে প্রতিহত করা হয়েছে।

এর পরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'এবং যারা সৎ পথে চলে আল্লাহ্ তাদের পথনির্দেশে বৃদ্ধি দান করেন।' একথার অর্থ— এবং যারা সৎ পথের পথিক আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে দান করেন অধিক হেদায়েত। দান করেন তাঁর নৈকট্য ও সন্তোষ। সুতরাং বিশ্বাসীরা পার্থিব প্রতাপ ও সম্পদে দুর্বল হওয়ার অর্থ

এই নয় যে, তারা আল্লাহ্ থেকে দূরবর্তী। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রভাব ও সম্পদও নয় আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন হওয়ার কোনো আলামত। বরং সম্পদের স্বল্পতার কারণেই বিশ্বাসীরা পায় অধিক নির্ভুল পথনির্দেশনা। আর সম্পদের প্রাচুর্য অবিশ্বাসীদেরকে করে তোলে অধিকতর ভ্রষ্ট। দীর্ঘ অবকাশের ফলে তাদের ওই পথভ্রষ্টতা হয় অনড়, অবিচল ও নিরাময়ের অযোগ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সৎকর্ম, যার ফল স্থায়ী, তা তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ ও প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।' এখানে 'আলবাকীয়্যাতুস সলিহাত' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই সকল পুণ্যকর্মকে যার বিনিময় হয় নিরবচ্ছিন্ন। অর্থাৎ কাফেরদের সম্পদগত উপকার যেমন অপূর্ণ, তেমনি ধ্বংসশীলও বটে। কিন্তু ইমানদারদের পুণ্যকর্ম ও সওয়াব স্থায়ী ও উত্তম।

এখানকার 'খইর' শব্দটি তুলনামূলক বিশেষণের শব্দরূপ। তাই মনে হতে পারে, সম্ভবতঃ অবিশ্বাসীরাও আল্লাহ্র নিকট থেকে কিছুটা উপকার লাভ করবে। লাভ করবে বিশ্বাসীদের চেয়ে কিছুটা কম শুভপরিণতি। কিন্তু এই ধারণাটি ঠিক নয়। কারণ এখানকার তুলনাটি সমান্তরালবোধক নয়। এখানে কেবল 'খইর' বা শ্রেষ্ঠত্বকে তুলনা করা হয়েছে পুরস্কার ও প্রতিদানের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে। যেমন বলা হয়— গ্রীষ্মের মওসুম শীতের মওসুম থেকে অনেক বেশী উষ্ণ। একথার অর্থ— শীতকালে যেমন শীত বেশী হয়, তেমনি গ্রীষ্মের উত্তাপ হয় শীতকালের চেয়ে বেশী।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত খাব্বাব বর্ণনা করেছেন, আমি লোহার জিনিষ পত্র তৈরী করতাম। একবার আস ইবনে ওয়ায়েল আমার কাছ থেকে কিছু কাজ করিয়ে নিলো। কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পারিশ্রমিক দিলো না। প্রাপ্য পারিশ্রমিক সংগ্রহের জন্য আমি একদিন তার কাছে গেলাম। সে বললো, আল্লাহ্র কসম মোহাম্মদের আল্লাহ্কে অস্বীকার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করবো না। আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ, তুমি মরে গিয়ে দ্বিতীয় বার বেঁচে না ওঠা পর্যন্ত আমি এরকম কথা বলবো না। সে বললো, সত্যি কি মৃত্যুর পর আমাকে জীবিত করা হবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বললো, তাহলে তো সেখানে আমার ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি সবকিছুই থাকবে। ঠিক আছে, সেখানেই আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করবো। তার একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ۝ اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝ وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا ۝ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ۝ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝

❒ তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ উহাকে, যে আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে 'আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হইবেই।'

❒ সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে অথবা দয়াময়ের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে?

❒ ইহা সত্য নহে, তাহারা যাহা বলে আমি তাহা লিখিয়া রাখিব এবং তাহাদিগের শাস্তি বৃদ্ধি করিতে থাকিব।

❒ সে যাহা বলে তাহা থাকিবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসিবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

❒ তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করে এই জন্যে যাহাতে উহারা তাহাদিগের সহায় হয়।

❒ না, এই ধারণা অবাস্তব, উহারা তাহাদিগের ইবাদত অস্বীকার করিবে এবং তাহাদিগের বিরোধী হইয়া যাইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি কি হতভাগ্য আস ইবনে ওয়ায়েলের কথা শুনেছেন? সে আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, মৃত্যু-উত্তর জীবনে তাকে নাকি তার ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে।

বাগবী লিখেছেন, 'উলদা' এবং 'ওয়ালাদা' শব্দ দু'টো সমার্থক। এর অর্থ সন্তান-সন্ততি। এরকম সমার্থক শব্দের আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন 'উরবুন' 'আরাবু', 'উজমুন', 'আজামুন'। কেউ কেউ বলেছেন, 'উলদুন' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে, 'ওয়ালাদুন'। যেমন 'উসদুন' এর একবচন 'আসাদুন।'

পরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'আত্‌ত্বলাআ'ল গইবা' (সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে)। এখানে 'ইলা' (দিকে) শব্দটি রয়েছে উহ্য। যেমন 'আত্‌ত্বলাআ'ল জাবাল' অর্থ পাহাড়ের দিকে গমন করো। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— সে কি অদৃশ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছে? হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— সে কি লওহে মাহফুজ দেখে নিয়েছে? মুজাহিদ অর্থ করেছেন— সে কি গায়েবের এলেম হাসিল করেছে, যে পরকালে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রাপ্তির আশা করছে?

এরপর বলা হয়েছে— 'অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে?' একথার অর্থ— সে কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমার প্রবক্তা হয়েছে? কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— সে কি প্রয়োজনীয় পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছে? কালাবী অর্থ করেছেন, আল্লাহ্ কি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ?

এর পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'এটা সত্য নয়, তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখবো এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকবো।'

একটি প্রশ্নঃ সত্যপ্রত্যাখ্যানজনিত উক্তি এবং পাপবচন উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তো মন্দ আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা তা লিখে নেয়। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— মানুষের উচ্চারিত কথা লিপিবদ্ধ করবার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই আছে (সুরা কাহফ)। কিন্তু এই আয়াতে 'আমি তা লিখে রাখবো' এরকম বলা হলো কেনো?

উত্তরঃ এখানে 'লিখে রাখবো' কথাটির অর্থ হবে সংরক্ষণ করবো, অথবা প্রকাশ করবো, কিংবা এমতো অপকথনের প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

আমল-লেখক ফেরেশতারা মানুষের কর্মকাণ্ডের বিবরণ লিখে রাখে। একাজ তারা করে আল্লাহ্‌র নির্দেশেই। তাই এখানে আল্লাহ্‌তায়ালা লিপিবদ্ধ করার কর্মটিকে সম্পৃক্ত করেছেন নিজের সঙ্গে। আর 'তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকবো' কথাটির অর্থ হবে এখানে এরকম— তারা তো সৃষ্টিলগ্ন থেকেই শাস্তিযোগ্য বলে নির্ধারিত। তদুপরি তাদেরকে আমি আরো অধিক শাস্তি প্রদান করবো, তাদের এমতো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপজনিত উক্তির কারণে।

এর পরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— 'সে যা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।' একথার অর্থ— তার মৃত্যুর পরে তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মালিকানা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবে। সকল কিছুর প্রকৃত মালিক তো আমি। আর মহাবিচারের দিবসে তাকে আমার নিকটে আসতে হবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

এর পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করে এজন্যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়।' এখানে 'ইত্তাখাজু' কথাটির সর্বনাম সম্পৃক্ত হয়েছে মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে। আর 'আলিহাতান' কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, তাদের ওই সকল ইলাহ্ বা প্রতিমাগুলোকে, যার আরাধনা তারা করতো। তারা বিশ্বাস করতো আল্লাহ্তায়ালার দরবারে তাদের ওই সকল প্রতিমাগুলো সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে। আলোচ্য আয়াতে তাদের ওই অপবিশ্বাসটিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

এর পরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'না, এই ধারণা অবাস্তব, তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।' একথার অর্থ— কখনোই নয়। তাদের ধারণা বাস্তববিবর্জিত। মহাবিচারের ময়দানে তাদের বাতিল উপাস্যগুলো তাদেরকে অস্বীকার করবে। বলবে, এরা আমাদের উপাসনা করতো না। প্রকৃতপক্ষে তারা উপাসনা করতো স্বপ্রবৃত্তির ও শয়তানের। আমরা তাদের অপবিত্র ক্রিয়াকর্ম থেকে মুক্ত। কথাটির উদ্দেশ্য এরকমও হতে পারে যে— ওই দিন তারা তাদের অংশীবাদিতার বিষয়টিকে অস্বীকার করবে। বলবে, শপথ করে বলছি, আমরা কখনোই অংশীবাদী ছিলাম না।

এরপরে বলা হয়েছে— 'ওয়া ইয়াকুনুনা আলাইহিম দ্বিদ্দা ' (এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে)।

'দ্বিদ্দা' অর্থ অপমান, অসম্মান, অবজ্ঞা। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে— প্রতিমাগুলো সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হয়ে আল্লাহ্র দরবারে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করবে, সে কারণেই অংশীবাদীরা তাদের উপাসনা করে। আলোচ্য আয়াতে তাই তাদের ওই অপবিশ্বাসকে নাকচ করা হয়েছে, 'দ্বিদ্দা' (অসম্মান) শব্দটির মাধ্যমে । অথবা 'দ্বিদ্দা' শব্দটির দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে শত্রু হওয়া বা বিরোধী হওয়াকে। অর্থাৎ তাদের বাতিল উপাস্যগুলো সেদিন হবে তাদের ঘোর বিরুদ্ধপক্ষ। এরকমও হতে পারে যে, সেদিন নিরুপায় হয়ে অংশীবাদীরা হয়ে যাবে তাদের বাতিল উপাস্যসমূহের বিরুদ্ধে। বলবে আমরা কখনোই নিশ্চিত মুশরিক ছিলাম না।

'দ্বিদ্দা' শব্দটি একক বা সম্মিলিত অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ সে দিন সকল অংশীবাদী একজোট হয়ে অস্বীকার করবে তাদের উপাস্যগুলোকে। হজরত আলী থেকে আবু দাউদ, নাসাঈ এবং হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে হাব্বান উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেদিন তারা সকলে তাদের উপাস্যগুলোর বিরোধী হওয়ার ব্যাপারে হয়ে যাবে একটি বাহুর মতো। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তারা সেদিন হবে অটুট ও ঐকমত্যভূত। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, বহুবচনরূপেও 'দ্বিদ্দা' শব্দটি প্রয়োগ করা যায়। যেমন প্রয়োগ করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيٰطِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ○ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ○ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ○ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ○ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ○

❒ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের নিকট শয়তান পাঠাইয়াছি উহাদিগের মন্দ কর্মে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করিবার জন্য।

❒ সুতরাং তাহাদিগের বিষয়ে তাড়াতাড়ি করিও না। আমি তো গণনা করিতেছি উহাদিগের নির্ধারিত কাল,

❒ যে দিন দয়াময়ের নিকট সাবধানীদিগকে সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করিব,

❒ এবং অপরাধীদিগকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে খেদাইয়া লইয়া যাইব।

❒ যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে সে ব্যতীত অন্য কাহারও সুপারিশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট শয়তান প্রেরণ করেছি। ওই শয়তানেরা তো তাদেরকে পাপকর্মে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।

আলোচ্য আয়াত উপস্থাপিত হয়েছে বিস্ময়সূচক এবং অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নের আকারে। রসুল স.কে বিস্মিত করাই এরকম বক্তব্যভঙ্গির উদ্দেশ্য। এভাবেই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে ওই সকল লোকের প্রকৃত অবস্থা, সত্য স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পরেও যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানে থাকে অবিচল।

বাগবী লিখেছেন, অন্য একটি আয়াতের বক্তব্যও আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের পরিপূরক। ইবলিসকে লক্ষ্য করে সেখানে আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমার আহ্বানের দ্বারা তাদের মধ্যে যাকে পারো পদস্খলিত করো' (সুরা বানী ইসরাইল)। অথবা এখানকার 'আরসালনা' কথাটির অর্থ ছেড়ে দেয়া বা মুক্ত করে দেয়া। অর্থাৎ আমি শয়তানকে ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ছেড়ে দিয়ে রেখেছি। যেমন বলা হয় — 'আরসালতুল্ বায়ীর' (আমি উটকে উন্মুক্ত করে দিয়েছি, ছেড়ে দিয়েছি)।

'আয্‌যুন' অর্থ প্রলুব্ধ করা, অনুপ্রাণিত করা, উৎসাহ দান করা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি শয়তানকে ছেড়ে দিয়েছি মিথ্যা কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহ দানের জন্য।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তাদের বিষয়ে তাড়াতাড়ি কোরো না। আমি তো গণনা করছি তাদের নির্ধারিত কাল। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! সুতরাং তাদের উপরে শাস্তি আপতিত হওয়ার ব্যাপারে আপনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে দোয়া করবেন না। আমি তো তাদের শাস্তির দিন-ক্ষণ নির্ধারিত করেই রেখেছি। নির্দিষ্ট করে দিয়েছি তাদের আয়ু। যথাসময়ে সে শাস্তি বাস্তবায়িত হবেই।

এর পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'যে দিন দয়াময়ের নিকট সাবধানীদেরকে সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করবো।'

এখানে 'ইলার রহমান' (দয়াময়ের নিকটে) কথাটির অর্থ ওই সম্মানিত স্থান, যেখানে পরিদৃশ্যমান হয় আল্লাহ্‌র উপাস্য হওয়ার (উলুহিয়াতের) তাজাল্লী বা বিচ্ছুরণ। আর এখানকার 'ওয়াফ্‌দান' শব্দটি 'ওয়াফিদ্' এর বহুবচন। এভাবে আলোচ্য আয়াতে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— সম্রাটের দরবারে যেমন অতিথিবৃন্দকে উপস্থিত করানো হয় পুরস্কৃত ও সম্মানিত করবার জন্য, তেমনি আল্লাহ্‌র দরবারে মুত্তাকী বা সাবধানীদেরকেও সমবেত করানো হবে সম্মানিত অতিথিরূপে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ তাঁর যাওয়াইদুল মসনদ গ্রন্থে এবং হাকেম, বায়হাকী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে হজরত আলী বলেছেন, হে জনতা! উত্তমরূপে অবগত হও। মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না, নিয়ে যাওয়া হবে না পদব্রজে, বরং তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে বেহেশতে উটের পিঠে আরোহণ করিয়ে। আল্লাহ্‌র কোনো সৃষ্টিই সেরকম উট কখনো দেখেনি। ওই উটগুলোর হাওদা হবে স্বর্ণনির্মিত এবং সেগুলোর নাসারন্ধ্রের রশি হবে জবরজদের। ওই উটের পিঠে সওয়ার হয়ে মুত্তাকীরা গিয়ে করাঘাত করবে বেহেশতের দরজায়।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তাদেরকে পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না। নিয়ে যাওয়া হবে স্বর্ণের হাওদা ও ইয়াকুতের জিন বিশিষ্ট উটে চড়িয়ে। তারা যদি চায়, তবে তাদের ওই বাহনগুলোকে তারা উড়িয়েও নিয়ে যেতে পারবে।

তালহা বিন আবী তালহার পদ্ধতিতে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সাবধানীদেরকে তখন দয়াময়ের দরবারে নিয়ে যাওয়া হবে বাহনে

উঠিয়ে। আর 'এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাবো' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অবাধ্য ও পাপিষ্ঠদেরকে তখন দোজখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে পিপাসিত অবস্থায়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু তালহা সূত্রে ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন। এখানে 'ওয়াফ্দান' অর্থ উটের উপরে আরোহণ করা।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, ওমর ইবনে কায়েস মালায়ী বর্ণনা করেছেন, কবর থেকে মুমিন ব্যক্তিকে যখন ওঠানো হবে, তখন তার আমল পবিত্র ও সুবাসিত পরিচ্ছদাবৃত হয়ে সুন্দর আকৃতিতে তার সামনে উপস্থিত হবে এবং বলবে, আমাকে চিনতে পারছেন? মুমিন ব্যক্তি বলবে, না। কিন্তু তুমি সুন্দর ও পবিত্র। আমল বলবে, পৃথিবীতেও আমি এরকম ছিলাম। আমি আপনার পুণ্যকর্ম। পৃথিবীতে দীর্ঘদিন ধরে আমি আপনার উপরে সওয়ার হয়েছিলাম। এখন আপনি আমার উপরে সওয়ার হয়ে যান। এপর্যন্ত বলার পর বর্ণনাকারী পাঠ করলেন 'যে দিন দয়াময়ের নিকট সাবধানীদেরকে সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করবো।' বর্ণনাকারী পুনরায় বললেন, অবিশ্বাসীদের আমল তাদের সম্মুখে উপস্থিত হবে অসুন্দর আকৃতিতে, দুর্গন্ধিত অবস্থায়। বলবে, আমাকে চিনতে পারছো? সে বলবে, না। কিন্তু তুমি তো কুৎসিত ও দুর্গন্ধযুক্ত। তার আমল বলবে, আমি দুনিয়াতেও এরকম ছিলাম। আমি তোমার মন্দ আমল। দুনিয়াতে দীর্ঘদিন ধরে তুমি আমার ঘাড়ে চড়েছিলে। এখন আমি তোমার ঘাড়ে চড়বো। এপর্যন্ত বলার পর বর্ণনাকারী পাঠ করলেন, 'তারা নিজের বোঝা নিজের পিঠের উপর উঠিয়ে নেবে।'

এর পরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে 'এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাবো।' এখানে 'মুজ্‌রিমীন' (অপরাধীদেরকে) বলে বোঝানো হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। বাগবী লিখেছেন, এখানকার 'বিরদা' শব্দটির অর্থ পায়ে হাঁটিয়ে। কেউ কেউ বলেছেন, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হবে ভয়ানক পিপাসিত। অত্যধিক পিপাসার ফলে প্রাণ হবে ওষ্ঠাগত। গলা যাবে শুকিয়ে। উল্লেখ্য যে, পানির উপরে অবতরণকারী দলকে বলে 'বিরদা'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ হবে তৃষিত।

আমি বলি, পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা দু'টি দলের হাশরের কথা বর্ণনা করেছেন। ১. সাবধানীগণ। নবী ও আল্লাহ্‌র পরিচয়ধন্য ব্যক্তিবর্গ থাকবেন ওই দলে। ২.'মুজ্‌রিমীন'। পুণ্যবান-পাপী এবং সাধারণ শ্রেণীর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথা এখানে উল্লেখিত হয়নি। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কোনো কোনো লোককে সেদিন ওঠানো হবে নগ্নপদ অবস্থায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হবে পুণ্যবান ও কেউ কেউ হবে পাপী। সুরা বানী ইসরাইলের

তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। হজরত আবু জর কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, হাশরের ময়দানে উপস্থিত লোকেরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিনটি দলে— বাহনারোহী দল, পায়ে হেঁটে চলা দল এবং মুখের উপর ভর করে চলা দল। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে— লোকদের হাশর হবে তিন রকমের। কেউ কেউ হবে উৎফুল্ল, আর কেউ কেউ হবে ভীতসন্ত্রস্ত। কোনো কোনো উটের আরোহী হবে দু'জন, কোনো কোনো উটের আরোহী হবে তিনজন অথবা দশজন। সেখানে তাদের সাথে থাকবে আগুন। যেদিকেই তারা চলুক না কেনো, ওই আগুনও চলবে তাদের সাথে সাথে। শায়েখ ইবনে হাজার বলেছেন, 'রগিবীন' ও 'রহিবীন' শ্রেণীর লোকেরা হবে প্রথমোক্ত প্রকারের। আর উটের উপর দু'জন, তিনজন এবং দশজন আরোহণের কথা হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, কেবল একজন আরোহণের কথা বলা হয়নি। তাই ইশারা ইঙ্গিতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, উটের পিঠের একজন আরোহীরা হবেন আবরার (বিশেষ পুণ্যবান) শ্রেণীর।

বায়হাকী লিখেছেন, 'রগিবীন' শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে আবরার বা নেককারগণকে। 'রাহিবীন' দ্বারা বোঝানো হয়েছে ওই সকল লোককে, যারা অবস্থান করবে আশা নিরাশার মধ্যে। আর আগুন যাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে, তারা হবে কাফের। হালিমীও এ হাদিসের এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন এতটুকু— আবরার ও মুত্তাকীদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জান্নাত থেকে আনা হবে উট। অন্যান্য পুণ্যবানকেও নিয়ে যাওয়ার জন্য উটের ব্যবস্থা থাকবে। উটগুলোকে ওই সময়েই সৃষ্টি করা হবে। সুয়ূতী বলেছেন, এই কথাটিই অধিকতর যথার্থ। যারা পাপী বিশ্বাসী তাদের জন্য জান্নাত থেকে উট আনা হবে, এধারণাটি ঠিক নয়। তবে হিসাবের সময় তাদের মধ্যে যারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে, তাদের জন্য উট আনার ব্যাপারটি অযৌক্তিক নয়। এরপর অবশিষ্ট থাকবে কেবল তারা, যাদের জন্য নির্ধারিত হবে দোজখের শাস্তি। দোজখের দিকে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে পায়ে হাঁটিয়ে। শুরু থেকেই তারা হবে বাহনবিবর্জিত। অথবা হাশর প্রান্তরে তারা যেতে থাকবে সওয়ারীতে আরোহণ করে। কিন্তু প্রান্তরের নিকটবর্তী যখন হবে, তখন তারা চলবে পায়ে হেঁটে। আর যারা আগে থেকেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও অংশীবাদী, তারা বরাবরই চলবে মুখের উপর ভর করে। তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা কোনো সময়েই করা হবে না।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেদিন নবী-রসুলগণকে সওয়ারীতে আরোহণ করানো হবে। এভাবে

তাঁরা পৌঁছবেন হাশরের ময়দানে। নবী সালেহ্কে তাঁর কবর থেকে ওঠানো হবে তাঁর উষ্ট্রারোহী অবস্থায়। আমাকে ওঠানো হবে আমার বোরাকে আরোহণ করিয়ে। আমার প্রিয় দৌহিত্রদ্বয়কে ওঠানো হবে জান্নাত থেকে নিয়ে আসা দু'টি উটের উপর। বেলালও হবে সেদিন উষ্ট্রারোহী। উটে চড়ে সে আযান দিবে। ঘোষণা করবে— আশহাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্। যখন আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ্ বলবে, তখন সকল বিশ্বাসী একযোগে তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। খাঁটি বিশ্বাসীদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে এবং যারা খাঁটি নয়, তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

হালিমী ও গাজ্জালী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, যাদেরকে সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়ে নেয়া হবে, তাদেরকে কবর থেকে ওঠানো হবে সওয়ারী অবস্থাতেই। কিন্তু ইসমাইলী অন্যান্য হাদিসের সামঞ্জস্য সাধনার্থে তাঁদের একথাকে স্বীকার করতে চাননি। বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজির এক যথাসূত্রসম্বলিত বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার রসুল স. ভাষণ দানের জন্য দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, হে জনতা! তোমাদেরকে আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত করানো হবে খালি গায়ে খালি পায়ে এবং খতনা বিহীন অবস্থায়। এরপর তিনি পাঠ করলেন — 'যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করবো' (সুরা আম্বিয়া)। তারপর তিনি স. বললেন, সর্বপ্রথম পোশাক পরিধান করানো হবে পিতা ইব্রাহিমকে। জননী আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম, জননী সাওদা , জননী উম্মে সালমা, হজরত সহল ইবনে সা'দ, হজরত হাসান ইবনে আলী থেকে তিবরানী এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বায্যারও এরকম বর্ণনা এনেছেন। কিন্তু তাঁদের বর্ণনায় উদ্ধৃত আয়াতটি পাঠ করার কথা এবং হজরত ইব্রাহিমকে সর্বপ্রথম পোশাক পরিধানের কথাটি নেই। আছে আর একটি কথা— উম্মত-জননীগণের মধ্যে একজন তখন বললেন, হায়! কি লজ্জার কথা, তখন একে অপরকে দেখবে। রসুল স. বললেন, সেদিন অপরের দিকে দৃষ্টিপাত করার মনোবৃত্তি ও সুযোগ কারোরই থাকবে না। সকলেই থাকবে আপনাপন পরিণতির চিন্তায় নিমগ্ন।

এর পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না।' একথার অর্থ— যারা শাফায়াত করার যোগ্য সেদিন কেবল তারাই শাফায়াত করতে

পারবে, অন্য কেউ নয়। আল্লাহ্ বলেছেন— 'তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করবো।' আরো বলেছেন— 'তিনি বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ধিত করেন' (সুরা শূরা)। এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাদের ভ্রাতাদের জন্য তাদের শাফায়াত আল্লাহ্ কবুল করবেন। একথা বর্ণনা করেছেন ইবনে সালেহ।

এখানকার 'আহ্দা' শব্দটির অর্থ অনুমতি বা সম্মতিও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— যারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাফায়াতের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত কেবল তারাই সেদিন শাফায়াত করতে পারবে, অন্য কেউ নয়। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কে সে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে' (সুরা বাকারা)। আরববাসীরা বলে— প্রশাসক এক লোককে এরকম করার অনুমতি দিয়েছে (আহাদাল আমীরু ইলা ফুলানিন্ বিকাজা)।

কোনো কোনো আলেম মনে করেন 'যারা দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমায় দৃঢ় বিশ্বাসী। আর এখানকার 'মান' কথাটির পূর্বে 'শাফায়াত' কথাটি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য শব্দটি সহযোগে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমায় বিশ্বাসী প্রত্যেককে শাফায়াতকারী বলা যায়। আর আল্লাহ্ তো সকল বিশ্বাসীকে ক্ষমা করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। যেমন— ১. 'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে' (সুরা যিলযাল)। ২. 'আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন' (সুরা যুমার)। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র উপর তাঁর বান্দাদের এই হক রয়েছে যে, যারা অংশীবাদী নয়, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে। শাফায়াত বা সুপারিশ সম্পর্কে অন্য একটি আয়াতের বক্তব্য এরকম— 'তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি প্রসন্ন' (সুরা আম্বিয়া)।

কোনো কোনো আলেমের ধারণা এখানকার 'লা ইয়ামলিকুনা' কথাটির সর্বনাম সম্পর্কিত হবে পূর্ববর্তী আয়াতের 'আলমুজরিমীনা' (অপরাধীদেরকে) কথাটির সঙ্গে। আর এখানকার 'শাফায়া'তা' কথাটির উদ্দেশ্য হবে শাফায়াতপ্রাপ্ত হওয়া। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াবে— অপরাধীরা শাফায়াতপ্রাপ্ত হবে না। শাফায়াতপ্রাপ্ত হবে কেবল বিশ্বাসীরা, আল্লাহ্ যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۝ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۝ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝ لَقَدْ أَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۝

❒ তাহারা বলে,'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।'

❒ তোমরা তো এক অদ্ভুত কথা সৃষ্টি করিয়াছ।

❒ হয় তো আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে,

❒ তাহারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করাতে।

❒ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নহে!

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হইবে না দাসরূপে।

❒ তাঁহার জ্ঞান তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে এবং তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে গণনা করিয়াছেন,

❒ এবং কিয়ামতের দিবসে উহাদিগের সকলেই তাঁহার নিকট আসিবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া কালুত্ তাখাজার রহ্মানু ওয়ালাদা' (তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন)। এখানে 'তারা বলে' (কালু) একথা উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে ইহুদী-খৃষ্টান ও ওই সকল অংশীবাদীকে যারা বলে, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। তাদের অংশীবাদিতার বিষয়টি সর্বজনবিদিত। তাই তাদের কথা স্পষ্ট উল্লেখ না করে 'তারা বলে'— একথার মাধ্যমে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে কেবল তাদের অপকর্মের কথা।

পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'লাক্বদ্ জি'তুম শাইয়্যান ইদ্দা' (তোমরা তো এক অদ্ভুত কথা সৃষ্টি করেছো)। হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'ইদ্দা' শব্দটির অর্থ করেছেন— ঘৃণিত, জঘন্য। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন—

অত্যধিক মন্দ। যেমন বলা হয়— 'আদানী আমরুন' (অমুক কথা বা ঘটনা আমাকে পীড়া দিয়েছে)। এটি একটি আরবী বাগধারা। বাগবী লিখেছেন, 'ইদ্‌দুন' অর্থ আকস্মিক দুর্ঘটনা।

এর পরের আয়াতদ্বয়ে (৯০, ৯১) বলা হয়েছে—'হয়তো আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী বিদীর্ণ হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করাতে।' কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'হাদ্‌দুন' অর্থ খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া। কোনো কোনো আলেম আয়াতদ্বয়ের অর্থ করেছেন— 'আল্লাহ্‌র সন্তান রয়েছে'— এমতো জঘন্য উক্তির কারণে যে কোনো সময় আকাশ ভেঙে পড়তে পারে, ধসে পড়তে পারে মৃত্তিকা এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে পর্বতরাজি। হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত কা'ব বলেছেন, জ্বিন ও মানুষ ছাড়া আকাশ-পৃথিবী ও পর্বতমালাসহ সমগ্র সৃষ্টি আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের উচ্চারণে ভীত হয়ে পড়েছিলো। স্থানচ্যুত হবার উপক্রম করেছিলো সকলেই। ফেরেশতারা হয়ে পড়েছিলো প্রচণ্ড রোষতপ্ত। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিলো নরকের লেলিহান আগুন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার সহিষ্ণুতা অন্তহীন। যদি তা না হতো, তবে আলোচ্য আয়াতদ্বয় উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যেতো সমগ্র সৃষ্টি।

এর পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়।' এখানে 'শোভন নয়' কথাটির অর্থ হতে পারে দু'রকম— ১. বৈধ নয় এবং ২. সম্ভব নয়। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌র সন্তান হওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে অবৈধ অথবা অসম্ভব। এরকম কলঙ্ক ও ত্রুটি থেকে তিনি চিরমুক্ত, চিরপবিত্র ও চির অমুখাপেক্ষী।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে আল্লাহ্‌র স্থলে 'রহমান' শব্দটি বসিয়ে এই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালাই একমাত্র দাতা, আর সমগ্র সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী ও গ্রহীতা। অথবা সকলেই আল্লাহ্‌র দয়া বা অনুগ্রহপ্রাপ্ত। এভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, অমুখাপেক্ষী অনুগ্রহদাতা ও মুখাপেক্ষী অনুগ্রহগ্রহীতা সমশ্রেণীভূত নয়। কিন্তু পিতা ও তার সন্তানকে সমশ্রেণী বা সমজাতিভূত হতেই হয়। একারণেই আল্লাহ্‌র সন্তান হওয়া একটি অসম্ভব ব্যাপার । এরকম অংশীবাদী ধারণা থেকে তিনি সতত পবিত্র।

এর পরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে না দাসরূপে।' একথার অর্থ— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির একক অধিকর্তা আল্লাহ্। সকলেই এবং সকল কিছুই তাঁর অধীন। সুতরাং তাঁর সকাশে একদিন সকলকেই অসহায় দাসরূপে উপস্থিত হতে হবে। 'প্রভুপালকত্ব ও দাসত্ব'— এটাই তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির স্থায়ী সম্পর্ক। কিন্তু কোনো পিতা তার সন্তানের মালিক বা প্রভুপালক নয়। ধরা যাক, কেউ তার সন্তানের মালিক হলো ক্রয়সূত্রে, উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা

দানসূত্রে। কিন্তু যখনই তার সন্তানের উপর তার মালিকানা প্রযুক্ত হবে, তখনই তো তার সন্তান হয়ে যাবে স্বাধীন। কারণ সন্তান কখনোই ক্রীতদাস বা দাস নয়। সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্‌র সন্তান একটি অবাস্তব ও অসম্ভব ব্যাপার। কোনো সৃষ্টিই তাঁর সন্তান নয়, বরং দাস। আর তিনি একাই সকল কিছুর একক ও অংশীবিহীন প্রভুপালক ও মালিক। তাই দাসরূপে ছাড়া অন্য কোনোরূপে আল্লাহ্‌র সকাশে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না।

এর পরের আয়াতে (৯৪) বলা হয়েছে— 'তাঁর জ্ঞান তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র জ্ঞান আনুরূপ্যবিহীনরূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাই মানুষের ও সমগ্র সৃষ্টির অনস্তিত্ব-স্থায়িত্ব, আদি-অন্ত, প্রকাশ্য-গোপন, রিজিক, হায়াত সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত্ব।

শেষোক্ত আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'এবং কিয়ামতের দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।' এ কথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে হাশরের প্রান্তরে কোনো আপনজন বা সঙ্গী-সাথীকে নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। সেখানে সকলের উপস্থিতি হবে নির্বৈভব, নির্বস্ত্র ও নিঃসঙ্গরূপে।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ থেকে ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর আমার হৃদয়ে মক্কাবাসী কিছু বন্ধুর স্মৃতি জাগ্রত হলো। যেমন শাইবা ইবনে রবীয়া, উত্‌বা ইবনে রবীয়া, উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখ। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সূরা মার্‌য়ামঃ আয়াত ৯৬, ৯৭, ৯৮

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ۝ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝

❏ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে দয়াময় তাহাদিগের জন্য সৃষ্টি করিবেন ভালবাসা।

❏ আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি যাহাতে তুমি উহা দ্বারা সাবধানীদিগকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার।

❑ তাহাদিগের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি! তুমি কি তাহাদিগের কাহাকেও দেখিতে পাও অথবা তাহাদিগের ক্ষীণতম শব্দও শুনিতে পাও?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! যারা আমাকে ও আপনাকে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমি তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দেবো ভালোবাসার বন্ধন অথবা এমন কিছু লোক সৃষ্টি করবো যারা তাদেরকে ভালোবাসবে।

কামুস প্রণেতা বলেছেন, এখানকার 'বুদ্‌দা' শব্দটির অর্থ ভালোবাসা। বুদ্দুন ও বিদাদুন অর্থ— প্রেম ও প্রেমিক। অর্থাৎ একই সঙ্গে শব্দটি ধাতুমূল ও কর্তৃবাচক। অধিক ভালোবাসে যে, তাকে যেমন 'ওয়াদীদ্' বলা হয়, তেমনি বলা হয় 'উদ্'। অর্থাৎ শব্দটি উদ্দেশ্যমূলকও বটে। উল্লেখ্য যে, এই আয়াতে রয়েছে হজরত আবদুর রহমানের জন্য সান্ত্বনার বাণী। আর এই অঙ্গীকারও রয়েছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা প্রেম-ভালোবাসা কাফেরদেরকে না দিয়ে দিয়েছেন ইমানদার-দেরকে। তাদেরকে বানিয়েছেন পারস্পরিক বন্ধু।

তিবরানী তাঁর আল আওসাত পুস্তকে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আলী সম্পর্কে। এরশাদ করেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ব্যতীত সকল বিশ্বাসী ও সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আমি প্রেম-বন্ধন সৃষ্টি করে দিবো। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি যার মওলা, আলীও তার মওলা। এখানে 'মওলা' অর্থ বন্ধু। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আহমদ ও ইবনে মাজা হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে, আহমদ হজরত বুরাইদা থেকে এবং তিরমিজি ও নাসাঈ হজরত জায়েদ বিন আরকাম থেকে।

রসুল স. আরো বলেছেন, আলীর স্মরণ ও ভালোবাসা হচ্ছে ইবাদত। মাসনাদুল ফেরদাউস রচয়িতা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন জননী আয়েশা থেকে। রসুল স. একথাও বলেছেন যে, আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরাইলকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো। জিবরাইল তখন তাকে ভালোবাসে এবং আকাশবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দেয়, আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। আকাশবাসীরাও তখন তাকে ভালোবাসতে থাকে। এভাবে ওই ব্যক্তি হয়ে যায় পৃথিবীবাসীদেরও প্রিয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

আমি বলি, সম্ভবতঃ হাদিসটির মর্মার্থ হবে এরকম— বান্দা আল্লাহ্‌কে মহব্বত করলে, পরিণামে আল্লাহ্‌ও তাকে মহব্বত করেন। তাই এক হাদিসে বলা হয়েছে—আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা নিরবচ্ছিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে লাভ করে আমার নৈকট্য। আমিও তখন তাকে মহব্বত করতে থাকি।

পরের আয়াতে (৯৭) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি এই কোরআন দ্বারা সাবধানীদেরকে সুসংবাদ দিতে পারো এবং বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো।'

এখানে 'বিলিসানিকা' কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! আমি এই কোরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি। 'বি' শব্দটির অর্থ এখানে 'আলা' (উপর), অথবা আমি এই কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি সহজভাবে। আমি বলি 'বিলিসানিকা' কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, আমি কোরআনকে সহজবোধ্য করে দিয়েছি আপনার উম্মতের জন্য আপনার ভাষায় (অন্য ভাষায় অবতীর্ণ হলে আপনার আরবীভাষী স্বজাতিদের বুঝতে অসুবিধা হতো)।

'লুদ্‌দা' শব্দটির অর্থ— বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়, যারা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরেও সত্যকে গ্রহণ করে না, বরং অবতারণা করে বিভিন্ন প্রকার কূটতর্কের, এমনকি নরকপ্রিয় উন্নাসিকেরা বিরুদ্ধাচরণ করতেও পিছ পা হয় না। শব্দটির বহুবচন হচ্ছে 'আলাদ্'। মুজাহিদ বলেছেন, 'আলাদ্' বলে তাদেরকে, যারা কখনো সহজসরল পথ পছন্দ করে না। আবু উবাইদা বলেছেন, মিথ্যার অনুরাগী ও সত্যের বিরোধী ব্যক্তিদেরকে বলে 'আলাদ্'।

আয়াতের শেষে একথাটি পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে যে, সাবধানীদেরকে সুসংবাদ এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সতর্ক করাই কোরআন অবতরণের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি শুভসংবাদ প্রদান ও সতর্ককরণের কাজটিকেই আপনার কর্তব্যকর্মের অন্তর্ভূত রাখুন। অবিশ্বাসীদের অপআচরণ ও অস্বীকৃতিতে মনোক্ষুণ্ন হবেন না। কারণ আপনাকে কষ্ট প্রদান আমার এই কোরআন অবতরণ করার উদ্দেশ্য নয়।

সর্বশেষ আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'তাদের পূর্বে আমি কতো মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি! তুমি কি তাদের কাউকেও দেখতে পাও অথবা তাদের ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও?'

এখানে 'হাল তুহিস্‌সু' কথাটির অর্থ আপনি কি তাদের কাউকে দেখেন? অথবা ওই সকল বিনাশপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর কারো উপস্থিতি কি আপনার নেত্রগোচর হয়? আর 'রিকযা' অর্থ এখানে ক্ষীণতম শব্দ বা গোপন আওয়াজ। শব্দটির আকৃতিই গোপনত্ববোধক। যেমন বলা হয়, 'রাকাযার্ রামহা' (বর্শার অগ্রভাগ মৃত্তিকায় প্রোথিত হয়েছে)।' রিকায' অর্থ মাটিতে পুঁতে রাখা সম্পদ বা গুপ্তধন।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে রসুল স.কে শুভ ও সতর্ক বার্তা প্রচারের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনার শত্রু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো অনেক মানব গোষ্ঠীকে আমি ইতোপূর্বে ধ্বংস করেছি। আপনি কি ওই ধ্বংস প্রাপ্তদের কাউকে দেখতে পান অথবা শুনতে পান কি তাদের ক্ষীণতম কোনো কথা বা চলাচলের আওয়াজ?

আলহামদুলিল্লাহ্। মহান আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় সুরা মারয়ামের তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ ৫ই সফর রবিবার ১২০৩ হিজরীতে।

সূরা ত্বাহা

৮ রুকু এবং ১৩৫ আয়াত সম্বলিত এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ১,২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
طٰهٰ ○ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ○ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ
يَّخْشٰى ○ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ○ اَلرَّحْمٰنُ
عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ○ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ○ وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ
اَخْفٰى ○ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ○

❒ ত্বা'হা,

❒ তোমাকে ক্লেশ দিবার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করি নাই।

❒ ইহা যাহারা ভয় করে কেবল তাহাদিগের উপদেশার্থে,

❒ যিনি সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা তাঁহার নিকট হইতে অবতীর্ণ,

❒ দয়াময় আরশে সমাসীন।

❒ যাহা আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে, এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তাহা তাঁহারই।

❒ তুমি উচ্চকণ্ঠে যাহাই বল না কেন আল্লাহ্ তো যাহা গুপ্ত ও অব্যক্ত তাহা জানেন।

❒ আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁহারই,

---

প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে দু'টি অক্ষর— ত্ব এবং হা। কোরআন মজীদের অনেক সুরার প্রথমে এরকম বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি রয়েছে। এরকম অক্ষর সন্নিবেশনকে বলা হয় 'হরূফে মুক্বাত্তায়াত'। সুরা বাকারার শুরুতে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ত্ব হা আল্লাহ্‌র নাম। এখানে এই নামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র শপথ উচ্চারিত হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে ত্ব হা কথাটির অর্থ হবে ত্ব হা এর শপথ। যেমন রসুল স. একবার বলেছিলেন, হা মিম এর শপথ! ওই অবিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করা হবে না, তারা বিজয়ীও হতে পারবে না। হজরত বারা বিন আজীব থেকে আবু দাউদ তিরমিজি, নাসাঈ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এই শপথ উচ্চারণ করেছিলেন খন্দকের যুদ্ধের সময় রাত্রিকালে।

মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, ত্ব হা অর্থ মাটিকে পদদলিত করা। অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। হজরত আলী থেকে ইবনে মারদুবিয়া তাঁর তাফসীরে এবং বায্‌যার হজরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন সুরা মুজাম্মেলের 'হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি! রাতের কিছু অংশে নামাজের জন্যে দণ্ডায়মান হও' —এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. প্রায় সারারাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পবিত্র চরণযুগল ফুলে যেতো। তিনি স. তখন কখনো ডান পায়ে এবং কখনো বাম পায়ে ভর করে দাঁড়াতে শুরু করলেন। এমতাবস্থায় হজরত জিবরাইল অবতীর্ণ হলেন এবং বললেন, ত্ব হা (হে মোহাম্মদ!) আপনার পদযুগল মাটির উপর স্থিরভাবে রাখুন। মুজাহিদ, আতা ও জুহাক বলেছেন, ত্ব হা অর্থ হে পুরুষপ্রবর। কাতাদা বলেছেন, সুরিয়ানী ভাষায় কথাটির অর্থ হে পুরুষ। কালাবী বলেছেন, কবীলায়ে উকলের পরিভাষায় ত্ব হা অর্থ হে মানুষ। উপসংহার হিসেবে বলতে হয়, এখানে ত্ব হা কথাটির মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। তাই কেউ কেউ বলেছেন, ত্ব হা হচ্ছে রসুল স. এর একটি নাম। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে কথাটির দ্বারা এখানে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কেই।

বাগবী লিখেছেন, কালাবী বলেছেন, যখন মক্কায় রসুল স. এর উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হতে শুরু করলো, তখন তিনি স. প্রায় সমস্ত রাত্রি নামাজ পাঠের মাধ্যমে অতিবাহিত করতে শুরু করলেন। যখন কষ্ট হতো তখন তিনি স. একেক পায়ের উপর একেক বার অধিক ভর করে দাঁড়াতেন। তখন অবতীর্ণ হলো—

'তোমাকে ক্লেশ দিবার জন্য আমি তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! নামাজ পাঠ করতে করতে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, সে জন্য আমি আপনার উপরে কোরআন অবতীর্ণ করিনি।

কামুস রচয়িতা লিখেছেন, এখানে 'শিক্বা' অর্থ ক্লেশ। জওহরী লিখেছেন, 'শাক্বাওয়াত্‌' (ক্লেশ) কথাটি 'সায়াদাত্‌ (স্বস্তি) এর বিপরীতার্থক। স্বস্তি যেমন দুই রকম— ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, ক্লেশও তেমনি দুই ধরনের— দুনিয়ার

ও আখেরাতের। দুনিয়ার স্বস্তি আবার তিন রকম— আর্থিক, দৈহিক ও বাহ্যিক। ক্লেশেরও রয়েছে এই তিনটি প্রকার। পার্থিব দৈহিক অবসাদ, দৌর্বল্য বা ক্লেশকেই বলে দৈহিক বা জিসমানী ক্লেশ। আলোচ্য আয়াতে এই ক্লেশের কথাই বলা হয়েছে। কামুস প্রণেতার মতে 'তাশাক্কা' (ক্লেশ) কথাটি এসেছে 'শিক্বাউন' থেকে। আর জওহরী বলেছেন, 'শাক্বাওয়াতুন' থেকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'তায়াব্' (কষ্টকর) শব্দটির পরিবর্তেও 'শিক্বা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বায়যাবী লিখেছেন, এরকম শব্দব্যবহার ঘটে সাধারণভাবে। যেমন— হুয়াআশ্‌ক্ব মিন রবিদ্বিল মুহরি, সায়্যিদুল ক্বওমি আশক্বাহুম — এরকম আরো অনেক প্রসিদ্ধ প্রবচন রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে 'তাত্য়াব্' এর পরিবর্তে 'তাশক্বা' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে এই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, রসুল স. এর উপরে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে তাঁকে সৌভাগ্যশালী করার জন্য, ক্লেশ প্রদানের জন্য নয়।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর উপরে যখন ওহী অবতীর্ণ হতে শুরু করলো, তখন তিনি পায়ের পাতার উপরে ভর করে প্রায় সমস্ত রাত ধরে নামাজ পাঠ করতে শুরু করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো— 'আপনাকে ক্লেশ দিবার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি'।

আবদ্ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে, রবী বিন আনাস বলেছেন, দীর্ঘক্ষণ ধরে নামাজ পাঠকালে রসুল স. কষ্টের কারণে কখনো কখনো এক পায়ের উপরে অধিক ভর করে দাঁড়াতেন। অপর পায়ে ভর দিতেন হাল্‌কাভাবে। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, রসুল স.কে দীর্ঘক্ষণ ধরে নামাজে মগ্ন থাকতে দেখে অবিশ্বাসীরা বলতে শুরু করলো, কষ্ট দেয়ার নিমিত্তেই মোহাম্মদের উপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের ওই অপকথনের বিরুদ্ধে তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। সম্ভবতঃ ওই অবিশ্বাসীরা বলতে চেয়েছিলো, দেখো হে মোহাম্মদ! তুমি তোমার পিতা, পিতামহের ধর্মাদর্শকে পরিত্যাগ করেছো বলেই তোমাকে এভাবে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তাদের ওই অপবিত্র উক্তি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে। এই ব্যাখ্যাটির সমর্থনে রয়েছে আওফী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের একটি উক্তি রয়েছে। তিনি বলেছেন, অংশীবাদীরা তখন বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ তার প্রভুপালকের কারণে এমতো দুর্ভাগ্যকে বরণ করে নিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, হে আমার রসুল! আপনার প্রতি আমি এই কোরআনকে এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি কষ্টে পতিত হবেন এবং এই দুশ্চিন্তায় নিপতিত হবেন যে ইসলাম দিবালোকের মতো সত্য হওয়া সত্ত্বেও কেনো আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাসী হয় না। হে আমার প্রিয় রসুল! আপনার দায়িত্বতো কেবল সত্য ধর্মের প্রচার । কে ইমান আনলো না আনলো— এমতো দুশ্চিন্তা আপনার দায়িত্বভূত নয়।

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এটা যারা ভয় করে কেবল তাদের উপদেশার্থে।' এখানে 'মাঁই ইয়াখশা' বলে বোঝানো হয়েছে ওই সকল ব্যক্তিকে যাদের অন্তরে রয়েছে ভয় ও নম্রতা। এ ধরনের ব্যক্তিকে ভয় দেখালে তারা উপকৃত হয়। অথবা বুঝানো হয়েছে এমন ব্যক্তিদেরকে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন যে, এদেরকে শাস্তির ভয় দেখালে তারা ভীত হবে। অর্থাৎ আগে থেকেই ভয়ভীতি না থাকলেও যারা আল্লাহ্র শাস্তির কথা শুনলে ভয় পেয়ে যায় তাদেরকে উপদেশ প্রদানার্থেই অবতীর্ণ হয়েছে এই কোরআন।

এর পরের আয়াতে (৪)বলা হয়েছে— 'যিনি সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এটা তাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ।' প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে 'তানযীলা' (অবতীর্ণ)। দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'আন্যালনা'। অর্থ আমরা অবতীর্ণ করেছি। কথাটি বহুবচনবোধক উত্তম পুরুষের শব্দরূপ। আর এখানে আল্লাহ্র সত্তাকে নির্দেশ করা হয়েছে নামপুরুষের মাধ্যমে। এভাবে সত্তাকে (আল্লাহ্) উল্লেখ না করায় বাক্যটি হয়েছে উন্নততর সুষমামণ্ডিত, অলৌকিকত্বমণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশক। এভাবে বলা হয়েছে—এই কোরআন সেই সত্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ, যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশ-মণ্ডলী। বক্তব্যের এমতো উপস্থাপনের মাধ্যমে এখানে নির্ণয় করা হয়েছে একটি ধারাবাহিকতা— আল্লাহ্র কার্যকলাপ, গুণাবলী ও সত্তা। অথবা সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলী। সৃষ্টি হিসেবে প্রথমে উল্লেখ এসেছে পৃথিবীর, কারণ পৃথিবী আমাদের সর্বাধিক নিকটে। তারপর উল্লেখ করা হয়েছে দূরবর্তী সৃষ্টি আকাশের । আর পরবর্তী আয়াতসমূহে এসেছে অন্যান্য সৃষ্টির উল্লেখ।

এখানকার 'আলউ'লা' শব্দটি 'আলউলইয়া' শব্দের বহুবচন। 'উলইয়া' আবার 'আয়লা' শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ।

এর পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'দয়াময় আরশে সমাসীন।' এই আয়াতটি রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতের (আয়াতে মুতাশাবিহাতের) অন্তর্ভুক্ত। বিষয়টি জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী, কার্যকলাপ যেরকম আনুরূপ্যবিহীন, তাঁর আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টিও তদ্রূপ। এরকম আনুরূপ্যবিহীন বিষয় অতি দুর্বোধ্য ও জটিল। সুরা ইউনুসের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

এর পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'যা আছে আকাশ-মণ্ডলীতে, পৃথিবীতে, এই দু'য়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে, তা তাঁরই।' একথার অর্থ— আকাশের চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র, পৃথিবীর নদ-নদী-পাহাড়-অরণ্য এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী মানুষ-ফেরেশতা-শয়তান, বজ্র-বিদ্যুৎ-মেঘ, এবং ভূগর্ভে যা কিছু আছে সকল কিছুর স্রষ্টা, পালনকর্তা ও মালিক হচ্ছেন এক ও অংশীবিহীন আল্লাহ্।

'তাহ্তাছ ছারা' অর্থ ভূগর্ভে যা কিছু আছে। 'ছারা' কথাটির অর্থ আসলে অনির্ণেয় ও অনির্ধারিত। এক হাদিসে এসেছে— একটি পিপাসিত কুকুর 'ছারা' পান করছিলো। শুকনো মাটির উপর পানির ছিটা দিলে তাকে বলে 'ছারাত্ তুরাব'। 'ভূগর্ভ'ও কম রহস্যপূর্ণ নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, পৃথিবী রয়েছে একটি মাছের উপর। মাছটি রয়েছে সমুদ্রের উপর। আর ওই মাছের মাথা ও লেজ মিলিত হয়েছে আরশের নিচে। সমুদ্রটি রয়েছে একটি নীল রঙের প্রস্তরময় মরুভূমির উপরে। হজরত লোকমানের কাহিনীর মধ্যে ওই প্রস্তরময় মরুভূমির কথা উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে— 'ফাতাকুন ফী সাখ্রাতিন্' (এতে হয়ে যাও প্রস্তর)। প্রস্তরময় মরুভূমি রয়েছে আবার একটি ষাঁড়ের শিঙের উপর। আর ষাঁড়টি দণ্ডায়মান রয়েছে 'ছারা' এর উপর। আর 'ছারা'র নিচে কি আছে, তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানেন না। ষাঁড়টি রয়েছে মুখ খোলা অবস্থায়। যখন আল্লাহ্ সকল সমুদ্রকে মিলিয়ে একটি সমুদ্রে পরিণত করবেন, তখন ওই ষাঁড় তার হা করা মুখ দিয়ে সমুদ্রের সকল পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত।

এর পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে — 'তুমি উচ্চ কণ্ঠে যা-ই বলো না কেনো, আল্লাহ্ তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত তা জানেন।' বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যের মূল মর্ম এরকম— হে আমার রসুল! আপনার জিকির ও প্রার্থনা উচ্চ কণ্ঠ সম্বলিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি তো সুপ্ত-গুপ্ত সকল কিছুই জানি। গুপ্তের গুপ্ত বিষয়াবলীও আমার অজানা নেই। আমার মতে বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে এরকম— হে আমার রসুল! আপনি উচ্চকণ্ঠে-নিম্নকণ্ঠে, গোপনে যেভাবেই আমাকে স্মরণ করুন না কেনো, আমি তা কবুল করবো এবং তার যথাবিনিময়ও প্রদান করবো। এখানে 'ইনতাজ্হার বিলক্বওলি' (উচ্চকণ্ঠে যা-ই বলুন না কেনো) কথাটির পরে উহ্য রয়েছে 'আওতুখাফিত্ বিহী' (অথবা যা কিছু বলুন গোপনে)। অন্য আয়াতেও এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'সারাবীলা তাক্বীকুমুল্ হাররা' (পাজামা তোমাদেরকে রক্ষা করে গরম থেকে)। এখানে উহ্য রয়েছে 'ওয়াল বারদা' (এবং ঠাণ্ডা থেকে) কথাটি। কেননা পোশাক কেবল মানুষকে গরম থেকেই রক্ষা করে না, রক্ষা করে ঠাণ্ডা থেকেও।

'সির' এবং 'আখফা' শব্দদ্বয়ের পর্যালোচনাঃ বাগবী লিখেছেন, হাসান বলেছেন 'সির' হচ্ছে ওই গোপন কথা, যা মানুষ গোপনে অন্যের কাছে বলে। আর 'আখফা' হচ্ছে ওই গুপ্ত কথা, যা মানুষ তার হৃদয়েই লুকিয়ে রাখে। হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'সির' হচ্ছে ওই গোপন কথা যা মানুষ মনে রাখে। আর 'আখফা' হচ্ছে ওই কথা যা আল্লাহ্ ভবিষ্যতে তার অন্তরে সৃষ্টি করে দেন। মানুষ বর্তমান গোপনকে জানে কিন্তু ভবিষ্যতের গোপন সম্পর্কে কিছুই জানে না। আর আল্লাহ্ মানুষের মনের অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সব কিছুই জানেন। অর্থাৎ ভবিষ্যতে মানুষ যে কথা প্রকাশ না করে মনে মনে রাখবে, সে কথাও তিনি জানেন।

আলী ইবনে তালহার বর্ণনায় এসেছে, যে কথা মানুষ মনের মধ্যে গোপন রাখে, তা হচ্ছে 'সির'। আর অন্তরের যে গোপন কথা মানুষ নিজেই জানে না, তাকে বলে 'আখফা'। মুজাহিদ বলেছেন, 'সির' হচ্ছে ওই কর্ম যা মানুষ গোপন রাখে। আর 'আখফা' হচ্ছে অন্তরের কুমন্ত্রণা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হৃদয়ের গোপন ও দৃঢ় সংকল্পের নাম 'সির'। আর 'আখফা' হচ্ছে ওই অদৃঢ় ও অনিচ্ছাকৃত খেয়াল, যা হৃদয়ে কখনো কখনো উদিত হয়। জায়েদ ইবনে আসলাম 'আখফা' কথাটিকে মনে করেন অতীতকালবোধক। এর সঙ্গে তিনি যুক্ত করেন 'জানেন' কথাটি। এভাবেই তিনি 'আখফা' শব্দটির অর্থ করেন মানুষের হৃদয়ের অতীতের গোপন কথা, যা সে কাউকে জানায়নি। বলা বাহুল্য যে, এরকম অতীতায়িত গোপনীয়তা সম্পর্কেও আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

সুফী সাধকগণ বলেন, 'সির ও 'আখফা' মানবদেহের অভ্যন্তরভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পাঁচটি লতিফার অন্তর্ভুক্ত মূলের মৌল। ওই লতিফা পঞ্চকের মূল রয়েছে আল্লাহ্র আরশের উপরে সূক্ষ্মজগতে। অবশ্য মানবদেহে ওই পাঁচটি লতিফার প্রভাব, প্রতিক্রিয়া অথবা বিচ্ছুরণ অনুভূত হয়। ওই লতিফা পঞ্চকের নাম— কলব, রূহ, সির, খফি, আখফা। বেলায়েতে আদমের তাজাল্লী বা বিচ্ছুরণ পতিত হয় কলবে, রূহে পতিত হয় বেলায়েতে নুহের জ্যোতিচ্ছটা। এই রূহ লতিফাই আবার বেলায়েতে ইব্রাহিমের নূর পতনের স্থান। বেলায়েতে মুসাবীর তাজাল্লী পতিত হয় সির লতিফায়। খফি লতিফায় জ্যোতিসম্পাত ঘটে বেলায়েতে ঈসাবীর। আর বেলায়েতে মোহাম্মদীর তাজাল্লী বর্ষিত হয় আখফায়।

শেষোক্ত আয়াতে (৮)বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই।' এ বাক্যটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও সিদ্ধান্তমূলক। সুরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত বর্ণিত আয়াতগুলোর উপসংহার টানা হয়েছে এখানে। বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্র জাত, সিফাত ও আফআলের পরিচয়। এভাবে এই সিদ্ধান্তটি ঘোষিত হয়েছে যে— আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং সর্বোত্তম নামসমূহ কেবলই তাঁর। কারণ তিনি পরিপূর্ণ, অক্ষয় ও

আনুরূপ্যবিহীন গুণসমূহের অধিকারী। এরকম গুণরাজি অন্য কারো মধ্যে অথবা কোনো কিছুর মধ্যে একেবারেই নেই। তিনি যেমন অন্য কারো মতো নন, তেমনি তাঁর গুণবত্তা ও কার্যাবলীও অন্য কারো বৈশিষ্ট্য ও কর্মের মতো নয়। সেকারণেই আসমাউল হুসনা বা সর্বোত্তম নামসমূহ কেবলই তাঁর। সূরা আ'রাফের 'ওয়ালিল্লাহিল আসমাউল হুসনা'— এই আয়াতের তাফসীরে আমি এসম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছি। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۘ اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۞ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ۞ اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۞ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ۞ اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۞

❒ মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে কি?

❒ সে যখন আগুন দেখিল তখন পরিবারবর্গকে বলিল, 'তোমরা থাক আমি আগুন দেখিয়াছি। সম্ভবতঃ আমি তোমাদিগের জন্য উহা হইতে কিছু আগুন আনিতে পারিব অথবা আমি উহার নিকটে কোন পথপ্রদর্শক পাইব।'

❒ অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট আসিল তখন আহ্বান করিয়া বলা হইল, হে মূসা!

❒ আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার পাদুকা খুলিয়া ফেল, কারণ, তুমি পবিত্র 'তোয়া' উপত্যকায় রহিয়াছ।

❒ এবং আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি অতএব যাহা প্রত্যাদেশ করা হইতেছে তুমি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।

❒ আমিই আল্লাহ্, আমা ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।

প্রথমেই বলা হয়েছে — মুসার বৃত্তান্ত তোমার নিকটে পৌঁছেছে কি? বাক্যটি এখানে উপস্থিত হয়েছে একটি স্বীকৃতিসূচক জিজ্ঞাসারূপে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! নবী মুসার কাহিনী অবশ্যই আপনাকে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, হজরত মুসার সঙ্গে শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর অনেক মিল রয়েছে। হজরত মুসা সত্য ধর্মের প্রচার ব্যপদেশে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। মুখোমুখি হয়েছেন অনেক প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার। কারণ তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রসুল। সর্বশেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. ছিলেন তাঁর চেয়ে আরো অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। তাই তাঁকেও সহ্য করতে হবে অনেক বিরূপতা ও তিক্ততাকে। সে কারণে তাঁর নবুয়তের দায়িত্ব লাভের প্রথম দিকেই জানানো হয়েছে হজরত মুসার বৃত্তান্ত। এভাবে এই ইঙ্গিতটি দেয়া হয়েছে যে — হে আমার রসুল! শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সত্যধর্মের পতাকাকে সমুন্নত রাখবেন। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে অব্যাহত রাখবেন সত্যধর্মের প্রচার। আপনার পূর্বসূরী নবী মুসাও ছিলেন সহিষ্ণু, নির্ভীক ও অজেয়। আপনাকেও সেরকম হতে হবে। বরং আপনাকে হতে হবে তদপেক্ষা অধিক অটল ও সফল।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'সে যখন আগুন দেখলো, তখন তাঁর পরিবারবর্গকে বললো, তোমরা এখানে থাকো, আমি আগুন দেখেছি।' বাগবী লিখেছেন, হজরত শোয়াইবের কন্যাকে বিবাহ করে হজরত মুসা দীর্ঘ বার বছর কাটিয়ে দিলেন তাঁর শ্বশুরালয়ে। তারপর একদিন মাতা ও ভাইবোনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন মিসর অভিমুখে। তখন ছিলো শীতকাল। প্রধান সড়ক পথে সিরিয়ার সম্রাটের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা ছিলো। তাই তিনি তাঁর পরিবারবর্গসহ ধরলেন অপ্রচলিত পথ। পথিমধ্যে এক স্থানে যাত্রা স্থগিত করলেন তিনি। সেখান থেকে তূর পর্বত ছিলো দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। একে তো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তার উপর ঘনঘোর অন্ধকার রাত্রি। প্রসব বেদনা অনুভব করলেন তাঁর স্ত্রী। প্রয়োজন দেখা দিলো আগুনের। তিনি চকমকি পাথর ঘসে আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সফল হলেন না। হঠাৎ দেখতে পেলেন তূর পর্বতের দিকে কোথাও আগুন জ্বলছে।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুসা ছিলেন অত্যন্ত আত্মসচেতন ব্যক্তি। তাই তিনি তাঁর স্ত্রী ও পরিবারবর্গকে নিয়ে পথ চলতেন রাত্রি বেলায়। এভাবে পথ চলতে চলতে এক ঘন অন্ধকার রাতে পথ হারিয়ে ফেললেন তিনি। ঘোর শীতকাল ছিলো তখন। তিনি চকমকি পাথর ঘষে ঘষে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু হিম পাথর থেকে কিছুতেই আগুন নির্গত হলো না। হঠাৎ তূর পাহাড়ের দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেলেন সেখানে এক স্থানে জ্বলছে আগুন।

পরিবারবর্গের প্রতি হজরত মুসার সম্বোধনটি এখানে বহুবচনবোধক। তাই এখানে বলা হয়েছে 'তোমরা এখানে থাকো আমি আগুন দেখেছি।' তাঁর স্ত্রী ছিলেন নবীতনয়া। তাই এরকম হতে পারে যে, কথাটি তিনি বলেছিলেন কেবল তাঁর স্ত্রীকে। কিন্তু শিষ্টাচারবশতঃ তাঁর সম্বোধনটি ছিলো বহুবচনের। 'তুমি ' না বলে বলেছিলেন 'তোমরা'। অথবা তিনি তখন কথাটি বলেছিলেন তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সদস্যদের লক্ষ্য করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সম্ভবতঃ আমি তোমাদিগের জন্য সেখান থেকে কিছু আগুন আনতে পারবো, অথবা আমি ওই আগুনের নিকট কোনো পথ-প্রদর্শক পাবো।'

'আনাসতু' কথাটির অর্থ এখানে— আমি আগুন দেখছি। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কোনো কোনো অভিধান বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ওইরূপ দ্রষ্টব্যকে 'ইনাস' বলে, যার প্রতি সৃষ্টি হয় অনুরাগ এবং যার মাধ্যমে দূরীভূত হয় ভয়।

'ক্বাবাসিন' অর্থ অগ্নিস্ফুলিংগ। কামুস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, অধিক আগুন থেকে উদগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিংগকে বলা হয় 'ক্বাবাসিন।'

'হুদান' অর্থ পথ-প্রদর্শক। হজরত মুসা এখানে বলতে চেয়েছেন, সম্ভবতঃ ওই আগুনের কাছে গেলে পথের সন্ধানকারী কাউকে পাবো। অথবা 'হুদান' অর্থ ধর্মের পথ-প্রদর্শক। এই অর্থেও শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আদৌ সেখানে কোনো পথ-প্রদর্শক পাওয়া যাবে কিনা, সে সম্পর্কে হজরত মুসা নির্দ্বিধ ছিলেন না। তাই হজরত মুসা এখানে দৃঢ়তাব্যঞ্জক কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করেননি। সাধারণভাবে কেবল বলেছেন 'অথবা আমি সেখানে কোনো পথ-প্রদর্শক পাবো।' এখানে 'আ'লান্ নার' কথাটির অর্থ আগুনের নিকটে।

এর পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট এলো, তখন আহ্বান করে বলা হলো, হে মুসা!' বাগবী লিখেছেন, হজরত মুসা আগুনের নিকটে উপনীত হলেন। দেখলেন, সেখানে সম্পূর্ণ সবুজ একটি বৃক্ষকে ঘিরে জ্বলজ্বল করছে শাদা রঙের এক অলৌকিক আগুন। বৃক্ষটি পুড়ছে না। কোনো প্রকার ধুম্রও নির্গত হচ্ছে না সেখান থেকে। বৃক্ষের সবুজ ও আগুনের শুভ্রতা দু'টোই পরিদৃশ্যমান হচ্ছে একই সঙ্গে সম্মিলিত ও পৃথকরূপে। একটির সঙ্গে অন্যটি মিশছে না।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, বৃক্ষটির রঙ ছিলো গন্ধম বর্ণের সবুজ। কাতাদা, মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, বৃক্ষটি ছিলো উসাজ বৃক্ষ। ওয়াহাব বলেছেন, আলীক। কেউ কেউ বলেছেন দ্রাক্ষাকুঞ্জ। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, হজরত মুসা ওই আগুনকে ভেবেছিলেন পৃথিবীর আগুন। কিন্তু তা পৃথিবীর আগুন ছিলো না, ছিলো নূর। কিন্তু হজরত মুসার ধারণানুসারে এখানে বলা হয়েছে 'নার' (আগুন)। অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, ওই নূর ছিলো আল্লাহ্র নূর। হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইকরামা প্রমুখের অভিমত এরকমই। কিন্তু হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ওই আগুনকে আগুনই বলেছেন, নূর নয়। আরো বলেছেন, ওই আগুনই ছিলো আল্লাহ্র পর্দা। যেমন হজরত আবু মুসা আশআ'রীর বর্ণনায়

এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র পর্দা হচ্ছে আগুন। ওই পর্দা উন্মোচিত হলে তার সৌন্দর্যচ্ছটার প্রভাবে সমগ্র সৃষ্টি ঝলসে যাবে এবং তা পরিব্যাপ্ত হবে সৃষ্টির সম্পূর্ণ সীমানা পর্যন্ত। বাগবীর বর্ণনায় হাদিসটি পরিবেশিত হয়েছে এভাবেই। কিন্তু মুসলিম ও ইবনে মাজার বর্ণনায় 'নার' এর পরিবর্তে এসেছে 'নূর'। অর্থাৎ তাঁর পর্দা হচ্ছে নূর। আমি বলি, নূর ও নার মূলতঃ এক। 'নূর' হচ্ছে অতিসূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ আগুন, যা জ্বালায় না।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুসা সেখানে উপস্থিত হলেন কিছু শুষ্ক তৃণ নিয়ে। আগুনের কাছে যখন গেলেন, তখন ওই আগুন দূরে সরতে শুরু করলো। তিনি কিছুটা পিছিয়ে এলেন। তখন আগুন তাঁর নিকটে চলে এলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি তখন সেখানে স্থাণুর মতো দণ্ডায়মান হলেন। শুনতে পেলেন ফেরেশতাদের মুহুর্মুহু সুবহানআল্লাহ্ সুবহানআল্লাহ্ উচ্চারণ। সাকিনা বা প্রশান্তিপ্রবাহ পরিবেষ্টন করে ফেললো তাঁকে। তিনি শুনতে পেলেন অলৌকিক আহ্বান— হে মুসা! বাগবী লিখেছেন, ওহাব বলেছেন, তখন আওয়াজ ভেসে আসতে শুরু করলো শাদা আগুনে ঘেরা সবুজ বৃক্ষটি থেকে।

এর পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আমিই তোমার প্রতিপালক।' হজরত মুসা বুঝতে পারছিলেন না, কে কথা বলছে এমন করে। তাই তিনি বললেন, আমি তোমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তুমি কোথায়? উত্তর ধ্বনিত হলো— আমি তোমার উপরে, সঙ্গে, সামনে ও পশ্চাতে। আমি তোমার এতো নিকটে যে তুমিও তোমার অতো নিকটে নও। হজরত মুসা তখন নিশ্চিত হলেন, এ বাণী বিশ্বসমূহের প্রতিপালকের। কারণ তিনি ছাড়া শ্রুতির অতীত থেকে কেউ এভাবে কথা বলতে পারে না। এ বাণীতে রয়েছে আনুরূপ্যবিহীনতার রঞ্জন।

বায়যাবী লিখেছেন, যখন হজরত মুসা আহ্বান শুনতে পেলেন, তখন বললেন, কে তুমি? জবাব এলো, আমি আল্লাহ্। শয়তান তখন এইমর্মে কুমন্ত্রণা দিলো যে, না, একথা আল্লাহ্‌র নয়, শয়তানের। কিন্তু সে কুমন্ত্রণা ছিলো অত্যন্ত ক্ষীণ ও প্রভাবহীন। তাই তিনি বুঝতে পারলেন, নিঃসন্দেহে এ কথা আল্লাহ্‌র। কারণ, আমি তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছি সমগ্র অস্তিত্ব ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে। শয়তান কখনো এভাবে দিকের অতীত থেকে কথা বলতে পারে না। তার কথা অধিকার করতে পারে কেবল শ্রুতির সড়ক। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অস্তিত্বের মাধ্যমে তার কথা কখনো শ্রুত হতে পারে না। বর্ণিত ব্যাখ্যাটির মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে, সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র কালাম হজরত মুসার উপরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিলো রূহানীভাবে। তারপর তা প্রভাব বিস্তার করেছিলো ও পরিবেষ্টন করে নিয়েছিলো তাঁর পার্থিব অস্তিত্বকে। তাই তিনি আল্লাহ্‌র কথা শুনতে পাচ্ছিলেন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব তোমার পাদুকা খুলে ফেলো, কারণ তুমি পবিত্র তোয়া উপত্যকায় রয়েছো।'

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, নগ্নপায়ে পবিত্র ভূমিতে গমন করতে হয় আদব বা সম্মান প্রদর্শনার্থে। বাগবী লিখেছেন, এর কারণ বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে মাসউদের একটি বর্ণনায় এভাবে— তাঁর পাদুকা ছিলো মৃতগর্দভের চামড়া নির্মিত। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁর পাদুকা ছিলো কাঁচা চামড়ার। ইকরামা ও মুজাহিদ বলেছেন, ওই পবিত্র ভূমির বরকত থেকে তার পদযুগল যেনো বঞ্চিত না হয়, সে কারণেই তাঁকে দেয়া হয়েছিলো জুতা খুলে ফেলার নির্দেশ। উল্লেখ্য যে, নির্দেশপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হজরত মুসা তাঁর জুতা খুলে ফেলে নিক্ষেপ করেছিলেন দূরের মরুভূমিতে।

ওই উপত্যকার নাম ছিলো তোয়া। জুতা খুলে ফেলার নির্দেশের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় যে, উপত্যকাটি ছিলো পবিত্র। জুহাক বলেছেন, উপত্যকাটি ছিলো নির্জন এবং তুর পর্বতের মতোই দীর্ঘ।

কেউ কেউ বলেছেন, 'তোয়া' শব্দটি একটি মূল শব্দ। শব্দটির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ মেহেরবানীর মাধ্যমে তাঁকে পৌছিয়েছিলেন ওই পবিত্র উপত্যকায়। হজরত মুসা আপন চেষ্টায় সেখানে পৌছতে পারতেন না। কারণ পথ ছিলো অতি দীর্ঘ। উল্লেখ্য যে, 'মুক্বাদ্দাসা ' শব্দটির এক অর্থ— দূরবর্তী। সুফী সাধকগণ বলেন, কলবের উরুজ বা উর্ধ্বারোহণ হয় আরশের উপর পর্যন্ত। কেউ যদি আপন চেষ্টায় সেখানে পৌছতে চেষ্টা করে, তবে তার সময় লাগবে পঞ্চাশ হাজার বছর। কেননা পৃথিবী থেকে আরশের দূরত্ব পঞ্চাশ হাজার বছরের পথের দূরত্বের সমান। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফী ইয়াওমিন কানা মিক্বদারুহু খমসীনা আলফা সানাতিন' (একদিন, তার পরিমাণ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার বৎসর)। কিন্তু পীর মোর্শেদের তাওয়াজ্জোহের ফলে ইজতেবার পথে (বাঞ্ছিত ব্যক্তির পথে) আধ্যাত্মিক পথের পথিক সেখানে পৌছতে পারে এক লহমায়। আল্লামা রুমী তাই বলেছেন—

সায়েরে যাহেদ হর শব রোয রাহ
সায়েরে আরেফ হরদমে তা তখতে শাহ্।

অর্থঃ সাধক ওই শাহী দরবারে পৌছতে পারে অতি কঠোর সাধনার মাধ্যমে। আর যারা আরেফ (আল্লাহ্র পরিচয় ধন্য), তারা সেখানে পৌছায় প্রতিটি প্রশ্বাসে।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি; অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করো। এখানে 'আমি তোমাকে মনোনীত করেছি' কথাটির অর্থ— আমি তোমাকে স্ব-উদ্যোগে নির্বাচিত করেছি আমার বচনবাহকরূপে।

এর পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে—'আমিই আল্লাহ্, আমা ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। অতএব আমার ইবাদত করো।' আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে বিশুদ্ধ তওহীদ গ্রহণ ও পরিশুদ্ধ ইবাদত সম্পাদনের নির্দেশ। আল্লাহ্ সরাসরি এখানে বলেছেন, আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। একথা বিশ্বাসের নামই বিশুদ্ধ তওহীদ। আর কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইবাদত করার নাম হচ্ছে পরিশুদ্ধ বা বিশুদ্ধ ইবাদত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো।' সাধারণভাবে প্রথমে বিশুদ্ধ ইবাদত সম্পাদনের নির্দেশ দেয়ার পর পরই এভাবে দেয়া হয়েছে নামাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ। কেননা নামাজই সর্বোত্তম ইবাদত। রসুল স. বলেছেন, নামাজ ধর্মের স্তম্ভ। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আবু নাঈম ও বায়হাকী হজরত ওমর থেকে। মসনদুল ফিরদাউস গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আলী থেকে।

হজরত আনাস থেকে ইবনে আসাকের কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, নামাজ হচ্ছে ইমানের নূর। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, একবার আমি রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সর্বোত্তম আমল কী? তিনি স. বললেন, নামাজ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, নামাজ পরিত্যাগ করা সত্য প্রত্যাখ্যান সদৃশ। ইমাম আহমদ ও সুনান রচয়িতাবৃন্দ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন হজরত বুরাইদা থেকে। আহমদ, দারেমী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বলেছেন, একবার রসুল স. নামাজের প্রসঙ্গ তুললেন এবং বললেন, যে নামাজের যত্ন করবে, তার জন্য নামাজ কিয়ামতের দিন হবে নূর, প্রমাণ ও পরিত্রাণের পরিলক্ষ্য। যে এরকম করবে না সে সেখানে এসকল কিছুই পাবে না। সে সেখানে সঙ্গী হবে কারূন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সাক্বীক বলেছেন, নামাজ পরিত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোনো আমল পরিত্যাগকে সাহাবীগণ কুফরী মনে করতেন না। এই বর্ণনাটির পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আহমদ বলেছেন, যে স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করে, সে কাফের।

নামাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি পুণ্যকর্ম। সেকারণেও নামাজকে সর্বোত্তম ইবাদত বলা হয়ে থাকতে পারে। রোজাও উত্তম ইবাদতভূত। কারণ এর মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তির প্রভাব পর্যুদস্ত হয়। জাকাতও উত্তম। জাকাতের মাধ্যমে উপকৃত হয় দুঃস্থ জনতা। হজ দ্বারা সম্মান করা হয় আল্লাহ্র গৃহকে। তাই হজও একটি উত্তম ইবাদত।

'লি জিকরী' (আমার স্মরণার্থে) একথা বলে এখানে নির্দেশ করা হয়েছে নামাজের উদ্দেশ্যকে। আল্লাহ্র স্মরণ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে নামাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। নামাজ সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র জিকির। এই স্মরণে নিমগ্ন হয় নামাজীর অন্তর ও বাহির। অনেকে কথাটির মর্মার্থ করেছেন এরকম— আমি পূর্ববর্তী সকল কিতাবে নামাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছি। এখনো দিলাম। সুতরাং আমার পূর্বাপর নির্দেশ স্মরণার্থে তোমরাও নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো। কেউ কেউ আবার অর্থ করেছেন — তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাকে স্মরণ যদি করো, তবে আমিও আমার রহমত ও সন্তোষের সঙ্গে তোমাদেরকে স্মরণ করবো। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার অনুরূপ। তাদের প্রতিটি নিশ্বাস প্রশ্বাসে আমি তাদের সঙ্গী, যদি তারা একাকী মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদেরকে স্মরণ করি আপন অস্তিত্বের মধ্যে। আর দলগতভাবে যদি আমার স্মরণমুখর হয় তবে আমি তাদেরকে স্মরণ করি তদপেক্ষা উত্তম দলের মধ্যে (ফেরেশতাদের দলমধ্যে)। উল্লেখ্য যে, এখানে কেবল নামাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য আয়াতে দেয়া হয়েছে বিস্তারিত নির্দেশ। যেমন— 'আকিমিস সলাতা লিদুলূকিশ শামসি ইলা গসাকিল লাইলি ওয়া কুরআনাল ফাজ্রি'। হজরত জিবরাইল নিজে ইমাম হয়ে রসুল স.কে শিক্ষা দিয়েছিলেন কী নিয়মে কোন সময়ে নামাজ পাঠ করতে হয়।

কোনো কোনো আলেম 'আমার স্মরণার্থে নামাজ কায়েম করো' কথাটির মর্মার্থ করেছেন এভাবে— নামাজ কায়েম করো, যখন নামাজের স্মরণ হয়। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাজের কথা ভুলে যায় অথবা ঘুমের কারণে যার নামাজের সময় শেষ হয়ে যায়, যখন মনে পড়বে অথবা যখন তার ঘুম ভাঙবে তখন সে যেনো তার নামাজ আদায় করে নেয়। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন— আমার স্মরণার্থে নামাজ প্রতিষ্ঠা করো। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে নামাজের ক্ষতিপূরণ হয় না। হজরত আবু কাতাদা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নিদ্রা ও বিস্মৃতি কোনো অপরাধ নয়। জাগ্রত অবস্থায় ও সচেতনভাবে নামাজ পরিত্যাগ করা অপরাধ। সুতরাং বিস্মৃত ও নিদ্রিত ব্যক্তি তার বাদ পড়ে যাওয়া নামাজ সম্পাদন করতে পারবে তখন, যখন তার স্মৃতি জাগ্রত হয় ও ঘুম ভাঙে। কেননা আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন— আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো।

إِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى ○ فَلَا
يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ○ وَمَا تِلْكَ
بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ○ قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى
غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ○ قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ○ فَاَلْقٰهَا فَاِذَا
هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ○ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ○
وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً
اُخْرٰى ○ لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ○ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ○

❑ কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি ইহার সংঘটন মুহূর্ত গোপন রাখিতে চাহি যাহাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে।

❑ সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে উহাতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হইলে তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে।

❑ হে মূসা। তোমার দক্ষিণ হস্তে উহা কি?

❑ সে বলিল, 'উহা আমার লাঠি, আমি ইহাতে ভর দিই এবং ইহা দ্বারা আঘাত করিয়া আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলিয়া থাকি এবং ইহা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।

❑ আল্লাহ্ বলিলেন, 'হে মূসা! তুমি ইহা নিক্ষেপ কর।'

❑ অতঃপর সে উহা নিক্ষেপ করিল, সংগে সংগে উহা সাপ হইয়া ছুটিতে লাগিল,

❑ তিনি বলিলেন 'তুমি ইহাকে ধর, ভয় করিও না, আমি ইহাকে ইহার পূর্বরূপে ফিরাইয়া দিব।

❑ এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা বাহির হইয়া আসিবে নির্মল উজ্জ্বল হইয়া অপর এক নিদর্শন স্বরূপ।

❑ ইহা এই জন্য যে আমি তোমাকে দেখাইব আমার মহা নিদর্শনগুলির কিছু।

❑ ফিরাউনের নিকট যাও সে সীমালংঘন করিয়াছে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এর সংঘটন-মুহূর্ত গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে।' এখানে বিবৃত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত ইবাদতের কারণ। অথবা এখানে মানুষকে সতর্ক করণার্থে উল্লেখ করা হয়েছে কিয়ামত ও কর্মফল লাভের কথা।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের শুরুতে অনুক্ত রয়েছে সংযোজক অব্যয় 'ওয়াও' (এবং)। ওই অনুক্ত শব্দটিসহ বাক্যটি উপস্থাপিত হতে পারে এভাবে— ওয়া ইন্নাস্ সাআ'তা অতিয়াতিন (অবশ্যই মহাপ্রলয় ঘটিতব্য)।

আখ্ফাশ বলেছেন, এখানে 'আকাদু' শব্দটির অর্থ— 'উরীদু'(আমি চাই)। বাগবী লিখেছেন, শব্দটি এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। এর অর্থ— আমি কিয়ামতের নির্ধারিত সময় প্রকাশ করবো না। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতাও এরকম বলেছেন। কিয়ামত কখন হবে— এই নিয়ে মানুষ বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাই এর সঠিক দিন-ক্ষণ গোপন রাখার ঘোষণা দিয়ে মানুষকে অনুগৃহীত করা হয়েছে। আল্লাহ্র জ্ঞানে কিয়ামতের সময় সুনির্ধারিত। সে কারণে এক স্থানে বলা হয়েছে— হয়তো আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী বিদীর্ণ হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তারা দয়াময়ের সন্তান আরোপ করাতে (সুরা মারয়াম)। মোটকথা এই বিশ্বাসটি এখানে অত্যাবশ্যক যে, কিয়ামত বা মহাপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তার সংঘটিত হওয়ার সঠিক দিন-তারিখ আল্লাহ্ দয়া করে গোপন রাখতে চান একারণেই যে, মানুষ যেনো ভীতসন্ত্রস্ত হয় এবং পুণ্যকর্মে লজ্জিত হয়ে কিয়ামতের জন্য থাকে সতত প্রস্তুত। আমি বলি, আলোচ্য বাক্যের মধ্যে সম্ভবতঃ এই ইঙ্গিতটি রয়েছে যে, ইমান ও আল্লাহ্র বিশুদ্ধ ইবাদত এমন এক মর্যাদার ব্যাপার, যা বেহেশত, দোজখ অথবা কিয়ামতের উপর নির্ভরশীল নয়। সওয়াব ও আযাব হবে মানুষের আসল পরিণতি। এই পরিণতি যদি সামনে না-ও থাকতো, তবুও প্রকৃত ইমান ও ইবাদতের মর্যাদা ও সৌন্দর্য এতটুকুও ক্ষুণ্ন হতো না। প্রকৃত ইমান ও বিশুদ্ধ ইবাদতের এমতো বৈশিষ্ট্য না থাকলে দোজখ ও কিয়ামতের ভয় ও বেহেশতের আশা দেখিয়ে মানুষকে ইমানদার বানোনো যেতো না এবং তাদের ইবাদতকেও রাখা যেতো না বিশুদ্ধ। তাই প্রকৃত ইমানদারেরা ইবাদত করে আল্লাহ্র সন্তোষ সাধনার্থে, কোনো কিছুর ভয়ে বা আশায় নয়। রসুল স. একবার হজরত সুহাইব সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, সে খুব উত্তম বান্দা। দোজখের শাস্তির কথা না জানানো হলেও সে কখনো আল্লাহ্র অবাধ্য হতো না। রাবেয়া বসরী বলেছেন, জান্নাতকে জ্বালিয়ে দাও এবং নিভিয়ে দাও জাহান্নামকে। তাহলে মানুষ আতংক ও লালসা ছাড়া কেবল আল্লাহ্র জন্য ইবাদত করতে পারবে।

অধিকাংশ তাফসীরকার এখানকার 'আমি এর সংঘটন মুহূর্ত গোপন রাখতে চাই।' কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি আমার নিজের নিকটেও এই তত্ত্বটি গোপন রাখবো। গোপনীয়তাকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্যই এখানে এরকম বক্তব্যভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে। এই মর্মার্থটি সমর্থনযোগ্য। কারণ এক ক্বেরাতে 'উখ্ফিহা' (গোপন রাখতে চাই) —কথাটির পরে উচ্চারিত হয়েছে 'ফাকাইফা উজ্হিরুহালাকুম'। কিন্তু এ ক্বেরাতটি বিরল। কোনো বিষয়ের গোপনীয়তাকে অত্যধিক গুরুত্বের সঙ্গে রক্ষা করতে চাইলে আরববাসীরা বলে থাকে 'কাতামতু সির্রাকা মিন নাফসি (আমি তোমার গোপন তত্ত্ব নিজের কাছ থেকেও গোপন রাখবো)। কিয়ামত সংঘটনের সময় গোপনে রাখার মধ্যে তাই মানুষের জন্য রয়েছে কল্যাণ। কারণ এতে করে তারা এই মর্মে চিন্তিত থাকবে যে, কখন জানি কিয়ামত সংঘটিত হয়, আর আমি ধ্বংস হয়ে যাই পুণ্যবিহীন অবস্থায়। সুতরাং পাপমুক্তি এবং পুণ্যাভিলাষই হোক আমার সার্বক্ষণিক সাধনা।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'উখফিয়া' এর মধ্যে 'হামযা' ব্যবহৃত হয়েছে সলবে মাখুজ (ধাত্যর্থ বিনাশনার্থে)। এভাবে 'উখফিয়া' কথাটির অর্থ হয় উজহিরাহা (আমি কিয়ামতকে প্রকাশ করবো, এই বিষয়টি সুদূর প্রসারী নয়)। আরবী অভিধানানুসারে 'আখফাহু' কথাটির অর্থ লুকিয়ে রাখা যেমন হয়, তেমনি হয় প্রকাশ করা। বায়যাবী লিখেছেন, 'হামযা'র উপরে যবর দিয়ে 'উখফিয়া'কে 'আখফিয়া' পড়লেও এরকম অর্থ হয়। বাগবী লিখেছেন, শব্দটির 'হামযা' 'যবর' সহযোগে পড়লে অর্থ হয়— আমি প্রকাশ করে দিবো। যেমন বলা হয়— 'আখফাইতুহু' আমি তাকে প্রকাশ করে দিয়েছি। শব্দটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট বলে অর্থ হয় প্রকাশ করা এবং তিনের অধিক অক্ষরবিশিষ্ট হলে অর্থ হয় গোপন রাখা। 'নেহায়া' গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে।

একটি প্রশ্নঃ শব্দটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট (খাফাআ) হলে প্রকাশ করা, আর 'ইখফা' হলে ধাত্যর্থ নাশ অর্থে হয় গোপন করা । আবার প্রসিদ্ধ ক্বেরাত অনুসারে অর্থ দাঁড়ায় প্রকাশ করা। এটা আবার কী করে সম্ভব? 'ইখফা ' অর্থ তো প্রকাশ না করাই হওয়া উচিত ছিলো।

উত্তরঃ আমি বলি, তিন অক্ষর বিশিষ্ট 'খাফা' প্রকাশ করা ও গোপন রাখা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং প্রসিদ্ধ ক্বেরাত অনুসারে প্রকাশ না করার যে অর্থ নেয়া হয়েছে, সেখানে কিন্তু শব্দটি তিন অক্ষর থেকে বৃদ্ধি করে সংযোজিত করা হয়েছে 'হামযা'। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে গোপন করা। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'খাফা'— 'ইয়াখফি'। যেমন 'রামা' 'ইয়ারমী'(দ্বরাবা থেকে)। এভাবে 'খাফইয়া' এবং 'খুফইয়া' এর অর্থ দাঁড়ায় প্রকাশ করা। 'ইখতাফা' এর অর্থও এরকম।

আবার 'খফিয়া' 'ইয়াখফা'। যেমন 'রুব্বিইয়া'— 'ইয়ারব্বা' (সামিয়া থেকে)। মূল শব্দ 'খফিন' হচ্ছে কর্তৃকারক। খফিয়্যুন হচ্ছে সিফাতে মুশাব্বাহ। 'খফিয়্যুন' অর্থ প্রকাশ না করা। সুতরাং 'দ্বরাবা' থেকে আগত 'খফা' এর সঙ্গে 'হামযায়ে কলব' যোগ করলে তখন তার অর্থ হবে গোপন করা, অর্থাৎ প্রকাশ না করা। কেননা 'খফা' অর্থ প্রকাশ করা। আর 'সামিয়া' থেকে উদ্ভূত 'খফিয়া' এর সঙ্গে 'হামযা' যুক্ত করলে শব্দটির অর্থ হবে প্রকাশ হতে না দেয়া বা গোপন করা।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেনো তোমাকে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।' প্রকাশ্যতঃ মনে হয়, এখানে অবিশ্বাসীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেনো তারা হজরত মুসাকে কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র স্মরণার্থে নামাজ প্রতিষ্ঠা থেকে বাধা না দেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানকার নির্দেশটি প্রযোজ্য হবে হজরত মুসার প্রতি এভাবে— হে নবী মুসা! তুমি প্রবৃত্তিতাড়িত অবিশ্বাসীদের কথায় কিছুতেই প্রভাবিত হয়ো না। যদি হও, তবে তুমিও তাদের মতো পরকালে আক্ষেপ করতে থাকবে।

আলোচ্য আয়াতের মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও নিহিত রয়েছে যে, শুভ স্বভাববিশিষ্ট যারা, তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌কে এবং পরকালকে। আর নামাজ প্রতিষ্ঠাও হয় তাদের স্বভাবসম্ভূত কর্ম। সত্যপ্রত্যাখ্যান হয় তাদের সুন্দর স্বভাবের পরিপন্থী। অপরপক্ষে সত্যপ্রত্যাখ্যান ও বক্রতা হয় অবিশ্বাসীদের স্বভাব সন্নিহিত। তাই সত্যের স্বীকৃতি প্রদান হয়ে যায় তাদের স্বভাবের পরিপন্থী একটি বিষয়।

'নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে' কথাটির অর্থ এখানে— তারা অনুগামী হয় তাদের লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনার। চায় কেবল পার্থিব সাফল্য। পরকাল ও পরকালের শাস্তি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অসচেতন।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'হে মুসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে ওটা কী? দৃশ্যতঃ সাধারণ মনে হলেও প্রশ্নটি কিন্তু সাধারণ কোনো প্রশ্ন নয়। এটা হচ্ছে বিস্ময়কর ও ভয়ংকর এক মোজেজার উপক্রমণিকা বা ভূমিকা। সাধারণ একটি লাঠি হবে আল্লাহ্‌র অপার অলৌকিকত্বের প্রকাশস্থল। তাই প্রস্তুতিপর্বের মানসিকতাকে সুতীক্ষ্ণ ও সচেতন করার নিমিত্তে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও এভাবে প্রশ্ন করেছেন— হে মুসা! বলো, তোমার হাতে ওটা কী?

এর পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'সে বললো, এটা আমার লাঠি, আমি এতে ভর দেই এবং এর আঘাতে আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।'

হজরত মুসার ওই লাঠির নাম ছিলো তাবআহ্। বাগবী লিখেছেন লাঠিটির উপরের অংশে ছিলো দু'টি শাখা এবং নিম্নপ্রান্তে ছিলো ছয়টি জোড়া।

'আমি এতে ভর দেই' অর্থ আমি যখন উঁচু কোনো স্থানে আরোহণ করি তখন লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে উঠি, আবার ক্লান্ত হয়ে পড়লেও এতে ভর দিয়ে দাঁড়াই। 'এর আঘাতে আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি' অর্থ আমি আমার ছাগল ভেড়াগুলোকে এই লাঠি দিয়ে গাছ থেকে পাতা পেড়ে দেই। আর 'এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে' অর্থ এই লাঠিতে আমি আমার পানাহারের সামগ্রী বেঁধে নিয়ে দূরের চারণভূমিতে যাতায়াত করি, এর দুটি প্রান্তে কাপড় বেঁধে কখনো কখনো প্রখর রৌদ্রে ছায়ার ব্যবস্থা করি, কূপ থেকে পানি ওঠানোর সময় রশি খাটো হলে লাঠির সঙ্গে বেঁধে পানি ওঠানোর কাজকে করি সহজ, আবার কখনো হিংস্র প্রাণীর আক্রমণও প্রতিহত করি এর মাধ্যমে।

কোনো কোনো আল্লাহ্ প্রেমিক বলেছেন, আল্লাহ্র প্রশ্নের উত্তরে 'এটা আমার লাঠি' বলাই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু হজরত মুসা তার সঙ্গে লাঠির বিভিন্ন উপকারিতার কথা বলে তাঁর বক্তব্যকে করেছেন প্রলম্বিত। প্রিয়তম জনের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতা প্রেমিকগণের একটি চিরাচরিত স্বভাব। হজরত মুসাও তাই প্রেমাতিশয্যবশতঃ তাঁর বক্তব্য দীর্ঘ করে চলেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর স্মরণ হলো মহাবিশ্বের মহাপ্রভুপালকের প্রশ্নের জবাব যথাযথ ও সংযমশোভিত হওয়া সমীচীন, তখন তিনি তাঁর বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করে ফেললেন এভাবে—'এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।' আদব প্রদর্শনার্থেই তিনি তখন উচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করলেন এভাবে। অন্যান্য কাজের বিস্তারিত ফিরিস্তি আর দিলেন না।

এর পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বললেন, হে মুসা! লাঠিটি নিক্ষেপ করো।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ বললেন, হে মুসা! এবার লাঠিতে ভর দেয়ার কথা ভুলে যাও। পরিপূর্ণরূপে আশ্রয় করো আমাকে। লাঠিটি মাটিতে ফেলে দাও। ওহাব বলেছেন, নির্দেশটি পেয়ে হজরত মুসা মনে করেছিলেন হয়তো জুতার মতো লাঠিটিও দূরে ছুঁড়ে ফেলার হুকুম দেয়া হয়েছে। অথচ লাঠিটি কেবল মাটিতে ফেলে দেয়াই ছিলো আল্লাহ্র নির্দেশ। পরক্ষণেই হজরত মুসা তা বুঝতে পারলেন এবং হাতের লাঠি ছেড়ে দিলেন মাটিতে।

এর পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করলো, সঙ্গে সঙ্গে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগলো।' এই সাপের উল্লেখ অন্য আয়াতে এসেছে এভাবে— 'কাআন্নাহা জ্বান্নুন'। 'জ্বান্নুন' বলে ছোট সাপকে, যা অতি দ্রুত নড়াচড়া করতে পারে। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফাইজা হিইয়া ছা'বানুন'। 'ছা'বানুন' বলে অজগরকে। সাপের মধ্যে অজগরই সর্ববৃহৎ। কিন্তু তা

নড়াচড়া করে অত্যন্ত শ্লথ গতিতে। আলোচ্য আয়াতে আবার সাপকে বলা হয়েছে 'হাইয়্যাতুন'। ছোট বড় পুরুষ নারী— সব ধরনের সাপকেই 'হাইয়্যাতুন' বলা যায়। একই সঙ্গে একই সাপের 'জ্বান্নুন' ও 'ছু'বানুন' (ছোট ও বড়) হওয়ার ব্যাপারটি বেশ বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু সমস্যাটি অসমাধাননীয় নয়। ব্যাপারটি ছিলো এরকম— মাটিতে লাঠিটি নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে তা পরিণত হলো লাঠির মাপসম্পন্ন একটি ছোট সাপে। তারপর তা বাড়তে বাড়তে হয়ে গেলো বিরাট অজগর।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আসলে ওই সাপটি অজগর সাপ ছিলো, কিন্তু তা ছিলো ছোট সাপের মতো অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন। তাই বলা হয়েছে— 'কাআন্নাহা জ্বান্নুন' (ছোট সাপের মতো)। ছোট সাপের মতো ও ছোট সাপ নিশ্চয় এক কথা নয়। আবার অন্য স্থানে এসেছে— 'ইজা হিয়্যা ছু'বানুম মুবীন' (হঠাৎ সেটি হয়ে গেলো আজদাহা)। এভাবে বক্তব্য দু'টোকে সম্মিলিত করলে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মাটিতে লাঠি নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে তা পরিণত হলো একটি ছোট সাপে। তারপর তা বাড়তে বাড়তে হয়ে গেলো বৃহদাকৃতির একটি অজগর। সাধারণতঃ অজগর হয় ধীরগতিসম্পন্ন, কিন্তু ওই অলৌকিক অজগরটি ছিলো অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত মুসা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, তাঁর নিক্ষিপ্ত লাঠিটিই পরিণত হয়েছে বিশাল অজগরে। লাঠির উপরের অংশের শাখা দু'টো হয়ে গিয়েছে সাপটির বিরাট চোয়াল। যে স্থানে হাত রেখে তিনি লাঠিটিকে ধরেন সেই স্থানটি হয়েছে তার গর্দান। মাথাটিও বৃহৎ ও কেশবিশিষ্ট। চোখ দু'টো জ্বল জ্বল করছে আগুনের মতো। সাপটি প্রবল আক্রোশে মাঝে মাঝে দাঁতে দাঁত ঘষছে। শোনা যাচ্ছে দন্তঘর্ষণের বিকট আওয়াজ। কখনো কখনো সে গিলে ফেলছে বড় বড় পাথর। আবার কখনো খণ্ড বিখণ্ড করে চিবিয়ে খাচ্ছে গাছপালা। এরকম ভয়ংকর দৃশ্য দেখে হজরত মুসা পালিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হলো প্রিয়তম প্রভুপালকের কথা। লজ্জিত হয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

এর পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে—'তিনি বললেন, তুমি একে ধরো, ভয় কোরো না, আমি একে এর পূর্বের রূপে ফিরিয়ে দিবো।' এখানে 'সীরাতাহাল উলা' অর্থ পূর্বরূপে। 'সীরাতুন্' কথাটি এসেছে 'ফি'লাতুন' এর ওজনে। এর পরোক্ষ অর্থ পদ্ধতি, রূপ, অবস্থা। এভাবে কথাটি দাঁড়িয়েছে— আমি লাঠিটি ফিরিয়ে দিবো পূর্বরূপে, পূর্ব পদ্ধতিতে অথবা পূর্বাবস্থায়।

বাগবী লিখেছেন, হজরত মুসা তখন ছিলেন পশমী পরিচ্ছদাবৃত অবস্থায়। যখন নির্দেশ করা হলো 'খুজহা' (সাপটিকে ধরো) তখন তিনি তাঁর পরিধেয় বস্ত্র হাতে পেঁচিয়ে নিলেন। পুনঃ নির্দেশ ঘোষিত হলো, হস্ত উন্মোচন করো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পরিধেয় বস্ত্রের ভিতর থেকে তাঁর হাত বের করলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, যখন হজরত মুসা পরিধেয় বস্ত্রে তাঁর হাত পেঁচিয়ে নিলেন, তখন কোনো এক ফেরেশতা বললেন, ভ্রাতা মুসা! আপনি ভীত হচ্ছেন কেনো? আল্লাহ্ যদি চান যে, সাপটি আপনাকে দংশন করুক, তবে কি পরিধেয় বস্ত্র সে দংশন ঠেকাতে পারবে? হজরত মুসা বললেন, না। কিন্তু আমি যে আতংকিত। একথা বলার পর হজরত মুসা সাহস করে এগিয়ে গেলেন এবং হাত দিলেন সাপের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে সাপটি পরিণত হলো লাঠিতে।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, এভাবে পূর্বাহ্নেই আল্লাহ্ হজরত মুসাকে মোজেজাটি দেখিয়ে দিলেন, যাতে পরবর্তী সময়ে ফেরাউনের দরবারে তিনি স্বাভাবিক সাহসের সঙ্গে মোজেজাটি প্রদর্শন করতে পারেন। নিজেই যেনো না হয়ে যান ভীত, সন্ত্রস্ত।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসা সফরের সময় তাঁর লাঠিতে খাবার দাবার বেঁধে নিয়ে যাত্রা শুরু করতেন। পথ চলার সময় লাঠিটি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাও বলতো। ওই লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করলে তাঁর সারা দিনের খাবার বের হয়ে আসতো। আর পুঁতে রাখলে তা থেকে উৎসারিত হতো পানির প্রস্রবণ। হাতে উঠিয়ে নিলে আবার তা হয়ে যেতো পূর্ববৎ সাধারণ লাঠি। কোনো ফল খেতে ইচ্ছে করলে লাঠিটিকে তিনি সম্পূর্ণ খাড়া করে মাটিতে প্রোথিত করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। ওই কিছুক্ষণের মধ্যেই লাঠিটি পরিণত হতো সবুজ পাতা ও সুপক্ক ফল বিশিষ্ট একটি বৃক্ষে। কূপ থেকে পানি তুলতে চাইলে তিনি লাঠিটি ধরে রাখতেন কূপের উপর। তখন লাঠিটি বাড়তে বাড়তে মিলিত হতো কূপের পানির সঙ্গে। লাঠিটির দু'মাথা তখন হয়ে যেতো পানি পরিপূর্ণ দু'টি সুরাহী। আবার রাতে ওই অলৌকিক লাঠি থেকে প্রদীপের মতো ঠিকরে পড়তো আলো। প্রহরীর দায়িত্বও পালন করতো যষ্টিটি। পালন করতো নিরাপত্তার দায়িত্বও। প্রতিপক্ষের কেউ আক্রমণ করতে এলে সেটি নিজেই লড়াই করে তাকে হটিয়ে দিতো।

এর পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, হাতটি বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অপর এক নিদর্শনস্বরূপ।' এখানে 'ইয়াদ' অর্থ দক্ষিণ হস্ত। বাগবী লিখেছেন, 'জ্বানাহ্' অর্থ এখানে বাম

বগল। তিনি 'ইলা' শব্দের অর্থ এখানে 'মধ্যে' না করে করেছেন দিকে। এরকম বলেছেন মুজাহিদ। তাঁর অর্থানুসারে বক্তব্যটি দাঁড়ায় এরকম— তুমি তোমার ডান হাত তোমার বাম বগলের দিকে নিয়ে যাও। বাহু থেকে বগলের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত স্থানকে বলে 'জ্বানাহ্'। বায়যাবী লিখেছেন, আসলে 'জ্বানাহ্' বলা হয় পাখির ডানাকে। মানুষের ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয় রূপকার্থে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, বক্ষ পিঞ্জরকে বলে 'জ্বাওয়ানেহ্'। এর একবচন হচ্ছে 'জ্বানিহাতুন'। আর 'জ্বানাহুন' হচ্ছে বাহু, হাত, বগল।

'তাখরুজ' অর্থ বের হবে। 'সূইন' অর্থ মন্দ কোনো কিছু, অসুখ, কুষ্ঠরোগ অথবা এই জাতীয় কোনো ব্যাধি। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে মুসা! তোমার ডান হাত তোমার বাম বগলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাও, তারপর তা বের করে আনো। দেখবে তোমার ওই হাত হয়ে গিয়েছে নির্মল, উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়। হাতের ওই শুভ্রোজ্জ্বলতা কিন্তু শ্বেত-কুষ্ঠ অথবা ওই জাতীয় কোনো রোগের চিহ্ন নয়। ওটি হবে একটি মোজেজা বা নিদর্শন। লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া প্রথম নিদর্শন। আর দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে— ওই শুভ্রোজ্জ্বল নিরোগ হাত। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসা তাঁর ডান হাত বাম বগলে রেখে বের করে আনলে ওই হাত থেকে বিচ্ছুরিত হতো নূর। আর ওই নূর জ্বল জ্বল করতো চন্দ্র, সূর্যের মতো।

এখানে 'আয়াতান উখরা' অর্থ অপর এক নিদর্শনস্বরূপ। এভাবে এখানে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হজরত মুসার নবুয়তের একটি প্রমাণ যষ্টির সর্পরূপ ধারণ এবং অপর একটি নিদর্শন হচ্ছে নিরোগ শুভ্রোজ্জ্বল হাত।

এর পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্যে যে, আমি তোমাকে দেখাবো আমার মহানিদর্শনগুলোর কিছু।' একথার অর্থ— হে আমার নবী মুসা! আমি আমার মহানিদর্শনগুলোর কিছু কিছু তোমাকে এভাবে দেখাবো, যেমন এখন দেখালাম লাঠি ও হাতের মোজেজা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসার সবচেয়ে বড় মোজেজা ছিলো শুভ্রোজ্জ্বল হাত।

শেষের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'ফেরাউনের নিকটে যাও, সে সীমালংঘন করেছে।' একথার অর্থ— হে আমার বাণীবাহক! ফেরাউন উপনীত হয়েছে সীমালংঘনের চরমতম পর্যায়ে। প্রভুপ্রতিপালক বলে ঘোষণা করেছে নিজেকে। তাই তুমি তার নিকটে গিয়ে আমার বাণী প্রচার করো। তাকে আহ্বান জানাও সত্য ধর্মের প্রতি।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ○ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ○ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ○ يَفْقَهُوا قَوْلِي ○ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ○ هَارُونَ أَخِي ○ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ○ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ○ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ○ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ○ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ○

❑ মূসা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দাও।
❑ এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও।
❑ আমার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দাও।
❑ যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে।
❑ আমার স্বজনবর্গের মধ্য হইতে আমার জন্য করিয়া দাও একজন সাহায্যকারী,
❑ আমার ভ্রাতা হারুনকে
❑ তাহার দ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি কর।
❑ ও তাহাকে আমার কর্মে অংশী কর।
❑ যাহাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে পারি প্রচুর।
❑ এবং তোমাকে স্মরণ করিতে পারি অধিক।
❑ তুমি তো আমাদিগের সম্যক দ্রষ্টা।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রভুপালনকর্তা! প্রবল প্রতাপশালী ফেরাউনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য তুমি আমাকে অটল ও অবিচল মন-মানসিকতা দাও। মারেফতের নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও আমার বক্ষদেশকে। দাও নির্ভিকতা, আত্মিক শক্তি ও সাহস, যাতে করে তার প্রতাপ ও পরাক্রম আমার উপরে দূরবর্তী কোনো প্রভাবও বিস্তার করতে সক্ষম না হয়।

হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, হজরত মুসা এখানে এটাই বলতে চেয়েছেন যে, হে আমার প্রভুপালক! আমি যেনো তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই ভয় না করি। বক্ষ প্রশস্ত হওয়ার (শরহে সুদুরের) প্রার্থনা তিনি জানিয়েছেন একারণেই।

পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও।' একথার অর্থ— এবং আমার কর্মসূচীর বাস্তবায়ন সহজ করে দাও, যেনো আমি সত্যধর্ম প্রচারের দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করতে পারি। সকল প্রতিবন্ধকতা যেনো অতিক্রম করতে পারি অনায়াসে। দাও সাহস ও সহিষ্ণুতা ও সফলতা।

এর পরের আয়াতদ্বয়ে (২৭, ২৮) বলা হয়েছে— 'আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও; যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।'

বাগবী লিখেছেন, জ্যোতিষীরা ফেরাউনকে বলেছিলো ইসরাইলী বংশভূত এক মহাপুরুষ আপনাকে ও আপনার সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে ফেলবে। ফেরাউন তাই নির্দেশ জারী করেছিলো, বনী ইসরাইলের সদ্যজাত সকল শিশুকে হত্যা করতে হবে। তার ওই নির্দেশের ফলে শত শত শিশুর প্রাণ বধ করা হলো। কিন্তু লোক চক্ষুর অন্তরালে হজরত মুসার মাতা তাঁর সদ্যজাত শিশুপুত্রকে একটি সিন্দুকের মধ্যে পুরে নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেকলো নীল নদের তীরবর্তী ফেরাউনের এক বালাখানায়। ফেরাউন দম্পতি তাঁকে তুলে নিলো। তারা ছিলো নিঃসন্তান। শিশু মুসাকে দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে গেলো। ঠিক করলো, এই সুন্দর শিশুটিকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করা হবে। সেই থেকে আল্লাহ্র প্রিয় পয়গম্বর প্রতিপালিত হতে লাগলেন আল্লাহ্র দুশমনের গৃহে। একদিন ফেরাউন তাঁকে আদর করে কোলে নিলো। অমনি শিশু মুসা চপেটাঘাত করলেন তার গণ্ডদেশে এবং টান মারলেন তার দাড়ি ধরে। ফেরাউন হলো স্তম্ভিত ও ভীত। স্ত্রী আছিয়াকে বললো আমার মনে হয় এই শিশুটিই আমার কথিত শত্রু। সুতরাং একে হত্যা করাই উত্তম। আছিয়া বললেন, এতো দুগ্ধপোষ্য এক শিশু। ভালো মন্দ বুঝবার জ্ঞান কি এর হয়েছে?

অপর বর্ণনায় এসেছে, ফেরাউন তার পালিত পুত্রের দুগ্ধধাত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলো মুসার আপন মাতাকে। দুগ্ধপানের বয়স শেষ হয়ে যাওয়ার পর হজরত মুসাকে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে আনলো ফেরাউন। সে ও তার স্ত্রী আছিয়া পুত্র স্নেহে প্রতিপালন করতে লাগলো শিশু নবীকে। একদিন খেলাচ্ছলে হজরত মুসা তাঁর হাতের যষ্টি দিয়ে আঘাত করলেন ফেরাউনের মাথায়। ফেরাউন ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করতে মনস্থ করলো। সম্রাজ্ঞী আছিয়া বললেন, মহামান্য সম্রাট! আপনি অযথা ক্রোধান্বিত হচ্ছেন। এই শিশুতো অবুঝ। আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনি তাকে পরীক্ষা করে দেখুন। এ কথা বলে সম্রাজ্ঞী আছিয়া দু'টো পাত্র আনালেন। একটিতে ছিলো মনিমুক্তা এবং অপরটিতে ছিলো টুকরো টুকরো অঙ্গার। পাত্র দু'টো শিশু মুসার নিকটে আনতেই তিনি মনিমুক্তার পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু হজরত জিবরাইল তাঁর হাত ফিরিয়ে দিলেন অঙ্গারের পাত্রটির দিকে। শিশু মুসা তখন সেখান থেকে একটি অঙ্গারের টুকরা তুলে মুখে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জিব পুড়ে ঝলসে গেলো। তখন থেকেই তাঁর জিহ্বায় দেখা দিলো জড়তা।

আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে মুনজির ও ইবনে হাতেমের বর্ণনায় এসেছে হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, একদিন শিশু মুসা ফেরাউনের দাড়ি ধরে টান মারলেন। ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যার হুকুম দিলো। আছিয়া

বললেন, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? মনিমুক্তা ও আগুনের মধ্যে পার্থক্য করার বয়সই তো এর হয়নি। এতো নিতান্তই এক অপগণ্ড শিশু। ফেরাউন তখন আগুন ও মনিমুক্তা ভর্তি দু'টো পাত্র নিয়ে এসে স্থাপন করলো শিশু মুসার সামনে। তিনি মনিমুক্তার পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু হজরত জিবরাইল তাঁর হাত ঠেলে নিয়ে গেলেন আগুনের পাত্রের দিকে। শিশু মুসা তখন এক টুকরা আগুন নিয়ে নিজের মুখে পুরে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জিহ্বা পুড়ে গেলো এবং তখন থেকেই জড়তা সৃষ্টি হলো তাঁর রসনায়।

হজরত মুসার রসনার জড়তা কি সম্পূর্ণ দূর হয়ে গিয়েছিলোঃ এ কথার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন বক্তব্য এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ বলেছেন— 'হে মুসা! তুমি যা চেয়েছো তা তোমাকে দেয়া হলো' (আয়াত ৩৬)। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, হজরত মুসার জিহ্বার জড়তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছিলো। আবার কেউ কেউ বলেন, এক আয়াতে বলা হয়েছে, হজরত মুসা, হজরত হারূন সম্পর্কে বলেছিলেন— 'সে আমার চেয়েও স্পষ্টভাষী।' আর এক আয়াতে বলা হয়েছে, ফেরাউন বলেছিলো— 'এই নিচ লোকের চেয়ে আমি উত্তম। সে তো স্পষ্টভাবে কথাও বলতে পারে না।' এতে করে বোঝা যায়, হজরত মুসার জিহ্বার আড়ষ্টতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়নি। তাছাড়া হজরত মুসা আল্লাহ্র নিকটে তাঁর জিহ্বার জড়তা পূর্ণরূপে দূর করার আবেদনও জানাননি। কেবল বলেছেন— 'যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।' অর্থাৎ তিনি কেবল এতটুকুই চেয়েছিলেন, মানুষ যেনো তাঁর কথা কোনোক্রমে বুঝে নিতে পারে।

এর পরের আয়াতদ্বয়ে (২৯, ৩০) বলা হয়েছে— 'আমার স্বজনবর্গের মধ্য থেকে আমার জন্য করে দাও একজন সাহায্যকারী, আমার ভ্রাতা হারূনকে।' এখানকার 'ওয়াযীরা' অর্থ— উযির, মন্ত্রণাদাতা, সাহায্যকারী। শব্দটি সংকলিত হয়েছে 'বিয্রুন' থেকে। আবার 'ওয়াযরু জাবালিন্' (পর্বতাশ্রয়) থেকেও শব্দটি উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে। সম্রাট যেমন তার মন্ত্রীর সাহায্য নিয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন, হজরত মুসাও তেমনি বিচক্ষণ মন্ত্রণাদাতা হিসেবে রেসালতের মহান কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য চেয়েছিলেন হজরত হারূনকে। মাওয়াযিরাত্ বা পারস্পরিক সাহায্যের বিষয়টি এরকমই। কোনো কোনো অভিধান বিশারদ বলেন, 'ওয়াযীর' শব্দটির প্রকৃতরূপ ছিলো 'আযীর'। 'আয্রুন' থেকে বিশেষণবাচক শব্দরূপ হিসেবে গঠিত হয়েছে 'আযীরুন'। 'আযার' অর্থ শক্তি। যেমন, 'আযীরু ক্বওমী' অর্থ সম্প্রদায়গত শক্তি। এভাবে 'আযীরুন ' অর্থ 'মাযুর'। যেমন, 'আশীরুন অর্থ— মাআ'শীরুন, জালাসুন অর্থ মাজালিসুন ইত্যাদি। এভাবে 'ওয়াও' অক্ষরটিকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বসানো হয়েছে 'হামযা'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— শক্তি সঞ্চারক সঙ্গীরূপে আমার স্বজনবর্গের মধ্য থেকে আমাকে দাও আমার ভ্রাতা হারূনকে।

শেষের পাঁচ আয়াতে (৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫) বলা হয়েছে--- 'তার দ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি করো ও তাকে আমার কর্মে অংশী কর; যাতে আমরা তোমার প্রচুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি এবং তোমাকে স্মরণ করতে পারি অধিক। তুমি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।' একথার অর্থ— ভ্রাতা হারুনের দ্বারা আমার সত্যধর্ম প্রচারের মহান কর্মকাণ্ডকে করো অধিকতর প্রবল এবং তাকে করো আমার সার্বক্ষণিক সতীর্থ ও অংশীদার; যাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমার কথা প্রতুল উচ্চারণ করে ধন্য হই এবং করতে পারি তোমার অত্যধিক স্মরণ। তুমি তো আমাদের প্রকাশ্য-গোপন, আদি-অন্ত সকল কিছুর আনুরূপ্যবিহীন দ্রষ্টা।

কামুস প্রণেতা লিখেছেন, 'আযরী' অর্থ সুদৃঢ় বা সুসংহত। কালাবী বলেছেন, 'নুসাব্‌বিহাকা' অর্থ পবিত্রতার ঘোষণা, বর্ণনা বা উচ্চারণ দ্বারা। আর 'বাসীরা' অর্থ দ্রষ্টা।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَٰمُوسَىٰ ○ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ ○ إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ ○ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِى ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِى ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّى وَعَدُوٌّ لَّهُۥ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىٓ ○

❒ তিনি বলিলেন, 'হে মূসা! তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইল।

❒ এবং আমি তো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করিয়াছিলাম।

❒ যখন আমি তোমার মাতার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছিলাম যাহা ছিল নির্দেশ করিবার,

❒ এইমর্মে যে, তুমি মূসাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর উহা নীল দরিয়ায় ভাসাইয়া দাও যাহাতে দরিয়া উহাকে তীরে ঠেলিয়া দেয়, উহাকে আমার শত্রু ও উহার শত্রু লইয়া যাইবে। আমি আমার নিকট হইতে মানুষের মনে তোমার প্রতি ভালবাসা সঞ্চারিত করিয়াছিলাম, যাহাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের (৩৬, ৩৭) মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ বললেন, হে মুসা! তুমি যা কামনা করেছিলে, তা তোমাকে দান করা হলো এবং তোমাকে তো আমি ইতোপূর্বেও একবার এমতো অনুগ্রহ করেছিলাম। এখানকার 'সুউলুন' (কামনা বা চাহিদা) কথাটি এসেছে 'ফুউ'লুন' এর ওজনে 'মাসউলুন' এর অর্থরূপে। যেমন 'খুবরুন' অর্থ 'মাখবুরুন' এবং 'উকুলুন' অর্থ 'মা'কুলুন'।

এর পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'যখন আমি তোমার মাতার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম, যা ছিলো নির্দেশ করবার।' এখানে 'ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দান' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'আওহাইনা' শব্দটি। এর মর্মার্থ হচ্ছে— ইলহাম বা অনুপ্রেরণা, যা হজরত মুসার জননী পেয়েছিলেন স্বপ্নযোগে, অথবা ওই সময়ের কোনো নবীর জবানীতে অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁকে প্রত্যাদেশ করা হয়েছিলো, একথা মেনে নিলেও বুঝতে হবে যে, ওই প্রত্যাদেশ নবুয়তের পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।

জ্ঞাতব্যঃ ওহী এবং শরিয়তবিশিষ্ট নবুয়ত পেয়ে থাকেন কেবল নবী-রসুলগণ। আর তাঁরা সকলেই হন পুরুষ। এভাবে নবুয়ত ও রেসালতের ধারাক্রম সমাপ্ত হয়েছে শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. পর্যন্ত। অবশ্য ওহী বা প্রত্যাদেশবিহীন নবুয়তের পূর্ণতার ধারাবাহিকতা ইলহামের পদ্ধতিতে অথবা ফেরেশতাদের কথোপকথনের মাধ্যমে অদ্যাবধি প্রবহমাণ। এই প্রবহমাণতা নবুয়তের উত্তরাধিকারিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সরাসরি নবুয়তের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। আর এর জন্য পুরুষ হওয়াও কোনো শর্ত নয়। যেমন হজরত মরিয়মের সঙ্গে ফেরেশতা কথা বলেছিলো। আবার ওলীআল্লাহ্গণ প্রত্যাদেশের প্রতিবিম্বরূপে ইলহামও পেয়ে থাকেন। এ ধরনের কামালিয়াত লাভ হয় আপন আপন নবীগণের পরিপূর্ণ অনুসরণের সূত্রে। শায়েখ মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী তাঁর ফতুহাতে মক্কীয়া গ্রন্থে লিখেছেন, শরিয়তবিশিষ্ট প্রকৃত নবুয়তের ধারাবাহিকতা বিলুপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু নবুয়তের উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতা রুদ্ধ হয়নি। তাই এই উম্মতের কেউ কেউ নবুয়তের উত্তরাধিকারীরূপে ধন্য হয়ে থাকেন। তাঁরা নবী নন, কিন্তু নবীর উত্তরাধিকারী বা যথার্থ প্রতিনিধি। নবী-রসুলগণ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ও শরিয়তের বিধানের প্রবক্তা, ওলীআল্লাহ্গণ তা নন। কারণ তাঁরা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ও শরিয়তের বিধানের প্রবক্তা কোনোটাই নন। রসুল স. তাই বলেছেন, নবুয়ত ও রেসালতের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে আমার নিকটে এসে। সুতরাং আমার পরে আর কোনো নবী নেই। শায়েখ মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী আরো লিখেছেন, নবী-রসুলগণই

আল্লাহ্র সরাসরি নৈকট্যভাজন। তাঁদের সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে, আ'ইনাই ইয়াশরাবু বিহাল মুকাররাবুন (এটা একটি প্রস্রবণ, যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে (সুরা মুতাফ্‌ফিফীন)। আমি বলি, 'মুকার্‌রবীন' বলে পরোক্ষ অর্থে ওলীআল্লাহ্গণকে বুঝানো হয়ে থাকে। কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁরাও আল্লাহ্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হন ইলহামের মাধ্যমে। আমি সুরা নিসা ও সুরা ওয়াকিয়ার তাফসীরে এ ধরনের সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাঁদের ইলহামকে রসুল স. বলেছেন তাহদিছ্। জননী আয়েশা ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম আহমদ, বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে কেউ কেউ ছিলো মুহাদ্দাছ (কথোপকথনকারী)। আমার উম্মতের মধ্যেও কেউ কেউ সেরকম হবে, যেমন ওমর।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, অতীতের কোনো কোনো ইসরাইল বংশভূত সাধুপুরুষের সঙ্গে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কথা বলা হতো, কিন্তু তাঁরা নবী ছিলেন না। আমার উম্মতের মধ্যে যদি কেউ এরূপ হয়, তবে সে হবে ওমর। তিনি স. আরো বলেছেন, আমার পরে যদি কেউ নবী হতো, তবে সে হতো ওমর ইবনে খাত্তাব। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান ও হাকেম, হজরত উকবা ইবনে আমের থেকে, তিবরানী হজরত আসমা ইবনে মালেক ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এবং ইবনে আসাকের হজরত ইবনে ওমর থেকে।

শায়েখ শো'য়রাবী তাঁর এক গ্রন্থে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, ইলহাম কি কোনো মাধ্যম ব্যতীত হতে পারে? এরপর নিজেই তার উত্তরে বলেছেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্তগণ অদৃশ্য যোগাযোগের মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইলহাম লাভ করেন। এই যোগাযোগ সম্পর্কে ফেরেশতারাও অবগত নয়। স্বাভাবিকভাবে মানুষ এই অদৃশ্য যোগসূত্রকে অস্বীকার করে থাকে। তাই হজরত খিজিরের এ ধরনের অদৃশ্য জ্ঞানসূত্রকে তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকার করে বসেছিলেন হজরত মুসা।

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, নবী-রসুলগণ ফেরেশতাদেরকে দেখতে পান স্বচক্ষে। আর নবী-রসুল যারা নন, তাঁরা ফেরেশতাদেরকে দেখেন না বটে, কিন্তু অনুভব করতে পারেন তাদের প্রভাব ও উপস্থিতি। আবার ফেরেশতাদের মাধ্যমেও কখনো কখনো ইলহাম হয়। আবার কখনো কখনো ইলহাম হয় তাদের মাধ্যম ছাড়া, সরাসরি। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সরাসরি প্রক্ষিপ্ত এধরনের ইলহামই সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ। এ ধরনের ইলহাম নবী-রসুলগণও পেয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের ইলহাম ওহীর পর্যায়ভূত, কিন্তু

ওলীআল্লাহ্‌গণের ইলহাম কেবলই ইলহাম, ওহীর পর্যায়ভূত তা কখনোই নয়। শায়েখ আরো বলেছেন, আবুল মাওয়াহিব শাযালী বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি বলে, আমার হৃদয় আমার প্রভুপালকের পক্ষ থেকে আমার সঙ্গে কথা বলেছে, তাহলে ওই ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা বৈধ নয়। কেননা তার একথার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, ইলহামের মাধ্যমে আমার অন্তর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কথা বলেছে। এ ধরনের ইলহামও ওহীর মতো মর্যাদাসম্পন্ন এবং সর্বসাধারণের জন্য অনুসরণীয় নয়। আবার কেউ যদি বলে, আমার প্রভুপালক আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, যেমন তিনি কথা বলেছিলেন হজরত মুসার সঙ্গে— তবে তা হবে প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

আমি বলি, কখনো কখনো ওলীগণের চোখেও ফেরেশতারা দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন হজরত মরিয়ম হজরত জিবরাইলকে দেখেছিলেন এবং সাহাবীগণ ফেরেশতাদেরকে দেখেছিলেন বদর যুদ্ধের সময়।

'মা ইউহা' (অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ) কথাটির অর্থ হতে পারে দু'রকম। একটি হচ্ছে ওই ইলহাম, যা বিবৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ওই ইলহাম, যা বুদ্ধি ও বোধের অতীত। শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এই দুই অর্থেই।

এর পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'এইমর্মে যে, তুমি মুসাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখো, অতঃপর তা নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, যাতে দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেয়, তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে যাবে।'

'ফাল্‌ইউলক্বিহী' (তাকে ঠেলে দিবে) কথাটি এখানে নির্দেশসূচক। কিন্তু এখানে শব্দটি বিধেয়রূপে প্রয়োগিত। অর্থাৎ দরিয়া তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি এখানে নির্দেশসূচকরূপেই ব্যবহৃত । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ দরিয়াকে এইমর্মে হুকুম দিয়েছেন যে, সে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তীরে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দরিয়া বা নদী তো বিবেকসম্পন্ন নয়। সুতরাং তা আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যকর করবে কীভাবে? কিন্তু এখানকার নির্দেশটি হচ্ছে 'কুন' বা 'হও' নির্দেশের আওতাভূত। সুতরাং এই আমল বা নির্দেশ প্রতিপালন করার জন্য বিবেকসম্পন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক নয়। বায়যাবী লিখেছেন, সিন্দুকটিকে কিনারায় পৌঁছে দেয়ার নির্দেশটি নদীর উপর ছিলো অবশ্যপালনীয়। কেননা আল্লাহ্‌ তাকে তখন দিয়েছিলেন ভালোমন্দ বুঝবার ক্ষমতা। তাই সে বুঝেছিলো, এ নির্দেশপালন তার জন্য অত্যাবশ্যক।

সত্যাশ্রয়ী সুফী সাধকগণ বলেন, জড় বস্তু আমাদের দৃষ্টিতে বুদ্ধি-বিবেকহীন। তাই আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। তারাও আমাদের কথা বুঝতে পারে না। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত ও সতত অনুগত। তাই আল্লাহ্‌ তাদেরকে সরাসরি নির্দেশ দিতে পারেন। কোরআন মজীদে এরকম দৃষ্টান্ত

রয়েছে অনেক। যেমন ১. 'এবং মৃত্তিকা তার আপন প্রভুপালয়িতার নির্দেশ মান্য করেছে এবং এটা ছিলো তার জন্য অত্যাবশ্যক'। ২. (আকাশ ও পৃথিবী) বললো, 'আমরা অনুগত হয়ে আগমন করলাম'। রসুল স. বলেছেন, এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে বলে, তোমার উপর দিয়ে এমন কোনো লোক কি অতিক্রম করেছে, যে আল্লাহ্র জিকির করে। আল্লামা রুমী বলেছেনঃ

খাক ও বাদ আব আতশ বান্দাহ্ আনদ
পেশে তো মুরদাহ্ ওয়া বরহক জিন্দাহ্ আনদ

অর্থঃ আগুন পানি মাটি বাতাস আল্লাহ্র বান্দা, তোমার কাছে তারা নিষ্প্রাণ হলেও আল্লাহ্র কাছে জীবিত।

'আমার শত্রু ও তার শত্রু'— একথা বলে বুঝানো হয়েছে, ফেরাউন আল্লাহ্র শত্রু এবং হজরত মুসা আ. এরও শত্রু। তবে একথা ঠিক যে, যখন হজরত মুসাকে সিন্দুকে করে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং যতদিন পর্যন্ত হজরত মুসা ফেরাউনের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, ততদিন পর্যন্ত ফেরাউন তাঁর শত্রু ছিলো না। তাই এখানে 'শত্রু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দু'বার। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— ফেরাউন যেহেতু মুশরিক, তাই সে আল্লাহ্র শত্রু এবং যেহেতু পরবর্তীতে সে হজরত মুসার প্রতিপক্ষ হবে, তাই সে হজরত মুসার ভবিষ্যতের শত্রু। এভাবে দু'বার 'শত্রু' শব্দটি উল্লেখ না করা হলে বর্তমান ও ভবিষ্যত সব একাকার হয়ে যেতো এবং বক্তব্যটিও যথাযথ হতো না। এরকমও হতে পারে যে, ফেরাউন যে সত্য ধর্মের নিশ্চিত শত্রু, এ কথাটিকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্য এখানে পুনঃ পুনঃ 'শত্রু' কথাটি উল্লেখ হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে এরকম বক্তব্যের মাধ্যমে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। কথাটিকে আবার এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়— আগে থেকেই সে আল্লাহ্র ও হজরত মুসার শত্রু ছিলো। আল্লাহ্র শত্রু ছিলো এ কারণে যে, সে ছিলো অংশীবাদী। আর হজরত মুসার শত্রু ছিলো এ কারণে যে, জ্যোতিষীদের কথা শুনে সে হজরত মুসাকে হত্যা করার জন্য আগে থেকেই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলো। 'বনী ইসরাইল বংশদ্ভূত একজন হবে আপনার ও আপনার সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ'— জ্যোতিষীদের একথায় বিশ্বাস করে সে হুকুম জারী করেছিলো, বনী ইসরাইলদের সকল নবজাতককে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরক্ষণেই হত্যা করে ফেলতে হবে। রাজকর্মচারীরা তার এই হুকুম বাস্তবায়নও করেছিলো। বনী ইসরাইলের অসংখ্য শিশু সন্তানকে হত্যা করেছিলো তারা। কিন্তু হজরত মুসাকে চিনতে না পারার কারণে তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। যদি চিনতে পারতো তবে অবশ্যই তারা তাঁকে হত্যা করতো। সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো যে, ফেরাউন আগে থেকেই ছিলো হজরত মুসার দুশমন।

আলোচ্য বাক্যে চারটি স্থানে উল্লেখিত হয়েছে কর্মপদীয় সর্বনাম এবং পাঁচটি স্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে সম্বন্ধপদীয় সর্বনাম। এই সর্বনামগুলো হজরত মুসার সঙ্গে সম্পর্কিত। এরকম হতে পারে যে, এখানকার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্বনামটি (তা, যাতে, তাকে) সর্বনামত্রয় সম্পর্কিত হয়েছে 'সিন্দুক' এর সঙ্গে। কিন্তু একথা মেনে নিলে বক্তব্যটি হয়ে পড়ে বাধাগ্রস্ত ও ধারাক্রমচ্ছিন্ন। নীল দরিয়ায় যাকে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং যাকে দরিয়ার ঢেউ তীরে ঠেলে দিয়েছিলো, তাতো সিন্দুকই ছিলো। কিন্তু ওই সিন্দুকের মধ্যে ছিলেন হজরত মুসা। সুতরাং এখানকার সর্বনামগুলো সিন্দুকের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয়ে সম্পৃক্ত হবে হজরত মুসার সঙ্গে এবং উদ্ধৃত বক্তব্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— মুসাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখো, তারপর মুসাকে বহনকারী ওই সিন্দুক নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, যাতে দরিয়ার ঢেউ হজরত মুসাকে বহনকারী সিন্দুকটিকে তটভূমি পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যায়, তখন সিন্দুকটি খুলে তার মধ্য থেকে নবজাতক মুসাকে নিয়ে যাবে ফেরাউন। সে আমি ও মুসা— দু'জনেরই শত্রু।

বাগবী লিখেছেন, নবীমাতা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলহাম পেয়ে একটি সিন্দুক জোগাড় করলেন এবং ওই সিন্দুকে ধুনাতুলা বিছিয়ে তার উপর শুইয়ে দিলেন প্রাণপ্রিয় আত্মজকে। তারপর সিন্দুকের ঝাঁপ বন্ধ করে সিন্দুকটি ভাসিয়ে দিলেন নীল নদের পানিতে। সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে চললো। নদী থেকে একটি খাল খনন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো ফেরাউনের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে। ভাসতে ভাসতে সিন্দুকটি ওই খাল বেয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে ঠেকলো রাজপ্রাসাদের ঘাটে। পরিচারক-পরিচারিকাপরিবেষ্টিত হয়ে তখন ওই ঘাটে উপবিষ্ট ছিলেন সম্রাজ্ঞী আছিয়া। ঘাটে লেগে থাকা সিন্দুকটির প্রতি প্রথম দৃষ্টি পতিত হলো তাঁর। পরিচারক-পরিচারিকাদেরকে নির্দেশ দিলেন সিন্দুকটি তুলে আনো। তারা সিন্দুকটি তুলে এনে স্থাপন করলো সম্রাজ্ঞী আছিয়ার সামনে। সিন্দুকটির ঝাঁপ খোলা হতেই তিনি দেখলেন, অভ্যন্তরে শায়িত রয়েছে অপরূপ এক শিশু। শিশুটিকে দেখেই তিনি বিমোহিত হয়ে গেলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা শিশুটির জন্য এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিলেন সম্রাজ্ঞীর অন্তরে।

এরপরে বলা হয়েছে— 'আমি আমার নিকট থেকে মানুষের মনে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চারিত করেছিলাম।' এ কথার অর্থ— আমি মানুষের মনে তোমার জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম প্রেম। অথবা— আমার প্রেম-ভালোবাসা আমি ঢেলে দিয়েছিলাম তোমার উপর। তাই মানুষও তোমাকে দেখলে না ভালোবেসে পারতো না। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, সৃষ্টিকুলের দৃষ্টিতেও তোমাকে করেছি

প্রিয়ভাজন। ইকরামা বলেছেন, শিশু মুসাকে যে দেখতো, সে-ই তাঁকে ভালোবাসতে বাধ্য হতো। কাতাদা বলেছেন, হজরত মুসার আঁখিযুগল ছিলো বিস্ময়কর সৌন্দর্যের আকর। তাই যে তাঁকে দেখতো, সে তাঁকে ভালো না বেসে পারতো না।

আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে— আমি আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম তোমার হৃদয়ে। সে ভালোবাসা ক্রমশঃ হলো প্রবল, প্রবলতর। তাই তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্র অন্যান্য মানুষও হয়ে গেলো তোমার প্রেমিক।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেছেন, হজরত মুসা কলিমুল্লাহ্র মাবদায়ে তায়্যুন (সূচনাস্থল) ছিলো প্রেমিকত্বের (মোহেব্বিয়াতের) মূল কেন্দ্র। তাই তিনি সকল প্রেমিকের (মোহেবের) নেতা। আর শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর মাবদায়ে তায়্যুন ছিলো মাহবুবিয়াতের (প্রেমাস্পদত্বের) মূল কেন্দ্র। তাই তিনি প্রেমাস্পদগণের (মাহবুবগণের) অধিনায়ক।

সুফীসাধকগণের অন্তর্দৃষ্টিতে মহব্বতের একটি বৃত্ত ও ওই বৃত্তের কেন্দ্র পরিদৃষ্ট হয়। আরো পরিদৃশ্যমান হয় যে, ওই কেন্দ্রেরও রয়েছে আরেকটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কেন্দ্র। ওই বৃত্তের বিস্তৃতি হচ্ছে খুল্লাতের (বন্ধুত্বের) মাকাম। ওই মাকাম হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্র মাবদায়ে তায়্যুন। আর কেন্দ্রটি মাবদায়ে তায়্যুন হজরত মুসা কলিমুল্লাহ্র। আর কেন্দ্রের কেন্দ্রটি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর। এভাবে সূচিত হয়েছে মহব্বতের তিনটি পৃথক উৎসারণ— মাহবুবিয়াত, মোহেব্বিয়াত, খুল্লাত (প্রেমাস্পদত্ব, প্রেমিকত্ব, বন্ধুত্ব)। এভাবেই রসুল স. হয়েছেন মহাপ্রেমাস্পদ, হজরত মুসা হয়েছেন মহাপ্রেমিক এবং হজরত ইব্রাহিম হয়েছেন মহাবন্ধু। রসুল স. এর উম্মতের মধ্যে অতি নগণ্যসংখ্যক ব্যক্তি প্রেমের উত্তরাধিকার সূত্রে উপনীত হয়েছেন প্রেমাস্পদত্বের স্তরে। সুতরাং তাঁরাও প্রেমাস্পদরূপে আখ্যায়িত। আমি বলি, নিঃসন্দেহে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি ছিলেন এই দুর্লভ মর্যাদার অধিকারী। অর্থাৎ প্রেমাধিকারের সূত্রে তিনিও আল্লাহ্র প্রেমাস্পদ।

শেষে বলা হয়েছে— 'যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।' একথার অর্থ— শত্রুমিত্র সকলেই আমার বান্দা। যাকে যেভাবে খুশী আমি আমার অভিপ্রায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে নির্বাচন করি। শত্রুকুলের মাধ্যমে নিশ্চিত করি আমার প্রিয়ভাজনের সংরক্ষণ ও প্রতিপালন। এভাবে আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমি মুসাকে ফেরাউনের গৃহে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করলাম। সুতরাং শত্রুর ঘরে আমার মিত্রের প্রতিপালন অবশ্যই হবে।

إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ ○ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ○ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِـَٔايَٰتِى وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى ○ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ○ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ○ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ○ قَالَ لَا تَخَافَآ ۖ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ○ فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَٰكَ بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ○ إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ○

❒ যখন তোমার ভগ্নি আসিয়া বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলিয়া দিব কে এই শিশুর ভার লইবে? তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরাইয়া দিলাম যাহাতে তাহার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না পায়; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হইতে মুক্তি দিই, আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করিয়াছি। অতঃপর তুমি কয়েক বৎসর মাদ্‌য়ানবাসীদিগের মধ্যে ছিলে, হে মূসা! ইহার পরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইলে।

❒ এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি।

❒ তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করিও না,

❒ তোমরা দুইজন ফিরাউনের নিকট যাও, সে সীমালংঘন করিয়াছে।

❒ তোমরা তাহার সহিত নম্র কথা বলিবে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে।

❒ তাহারা বলিল, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক' আমরা আশংকা করি সে আমাদিগকে যাওয়া মাত্রই শাস্তি দিবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমা লংঘন করিবে।'

❒ তিনি বলিলেন 'তোমরা ভয় করিও না, আমি তো তোমাদিগের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।'

❒ সুতরাং তোমরা তাহার নিকট যাও এবং বল, 'আমরা তোমার প্রতিপালকের রসূল, সুতরাং আমাদিগের সহিত বনি ইস্‌রাঈলকে যাইতে দাও এবং তাহাদিগকে কষ্ট দিও না, আমরা তো আনিয়াছি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে নিদর্শন এবং যাহারা সৎপথ অনুসরণ করে তাহাদিগের প্রতি শান্তি।

❒ আমাদিগের প্রতি ওহি প্রেরণ করা হইয়াছে, যে-ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয় শাস্তি তাহার জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যখন তোমার ভগ্নি এসে বললো, আমি কি তোমাদেরকে বলে দিবো, কে এই শিশুর ভার নিবে? তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না পায়।' ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— সম্রাজ্ঞী কর্তৃক উদ্ধারকৃত নবজাতক মুসাকে দেখে ফেরাউনও মুগ্ধ হয়ে গেলো। সে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিলো, এই শিশুর দুগ্ধদাত্রী নিযুক্ত করা হোক। রাজকর্মচারীরা নির্দেশটি প্রচার করলো। আগ্রহী মহিলারা জড় হলো নির্দিষ্ট স্থানে। হজরত মুসার বোন দূর থেকে লক্ষ্য রাখছিলেন সিন্দুকটির গতিবিধির দিকে। তিনিও দুগ্ধদানকর্মে আগ্রহী মহিলাদের সমাবেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মহিলারা একে একে অনেকেই শিশু মুসাকে দুধ পান করানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু শিশু মুসা কারোরই দুধ পান করলেন না। তাঁর বোন তখন বললেন, দুগ্ধদাত্রী হিসেবে এক মহিলার সন্ধান আমি দিতে পারি। মনে হয় শিশুটির প্রতিপালনের ভার গ্রহণের জন্য ওই মহিলাটিই সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। রাজকর্মচারীরা তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়ে ডেকে আনলেন তাঁর মাকে। মায়ের কোলে গিয়েই শিশু মুসা দুধ পান করতে শুরু করলেন। এই দৃশ্য দেখে সকলেই আশ্বস্ত হলো। সেই থেকে আপন জননীর ক্রোড়ে রাজ ব্যবস্থায় বেড়ে উঠতে লাগলেন হজরত মুসা। জননীও তাঁর প্রাণাধিক পুত্রকে এভাবে নিজের কাছে পেয়ে স্বস্তি ফিরে পেলেন। জুড়িয়ে গেলো তাঁর চোখ। এ সকল কথাই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে 'ওয়ালা তাহ্‌যান্' অর্থ সে যেনো দুঃখ না পায়। অর্থাৎ হজরত মুসার জননী যেনো তাঁর বুকের মানিককে হারিয়ে শোকাকুলা না হন, তাই আমি এভাবে আমার বিশেষ প্রজ্ঞাময়তার নিদর্শনরূপে আপন মায়ের বুকে ফিরিয়ে দিলাম তার শিশু পুত্রকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে মনোপীড়া থেকে মুক্তি দেই।' এই ঘটনাটি ঘটেছিলো আরো পরে। হজরত মুসা তখন কিশোর অথবা যুবক। একদিন তিনি দেখলেন, এক কিবতী এক বনী ইসরাইলকে অন্যায়ভাবে প্রহার করছে। এই অন্যায় তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি অত্যাচারী কিবতীকে ঘুষি মেরে বসলেন। তাঁর এক ঘুষি খেয়েই কিবতীটি মরে গেলো। হজরত মুসা তাকে হত্যা করতে চাননি। অত্যাচার থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু হঠাৎ তাকে এভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখে তিনি আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হলেন। আল্লাহ্ তাঁর এই অনবধানতা ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু ফেরাউনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণের দুশ্চিন্তাও তখন তাঁকে পেয়ে বসেছিলো। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ মিসর ছেড়ে চলে গেলেন মাদায়েনের দিকে, ফেরাউনের সাম্রাজ্যের বাইরে। এই ঘটনাটিই আলোচ্য বক্তব্যে স্থান পেয়েছে এভাবে— এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে মনোপীড়া থেকে মুক্তি দেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই সময় হজরত মুসার বয়স ছিলো বারো বছর। হজরত কা'ব আহবারও এরকম বলেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া ফাতান্নাকা ফুতূনা' (আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি)। এখানে 'ফুতূনুন' কথাটি এসেছে 'কুউ'দুন্' এর শব্দরূপে। এটি একটি মূল শব্দ এবং শব্দটি বহুবচন। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির মর্মার্থ করেছেন— আমি তোমাকে খুব-ই পরীক্ষা করেছি। জুহাক বলেছেন, আমি তোমাকে যাচাই করেছি খুব। 'ফুতূনুন' শব্দটিকে শব্দমূল এবং কর্মপদ মেনে নিলে কথাটির মর্মার্থ এরকমই হয়। 'আমি তোমাকে বারংবার পরীক্ষা করেছি'— কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে। এরকম অর্থ করলে 'ফুতূনুন' কে বলতে হয় 'ফাতানুন' (পরীক্ষা)। অথবা শব্দটিকে ধরতে হয় 'ফিত্‌নাতুন' এর বহুবচন। আর এমতোক্ষেত্রে শব্দটির শেষ অক্ষর 'তা' কে করে নিতে হবে দৃষ্টিগ্রাহ্য। যেমন, 'হাজ্‌রাতুন' এর বহুবচন 'হাজুরুন' এবং 'বাদরাতুন' এর বহুবচন 'বুদুরুন'।

মুজাহিদ কথাটির অর্থ করেছেন— আমি তাঁকে খাঁটি বানিয়ে নিয়েছি। অর্থাৎ বহু বিপদ-মুসিবতের মাধ্যমে করেছি পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ফুতূনুন' শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে হজরত মুসার বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টের কথা। অবশেষে আল্লাহ্ তাঁর ওই দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটিয়েছিলেন। তাঁর ওই দুঃখ-কষ্টসমূহ ছিলো এরকম— ১. যে বছর বনী ইসরাইলের সকল নবজাতককে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সেই

বছরেই। ২. তাঁকে সিন্দুকে পুরে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিলো অনিশ্চিতির দিকে। ৩. আপন জননী ছাড়া তিনি অন্য কোনো দুগ্ধদাত্রীর দুধ পান করতে চাননি। ৪. ফেরাউন তাঁকে কোলে নিলে তিনি তার দাড়ি ধরে সজোরে টান দিয়েছিলেন। ফলে ফেরাউন তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো। কিন্তু সে নিরস্ত হয়েছিলো সম্রাজ্ঞী আছিয়ার সুপারিশে আগুন ও মনিমুক্তা ভর্তি দু'টো পাত্রের পরীক্ষার মাধ্যমে। ৫.অত্যাচারী কিবতীকে অনিচ্ছাকৃত হত্যার পর তাঁকে দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছিলো সুদূর মাদায়েনে। আমি বলি, আগুনে পুড়িয়ে স্বর্ণকে যেমন বিশুদ্ধ করা হয়, তেমনি করে বিভিন্ন বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে বিশুদ্ধ করে নিয়েছিলেন। স্বজন-বন্ধন ছিন্ন করে কপর্দকহীনভাবে দূর দেশে চলে যাওয়া, সারা পথ ধরে বন্দী হওয়ার ভয়-ভীতি, অচেনা দেশে গিয়ে প্রথমে শ্রমিকরূপে জীবন-যাপন— এ ধরনের অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিলো তাঁকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তুমি কয়েক বৎসর মাদিয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে'। একথার অর্থ— মাদিয়ানে গিয়ে তুমি হয়ে গিয়েছিলে পুরো-দস্তুর শ্রমিক। নবী শোয়েবের কন্যাকে পরে তুমি বিবাহ করতে পেরেছিলে বটে, কিন্তু স্ত্রীর নগদ মোহরানা পরিশোধ করতে পারোনি। ফলে শ্বশুরালয়ে তোমাকে বেছে নিতে হয়েছিলো বকরি চরানোর কাজ। এভাবে সেখানে তোমাকে কাটাতে হয়েছিলো সুদীর্ঘ দশটি বছর। ওয়াহাব বলেছেন, হজরত মুসা হজরত শোয়েবের গৃহে ছিলেন আটাশ বছর। প্রথম দশ বছর শ্রম দিয়ে পরিশোধ করেছিলেন স্ত্রীর মোহরানা। সেখানে থাকতেই তিনি হয়েছিলেন সন্তান-সন্ততির জনক।

এরপর বলা হয়েছে— 'এরপরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে, হে মুসা'! একথার অর্থ— বহু বছর মাদায়েনে বসবাস শেষে মিসরে প্রত্যাবর্তনের পথে আজ এই ঘনঘোর অন্ধকার রজনীতে আমার বিশেষ ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায় প্রত্যাদেশ প্রদানের জন্য তুর পাহাড়ের এই পবিত্র উপত্যকায় তোমাকে এভাবে একাকী উপস্থিত করা হলো হে মুসা! মোহাম্মদ বিন কা'ব কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— হে মুসা! নবুয়তের দায়িত্বদানের নির্ধারিত সময়ে পরিণত বয়সে আমার ইশারায় আজ এখানে তুমি উপস্থিত হলে। উল্লেখ্য যে, সাধারণতঃ চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত ব্যক্তিবর্গকে নবুয়তের দায়িত্ব দান করেন। সুতরাং এখানে 'নির্ধারিত সময়ে' কথাটির অর্থ হতে পারে— হজরত মুসার চল্লিশ বছর বয়সে। আবদুর রহমান ইবনে কায়সান এরকমই বলেছেন। অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা 'নির্ধারিত সময়ে' কথাটির অর্থ করেছেন— নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞানে হজরত মুসার নবুয়তপ্রাপ্তির যে

সময় নির্ধারিত ছিলো, সেই সময়ে, চল্লিশ বছর বয়সে। এই অভিমতটি অংশতঃ মোহাম্মদ বিন কা'বের বর্ণনার সহায়ক।

লক্ষণীয় যে, এখানে বক্তব্যের শেষে 'ইয়া মুসা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এমতো সম্বোধন একান্ত অন্তরঙ্গতার পরিচায়ক এবং গভীরতর প্রেমানুভূতির প্রকাশ। রসুল স. বলেছেন, প্রিয়জনের কথাই প্রেমিকের কণ্ঠে বার বার উচ্চারিত হয়। মাসনাদুল ফিরদাউস রচয়িতা বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন জননী আয়েশা থেকে।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি।' একথার অর্থ— হে আমার নবী! এভাবেই আমি বিশেষ প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তোমাকে মনোনীত করে নিয়েছি আমার প্রিয়জন ও বচনবাহকরূপে, যেনো তোমার অন্তর ও বাহির আমি ছাড়া অন্য কারো প্রতি নিবদ্ধ না হয়। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— এভাবেই আমি তোমাকে সমুন্নত চরিত্রের অধিকারী করেছি। করেছি আমার নৈকট্যভাজন এবং আমার বার্তাবহনের উপযুক্ত পাত্র।

এর পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা করো।' একথার অর্থ— হে নবীপ্রবর! তোমার প্রার্থনার ফলে তোমার ভ্রাতা হারূনকেও করলাম আমার নবী ও তোমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। এখন তোমরা দু'জনে তোমাকে প্রদত্ত আমার মোজেজাসমূহ সহকারে সত্যধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মিসরের সম্রাটের দরবারে গমন করো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'নিদর্শন' বলে বুঝানো হয়েছে ওই নয়টি মোজেজার কথা, যেগুলো আল্লাহ্ নবুয়তের প্রমাণরূপে প্রদান করেছিলেন হজরত মুসাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য কোরো না।' 'তানিয়া' অর্থ শৈথিল্য। 'ফাতা' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'দানা' এর ওজনে। উল্লেখ্য, 'তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা করো'— একথায় বুঝানো হয়েছে, হে মুসা তুমি মিসরের দিকে যাত্রা করো, আর ওদিকে হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ করা হয়েছে— তুমি মুসাকে অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হও। এভাবে নবীভ্রাতৃদ্বয় অগ্রসর হলেন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। হজরত হারূন একদিনের পথ অতিক্রম করতেই দেখতে পেলেন হজরত মুসা এগিয়ে আসছেন। বহুদিন পর এভাবে যখন ভ্রাতৃমিলন ঘটলো, তখন তাঁরা দু'জনেই নবুয়তপ্রাপ্ত। যৌথভাবে তাঁদের স্কন্ধে তখন অর্পিত হয়েছে সত্যধর্ম প্রচারের গুরু দায়িত্ব।

এর পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'তোমরা দুজনে ফেরাউনের নিকটে যাও, সে সীমালংঘন করেছে।' পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে 'তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা করো'। আবার আলোচ্য আয়াতেও সেই হুকুমের পুনরাবৃত্তি করা হলো। এতে করে বুঝা যায়, হজরত মুসা বুঝেছিলেন এক জনের পর একজন যেতে হবে ফেরাউনের কাছে। এই প্রথম হুকুম অনুসারে প্রথমে ফেরাউনের নিকটে গিয়েছিলেন হজরত মুসা একাকী। সেকারণেই পরে হুকুম দেয়া হয়েছিলো, এভাবে একজনের পর একজন নয়, একসঙ্গে দু'জনকে যেতে হবে ফেরাউনের কাছে। কারণ সে সীমালংঘন করেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে— একথা বলা যায় না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, প্রথম নির্দেশটি ছিলো সাধারণ। আর পরের নির্দেশটি ছিলো শর্তযুক্ত। শর্তটি হলো, ফেরাউনের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে হবে নম্রভাবে। পরের আয়াত দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয়।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'তোমরা তার সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলবে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।' একথার অর্থ— হে নবী ভ্রাতৃদ্বয়! তোমরা ফেরাউনকে সত্যের দিকে আহ্বান জানিয়ো নম্র ও কোমল ভাষায়। তোমাদের উত্তম আচরণে সে মুগ্ধ হয়ে যেতেও পারে। যদি সে বুঝতে পারে তোমরা সত্যিসত্যিই সত্য পয়গম্বর, তাহলে সে হয়তো সত্যকে স্বীকার করে নিবে। যদি তা না-ও নেয়, তবে অন্ততঃ ভীত হয়ে পড়বে সে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্তায়ালা সর্বজ্ঞ। তাই ফেরাউন যে সত্যের পথে ফিরে আসবে না, তা তিনি ভালো করেই জানেন। তবুও এখানে 'হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' বলা হয়েছে হজরত মুসা ও হজরত হারুনের জ্ঞানানুসারে। সত্য ধর্মের দাওয়াত দিতে হয় নম্রতার সঙ্গে আশাধারী হয়ে, নৈরাশ্যের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে নয়— এরকম শিক্ষা প্রদান করাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। তাই এখানকার বক্তব্যভঙ্গিটি এরকম।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ফাকুলা লাহু ক্বওলাল লাইয়্যেনা' অর্থ— বাক্যালাপের সময় কঠোর ভাষা ব্যবহার কোরো না। ইকরামা ও সুদ্দী বলেছেন, কথাটির অর্থ— সরাসরি তাকে তার নাম ধরে সম্বোধন কোরো না, সম্বোধন কোরো উপাধি ধরে। উল্লেখ্য, ফেরাউনের উপাধি ছিলো আবুল আব্বাস, অথবা আবুল ওয়ালিদ। মুকাতিল বলেছেন, নম্র কথায় দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের নির্দেশের দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— বলো, তোমার কি এ বিষয়ে আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হবে? আর আমি তোমাকে তোমার প্রভুপালকের পথে পরিচালিত করি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় করো (সুরা নাযিয়াত)। এছাড়া

নম্রভাবে কথা বলতে বলার অন্য কারণও ছিলো। কড়া কথা বললে প্রথমেই ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে যেতো, নবী ভ্রাতৃদ্বয়ের বক্তব্য বুঝবার চেষ্টা সে একেবারেই করতো না। কঠোরতার প্রতিক্রিয়া কঠোরতাই হয়। নম্রতার প্রতিক্রিয়া হয় নম্র। তাই তাঁদেরকে দেয়া হয়েছিলো নম্র কথা বলার নির্দেশ। কেউ কেউ আবার বলেছেন, ফেরাউন হজরত মুসাকে লালন পালন করেছিলো। তাই এ ব্যাপারে হজরত মুসার উপরে ছিলো তার অধিকার। সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য নির্দেশ হজরত মুসা পালন করেছিলেন এভাবে— তিনি বলেছিলেন, হে সম্রাট! আমরা যে আল্লাহ্‌র নবী, তিনিই সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা। আর তিনি মানুষের প্রতি অত্যধিক ক্ষমাপরবশ ও সকলের প্রয়োজন ও প্রার্থনা পূরণকারী। তুমি যদি তাঁকে মেনে নাও, তবে তোমার স্বাস্থ্য ও সাম্রাজ্য হবে পূর্ণরূপে নিরাপদ। মৃত্যু পর্যন্ত কেউ আর তোমাকে রাজক্ষমতা থেকে টলাতে পারবে না। মৃত্যু পর্যন্ত তুমি থাকবে নওজোয়ান। নারী সম্ভোগ ও পানাহারের আস্বাদ থাকবে অটুট। আর মৃত্যুর পর পাবে চিরস্থায়ী সুখের আলয় বেহেশত। হজরত মুসার এরকম জ্ঞানগর্ভ ও কোমল সদুপদেশ শুনে ফেরাউন কিছুটা নরম হয়ে গেলো। কিন্তু তার অভ্যাস ছিলো, তার প্রধান মন্ত্রণাদাতা হামানের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় ছাড়া সে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো না । হামান সেখানে উপস্থিত ছিলো না বলে সে হজরত মুসার কথায় সাড়া দিলো না। কিন্তু প্রত্যাখ্যানসূচক কিছু বললো না। পরে একান্তে হামানকে সে খুলে বললো সব। হামান বললো, মহামান্য সম্রাট! আমি ভাবতাম আপনি প্রকৃতই জ্ঞানী। কিন্তু এখন তো সে পরিচয় আর পাচ্ছি না। আপনাকে সারাদেশের লোক শ্রেষ্ঠ প্রভুপালক বলে মানে। আপনার উপাসনাও করে অকুণ্ঠচিত্তে। আর আপনি তাদের প্রভুপালক হয়ে উপাসনা করতে চান মুসা-হারুনের আল্লাহ্‌র। কেনো? এভাবে প্রভুপালকত্বের সম্মান আপনি পরিত্যাগ করতে যাবেন কোন দুঃখে?

এর পরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা আশংকা করি, সে আমাদেরকে যাওয়া মাত্রই শাস্তি দিবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'সে আমাদেরকে যাওয়া মাত্রই শাস্তি দিবে' কথাটির অর্থ— সে আমাদের মোজেজা সমূহ প্রকাশের পূর্বেই আমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। অথবা প্রদান করবে অন্য কোনো গুরুতর শাস্তি। আরবী পরিভাষানুসারে 'ফারাত্বা আলাইহি' অর্থ শাস্তি প্রদানের জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়া। শব্দটির প্রকৃত অর্থ সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। 'ফারিতুন' অর্থ অগ্রগামী।

'অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে' কথাটির অর্থ— আমাদের কথা শুনে সে হয়তো হয়ে উঠবে আরো বেশী উদ্ধত ও অবাধ্য। হয়তো বনী ইসরাইলের উপরে বাড়িয়ে দিবে তার অত্যাচারের মাত্রা।

এর পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, ভয় কোরো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।' একথার অর্থ— হে নবী ভ্রাতৃদ্বয়। শংকিত হয়ো না। আমার বিশেষ নিরাপত্তা ও সাহায্য তোমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আর আমি সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা। তোমাদের কোনো কিছুই আমার দর্শন ও শ্রবণ বহির্ভূত নয়। সুতরাং তোমরা নির্ভয়ে সত্যের আহ্বান জানাতে থাকো। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— ফেরাউন ও তোমাদের সকল কার্যকলাপ ও বাক্যালাপ আমি দেখি ও শুনি। কারণ আমি তো সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা। সুতরাং হে নবী ভ্রাতৃদ্বয়! তোমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। যখন যে রকম সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখন সে রকম সাহায্যই তোমরা পাবে। মনে রেখো, আমার পক্ষ থেকে তোমরা সতত সাহায্যপ্রাপ্ত। ফেরাউন তোমাদের কিছুই করতে পারবে না।

এর পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা তার নিকট যাও এবং বলো, আমরা তোমার প্রতিপালকের রসুল, সুতরাং আমাদের সঙ্গে বনী ইসরাইলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না।'

এখানে 'আমরা তোমার প্রতিপালকের রসুল' কথাটির অর্থ— হে মিসরাধিপতি! আমরা দু'জন মিসরবাসী কিবতী ও এখানকার বনী ইসরাইল উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্‌র রসুল।

'আমাদের সঙ্গে বনী ইসরাইলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না' অর্থ— আমাদের সঙ্গে তাদেরকে চলে যেতে দাও তাদের পিতৃপুরুষের দেশ সিরিয়ায়। মুক্ত করে দাও তাদেরকে প্রায়-বন্দী মানবেতর জীবন থেকে। তোমার উপাসনা করতে তাদেরকে বাধ্য কোরো না। তাদেরকে নিয়োজিত হতে দাও এক আল্লাহ্‌র আরাধনায়। তাদেরকে আর কষ্ট দিয়ো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা তো এনেছি তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন।' হজরত মুসা দু'টি নিদর্শন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন ফেরাউনের দরবারে— একটি হচ্ছে লাঠির সর্পাকৃতি ধারণ এবং অপরটি শুভ্রোজ্জ্বল হাত। কিন্তু এখানে 'নিদর্শনদ্বয়' না বলে বলা হয়েছে কেবল 'নিদর্শন'। এর কারণ হচ্ছে, নবুয়তের নিদর্শনের কথা প্রকাশ করাই এখানে উদ্দেশ্য। নিদর্শনের সংখ্যা জানানো উদ্দেশ্য নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যারা সৎপথ অনুসরণ করে তাদের প্রতি শান্তি।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ বলছেন, যারা সৎপথের অনুসারী তাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে ও আখেরাতে শান্তি— আমার পক্ষ থেকে, আমার ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে এবং আমার জান্নাতের পরিচারক-পরিচারিকাদের পক্ষ থেকে।

শেষোক্ত আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'আমাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, শাস্তি তার জন্য।' এখানে 'আলআ'জাবা' বা শাস্তি অর্থ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের শাস্তি।

'মান কাজ্জাবা'(মিথ্যা আরোপ করে) অর্থ— যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষগণকে। 'তাওয়াল্লা' অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়। অর্থাৎ অমান্য করে আল্লাহ্‌র বিধানাবলীকে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 'আমরা তোমার প্রতিপালকের রসুল'। আর এই আয়াতে বলা হলো 'যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, শাস্তি তার জন্য।' এতে করে বোঝা যায়, এই কথাটি পূর্ববর্তী আয়াতের উদ্ধৃত কথাটির পরিপূরক। এভাবে বক্তব্য দু'টির মিলিত অর্থ দাঁড়ায়—হে মিসরের নৃপতি! আমরা দু'জন তোমার ও আমাদের প্রভুপালনকর্তার রসুল। আমাদের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলে ও প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমাদের প্রতি অর্পিত বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানে তোমার উপরে আপতিত হবে শাস্তি।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ○ قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ○ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ○ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ○ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ سَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۭ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ○

❒ ফিরাউন বলিল 'হে মূসা! কে তোমাদিগের প্রতিপালক?

❒ মূসা বলিল, 'আমাদিগের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহার যোগ্য আকৃতি দান করিয়াছেন ও তাহার প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়াছেন।'

❒ ফিরাউন বলিল, 'তাহা হইলে অতীত যুগের লোকদিগের অবস্থা কী?'

❒ মূসা বলিল, 'ইহার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট এক কিতাবে আছে; আমার প্রতিপালক ভুল করেন না ও তিনি ভুলিয়াও যান না।

❒ 'যিনি তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বিছানা এবং উহাতে করিয়া দিয়াছেন তোমাদিগের চলিবার পথ, তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং উহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন।'

❒ তোমরা আহার কর ও তোমাদিগের আনয়াম চরাও; অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদিগের জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে—'ফেরাউন বললো, হে মুসা! কে তোমাদের প্রতিপালক?' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র নির্দেশানুসারে নবী ভ্রাতৃদ্বয় উপস্থিত হলেন ফেরাউনের দরবারে এবং যেভাবে তাঁরা আদিষ্ট হয়েছিলেন, সেভাবে উপস্থাপন করলেন তাঁদের বক্তব্য। তাঁদের কথা শুনে ফেরাউন দৃষ্টিনিবদ্ধ করলো হজরত মুসার প্রতি। কারণ তিনি তার গৃহেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তাছাড়া ফেরাউন একথা বুঝতে পেরেছিলো যে, দু'জনেই নবুয়তের দাবিদার হলেও হজরত মুসা হচ্ছেন প্রধান মুখপাত্র। আর তাঁর সঙ্গী ও ভ্রাতা হচ্ছেন তাঁর উপদেষ্টা বা মন্ত্রণাদাতা। 'প্রতিপালকের রসুল'— একথাটি তাকে বিস্মিত করেছিলো। তাই সে বললো, হে মুসা! তোমাদের প্রতিপালক আবার কে?

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন ও তার প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন।' একথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, যে একক ও অংশীবিহীন স্রষ্টা, সকল সৃষ্টির যথাযথ অবয়ব সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেই পবিত্রাতিপবিত্র সত্তাই আমাদের প্রভুপালনকর্তা।

হাসান ও কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন উত্তম উপাদান দ্বারা। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে প্রদর্শন করেছেন কল্যাণের পথ। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে দান করেছেন যথাযথ আকৃতি। তাই সৃষ্ট বস্তুসমূহ তাদের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যসহ বিদ্যমান। তাই মানুষ অন্যান্য প্রাণীর আকৃতিবিশিষ্ট নয়। অন্যান্য প্রাণী ও বস্তুও একে অপরের মতো নয়।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে 'খাল্‌ক্ব' শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকুলকে পুরুষ ও নারী এই দু'ভাবে বিভক্ত করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে স্বাভাবিক প্রজনন ক্রিয়ার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে চলেছে আল্লাহ্‌র পৃথক পৃথক সৃষ্টি— মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি।

কোনো কোনো আলেম মনে করেন, আলোচ্য আয়াতের 'আকৃতিদান' এবং 'প্রকৃতি নির্ধারণ'— এই দু'টি কর্মকে অগ্র-পশ্চাৎরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকুলকে ওই সকল বস্তু দান করেছেন, যা তাদের প্রয়োজন ছিলো। আর নির্ধারণ করেছেন ওই সকল বস্তু, যা তাদের প্রয়োজন হবে। উদ্দিষ্ট বস্তুলাভের উপায়ও তিনি তাদেরকে বলে দিয়েছেন, যেনো সেই উপায় অবলম্বন করে তারা পৌঁছে যেতে পারে তাদের পূর্ণতায়। বায়যাবী লিখেছেন, ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। ব্যাখ্যাটি জড়-অজড় সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বশক্তিধর, একক স্রষ্টা, অসমকক্ষ দাতা, চিরঅমুখাপেক্ষী এবং সৃষ্টিকুল যে তাদের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী— সে কথা অপ্রচ্ছন্নভাবে আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে। ফেরাউন একথা বুঝতে পারলো। তাই সে ঘুরিয়ে নিলো তার বক্তব্যের মোড়।

এর পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী?' একথার অর্থ— ফেরাউন বললো, বুঝলাম। তোমাদের কথাই যদি ঠিক হয়, তাহলে বিগত যুগের লোকদের কি উপায় হবে? তারা তো তোমাদের প্রভুপালনকর্তাকে স্বীকার করেনি। মূর্তিপূজাকেই তারা সত্য বলে জেনেছে। কী হবে তাহলে তাদের পরিণতি?

এর পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট এক কিতাবে আছে; আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং তিনি বিস্মৃতও হন না।' একথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, আদি ও অন্তের সকলের ও সকল কিছুর জ্ঞান আমার পালনকর্তা লওহে মাহ্‌ফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের কোনো কিছুর ভুল ও বিস্মরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

এখানে 'দ্বলাল' অর্থ অবস্থানের বিস্মৃতি। আর 'নিস্ইয়ান' অর্থ অস্তিত্বের বিস্মরণ এখানে শব্দ দু'টো ব্যবহারের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কোনো কিছুর অস্তিত্ব ও তার অবস্থিতি সম্পর্কে বিস্মৃত হওয়া আল্লাহ্‌র পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এরকম বিস্মরণ থেকে তিনি সতত পবিত্র।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'ভুল করেন না' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্‌র নিকটে তাঁর কোনো সৃষ্টিই অদৃশ্য নয় এবং তিনিও তাঁর কোনো সৃষ্টি থেকে জ্ঞানগত দিক থেকে অনুপস্থিত নন। আর 'ভুলেও যান না' কথাটির অর্থ— সৃষ্টিকুলের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, আদি-অন্ত কোনো কিছু তিনি ভুলে যান না। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— তিনি প্রত্যেকের কর্মকাণ্ডসমূহ সম্পর্কে যেহেতু উত্তমরূপে অবগত, তাই তিনি যথাসময়ে প্রত্যেককে দান করবেন যথাবিনিময়। উত্তমকর্মের বিনিময়ে স্বস্তি এবং মন্দকর্মের বিনিময়ে শাস্তি।

এর পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলবার পথ।

'সুলূক' অর্থ পথ পরিক্রমণ। লাজেম (অকর্মক) ও মুতাআদ্দী (সকর্মক) উভয়রূপে ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয়। এক আয়াতে এসেছে— 'লিতাস্লুকু মিনহা সুবুলান ফিজাজা' (যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পারো প্রশস্ত পথে)। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'সালাকাল মাকানা সুলুকা' অর্থ— সে এ স্থানে চলেছে এবং 'সালাকাহু গইরুহু' অর্থ— অন্য কেউ তাকে চালিয়েছে। প্রথমটি লাজেমের উদাহরণ এবং দ্বিতীয়টি উদাহরণ মুতাআদ্দীর। আলোচ্য আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে মুতাআদ্দীরূপে । 'সুবুলান' (চলার পথ) শব্দটি এখানে জরফ (ক্রিয়ার আধার)। কিন্তু এখানে শব্দটি পরোক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়েছে মাফউলে বিহী

(সহকর্মকারক) রূপে। যেমন পরোক্ষার্থে প্রবহমানতার সম্পর্ক করা হয় নদী বা স্রোতস্বিনীর সঙ্গে। বলা হয়—নদী প্রবাহিত হচ্ছে । অথচ নদী কখনো প্রবাহিত হয় না, প্রবাহিত হয় নদীর পানি। নদী তো আসলে পানির ধারক, যার মধ্য দিয়ে স্রোত বয়ে চলে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্ সমভূমিতে ও উচ্চভূমিতে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পথ, যে পথ দিয়ে তোমরা চলো। এভাবে গমন করো পৃথিবীর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সুগম করে দিয়েছেন পৃথিবীর পথ। আমি বলি, উক্তিটি যথার্থ।

বাগবী লিখেছেন, 'সালাকা' অর্থ এক বস্তুকে অন্য বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়া, চালিয়ে দেয়া। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ জমিনের উপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছেন পথ, যে পথে তোমরা পরিভ্রমণ করো। যেমন এক আয়াতে এসেছে—'মা সালাকাকুম ফী সাক্বার (কোন বস্তু তোমাদেরকে দোজখে প্রবেশ করিয়েছে)।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন।' এখানে 'আযওয়াজ্বান' অর্থ বিভিন্ন প্রকারের, বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন স্তরের জুটি। 'মাআন' অর্থ বৃষ্টি। 'শাত্তা' অর্থ বিচিত্র। শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'শাতীতুন'। যেমন মারীদ্বুন শব্দটির বহুবচন 'মারাদ্বা'। বহুধা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ। সেগুলোর উপকারিতাও বহুবিধ। কোনো কোনোটি উপকারে লাগে মানুষের। কোনো কোনোটি পশুর।

এর পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'তোমরা আহার করো ও তোমাদের পশুপাল চরাও।' এখানকার 'আরআ'ও' (চরাও) শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'রাআ' থেকে। শব্দটি লাজেম ও মুতাআদ্দী উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন— চরো ও চরাও। আরববাসীরা বলে— 'রআইতুল ক্বওম'(আমি আমার গোত্রের নিরাপত্তা বিধান করেছি)। আরো বলে, 'ফারাআ'ত'(অতঃপর তারা নিরাপদ হয়ে গিয়েছে)। এখানে শব্দটির মাধ্যমে পশুপাল চরানোর কথাই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে— চরাও। বাক্যটি এখানে নির্দেশসূচক। অর্থাৎ পশুপালের গোশত আহার করা এবং তাদেরকে চরানো— কোনোটাই তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, আগের আয়াতের 'আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন' পর্যন্ত ছিলো হজরত মুসার উক্তি। তারপর থেকে আলোচ্য আয়াতের শেষ পর্যন্ত উল্লেখিত বক্তব্যটি আল্লাহ্র। আল্লাহ্ এই বক্তব্যটি উপস্থাপন করেছেন মক্কাবাসীদেরকে লক্ষ্য করে। কিন্তু অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, ৫২ সংখ্যক আয়াতে 'মুসা বললো' থেকে আলোচ্য আয়াতের শেষ পর্যন্ত বক্তব্যটি হজরত মুসার। এভাবে বক্তব্যটির মূলরূপ দাঁড়ায় এরকম— হজরত

মুসা বললেন, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যার ফলে মাটিতে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ। ওই উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত ফুল, ফল ও ফসল আহার্যরূপে ব্যবহৃত হয় মানুষের এবং পশুর। সুতরাং হে মানুষ! তোমরা ওই আহার্য খাও এবং পশুদেরকে খাওয়াও। আর এই সুন্দর ব্যবস্থাপনা যিনি করেছেন, সেই আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

এরপর বলা হয়েছে— 'অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে, বিবেকসম্পন্নদের জন্য।' একথার অর্থ— পৃথিবীকে সমতল করে পথযাত্রাকে সুগম করার মধ্যে, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মধ্যে এবং ওই বৃষ্টিপাতের দ্বারা মৃত্তিকায় বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ উৎপন্ন করার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র অপার প্রজ্ঞা, পরাক্রম ও সদা বিদ্যমানতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এসকল নিদর্শনের মাধ্যমে কেবল বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিরাই বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ্ই সকল কিছুর একক স্রষ্টা ও পালয়িতা। সৃষ্টির প্রতিপালনের এমতো কুশলী ও নিখুঁত মহা আয়োজনের রহস্যময়তা ধরা পড়ে কেবল তাঁদেরই বোধে, চিন্তায় ও দর্শনে।

এখানে 'উলিন নুহা' অর্থ বিবেকসম্পন্নগণ। 'আন্নুহা' শব্দটি 'নুহ্ইয়াতুন্' এর বহুবচন। 'নুহ্ইয়াতুন্' অর্থ বিবেক, যে বিবেক মানুষকে বিরত রাখে ভুল মত ও পথ থেকে।

সূরা ত্বাহা : আয়াত ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ○ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا
فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ○ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ○ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ
مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ○ قَالَ
مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ○ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ
ثُمَّ أَتَىٰ ○

❑ মৃত্তিকা হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, উহাতেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিব এবং উহা হইতে পুনর্বার তোমাদিগকে বাহির করিব।

❑ আমি তো ফিরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করিয়াছে ও অমান্য করিয়াছে।

❑ সে বলিল, 'হে মূসা! তুমি কি তোমার যাদু দ্বারা আমাদিগকে আমাদিগের দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার জন্য আমাদিগের নিকট আসিয়াছ?

❒ আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করিব ইহার অনুরূপ যাদু, সুতরাং আমাদিগের ও তোমার মধ্যে নির্ধারণ কর এক দিন ও এক মধ্যবর্তী স্থান যাহার ব্যতিক্রম আমরাও করিব না এবং তুমিও করিবে না।'

❒ মূসা বলিল, 'তোমাদিগের নির্ধারিত দিন উৎসবের দিন এবং সেই দিন পূর্বাহ্নে জনগণ সমবেত হইবে।'

❒ অতঃপর ফিরাউন উঠিয়া গেল এবং পরে তাহার যাদুকরদিগকে জমা করিল ও ইহার পর উপস্থিত হইল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃজন করেছি। মৃত্যুর পর আবার ওই মৃত্তিকাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিবো এবং পুনরুত্থান দিবসে পুনরায় তোমাদেরকে বের করবো ওই মৃত্তিকা থেকেই।

মানুষের আদি পিতা হজরত আদমকে নির্মাণ করা হয়েছিলো মাটি দ্বারা। অন্য মানুষকে এভাবে সরাসরি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়নি। মাটি দ্বারা তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পরোক্ষভাবে, শুক্রাণুর মাধ্যমে। আর মানবদেহে শুক্রাণুর সৃষ্টি হয় মৃত্তিকাজাত আহার্য ভক্ষণের মাধ্যমে। বাগবী লিখেছেন, আতা বলেছেন, যে শুক্রকণার মাধ্যমে মানুষের সৃষ্টি হয়, ওই শুক্রকণার সঙ্গে ফেরেশতা মিশিয়ে দেয় সমাধিস্থলের মাটি। এভাবে শুক্রকণিকা ও সমাধিস্থলের মৃত্তিকাসহযোগে পরিগঠিত মানুষের শরীর। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নবজাতকের নাভীমূলে অবশ্যই ওই মাটি থাকে, যে মাটি দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়। আবার আয়ু শেষে মৃত্যুর পর যে মাটি দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো সেই মাটিতেই তাকে দাফন করা হয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন খতিব বাগদাদী এবং বলেছেন হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য। ইবনে জাওজী আবার হাদিসটিকে 'মউজু' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু শায়েখ মীরজা মোহাম্মদ হারেছী বদখশানী বলেছেন, হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এরকম সমঅর্থসম্পন্ন হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং বলতে হয়, হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। তা ছাড়া আরেকটি বর্ণনার মাধ্যমেও খতিব বাগদাদী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটির সত্যতা প্রমাণিত হয়। বর্ণনাটি এই— আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী তাঁর বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থের 'কিতাবুল জানায়েয' অধ্যায়ে লিখেছেন, মোহাম্মদ বিন সিরীন বলেছেন, এ ব্যাপারে যদি আমি কসম খেয়ে বলি, তবে আমার কসম মিথ্যা হবে না, আর এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহও নেই যে, আল্লাহ্তায়ালা রসুল স., হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরকে একই মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমাকে বলেছেন, তোমার কল্যাণ হোক। তোমাকে আমার খামির থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তোমার পিতা আকাশের ফেরেশতাদের সঙ্গে উড্ডয়ন করে।

'মসনদুল ফেরদাউস' গ্রন্থে দায়লামী ও ইবনে নাজ্জারের বর্ণনায় এসেছে, ওই ক্রীতদাস-দাসীর মুক্তকারীর খামীর আমার মাটির অংশ। সম্ভবতঃ রসুল স. একথা বলেছিলেন কোনো এক গোলাম আযাদকারী ব্যক্তি সম্পর্কে। এভাবে আতা খোরাসানীর তাফসীর এবং উপরোল্লিখিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় যে, কোনো কোনো মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে নবী-রসুলগণের খামীর থেকে। সুফী সাধকগণের পরিভাষায় এ বিষয়টিকে বলা হয়, 'ইসালাতুত্তীনাতু' (মৃত্তিকা মিশ্রিত)। শুধু তাই নয়, কাউকে কাউকে আবার সৃষ্টি করা হয়েছে শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর খামীর থেকে। সুফী সাধকগণ এমতো সৃজনকে বলেন 'ইসালাতে কুবরা'(বৃহৎ মিশ্রণ)।

আমি বলি, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্নেই বিষয়টি আল্লাহ্ কর্তৃক সুনির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ কাকে পৃথিবীর কোন অংশের কোন মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করা হবে, তা আল্লাহ্ পূর্বাহ্নেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই মানুষে মানুষে পরিদৃষ্ট হয় যোগ্যতা ও ক্ষমতার পার্থক্য। এ কারণেই নবী ও রসুলগণের জন্মভূমি ও সমাধিক্ষেত্র সন্নিহিত অঞ্চলের মৃত্তিকায় অন্যান্য অঞ্চলের মৃত্তিকা অপেক্ষা বর্ষিত হয় অধিকতর নূর, বরকত ও তাজাল্লী। এভাবে নবীর মৃত্তিকার খামীর বা অবশিষ্টাংশ থেকে যারা সৃষ্ট হন, তাদের জন্মস্থল ও সমাধিভূমি সংলগ্ন অঞ্চলের মৃত্তিকাও বিশেষ নূর, বরকত ও তাজাল্লী দ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং এভাবেই নবীগণের খামীরের বরকত, যারা নবী নন, প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যেও। খেজুরের বৃক্ষ সম্পর্কিত একটি হাদিসেও এই ইঙ্গিতটি রয়েছে। যেমন রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা তোমাদের ফুফুর (খেজুর গাছের) সম্মান কোরো। কেননা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের প্রথম পিতা হজরত আদমের খামীর থেকে। আল্লাহ্র নিকটে খেজুর বৃক্ষের চেয়ে অন্য কোনো বৃক্ষ প্রিয় নয়। খেজুর বৃক্ষের নিচেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহাপুণ্যবতী মরিয়ম বিনতে ইমরানের পুত্র। তোমরা তোমাদের সহধর্মিণী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে পাকা খেজুর খাওয়াও। না পেলে কাঁচাও খাওয়াতে পারো। 'মুসনাদ' গ্রন্থে আবু ইয়া'লী, 'আত্তিব্ব' গ্রন্থে আবু নাঈম, 'ইতিহাস' গ্রন্থে বোখারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম, উকাইলী, ইবনে আদী, ইবনে সিরীন এবং ইবনে মারদুবিয়া হজরত আলী থেকে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, খেজুর, আনার এবং আঙ্গুর গাছ সৃজিত হয়েছে পিতা আদমের মৃত্তিকার অবশিষ্টাংশ থেকে।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী তাঁর মকতুবাত শরীফের তৃতীয় খণ্ডের ৯৯ সংখ্যক মকতুবে 'ইসালাতে কুবরা'র দাবি করেছেন। বলেছেন, আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে রসুল স. এর মৃত্তিকার অবশিষ্টাংশ থেকে। দুঃখের বিষয়, অজ্ঞতা ও হঠকারিতাবশতঃ কেউ কেউ হজরতের বিশুদ্ধ কাশফ্জাত এই প্রজ্ঞাপনটির ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেছে। আল্লাহ্পাকই অধিক পরিজ্ঞাত।

'তারাতান' অর্থ পুনর্বার। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— পুনরুত্থান দিবসে তোমাদের সমাধিস্থিত অস্থিচূর্ণসমূহ ও মাটিতে মিশে যাওয়া অংশসমূহ একত্র করে আমি পুনরায় সৃষ্টি করবো তোমাদের পূর্ণ অবয়ব এবং সেই অবয়বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করবো রূহকে। এভাবে তোমাদের সকলকে দান করবো পুনর্জীবন।

পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'আমি তো ফেরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অমান্য করেছে।' এখানে 'আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম' কথাটির অর্থ— নবী মুসাকে যে নয়টি মোজেজা আমি দিয়েছিলাম, তার সব কয়টিই আমি তাকে দেখিয়েছিলাম। আর 'কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অমান্য করেছে' কথাটির অর্থ— কিন্তু ফেরাউন ওই অভূতপূর্ব দুর্লভ নিদর্শনসমূহ দেখেও ঈমান আনেনি। বরং সত্য নবী মুসাকে বলেছে মিথ্যাবাদী ও যাদুকর। অস্বীকার করেছে তাঁর আনুগত্যকে।

এর পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে মুসা! তুমি কি তোমার যাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দিবার জন্য আমাদের নিকটে এসেছো?' এ কথার অর্থ— ফেরাউন বললো, হে মুসা! তোমার মতলব কী? তুমি কি এ সকল ভেলকিবাজি দেখিয়ে আমাদেরকে ভীত ও বিতাড়িত করে এদেশে তোমার রাজত্ব কায়েম করতে চাও?

এর পরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করবো এর অনুরূপ যাদু, সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে নির্ধারণ করো এক দিন ও এক মধ্যবর্তী স্থান, যার ব্যতিক্রম আমরাও করবো না এবং তুমিও করবে না।' এ কথার মাধ্যমে ফেরাউন হজরত মুসার মোজেজাসমূহকে প্রতিহত করবার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। আস্ফালন করেছে এই বলে যে,

তোমার যাদুর মোকাবিলা আমরা করবোই করবো। তারিখ ও স্থান ঠিক করো। নির্ধারিত দিনে এক উন্মুক্ত স্থানে তোমার ও আমাদের মধ্যে যাদুর প্রতিযোগিতা হবে। ওই প্রতিযোগিতা থেকে আমরা পিছপা হবো না, তুমিও পিছপা হতে পারবে না।

এখানে 'মাওই'দা' শব্দটি 'ওয়াদা' বা অঙ্গীকার প্রকাশক। শব্দটি সময়সম্পৃক্ত অথবা স্থানসম্পৃক্ত নয়। কারণ বিরোধিতার সম্পর্ক সকল ক্ষেত্রে অঙ্গীকার বা প্রতিযোগিতার সঙ্গে হয়, সময় বা স্থানের সঙ্গে হয় না।

'মাকানান সুওয়ান' অর্থাৎ মধ্যবর্তী স্থান। অর্থাৎ তোমার ও আমাদের দল থাকবে সমদূরত্বে। এরকম অর্থ করেছেন কাতাদা ও মুজাহিদ। এক বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতও এরকম। কালাবী বলেছেন, শব্দটির অর্থ —এখানে নয়, অন্য কোনো স্থানে।

এর পরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, তোমাদের নির্ধারিত দিন উৎসবের দিন এবং সেই দিন পূর্বাহ্নে জনগণ সমবেত হবে।' এখানে 'মাওইদা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে স্থান প্রকাশকরূপে। এভাবে বলা হয়েছে— হজরত মুসা বললেন, ঠিক আছে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে তোমাদের উৎসবের স্থানে, উৎসবের নির্দিষ্ট দিনে, যাতে সর্বজনসমক্ষে বিষয়টি সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত হয়।

মুজাহিদ, কাতাদা, মুকাতিল ও সুদ্দী বলেছেন, মিসরবাসী সকলে একটি বাৎসরিক উৎসবে সমবেত হতো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওই উৎসব চলতো নয় দিন ধরে। হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, উৎসব শুরু হতো মহররমের দশ তারিখ থেকে।

'দুহা' অর্থ চাশতের সময়। অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের পূর্বে। ওই সময় সকল কিছু সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। তাই হজরত মুসা বলেছিলেন, ওই সময়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

এর পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর ফেরাউন উঠে গেলো, পরে তার যাদুকরদেরকে জমা করলো ও এরপর উপস্থিত হলো।' একথার অর্থ— ফেরাউন হজরত মুসার সঙ্গে এভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে রাজদরবার থেকে প্রস্থান করলো। রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করে ও বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করে দেশের বড় বড় যাদুকরদেরকে একত্র করলো সে। তারপর বাৎসরিক উৎসবের দিনে পারিষদবর্গ ও যাদুকরদেরকে নিয়ে নিশ্চিত জয়ের আশায় উপস্থিত হলো নির্ধারিত স্থানে।

قَالَ لَهُمْ مُّوسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ○ فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ○ قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ○ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ○ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ○ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ○ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ○ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ○ وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۭ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۭ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ○ فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ○

❒ মূসা উহাদিগকে বলিল, 'দুর্ভোগ তোমাদিগের! তোমরা আল্লাহের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিও না। করিলে, তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করিবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সেই ব্যর্থ হইয়াছে।'

❒ উহারা নিজদিগের মধ্যে আলোচনা করিল এবং উহারা গোপনে পরামর্শ করিল।

❒ উহারা বলিল, 'এই দুই জন অবশ্যই যাদুকর, তাহারা চাহে তাহাদিগের যাদু দ্বারা তোমাদিগকে তোমাদিগের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে এবং তোমাদিগের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করিতে।'

❒ 'অতএব তোমরা তোমাদিগের যাদুক্রিয়া সংহত কর, তারপর সারিবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হও এবং আজ যে জয়ী হইবে সেই সফল হইবে।'

❒ উহারা বলিল, হে মূসা! 'হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।'

❒ মূসা বলিল, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।' উহাদিগের যাদু-প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হইল উহাদিগের দড়ি ও লাঠিগুলি ছুটাছুটি করিতেছে।

❒ মূসা তাহার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করিল।

❒ আমি বলিলাম, 'ভয় করিও না, তুমিই প্রবল।

❒ 'তোমার দক্ষিণ হস্তে যাহা আছে তাহা নিক্ষেপ কর, ইহা উহারা যাহা করিয়াছে তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে, উহারা যাহা করিয়াছে তাহা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেথায়ই আসুক, সফল হইবে না।

❒ অতঃপর যাদুকরেরা সিজদাবনত হইল ও বলিল, 'আমরা হারুন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম।'

'ক্বলা লাহুম মূসা' অর্থ— ফেরাউন ও তার সঙ্গী যাদুকরদের প্রতি লক্ষ্য করে হজরত মুসা বললেন। বাগবী লিখেছেন, কথাটির অর্থ— কেবল যাদুকরদেরকে লক্ষ্য করে হজরত মুসা বললেন। ফেরাউন ওই যাদুকরদেরকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এনে একত্র করেছিলো। তাদের সংখ্যা ছিলো বায়াত্তর জন। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিলো একটি করে লাঠি ও একটি করে রশি। হজরত কা'ব বলেছেন, তাদের সংখ্যা ছিলো চার শত। কেউ কেউ বলেছেন, বারো হাজার, বরং এর চেয়েও বেশী।

'ওয়াইলাকুম' অর্থ সমূলে ধ্বংস করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য করেছেন। অথবা তোমরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছো। কিংবা তোমাদের ধ্বংস হোক, যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করো। যাদুকরদের প্রতি এটা ছিলো হজরত মুসার সাবধান বাণী। একথার মাধ্যমে হজরত মুসা তাদেরকে একথাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, হে যাদুকরের দল! তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক কোরো না। 'ইসহাতুন' এবং 'ছাহ্তুন' শব্দ দু'টো সমার্থক। নজদবাসী ও বনী তামীম শব্দটিকে উচ্চারণ করে আস্হাত। হেজাজবাসীরা বলে 'সাহ্তুন'। মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, এখানকার 'ইউস্হিতাকুম' কথাটির অর্থ আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধ্বংস করবেন। কাতাদা বলেছেন, তিনি তোমাদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করবেন। 'বিআ'জাবিন্' (শাস্তি দ্বারা) কথাটির তান্ভিন কঠোরতা প্রকাশক। অর্থাৎ কঠিন শাস্তি দ্বারা। আর 'খবা' অর্থ ব্যর্থ বা বিফল হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাস্তবে ফেরাউনের এই অপচেষ্টা ব্যর্থই হয়েছিলো।

পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো এবং তারা গোপনে পরামর্শ করলো।' এখানে 'তারা' অর্থ ফেরাউন, তার পারিষদবর্গ ও সমবেত যাদুকরেরা। হজরত মুসার কথা শুনে তারা কিছুটা ঘাবড়ে গেলো। তারা মোকাবিলা করা সঙ্গত হবে কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলো। মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, হজরত মুসার কথা শুনে যাদুকরেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, এ তো কোনো যাদুকরের কথা নয়।

'নাজ্‌ওয়া' অর্থ গোপন পরামর্শ। শব্দটি নামপদ। অথবা শব্দটি 'নাজ্বাইতুহূ' কথাটির ধাতুমূল। 'নাজ্বাইতু' অর্থ আমি তার সঙ্গে গোপনে কথা বলেছি। 'নাজ্‌ওয়াহ্' শব্দটি সংকলিত হয়েছে 'নাজ্‌ওয়াতুন' থেকে। 'নাজ্‌ওয়াতুন' অর্থ ওই ঠেলে উঠা টিলা, যা অমসৃণ উচ্চতার কারণে বিসদৃশ মনে হয়। কেউ কেউ আবার বলেন, 'নাজ্‌ওয়াতুন' শব্দটি উৎকলিত হয়েছে 'নাজ্বাতুন' থেকে। 'নাজ্বাত' অর্থ মুক্তি পাওয়া বা রেহাই পাওয়া। অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে এমন গোপন পরামর্শ করা, যার মাধ্যমে সবাই বেঁচে যেতে পারে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— যাদুকরেরা নিজেদের মধ্যে গোপনে এই পরামর্শ করলো যে, প্রতিযোগিতায় হজরত মুসা যদি জিতে যান, তবে আমরা তাঁর আনুগত্যকে স্বীকার করে নিবো। কিন্তু একথা তারা বাইরে প্রকাশ করলো না।

এর পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, এই দু'জন অবশ্যই যাদুকর, তারা চায় তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করতে।' একথার অর্থ— ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের আলোচনায় বিভিন্ন মন্তব্য স্থান পেলেও শেষ পর্যন্ত তারা সকলে একমত হয়ে গেলো। তখন ফেরাউন অথবা তার জনৈক মুখপাত্র তাদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করলো, হে যাদুকরের দল! এই দু'জন তোমাদের মতোই যাদুকর। তারা তোমাদেরকে যাদু দ্বারা পরাস্ত করতে চায় এবং এভাবে তারা আমাদের সকলকে করতে চায় দেশান্তরিত। চায় আমাদের উন্নত ও উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার বিনাশ। উল্লেখ্য যে, ফেরাউন, তার পারিষদবর্গের ও যাদুকরদের মতপার্থক্যের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সুরা মু'মিনুনে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

'ইন হাজানি লাসাহিরানি' কথাটির 'ইন্' শব্দটি মুখাফ্‌ফাফাহ্(সংক্ষিপ্তরূপ)। আর 'লাসাহিরানি' এর 'লাম' অক্ষরটি পার্থক্য প্রকাশক। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— নিঃসন্দেহে এই দুই ব্যক্তি যাদুকর। অথবা 'ইন' শব্দটি এখানে না বোধক। যদি তাই হয়, তবে এখানকার 'লাম' অক্ষরটির অর্থ হবে ইল্লা (ব্যতীত)। অর্থাৎ এ দু'জন যাদুকর ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

আবু ওমরের ক্বেরাতে 'ইন' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে 'ইন্না' রূপে (নূন অক্ষরে তাশদীদ্ সহকারে)। আর 'হাজানি লাসাহিরানি' কথাটি উচ্চারিত হয়েছে 'হাজাইনি লাসাহিরানি' রূপে। কিন্তু আবু ওমর ছাড়া অন্য সকলেই 'হাজানি'-ই পড়েছেন।

উল্লেখ্য যে, 'ইন্' এর স্থলে 'ইন্না' বলা হলে তা হবে সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী। 'ইন্না' এর 'এছেম' (নামপদটি) যবর বিশিষ্ট হয়, পেশযুক্ত হয় না। এ

সম্পর্কে হিশাম বিন ওরওয়া তাঁর পিতার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, এটা হচ্ছে লেখকের ভুল। কিন্তু আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, কোরআনের লিপি নির্ভুল। কেউ কেউ বলেছেন, এই উচ্চারণটি আবুল হারেছ, খাছআম এবং কেনানা গোত্রের পরিভাষার অনুরূপ। তাদের পরিভাষা অনুসারে 'তাছনিয়াহ্' (দ্বিবচন) 'সাকিন'— সর্বাবস্থায় যবরযুক্তই হবে। তাই তারা এ সকল ক্ষেত্রে উচ্চারণ করে 'আলিফ্'। যেমন — 'মারারতু বির্‌রজুলিন', 'রআইতুর রজুলান', 'আতানিয়ার্ রজুলান'। এগুলোর প্রতিটিতেই তাছনিয়াকে পড়া হয়েছে 'আলিফ্' সহযোগে। আবার তারা বলে থাকে— 'কাসারতু ইয়াদাহু' এবং 'রকিব্‌তু আলাহু'। 'ইয়াদাইহি' এবং 'আলাইহি'— এরকম বলে না। প্রসিদ্ধ নামষষ্ঠকের (পিতা, ভাই ইত্যাদির) সর্বনামের ক্ষেত্রেও তারা 'আলিফ্' সংযোজন করে। যেমন প্রখ্যাত এক কবি বলেছেন—

ইন্‌না আবাহা ওয়া আবা আবাহা
ক্বদ বালাগা ফীল মাজদি গাইয়াতাহা।

লক্ষণীয় যে, এখানেও পরের 'আবাহ' এসেছে 'আলিফ' সহযোগে। কথাটি এখানে 'আবীহা'রূপে আসেনি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'ইন্‌না' শব্দটির নামপদের অভিজাত সর্বনাম অনুক্ত রয়েছে। ওই অনুক্ত সর্বনাম সহযোগে এখানকার বিধেয়টির মূলরূপ দাঁড়াবে এরকম— 'ইন্‌নাহু হাজানি লাসাহিরানি'। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইন্‌না নাআ'ম' অর্থে। একবার এক বেদুইন হজরত ইবনে যোবায়েরের নিকটে কিছু চাইলো। কিন্তু তিনি তাকে কিছু দিলেন না। তখন সে বললো, 'লাআ'নাল্লহু নাক্বাতান্ হামালাত্‌নী ইলাইকা' (ওই উটনীর উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ যে আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে)। হজরত ইবনে যোবায়ের বললেন, 'ইন্‌না ওয়া সাহিবাহা' (উটনীর মালিকের প্রতিও)।

'ইয়াজ্‌হাবা বিত্বরীক্বাতিকুমুল মুছলা' অর্থ— তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করতে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ত্বরীকা' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মিসরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে। ত্বরীকাতিল ক্বওম' অর্থ গোত্র প্রধানগণ। শা'বী বলেছেন, হজরত আলী এই কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সে চায় সর্বসাধারণ তার প্রতি আকৃষ্ট হোক। কাতাদা বলেছেন, তখন বনী ইসরাইলের জনসংখ্যা ছিলো অন্যান্য গোত্রের চেয়ে অনেক বেশী। সম্পদও তাদের কম ছিলো না। তাই এখানে 'ত্বরীকাতিকুমুল মুছলা' কথাটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে বনী ইসরাইলকে। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— নবুয়তের দাবি উত্থাপনকারী এই দুই ব্যক্তি বনী ইসরাইল

বংশদ্ভূতদেরকে নিয়ে অন্যত্র গমন করতে চায়। ইতোপূর্বে হজরত মুসা উচ্চারণ করেছিলেন 'আমাদের সঙ্গে বনী ইসরাইলকে যেতে দাও' (আয়াত ৪৭)। একথার দিকে লক্ষ্য রেখে ফেরাউন এরকম বলেছিলো।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ সাধারণভাবে 'ত্বরীকাতিকুমুল মুছলা' কথাটির অর্থ করেছেন— ওই ধর্মমত, যার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলো ফেরাউন ও তার অনুসারীরা। এক আয়াতে এসেছে— 'আমার ভয় হচ্ছে, এই ব্যক্তি তোমাদের ধর্মাদর্শকে পরিবর্তন করে ফেলবে।' সুতরাং আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে মিসরবাসী! বনী ইসরাইল বংশদ্ভূত এই দুই যাদুকর চায় তোমাদের উৎকৃষ্ট ধর্মাদর্শের অস্তিত্ব বিনাশ করতে।

এর পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'অতএব তোমরা তোমাদের যাদুক্রিয়া সংহত করো, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও এবং আজ যে জয়ী হবে সে-ই সফল হবে।' একথার অর্থ— ফেরাউন আরো বললো, হে যাদুকরেরা! তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও। সংহত করো তোমাদের যাদুক্রিয়াকে। তারপর ময়দানে অবতীর্ণ হও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে, সুশৃংখলরূপে সারিবদ্ধ হয়ে, যেনো দর্শকদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় তোমাদের দৃঢ়তা ও প্রতাপ। আজ জয় যার, সফলতা তার।

এখানে 'আজমিউ' অর্থ ঐক্যবদ্ধ হও, হও সংহত। আর 'সাফ্ফান্' অর্থ সারিবদ্ধ হওয়া। উল্লেখ্য যে, মানুষ, বৃক্ষ অথবা অন্য কোনো কিছুর সারিবদ্ধ হওয়াকে বলে 'সাফ্ফুন'। মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, অন্য আয়াতেও শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— 'যারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধ হয়ে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন' (সুরা সাফ্ফা)। কিন্তু ইবনে উবায়দা বলেছেন, শব্দটির অর্থ একত্রিত হওয়ার স্থান। একারণেই জায়নামাজকে বলে 'সাফ্'। এরকম অর্থ করলে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— তোমরা সকলে নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হও।

এর পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে মুসা! হয় তুমি নিক্ষেপ করো, অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।' একথার অর্থ— যাদুকরেরা উন্মুক্ত প্রান্তরে নির্ধারিত স্থানে সমবেত হলো। বিজয়ের আশায় ও আতিশয্যে উদ্বেলিত ছিলো তারা। তাই সৌজন্য প্রকাশার্থে বললো, হে মুসা! আপনিই প্রথমে আপনার যাদুর ক্ষমতা প্রদর্শন করুন, নতুবা আমাদেরকে প্রথমে সুযোগ দিন।

উল্লেখ্য যে, হজরত মুসা ছিলেন, নিশ্চিত ও নির্বিকার। তাই তিনি চেয়েছিলেন, যাদুকরেরাই প্রথমে তাদের ক্ষমতা দেখাক। তারপর তিনি তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করবেন। আর তখনই প্রমাণ হয়ে যাবে সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ। উপস্থিত জনমণ্ডলী স্বচক্ষে দেখবে, কীভাবে সত্য বিজয়ী হয় এবং কীভাবে পরাস্ত হয় মিথ্যা। তাই তাদের সৌজন্যের বিনিময়ে হজরত মুসাও সৌজন্য প্রদর্শন করলেন।

এর পরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, বরং তোমরাই নিক্ষেপ করো। তাদের যাদুর প্রভাবে অকস্মাৎ মুসার মনে হলো তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে।' একথার অর্থ হজরত মুসা বললেন, ঠিক আছে। তোমরাই প্রথমে শুরু করো। যাদুকরেরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করলো। সমবেত জনতা দেখতে পেলো নিক্ষিপ্ত লাঠি ও দড়িগুলো সারা প্রান্তর জুড়ে সাপের মতো দৌড়াদৌড়ি করছে। হজরত মুসাও এরকম দেখতে পেলেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, যাদুকরেরা উপস্থিত জনতাকে নজরবন্দী করলো। ফলে সকলে দেখতে পেলো প্রায় এক মাইল পরিসর জুড়ে অসংখ্য সাপ ছুটাছুটি করছে। হজরত মুসাও দেখতে পেলেন এই বীভৎস দৃশ্যটি।

এর পরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'মুসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করলো।' এখানে 'ওয়াজসুন' অর্থ মৃদু শব্দ, ধীর পদবিক্ষেপের আওয়াজ। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'ওয়াজসুন' অর্থ ওই আওয়াজের আতংক, যা শ্রুত হয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা প্রবিষ্ট হয় অন্তরে। উল্লেখ্য যে, মানবিক বৃত্তির স্বাভাবিক নিয়মে ওই বীভৎস দৃশ্য দেখে হজরত মুসার হৃদয়ে উদ্রেক হয়েছিলো সাময়িক ভয়। মুকাতিল বলেছেন, যাদুর ভীতিপ্রদ প্রকাশ দেখে হজরত মুসা আসলে শংকিত হননি। তিনি শংকিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, এই যাদুকে সত্য মনে করে উপস্থিত মানুষেরা যেনো প্রকৃত মোজেজাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু না করে। এভাবে যেনো ভণ্ডুল না হয়ে যায় সত্য প্রতিষ্ঠার এই মহা আয়োজন।

এর পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'আমি বললাম, ভয় কোরো না, তুমিই প্রবল।' হজরত মুসাকে নির্ভিক করে তুলবার জন্য অবতারণা করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যের। বলা হয়েছে— ভয় কোরো না। কেনো করবে! তুমি যে আমার রসুল! রেসালত ও মোজেজা প্রদান করে বিরুদ্ধবাদীদের উপর আমিই তোমাকে করে দিয়েছি প্রবল, বিজয়ী। আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এটাই।

'ইন্নাকা আনতাল আ'লা' অর্থ তুমিই প্রবল। কথাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে ভয় না করার কারণ। অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্য কথাটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে কোনো প্রকার সংযোজক অব্যয় ব্যতিরেকেই। ব্যবহৃত হয়েছে দু'টি নিশ্চয়তাপ্রকাশক শব্দ— 'ইন্না' এবং 'আ'লা।' প্রয়োগ করা হয়েছে ইসমে তাফজীলের শব্দরূপ আ'লা।

এর পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'তোমার দক্ষিণ হস্তে যা আছে তা নিক্ষেপ করো, তা তারা যা করেছে, তা গ্রাস করে ফেলবে, তারা যা করেছে, তাতো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না।'

এখানে 'তোমার দক্ষিণ হস্তে যা আছে' বলে বোঝানো হয়েছে হজরত মুসার অলৌকিক লাঠিকে। স্পষ্ট করে এখানে 'লাঠি নিক্ষেপ করো'— এরকম বলা হয়নি। যাদুকরদের লাঠি ও রশিকে হীন করে দেখানোর জন্যই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এরকম পরোক্ষ বাকভঙ্গি। আর 'নিক্ষেপ করো' কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, তোমার নিক্ষিপ্ত যষ্টি বিশাল অজগর হয়ে যাদুকরদের সকল যাদু গ্রাস করে ফেলবে। যা যাদু, তা কখনোই সত্য মোজেজার সামনে টিকে থাকতে পারে না। তাই পরক্ষণেই বলা হয়েছে— তারা যা করেছে তাতো কেবল যাদুকরের কৌশল। এরকম কৌশল কখনোই সফল হবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যাদুকরেরা পৃথিবীর কোনো স্থানেই সফলকাম হতে পারে না। তাই এখানে বলা হয়েছে— যেখানেই তারা যাক না কেনো, সফল হবে না। কেউ কেউ এখানকার 'আতা' কথাটির অর্থ করেছেন চক্রান্ত । অর্থাৎ যেখান থেকেই তারা চক্রান্ত চালাক না কেনো, সফল হতে পারবে না। হজরত জুনদুব বিন আবদুল্লাহ্ বাজালী থেকে ইবনে আবী হাতেম ও তিরমিজি বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যাদুকরকে যেখানে পাবে তাকে সেখানেই হত্যা করবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন—'যাদুকর যেখানেই আসুক সফল হবে না।'

শেষোক্ত আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যাদুকরেরা সেজদাবনত হলো ও বললো, আমরা হারুন ও মুসার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।' একথার অর্থ— হঠাৎ হজরত মুসা তার হাতের লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। সাথে সাথে তা হয়ে গেলো একটি বিরাট অজগর সাপ। সাপটি যাদুর সকল উপকরণ অবলীলায় গলাধঃকরণ করতে লাগলো। চৈতন্যোদয় হলো যাদুকরদের। তারা বুঝতে পারলো, হজরত মুসার এই অলৌকিক কাণ্ড যাদু নয়। এ হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রদর্শিত এক বিস্ময়কর মোজেজা। অভিভূত হয়ে গেলো তারা। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে গেলো তাদের মস্তক। তাই সেজদাবনত হতে বাধ্য হলো তারা। এভাবে সেজদার মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর তারা বললো, হারুন ও মুসা যাঁর বাণীবাহক, তাঁর প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

উল্লেখ্য যে, এখানে হজরত মুসার পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে হজরত হারুনের নাম। কিন্তু সুরা শূআরা ও সুরা আ'রাফে উল্লেখিত এই কাহিনীটির বিবরণে হজরত মুসার নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে হজরত হারুনের পূর্বে। এতে করে বুঝা যায়, নামের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এখানে মূল বিবেচ্য বিষয় নয়। তাঁদের দু'জনকে আল্লাহ্র রসুল বলে স্বীকৃতি প্রদান করার বিষয়টিই এখানে মুখ্য।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۡ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ○ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۚ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○ اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○ اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ○ وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ○ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ○

❒ ফিরাউন বলিল, 'কী, আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা মূসাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে! দেখিতেছি, এতো তোমাদিগের প্রধান, সে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে। সুতরাং আমি তো তোমাদিগের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই এবং আমি তোমাদিগকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করিবই এবং তোমরা অবশ্যই জানিতে পারিবে আমাদিগের মধ্যে কাহার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।'

❒ যাদুকরেরা বলিল, 'আমাদিগের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে তাহার উপর এবং যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব না, সুতরাং তুমি কর যাহা তুমি করিতে চাহ। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহা করিবার করিতে পার।'

❒ আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি যাহাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদিগের অপরাধ এবং তুমি আমাদিগকে যে যাদু করিতে বাধ্য করিয়াছ তাহা; আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

❒ যে তাহার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হইয়া উপস্থিত হইবে তাহার জন্য তো আছে জাহান্নাম, সেথায় সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।

❒ এবং যাহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে বিশ্বাসী হইয়া ও সৎকর্ম করিয়া, উহাদিগের জন্য আছে সুউচ্চ মর্যাদা।

❒ স্থায়ী জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং এই পুরস্কার তাহাদিগেরই যাহারা পবিত্র।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, কী, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বে তোমরা মুসাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে! দেখছি, এতো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে।' এখানে 'ঈমান' (আমানতুম) কথাটির পর 'বা' অক্ষরটি প্রয়োগ জরুরী ছিলো। কিন্তু তা না করে এখানে বসানো হয়েছে 'লাম'। এর কারণস্বরূপ বলতে হয় যে, 'আমানতুম' কথাটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে মান্য করা বা আনুগত্য করার ধারণা। আর আনুগত্যের পরে 'লাম'ই বসে, 'বা' বসে না। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— ফেরাউন বললো, কী, এতো বড় স্পর্ধা তোমাদের! আমি তোমাদেরকে এখানে আনলাম। এতো বড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করলাম। অথচ তোমরা আমার অনুমতি না নিয়েই মুসা ও হারুনকে মেনে নিলে!

'দেখছি, এতো তোমাদের প্রধান' কথাটির অর্থ— ফেরাউন আরো বললো, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, ওরা দু'জন আসলে নবী টবি কিছু নয়, ওরা হচ্ছে মস্ত যাদুকর। যাদুর বলেই ওরা দু'জন তোমাদের উপরে বিজয়ী হয়েছে। অথবা 'কাবীরুন' শব্দটির অর্থ এখানে ওস্তাদ, গুরু, দলনেতা বা প্রধান। 'সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে' কথাটির অর্থ— আসলে ভিতরে ভিতরে তোমরা এক জোট, মুসাই তোমাদের গুরু। তার নিকট থেকে তোমরা যাদু শিক্ষা করেছো। তারপর এখানে এসেছো পাতানো খেলা দেখাতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমি তো তোমাদের হস্ত-পদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবোই এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবোই।' এখানে 'মিন্‌খিলাফিন' অর্থ বিপরীত দিক থেকে। অর্থাৎ ডান হাত, বাম পা। 'খিলাফ' অর্থ বিপরীত। 'ফী জুজূইন্ নাখলি' অর্থ খেজুর গাছের কাণ্ডে। খেজুরগাছ হয় দীর্ঘাকৃতির ও শাখা-প্রশাখাবিহীন। খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করলে দূরের মানুষও দৃশ্যটি দেখতে পাবে। এভাবে মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করাই ছিলো ফেরাউনের ইচ্ছা। তাই সে বলেছিলো— 'আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবোই'।

এরপরে বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।' একথার অর্থ— তারপর হে বিদ্রোহী যাদুকরেরা! তোমরা ভালো করেই একথা বুঝতে পারবে যে, কার শাস্তি কঠিনতর ও দীর্ঘস্থায়ী — মুসা-হারুনের, না আমার।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'যাদুকরেরা বললো, আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিবো না, সুতরাং তুমি করো, যা তুমি করতে চাও।'

'মা আনতা ক্বাদ্বিন' অর্থ যা তুমি করতে চাও। কথাটি 'ইক্বদ্বি' (করো) এর কর্মপদ। কিন্তু যদি 'ক্বদ্বা' শব্দটির অর্থ এখানে সিদ্ধান্তমূলক এবং নির্দেশপ্রকাশক হয়, তবে 'মাআনতা' পদদ্বয়টি এখানে কর্মপদ হবে না। কেননা এখনে 'ক্বদ্বা' এর কর্মপদের উপর 'বা' অক্ষরটি যুক্ত করার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু তা করা হয়নি।

সুতরাং 'মা আনতা ক্বদ্বিন' কথাটি এখানে হবে একটি সুনির্দিষ্ট কর্ম এবং অর্থ দাঁড়াবে— তুমি যা ইচ্ছা হয়, তাই করো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যা করবার করতে পারো।' 'তাক্বদ্বী' অর্থ যা করবার করতে পারো। 'আল হায়াতাদ্ দুন্ইয়া' অর্থ পার্থিব জীবনে। কথাটি মাফউলে ফীহ্ (সন্নিহিত কর্মপদ), জরফে জামান (কালাধিকরণ কারক)। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— যাদুকরেরা আরো বললো, তুমি দুনিয়ার রাজা। এই দুনিয়ায় তুমি তোমার হুকুম চালাতে পারো। সুতরাং তুমি যা কিছু করতে চাও, করে ফেলো। কিন্তু মনে রেখো, দুনিয়া ধ্বংসশীল। তাই তোমার সাম্রাজ্য ও প্রতাপ অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এরপর ফেরাউন তওবাকারী যাদুকরদেরকে হাত পা কেটে ক্রুশবিদ্ধ করেছিলো। এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম। কেউ কেউ বলেছেন, সে এরকম করতে পারেনি। কেননা আল্লাহ্ এক স্থানে বলেছেন, তোমরা দু'জন এবং তোমাদের অনুসারীগণ সকলেই বিজয়ী।

এর পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করছো, তা।' এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, ফেরাউন তো তাদেরকে যাদু করতে বাধ্য করেনি। বরং ইতোপূর্বে এক স্থানে উল্লেখিত হয়েছে— তারা নিজেরাই ফেরাউনের সম্মানের শপথ করে বলেছিলো, আমরা অবশ্যই বিজয়ী হবো। সুতরাং এখানে 'তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছো'— এরকম বলা হলো কেনো? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বাগবী লিখেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, যাদুবিদ্যার চর্চা অব্যাহত রাখার মানসে ফেরাউন কোনো কোনো লোককে যাদু শিখতে বাধ্য করতো। তাই এখানে যাদুকরেরা এরকম বলেছে। মুকাতিল বলেছেন, যাদুকরদের সংখ্যা ছিলো বায়াত্তর জন। তার মধ্যে দু'জন ছিলো কিবতী এবং অবশিষ্ট সত্তরজন ছিলো ইসরাইলী। আর ফেরাউন ইসরাইলীদেরকেই যাদু শিখতে বাধ্য করেছিলো।

আবদুল আজিজ ইবনে আবান বলেছেন, প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ফেরাউন যাদুকরদের ডেকে বলেছিলো, মুসা যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন তোমরা আমার সঙ্গে গিয়ে তাকে দেখে এসো। একদিন হজরত মুসা যখন ঘুমিয়ে ছিলেন তখন সে যাদুকরদেরকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। সকলে সবিস্ময়ে দেখলো হজরত মুসা নিদ্রিত, কিন্তু তাঁর লাঠি অতন্দ্র প্রহরীর মতো তাঁকে পাহারা দিচ্ছে। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে যাদুকরেরা ফেরাউনকে বললো, এ লোক যাদুকর নয়। কারণ যাদুকরেরা ঘুমিয়ে পড়লে তাদের যাদুও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর লাঠিকে দেখছি সদা-সতর্ক প্রহরীর মতো তাঁকে পাহারা দিচ্ছে। এটা কখনো যাদু হতে পারে না। সুতরাং এ লোকের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। ফেরাউন তাদের কথায় কর্ণপাত করলো না। রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে বললো, তোমাদেরকে

তার মোকাবিলা করতেই হবে। এভাবে তাদেরকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করা হয়েছিলো বলেই তারা বলেছিলো— তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছো।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌ই শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।' কথাটির মাধ্যমে এটাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে— আল্লাহ্ যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী, তাই তিনি তাঁর অস্থায়ী সৃষ্টির কর্মকাণ্ডের যথাবিনিময় প্রদান করবেন। বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদেরকে করবেন পুরস্কৃত এবং অবিশ্বাসী ও পাপিষ্ঠদেরকে প্রদান করবেন কঠোর শাস্তি। মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, ফেরাউন বলেছিলো, 'তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী' (আয়াত ৭১)। তার একথার বিপরীতে তাই তওবাকারী যাদুকরেরা বলে দিয়েছিলো— আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

এর পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য তো আছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।' একথার অর্থ— 'এবং যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই গমন করবে জাহান্নামে। ভোগ করবে চিরস্থায়ী শাস্তি। সেখানে তার মৃত্যুও ঘটবে না, কিন্তু জীবিত থাকা সত্ত্বেও সে সেখানে পাবে না ন্যূনতম স্বস্তি। এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকবে অনন্তকাল ধরে।

এর পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'এবং যারা তাঁর নিকটে উপস্থিত হবে বিশ্বাসী হয়ে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা।' একথার অর্থ— এবং যারা মৃত্যুবরণ করবে বিশ্বাস ও সৎকর্ম সহকারে, তারা গমন করবে চির সুখের উদ্যান জান্নাতে। লাভ করবে সমুচ্চ মর্যাদা।

শেষোক্ত আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই, যারা পবিত্র।' একথার অর্থ— ইমানদারদের ওই জান্নাত হবে চিরস্থায়ী, যার পাদদেশে সতত প্রবহমান থাকবে জলবতী নদী। সেখানেই চিরকাল বসবাস করবে তারা। যারা পবিত্র, ওই পুরস্কার জুটবে তাদেরই ভাগ্যে।

কালাবী বলেছেন, এখানে 'পবিত্র' বলা হয়েছে তাকে, যারা তাদের নফসের জাকাত দিয়ে দিয়েছে এবং অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলেছে— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত একটি যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সেখানে নিম্ন মর্যাদাধারী ব্যক্তিরা উচ্চ মর্যাদাধারী ব্যক্তিদেরকে এমনভাবে দেখবে, যেমন তোমরা দেখে থাকো আকাশের সমুজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি। আর আবুবকর ও ওমর হবে ওই উচ্চ মর্যাদাধারীদের অন্তর্ভূত। এই হাদিসটি আবার তিবরানী বর্ণনা করেছেন হজরত জাবীর ইবনে সামুরা থেকে, ইবনে আসাকের হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং ইমাম

আহমদ হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। বোখারী ও মুসলিমও হাদিসটির বর্ণনাকারী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে সুপরিণতসূত্রে তিরমিজি কর্তৃক হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— রসুল স. বলেছেন, আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম প্রান্তে তোমরা যেমন উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহকে দেখতে পাও, তেমনিভাবে বেহেশতের নিম্নমর্যাদাধারীরা উচ্চ মর্যাদাধারীদেরকে দেখতে পাবে। উচ্চ মর্যাদাধারীরাও হবে আবার বিভিন্ন স্তরের। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তাহলে তো নবী রসুলগণের মর্যাদা নিশ্চয় হবে এর চেয়ে আরো অনেক উর্ধ্বে। তিনি স. বললেন, অবশ্যই । শপথ ওই সত্তার, যার অলৌকিক অধিকারে রয়েছে আমার জীবন! যারা আল্লাহ্র উপরে ও নবী-রসুলগণের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে, তারাও সেখানে হবে তাঁদের সাথী। মোটকথা, আল্লাহ্ই যে শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী, তার কারণ ঘোষিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতত্রয়ে (৭৪, ৭৫, ৭৬)। অথবা আয়াতগুলি যাদুকরদের সংলাপের পরিসমাপ্তি। কিংবা আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে যাদুকরদের উক্তির স্বীকৃতি।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۝ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۝ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۝ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۝ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ۝

❐ আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম এই মর্মে, আমার দাসদিগকে লইয়া রজনীযোগে বহির্গত হও এবং উহাদিগের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়া এক শুষ্ক পথ নির্মাণ কর। পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তোমাকে ধরিয়া ফেলা হইবে— এই আশংকা করিও না এবং ভয়ও করিও না।

❐ অতঃপর ফিরাউন তাহার সৈন্যবাহিনীসহ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলে সমুদ্র উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করিল।

❐ এবং ফিরাউন তাহার সম্প্রদায়কে পথ ভ্রষ্ট করিয়াছিল, সৎপথ দেখায় নাই।

❐ হে বনি ইসরাঈল! আমি তো তোমাদিগকে তোমাদিগের শত্রু হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, আমি তোমাদিগকে তওরাত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তোমাদিগের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করিয়াছিলাম,

❐ বলিয়াছিলাম, তোমাদিগকে যাহা দান করিলাম তাহা হইতে ভাল ভাল বস্তু আহার কর। এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করিও না, করিলে, তোমাদিগের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যাহার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হইয়া যায়।

❐ এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তাহার প্রতি যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বহুদিন ধরে ফেরাউন বনী ইসরাইলদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিলো। আল্লাহ্ তাদেরকে ওই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে চাইলেন। তাই তাদের রসুল হজরত মুসার নিকটে এইমর্মে প্রত্যাদেশ করলেন যে, রাত্রিকালে তুমি বনী ইসরাইল জনতাকে নিয়ে মিসর ছেড়ে চলে যাও। পথিমধ্যে যখন সমুদ্র পড়বে তখন তোমার হাতের লাঠি দিয়ে সমুদ্র তরঙ্গে আঘাত করো। এভাবে সমুদ্রের অভ্যন্তরে নির্মাণ করো শুষ্ক পথ। ফেরাউনের লোকেরা তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তোমাদেরকে ধরে ফেলবে, এমতো আশংকা কোরো না। নির্বিঘ্নে সমুদ্রভ্যন্তরের বিশুষ্ক পথ দিয়ে সমুদ্রের অপর পাড়ে চলে যাও। ডুবে যাওয়ার ভয় কোরো না।

'ফাদ্বরিব্ লাহুম ত্বরীক্বা' অর্থ পথ ঠিক করে দাও। পরিভাষা অনুসারে কথাটি 'সাহম' থেকে সংকলিত হয়েছে বলা যেতে পারে। যেমন আরববাসীরা বলে— দ্বরবা লাহু মিম্ মালিহী সাহ্মা (সে তার সম্পদের মধ্যে একটি উপায় বা পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে)। অথবা কথাটির অর্থ হবে— তাদের জন্য পথ নির্মাণ করো। যেমন আরববাসীরা বলে— দ্বরাবাল লাবান (সে ইট নির্মাণ করেছে)। আমি বলি, এখানে 'ইদ্বরিব্' শব্দটির উদ্দেশ্য লাঠি দ্বারা আঘাত করা-ও হতে পারে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রতরঙ্গে আঘাত করো, তাহলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে নির্মিত হবে শুষ্ক পথ।

'দ্বারকান' অর্থ পশ্চাদ্ধাবন করা, পিছনে পিছনে অনুসরণ করে ধরে ফেলা। আর 'লা ইয়াখশা' অর্থ ভয় কোরো না। অর্থাৎ সমুদ্রভ্যন্তরের পথ দিয়ে গমনকালে ডুবে যাবে, এমতো আশংকা কোরো নো। বলা বাহুল্য যে, হজরত মুসা আল্লাহ্র এই প্রত্যাদেশ পালন করলেন। গোপনে সকল বনী ইসরাইলকে জানিয়ে দিলেন যে, অমুক রাতে সকলকে মিসর ছেড়ে আমার সঙ্গে যাত্রা করতে হবে। নির্ধারিত

রাতে হজরত মুসা তাঁর সকল অনুসারীকে নিয়ে যাত্রা করলেন সিরিয়ার দিকে। পথিমধ্যে পড়লো উত্তাল সাগর। তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন সাগরের পানিতে । তৎক্ষণাৎ সাগর চিরে সৃষ্টি হয়ে গেলো শুষ্ক পথ। বনী ইসরাইল ছিলো বারোটি গোত্রে বিভক্ত। তাই প্রতিটি গোত্রের জন্য একটি করে রাস্তা তৈরী হয়ে গেলো সাগরের ভিতর।

পরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর ফেরাউন তার সেনাবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করলো।' একথার অর্থ— পরদিন সকালে ফেরাউন সংবাদ পেলো বনী ইসরাইলেরা রাত্রের অন্ধকারে উধাও হয়ে গিয়েছে। তার মনে পড়লো হজরত মুসা বলেছিলেন, 'আমাদের সঙ্গে বনী ইসরাইলকে যেতে দাও'। সে নিশ্চিত হলো, নিশ্চয় তারা তাদের পিতৃভূমি সিরিয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। যে করেই হোক তাদেরকে ধরে আনতে হবে। অল্প সময়ের মধ্যে সে তার বিশাল বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলো সিরিয়ার পথে। অনেক পথ অতিক্রম করার পর সে তার লোকদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলো সমুদ্রের কিনারায়। অবাক হয়ে দেখলো সমুদ্রের পানি দু'পাশে সরে গিয়ে সাগরের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত সৃষ্টি করে দিয়েছে শুষ্ক পথ। এরকম বারোটি পথ ধরে ওই দূরে চলে যাচ্ছে বনী ইসরাইলেরা। সে-ও তার লোকজন নিয়ে ওই পথগুলোর মধ্য দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চললো তাদেরকে ধরবার জন্য। বনী ইসরাইলেরা যখন সাগরের অপর পাড়ে গিয়ে উঠেছে, তখন অকস্মাৎ ভেঙে পড়লো পানির দেয়ালগুলো। একাকার হয়ে গেলো সমুদ্রের উত্তাল সলিল। মাঝপথে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হলো ফেরাউন ও তার লোকেরা।

এর পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'এবং ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিলো, সৎপথ দেখায়নি।' একথার অর্থ— নিঃসন্দেহে ফেরাউন ছিলো পথভ্রষ্ট। তার সম্প্রদায়কেও সে পথভ্রষ্ট করেছিলো। সত্যের পথ ছেড়ে ধরেছিলো অংশীবাদিতার পথ। লোকদেরকে বলেছিলো 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রভুপালনকর্তা।' আরো বলেছিলো, আমি তোমাদেরকে সঠিকপথ ভিন্ন অন্য কোনো পথ প্রদর্শন করিনি। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তার ওই উক্তিকে মিথ্যা প্রমাণ করা হয়েছে। শেষে বলা হয়েছে— 'সৎপথ দেখায়নি।' অর্থাৎ সে তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র মনোনীত পথে পরিচালিত করেনি। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে— সদলবলে সমুদ্রভ্যন্তরের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে তার সম্প্রদায়কে ভুল পথ-নির্দেশনা দিয়েছিলো, সঠিক পথ প্রদর্শন করেনি। ফলে সে ও তার সম্প্রদায় লাভ করেছিলো সলিল সমাধি।

এর পরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— 'হে বনী ইসরাইল! আমি তো তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু থেকে উদ্ধার করেছিলাম; আমি তোমাদেরকে তওরাত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তুর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে।' এখানে 'হে বনী ইসরাইল' বলে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স. এর সমসাময়িক মদীনাবাসী ইহুদীদেরকে। অর্থাৎ তাদেরকে লক্ষ্য করেই তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে তাদেরকে। কিন্তু এই অভিমতটি মেনে নিলে এক অনপনেয় জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। মক্কায় কোনো ইহুদী বাস করতো না। তাহলে এখানে ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হবে কেনো? অতএব এ কথা বলাই সমীচীন যে, এখানে 'হে বনী ইসরাইল বলে' ফেরাউনের খপ্পর থেকে উদ্ধারপ্রাপ্তদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আর সেই সম্বোধনটিই অবিকল উদ্ধৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। যদি তাই হয়, তবে বলতে হবে, আলোচ্য বাক্যের শুরুতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে 'কুলনা' (ফেরাউন ও তার লোকদেরকে সলিল সমাধিদানের পর আমি তাদেরকে বলেছিলাম) কথাটি।

'জ্বানিবাত্ব তুরিল আইমান' অর্থ— তুর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে। এখানে 'জ্বানিবা' শব্দটি মাফউলে ফীহ (সন্নিহিত কর্মপদ), জরফে মাকান (আধারাধিকরণ কারক)। অর্থাৎ স্থানবাচক কর্মপদ। আর এখানে 'আলআইমান' (দক্ষিণ পার্শ্বে) শব্দটি 'জ্বানিবা' এর সিফাত বা বিশেষণ। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, পর্বতের ডান বাম বলে কিছু থাকে না। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে 'তুর পর্বতের দক্ষিণ পাশে' অর্থ হজরত মুসার গমনপথের ডান দিকে। আর এখানকার 'প্রতিশ্রুতি' কথাটির অর্থ হজরত মুসার সঙ্গে বাক্যালাপের এবং তওরাত শরীফ প্রদানের অঙ্গীকার। ওই অঙ্গীকারের সঙ্গে হজরত মুসার প্রতি এই নির্দেশটিও ছিলো যে, তুর পর্বতে তোমাকে আসতে হবে তোমার সম্প্রদায়ের সত্তর জন নেতাকে নিয়ে। তাই এখানে 'তুমি' না বলে বলা হয়েছে 'তোমাদেরকে।' কারণ তারাও ছিলো ওই প্রতিশ্রুতিভূত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের নিকট 'মান্না' ও 'সালওয়া' প্রেরণ করেছিলাম।' এ কথার অর্থ— ওই প্রতিশ্রুত সময়ে আমি তোমাদেরকে অনায়াস আহার্যরূপে প্রদান করেছিলাম 'মান্না' ও 'সালওয়া'।

এর পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'বলেছিলাম, তোমাদেরকে যা দান করলাম, তা থেকে ভালো ভালো বস্তু আহার করো।' এখানকার 'মিন্ ত্বয়্যিবাত' কথাটির 'মিন্' বর্ণনামূলক, অথবা আংশিক অর্থ প্রকাশক। 'ত্বয়্যিবাত্' অর্থ ভালো ভালো বস্তু, সুস্বাদু ও হালাল খাদ্যদ্রব্য। উল্লেখ্য যে, মান্না ও সালওয়া হালাল তো ছিলোই, সুস্বাদুও ছিলো। 'রযাক্বনাকুম' অর্থ রিজিক হিসেবে তোমাদেরকে যা দান করলাম। উল্লেখ্য যে, সমগ্র সৃষ্টির সকল রিজিক আল্লাহ্ই দিয়ে থাকেন। তবু এখানে 'রিজিক হিসেবে যা দান করলাম' এ কথা বলে আল্লাহ্ নিজেকে রিজিক

দাতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মান্না ও সালওয়া যে বিশেষ ও শ্রেষ্ঠ রিজিক, সে কথা বোঝানোর উদ্দেশ্যেই কথাটি তিনি এখানে এভাবে স্পষ্ট করে একথা উল্লেখ করে দিয়েছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন কোরো না, করলে, তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত, সে তো ধ্বংস হয়ে যায়।' একথার অর্থ— এবং আহার্যরূপে আমার দেয়া এই নেয়ামতের অপব্যবহার কোরো না। অপচয় কোরো না। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ কোরো না। অকৃতজ্ঞ হয়ো না এবং শরিয়তের বিধান লংঘন কোরো না। যদি করো, তবে তোমরা হবে আমার অনিবার্য ক্রোধের লক্ষ্যস্থল। আর যার উপরে আমার ক্রোধ অনিবার্য হয়, তার ধ্বংস সুনিশ্চিত।

'ইয়াহ্লিল' অর্থ অবধারিত হওয়া। ক্বারী আ'মাশ ও ক্বারী কুসাই শব্দটিকে পড়তেন— 'ইয়াহ্লুল'। শব্দটি এসেছে 'হুলুল' থেকে। এর অর্থ অবতীর্ণ হওয়া বা পতিত হওয়া। 'হাওয়া' অর্থ ধ্বংস হয়ে যাওয়া, অগ্নিতে নিপতিত হওয়া। এভাবে শেষ বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— যার উপর আমার গজব অবধারিত হয়, সেতো ধ্বংস হয়ে যায়, নিপতিত হয় অগ্নিকুণ্ডে।

এর পরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে।' এখানে 'তাবা' অর্থ যে তওবা করে, অংশীবাদিতা ও অন্যান্য বৃহৎ পাপ থেকে ইমানের পথে ফিরে আসে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে। 'আমানা' অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলগণ কর্তৃক আনীত বিধানাবলীর উপরে ইমান আনে বা বিশ্বাস স্থাপন করে। 'আ'মিলা সলিহান' অর্থ সৎকর্ম করে। আর 'ইহ্তাদা' অর্থ সৎপথে অবিচলিত থাকে। অবশ্য আলেমগণ এই শেষোক্ত কথাটির বিভিন্ন রকম অর্থ করেছেন। যেমন, আতা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ— সে যেনো একথা মনে রাখে যে, আমি ইমান ও হেদায়েত পেয়েছি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে ও দয়ায়। কাতাদা ও সুফিয়ান সওরী অর্থ করেছেন— শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত সে যেনো প্রতিষ্ঠিত থাকে ইসলামের উপর। শা'বী, মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, এখানে 'ইহ্তাদা' কথাটির অর্থ— সে যেনো একথা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবশ্যই আমি আমার বিশ্বাস ও পুণ্য কর্মের যথাপুরস্কার লাভ করবো। জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, কথাটির অর্থ— তার আমল যেনো হয় তার অর্জিত এলেমের অনুকূল। জুহাক বলেছেন, সে যেনো আমৃত্যু অধিষ্ঠিত থাকে হেদায়েতের উপর। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, সে যেনো সতত দণ্ডায়মান থাকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আদর্শের উপর। আমি বলি, কথাটির মর্মার্থ হবে— সে যেনো আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য থাকে সদা তৎপর। মুহুর্মুহু যেনো উড়াল দিতে থাকে মহব্বত ও মারেফাতের রহস্যময় ও অন্তহীন আকাশে, যার স্বরূপ অবর্ণনীয়।

وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَٰمُوسَىٰ ○ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ
إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ○ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَ
أَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِىُّ ○ فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا ۚ قَالَ
يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن
يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ○ قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا
مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى
ٱلسَّامِرِىُّ ○ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ فَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ
أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ○

❐ হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলিয়া তোমাকে ত্বরা করিতে বাধ্য করিল কিসে?

❐ সে বলিল, 'এই তো উহারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি ত্বরায় তোমার নিকট আসিলাম, তুমি সন্তুষ্ট হইবে এই জন্য।'

❐ তিনি বলিলেন, 'আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছি তোমার চলিয়া আসার পর এবং সামেরী উহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে।'

❐ অতঃপর মূসা তাহার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া। সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদিগের প্রতিপালক কি তোমাদিগকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নাই? তবে কি প্রতিশ্রুত কাল তোমাদিগের নিকট সুদীর্ঘ হইয়াছে না তোমরা চাহিয়াছ তোমাদিগের প্রতি অবধারিত হউক তোমাদিগের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভংগ করিলে?'

❐ উহারা বলিল, 'আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভংগ করি নাই তবে আমাদিগের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা উহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করে।

❐ 'অতঃপর সে উহাদিগের জন্য গড়িল এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যাহা গরুর শব্দ করিত; উহারা বলিল, 'ইহা তোমাদিগের ইলাহ্ এবং মূসারও ইলাহ্ কিন্তু মূসা ভুলিয়া গিয়াছে।

❐ তবে কি উহারা ভাবিয়া দেখে না যে উহা তাহাদিগের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাহাদিগের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করিবার ক্ষমতাও রাখে না?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত মুসা যখন আল্লাহ্‌র সন্নিধান, একান্ত আলাপন ও তওরাত প্রদানের প্রতিশ্রুতি ও অনুমতি পেলেন, তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের সত্তর জন নেতাকে নিয়ে যাত্রা করলেন তুর পর্বতের দিকে। যতই সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকলেন, ততই তাঁর উপরে প্রবল হতে থাকলো পবিত্র প্রেমের পরিপ্লাবন ও উদ্বেলন। আল্লাহ্‌র মহব্বতে দেওয়ানা হয়ে একসময় তিনি সঙ্গী সাথীদেরকে পিছনে ফেলে দ্রুত ছুটে গেলেন কাঙ্ক্ষিত উপত্যকায়। তখন আল্লাহ্ প্রশ্ন করলেন, হে আমার মুসা! তুমি তোমার সঙ্গীদেরকে ফেলে এভাবে আগে চলে এলে কেনো?

আমি বলি, প্রশ্নটির মাধ্যমে এখানে দ্রুত ছুটে আসার কারণ জানতে চাওয়া হয়নি। ভর্ৎসনা জানানোও প্রশ্নটির উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রেমপথের একটি চিরন্তন আকুতি এখানে উত্থাপিত হয়েছে প্রশ্নাকারে। 'কেবল তোমার জন্য'— এরকম প্রেমাপ্লুত উচ্চারণ শুনবার জন্যই প্রেমাস্পদ তার প্রেমিককে বলে 'কেনো এলে?' এখানকার প্রশ্নটিও সেরকম। কিন্তু হজরত মুসা আল্লাহ্‌র মহান প্রেমিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন মহান রসুলের দায়িত্বপ্রাপ্তও বটেন। তাই সঙ্গী সাথীদেরকে ফেলে আসা দায়িত্বের দিক থেকে নিশ্চয় একটি স্খলনও। তাই প্রশ্নটিতে মিশ্রিত হয়েছে নিকটজনোচিত মৃদু উষ্মাও। সেকারণেই হজরত মুসা প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন ভারসাম্যমূলকভাবে, প্রেমানুরাগ ও দায়িত্ববোধের অভিধায়।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'সে বললো, এই তো তারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি ত্বরায় তোমার নিকটে এলাম, তুমি সন্তুষ্ট হবে এজন্যে।' একথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, আমার সঙ্গীসাথীরা তো আমার পিছনে পিছনে আসছে। আর হে আমার প্রেমাস্পদ, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি পরিতুষ্ট হবে বলেই তো আমি এতো দ্রুত তোমার কাছে এলাম। উল্লেখ্য যে, 'ওরা আমার পশ্চাতে'— একথা হজরত মুসা বলেছিলেন অনুমান করে।

আর এখানে 'তোমার কাছে এলাম' কথাটির অর্থ— আমি এলাম তোমার প্রতিশ্রুত, অনুমোদিত ও নির্দেশিত স্থানে।

'লিতারদ্বা' অর্থ তুমি সন্তুষ্ট হবে বলে। কেউ কেউ বলেছেন, অঙ্গীকার পূরণ ও নির্দেশ বাস্তবায়নে তৎপর হলে আল্লাহ্ খুশী হবেন— এই ছিলো হজরত মুসার ধারণা। তাই তিনি এখানে বলেছেন— 'লিতারদ্বা' (তুমি সন্তুষ্ট হবে, এজন্যে)।

এর পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার চলে আসার পর।' এখানে 'ফাতান্না' অর্থ পরীক্ষা করেছি। 'ফাতান' অর্থ পরীক্ষা করা। হজরত মুসা তুর পর্বতে আগমনের পর সামেরী নামের এক লোক বনী ইসরাইলের অধিকাংশ লোককে মূর্তিপূজক বানিয়ে দিয়েছিলো। তাদের ওই পথভ্রষ্টতাকেই এখানে বলা হয়েছে 'ফাতান্না' বা পরীক্ষা করেছি।

এখানে 'ফাইন্না' শব্দটির 'ফা' অক্ষরটি কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ এর পরবর্তী বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের কারণ। সুতরাং এখানে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে মুসা! তোমার দ্রুত এখানে চলে আসার কারণে তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তোমার এভাবে চলে আসাই হয়ে গিয়েছে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে— হজরত মুসা যদি দ্রুত না এসে স্বাভাবিক গতিতে সম্প্রদায়ের নেতাদেরকে সঙ্গে করে তুর পর্বতে আসতেন, তবে কি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা পথভ্রষ্ট হতো না? এর উত্তরে আমি বলি, নবী-রসুলগণের প্রধান দায়িত্ব দু'টি। একটি হচ্ছে— মানুষকে আল্লাহ্র মনোনীত ধর্মের বিধানাবলী শিক্ষা দান এবং তার বাস্তবায়ন। আর অপরটি হচ্ছে— আত্মিক আকর্ষণের দ্বারা মানুষকে আল্লাহ্র পথে পরিচালনা এবং তাদের অন্তর্জগতে ইমান ও মারেফাতের নূর নিক্ষেপ। এ দু'টো দায়িত্বের পরিপূর্ণ সমন্বয় ঘটলে সর্বসমক্ষে ফুটে ওঠে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য। কিন্তু দ্বিতীয় ফরজ দায়িত্বটি পরিপূর্ণরূপে পালিত হতে পারে তখনই, যখন তাঁরা সৃষ্টিকুলের প্রতি পরিপূর্ণরূপে মনোনিবদ্ধ করেন। কিন্তু তুর পর্বতে দ্রুত গমনের সময় হজরত মুসা ছিলেন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র প্রেমানুরাগে মগ্ন। তাই তখন তাঁর আত্মিক তাওয়াজ্জোহ্ তাঁর উম্মতের প্রতি পরিপূর্ণরূপে ছিলো না। একারণেই তারা হয়ে পড়েছিলো পথচ্যুত। সুফী-সাধকগণের অনেকেই কিন্তু আল্লাহ্র প্রেমে পরিপূর্ণরূপে নিমজ্জিত হওয়াকেই (বেলায়েতকেই) সর্বোচ্চ সিদ্ধি বলে মনে করে থাকেন। তাঁরা বলেন, বেলায়েত আল্লাহ্মুখী এবং নবুয়ত মখলুকমুখী। তাই বেলায়েত নবুয়ত অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রহঃ) বলেছেন, নবুয়ত সর্বাবস্থায় বেলায়েত থেকে উত্তম— সে বেলায়েত নবী, ওলীআল্লাহ্, ফেরেশতা যে কারো হোক না কেনো। কেননা বেলায়েত হচ্ছে তাজাল্লিয়ে সেফাতের (আল্লাহ্র গুণবত্তার জ্যোতিসম্পাতের) নাম। আর নবুয়ত হচ্ছে তাজাল্লিয়ে জাত (আল্লাহ্র সত্তাগত জ্যোতিসম্পাত)। তিনি আরো বলেন, নবুয়ত ও বেলায়েত উভয়ের রয়েছে দুইটি দিক— উর্ধ্বারোহণ ও অবরোহণ। উর্ধ্বারোহণ আল্লাহ্মুখী এবং অবরোহণ মখলুকমুখী। নবী ও ওলীগণ উর্ধ্বারোহণের সময় নূর আহরণ করেন এবং তা বিতরণ করেন অবরোহণকালে। তাই মখলুক উপকৃত হতে পারে তাঁদের

অবরোহনের সময়। তবে উর্ধ্বারোহণের সময় ওলীগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে তাজাল্লিয়ে সেফাতের প্রতি, তাজাল্লিয়ে জাত পর্যন্ত তাঁরা পৌঁছতে সক্ষম হন না। ফলে অবরোহণের সময় তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টির প্রতি মনোনিবদ্ধ করতে পারেন না। কারণ তখনও তাঁদের উর্ধ্বারোহণের প্রভাব কিছু না কিছু থেকেই যায়। কিন্তু নবীগণের অবরোহণ এরকম নয়। অবরোহণের পর তাঁরা সৃষ্টির প্রতি পরিপূর্ণরূপে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারেন। তাই বাহ্যত মনে হয় তাঁরা সাধারণ মানুষের মতো আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত। এমতো অবস্থা হয় তাঁদের জন্য অসহনীয়। কিন্তু তখন তাঁদের করার কিছুই আর থাকে না। কারণ তাঁরা যে নবী। মানুষের কাণ্ডারী ও পথপ্রদর্শক। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে— সৃষ্টির প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হন না। কেনো হবেন? তাঁরা যে আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন। তাই বলা যেতে পারে, সৃষ্টির প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোনিবদ্ধ করার সময়ও তাঁরা আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবদ্ধকারী। কেননা তাঁরা স্বেচ্ছায় নয়, মখলুকের প্রতি মনোনিবদ্ধ করেছেন আল্লাহ্র নির্দেশে। তাই তাঁদের এমতো অবরোহণকে বলে আল্লাহ্র হুকুমে ও ইচ্ছায় অবরোহণ, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাবর্তন (সায়ের মিনাল্লাহ্ বিল্লাহ্)। উল্লেখ্য যে, এই প্রসঙ্গটি আমি সুরা আলাম নাশরাহ্ এর তাফসীরে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকম হতে পারে যে— আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করলেন। একান্তে বাক্যালাপ করলেন তাঁর প্রেমিক শ্রেষ্ঠ হজরত মুসার সঙ্গে। তারপর দান করলেন তওরাত। শেষে বললেন— হে মুসা! এবার তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ফিরে যাও। তোমার অবর্তমানে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। কিন্তু তারা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি, হয়ে গিয়েছে পদস্খলিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।' উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ যেমন পথ-প্রদর্শন করেন, তেমনি করেন পথভ্রষ্ট। তিনিই ভালো ও মন্দ উভয় কর্মের স্রষ্টা। সৃজনের অধিকার ও ক্ষমতা তিনি ছাড়া অন্য কারোই নেই। তাই বলতে হয়, বনী ইসরাইলদের মধ্যে পথভ্রষ্টতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন তিনিই। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি।' কিন্তু আল্লাহ্ পথভ্রষ্টতার স্রষ্টা হলেও এর বাস্তবায়নের মাধ্যম ও কারণ ছিলো সামেরী। তাই সে কথা শেষে বলা হয়েছে এভাবে 'সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।'

বাগবী লিখেছেন, বনী ইসরাইলের সংখ্যা ছিলো ছয় লক্ষ। বারো হাজার ব্যতীত তাদের বাকী সকলেই গো-বৎসের মূর্তি পূজা করে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। আর ওই মূর্তিপূজা তাদেরকে শিখিয়েছিলো সামেরী। কামুস রচয়িতা

লিখেছেন, সামেরী ছিলো সামেরা গোত্রভূত। সে ছিলো কিরমান অঞ্চলের লোক। অথবা বনী ইসরাইলের কোনো নেতা। বায়যাবী লিখেছেন, বনী ইসরাইলের একটি গোত্রের নাম ছিলো সামেরা। সামেরী ছিলো ওই গোত্রসম্পৃক্ত। মুসা বিন তিফির ছিলো তার আসল নাম। সে ছিলো মহাকপট।

এর পরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর মুসা তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেলো ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে।' একথার অর্থ— তুর পর্বতে চল্লিশ দিন অবস্থানের পর আল্লাহ্‌র কথোপকথন ধন্য হজরত মুসা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত তওরাত কিতাব নিয়ে যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে জ্ঞাত হলেন, তখন তিনি রোষ ও ক্ষোভ সহকারে প্রত্যাবর্তন করলেন তাদের কাছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতকাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা চেয়েছো তোমাদের প্রতি অবধারিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে?' এখানে 'উত্তম প্রতিশ্রুতি' অর্থ তওরাত কিতাব প্রদানের অঙ্গীকার— যা ছিলো হেদায়েত ও নূর। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— সম্প্রদায়ের লোকদেরকে গো-বৎসের মূর্তি পূজায় লিপ্ত দেখে হজরত মুসা তাদেরকে বললেন, কিছুদিন আগেই তো তোমরা ছিলে এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস স্থাপনকারী। ছিলে কেবল তাঁরই বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ উপাসক। এই বিশ্বাসে ও কর্মে আজীবন প্রতিষ্ঠিত থাকার অঙ্গীকারও তোমরা আমার সঙ্গে করেছিলে। আমি কি খুব বেশীদিন তোমাদের কাছ থেকে পৃথক ছিলাম? আর তা যদি থাকিও, বিশুদ্ধ এককত্বকে ছেড়ে দিয়ে অংশীবাদিতাকে তোমরা গ্রহণ করবে কোন যুক্তিতে? সত্যকে পরিত্যাগ করে কেউ কি মিথ্যার আশ্রয় যাচনা করতে পারে। তোমরা না অঙ্গীকারাবদ্ধ। তবে তোমাদের এই অঙ্গীকার ভঙ্গের উদ্দেশ্য কী? তোমরা কি চাও, আল্লাহ্‌র গজব তোমাদের উপরে অবধারিত হোক? অংশীবাদীরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র গজব কবলিত।

এর পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি।' একথার অর্থ — লোকেরা বললো, হে আমাদের রসুল! আপনার সঙ্গে আল্লাহ্‌র এককত্বে সুদৃঢ় থাকার যে অঙ্গীকার আমরা করেছিলাম, সে অঙ্গীকার আমরা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। এখানে 'মালকিনা' অর্থ স্বেচ্ছায় করিনি। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'মালাকুন;' 'মিলকুন' ও 'মুলকুন' শব্দত্রয় সমঅর্থসম্পন্ন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরীক্ষায় নিপতিত হলে মানুষ সাধারণতঃ আপন অভিপ্রায়ের উপরে অটল থাকতে পারে না। তাই তারা তখন বলেছিলো— আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে আমাদের উপরে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা তা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করে।' উল্লেখ্য যে, কিবতীরা বনী ইসরাইলদের নিকটে বিভিন্ন অলংকারপত্র গচ্ছিত রাখতো। রাতের অন্ধকারে মিসর ছেড়ে চলে আসার সময়ে তারা আর সেগুলোকে প্রত্যর্পণ করতে পারেনি। সঙ্গে করে নিয়ে আসা সে সমস্ত অলংকারকেই বনী ইসরাইলেরা তখন বলেছিলো 'অলংকারের বোঝা।' 'যীনাতুল ক্বওমী' বলে এখানে ওই অলংকারগুলোর কথা বলা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম এরকমই বর্ণনা করেছেন। বাগবী লিখেছেন, বনী ইসরাইলেরা ওই অলংকারগুলোকে 'চাপিয়ে দেয়া বোঝা' একারণেই বলেছিলো যে, তারা ওগুলো নিয়েছিলো কর্জরূপে, যা আর ফেরত দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কারণ ওই অলংকারের মালিকদের সকলেরই ঘটেছিলো সলিল সমাধি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফেরাউন ও তাহার বাহিনীর সমুদ্রনিমজ্জনের পর সমুদ্র তাদের সকল অলংকার নিক্ষেপ করেছিলো বেলাভূমিতে। বনী ইসরাইলেরা সেই অলংকারগুলো কুড়িয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু এরকম কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ তাদের শরিয়তে বৈধ ছিলো না। তাই তারা অলংকারগুলোকে বলেছিলো বোঝা।

'ফাক্বাজাফ্‌নাহা' অর্থ আমরা নিক্ষেপ করেছি। অর্থাৎ নিক্ষেপ করেছি একটি গর্তে। বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সামেরীর পরামর্শক্রমেই তারা একটি গর্ত খুঁড়ে সেগুলোকে নিক্ষেপ করেছিলো তার মধ্যে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো—অলংকারগুলো এভাবেই থাকুক। হজরত মুসা তুর পর্বত থেকে ফিরে এসে এর যা কিছু একটি বিহিত করবেন।

বিশ্বাসভাজন হওয়ার অপচেষ্টায় সামেরীও তার অলংকারগুলো নিক্ষেপ করেছিলো ওই গর্তের মধ্যে। তাই এখানে বলা হয়েছে—'অনুরূপভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করে'। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত হারূন একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে সবাইকে হুকুম দিয়েছিলেন তোমাদের কাছে রক্ষিত স্বর্ণালংকারগুলো এই আগুনে নিক্ষেপ করো। সকলেই তাঁর নির্দেশ পালন করলো। শেষে সামেরী নিক্ষেপ করলো এক মুঠো মাটি। ওই মাটি ছিলো হজরত জিবরাইলের ঘোড়ার পদস্পর্শধন্য। কাতাদা বলেছেন, ওই মাটিটুকু সামেরী লুকিয়ে রেখেছিলো তার পাগড়ির ভাঁজের মধ্যে।

পরের আয়াতে (৮৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে তাদের জন্য গড়লো এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যা গরুর শব্দ করতো, তারা বললো, এটা তোমাদের ইলাহ্ এবং মুসারও ইলাহ্, কিন্তু মুসা ভুলে গিয়েছে।' একথার অর্থ— তারপর ওই আগুনে পোড়া অলংকারগুলো গলিয়ে সামেরী নির্মাণ করলো একটি গো-

বৎসের মূর্তি। আর ওই গো-বৎস মূর্তিটি থেকে নির্গত হতে শুরু করলো গরুর মতো হাম্বা হাম্বা আওয়াজ। তখন সামেরী ও তার ভক্তরা বলতে শুরু করলো, এটাই তোমাদের আল্লাহ্ এবং মুসারও আল্লাহ্। কিন্তু মুসা এর কথা ভুলে গিয়ে তুর পর্বতে চলে গিয়েছে।

এর পরের আয়াতে(৮৯) বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা ভেবে দেখেনা যে, ওই মূর্তিটি তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোনো ক্ষতি অথবা উপকার করবার ক্ষমতাও রাখে না?' এখানে উদ্ধৃত প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। প্রশ্নটির মাধ্যমে সামেরী ও তার অনুসারীদের অপবিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বলা হয়েছে— নির্বোধেরা একথা কেনো অনুধাবন করতে পারে না যে, গো-বৎস মূর্তি কখনোই উপাস্য হতে পারে না? কেনো একথা বোঝে না যে, নিঃসাড় ওই মূর্তিটি কারো ক্ষতি অথবা উপকার করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন?

'আল্লা ইয়ারজ্বিউ' ইলাইহিম ক্বওলান' অর্থ— তা তাদের কথায় সাড়া দেয় না। এখানে 'আল্লা ইয়ারজিউ' কথাটির 'আল্লা ' শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'আন্না'। এই অব্যয়টির বিশেষ্য এখানে উহ্য রয়েছে। অব্যয়টিকে এখানে বসানো হয়েছে সংক্ষিপ্তরূপে। পূর্ণরূপটি ছিলো 'আন্নাহু'। অর্থাৎ 'আন্' এখানে 'নাসেবাহ্ মাস্দারিয়াহ্' (জবরপ্রদানকারী ধাতুমূল) নয়। তাই এরপর বসানো হয়েছে 'ইয়ারজ্বিউ'। আর 'ক্বওলান্' অর্থ ওই মূর্তিটি কথা বলতে পারে না। তার উপাসকদের কথার জবাবও দিতে পারে না। মূর্তিটিতো তার উপাসকদের চেয়েও অধিকতর অক্ষম। তাই এখানে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, নির্বোধেরা তবুও তাকে উপাস্য বলে মেনে নেয় কেনো?

'লা ইয়াম্লিকু লাহুম দ্বর্রাও লা নাফআ' অর্থ তাদের কোনো ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না। অর্থাৎ গো-বৎস মূর্তিটি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন। বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, সামেরী যখন গো-বৎস মূর্তিটি নির্মাণ করতে শুরু করলো, তখন হজরত হারুন সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, কি করছো? সামেরী বললো, আমি এমন জিনিস তৈরী করছি যা কল্যাণকর হবে, অকল্যাণকর কোনো কিছু আমি করবো না। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন। হজরত হারুন দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! এর মনোস্কামনা পূর্ণ করো। তাঁর এই দোয়া কবুল হয়ে গেলো। সামেরী গো-বৎস মূর্তিটি নির্মাণের পর সেটির মুখে লাগিয়ে দিলো হজরত জিবরাইলের অশ্বের পদস্পর্শধন্য সেই মাটিটুকু। তারপর বললো, আওয়াজসর্বস্ব বাছুর হয়ে যাও। তাই হলো। বাছুরটির মুখ থেকে নির্গত হতে শুরু করলো জীবিত বাছুরের মতো হাম্বা হাম্বা শব্দ। বস্তুতঃপক্ষে এটা ছিলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বনী ইসরাইলদের প্রতি আপতিত একটি পরীক্ষা।

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ
فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ○ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا
مُوْسٰى ○ قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ○ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۭ اَفَعَصَيْتَ
اَمْرِيْ ○ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ
فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ○ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ○
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَ
كَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ○ قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ
لَا مِسَاسَ ۖ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۭ
لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ○ اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ
وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ○

❒ হারুন উহাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিল 'হে আমার সম্প্রদায়! ইহা দ্বারা তো কেবল তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। তোমাদিগের প্রতিপালক দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মানিয়া চল।'

❒ উহারা বলিয়াছিল, 'আমাদিগের নিকট মূসা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমরা ইহার পূজা হইতে কিছুতেই বিরত হইব না।'

❒ মূসা বলিল, 'হে হারুন! তুমি যখন দেখিলে উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করিল

❒ আমার অনুসরণ করা হইতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করিলে?'

❒ হারুন বলিল, 'হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিও না; আমি আশংকা করিয়াছিলাম যে, তুমি বলিবে 'তুমি বনি ইসরাঈলদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ ও তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হও নাই।'

❒ মূসা বলিল, 'হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কী?

❒ সে বলিল, 'আমি দেখিয়াছিলাম যাহা উহারা দেখে নাই, অতঃপর আমি জিবরাঈলের পদচিহ্ন হইতে একমুষ্টি ধূলা লইয়াছিলাম এবং আমি উহা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম এবং আমার মন আমার জন্য শোভন করিয়াছিল এইরূপ করা।'

❒ মূসা বলিল, 'দূর হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি বলিবে 'আমি অস্পৃশ্য' এবং তোমার জন্য রহিল এক নির্দিষ্ট কাল যাহার ব্যতিক্রম হইবে না এবং তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর যাহার পূজায় তুমি রত ছিলে, আমরা উহাকে জ্বালাইয়া দিবই অতঃপর উহাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করিবই।'

❒ তোমাদিগের ইলাহ্ তো কেবল আল্লাহ্ই যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, সর্ববিষয় তাঁহার জ্ঞানায়ত্ত;

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সামেরীর এমতো কুকর্ম দেখে হজরত হারূন হজরত মুসার প্রত্যাবর্তণের আগেই তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এই মর্মে সাবধান করলেন যে, হে আমার সম্প্রদায়! এটা দ্বারা কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। সুতরাং তোমরা ভুল কোরো না। প্রকৃত প্রভুপালকতো তিনিই, যাঁর দয়ায় তোমরা বেঁচে আছো এবং জীবনোপকরণ পেয়ে চলেছো। গো-বৎস মূর্তিটি তো তোমাদের চেয়েও নিম্নস্তরের এক সৃষ্টি। সুতরাং যদি তোমরা তোমাদের বিশ্বাসকে নিরাপদ রাখতে চাও, তবে আমার প্রদর্শিত পথে চলো এবং আমি যে আল্লাহ্র ইবাদত করতে বলি সেই আল্লাহ্কে মেনে নাও।

পরের আয়াতে (৯১) বলা হয়েছে— 'তারা বলেছিলো, আমাদের নিকট মুসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এ পূজা থেকে কিছুতেই বিরত হবো না।' একথা বলে অধিকাংশ লোক মেনে নিলো সামেরীকে। হজরত হারূন তাঁর বারো হাজার একনিষ্ঠ অনুসারীকে নিয়ে তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। এর কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে এলেন হজরত মুসা। দূর থেকে তিনি শুনতে পেলেন হৈ হট্টগোলের আওয়াজ। তাঁর সঙ্গী নেতৃবৃন্দ বললো, মনে হয় নতুন কোনো ফেৎনা ছড়িয়ে পড়েছে। কাছাকাছি আসতেই হজরত মুসা দেখলেন, একটি গো-বৎস মূর্তির চার পাশে অনেক লোক নাচানাচি করছে। ইতোমধ্যে সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত হারূন। রোষান্বিত নবী তখন ডান হাত দিয়ে হজরত হারূনের মস্তকের কেশগুচ্ছ ধরলেন এবং বাম হাত দিয়ে ধরলেন তাঁর শ্মশ্রু।

এর পরের আয়াতদ্বয়ে (৯২, ৯৩) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, হে হারূন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করলো আমার অনুসরণ করা থেকে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?' একথার অর্থ— রোষতপ্ত নবী তখন বললেন, হে হারূন! স্বচক্ষে মূর্তিপূজা করতে

দেখেও তুমি তাদেরকে নিবৃত্ত করলে না কেনো? কেনো সরে গেলে আমার আনুগত্য থেকে? তবে তুমিও কি আমার আদেশ লংঘনকারী? আমাকে তো তুমি বিষয়টি জানাতে পারতে। কেনো জানালে না?

এর পরের আয়াতে (৯৪) বলা হয়েছে— 'হারূন বললো, হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরে আকর্ষণ কোরো না; আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, তুমি বনী ইসরাইলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো ও তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হওনি।' একথার অর্থ— হজরত হারূন বললেন, হে আমার সহোদর! আমার মাথার চুল ও দাড়ি ছেড়ে দাও। আমি তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করিনি, এমতো সন্দেহকে প্রশ্রয় দিয়ো না। তুমি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলে, আমি যেনো তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করি। সে চেষ্টা আমি অবশ্যই করেছিলাম। তবে তা করেছিলাম কোমলতার সঙ্গে, কঠোরতার সঙ্গে নয়। কঠোরতা প্রদর্শন করলে পরিস্থিতি হয়ে পড়তো আরো অধিক সঙ্গিন। যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতো আমার অনুসারী ও সামেরীর অনুসারীদের মধ্যে। ঘটতো অনেক রক্তপাত। আমি রক্তপাত ঘটাতে চাইনি। নম্রতার মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম তাদেরকে। যদি রক্তপাত ঘটাতাম, তবে তুমিই শেষে বলতে, তুমি বনী ইসরাইলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো ও তুমি আমার নির্দেশ পালনে যত্নবান হওনি। 'ইয়াব্‌না উম্‌মা' অর্থ হে আমার সহোদর। অর্থাৎ হে আমার মায়ের পেটের ভাই। হজরত মুসার ক্রোধ প্রশমিত করবার জন্য হজরত হারূন এভাবে সম্বোধন করেছিলেন তাঁকে। সরাসরি 'হে ভাই' না বলে বলেছিলেন 'হে আমার সহোদর ।' কেউ কেউ বলেছেন, হজরত মুসা ও হজরত হারূন ছিলেন এক মায়ের সন্তান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁরা ছিলেন এক পিতা ও এক মাতার সন্তান।

এর পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কী?' একথার অর্থ— হজরত হারূনের কথা শুনে হজরত মুসা আত্মসংবরণ করলেন। জানতে পারলেন, সামেরীই এই অপকর্মটির হোতা। তাই তিনি এবার দৃষ্টিপাত করলেন সামেরীর দিকে। বললেন, হে সামেরী! তুমি এরকম করলে কেনো?

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'খত্বুন,' অর্থ আহ্বান। শব্দটির মাধ্যমে সামেরীর নিকটে জানতে চাওয়া হয়েছে, তোমার এমতো কর্মের উদ্দেশ্য কি? কে তোমাকে এরকম করতে উদ্বুদ্ধ করলো? 'নিহায়াহ্' রচয়িতা লিখেছেন 'খত্বাবা' অর্থ অবস্থা এবং ব্যাপার বা কারণ। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— তোমার ব্যাপার কী? যে সম্পর্কে সম্বোধন করা হয়, তার অবস্থা বা কারণকেও 'খত্বাবা' বলা হয়। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'খত্বাবা' অর্থ বৃহৎ বা ক্ষুদ্র উভয় কর্মের উদ্দেশ্য বা কারণ।

এর পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে— ' সে বললো, আমি দেখেছিলাম, যা তারা দেখেনি, অতঃপর আমি জিবরাইলের পদচিহ্ন থেকে এক মুষ্টি ধুলা নিয়েছিলাম এবং আমি নিক্ষেপ করেছিলাম এবং আমার মন আমার জন্য শোভন করেছিলো এইরূপ করা।' 'ক্বব্দাতুন' অর্থ এক মুষ্টি। এখানে শব্দটির অর্থ হবে এক মুঠো ধুলো বা মাটি। 'আছরির রসুল' অর্থ আল্লাহ্‌র দূতের অর্থাৎ হজরত জিবরাইলের অশ্বের পদচিহ্ন থেকে। 'ফানাবাজতুহা' অর্থ নিক্ষেপ করেছিলাম। অর্থাৎ ওই এক মুঠো মাটি আমি নিক্ষেপ করেছিলাম গো-বৎস মূর্তিটির মুখে।

কেউ কেউ বলেছেন, যে বছর ব্যাপকভাবে বনী ইসরাইলদের নবজাতকদেরকে হত্যা করা হয়, সামেরী জন্মগ্রহণ করেছিলো ওই বছরেই। জন্মের পর পরই তার মা তাকে রেখে এসেছিলো একটি গুহায়। আল্লাহ্‌ হজরত জিবরাইলকে দিয়েছিলেন তার লালন পালনের ভার। তাকে দিয়ে পরবর্তীতে বনী ইসরাইলদেরকে পরীক্ষা করাই ছিলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিলো। হজরত জিবরাইলের তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে উঠেছিলো বলেই সে হজরত জিবরাইলকে চিনতো। সে লক্ষ্য করেছিলো, হজরত জিবরাইলের অশ্বের পায়ের ছোঁয়ার মধ্যে রয়েছে সঞ্জিবনী শক্তি। তাই সে তার সংগ্রহে রেখে দিয়েছিলো তাঁর অশ্বের পদচিহ্নের কিছু মাটি। ওই মাটিটুকুই সে নিক্ষেপ করেছিলো গো-বৎস মূর্তিটির মুখে।

'আমার মন আমার জন্য শোভন করেছিলো এইরূপ করা' কথাটির অর্থ— আমার মনে হয়েছিলো গো-বৎস মূর্তি নির্মাণ করে তার মুখে ওই মাটিটুকু নিক্ষেপের মাধ্যমে মূর্তিটির মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুটিয়ে তোলা একটি অত্যুত্তম কর্ম।

এর পরের আয়াতে (৯৭) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, দূর হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটাই রইলো যে, তুমি বলবে, আমি অস্পৃশ্য এবং তোমার জন্য রইলো এক নির্দিষ্ট কাল যার ব্যতিক্রম হবে না।' এ কথার অর্থ— হজরত মুসা সামেরীকে এইমর্মে অভিসম্পাত করলেন যে, পৃথিবীতে তোমার জন্য এই শাস্তি স্থিরিকৃত হলো মানুষ দেখলেই তুমি বলতে থাকবে 'আমি অস্পৃশ্য', 'আমাকে ছুঁয়ো না', 'আমার নিকটে এসো না। আমি বলি, হজরত মুসার অভিশাপে তার অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিলো জনাতঙ্ক। তাই সে জনমানবহীন অরণ্য ও মরুপ্রান্তরে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতো । ওই অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়।

বাগবী লিখেছেন, হজরত মুসা নির্দেশ জারী করেছিলেন, তার সাথে কেউ মেলামেশা কোরো না। হজরত ইবনে আব্বাস 'লা মিসাসা' (আমি অস্পৃশ্য) কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, ওই ঘটনার পর থেকে সামেরী মানুষ দেখলেই বলতো, খবরদার! আমাকে কেউ স্পর্শ কোরো না। আমি অস্পৃশ্য।

'তোমার জন্য রইলো এক নির্দিষ্ট কাল যার ব্যতিক্রম হবে না' কথাটির অর্থ এখানে— দুনিয়ার শাস্তির মাধ্যমেও তোমার পাপ মোচন হবে না, আখেরাতেও রয়েছে তোমার জন্য সুদীর্ঘকালের সুনির্দিষ্ট শাস্তি। অর্থাৎ অনন্ত শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য করো, যার পূজায় তুমি রত ছিলে, আমরা সেটিকে জ্বালিয়ে দিবোই, অতঃপর সেটিকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবোই'। একথার অর্থ— এবং হে সামেরী! তুমি দেখতে থাকো, তোমার পূজিত মূর্তিটিকে আমরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করবো। তারপর ওই চূর্ণ-বিচূর্ণ ভস্মগুলোকে নিক্ষেপ করবো সাগরে। উল্লেখ্য যে, নির্বোধদেরকে সচেতন করে তুলবার জন্য হজরত মুসা এরকমই করেছিলেন।

শেষোক্ত আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'তোমাদের ইলাহ্ তো কেবল আল্লাহ্ই, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, সর্ববিষয় তাঁর জ্ঞানায়ত্ব'। একথার অর্থ—আল্লাহ্ই তোমাদের উপাসনা লাভের একক অধিকারী। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। সৃষ্টির কেউ বা কোনো কিছু তাঁর সমকক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা অংশীদার হতে পারে না। গো-বৎস মূর্তিটিও নয়।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ۝ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ۝ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝ يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ۝

❒ পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহার সংবাদ আমি এইভাবে তোমার নিকট বিবৃত করিব এবং আমি আমার নিকট হইতে তোমাকে দান করিয়াছি কুরআন,

❒ ইহা হইতে যে বিমুখ হইবে সে কিয়ামতের দিনে মহা পাপভার বহন করিবে।

❒ উহাতে উহারা স্থায়ী হইবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা উহাদিগের জন্য হইবে কত মন্দ।

❒ যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেইদিন আমি অপরাধিগণকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করিব।

❐ উহারা নিজদিগের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করিবে 'তোমরা পৃথিবীতে মাত্র দশ দিন অবস্থান করিয়াছিলে।'

❐ উহারা কি বলিবে তাহা আমি ভাল জানি, উহাদিগের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল সে বলিবে 'তোমরা মাত্র এক দিন অবস্থান করিয়াছিলে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পূর্বে যা ঘটেছে, তার সংবাদ আমি এভাবে তোমার নিকট বিবৃত করবো এবং আমি আমার নিকট থেকে তোমাকে দান করেছি কোরআন'। রসুল স. কে লক্ষ্য করে এখানে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! এই হলো নবী মুসা ও তার সম্প্রদায়ের একটি কাহিনী। অতীত যুগের এরকম আরো অনেক উপদেশপূর্ণ বৃত্তান্ত এই কোরআনের মাধ্যমে আমি আপনাকে অবহিত করে চলেছি, যেনো এগুলো হয় আপনার নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ, মোজেজা ও আপনার উম্মতের বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের জন্য সদুপদেশ ও সচেতনতা। আর এই কোরআন আমি দান করেছি আপনাকেই।

এখানে 'জিকরা' শব্দটির অর্থ কোরআন মজীদ, অথবা সদুপদেশ, যা গ্রহণযোগ্য। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, এখানে 'জিকরা' কথাটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে রসুল স. সম্পর্কিত আলোচনা, তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম বর্ণনা, যা চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। এই অভিমতটি গ্রহণ করলে শেষ বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমি আমার পক্ষ থেকে আপনাকে দান করেছি প্রবহমান প্রসিদ্ধি ও মহিমা। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আমি আপনার জিকিরকে আমার জিকিরের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছি— কলেমায়, আজানে, ইকামতে, তাশাহ্হুদে এবং ধর্মসম্পর্কিত অন্যান্য আলোচনায়।

এর পরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে— 'এ থেকে যে বিমুখ হবে, সে কিয়ামতের দিনে মহাপাপভার বহন করবে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার প্রতি আমি যে কোরআন অবতীর্ণ করেছি, সেই কোরআন থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নিবে, কথা ও কাজে কোরআনের বিধান যে মান্য করবে না, মহা বিচারের দিবসে সে বহন করবে বিশাল পাপের বোঝা।

এখানকার 'আনহু' কথাটির 'হু' সর্বনামটি আল্লাহ্র সঙ্গে অথবা পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে উল্লেখিত 'জিক্‌রা' কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায় এরকম— যে বিমুখ হবে আমার স্মরণ থেকে, অথবা (হে রসুল) আপনার মহিমা থেকে।

'বিযরা' অর্থ পাপের বোঝা বা ভার। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'ওয়াফদা'। যেমন সুরা মারয়ামের এক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে— 'ইয়াওমা নাহ্শুরুল মুত্তাক্বীনা ইলার রহমানি ওয়াফদা' (যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সমবেত করা হবে সম্মানিত অতিথিরূপে)। এই আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে আমি হজরত আমর বিন কায়েস মালায়ী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছি,

যেখানে বলা হয়েছে, কাফেরের সমাধির অভ্যন্তরে তার পাপকর্মগুলো হাজির হবে অত্যন্ত দূর্গন্ধযুক্ত বীভৎস আকৃতিতে এবং তাকে বলবে, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো? সে উত্তর দিবে, না। শুধু এতটুকুই জানি যে, তুমি অত্যন্ত কুৎসিৎ আকৃতি বিশিষ্ট ও দুর্গন্ধময়। আকৃতিটি বলবে, আমি দুনিয়াতেও এরকম ছিলাম। আমি তোমার মন্দ আমল। দুনিয়ায় তুমি দীর্ঘকাল ধরে আমার উপরে সওয়ার হয়ে ছিলে, এখন আমি তোমার উপর সওয়ার হবো। শেষে রয়েছে এ কথাটি— রসুল স. পাঠ করলেন— তারা তাদের পৃষ্ঠদেশে নিজেদের পাপ বহন করবে (সুরা আনআম)।

পাপকে এখানে বলা হয়েছে বোঝা বা ভার। ঘাড়ে বা পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে চলা অত্যন্ত কষ্টকর। ভারী পাপের বোঝা নিয়ে সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপিষ্ঠরাও এরকম অসহ্য কষ্টের মধ্যে পড়বে। ওই দুর্বহ ও অসহ কষ্ট থেকে তারা সেদিন কেউই নিষ্কৃতিও পাবে না।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরকমও হতে পারে যে— যে ব্যক্তি আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল ও আল্লাহ্র কোরআন থেকে বিমুখ হবে, কিয়ামতের দিন তার কাঁধে উঠিয়ে দেয়া হবে ওই সকল সম্পদের বোঝা, যা তারা পৃথিবীতে অবৈধ উপায়ে উপার্জন করেছিলো। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ কোরো না। যদি করো, তবে মহা বিচারের দিবসে ওই সম্পদ তোমার উপরে চেপে বসবে। আমি সেদিন যেনো তোমাদের কাউকে গাভী ও উটের মতো চিৎকার করে কাঁদতে না শুনি। আবু হুমাইদ সাঈদী সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে দখলে রাখবে, কিয়ামতের দিন তার উপরে চাপিয়ে দেয়া হবে সপ্তস্তর বিশিষ্ট মৃত্তিকার বোঝা। হজরত হাকাম বিন হারেছ সালমী থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের চলার পথের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী পরিমাণ জমি অবৈধভাবে দখল করবে, মহাবিচারের দিবসে তাকে উপস্থিত হতে হবে সাত তবক জমিনের বোঝা নিয়ে।

হজরত ইয়া'লী বিন মুররাহ্ থেকে ইমাম আহমদ ও তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অপরের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার স্কন্ধে ঝুলিয়ে দিবেন সাত তবক জমিনের বোঝা। সকল মানুষের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে ওভাবেই রাখা হবে। হজরত আনাস থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি কারো কনিষ্ঠা অঙ্গুলী পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে ভোগ

করবে, হাশরের প্রান্তরে সে উপস্থিত হবে সপ্তস্বর বিশিষ্ট বোঝা ঘাড়ে নিয়ে। হজরত আবু মালেক আশআরী থেকে ইমাম আহমদ এবং তিবরানীও এরকম হাদিস উল্লেখ করেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম আহমদ, বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একদিন বক্তৃতা দানের জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং গনিমতের মাল আত্মসাতের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। শেষে বললেন, সে দিন আমি যেনো কাউকে ভারী বোঝাবাহী উটের মতো অসহায় অবস্থায় না দেখি। এরকমও যেনো বলতে না শুনি যে, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করুন। এরকম কথা শুনলে আমি জবাবে বলবো, এখন তোমাদের জন্য আমি কিছুই করতে পারবো না। আমি তো এ সম্পর্কে তোমাদেরকে পূর্বাহ্নেই অবহিত করেছিলাম। এই হাদিসে বোঝাবাহী অশ্ব ও ছাগলের উল্লেখও এসেছে। হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে আবু ইয়া'লী ও বাযযারও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। জাকাতের মাল আত্মসাতের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে হাদিস বর্ননা করেছেন ইমাম আহমদ হজরত সা'দ বিন উবাদা থেকে, বায্যার হজরত ইবনে ওমর, হজরত আয়েশা থেকে এবং তিবরানী হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত উবাদা ইবনে সামেত এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে।

আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' পুস্তকে এবং তিবরানী শিথিল সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘর-বাড়ি বানায়, কিয়ামতের দিন তাকে বহন করতে হবে ওই অতিরিক্ত ঘর-বাড়ির বোঝা। হজরত আনাস থেকে উত্তমসূত্রে আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার এক আনসারীর নির্মাণাধীন বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে হাত দিয়ে নিজের মাথার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, যে অট্টালিকা এর চেয়ে অতিরিক্ত হবে, কিয়ামতের দিন সেই অট্টালিকা তার মালিকের জন্য ডেকে আনবে বিপদ। বাড়ির মালিক রসুল স. এর এই মন্তব্য শুনতে পাওয়ার সাথে সাথে অট্টালিকাটি গুঁড়িয়ে দিলেন। হজরত ওয়াসেলাহ্ বিন আসকা থেকে তিবরানীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

মুনজারী বলেছেন, বর্ণিত হাদিসের অনুরূপ হাদিস তিবরানীর আলআওসাত গ্রন্থেও রয়েছে। হাদিসটি এই— হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার এক কূপের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। কূপটির পানি ওঠানো হচ্ছিলো। তাই দেখে তিনি স. বললেন, এই কূপের মালিক যদি কূপের হক আদায় না করে, তবে তাকে বিচার দিবসে এই কূপের বোঝা বহন করতে হবে।

এর পরের আয়াতে (১০১) বলা হয়েছে— 'তাতে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্য হবে কতো মন্দ।'

এর পরের আয়াতে (১০২) বলা হয়েছে— 'যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করবো।'

হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক বেদুইন এসে একবার রসুল স. কে শিঙ্গা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি স. বললেন, শিঙ্গা হচ্ছে শিঙের মতো, যার মধ্যে ফুৎকার দেয়া হবে। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, হাকেম,বায়হাকী, ইবনে মোবারক। হাদিসটিকে উত্তমসূত্রবিশিষ্ট এবং যথাসূত্রসম্বলিত বলেছেন যথাক্রমে নাসাঈ ও হাকেম। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে মুসাদ্দাদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

এখানে 'যুরক্বা' কথাটির অর্থ নীলচক্ষুবিশিষ্ট। চক্ষুগোলকের কালো বর্ণের সঙ্গে নীলবর্ণের আভা পরিদৃষ্ট হলে তাকে বলে 'যুরক্বা'। রোমবাসীদের চক্ষু ছিলো এরকম। তারা ছিলো আরবদের দুশমন। তাই আরববাসীরা তাদেরকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। কিয়ামতের দিন কাফেরদের চেহারা হবে কালো এবং চক্ষু হবে নীল বর্ণের। কোরআনের কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, শব্দটির অর্থ দৃষ্টিহীন বা অন্ধ। কিয়ামতের দিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্ধ হওয়ার কথা অন্য আয়াতেও এসেছে। যেমন— 'কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে অন্ধ করে ওঠাবো।' কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ তৃষিত নয়ন।

এর পরের আয়াতে (১০৩) বলা হয়েছে— 'তারা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করবে, তোমরা পৃথিবীতে মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে।'

সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হবে ভীতসন্ত্রস্ত। তাই তারা চুপি চুপি একে অপরকে বলবে, তোমরা দুনিয়ায় তো ছিলে মাত্র দশ রাত্রি বা দশ দিন। অর্থাৎ অতি দ্রুত শেষ হয়ে গিয়েছে তোমাদের পৃথিবীর জীবন। তারা তখন বুঝতে পারবে, পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের জীবন অনন্ত। তাই তারা এরকম মন্তব্য করবে। অথবা অসহনীয় কষ্টের কারণে তাদের তখন মনে হবে, হায় আক্ষেপ! পৃথিবীর সামান্য কয়েকদিনের জীবন আমরা স্বেচ্ছাচারিতা এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূরণের জন্য ব্যয় করেছি, আখেরাতের সাফল্যের জন্য কিছুই করিনি।

কোনো কোনো কোরআন ভাষ্যকার বলেছেন, তখন তারা তাদের কবরের জীবনকে দশ দিন বলে উল্লেখ করবে। কেউ কেউ বলেছেন, শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকারের সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফুৎকারের পর সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে তাদের আপন আপন সমাধি থেকে। এই দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ বছর। ওই চল্লিশ বছর কারো কোনো অস্তিত্ব থাকবে না বলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরও আযাব হবে না। আর ওই সময়ের কথা মনে করেই হাশরের ময়দানে তারা বলবে, তোমরা তো ওই সময় অস্তিত্বহীনতার আরামে ছিলে মাত্র দশ দিন।

শেষোক্ত আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— 'তারা কি বলবে তা আমি ভালো জানি, তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিলো সে বলবে, তোমরা তো মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।'

'আমছালুহুম ত্বরীক্বাতান্' অর্থ তাদের মধ্যে যে জ্ঞানী ও সৎপথ প্রাপ্ত। ওই জ্ঞানী ও সৎকর্মশীলেরা তখন বলবে, তোমরা পৃথিবীতে মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে। নিঃসন্দেহে জ্ঞানবানেরাই তখন এরকম কথা বলতে পারবে। আল্লাহ্পাকও তাদেরকে জ্ঞানবান ও সৎপথপ্রাপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ আখেরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায় পৃথিবীর জীবনের পরিসর নিতান্ত নগণ্য।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, সাক্বাফী গোত্রের এক লোক একবার রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলো, কিয়ামতের দিন পৃথিবীর পাহাড় পর্বতগুলোর কী অবস্থা হবে? তার ওই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত। বাগবী লিখেছেন, কেউ কেউ বলেছেন, কারো কোনো প্রশ্নের কারণে নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। অবতীর্ণ হয়েছে এভাবে— হে আমার রসুল! কেউ যদি আপনাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তবে আপনি বলবেন, আমার প্রভুপালক ওগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে দিবেন।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ○ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ○ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ○ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ○ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ○ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ○ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ○ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ○

❒ উহারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'আমার প্রতিপালক উহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবেন।'

❒ অতঃপর তিনি ভূমিকে মসৃণ সমতল ভূমিতে পরিণত করিবেন।

❒ যাহাতে তুমি উঁচু-নীচু দেখিবে না।

❒ সেই দিন উহারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করিবে, এই ব্যাপারে এদিক ওদিক করিতে পারিবে না। দয়াময়ের নিকট সকল শব্দ ক্ষীণ হইয়া যাইবে, সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনিবে না।

❒ দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন ও যাহার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইবেন সে ব্যতীত কাহারও সুপারিশ সেই দিন কোন কাজে আসিবে না।

❑ তাহাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত কিন্তু উহারা জ্ঞান দ্বারা তাহার জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে না।

❑ চিরঞ্জীব, অনাদি, স্বাধিষ্ঠ, বিশ্বধাতার নিকট সকলেই হইবে অধোবদন এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে যে জুলুমের ভার বহন করিবে।

❑ এবং যে বিশ্বাসী হইয়া সৎকর্ম করে তাহার আশংকা নাই অবিচার ও ক্ষতির।

ইবনে জুরাইজ্ সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, একবার কুরায়েশরা রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলো, হে মোহাম্মদ! কিয়ামতের দিন আপনার প্রভুপ্রতিপালক এই পাহাড়গুলোর কী করবেন? তাদের একথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতটি এভাবে— 'তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, আমার প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন ।'

প্রকৃত কথা হচ্ছে, কারো কোনো জিজ্ঞাসার জবাবরূপে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। বরং এখানে প্রশ্নাকারে জানিয়ে দেয়া হয়েছে পর্বতসমূহের পরিণতির কথা। কেননা এখানে 'কুল' শব্দটির প্রথমে যুক্ত করা হয়েছে 'ফা' অক্ষরটি (ফাকুল)। সুতরাং বুঝতে হবে 'ফা' অক্ষরটি এখানে বসেছে একটি উহ্য শর্তের পরিণতি হিসেবে। তাই কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! যদি লোকেরা আপনাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে , তবে আপনি এই উত্তর দিবেন। প্রশ্নাকারে শিক্ষাদানের এমতো দৃষ্টান্ত অন্য আয়াতেও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ওই আয়াতগুলোতে কোনো শর্ত উহ্য নেই এবং উল্লেখিতও নেই। তাই সেখানে 'কুল' এর প্রথমে 'ফা' অক্ষরটি উল্লেখ করা হয়নি। যেমন—১. 'ওয়া ইয়াস আলুনাকা আ'নিল মাহীদ্বি কুল হুয়া আজা'। ২. 'ইয়াসআলুদনাকা আ'নিল খমরি ওয়াল মাইসিরি কুল ফীহিমা ইছমুন কাবীর'। ৩. 'ইয়াসআলূনাকা আ'নিল আনফালি কুলিল আনফালূ লিল্লাহ্।

'ইয়ানসিফুহা' অর্থ ওগুলোকে সমূলে উৎপাটন করা হবে এবং বিক্ষিপ্ত করা হবে বালুকণার মতো। 'নাসফুন' অর্থ মূলোচ্ছেদ বা মূলোৎপাটন। 'হা' সর্বনামটি এখানে মাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যদিও 'মাটি থেকে উৎপাটন করা হবে' এরকম কথা এখানে আসেনি। কিন্তু একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, পাহাড়-পর্বতসমূহ মাটির উপরেই দণ্ডায়মান।

পরের আয়াতদ্বয়ে (১০৬, ১০৭) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি ভূমিকে মসৃণ সমতলভূমিতে পরিণত করবেন। যাতে তুমি উঁচু-নীচু দেখবে না।'

'ক্বাআ'ন্' অর্থ মসৃণ মৃত্তিকা, যেখানে কোনো পাহাড়-পর্বত নেই। আর 'সফ্‌সফা' অর্থ সমতল ভূমি। এরকম অর্থ করা হয়েছে কামুস গ্রন্থে। 'ইওয়াজা' অর্থ আঁকাবাকা। আর 'আমতা' অর্থ উঁচু-নীচু।

এর পরের আয়াতে (১০৮) বলা হয়েছে— 'সেই দিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এ ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবে না। দয়াময়ের নিকট সকল শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে, সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছু শুনবে না।'

এখানে 'আহ্বানকারী' বলে বোঝানো হয়েছে হজরত ইসরাফিলকে। তিনিই হাশরের মাঠে সকলকে একত্র হওয়ার আহ্বান জানাবেন। বায়তুল মাকদিস প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে বলবেন, হে বিকৃত ও অবিকৃত অস্থি! হে ছিন্ন ভিন্ন ও অপসৃত চর্ম! হে বিস্রস্ত কুন্তলরাশি! তোমাদেরকে আল্লাহ্ বিচারের ময়দানে একত্র হতে নির্দেশ দিচ্ছেন। জায়েদ বিন জাবের শাফেয়ী সূত্রে ইবনে আসাকের এরকম বর্ণনা করেছেন।

'লা ই'ওয়াজা লাহু' অর্থ তারা তখন আহ্বানকারীর ঘোষণার এদিকে ওদিকে যেতে পারবে না। অর্থাৎ তার আহ্বানে অতিদ্রুত সাড়া না দিয়ে পারবে না।

'ওয়া খশাআ'তিল আসওয়াতু লির্‌রহমান' অর্থ দয়াময় আল্লাহ্‌র ভয়ে তখন সকলের আওয়াজ হয়ে যাবে ক্ষীণ। 'ফালা তাসমাউ' বলে এখানে এই আয়াতের সকল শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে— হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত শ্রোতা! তুমি সেদিন ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কিছুই শুনবে না। 'ফালা তাসমাউ' কথাটির 'ফা' এখানে কারণ প্রকাশক।

'হামসান' অর্থ মৃদু গুঞ্জন বা মৃদু আওয়াজ— যেমন উটের ধীর পদক্ষেপের ধ্বনি। বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, 'হাসমুন' অর্থ নিচুস্বরে কথা বলা। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ উচ্চারণ ছাড়াই কেবল ঠোঁট নাড়াচাড়া করা। আবু তালহা সূত্রে ইবনে আবী জাব্বদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ক্বাআন' সমতল ভূমি, 'সফসফান' অর্থ উদ্ভিদবিহীন মসৃণ প্রান্তর, 'ইওয়াজুন' অর্থ উপত্যকা, 'আস্‌তা' অর্থ টিলা।, 'খশাআ'তিল আস্‌ওয়াত' অর্থ আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাওয়া এবং 'হামসান' অর্থ নিম্ন কণ্ঠের আওয়াজ। অন্য বর্ণনায় এসেছে, কথাটির অর্থ উঁচু নিচু নয় এমন স্থান। আর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'হামসান' অর্থ পদশব্দ। অর্থাৎ হাশর প্রান্তরের দিকে গমনকারী মানুষের পায়ের আওয়াজ।

এর পরের আয়াতে (১০৯) বলা হয়েছে— 'দয়ামন্ন যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, সে ব্যতীত কারো সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না।'

এখানে 'মান' শব্দটি রফা; (পেশ) এর স্থানে রয়েছে এবং 'শাফায়াত' শব্দটির 'মোজাফ' (সম্বন্ধপদ) এখানে উহ্য। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— সে দিন কারো কোনো সুপারিশ উপকারে আসবে না। তবে যে ব্যক্তি সেদিন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাফায়াতের অনুমতি প্রাপ্ত হবে সে অবশ্যই শাফায়াত করতে পারবে। অথবা 'মান' শব্দটি এখানে রয়েছে নছব (যবরের) স্থানে। যদি তাই হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে— সেদিন কারো জন্য কারো সুপারিশ কাজে আসবে না ওই ব্যক্তির সুপারিশ ব্যতীত, যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুপারিশের অনুমতি প্রাপ্ত।

'ওয়া রদ্বিয়া লাহু ক্বওলান্' অর্থ যার সুপারিশ আল্লাহ্ পছন্দ করবেন। অর্থাৎ যার সুপারিশ আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, মূল্যবান ও সম্মানার্হ বলে মনে হবে; তাকেই তিনি সেদিন দান করবেন সুপারিশ করবার অধিকার এবং তার সুপারিশ তিনি পছন্দও করবেন। কথাটির উদ্দেশ্য এরকমও হতে পারে— পাপী বিশ্বাসীদের জন্য তিনি সুপারিশ করাকে পছন্দ করবেন। প্রথমোক্ত অর্থটি গ্রাহ্য হবে ওই সময়, যখন 'মান' শব্দটিকে পেশের স্থানে মনে করা হবে। আর 'মান' শব্দটি যবরের স্থানে ধরা হলে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে পরের অর্থটি।

এর পরের আয়াতে (১১০) বলা হয়েছে— 'তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত, কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁর জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না। এ কথার অর্থ— সুপারিশকারীও সুপারিশপ্রাপ্তদের পূর্বাপর সকল অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। অর্থাৎ তাদের দুনিয়ার জীবন ও কবরের জীবন সম্পর্কে তিনি সবিশেষ জ্ঞাত। কিন্তু আল্লাহ্র এই অপার ও আনুরূপ্যবিহীন জ্ঞানকে জ্ঞানায়ত্ত করার ক্ষমতা সুপারিশকারী ও সুপারিশপ্রাপ্ত কারোই নেই।

এর পরের আয়াতে (১১১) বলা হয়েছে— 'চিরঞ্জীব, অনাদি, স্বাধিষ্ঠ, বিশ্বধাতার নিকটে সকলেই হবে অধোবদন।'

এখানে 'আ'নাতি' অর্থ অধোবদন, অক্ষম, অসহায় হওয়া— যেমন সম্রাটের সামনে অসহায় ও অবনত মস্তক হয় বন্দী। 'আ'ন' 'ইয়া'নূ', 'আ'না' বাবে নাসারা হতে, অর্থ পরিশ্রান্ত হওয়া। 'তাআ'ন্না' অর্থ ভারবহণ করা বা কষ্ট সহ্য করা। বাগবী লিখেছেন, 'আ'নী' অর্থ বন্দী (বাবে নাসারা) থেকে 'ইয়া'নু', 'আ'না।'

'আলহাইয়্যু' অর্থ চিরঞ্জীব, মৃত্যু যাকে কখনো স্পর্শ করতে পারে না। উল্লেখ্য যে, মৃত্যু যাকে গ্রাস করতে পারে, সে তো অনস্তিত্বজাত, সম্ভাব্য । অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য বা চির বিদ্যমান নয়। অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব হচ্ছেন কেবল আল্লাহ্, যিনি চিরঞ্জীব।

'আলক্বাইয়্যুম' অর্থ চিরস্থায়ী, অনাদি, স্বাধিষ্ঠ, সকল সৃষ্টির একক ও অসমকক্ষ ব্যবস্থাপক, রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। আর এখানকার উজূহ্ অর্থ চেহারা বা বদন। সকল মানুষের চেহারাই এখানে এই শব্দটির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সকল মানুষকে সেদিন আল্লাহ্ সকাশে অধোবদন হয়ে দাঁড়াতে হবে। অথবা এখানে

শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে কেবল পাপিষ্ঠদের মুখমণ্ডলকে। যদি তাই হয়, তবে এখানে কথাটি দাঁড়াবে—সকল পাপীকে সেদিন আল্লাহ্‌সকাশে দণ্ডায়মান হতে হবে অধোবদন হয়ে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে জুলুমের ভার গ্রহণ করবে।' এখানে 'জুলুম' শব্দের অর্থ শিরিক। কথাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সে দিন সে-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার করেছে।

তলক ইবনে হাবীব বলেছেন, 'ই'না' অর্থ সেজদা করা। যদি তাই হবে তবে সম্পূর্ণ বাক্যটির মর্মার্থ হবে— সকল অবয়ব চিরঞ্জীব, অনাদি ও স্বাধিষ্ঠ প্রভুপালককে সেজদা করে। যে এরূপ না করে অংশীবাদিতাকে প্রশ্রয় দেয়, সে ব্যর্থ।

এর পরের আয়াতে (১১২) বলা হয়েছে— 'এবং যে বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করে, তার আশংকা নেই অবিচারের ও ক্ষতির।' এখানে 'মিনাস্ সলিহাত্' (সৎকর্ম করে) কথাটির 'মিন' আংশিক অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ যে সৎকর্ম সমূহের মধ্যে ফরজ দায়িত্বগুলো পালন করে। অথবা 'মিন' এখানে উদ্দেশ্যমূলক। যদি তাই হয়, তবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— যে সৎকর্ম করে বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যে।

'ওয়াহুয়া মু'মিনুন' (সে বিশ্বাসী হয়ে) কথাটি এখানে অবস্থা প্রকাশক। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— যে ইমানদার অবস্থায় সৎকর্ম করে। উল্লেখ্য যে, ইমান বা বিশ্বাসই হচ্ছে সকল পুণ্যকর্ম গৃহীত হওয়ার অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

'ফালা ইয়াখাফু' (আশংকা নেই) কথাটির 'জাযা'(পরিণতি পদ) এখানে উহ্য। আর'ফা' হচ্ছে কারণ প্রকাশক। ওই উহ্য 'জাযা' হচ্ছে নির্ভয়তা। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— বিশ্বাসী হয়ে যে সৎকর্ম করবে, সে সেদিন হবে সার্থক। কারণ তার হক নষ্ট হওয়ার আশংকা তখন থাকবে না। সে হবে নির্ভয়। অথবা 'আশংকা নেই' কথাটি এখানে বিধেয় এবং 'হুয়া' সর্বনামটি এখানে উদ্দেশ্য। মূল উদ্দেশ্য এখানে উহ্য। সুতরাং তারা ভয় করবে না। অর্থাৎ তাদের পুণ্যের মধ্যে কোনো অবিচার বা জুলুমের মিশ্রণের আশংকা থাকবে না। 'ওয়ালা হাদ্বমা' অর্থ ভয় থাকবে না কোনো ক্ষতির। অর্থাৎ আশংকা থাকবে না সওয়াব কম হওয়ার। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। হাসান কথাটির তাফসীর করেছেন এভাবে— সে দিন তাদের সওয়াব কম হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না এবং এ ভয়-ও থাকবে না যে, অন্যের পাপের ভার তাদের উপরে চাপানো হবে। জুহাক বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— তারা করেনি এমন কোনো পাপের মধ্যে তাদের আটকে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না এবং পুণ্যকর্ম ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনাও হয়ে যাবে তিরোহিত।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ○ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ○ وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ○

❒ এইরূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় এবং উহাতে বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি সতর্কবাণী যাহাতে উহারা ভয় করে অথবা ইহা হয় উহাদিগের জন্য উপদেশ।

❒ আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধীশ্বর। তোমার প্রতি আল্লাহের ওহি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করিও না এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর।'

❒ আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করিয়াছিলাম কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল; আমি তাহাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নাই।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এই কোরআনের মাধ্যমে অতীত যুগের উম্মতের ঘটনাবলী আমি আপনাকে জানাচ্ছি এবং এই কোরআন আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করে চলেছি আপনার মাতৃভাষায়। আর এই কোরআনের মাধ্যমেই আমি বিবৃত করছি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের বিশদ বিবরণ। ওই বিবরণে রয়েছে সাবধানীদের জন্য সতর্কবাণী, সদুপদেশ ও সওয়াব প্রদানের অঙ্গীকার এবং অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তি প্রদানের দুঃসংবাদ।

এখানে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে (তাক্বওয়া অবলম্বন করে) তাদের জন্য কোরআনে বিবৃত করা হয়েছে সতর্কবাণী। এর কারণ , সতর্কবাণীকে মান্য করে তারাই, যাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র ভয়। আর যাদের মধ্যে এরকম ভয় নেই তাদের জন্যও কোরআন উপকারী। কারণ, এর মাধ্যমে তারা কিছু সদুপদেশ তো শুনতে পায়, যদিও তারা পূর্ণ তাক্বওয়ার স্তরে পৌঁছতে সক্ষম না হয়। এই সতর্কবাণী ও সদুপদেশের সম্পর্ক করা হয়েছে কোরআনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ সতর্ককারী ও সদুপদেশ দাতা তো আল্লাহ্। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'আও ইউহ্দিছু' কথাটির

'আও'(অথবা) শব্দটির অর্থ হবে 'ওয়াও' (এবং)। এরকম অর্থ করা হলে আলোচ্য বাক্যের মর্ম আরো অধিক স্পষ্ট হয়ে যায় এবং বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যেনো তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং কোরআন হয় তাদের জন্য সদুপদেশ।

এর পরের আয়াতে (১১৪) বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধীশ্বর।' এখানে 'ফাতায়ালাল্লহু' (আল্লাহ্ অতি মহান) কথাটির মাধ্যমে এখানে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণবত্তা যেরকম উপমাবিহীন, তেমনি তাঁর কালামও অন্য সকল কালামের (কথার) সাদৃশ্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র। সুতরাং তা অংশীবাদীদের শিরিকমিশ্রিত উক্তি থেকে অতি অবশ্যই পবিত্র। আমি বলি, বরং এখানে বলা হয়েছে— সৃষ্টি তাঁর সম্পর্কে যা বর্ণনা করে, তার চেয়েও তিনি অধিক পবিত্র ও মর্যাদামণ্ডিত। তাই তাঁর সম্পর্কে যে যেভাবে যতোবেশী বর্ণনা করুক না কেনো তাঁর সত্তা ও গুণবত্তার যথাযথ ও পরিপূর্ণ বর্ণনা কিছুতেই করতে পারবে না। সে কারণেই তাঁর স্তব-স্তুতির প্রকাশকারীরা একথা বলতে বাধ্য হয় যে— হে আল্লাহ্! আমি তোমার প্রশংসা করে কখনো শেষ করতে পারবো না। তুমি তদ্রূপ, যেরূপ তুমি তোমার নিজের প্রশংসা করেছো।

'আল-মালিকুল হাক্ব' অর্থ প্রকৃত অধীশ্বর, যাঁর সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী এবং যাঁর গুণবত্তাসমূহ তাঁরই সত্তা নির্ভর, অন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। তাই তাঁর প্রতাপ, পরাক্রম, কর্তৃত্ব অবক্ষয়ের অতীত, বিবর্তনবিহীন ও শাশ্বত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পন্ন হবার পূর্বে কোরআন পাঠে তুমি ত্বরা কোরো না এবং বোলো, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন করো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমা থেকে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ জিবরাইলকে প্রথমে সম্পূর্ণ আবৃত্তি করতে দিন, প্রথমে সম্পূর্ণ করতে দিন বিশেষ কোনো বক্তব্যের সম্পূর্ণ বাক্যগুলোকে। বিরত থাকুন আংশিক শ্রবণ, পাঠ ও প্রচার থেকে। এ ব্যাপারে ত্বরাপ্রবণতাকে কখনো প্রশ্রয় দিবেন না। বলুন, হে আমার প্রভুপালক, আমার জ্ঞান সম্প্রসারিত করে দিন। উল্লেখ্য যে, রসুল স. প্রেমাতিশয্যবশতঃ আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী শ্রবণ, সংরক্ষণ, পাঠ ও প্রচারের ব্যাপারে ত্বরাপ্রবণ হয়ে পড়তেন। তাই আলোচ্য আয়াতে তাঁকে এভাবে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'ব্যস্ততাহেতু আপনার রসনাকে অধিক সঞ্চালন করবেন না।'

মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! প্রত্যাদেশিত বাণীর উদ্দেশ্য ও অর্থ যতোক্ষণ আপনার নিকটে সুস্পষ্ট না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আপনি তা লিপিবদ্ধ করাবেন না এবং আপনার সহচরবৃন্দের

সম্মুখে আবৃত্তি করবেন না। আংশিক অনুধাবন ও তার প্রচার সুসংগত নয়। তাই আপনি এই মর্মে প্রার্থনা করুন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমার জ্ঞানসীমা প্রসারিত করে দিন।

এর পরের আয়াতে (১১৫) বলা হয়েছে— 'আমি তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিলো, আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।' একথার অর্থ— আমি আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, ওই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। কিন্তু সে আমার নির্দেশ বিস্মৃত হয়েছিলো। গমন করেছিলো নিষিদ্ধ বৃক্ষটির কাছে। আমি তাকে দৃঢ় সংকল্পকরূপে প্রত্যক্ষ করিনি।

এখানে 'আ'যমা' অর্থ দৃঢ় সংকল্প। 'সংকল্প' অর্থে শব্দটি কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— ১. 'অতঃপর তুমি সংকল্প করলে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবে'— সুরা আলে ইমরান। ২. 'নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহের সংকল্প কোরো না'। ৩. 'আর যদি তারা তালাকের ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ হয়'। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'আ'যামা আ'লাইহ্' অর্থ সে এই কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। 'সিদ্ধান্ত নিয়েছে' এবং 'চেষ্টা চালাচ্ছে' উভয় অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। নিহায়াহ্ গ্রন্থে রয়েছে, 'আ'যমা' অর্থ প্রচেষ্টা, ধৈর্য। আমি বলি, কথাটির মর্মার্থ— কোনো কাজের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলে তা বাস্তবায়নের জোর চেষ্টা চালাতে হবে এবং প্রতিকূলতায় ধারণ করতে হবে ধৈর্য।

কোনো কোনো কোরআন ভাষ্যকার বলেছেন, এখানকার 'লাম নাজিদ্ লাহু আ'যমা' কথাটির অর্থ— আমি আদমের হৃদয়ে অবাধ্যতার অপবিত্রতা দর্শন করিনি, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিলো, অঙ্গীকার পালনে হয়ে পড়েছিলো অক্ষম।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে জায়েদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন— 'তুমি ও তোমার স্ত্রীর শত্রু ইবলিস' আল্লাহ্র এই সাবধানবাণীটি হজরত আদম ভুলে গিয়েছিলেন। ওই সময় ইবলিসের শত্রুতা ও আল্লাহ্র সতর্কতা কোনো কিছুই মনে ছিলো না তাঁর। কাজী আয়ায তাঁর আশ্শিফা গ্রন্থে লিখেছেন, ' কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিলো' একথা বলে আল্লাহ্ নিজেই আলোচ্য আয়াতে হজরত আদমের অনিচ্ছাকৃত ভুলকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন। প্রকাশ করেছেন হজরত আদমের প্রতি তাঁর স্নেহসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি।

কাশশাফ রচয়িতা ও বায়যাবী লিখেছেন, এখানকার 'লাক্বদ্ আ'হিদ্না' (ইতোপূর্বে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম) কথাটির সম্পর্ক ঘটেছে 'সর্রাফনা' (আমি বর্ণনা করেছি) কথাটির সঙ্গে। এভাবে এখানে এই তথ্যটি ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সদুপদেশ প্রদানের পরেও কৃত অঙ্গীকারের কথা ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু

নয়। এরকম বিস্মৃতিপ্রবণতা একটি চিরাচরিত মানবিক বৃত্তি। যেমন ইতোপূর্বে আমি আমার নবী আদমকে একটি নির্দেশ দান করেছিলাম। কিন্তু বিস্মৃতিবশতঃ সে তা পালন করতে অক্ষম হয়েছিলো।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পিতা আদমকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্ তাঁর পৃষ্ঠদেশে হস্তস্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কিয়ামত পর্যন্ত সৃজিতব্য সকল মানুষ বের হয়ে এলো। আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেকের চোখের মাঝে সৃষ্টি করলেন একটি নূরের চমক। তারপর তাদেরকে উপস্থিত করলেন হজরত আদমের সামনে। পিতা আদম বললেন, হে আমার প্রভুপালক, এরা কারা? আল্লাহ্ বললেন, এরা তোমার অনাগত বংশধর। পিতা একজনের চোখে নূরের চমক দেখে অভিভূত হলেন। বললেন, হে আমার প্রভুপালক! এই লোকটি কে? আল্লাহ্ বললেন, দাউদ। তিনি বললেন, হে আমার আল্লাহ, আপনি তার পৃথিবীর আয়ু কতদিন নির্ধারণ করেছেন? আল্লাহ্ বললেন, ষাট বছর। তিনি বললেন, আমার আয়ু থেকে তাকে চল্লিশ বছর দিয়ে দিন। পৃথিবীর জীবন শেষে পরলোকগমনের সময় মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখে তিনি বললেন, এখনই এলে কেনো? আমার তো আরো চল্লিশ বছর আয়ু রয়েছে। মৃত্যুর ফেরেশতা বললেন, আপনি কি ওই চল্লিশ বছর আয়ু আপনার অধস্তন পুরুষ দাউদকে দেন নি? ঘটনাটি ছিলো অনেক দিন আগের। তাই তিনি কথাটি ভুলেই গিয়েছিলেন। সেকারণেই অবলীলায় বলে ফেললেন, না। তিনি এমতো বিস্মৃতি থেকে মুক্ত ছিলেন না বলেই তাঁর উত্তর পুরুষেরা এরকম ভুল করে বসে।

কোনো কোনো তাত্ত্বিক বলেছেন, কাশ্শাফ রচয়িতা ও বায়যাবীর বর্ণিত তথ্যটি ভুল। আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক 'সর্‌রাফনা' (আমি বর্ণনা করেছি) কথাটির সঙ্গে হলে একথাও বলতে হয় যে, 'কা'জালিকা' (এরূপ) কথাটির সম্পর্কও হবে 'সর্‌রাফনা' এর সঙ্গে এবং কা'জালিকা সর্‌রাফনা' এর সংযোগ হবে 'কাজালিকা নাক্বুদ্দা আলাইকা' এর সঙ্গে। আর কা'জালিকা নাক্বুদ্দা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে হজরত মুসার কাহিনীর প্রতি। সুতরাং হজরত আদম ও হজরত মুসার কাহিনীর সঙ্গে একটি সম্পর্ক বা সাদৃশ্য হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু হজরত আদমের কাহিনীতে এসেছে বিস্মৃতি প্রবণতা ও অঙ্গীকার পালনে অক্ষম হওয়ার কথা। হজরত মুসার কাহিনীতে এরকম কিছু নেই। বরং 'ওয়াহাল্ আতাকা হাদীছু মুসা' (মুসার বৃত্তান্ত তোমার নিকটে পৌঁছেছে কি) কথাটির সঙ্গে এখানকার 'স্মরণ করো, যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমের প্রতি নত হও' বাক্যটির একটি সম্পর্ক বা সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ উভয় ঘটনাই অতীত যুগের। আল্লাহ্পাকই প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ○ فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا
عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ○ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَ
لَا تَعْرَىٰ ○ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ○ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ
هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ○ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا
سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ○

❑ স্মরণ কর, যখন ফেরেশ্‌তাগণকে বলিলাম,'আদমের প্রতি নত হও,' তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হইল, সে অমান্য করিল।

❑ অতঃপর আমি বলিলাম, ' হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদিগকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ কষ্ট পাইবে।'

❑ তোমার জন্য ইহাই রহিল যে তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হইবে না ও নগ্নও হইবে না;

❑ এবং সেথায় পিপাসার্ত হইবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হইবে না।

❑ অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলিল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?'

❑ অতঃপর তাহারা উহার ফল ভক্ষণ করিল; তখন তাহাদিগের লজ্জাস্থান তাহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা উদ্যানের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। আদম তাহার প্রতিপালকের অবাধ্য হইল, ফলে সে পথভ্রষ্ট হইল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! সেই সময়ের কথা শুনুন, যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম, আদমকে সেজদা করো; ইবলিস ব্যতীত তখন সকলেই তাকে সেজদা করলো। কেবল ইবলিস করলো না। সে হয়ে গেলো বিদ্রোহী। এখানে 'ওয়া ইজ কুল্‌না' বলে হজরত আদমের বিস্মৃতির কাহিনীর প্রতি রসুল স. এর মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। আর এখানে 'আবা' (সে অমান্য করলো) বাক্যটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে পৃথকরূপে। ইবলিসের বিদ্রোহী হওয়ার বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণরূপে চিহ্নিত করার জন্যই এখানে এরকম করা হয়েছে।

পরের আয়াতে (১১৭) বলা হয়েছে— অতঃপর আমি বললাম, হে আদম! এ তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু, সে যেনো কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখকষ্ট পাবে।' এখানে 'ফাকুল্‌না' (অতঃপর আমি বললাম) কথাটির পূর্বে রয়েছে একটি উহ্য বক্তব্য। বক্তব্যটি হচ্ছে— আমি আদম ও তার স্ত্রীকে জান্নাতে প্রবেশ করালাম। এভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে— আমি আদম ও তার সহধর্মিণীকে জান্নাতে বসবাস করতে বললাম। তারপর তাদেরকে বললাম, ইবলিস কিন্তু তোমার ও তোমার সহধর্মিণীর শত্রু। সুতরাং তার সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিতে যদি তার এই অপপরিকল্পনাটি সফল হয়, তবে তোমরা চিরসুখময় এই বসবাস হারিয়ে ফেলবে। পতিত হবে দুঃখকষ্টে।

'জান্নাত থেকে বের করে না দেয়' কথাটি একই সঙ্গে ইবলিসের প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং আদমদম্পতির প্রতি সতর্কবাণী। সতর্কবাণীটি এই— সে যেনো তোমাদের জান্নাতচ্যুতির কারণ না হয়। অর্থাৎ তার প্রতারণা যদি সফল হয়, তবে আল্লাহ্ই তোমাদের দু'জনকে জান্নাতহারা করবেন।

এখানকার 'ফালা ইউখরিজান্নাকুমা মিনাল্‌জান্‌নাত' (জান্নাত থেকে বের করে না দেয়) কথাটির প্রথম অক্ষর 'ফা' কারণ প্রকাশক। আলোচ্য আয়াতের শেষ কথাটি হচ্ছে— 'ফাতাশক্বা।' কথাটির অর্থ— তোমরা দুঃখকষ্ট পাবে। অর্থাৎ তোমাদেরকে তাহলে চলে যেতে হবে পৃথিবীতে। সেখানকার জীবনযাত্রা হবে কঠিন। জান্নাতের মতো অনায়াস আহার্য সেখানে মিলবে না। চাষবাস করতে হবে। বীজ বুনতে হবে। ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সশ্রম ও সযত্ন শস্যায়নের। কাটাই মাড়াই শেষে আবার ছাড়িয়ে নিতে হবে শস্যের খোসা। তারপর রান্নাবান্না। অতঃপর আহার্য গ্রহণ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হজরত আদমের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিলো একটি লাল ষাঁড়। তিনি ওই ষাঁড়টির দ্বারা জমি চাষ করতেন। চাষবাস করার সময় তাঁর শরীর হয়ে উঠতো ঘর্মাক্ত। কপাল থেকে ঝরতো স্বেদবিন্দু। ওই পরিশ্রমের দিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে— তোমরা দুঃখকষ্ট পাবে। চাষবাস করতেন হজরত আদম একা। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, তোমরা দুঃখকষ্ট পাবে। এভাবে দু'জনকে দুঃখকষ্টের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হচ্ছে, স্বামী দুঃখ পেলে স্ত্রীও দুঃখ পায়। তাই এখানে 'তুমি' না বলে বলা হয়েছে 'তোমরা'। আবার বাক্যের শুরুতে সম্বোধন করা হয়েছে 'হে আদম'। জীবনোপকরণ সংগ্রহের দায়িত্ব প্রধানতঃ পুরুষের। তাই এখানে এককভাবে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল হজরত আদমকে।

এর পরের আয়াতদ্বয়ে (১১৮, ১১৯) বলা হয়েছে— 'তোমার জন্য এটাই রইলো যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না ও নগ্নও হবে না; এবং সেখানে পিপাসার্ত হবে না ও রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না।'

এখানে 'লাইয়াদ্বহা' অর্থ রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না। এরকম বলা হয়েছে একারণে যে, সেখানে রৌদ্র বলে কিছু নেই। রয়েছে কেবল সুনিবিড়, সুবিস্তৃত, সুশোভিত ও সুউজ্জ্বল ছায়া। এভাবে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— সকল সুখের উপকরণ রয়েছে জান্নাতে। রয়েছে ক্ষুধার খাদ্য, পিপাসার পানি, শরীরাচ্ছাদনের বস্ত্র এবং সুবিস্তৃত ও সুশীতল ছায়া। শ্রম, ঘাম কোনো কিছুই সেখানে নেই। আর সেখানকার সুখ চিরকালীন।

এর পরের আয়াতে (১২০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো; সে বললো, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিবো অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?' একথার অর্থ— ইবলিস সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। একসময় সে সুযোগ পেয়েও গেলো। আদম দম্পতিকে সে এইমর্মে কুমন্ত্রণা দিলো যে, আমি তোমাদের সুহৃদ। তাই অতি সংগোপনে আমি তোমাদেরকে জানাতে চাই এক অনন্ত জীবনপ্রদায়ক বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের সংবাদ। তোমরা কি শুনবে?

এর পরের আয়াতে (১২১) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা তার ফল ভক্ষণ করলো; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা উদ্যানের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো। আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হলো, ফলে সে পথভ্রষ্ট হলো ।' এখানে 'ওয়ারাক্বিল জান্নাত' অর্থ নিষিদ্ধ বৃক্ষের পাতা বা ফল। আর 'আ'সা আদামু রব্বাহু ফাগাওয়া' অর্থ ফলে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেলো, হারিয়ে ফেললো পথ। উল্লেখ্য যে, শয়তানের কুমন্ত্রণায় অক্ষয় জীবনের আশায় আদমদম্পতি ভক্ষণ করেছিলেন ওই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল, কিন্তু ওই বৃক্ষই ছিলো তাঁদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কারণ। এরকমও বলা যেতে পারে যে, ইবলিসের কুমন্ত্রণার প্রভাবে তাঁরা বিস্মৃত হলেন আল্লাহ্‌র সতর্কবাণী। তাই স্খলিত হলেন সুখের পথ থেকে।

ইবনে আরাবী এখানকার 'গাওয়া' শব্দটির অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন— তাঁদের সুখের জীবনে ঘটলো এক রহস্যময় উপপ্লব। জীবনের গতি নির্ধারিত হলো নিরাপদ অবস্থা থেকে উপদ্রুততার দিকে, আনন্দ থেকে বেদনার দিকে। ইবনে কুতাইবা বলেছেন, আল্লাহ্‌র কালামের প্রতিধ্বনিরূপে এরকম পাঠ করা

যাবে যে 'আ'সা আদামু রব্বাহু' (আদম তাঁর প্রতিপালকের অবাধ্য হলো)। কিন্তু সরাসরি কেউ তাঁকে স্বেচ্ছাচারী বা অবাধ্য বলতে পারবে না। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন নবী। তাছাড়া যে ক্রমাগত আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে চলে, তাকে বলা হয় 'আ'স'(অবাধ্য)। কিন্তু বিস্মৃতি বা অনবধনতার কারণে কোনো সময় কারো দ্বারা যদি আল্লাহ্র কোনো একটি আদেশ লংঘিত হয়, তবে তাকে অবাধ্য বলা যায় না। কেননা ঘটনাক্রমে কেউ যদি কাপড় সেলাই করে, তবে তাকে দর্জি বলা হয় না, পেশাগতভাবে যে নিয়মিত কাপড় সেলাই করতে অভ্যস্ত, তাকেই কেবল দর্জি বলা যায়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, একবার আল্লাহ্র সামনে নবী আদম ও নবী মুসার মৃদু বিতর্ক অনুষ্ঠিত হলো। ওই বিতর্কে বিজয়ী হলেন নবী আদম। নবী মুসা বললেন, আপনি আমাদের সকলের পিতা। আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর আপন অলৌকিক হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মধ্যে ঘটিয়েছেন আত্মার সম্পাত। ফেরেশতাদের সেজদার মাধ্যমে আপনাকে করেছেন সম্মানিত। আর আপনাকে তিনি রেখেছিলেন জান্নাতে। এরপরেও আপনি ভুল করলেন কেনো? আপনার জন্যই তো আমরা জান্নাত থেকে পতিত হয়েছি পৃথিবীতে। পিতা আদম বললেন, তুমি তো মুসা কলীমুল্লাহ্। আল্লাহ্ তোমার সঙ্গে করেছেন একান্ত আলাপন। বানিয়েছেন রসুল। দিয়েছেন তওরাত। এখন বলো, তওরাত লিপিবদ্ধ হয়েছে কবে? নবী মুসা বললেন, আপনার সৃষ্টির চল্লিশ বছর আগে। আদম বললেন, আমার ভুল করার কথাটি তওরাতে লিপিবদ্ধ ছিলো? মুসা বললেন, হ্যাঁ। আদম বললেন, এরপরেও তুমি আমাকে দোষারোপ করছো কেনো? আমার দ্বারা যা কিছু সংঘটিত হওয়ার, তাতো আল্লাহ্ আমার সৃষ্টির চল্লিশ বৎসর পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। শেষে রসুল স. বললেন, এইভাবে আদম মুসার উপরে বিজয়ী হয়ে গেলেন।

বাগবীর বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— মুসা বললেন, আপনি আমাদের সকলের পিতৃপুরুষ । অথচ আপনার কারণেই আমরা বেহেশতচ্যুত হয়েছি। আদম বললেন, আল্লাহ্ তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন। তাঁর অলৌকিক হস্তলিখিত তওরাত তোমাকে দান করেছেন। তবু কি তুমি ওই কর্মের জন্য আমাকে অভিযুক্ত করতে চাও, যা নির্ধারিত হয়েছিলো আমার অস্তিত্বলাভের চল্লিশ বৎসর পূর্বে? একথা বলেই আদম বিজয়ী হলেন মুসার উপর।

একটি প্রশ্নঃ ভুলে যাওয়া একটি স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তি। তাহলে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য হজরত আদমকে এখানে অবাধ্য বলে অভিযুক্ত করা হলো কেনো?

উত্তরঃ এই উম্মতের ভুল উপেক্ষণীয় ও ক্ষমার্হ। কিন্তু এই নিয়মটি পূর্ববর্তীগণের জন্য প্রযোজ্য ছিলো না। হজরত ওমর ও হজরত সাওবান থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের বিস্মৃতি ও বলপ্রয়োগিত কর্ম ক্ষমার্হ। এই হাদিসে এরকম বলা হয়নি যে, অন্যান্য উম্মতের ভুলত্রুটি ক্ষমার্হ। বলা হয়েছে কেবল এই উম্মতের কথা। তবে পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধ ক্ষমার্হ হওয়ার বিষয়টি সার্বজনীন। তাই সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিকৃতমস্তিস্কদের, জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত নিদ্রিতদের এবং বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিচ্যুতি ক্ষমার্হ। আমি সুরা বাকারার 'রব্বানা লা তুআখিজনা ইন্নাসীনা আও আখত্বা'না'— এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছি, বিস্মৃতিজনিত বিচ্যুতি অভিযোগের আওতায় পড়ে না। কিন্তু পাপ হচ্ছে বিষসদৃশ। ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত যেভাবেই বিষপান করা হোক না কেনো, বিষের প্রতিক্রিয়া হবেই। তাই জ্ঞানতঃ ও ভুলবশতঃ সকল পাপের পরিণাম অবশ্যই ভোগ করতে হবে, যদি না আল্লাহ্ তা মাফ করে দেন, স্বেচ্ছায় অথবা তওবার মাধ্যমে।

কালাবী বলেছেন, আল্লাহ্র হুকুমের পরিপন্থী সকল প্রকার ভুলের কারণে বনী ইসরাইলদেরকে শাস্তি দেয়া হতো। শাস্তিস্বরূপ বিশেষ কোনো খাদ্যবস্তুকে তাদের জন্য করে দেয়া হতো হারাম। আমি বলি, একারণেই হজরত আদমের ভুলের জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো এবং বঞ্চিত করা হয়েছিলো জান্নাতের সুখ শান্তি থেকে। উত্থাপিত প্রশ্নের অপর একটি উত্তর এরকমও হতে পারে যে, সাধারণ পুণ্যবানদের পুণ্য আল্লাহ্র বিশেষ সন্নিধানভাজনদের জন্য গোনাহ্ সদৃশ। তাই সাধারণ ভুলের জন্য সাধারণ পুণ্যবানদেরকে আখেরাতে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না এবং এজন্য দোজখের আযাবও তাদের ভোগ করতে হবে না। বিশেষ সন্নিধানভাজনগণও আখেরাতের আযাব থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকবেন। কিন্তু পৃথিবীতে তাঁদের ভুল তাঁদের অন্তরে সৃষ্টি করে এক ধরনের আচ্ছন্নতা। ফলে, আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁদের নৈকট্যের সম্পর্ক হয় কিছুটা বিপর্যস্ত। রসুল স. বলেছেন, আমার হৃদয়ও আচ্ছাদিত হয় এবং আমি প্রতিদিন একশতবার আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ।

মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন, নবী- রসুলগণ ইচ্ছে করলে বেঁচে থাকতে পারতেন— এরকম ভুলের জন্যও অভিযুক্ত হবেন। উল্লেখ্য যে, এই অভিমতের প্রেক্ষিতে কোনো কোনো আলেম বলেন, নবুয়তের দায়িত্বলাভের পূর্বে নবীগণের দ্বারা সগীরা গোনাহ্ সংঘটিত হতেও পারে।

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ○ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ○ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ○ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ○ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ○ وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ○ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ○

❒ ইহার পর তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন, তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইলেন ও তাহাকে পথ নির্দেশ করিলেন।

❒ তিনি বলিলেন, 'তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে একই সংগে জান্নাত হইতে নামিয়া যাও। পরে আমার পক্ষ হইতে তোমাদিগের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসিলে যে আমার পথানুসরণ করিবে সে বিপথগামী হইবে না ও দুঃখ কষ্ট পাইবে না।

❒ 'যে আমার স্মরণে বিমুখ তাহার জীবনের ভোগ সম্ভার হইবে সংকুচিত এবং আমি তাহাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করিব অন্ধ অবস্থায়।'

❒ সে বলিবে, ' হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করিলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।'

❒ তিনি বলিবেন,'তুমি এইরূপই ছিলে; আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট আসিয়াছিল কিন্তু তুমি উহা বর্জন করিয়াছিলে এবং সেইভাবেই আজ তোমাকে বর্জন করা হইল।

❒ এবং এই ভাবেই আমি প্রতিফল দিই তাহাকে যে বাড়াবাড়ি করে ও তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর, অধিক স্থায়ী।

❒ আমি ইহাদিগের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি কত মানবগোষ্ঠী যাহাদিগের বাসভূমিতে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে, ইহা কি তাহাদিগকে সৎপথ দেখাইল না? অবশ্যই ইহাতে বিবেকসম্পন্নদিগের জন্য আছে নিদর্শন।

'ইজতাবাহু' কথাটি এসেছে 'জাবইয়ুন' থেকে। শব্দটির অর্থ একত্র করা। যেমন— 'জাবায়াল খারাজা' অর্থ সে কর একত্র করেছে। 'ইজতাবা' অর্থ নিজের কাছে একত্র করা বা নিয়ে আসা। মর্মার্থ হচ্ছে— গ্রহণ করা, নির্বাচন করা, নিকটবর্তী করা, মনোনীত করা। অর্থাৎ তারপর আল্লাহ্ হজরত আদমকে তওবার প্রতি অনুপ্রাণিত করলেন। সেই অনুপ্রাণানুসারে তিনি যখন তওবা করলেন, তখন আল্লাহ্ তাকে গ্রহণ করলেন এবং মনোনীত করলেন অধিকতর নৈকট্যভাজনরূপে।

'তাবা আ'লাইহি' অর্থ আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। 'হাদা' অর্থ তাঁকে পথনির্দেশ করলেন। হজরত আদম তখন দোয়া করলেন 'রব্বানা জালামনা আন্ফুসানা'—হে আমার পালনকর্তা। আমি স্বীয় সত্তার উপর পীড়ন করেছি। শেষে আল্লাহ্ তাঁকে ও তাঁর সহধর্মিণীকে পথ প্রদর্শন করলেন অধিকতর নৈকট্যভাজনতার দিকে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— এরপর আল্লাহ্ হজরত আদমকে করলেন অধিকতর নিকটবর্তী ও মনোনীত। তাঁর প্রতি হলেন ক্ষমাপরবশ এবং তাঁকে দান করলেন পথনির্দেশনা— অক্ষয় কল্যাণের দিকে।

পরের আয়াতে (১২৩) বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে একই সঙ্গে জান্নাত থেকে নেমে যাও।' এখানে হজরত আদম, হজরত হাওয়া এবং তাঁদের অনাগত বংশধরকে একযোগে 'তোমরা ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এটাও অবধারিত ছিলো যে, পৃথিবীতে তাঁদের ব্যাপক বংশ বিস্তার ঘটবে এবং তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সন্তানেরা সৃষ্টি করবে অনেক মত ও পথ। পার্থিব অর্জন নিয়েও তাদের মধ্যে উপস্থিত হবে অনেক বিতণ্ডা ও যুদ্ধ। কেউ হবে বিশ্বাসী, কেউ অবিশ্বাসী, কেউ অংশীবাদী, কেউ কপট। তাই হজরত আদম ও হজরত হাওয়ার মধ্যে কোনো শত্রুতা না থাকলেও তাঁদের ভবিষ্যত বংশধরদের দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে বলা হয়েছে— তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে একই সঙ্গে জান্নাত থেকে নেমে যাও।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ এলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখকষ্ট পাবে না।'

বাগবী লিখেছেন, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন পড়বে এবং কোরআনের নির্দেশানুযায়ী চলবে, আল্লাহ্ তাকে দুনিয়ায় গোমরাহী থেকে বাঁচিয়ে সোজা রাস্তায় পরিচালিত করবেন এবং কিয়ামতের দিন হিসাবের ভয়াবহতা থেকেও রক্ষা করবেন। কারণ আল্লাহ্ স্বয়ং এরশাদ করেছেন— 'যে আমার পথ অনুসরণ

করবে, সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখকষ্ট পাবে না।' শা'বীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোরআনের বিধান অনুসারীকে আল্লাহ্ পৃথিবীর পথভ্রষ্টতা থেকে এবং পরবর্তী পৃথিবীর হতভাগ্যতা থেকে নিরাপদ রাখবেন। এরপর হজরত ইবনে আব্বাস পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

এর পরের আয়াতে (১২৪) বলা হয়েছে— 'যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবনের ভোগসম্ভার হবে সংকুচিত।' এখানে 'আমার স্মরণে বিমুখ' কথাটির অর্থ যে আমার ওই সকল বিধানাবলী থেকে বিমুখ, যা আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, বিমুখ ওই আহ্বানকারী থেকে, যে আমার স্মরণের দিকে আহ্বান করে। 'দ্বান্‌কান' অর্থ সংকুচিত। 'মায়ী'শাতান দ্বান্‌কান' অর্থ জীবনের ভোগসম্ভার হবে সংকুচিত। অর্থাৎ জীবন হয়ে পড়বে দুর্বিষহ, দুরূহ ও সংকটাকীর্ণ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, 'মায়ী'শাতান দ্বান্‌কান' অর্থ কবরের আযাব। উত্তমসূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বায্‌যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'মায়ী'শাতান দ্বান্‌কান' হচ্ছে কবরের আযাব। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, মাটি কবরস্থ ব্যক্তিকে এমনভাবে চাপ দিবে যে, তার পাঁজরের এক পাশের হাড় অপর পাশে ঢুকে পড়বে। কোনো কোনো হাদিসগ্রন্থে সুপরিণতসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কোনো কোনো কবরবাসীর কবর এতো সংকীর্ণ হয়ে পড়বে যে, তাদের দুই পাঁজরের হাড় পরস্পরকে ভেদ করে যাবে। পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত এভাবেই শাস্তি দেয়া হবে তাদেরকে। তিবরানী তাঁর সুনান গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এরকম বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

হাসান বলেছেন 'মায়ী'শাতান দ্বানকান' কথাটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে দোজখের যাক্কুম, 'দরি' এবং 'গেসলিন'। ইকরামা বলেছেন, কথাটির অর্থ হারাম রিজিক। জুহাক বলেছেন, অবৈধ উপার্জন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মন্দ স্বভাব। আমি বলি, উপরে বর্ণিত সকল অর্থই 'মায়ী'শাতান দ্বান্‌কান' কথাটির উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যার কারণে দোজখ অবধারিত হয় তা-ই হচ্ছে 'মায়ী'শাতান দ্বান্‌কান'। এক আয়াতে এসেছে— 'এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় কোনো সংকীর্ণ অবস্থানে নিক্ষেপ করা হবে' (সুরা ফুরক্বান)।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বান্দাকে যে সম্পদই দেয়া হোক না কেনো, সে যদি তা আয় ও ব্যয়ের ব্যাপারে তাক্বওয়া অবলম্বন না করে, তবে তা হয়ে পড়ে কল্যাণহীন। ওই কল্যাণহীনতাকেই বলে 'মায়ী'শাতান দ্বান্‌কান'। তাদের মধ্যে যারা কৃপণ তারা ধারণা করে সম্পদ একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন,

কথাটির অর্থ— আমি তার কাছ থেকে পরিতৃপ্তি ছিনিয়ে নেই। তাই সে কোনোক্রমেই পরিতুষ্ট হতে পারে না। এ দু'টো উক্তির মূল কথা হচ্ছে— যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, সে হয়ে পড়ে স্বেচ্ছাচারী। পার্থিব সম্পদ আহরণ করাই হয় তার মূল লক্ষ্য। সম্পদবৃদ্ধির চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে সে এবং সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারে হয়ে পড়ে ভীতসন্ত্রস্ত। বিশ্বাসীগণের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের সার্বক্ষণিক মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে আখেরাতের প্রতি। তাই আল্লাহ্ তাকে যা কিছু দান করুন না কেনো, তাতেই সে হয় পরিতুষ্ট ও কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসাই হয় তার জীবনাদর্শ। তাই তার জীবন যাত্রা হয় স্বচ্ছন্দ ও পবিত্র।

আমি বলি, কেবল অবিশ্বাসীই যে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখ হয় তা নয়। পৃথিবীর প্রতি আকৃষ্ট সাধারণ বিশ্বাসীরাও হয় আল্লাহ্‌র স্মরণের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত। তাই অবিশ্বাসীদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র স্মরণ বিমুখ বিশ্বাসীরাও আলোচ্য আয়াতের 'যে আমার স্মরণবিমুখ' কথাটির অন্তর্ভুক্ত। সেকারণেই মুসলমান— অমুসলমান নির্বিশেষে পৃথিবীপূজকেরা সম্পদ ঘাটতির আশংকায় সদাশংকিত থাকে। পার্থিব ধনসম্পদকেই তারা তাদের জীবনের উদ্দেশ্যরূপে নির্ধারণ করে। এরকম লোকেরই জীবনযাত্রা হয় অস্বস্তিকর ও সংকুচিত। আর 'মায়ী'শাতান দ্বান্‌কান' কথাটির অর্থ যদি করা হয় পার্থিব সংকট, তাহলে এর মধ্যে কাফের ও ফাসেকদের কোনো প্রবেশাধিকারই থাকবে না। কারণ পৃথিবীতে নবী, ওলী ও পুণ্যবানেরাই অন্যাপেক্ষা অধিক বিপদগ্রস্ত হন। রসুল স. বলেছেন, সবচেয়ে কঠিন বিপদ ও পরীক্ষায় আক্রান্ত হন নবী রসুলগণ। তারপরে তারা, যারা অন্যাপেক্ষা উত্তম। তারপর তারা যারা অন্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ধর্মনিষ্ঠতার তারতম্যানুসারে একে অন্যের চেয়ে অধিক বিপদে পতিত হয়। তাই যে যত ধর্মপ্রাণ, তার বিপদ তত বেশী। আহমদ, বোখারী, তিরমিজি ও ইবনে মাজা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত সা'দ থেকে এবং তিবরানী হজরত হুযায়ফা থেকে।

ইমাম বোখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে জননী আয়েশা থেকে উত্তমসূত্রে বর্ণিত একটি হাদিসে উল্লেখ করেছেন, পৃথিবীতে কঠোর বিপদের সম্মুখীন হন নবী রসুলগণ এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজনগণ।

আমি বলি, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দু'ভাবে দেয়া যেতে পারে— ১. এখানে যে জীবনযাত্রা সংকুচিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ— পার্থিব সম্পদের স্বল্পতা। আর এরকম অবস্থা কেবল অবিশ্বাসীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। যেমন এক আয়াতে এসেছে— 'যে কুফরী করবে, তাকেও আমি কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিবো; তারপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য

করবো।' (সুরা বাকারা)। সুতরাং কথাটির অর্থ হবে— যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ তাকে আমি পৃথিবীতে সামান্যই জীবিকা দান করবো। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর বিপুল সম্পদও অতি সামান্য। কারণ তা অস্থায়ী ও অবক্ষয়প্রবণ। ২. বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেরই পার্থিব জীবন দুঃখময়। অর্থাৎ প্রকৃত সুখ থেকে এখানে উভয় দলই বঞ্চিত। এক আয়াতে এসেছে— 'হে মানুষ! তুমি তোমার প্রভুপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যে কঠোর সাধনা করে থাকো.........'(সুরা ইনসিকাক)। উল্লেখ্য যে, বিপদাপদের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের পাপক্ষয় হয় এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই মর্যাদার কথাই ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসে এসেছে। এই বিপদ পৃথিবীতে সাধারণতঃ প্রকাশিত হয় জীবিকার সংকটের আকারে। বিশ্বাসীরা এমতো সংকটগ্রস্ত হলে লাভ করতে পারেন আল্লাহ্‌র প্রতি অধিকতর আকর্ষণ ও বক্ষাভ্যন্তরের প্রশস্ততা। কিন্তু অবিশ্বাসীদের এমতো সংকট পরকালের শাস্তির একটি দূরবর্তী নিদর্শন ছাড়া অন্য কিছু নয়। কারণ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা কোনোটাই তাদের নেই। তাই তাদের বিপদাপদ আস্বাদ্য নয়, তিক্ত।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইবনে মাজা, আবদুর রাজ্জাক ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সবচেয়ে বেশী বিপদগ্রস্ত হন আম্বিয়াগণ। তারপর অন্যান্য পুণ্যবানগণ। তাঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ এমন দারিদ্রে নিপতিত হন যে, পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া তাঁদের আর কিছুই থাকে না। সেই পরিধেয় বস্ত্রও আবার হয় উকুনে উকুনে ভরা। কিন্তু এতো বিপদগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা এতো আনন্দিত থাকেন যে, সম্পদ পেলেও তাঁরা সেরকম আনন্দ পান না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো অন্ধ অবস্থায়।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'আ'মা' অর্থ দৃষ্টির অন্ধত্ব। মুজাহিদ বলেছেন, প্রমাণগত অন্ধত্ব। অর্থাৎ সেদিন তার স্বপক্ষে থাকবে না কোনো প্রমাণ। অবশ্য পরবর্তী আয়াতে হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতটিই স্বীকৃতি পেয়েছে।

এর পরের আয়াতে (১২৫)বলা হয়েছে— 'সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেনো আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।' এখানকার 'আ'মা' কথাটিকে যদি দৃষ্টির অন্ধত্ব ধরা হয়, তবে 'আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান' কথাটির অর্থ হবে— আমি তো পৃথিবীতে ছিলাম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। সেখানে আমার স্বপক্ষে অংশীবাদিতার প্রমাণও ছিলো। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে পৃথিবীতেও তাদের অংশীবাদিতার কোনো প্রমাণ নেই। যেমন এক আয়াতে বলা

হয়েছে— 'যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে আহ্বান করে, যে বিষয়ে তাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যার কাছে শিরিকের কোনো দলিল দুনিয়াতেই নেই, সে অন্ধ, তার কাছে আখেরাতেও কোনো দলিল থাকবে না, সেখানেও তারা হবে অন্ধ।' সুতরাং এ কথাটি সুপ্রমাণিত যে, হজরত ইবনে আব্বাসকৃত অর্থটিই সঠিক। অর্থাৎ এখানকার 'অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে' কথাটির অর্থ হবে— আমাকে উত্থিত করলো চোখের দৃষ্টিবিবর্জিত অবস্থায়।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলো, এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'সেদিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করবো' (আয়াত ১০২) । আবার অন্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করবো তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ করে' (সুরা বানী ইসরাইল)। এই আয়াত দু'টোর অর্থ কি? হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, কিয়ামতের দিন তারা এক অবস্থায় হবে নীল বা কটা চক্ষুবিশিষ্ট এবং অন্য অবস্থায় হবে দৃষ্টিশক্তিবিবর্জিত।

এর পরের আয়াতে (১২৬) বলা হয়েছে— 'তিনি বলবেন, তুমি এইরূপই ছিলে; আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিলো, কিন্তু তুমি তা বর্জন করেছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে বর্জন করা হলো'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ বলবেন, পৃথিবীতেও তুমি এরকম অন্ধই ছিলে। আমার সতত পরিদৃশ্যমান নিদর্শনাবলী, অথবা প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি অবতীর্ণ মোজেজাসমূহ তোমার কাছে এসেছিলো। কিন্তু তুমি তা দেখেও দেখোনি। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলে অন্য দিকে। অন্ধ যেমন দ্রষ্টব্য বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে, তেমনি তুমি বর্জন করেছিলে আমার নিদর্শনাবলীকে। তাই তোমাকেও এখন দোজখে নিক্ষেপ করে বর্জন করা হবে।

এর পরের আয়াতে (১২৭) বলা হয়েছে— 'এবং এভাবেই আমি প্রতিফল দেই তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালের শাস্তিতো অবশ্যই কঠোরতর, অধিক স্থায়ী'। এখানে 'আস্‌রফা' অর্থ সীমাতিক্রম, স্বেচ্ছাচরণ, বৈমুখ্য। 'লাম ইউমিনু বিআয়াতি রব্বিহী' অর্থ প্রভুপালকের নিদর্শনে আস্থা রাখে না, মান্য করে না। আর 'আশাদ্দু ওয়া আব্‌ক্বা' অর্থ তাদের পরকালের শাস্তি হবে অবশ্যই অধিক কঠিন ও অধিক স্থায়ী।

শেষের আয়াতে (১২৮) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কতো মানবগোষ্ঠী, যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে, এটা কি তাদেরকে সৎপথ দেখালো না? অবশ্যই এতে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন।' এখানে 'কাম আহ্লাকনা' কথাটির 'কাম' হচ্ছে বিজ্ঞপ্তিপ্রদায়ক। এর মাধ্যমে এই সংবাদটি প্রদান করা হয়েছে যে— ইতোপূর্বে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি অনেক মানবগোষ্ঠীকে। আর 'এটা কি তাদেরকে সৎপথ দেখালো না' কথাটির উদ্দেশ্য এখানে হতে পারে দু'রকম— ১. এই কোরআন যারা শুনছে, সেই মক্কার অংশীবাদীরাও কি বিনাশপ্রাপ্ত ওই মানবগোষ্ঠীর ঘটনা থেকে হেদায়েত লাভ করতে পারলো না? অথচ ওই বিনাশপ্রাপ্তদের স্থলাভিষিক্ত এখন তারা। ২. ওই মানবগোষ্ঠী তাদের আপনাপন জনপদে নির্বিঘ্নে বিচরণ করতো, হঠাৎ ওই অবস্থায় আমি তাদেরকে ধ্বংস করে ফেললাম, হেদায়েত লাভের সুযোগ আর তারা পেলো না।

সূরা ত্বাহা : আয়াত ১২৯, ১৩০

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۝ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

❒ তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকিলে ও এক কাল নির্ধারিত না হইলে অবশ্যম্ভাবী হইত আশু শাস্তি।

❒ সুতরাং, উহারা যাহা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও দিবাভাগে যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আমার পূর্ব নির্ধারণ এই যে, আমি আপনার উম্মতের অবাধ্যদেরকে এই পৃথিবীতে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি প্রদান করবো না, তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিবো না তাদের পূর্বসূরীদের মতো। কারণ, আপনি বিশ্বসমূহের জন্য আমার পক্ষ থেকে রহমত। আপনার সম্মানের কারণে আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত এটাই। যদি আমার এরকম সিদ্ধান্ত না থাকতো, তবে অবশ্যই আমি আপনার শত্রুদেরকে এখানে সমূলে উৎপাটন করতাম। তবে আখেরাতে তাদের শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত।

এর পরের আয়াতে (১৩০) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তারা যা বলে, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো রাত্রিকালে ও দিবাভাগে, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো।'

'ফাসবির্' অর্থ ধৈর্যধারণ করো। অর্থাৎ হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীরা আপনাকে কথায় ও আচরণে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়। আপনি ওই কষ্টে ধৈর্যধারণ করুন, 'ওয়া সাব্বিহ্' অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা করুন। অর্থাৎ নামাজ প্রতিষ্ঠা করুন। 'বিহামদি রব্বিকা।' অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আল্লাহ্র মহিমা বর্ণনা করুন যিনি আপনাকে নামাজ ও তসবিহ্ পাঠের সুযোগ ও যোগ্যতা দান করেছেন। একথার মধ্যে এই ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে যে, ইবাদত করতে পারলে বান্দা যেনো আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা ভুলে না যায়। কারণ ইবাদতের তৌফিক দিয়েছেন তিনিই। আর তাঁর সাহায্যেই সুসম্পন্ন হয়েছে ইবাদত। সুরা ফাতিহায়ও এরকম বলা হয়েছে। যেমন 'আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।' আর এখানে 'সাব্বিহ্' (পবিত্রতা বর্ণনা করো) কথাটির পরেই এসেছে 'বিহামদি রব্বিকা' (মহিমা ঘোষণা করো তোমার প্রভুপালকের)। এতে করে প্রমাণিত হয়, নামাজের মধ্যে সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। রসুল স. বলেছেন, সুরা ফাতিহা ব্যতীত নামাজ হয় না। বোখারী, মুসলিম, আহমদ। আর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে নামাজের মধ্যে সুরা ফাতিহা পড়েনি, তার নামাজ হয়নি। পবিত্রতা ঘোষণা করা এবং প্রশংসা বর্ণনা করার কথা এখানে বলা হয়েছে সংক্ষেপে। কিন্তু রসুল স. এর পবিত্র বাণী এই সংক্ষিপ্ততাকে বিস্তৃত করে দিয়েছে। এভাবে এই মর্মার্থটি দাঁড়িয়েছে যে, এখানে পবিত্রতা বর্ণনা করার অর্থ সুরা ফাতিহা পাঠ করা।

'সূর্যোদয়ের পূর্বে' কথাটির অর্থ এখানে ফজরের নামাজ। আর 'সূর্যাস্তের পূর্বে' কথাটির অর্থ আসরের নামাজ। কেউ কেউ বলেছেন, 'সূর্যাস্তের পূর্বে' কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে বিগত দিনের দুই ওয়াক্তের নামাজ জোহর ও আসরকে।

'ওয়া মিন আনাইল্ লাইলি' কথাটির অর্থ মাগরিব ও ইশার নামাজ। 'আনাআ' শব্দটির অর্থ সময়। শব্দটি 'ইন্না' শব্দের বহুবচন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'রাত্রিকালে' কথাটির অর্থ রাতের প্রথমাংশে। আমি বলি, এর দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাজও উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব। কেননা এখানে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে সরাসরি এবং তাহাজ্জুদ ছিলো তাঁর উপরে ওয়াজিব।

'ওয়া আত্বরাফান্ নাহার' অর্থ দিবাভাগে। কথাটির সম্পর্ক রয়েছে, 'সূর্যাস্তের পূর্বে' কথাটির সঙ্গে। এভাবে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে ফজর ও আসরের নামাজের। অধিক গুরুত্ব প্রদান করাই এমতো পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, ফজর ও আসর অতিরিক্ত গুরুত্ব পাওয়ার উপযোগী। ঘুম ভেঙে ফজরের নামাজ আদায় করা কষ্টকর এবং আসরের নামাজের সময় মানুষ লিপ্ত থাকে পার্থিব

কাজে। তাই এভাবে এখানে এই দুই ওয়াক্ত নামাজের প্রতি অধিক তাগিদ দেয়া হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তোমরা নামাজের হেফাজত করো, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের।' এখানে মধ্যবর্তী নামাজ বলে আসরের নামাজকে বুঝানো হয়েছে, যদিও 'নামাজের হেফাজত করো' কথাটির মধ্যে আসরের নামাজও অন্তর্ভুক্ত।

এরকমও হতে পারে যে, 'দিবাভাগে' বলে এখানে বোঝানো হয়েছে জোহরের নামাজের কথা আর 'রাত্রিকালে' বলে বুঝানো হয়েছে এশার নামাজকে। কেননা জোহরের সময় হয় দিবসের দ্বিতীয় ভাগে, দিবসের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'দিবাভাগে' বলে বুঝানো হয়েছে জোহর ও মাগরিবকে। কারণ দিবসের দ্বিতীয় ভাগের শুরুতেই হয় জোহরের নামাজের সময়। এদিক থেকে জোহরকে বলা যেতে পারে দিবসের দুই অংশের মিলনস্থল। আর মাগরিবের নামাজের সময় হয় দিবাবসানের পর। অথবা 'দিবাভাগের' কথাটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে দিনের বিভিন্ন অংশকে এবং 'পবিত্রতা বর্ণনা করো' কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে নফল নামাজকে।

'লায়াল্লাকা তারদ্বা' অর্থ উল্লেখিত সময়ে নামাজ পাঠ করো, তাহলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পুণ্য অর্জন করতে পারবে এবং তাতে করে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হবে— যেনো তোমাদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করে নেন। কেউ কেউ বলেছেন, 'সন্তুষ্ট হতে পারো' কথাটির অর্থ এখানে— যেনো লাভ করতে পারো শাফায়াতের অধিকার, যা হবে তোমার প্রসন্নতার কারণ। অর্থাৎ আশা করা যায় যে, তুমি শাফায়াতের অধিকার পেয়ে খুশী হয়ে যাবে। এই খুশী হওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে অপর এক আয়াতে এভাবে— 'অচিরেই তোমার প্রভুপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে'। (সুরা দ্বোহা)। বোখারী, মুসলিম, সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, হজরত জারীর বিন আবদিল্লাহ্ বলেছেন, আমরা একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। আকাশে ছিলো চতুর্দশীর চাঁদ। সেদিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি স. বললেন, যেভাবে তোমরা চাঁদ দেখছো সেভাবেই তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের প্রভুপালনকর্তাকে। এখন যেমন কোনো আড়াল নেই, তখনো তেমনি কোনো আড়াল থাকবে না। সুতরাং তোমাদের সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাজ যেনো কখনো বাদ না পড়ে। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন— 'এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রভুপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।'

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মারদুবিয়া, বায্যার এবং আবু ইয়া'লীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু রাফে' বলেছেন, একবার রসুল স. এর নিকটে একজন মেহমান উপস্থিত হলো। তিনি স. আমাকে এক ইহুদীর কাছে বাকীতে আটা ক্রয় করার জন্য পাঠালেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে— এতো এতো পরিমাণ আটা।

অথবা তিনি স. তখন আমাকে বলতে বলেছিলেন, আমাকে রজবের চন্দ্রোদয়ের সময় পর্যন্ত আটা ধার দাও। আমি ওই ইহুদীর কাছে গিয়ে একথাই বললাম। ইহুদী বললো, আমি কোনো কিছু বন্ধক না রেখে আটা দিতে পারবো না। আমি ফিরে এসে রসুল স.কে সব কথা জানালাম। তিনি স. বললেন, সে আমার হাত ক্রয় করে ফেলতো, অথবা বললেন, সে যদি বাকীতে বিক্রি করতো, তবে আমি তো অবশ্যই তার মূল্য পরিশোধ করতাম। আমি আকাশ ও পৃথিবী উভয় স্থানে 'আমীন' (বিশ্বস্ত) বলে প্রসিদ্ধ। যাও, আমার লৌহবর্মটি নিয়ে পুনরায় তার কাছে যাও। আমি সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে না হতেই অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫

❐ আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের কতককে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়াছি তাহার প্রতি তুমি কখনও লক্ষ্য করিও না। তোমার প্রতিপালক-প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।

❐ এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও উহাতে অবিচলিত থাক; আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাহি না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং শুভ পরিণাম তো সাবধানীদিগের জন্য।

❐ উহারা বলে, 'সে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে আমাদিগের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন?' উহাদিগের নিকট কি আসে নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ যাহা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে?

❐ যদি আমি উহাদিগকে ইতিপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করিতাম তবে উহারা বলিত, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করিলে না কেন? করিলে, আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবার পূর্বে তোমার নিদর্শন মানিয়া চলিতাম।

❐ বল, 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করিতেছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অতঃপর তোমরা জানিতে পারিবে কাহারা রহিয়াছে সরল পথে এবং কাহারা সৎপথ অবলম্বন করিয়াছে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কতককে তাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনো লক্ষ্য কোরো না। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।'

এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে কাউকে কাউকে দিয়েছি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকারের ভোগবিলাসের উপকরণ। ওই সকল উপকরণের দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করাই আমার উদ্দেশ্য। সুতরাং আপনিতো তাদের ওই সকল অবক্ষয়প্রবণ ধনসম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হবেনই না, আপনার অনুসারীরাও যেনো আকৃষ্ট না হয়। যেনো এরকম মনে না করে যে, আমরাও যদি এগুলো পেতাম। আপনাকে আমি দান করেছি নবুয়ত, হেদায়েত, হালাল রিজিক, জান্নাত ও আমার নৈকট্য। আপনার একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে আমি নবুয়ত ছাড়া অন্য নেয়ামতগুলো দান করবো। এগুলোই আপনার ও আপনার অনুসারীদের জন্য আমার পক্ষ থেকে প্রদত্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ। এগুলোই চিরস্থায়ী।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, আল্লাহ্‌প্রদত্ত জীবনোপকরণ দ্বারা যদি কারো হৃদয় প্রশান্ত না হয়, তবে তাকে পৃথিবীতে ফেলতে হয় দীর্ঘশ্বাস। আর যে অন্যের বিত্ত-বৈভবের প্রতি লালসাপরায়ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, মনে করে এগুলোই আসল প্রাপ্তি (ইমান, হেদায়েত, সওয়াব, জান্নাত কিছু নয়), তার সকল সৎকর্ম বিনষ্ট হয়। তার জন্য আখেরাতে রয়েছে অশেষ আযাব।

পরের আয়াতে (১৩২) বলা হয়েছে— 'এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও তাতে অবিচলিত থাকো; আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং শুভ পরিণাম তো সাবধানীদের জন্য'। একথার অর্থ— এবং হে আমার রসুল! আপনার পরিবারবর্গ ও আপনাকে যারা সত্য নবী বলে মান্য করে, তাদেরকে সম্পদের লোভ পরিহার করে নামাজ প্রতিষ্ঠার আদেশ দিন এবং এই আদর্শের উপরে

সকলকে অটল থাকতে বলুন। আমি চাই না যে, আপনি নিজে নিজে আপনার ও অন্যদের জীবনোপকরণ সৃষ্টি করুন। এ দায়িত্ব আপনার কিংবা অন্য কারো নয়। সকলকে রিজিক দিয়ে থাকি আমিই। সুতরাং রিজিকের জন্য অযথা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে সকলের উচিত নামাজ প্রতিষ্ঠায় নিমগ্ন হওয়া এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে সকল অন্যায় থেকে সাবধান হয়ে যাওয়া। এরকম সাবধানতা (তাক্বওয়া) অবলম্বন যারা করে, তাদের জন্যই অপেক্ষমান শুভপরিণাম।

'ওয়াল আক্বিবাতু লিত্ তাক্বওয়া' অর্থ 'শুভ পরিণাম তো সাবধানীদের জন্য'। পুণ্য কর্মের পরিণাম শুভ এবং পাপের পরিণাম অশুভ। অশুভ পরিণাম বুঝাতে ব্যবহৃত হয় 'ইক্বাব' শব্দটি। 'ইক্বাব' বলা হয় ওই আযাবকে, যা আসে মন্দ কর্ম সম্পাদনের পর। হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! যারা আপনাকে জানে, মানে, আপনার প্রদর্শিত পথে চলে এবং আমাকে ভয় করে তাদের পরিণতি শুভ।

সাঈদ ইবনে মনসুর তাঁর সুনানে, তিবরানী তাঁর আল আওসাতে, আবু নাঈম তাঁর হুলিয়ায় এবং বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে বর্ণনা করেছেন, সংসারে দুঃখ কষ্ট দেখা দিলে রসুল স. তাঁর পরিবারবর্গকে নামাজ পাঠের নির্দেশ দিতেন এবং তেলাওয়াত করতেন আলোচ্য আয়াত।

এর পরের আয়াতে (১৩৩) বলা হয়েছে—'তারা বলে, সে তার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমাদের নিকট কোনো নিদর্শন আনয়ন করে না কেনো? তাদের নিকট কি আসেনি সুস্পষ্ট প্রমাণ যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে?' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, মোহাম্মদ তার নবুয়তের স্বপক্ষে কোনো মোজেজা প্রদর্শন করে না কেনো? আপনি তাদেরকে বলুন, এই তো সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেজা। এই তো অক্ষয় কোরআন। এই কোরআন কি তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়নি? এই কোরআন কি পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের প্রত্যয়নকারী এবং পূর্বের সকল মোজেজার স্বীকৃতি প্রদানকারী নয়?

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী নবী রসুলগণের মাধ্যমে জ্ঞানগত ও কর্মগত অনেক অলৌকিকত্ব প্রকাশিত হতো, ওই সময়ের মানুষ সেগুলোর মোকাবিলা করতে পারতো না। কিন্তু ওই সকল মোজেজার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ছিলো একটি বিশেষ কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোরআনের মোজেজা চিরকালীন। কারণ এর ভিত্তি হচ্ছে প্রজ্ঞা ও রহস্যময়তা, যা অনিঃশেষ। আরো উল্লেখ্য যে, প্রজ্ঞা বা এলেম হচ্ছে সকল আমলের (কর্মের) ভিত্তি। তাই প্রজ্ঞাগত মোজেজা নিশ্চয় কর্মগত মোজেজা অপেক্ষা উত্তম ও অধিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। সেকারণেই যে নবীর

মাধ্যমে প্রজ্ঞাগত মোজেজা প্রকশিত হয়, তিনি কর্মগত মোজেজাসম্পন্ন নবী অপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। কোরআন হচ্ছে অন্তহীন জ্ঞানের এক রহস্যময় ভাণ্ডার। আলোচ্য আয়াতে এই অমূল্য তত্ত্ব ও তথ্যটির প্রতিই সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

'তাদের নিকট কি আসেনি সুস্পষ্ট প্রমাণ যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে?' এই প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। প্রশ্নাকারে উত্থাপিত বাক্যটির অর্থ— হে আমার রসুল! এখন পর্যন্ত অংশীবাদীরা আপনাকে চিনতে পারছেনা কেনো? আপনি অক্ষরের অমুখাপেক্ষী। পৃথিবীর কোনো ভাষার লিখিত অক্ষরের সঙ্গে আপনাকে সম্পৃক্ত করা হয়নি, পৃথিবীর সকল শিক্ষক থেকে আপনাকে রাখা হয়েছে মুক্ত ও পবিত্র। এতদসত্ত্বেও আপনার রসনায় উচ্চারিত হয়ে চলেছে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানভাণ্ডার আল কোরআনের আয়াতসমূহ। এটা কি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অলৌকিকত্ব নয়? এই অনন্য অলৌকিকতা যাঁর মাধ্যমে বিস্তৃত ও বিকশিত হয়ে চলেছে, তিনি কি অতি অবশ্যই আল্লাহ্‌র সত্য বচনবাহক নন? কোন যুক্তিতে, সাহসে ও ধৃষ্টতায় এখনো তারা আঁকড়ে ধরে রয়েছে অবিশ্বাসকে, অসত্যকে?

উল্লেখ্য, আলোচ্য বক্তব্যটির মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, কোরআন হচ্ছে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সম্মিলনকারী ও প্রত্যয়নকারী। পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের এই বৈশিষ্ট্যটি নেই। তাই সেগুলো ছিলো সাক্ষ্যনির্ভর। কিন্তু কোরআন স্বতঃসিদ্ধ ও স্বপ্রমাণিত। কারণ এই মহান গ্রন্থ রচনায় মানবরচিত বিদ্যার কোনোই প্রবেশাধিকার নেই। তাই এই কোরআনই হচ্ছে রসুল স. এর নবুয়তের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আর এভাবে একথাটিও সুপ্রমাণিত যে, তিনি স. ছিলেন অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মী)।

আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাটিও বলা হয়ে থাকতে পারে যে, বিগত যুগের উম্মতেরা তাদের নবীগণের নিকটে বিভিন্ন রকম মোজেজা দেখতে চেয়েছিলো। তাদেরকে তাদের কাংখিত মোজেজা দেখানো হয়েছিলোও। কিন্তু তারা সে সকল মোজেজার সম্মান রক্ষা করেনি। ইমান আনেনি। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এই বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে— মক্কার মুশরিকেরা কোরআনে বর্ণিত ওই সকল কাহিনীর মূল শিক্ষাকে মান্য করতে চায়না কেনো? তাদের কাংখিত মোজেজা প্রকাশিত হওয়ার পর ওজর আপত্তি ও অবকাশের সুযোগ তো আর থাকতে পারে না। একথা জেনেও তারা বার বার মোজেজা মোজেজা করে কেনো?

এর পরের আয়াতে(১৩৪) বলা হয়েছে— 'যদি আমি তাদেরকে ইতোপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তবে তারা বলতো, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট একজন রসুল প্রেরণ করলে না কেনো? করলে, আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার পূর্বে তোমার নিদর্শন মেনে চলতাম।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি যদি আপনাকে মক্কায় প্রেরণ করার আগেই অংশীবাদিতার কারণে আপনার সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দান করতাম, তবে

মহাবিচারের দিবসে তারা বলতো, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তোমার কোনো সতর্ককারী রসুল প্রেরণের আগেই আমাদেরকে এভাবে শাস্তি দিলে কেনো? রসুল প্রেরণ করলে আমরা তো তাঁকে অবশ্যই মান্য করতাম। তাহলে পৃথিবীর শাস্তি ও আজকের এই আখেরাতে অসহনীয় শাস্তি আমরা পেতাম না।

সর্বশেষ আয়াতে (১৩৫) বলা হয়েছে— 'বলো' প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা করো। অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কারা রয়েছে সরল পথে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে?' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনাকে প্রত্যাখ্যানকারী জনতাকে আপনি জানিয়ে দিন, সত্যকে যখন তোমরা স্বীকার করতেই চাও না, তখন পরিণামের প্রতীক্ষায় থাকো। এমতো প্রতীক্ষা করতে হবে তোমাদের সকলকেই। তারপর এক সময় তোমরাও বুঝতে পারবে সরল পথ ও সৎপথ অবলম্বনকারী ছিলো কারা? কিন্তু তখন তোমাদের তো প্রত্যাবর্তনের পথ আর খোলা থাকবে না।

অংশীবাদীরা বলতো, আমরা প্রতীক্ষায় আছি। এক সময় মোহাম্মদও তো হারিয়ে যাবে কালক্রমে। তখন মানুষ আবার আমাদেরকেই অনুসরণ করতে শুরু করবে। তাদের ওই কথিত প্রতীক্ষার সূত্র ধরেই আলোচ্য আয়াতে এসেছে এমতো বক্তব্য। এখানে 'অতঃপর তোমরা জানতে পারবে' কথাটির অর্থ শেষে তোমরা সত্যোপলব্ধি করতে পারবে মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানকালে।'সরল পথ' অর্থ যে পথ চলে গিয়েছে জান্নাতের দিকে। 'সৎপথ' অর্থ যে পথ সকল ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত। এভাবে 'সরল পথ' ও 'সৎপথ' কথা দু'টোর মিলিত অর্থ দাঁড়ায়— চিরস্থায়ী শান্তির পথ।

হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে এবং বায়হাকী বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে এবং বাগবী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে সুরা বাকারার প্রথমাংশ, ত্বহা, ত্ব সিন মিম সম্বলিত সুরা সমূহ, হা মিম সম্বলিত সুরা সমূহ নবী মুসার তওরাত থেকে দান করা হয়েছে এবং সুরা ফাতিহা ও সুরা বাকারার শেষাংশ বিশেষভাবে দান করা হয়েছে আরশের নিম্নদেশ থেকে। আর অতিরিক্ত হিসেবে দান করা হয়েছে সুরা মুফাস্সিলাত। হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে এবং তিবরানী ও ইবনে মাজা হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র ইসমে আজম ধরে প্রার্থনা জানালে আল্লাহ্ তা কবুল করে নেন। আর ওই ইসমে আজম রয়েছে তিনটি সুরায়— সুরা বাকারায়, সুরা আলে ইমরানে এবং সুরা ত্বহা'য়।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। তাঁরই বিশেষ অনুগ্রহে সুরা ত্বহা'র তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ ৮ই রবিউস্সানি, ১২০৩ হিজরী সনে। ফালহামদু কুবলা লাহু ওয়াল হামদু বা'দালাহু।

সপ্তদশ পারা

আমি তোমারই প্রশংসা করি হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তা! তুমি ছাড়া উপাস্য কেউই নেই। আমি মান্য করি তোমার পবিত্রতাকে। আমি চাই তোমার সাহায্য ও ক্ষমা। আমি সাক্ষ্য দেই, তুমিই সকল সাম্রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর। তুমি যাকে চাও, তাকেই দান করো কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও রাজত্ব। আবার যাকে চাও, ছিনিয়ে নাও তার এমতো অধিকার। যাকে ইচ্ছা, তাকে সম্মানিত করো তুমি, আবার যাকে ইচ্ছা করো অপদস্থ। তোমার অধিকারেই রয়েছে সকল কল্যাণ। সকল কিছুর উপরে তোমার অপার ক্ষমতা সতত বিদ্যমান। তুমি আমার, আকাশ-পৃথিবীর এবং সমগ্র সৃষ্টির এক, অবিভাজ্য ও অংশীবিহীন মালিক।

আমি তোমার অফুরন্ত রহমত কামনা করি তোমার বচনবাহক ও প্রেমাস্পদ মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা স. এর প্রতি, যিনি আমাদের অধিনায়ক ও অভিভাবক। আরো রহমত কামনা করি সকল নবী রসুল ও সকল পুণ্যবানগণের প্রতি। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

সূরা আম্বিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরায় রয়েছে ৭টি রুকু এবং ১১২টি আয়াত। সুরা আম্বিয়া অবতীর্ণ হয়েছে সুরা ইব্রাহীমের পরে।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ○ مَا يَأْتِيْهِمْ
مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ○ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ○ قٰلَ
رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۫ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ
بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَأْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ○

❐ মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু উহারা উদাসীনতায় মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।

❒ যখনই উহাদিগের নিকট উহাদিগের প্রতিপালকের কোন নূতন উপদেশ আসে উহারা উহা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে,

❒ উহাদিগের অন্তর থাকে অমনোযোগী। সীমালংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে 'এতো তোমাদিগেরই মত একজন মানুষ, তবুও কি তোমরা দেখিয়া শুনিয়া যাদুর কবলে পড়িবে?'

❒ রসূল বলিল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

❒ উহারা ইহাও বলে 'এই সমস্ত অলীক কল্পনা। হয় সে ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব সে আনয়ন করুক আমাদিগের নিকট এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হইয়াছিল পূর্ববর্তীগণ।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন।' এখানে 'মানুষের' অর্থ সকল মানুষের। অথবা সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর। প্রথমোক্ত অর্থ হবে 'লিন্নাস' কথাটির 'লাম'কে আলিফ লাম জিনসী (জাতিবাচক লাম) ধরলে। আর 'লাম'কে আলিফ লাম আহদী (সীমিত) ধরলে গৃহীত হবে শেষোক্ত অর্থটি। পরের বাক্যের দিকে লক্ষ্য করলে অবশ্য শেষের অর্থটিকেই গ্রহণ করতে হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।' একথার অর্থ— কিন্তু অপরিণামদর্শী মানুষ পৃথিবীর ভোগ বিলাসে মগ্ন হয়ে গিয়েছে। ফলে তারা পরিণাম দিবসের প্রতি হয়ে পড়েছে উদাসীন ও বিমুখ।

এখানে 'উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে 'কথাটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আখেরাতের হিসাব নিকাশ সম্পর্কে উদাসীন থাকার কারণেই মানুষ সংলিপ্ত হয়ে পড়ে পার্থিবতায়। অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌র স্মরণে লিপ্ত নয়, পরকালের কথা তার স্মৃতিপটে উদিত হয় না। আর যদি এখানকার 'আন্নাস' (মানুষ) শব্দটি নিপাতনী 'লাম' এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে এখানকার 'তারা' (হুম) সর্বনামটিকে কোনো কোনো মানুষের অর্থাৎ কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করতে হবে। এরকম বাকরীতি অসঙ্গত নয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ওয়াল মুতাল্লাক্বাতু ইয়াতারাব্বাস্না বি আনফুসিহিন্না ছালাছাতা কুরূইন ওয়া বুয়ুলাতুহুন্না আহাক্কু বি রদ্দিহিন্না। এখানে 'আল মুতাল্লাক্বাতু' শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত । কিন্তু এখানকার 'বুয়ুলাতিহিন্না' এর 'হিন্না' সর্বনামটি 'মুতাল্লাক্বাতু' কথাটির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তার সঙ্গে যুক্ত, যার তালাকে রজয়ী হয়েছে।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোনো নতুন উপদেশ আসে, তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে।'

এখানে 'মিন জিকরিন' (নতুন উপদেশ) কথাটির 'মিন' অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। যে উপদেশ মানুষকে উদাসীনতা থেকে সচকিত করে দেয়, তাকেই বলে 'জিকির'। 'মুহ্দাছিন' অর্থ সদ্য অবতীর্ণ বা নতুন করে অবতীর্ণ। এর মানে আবার এই নয় যে, আল্লাহ্‌র কালাম নতুন। এরকম হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। তাঁর বাণী অনাদি, অনন্ত, অধ্বংসী ও চিরন্তন। সুতরাং তা নতুনত্বের কলংক থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। সেই চিরন্তন কালাম থেকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে নতুন নতুন নির্দেশ জারী করা হয়। এরকম নতুন করে জারী করা উপদেশকেই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে 'মুহ্দাছিন' কথাটির মাধ্যমে। সুতরাং মোতাজিলাদের মতবাদ অতি অবশ্য পরিত্যাজ্য। কারণ তারা আল্লাহ্‌র বাণীকে ক্বদীম বা চিরন্তন বলে স্বীকার করতে চায় না।

'ওয়াহুম ইয়ালআ'বুন' অর্থ— ওই সদ্য অবতীর্ণ উপদেশকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে, নিতান্ত গুরুত্বহীনভাবে। তাই তারা কোরআনকে নিয়ে উপহাস করার ধৃষ্টতাও দেখায়।

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী।' একথার অর্থ— কোরআনের নির্দেশনার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণের ব্যাপারে তাদের অন্তর থাকে উদাসীন। আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতির চিন্তা তাদের হৃদয়ে জাগ্রত হয় না। আবু বকর ওয়ার্‌রাক বলেছেন, কথাটির অর্থ— তাদের অন্তর থাকে পার্থিব ভোগবিলাসের আনন্দে মত্ত, তাই সেখানে আখেরাতের চিন্তা উদিত হয় না।

এরপর বলা হয়েছে— 'সীমালংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে।' গোপন কথা গোপনেই বলা হয়। ওই গোপনীয়তাকে বোঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'নাজ্‌ওয়া' শব্দটি। কিন্তু কথা হচ্ছে এর পূর্বে আবার 'আসাররু'(গোপনে) শব্দটি বসানো হলো কেনো? এমতো প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে— শব্দটির মাধ্যমে গোপনীয়তার সঙ্গে অধিক সতর্কতা অবলম্বনের কথাও হয়তো এখানে বলা হয়েছে। অথবা বোঝানো হয়েছে, তাদের কথা ও বাক্যালাপের স্থান দু'টোই ছিলো গোপনীয়।

'আসাররু ' শব্দটির 'ওয়াও' অক্ষরটি এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। অথবা এর সর্বনাম বহুবচনের এবং আল্লাজীনা তা থেকে প্রতিস্থাপিত অথবা এর পূর্বে উদ্দেশ্য হিসেবে 'হাউলায়ি' (তারা) কথাটি উহ্য রয়েছে। আর 'আল্লাজীনা জলামু' (সীমালংঘনকারীগণ) এর পূর্বে উদ্দেশ্যরূপে অনুক্ত রয়েছে 'হুম' (তারা)। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— ওই সকল সীমালংঘনকারীরা গোপন স্থানে অত্যন্ত সঙ্গোপনে পরামর্শ করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এ তো তোমাদেরই মতো মানুষ। তবুও কি তোমরা দেখেশুনে যাদুর কবলে পড়বে?' মক্কার অংশীবাদীরা মনে করতো, মানুষ কখনো মানুষের নবী হতে পারে না। যিনি নবী প্রেরণ করেন, নবীকে হতে হবে তাঁর সমগোত্রীয়। ফেরেশতাকে তারা মনে করতো আল্লাহ্‌র সমগোত্রীয়। তাই তারা বলতো, ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা। আর এরকম বিশ্বাস রাখতো যে, নবী হতে পারে কেবল ফেরেশতা, মানুষ নয়। কিন্তু ফেরেশতারা তো কখনোই আল্লাহ্‌র সমগোত্রীয় বা সমজাতীয় নয়। তারা আল্লাহ্‌র এক বিশেষ সৃষ্টি। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন তাদের ও অন্যান্য সৃষ্টির একক, অসমকক্ষ ও অংশীবিহীন স্রষ্টা। অপর দিকে ফেরেশতারা আবার মানুষের সমজাতীয় ও সমগোত্রীও নয়। এই দুই সৃষ্টির স্বভাববৈচিত্র পৃথক। মিলের চেয়ে অমিলই তাদের মধ্যে বেশী। তাই ফেরেশতাকে মানুষের নবী বানানো হলে মানুষ তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারতো না। উপকার প্রদান ও আহরণ সমজাতীয়দের মধ্যেই হওয়া সম্ভব। তাই আল্লাহ্ মানুষকেই নির্বাচিত করেছেন মানুষের নবী হিসেবে। কিন্তু মক্কার অংশীবাদীরা একথা বিশ্বাস করতে চাইতো না। তাই তারা একে অপরকে বলতো, মোহাম্মদ তো তোমাদের মতো মানুষ। তাকে তোমরা নবী বলে মানতে যাবে কেনো?

উল্লেখ্য যে, এরকম কথা বলেও তারা স্বস্তি পেতো না। কারণ চোখের সামনেই দেখতো একে একে অবতীর্ণ হয়ে চলেছে কোরআনের অলৌকিক বাণী বৈভব, যা তাদের চিন্তা, বুদ্ধি ও প্রতাপকে অকার্যকর করে দেয়। অন্যান্য মোজেজা সমূহও তাদেরকে করে দেয় হতবাক। এ সকল কিছুকে স্বীকার করতে গেলে রসুল স. কে নবী বলে তাদেরকে মানতেই হয়। কিন্তু তারা তা মানতে রাজি নয়। অথচ এমতো সুস্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত ও প্রমাণসম্মত কোনোকিছুই তাদের নেই। তাই তারা সোজাসুজি মোজেজা সমূহকে বলে যাদু। একে অপরকে সাবধান করে দেয় একথা বলে, মোহাম্মদ তোমাদের মতোই তো একজন মানুষ। আর তার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে যাদু। সুতরাং সাবধান হও। বাপ-দাদার ধর্ম রক্ষা করো। দেখেশুনে যাদুকরের পাল্লায় পোড়ো না। একথাই আলোচ্য বাক্যের শেষাংশে প্রশ্নকারে উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে— তবুও কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর কবলে পড়বে?

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'রসুল স.বললো, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' একথার অর্থ রসুল স. তাদের মূর্খতার পর্দা উন্মোচন করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে এভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, দ্যাখো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা প্রকাশ্যে গোপনে যা কিছুই বলো ও করো না কেনো, আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ও পরিকল্পনাকে তোমরা প্রতিহত করতে পারবে না। তাঁর বিরুদ্ধে গেলে তোমরা অক্ষম ও পর্যুদস্ত হবেই। তিনি যে সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

এর পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'তারা এ-ও বলে, এ সমস্ত অলীক কল্পনা, হয় সে উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি। একথার অর্থ— ওই সকল অংশীবাদীরা একথাও বলে যে, এই কোরআন একটি অলীক কল্পনাসম্ভূত বাণীর সমাহার ছাড়া কিছুই নয়। অথবা স্বপ্নের মাধ্যমে পাওয়া কোনো কাল্পনিক বৃত্তান্ত। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসা প্রত্যাদেশ এগুলো কিছুতেই নয়। এরকম বলেও তারা স্বস্তি পেতো না। কারণ দিবালোকের মতো দেখতো কোরআনের উপদেশমালা, রচনাশৈলী ও বক্তব্য-বৈভব অত্যন্ত উচ্চমানের, এক কথায় অতুলনীয়। তাই তারাই তাদের পূর্বোক্ত মন্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বলতো, না কাল্পনিক কাহিনী ঠিক নয়। কোরআন হচ্ছে মোহাম্মদের নিজের রচিত একটি উচ্চমানের কবিতা সংকলন। ওহী বা প্রত্যাদেশ কিছুতেই নয়।

বাগবী লিখেছেন, মক্কার অংশীবাদীরা কোরআন সম্পর্কে এক এক জন এক এক কথা বলতো। কেউ বলতো কোরআন হচ্ছে বিক্ষিপ্ত ও বিস্রস্ত স্বপ্নবৃত্তান্তের সমাহার। কেউ বলতো ভিত্তিহীন কাহিনী, আবার কেউ বলতো কবিতা। উল্লেখ্য যে, 'অলীক কল্পনা' ও 'কবিতা'র মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অলীক কল্পনার অবতারকেরা তাদের বক্তব্যকে জনসমক্ষে সত্য বলে উপস্থাপন করতে চায়। এটাও চায় যে, মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করুক। আর কবিতার উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে মুগ্ধ করা, উদ্দীপিত করা, আন্দোলিত করা, অভিভূত করা ও আনন্দ দান করা। বিশ্বাস করা না করা এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। আবার কবিতা লেখা হয় যে কোনো বিষয়ে। বিষয়ের চেয়ে প্রকরণ বা রচনাশৈলিই এখানে প্রধান বিবেচ্য। কিন্তু কোরআনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার পৃথকীকরণ, মহাজীবনের সফলতার দিকে মানুষকে পথপ্রদর্শন এবং ভালো ও মন্দের পরিণতি সম্পর্কে সচকিত করণ, জীবনের সর্বক্ষেত্রের কর্তব্য নির্ধারণ। অর্থাৎ মানুষের মূল ও আনুসঙ্গিক সকল সমস্যা ও সমাধানের ব্যবস্থা রয়েছে কেবল কোরআনে। কবিতা, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদিতে এসবের কোনো কিছুই নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব সে আনয়ন করুক আমাদের নিকটে এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিলো পূর্ববর্তীগণ।' একথার অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আরো বলে, হজরত সালেহ্ নিয়ে এসেছিলেন অলৌকিক উষ্ট্রী, হজরত মুসার ছিলো অলৌকিক যষ্টি ও শুভ্রোজ্জ্বল হাত, আর হজরত ঈসা জীবিত করতেন মৃতকে। নিরাময় করতেন জন্মান্ধকে, কুষ্ঠ রোগগ্রস্তকে। এখন মোহাম্মদ যদি তাদের মতো নবী হয়েই থাকে, তবে তাদের মতো অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করে না কেনো?

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, মক্কার মুশরিকেরা একবার রসুল স.কে বললো, তুমি যদি তোমার দাবিতে সত্য হও, তবে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দাও। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে আবির্ভূত হলেন হজরত জিবরাইল। বললেন, ভ্রাতা মোহাম্মদ! আপনি চাইলে আল্লাহ্ সাফা

পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিবেন। কিন্তু তারপর যদি তারা ইমান না আনে, তবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। সময়ক্ষেপণ করা হবে না। এখন আপনিই বলুন, আপনি কী চান? মোজেজা, না আপনার সম্প্রদায়ের জন্য অবকাশ? রসুল স. বললেন, আমি আমার সম্প্রদায়ের বোধোদয়ের জন্য অবকাশই চাই। তাঁর একথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

❐ ইহাদিগের পূর্বে যে সব জনপদ আমি ধ্বংস করিয়াছি উহার অধিবাসীরা বিশ্বাস করিত না; তবে কি ইহারা বিশ্বাস করিবে?

❐ তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই পাঠাইয়াছিলাম; তোমরা যদি না জান তবে কিতাবীদিগকে জিজ্ঞাসা কর।

❐ এবং আমি তাহাদিগকে এমন দেহবিশিষ্ট করি নাই যে তাহারা আহার্য ভক্ষণ করিত না; তাহারা চিরস্থায়ীও ছিল না।

❐ অতঃপর আমি তাহাদিগের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিলাম,— যথা, আমি উহাদিগকে ও যাহাদিগকে ইচ্ছা রক্ষা করিয়াছিলাম এবং সীমালংঘন-কারীদিগকে করিয়াছিলাম ধ্বংস।

❐ আমি তো তোমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি কিতাব যাহাতে আছে তোমাদিগের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এদের পূর্বে যে সব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, তার অধিবাসীরা বিশ্বাস করতো না; তবে কি এরা বিশ্বাস করবে?' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! ইতোপূর্বের অবাধ্য সম্প্রদায়েরা তাদের কাংখিত মোজেজা দর্শন করেও ইমান আনেনি, ফলে আমি তাদেরকে ও তাদের জনপদগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছি। এখন আপনার সম্প্রদায়ের অবাধ্যদের প্রস্তাবানুসারে যদি আমি মোজেজার প্রকাশ ঘটাই, তবে কি তারা বিশ্বাস করবে?

এখানে 'মিন ক্বুরইয়াতিন' কথাটির 'মিন' অতিরিক্ত হিসেবে সংযুক্ত। 'ক্বুরইয়াতিন' অর্থ জনপদ। 'আহ্লাকনাহা' অর্থ আমি তা ধ্বংস করেছি। কথাটি 'ক্বুরইয়াতিন' শব্দের সিফাত বা বিশেষণ।

'তবে কি তারা বিশ্বাস করবে'— এ প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। মক্কার মুশরিকেরা যে মোজেজা দেখলে ইমান আনবে না, তার নিশ্চিতি প্রকাশার্থেই এখানে উত্থাপিত হয়েছে এই প্রশ্নটি। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— অতীত যুগের অবিশ্বাসীরা যখন মোজেজা দেখেও ইমান আনেনি, তখন হে আমার রসুল! আপনার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীরাও নিশ্চয় ইমান আনবে না। কারণ তাদের চেয়েও এরা সত্যপ্রত্যাখ্যানে অধিকতর অনড়। আপনি নিশ্চয় চান না, এরা তাদের পূর্বসূরীদের মতো ধ্বংস হয়ে যাক।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম, তোমরা যদি না জানো তবে কিতাবীদেরকে জিজ্ঞেস করো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার পূর্বে আমি মানুষকেই নবী মনোনীত করে তাদেরকে প্রত্যাদেশসহ মানুষকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। ফেরেশতাকে নয়। আমার এই চিরন্তন বিধানটির কথা আপনি অংশীবাদীদেরকে জানিয়ে দিন এবং বলুন, তোমাদের যদি এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে, তবে তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের জিজ্ঞেস করে এ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জেনে নিতে পারো।

উল্লেখ্য যে, মক্কার মুশরিকেরা বাণিজ্য ব্যপদেশে মদীনার ইহুদী ও সিরিয়ার খৃষ্টানদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো। তাদের নিকট থেকে তারা রসুল স. সম্পর্কে পরামর্শও গ্রহণ করতো। নবুয়ত, কিতাব, কিয়ামত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তাদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চাও ছিলো। তাই এখানে মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, মানুষের নবী হিসেবে মানুষকেই যে প্রেরণ করা হয়, একথা যদি তোমরা বিশ্বাস না করো, তবে কিতাবীদের কাছে জেনে নাও। এরকমও হতে পারে যে— সুবিদিত বিষয়ে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের কথা গ্রাহ্য। ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিকট মানুষের নবী রসুল হওয়ার বিষয়টি সুবিদিত। তাই এখানে মুশরিকদেরকে তাদের নিকটে জিজ্ঞেস করে এ ব্যাপারে নিঃসন্দিগ্ধ হতে বলা হয়েছে।

এর পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা আহার্য ভক্ষণ করতো না; তারা চিরস্থায়ীও ছিলো না।' একথার অর্থ— আমি ওই সকল নবী রসুলকে এমতো বৈশিষ্ট্য দান করিনি যে, তারা ফেরেশতাদের মতো পানাহার না করেও জীবনযাপন করবে এবং পৃথিবীতে চিরকাল থাকতে পারবে।

এখানে 'জ্বাসাদা' অর্থ দেহ। শব্দটি জাতিবাচক বিশেষ্য। একবচন বহুবচন সকল ক্ষেত্রেই শব্দটি সমভাবে প্রযোজ্য। এখানে শব্দটির প্রকৃত অর্থ হবে দেহ বিশিষ্ট। 'বিশিষ্ট' শব্দটি এখানে উহ্য। 'জ্বাসাদ্' বলা হয় রঙিন দেহকে। এর শাব্দিক অর্থ— সম্মিলিত করা বা জুড়ে দেয়া।

'তারা আহার্য ভক্ষণ করতো না' কথাটি এখানে 'দেহ বিশিষ্ট' কথাটির সিফাত বা বিশেষণ। অথবা এটি একটি পৃথক বাক্য— অবিশ্বাসীদের একটি প্রশ্নের উত্তর। তাদের ওই প্রশ্নটি ছিলো— এ কেমন রসুল? এ আবার আমাদের মতো খাওয়া-দাওয়া করে কেনো? আর 'তারা চিরস্থায়ীও ছিলো না' কথাটির অর্থ, ওই সকল নবী রসুলদের কেউই চিরকাল পৃথিবীতে বসবাস করেননি। যে অবয়বের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল আহার্যের উপর, তা অবশ্যই হবে রূপান্তরশীল বস্তু। অবশ্যই অস্থায়ী যা, তা ধ্বংসশীল । তাই নির্ধারিত হায়াত শেষে মহাপ্রস্থান ঘটেছে তাঁদের সকলের।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম,— যথা, আমি তাদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং সীমালংঘনকারীদেরকে করেছিলাম ধ্বংস।' একথার অর্থ— আমি আমার বার্তাবাহকগণকে সাহায্যদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পূর্ণ করেছি। তাদেরকে এবং তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে আমার গজব থেকে রক্ষা করেছি। রক্ষা করেছি তাদেরকেও, যাদের পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা ইমান আনবে। আর আমার ও আমার নবী রসুলগণের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছিলো, বিনাশ সাধন করেছি সেই সকল সীমালংঘনকারীদেরকে।

এর পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব, যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তোমাদেরই আলোচনা, তোমাদেরই মাহাত্ম্য। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?' এখানে 'জিকর' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে— হে কুরায়েশ জনতা! আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ এই কোরআনে তোমাদের আলোচনাই করেছি। প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের সম্প্রদায়ভূত এক রসুলের মাধ্যমে তোমাদেরকে দান করেছি উপদেশ, আর একে অবতীর্ণও করেছি তোমাদের ভাষায়, যেনো তোমরা বুঝতে পারো এবং মান্য করতে পারো। এতো কিছু করা সত্ত্বেও তোমাদের কি সত্যোপলব্ধি ঘটবে না? অথবা 'জিকর' শব্দটি দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও ধর্ম সংক্রান্ত অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সমূহের আলোচনাকে।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'জিকর' শব্দটির অর্থ উত্তম স্মরণ, খ্যাতিমানতা, উপদেশ অথবা ওই উত্তম আচরণ, যার মাধ্যমে অর্জিত হয় উত্তম স্মরণ। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে শব্দটির অর্থ হবে আলোচনা। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, কোনো

কিছু স্মৃতিচারণের নাম 'জিকর' ও 'তাজকিরা'। আরো অর্থ রয়েছে শব্দটির। যেমন— স্মরণ, আলোচনা, প্রচলন, খ্যাতি, প্রশংসা, উপদেশ, নামাজ, দোয়া এবং ওই কিতাব যার মধ্যে ঋণ ও সম্পদের হিসাব থাকে।

'আফালা তা'ক্বিলূন' অর্থ— তবুও কি তোমরা বুঝবে না? এখানকার হামযাহ্ অক্ষরটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এইভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— তোমরা কি ওই সকল আলোচনা বুঝতে পারো না, যার অবতারণা করা হয়েছে তোমাদেরকে লক্ষ্য করে?

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

❒ আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ, যাহার অধিবাসীরা ছিল সীমালংঘনকারী এবং তাহাদিগের পরে সৃষ্টি করিয়াছি অপর জাতি।

❒ অতঃপর যখন উহারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখনই উহারা জনপদ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল।

❒ উহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'পলায়ন করিও না এবং ফিরিয়া আইস তোমাদিগের ভোগ-সম্ভারের নিকট ও তোমাদিগের আবাসগৃহে যাহাতে এ বিষয়ে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।'

❒ উহারা বলিল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদিগের! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।'

❒ আমি উহাদিগকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি-সদৃশ না করা পর্যন্ত উহাদিগের এই আর্তনাদ স্তব্ধ হয় নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি ধ্বংস করেছি কতো জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিলো সীমালংঘনকারী এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অপর জাতি।

এখানে 'আহাস্সূ' অর্থ যখন তারা স্বচক্ষে অবলোকন করলো, 'কাসামুন' অর্থ ভেঙে ফেলা। মর্মার্থ— অধিকাংশ ধ্বংস করে ফেলা। 'ক্বরইয়াতান' অর্থ

অধিকাংশ জনপদ। 'কানাত্ জলিমাতান' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যান ও পাপে জর্জরিত করেছে নিজেদেরকে। 'আন্‌শা'না' অর্থ আমি উত্তরাধিকার করেছি। 'বা'দাহা' অর্থ ওই জনপদকে ধ্বংস করার পর।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো, তখনই তারা জনপদ থেকে পলায়ন করতে লাগলো'। এখানে 'আহাস্‌সূ' অর্থ প্রত্যক্ষ করলো। 'বা'সানা' অর্থ আমার শাস্তির কঠোরতা। আর 'ইয়ারকুদুন' অর্থ ঘোড়ার পায়ের নাল পায়ে লাগিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাওয়া। এরকমও বলা যায় যে— তারা যখন আল্লাহ্‌র ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন অশ্বের মতো ক্ষিপ্রগতিতে পালিয়ে যেতে শুরু করলো। ক্ষিপ্র ও তীব্র গতিতে পলায়ন বুঝানোর জন্যই এখানে শব্দটি এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— তাদেরকে বলা হয়েছিলো, পলায়ন কোরো না এবং ফিরে এসো তোমাদের ভোগ-সম্ভারের নিকট ও তোমাদের আবাসগৃহে, যাতে এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।' একথার অর্থ— দ্রুতবেগে পলায়নরতদেরকে তখন কোনো ফেরেশতা অথবা কোনো বিশ্বাসবান বললেন, পালাচ্ছো কেনো? ফিরে এসো। ফিরে এসো তোমাদের ধন-সম্পদের নিকটে ও তোমাদের আবাসগৃহে। হয়তো শাস্তিদানের পূর্বে তোমাদেরকে দেয়া হবে জিজ্ঞাসাবাদের অবকাশ। এখানে 'উত্‌রিফ্‌তুম' অর্থ ফিরে এসো তোমাদের ভোগ-সম্ভারের নিকটে। খলিল বলেছেন, নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত ব্যক্তিকেই সাধারণতঃ এভাবে ফিরে আসতে বলা হয়।

'হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে' কথাটির অর্থ ফিরে এলে হয়তো তোমাদেরকে তোমাদের সম্পত্তির আয়-ব্যয় সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করা হতে পারে। এরকমও অর্থ হতে পারে— তোমরা ফিরে গিয়ে আবার দরবার বসাও। সম্ভবতঃ তোমাদের পরিচারক-পরিচারিকারা পূর্বের মতোই বলবে, বলুন, কি হুকুম? কিংবা অর্থ হবে— সম্ভবতঃ তোমাদের লোকেরা তোমাদের বৈঠকে এসে তাদের আপনাপন বিপদাপদের কথা জানাবে। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— তোমাদের কাছে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, নতুবা তোমাদেরকে দেয়া হবে আযাব। উল্লেখ্য যে, শাস্তিদানের পূর্বেই সাধারণতঃ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে এক ধরনের হুমকি।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে নবীগণের হত্যা সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বাগবী লিখেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হুজুরার বাসিন্দাদের সম্পর্কে। ইয়েমেনের একটি জনপদের নাম ছিলো

হুজুরা। আরববাসীরাই সেখানে বসবাস করতো। তাদেরকে পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ একজন নবী প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র এককত্বের উপরে বিশ্বাসস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বললো এবং শেষে হত্যা করলো। শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্ তাদের উপর চড়াও করে দিলেন বখতে নসরকে। বখতে নসর তাদের কাউকে কাউকে করলো হত্যা এবং কাউকে কাউকে করলো বন্দী। অবস্থা বেগতিক দেখে অবশিষ্টরা পালাতে শুরু করলো। এক ফেরেশতা ঘোষণা করলো, পালিও না। পরিবারবর্গ ও ধনসম্পদের কাছে ফিরে যাও। সম্ভবতঃ তোমাদের কাছে কিছু চাওয়া যেতে পারে। কাতাদা কথাটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সম্ভবতঃ তোমাদের কাছে কিছু পার্থিব ধনসম্পদ চাওয়া হতে পারে। ইচ্ছে করলে দিয়ো, না হয় দিয়ো না। তোমরা তো সম্পদশালী ও প্রভাবশালী। পরের ঘটনাটি ছিলো এরকম— বখতে নসর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং যাকে পেলো তাকেই হত্যা করে ফেললো। তখন ঊর্ধ্বদেশ থেকে ঘোষণা শোনা গেলো— এ হচ্ছে নবীনিধনের বদলা। এই ঘোষণা শুনে কেউ কেউ অনুতপ্ত হলো। বখতে নসরের কাছে স্বীকার করলো তাদের অপরাধ। কিন্তু বখতে নসর তাদের কাউকেই বেঁচে থাকার সুযোগ দিলো না। কেউ কেউ বলেছেন, ওই ঘোষণাকারী তখন বলেছিলো— পালিয়ে গেলে লাভ হবে না, বরং ঘরে ফিরে যাও। সম্ভবতঃ তোমাদের কাছে ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু সম্পদ চাওয়া হতে পারে। সুতরাং সম্পদ প্রদান করে জীবন বাঁচাও। তখন আকাশ থেকে পুনঃ ঘোষিত হলো, এটা হচ্ছে নবীহত্যার প্রতিশোধ।

এর পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।' একথার অর্থ— ওই সকল নবী হন্তারকেরা বললো, হায়, একি দুর্ভোগ! আমরা যে সত্যি সত্যিই সীমালংঘন করেছি। স্বেচ্ছায় ডেকে এনেছি মৃত্যুকে। যেনো বা বলেছি, এসো, এসো হে মৃত্যু! আমরা তোমার জন্যই অপেক্ষমান।

এর পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নিসদৃশ না করা পর্যন্ত তাদের ওই আর্তনাদ স্তব্ধ হয়নি।' একথার অর্থ— ওই সকল সীমালংঘনকারীকে আমি করেছিলাম কর্তিত শস্য সদৃশ উন্মুল এবং নির্বাপিত অগ্নিশিখার মতো অস্তিত্বহীন। অবশেষে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো তাদের আহাজারি ও আর্তনাদ।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِينَ ○ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فٰعِلِينَ ○ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ○ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ○ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ○

❒ আকাশ ও পৃথিবী এবং যাহা উহাদিগের অন্তর্বর্তী তাহা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।

❒ আমি যদি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করিতে চাহিতাম তবে আমি আমার নিকট যাহা আছে তাহা লইয়াই উহা করিতাম; আমি তাহা করি নাই।

❒ কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে উহা মিথ্যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। দুর্ভোগ তোমাদিগের! তোমরা যাহা বলিতেছ তাহার জন্য।

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা তাঁহারই; তাঁহার সান্নিধ্যে যাহারা আছে তাহারা তাঁহার ইবাদত করিতে অহংকার করে না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না।

❒ তাহারা দিবা-রাত্রি তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তাহারা শৈথিল্য করে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আকাশ ও পৃথিবী এবং যা এর মধ্যবর্তী, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।' একথার অর্থ— আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে, তা আমি অহেতুক বা ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। এ সকল কিছু সৃষ্টি করেছি এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। যারা জ্ঞানান্বেষী, তাদের জন্য আমার এই সুবিশাল সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে অন্তহীন জ্ঞান ও বিস্ময়। রয়েছে মানুষের মহাজীবনকে অর্থবহ ও পূর্ণ করে তুলবার জন্য অসংখ্য উপকরণ। সুতরাং কেউ যেনো এগুলোর বাহ্যিক সৌন্দর্য ও অবস্থা নিয়ে মেতে না থাকে। মহাসৃষ্টির অন্তর্নিহিত রহস্য ভেদ করে পরিচয় লাভ করার চেষ্টা করে মহাস্রষ্টার। শানিত ও সুশোভিত করে তার প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টিকে।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'আমি যদি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার নিকটে যা আছে, তা নিয়েই তা করতাম; আমি তা করিনি।'

আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'লাহ্ওয়ান' শব্দটির শাব্দিক অর্থ নারী। নারীই হচ্ছে চিত্তবিনোদনের প্রধান উপকরণ। হাসান ও কাতাদার মতে 'লাহ্ওয়ান' অর্থ সম্ভোগ। নারীই হচ্ছে সম্ভোগের ক্ষেত্র। কালাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ সন্তান-সন্ততি। সন্তান-সন্ততিও চিত্তবিনোদনের অন্যতম উপকরণ। সুদ্দীও এরকম বলেছেন। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আমি যদি আমার মনোরঞ্জনের জন্য কিছু করি তবে তো তা হবে আমারই সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলীর সমান্তরাল, আনুরূপ্যবিহীন। সৃষ্টি জগত তো আমার সমান্তরাল, সমকক্ষ, অনুরূপ কোনোটাই নয়। নারীসঙ্গ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির মাধ্যমে বিনোদন করা তো সৃষ্টি জগতের স্বভাব। তাদের জোড়া আছে। সন্তান-সন্ততি আছে। আছে পরনির্ভরশীলতা, মুখাপেক্ষিতা, পানাহারের প্রয়োজন, নিদ্রা-তন্দ্রা, স্মৃতি-বিস্মৃতি, আছে জীবন-মৃত্যু, উত্থান-পতন। কিন্তু আমি এসকল কিছু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। আমি এক, অদ্বিতীয়, অংশীবিহীন, আনুরূপ্যহীন, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। তাই আমি সৃষ্টির মতো চিত্তবিনোদনের মুখাপেক্ষিতা ও প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সে কারণেই নিছক বিনোদন আমার এই মহাসৃষ্টির অস্তিত্বায়নের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের মাধ্যমে খৃষ্টানদের অপবিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। তারা বলে ঈসা মসীহ আল্লাহ্র পুত্র এবং তাঁর মাতা আল্লাহ্র স্ত্রী (আল্লাহ্ রক্ষা করুন)।

'ইন কুন্না ফায়িলীন' অর্থ আমি তা করিনি। এখানে 'ইন' হচ্ছে শরতিয়া (শর্তসাপেক্ষ অব্যয়)। পূর্ববর্তী বাক্যে যা বলা হয়েছে, তা নাকচ করে দেয়া হয়েছে এই কথাটির মাধ্যমে। তাই প্রসঙ্গটি এখানে পুনরুল্লেখিত হয়নি। হজরত কাতাদা, ইবনে জারীর ও মুকাতিলের মতে এখানকার 'ইন' হচ্ছে না বোধক। অর্থাৎ আমি এরূপ করি না। সুতরাং এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের পরিণতি স্বরূপ।

এর পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়'। আলোচ্য আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের ধারাবাহিকতা। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— ক্রীড়াচ্ছলে নয়, মিথ্যাকে সত্যের আঘাতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়াই আমার প্রত্যাদেশের মূল উদ্দেশ্য। এখানে 'সত্য' অর্থ ওই আয়াত যা আল্লাহ্র স্ত্রী-পুত্র পরিজন হওয়ার ধারণা থেকে পবিত্র করে দেয়।

'কুজফুন' অর্থ আঘাত হানা। আর 'বাতিল' বা মিথ্যা হচ্ছে অবিশ্বাস ও মিথ্যাচার এবং আল্লাহ্‌র স্ত্রী-পুত্রপরিজন হওয়ার ধারণা। 'ইয়াদমাগু' অর্থ ধ্বংস করা, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া। পরোক্ষার্থে মিথ্যাকে ধ্বংস করে তদস্থলে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা। 'কুজফুন' শব্দটির মাধ্যমে একথাই প্রকাশ পায় যে, যার দ্বারা আঘাত করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত শক্তিশালী, ভারী ও পূর্ণ। 'যাহিকুন' অর্থ এমনভাবে ধ্বংস করা যাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর আর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'যাহাক্বাল বাতিলু' অর্থ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। যেমন বলা হয় 'যাহাক্বাশ্‌ শাইউ' অর্থ ওই বস্তু ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, 'যাহাক্ব' অর্থ জীবন বের হয়ে যাওয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছো তার জন্য।' একথাটি বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে লক্ষ্য করে। 'ওয়াইলুন' অর্থ দুর্ভোগ। 'মিম্‌মা তাসিফূন' অর্থ যে সকল অশোভন ও অংশীবাদিতাপূর্ণ কথা তোমরা বলো তার জন্য তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

এর পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই; তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা তাঁর ইবাদত করতে অহংকার করে না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না।' একথার অর্থ— আকাশমার্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর সৃষ্টি ও তাঁর অধীনস্থ। আল্লাহ্‌র সমকক্ষ হওয়া ও অংশী হওয়ার যোগ্যতা কোনো সৃষ্টির নেই। তাই তাদের কারোই আল্লাহ্‌র স্ত্রী-পুত্র পরিজন হওয়ার অধিকার ও যোগ্যতা নেই। আর যে সকল ফেরেশতা, নবী ও পুণ্যবান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ও প্রিয়ভাজন, তাঁরাও আল্লাহ্‌র বান্দা। তাঁরাও আল্লাহ্‌র অহংকারমুক্ত উপাসনায় নিরত। আর নৈকট্যভাজন ফেরেশতাদের তো এ ব্যাপারে ক্লান্তি-শ্রান্তি বলে কিছুই নেই। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আনুরূপ্যবিহীন। তাই তাঁর সন্নিধান ও নৈকট্যের ধারণাটিও আনুরূপ্যবিহীন। অর্থাৎ তা আমাদের নৈকট্যের ধারণার অতীত।

'তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে' বলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্ত মানুষ ও ফেরেশতাদেরকে এখানে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, তাদের মধ্যে অনেকেই আকাশ অথবা পৃথিবীর কোনো স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। যেমন আরশবহনকারী ফেরেশতা।

'ইস্‌তিহ্‌সার' কথাটির অর্থ— ক্লান্তি বোধ করে না। সার্বক্ষণিক ইবাদতে মগ্ন থাকা যেমন অসহনীয় তেমনি দুঃসাধ্য। কাজেই নৈকট্যভাজন ফেরেশতাদের অবসাদগ্রস্ত হওয়াই ছিলো সমীচীন। কিন্তু আদতেই ক্লান্তি বোধ করে না তারা।

বরং উপভোগ করে ইবাদতের আস্বাদ। তাই তারা নিয়ত নিমজ্জিত থাকে তাঁর আরাধনায়। আরাধনাশূন্য অবস্থায় থাকা তাদের জন্য অসম্ভব। তাই এখানে বলা হয়েছে— তারা তাঁর ইবাদত করতে অহংকার করে না ও ক্লান্তিও বোধ করে না।

এর পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য করে না।' হজরত কা'ব আহরার বলেছেন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেমন মানুষের জীবন ধারণের জন্য অনিবার্য, তেমনি আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনাও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে যেমন মানুষ ক্লান্ত হয় না, তেমনি 'তসবিহ্' পাঠেও ক্লান্তি বোধ করে না কোনো ফেরেশতা।

'লা ইয়াফতুরুন' অর্থ শৈথিল্য প্রদর্শন করে না। অর্থাৎ তাদের অন্তর্জগতে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হয় আল্লাহ্র জিকির। স্থলভাগের প্রাণী যেমন বাতাস থেকে এবং জলভাগের প্রাণী যেমন পানি থেকে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে তাদের আপনাপন জীবন রক্ষা করে, তেমনি আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন ও নৈকট্যভাজন মানুষ ও ফেরেশতাও আল্লাহ্র জিকির দ্বারা রক্ষা করেন তাঁদের অস্তিত্ব। এটাই তাঁদের 'হায়াতে তইয়েবা' বা পবিত্র জীবন। উল্লেখ্য যে, এই জিকির হচ্ছে জিকরে খফি (গোপন জিকির)।

এরকম নিরবচ্ছিন্ন জিকির সম্পন্ন মানুষের সকল ক্রিয়াকলাপই পরোক্ষার্থে আল্লাহ্র ক্রিয়াকলাপ। কারণ তাঁরা আল্লাহ্র সতত অনুগত। তাঁরা পানাহার করেন ইবাদতের শক্তি গ্রহণের মানসে। বিবাহ করেন রসুল স. এর আদর্শের অনুসরণে। এর মধ্যে রসুল স. এর উম্মতের সংখ্যাবৃদ্ধিও থাকে তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা বিবাহ করো। মহাবিচারের দিবসে আমি যেনো আমার উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য উৎফুল্ল হতে পারি। এ ধরনের মানুষের জাগতিক প্রয়োজন ও কর্মকাণ্ড, নিদ্রা-তন্দ্রা তাঁদের অন্তরকে আল্লাহ্র জিকির থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। তাই তাঁদের মাধ্যমে কোনো অপরাধও সংঘটিত হয় না। তকদিরের অনড় লিখনের কারণে যদি এরকম কোনো স্খলন হয়েই যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁরা হন লজ্জিত ও অনুতপ্ত। ফলে তাঁদের কৃত অপরাধকে আল্লাহ্তায়ালা পরিণত করে দেন পুণ্যে। প্রকৃতপক্ষে এরকম গোপন জিকিরের অধিকারীরাই জ্ঞানী বা আলেম। 'আলেমগণের নিদ্রা ইবাদত' এই হাদিসটি প্রযোজ্য হতে পারে কেবল এ রকম ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেই। আর আলোচ্য আয়াতের 'শৈথিল্য প্রদর্শন করে না' কথাটিও প্রয়োগ করা যেতে পারে কেবল তাঁদেরই বেলায়।

أَمِ اتَّخَذُوٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ○ لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ○ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۭ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ○

❒ উহারা মৃত্তিকা হইতে তৈরি যে সব দেবতা গ্রহণ করিয়াছে সেইগুলি কি মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম?

❒ যদি আল্লাহ্ ব্যতীত বহু ইলাহ্ থাকিত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তবে উভয়ই ধ্বংস হইয়া যাইত। কিন্তু উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।

❒ তিনি যাহা করেন সে বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইবে না, বরং উহাদিগকেই প্রশ্ন করা হইবে।

❒ উহারা কি তাঁহাকে ব্যতীত বহু ইলাহ্ গ্রহণ করিয়াছে? বল, 'তোমরা তোমাদিগের প্রমাণ উপস্থিত কর। ইহাই, আমার সঙ্গে যাহারা আছে তাহাদিগের জন্য উপদেশ এবং ইহাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদিগের জন্য।' কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে উহারা মুখ ফিরাইয়া লয়।

❒ আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ ব্যতীত, 'আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; সুতরাং আমারই ইবাদত কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা মৃত্তিকা থেকে তৈরী যেসব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? এ কথার অর্থ— আল্লাহ্র এককত্বের পক্ষে অসংখ্য দলিল প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এবং নবী রসুলের মাধ্যমে অংশীবাদিতার ভয়াবহ কুফল সম্পর্কে বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও মুশরিকেরা মাটি অথবা ইট পাথর ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের তৈরী মূর্তিগুলোকে তাদের

উপাস্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে। কেনো এরকম করেছে তারা? ওই জড়প্রতিমাগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে পারে?

ইতোপূর্বের ভাষ্যসহ আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এরকম— তারা রসুল স. সম্পর্কে গোপন পরামর্শ সভায় বলে, সে তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তার অলৌকিক কর্মকাণ্ডসমূহ যাদু। আর কোরআন তো অলীক কল্পনা। তাও নয়, বরং কোরআন হচ্ছে মোহাম্মদের নিজের রচনা। সে একজন উচ্চ স্তরের কবি। এভাবে আল্লাহ্র কালাম ও আল্লাহ্র রসুলকে বিভিন্ন প্রকার অপমন্তব্য করেই তারা ক্ষান্ত হয় না, তার সঙ্গে আবার জড়প্রতিমার পূজাও করে। কিন্তু উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা কি তাদের আছে? উপাস্য যিনি হন তিনি তো হন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর, জীবনোপকরণ দাতা, জীবন ও মৃত্যু প্রদাতা। এসকল মূর্তির কি সে সকল যোগ্যতা বা ক্ষমতা আছে?

উল্লেখ্য যে, অংশীবাদীরা কেবল জড়প্রতিমার পূজাই করে না, তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ করে নক্ষত্র ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা। তাদের ওই সকল বাতিল উপাস্যসমূহও আলোচ্য আয়াতের 'দেবতা গ্রহণ করেছে' কথাটির অন্তর্ভুক্ত।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'যদি আল্লাহ্ ব্যতীত বহু ইলাহ্ থাকতো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেতো।' উল্লেখ্য যে, একাধিক আল্লাহ্র ধারণা একটি অবাস্তব ও অসম্ভব ব্যাপার। তবু যুক্তির খাতিরে যদি একাধিক আল্লাহ্র অস্তিত্ব ধরে নেয়া যায়, তবে সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব তো আর থাকে না। কারণ একাধিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে মতপার্থক্য, অভিপ্রায়গত ও শক্তিগত তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। এমতো ক্ষেত্রে সৃষ্টির ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় আর থাকে না। সুতরাং এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়, অংশীবিহীন ও আনুরূপ্যহীন।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা যা বলে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।' এখানে 'সুবহানা' (পবিত্র ও মহান) কর্মটি একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্ম। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করি। তিনি মহান আরশের অধিপতি। আর স্বীকার করি যে, অংশীবাদীদের অংশীবাদিতাপূর্ণ অপমন্তব্য (আল্লাহ্র স্ত্রী-পুত্র পরিজন রয়েছে ইত্যাদি) থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। উল্লেখ্য, আরশ হচ্ছে মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু, শরীরের মধ্যে মস্তিষ্কতুল্য। এভাবে 'আরশের অধিপতি' কথাটির অর্থ দাঁড়ায় সমগ্র সৃষ্টির একক অধিপতি।

এর পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'তিনি যা করেন, সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর ও ইচ্ছাময়। সৃষ্টির সকল কিছুই সম্পাদিত হয় তাঁর একক অভিপ্রায়ে ও কর্তৃত্বে। সুতরাং তাঁর কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারে কে? আর সৃষ্টি অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব সকল বিষয়ে সম্পূর্ণতই তাঁর মুখাপেক্ষী। তারা কেউই প্রকৃত অর্থে কোনো কিছুর মালিক নয়। আল্লাহ্র একক মালিকানাধীন সাম্রাজ্যে বিচরণ করে তারা। বিনা অনুমতিতে এভাবে বিচরণ করা বা অবস্থান করার অধিকারও তাদের নেই। তাই একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্ই সকলকে তাদের আনুগত্য অনানুগত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। কিন্তু তারা আল্লাহ্র কোনো ব্যাপারেই কোনো প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের অংশীবাদিতার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমেও তাদেরকে এই হুমকিটি দেয়া হলো যে, যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই তুলতে পারবে না, তারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্যকে শরীক করতে যায় কোন সাহসে, কোন যুক্তিতে, কোন ধৃষ্টতায়?

এর পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তারা কি তাঁকে ব্যতীত বহু ইলাহ্ গ্রহণ করেছে?' ইতোপূর্বে বলা হয়েছিলো 'তারা মৃত্তিকা থেকে যে সব দেবতা গ্রহণ করেছে' (আয়াত ২১)। এখানেও আবার একই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হলো। অংশীবাদিতার জঘন্য স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য এবং বিষয়টিকে চরম ঘৃণ্য বলে প্রমাণ করবার জন্য প্রসঙ্গটির পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটি করা হয়েছে বুদ্ধিগত দিক থেকে এভাবে— 'সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে পারে?' পরের প্রশ্নটি করা হয়েছে প্রত্যাদেশিত বিদ্যার দিক থেকে। অর্থাৎ বলা হয়েছে— পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবেও তো বহু উপাস্যের কথা নেই। এভাবে অংশীবাদিতার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত হয়েছে আকলি ও নকলি দলিল।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! অংশীবাদিদেরকে বলুন, তোমরা তোমাদের অংশীবাদিতার পক্ষে উপস্থিত করো জ্ঞানগত ও প্রবহমান বিদ্যাগত প্রমাণ। উভয় প্রকার প্রমাণই তো তোমাদের বিপক্ষে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটাই আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং এটাই উপদেশ ছিলো আমার পূর্ববর্তীদের জন্য।' একথার অর্থ— কোরআন, ইঞ্জিল ও তওরাতই আমার উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত উপদেশামৃত। অতীত যুগের উম্মতদেরকেও এরকম উপদেশই দেয়া হয়েছিলো। এই তিনটি কিতাবেরই তওহীদ সম্পর্কিত নির্দেশনা এক, আর সেই নির্দেশনা হচ্ছে— আল্লাহ্ অংশীহীন, তিনি ছাড়া উপাস্য আর কেউই নেই। এই নির্দেশনাটি একটি শাশ্বত নির্দেশনা। পূর্বাপর সকলের জন্য এই নির্দেশনাটি সাধারণ।

আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'জিকরু মাম্ মায়ীয়া' কথাটির অর্থ কোরআন এবং 'জিকরু মান ক্বলী' অর্থ তওরাত ও ইঞ্জিল। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকারান্তরে অংশীবাদীদেরকে এই প্রশ্নটি করতে বলা হয়েছে যে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, বলো হে অবিমৃশ্য জনতা! কোরআন, তওরাত, ইঞ্জিল ও পূর্ববর্তী আকাশী পুস্তিকাগুলোর কোন স্থানে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনাকে বৈধ বলা হয়েছে?

একটি প্রশ্নঃ মক্কার মুশরিকেরা তো কোরআন, তওরাত, ইঞ্জিল কোনোটাই মানতো না। সুতরাং আসমানী কিতাবসমূহে শিরিকের অনুমতি আছে কি নেই সে কথা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে কেনো? যারা কোরআনই মানে না, তাদের কাছে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবই বা গ্রহণযোগ্য হবে কেনো?

উত্তরঃ মক্কার মুশরিকেরা বিদ্বেষবশতঃ কোরআনকে স্বীকার করতো না। কিন্তু কোরআনের অলৌকিকত্ব তাদের সামনে অস্পষ্ট তো ছিলো না। আর কোরআন যেহেতু পূর্বের আসমানী কিতাবসমূহের প্রত্যয়নকারী, সুতরাং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহও যে সত্য, তাও তাদের কাছে অস্পষ্ট ছিলো না। তাই সুস্পষ্ট বিষয়ের প্রমাণ উপস্থাপন করা অসঙ্গত ও যুক্তিবিবর্জিত কিছু নয়। এখানে এভাবে তাদেরকে এই শাশ্বত বিশ্বাসটির প্রতিটি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলা হয়েছে যে, শিরিক শয়তান ও প্রবৃত্তিতাড়িতদের আবিষ্কৃত একটি নতুন প্রথা, যা অসত্য ও অপবিত্র। আর তওহীদ হচ্ছে চিরন্তন, নিষ্কলুষ ও অক্ষয় বিশ্বাসের নাম, যা সকল যুগের প্রত্যাদেশিত গ্রন্থ সমূহে একই ভঙ্গিতে প্রচার করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।' এ কথার অর্থ— সত্য এভাবে সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তাকে মান্য করতে হয়, সে কথা তারা জানে না ও মানে না। সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকে তারা স্বীকার করতেও চায় না। মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রদর্শিত পথ থেকে।

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'আমি তোমার পূর্বে এমন কোনো রসুল প্রেরণ করিনি, তার প্রতি এই প্রত্যাদেশ ব্যতীত, আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত করো।' একথার অর্থ— তওহীদের শাশ্বত বিশ্বাসটি কেবল আমি কোরআনেই উল্লেখ করিনি, পূর্ববর্তী সকল নবী রসুলগণের মাধ্যমেও বারংবার একথা প্রচার করেছি। তাদেরকেও একথা বলতে বলেছি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা কেবল আমার ইবাদত করো।

❒ উহারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি পবিত্র, মহান! তাহারা তো তাঁহার সম্মানিত দাস।

❒ তাহারা আগে বাড়িয়া কথা বলে না; তাহারা তো তাঁহার আদেশ অনুসারেই কাজ করিয়া থাকে।

❒ তাহাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। তাহারা সুপারিশ করে শুধু উহাদিগের জন্য যাহাদিগের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তাহারা তাঁহার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।

❒ তাহাদিগের মধ্যে যে বলিবে, 'আমিই ইলাহ্ তিনি ব্যতীত,' তাহাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম; এই ভাবেই আমি সীমালংঘনকারীদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র, মহান। তাঁরা তো তাঁর সম্মানিত দাস।' বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বনী খাজাআ সম্পর্কে। তারা বলতো, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। তাদের ওই অপকথন নাকচ করে দিয়ে এখানে বলা হয়েছে— না, ফেরেশতারা আল্লাহ্র সন্তান-সন্ততি কিছু নয়। তারা হচ্ছেন আল্লাহ্তায়ালার সম্মানিত বান্দা। আর আল্লাহ্ও তাদের পিতা নন, বরং স্রষ্টা ও প্রভুপালনকর্তা।

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তারা আগ বাড়িয়ে কথা বলে না, তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।' একথার অর্থ— ওই সকল সম্মানিত ফেরেশতা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিছু বলে না। সর্বাবস্থায় তারা আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও আদেশের পূর্ণ অনুগত। তাদের সকল কাজ আল্লাহ্র নির্দেশেই সম্পাদিত হয়।

এর পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত।' একথার অর্থ— ফেরেশতাদের কোনো আচরণ ও কর্মই আল্লাহ্র নিকটে গোপন নয়। তিনি তাদের অতীত-ভবিষ্যত , প্রকাশ্য-গোপন সবকিছুই জানেন। তাই তারা আল্লাহ্র ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত ও সদা সংযত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।' একথার অর্থ আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন মহত্ত্ব ও পরাক্রমের প্রভাবে ওই সকল ফেরেশতা সদা সন্ত্রস্ত থাকে। আর ভয়ে ভয়ে কেবল তাদের পক্ষেই সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রসন্ন। উল্লেখ্য, সম্মান প্রকাশক ভীতিকেই বলে 'খশইয়াতুন'। আল্লাহ্র প্রতি ফেরেশতাদের ভীতি এই শ্রেণীর। যারা প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী, তাঁরাও আল্লাহ্কে এভাবে ভয় ও সমীহ করে চলেন। তাই 'খশইয়াতুন' শব্দটি তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ইশফাক্ব' শব্দের অর্থও ভয় করা, ভীত হওয়া। যদি শব্দটির পরে 'মিন' উল্লেখিত হয়, তবে উদ্দেশ্য হয় কাউকে ভয় করা। আর যদি শব্দটির পরে 'মিন' এর পরিবর্তে আ'লা উল্লেখ করা হয়, তবে ক্ষতি বা দুঃখ-কষ্টের আশংকায় কাউকে ভয় করা বুঝায়।

এর পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'তাদের মধ্যে যে বলবে আমিই ইলাহ্ তিনি ব্যতীত, তাকে আমি প্রতিফল দিবো জাহান্নাম, এভাবে আমি সীমালংঘনকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।' একথার অর্থ— ফেরেশতা অথবা অন্য কেউ যদি নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবি করে বসে, তবে আমি তাকে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। যারা সত্য বিশ্বাসের সীমালংঘন করে, তাদের জন্য আমি এরকম শাস্তিই নির্ধারণ করি।

এভাবে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একাধিক আল্লাহ্র অপধারণাটিকে নাকচ করা হয়েছে। নতুবা এরকম কখনোই হতে পারে না যে, ফেরেশতা কিংবা আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন কেউ নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবি করবে। এক আয়াতে খৃষ্টানদের ইবনুল্লাহ্ (আল্লাহ্র পুত্র) হওয়ার ধারণাটিকেও নাকচ করা হয়েছে এভাবে— 'মসীহ আল্লাহ্র বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারাও নয় এবং কেউ তাঁর বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করলে তিনি তাদের সকলকে তাঁর নিকট একত্র করবেন' (সূরা নিসা)।

কাতাদা বলেছেন, হজরত আদমকে সেজদা করার নির্দেশ যে ফেরেশতাগণকে দেয়া হয়েছিলো, ইবলিসও ছিলো তাদের মধ্যে। কিন্তু সে হয়ে গিয়েছিলো অবাধ্য ও অহংকারী। পরবর্তীতে সে তার ইবাদত করার জন্য আদম সন্তানকে আহ্বান জানাতে থাকে। আলোচ্য আয়াতে 'তাদের মধ্যে যে বলবে আমিই আল্লাহ্' কথাটি উদ্ধৃত হয়েছে ইবলিসের উক্তি হিসেবেই। কিন্তু কথা হচ্ছে— ফেরেশতারা কখনোই এরকম অপবিত্র উক্তি উচ্চারণ করতে পারে না। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। তাই কাতাদার বক্তব্যটি মেনে নিলে বলতে হয়, একটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে বিজড়িত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়।

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ○ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ○ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُونَ ○ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ○

❒ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশিয়া ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম; এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে; তবুও কি উহারা বিশ্বাস করিবে না?

❒ এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছি সুদৃঢ় পর্বত যাহাতে পৃথিবী উহাদিগকে লইয়া এদিক ওদিক ঢলিয়া না যায় এবং আমি উহাতে করিয়া দিয়াছি প্রশস্ত পথ যাহাতে উহারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারে।

❒ এবং আকাশকে করিয়াছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু উহারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

❒ আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিলো ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি তাদেরকে পৃথক করে দিলাম'।

এখানে 'আস্‌সামাওয়াত' অর্থ সম্মিলিত আকাশসমূহ। আর 'আরদ্ব' অর্থ সম্পূর্ণ পৃথিবী। হজরত ইবনে আব্বাস, আতা ও কাতাদা বলেছেন, প্রথমাবস্থায় সকল আকাশ ও সমস্ত পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলো। তারপর তার অভ্যন্তরে বাতাস প্রবেশ করিয়ে আকাশ মার্গ ও পৃথিবীকে আলাদা করা হয়েছে তাই এখানে বলা হয়েছে— অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম।

'রত্‌কুন্‌' অর্থ বন্ধ করা, একীভূত করা। আর ফাতকুন অর্থ পৃথক করা। হজরত কা'ব বলেছেন, আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছিলেন স্তরে স্তরে সম্মিলিতরূপে সাজিয়ে। তারপর বাতাস সৃষ্টি করে তার অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ

করিয়ে আকাশ ও পৃথিবীকে রাখা হয় দূর ব্যবধানে। মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেছেন, প্রথম আকাশ ও পৃথিবী ছিলো এক স্তর বিশিষ্ট ও মিলিত। তারপর আল্লাহ্ একটি আকাশকে পরিণত করলেন সাতটি আকাশে। পৃথিবীকেও করলেন সাত স্তর বিশিষ্ট। ইকরামা ও আতিয়া বলেছেন, প্রথমাবস্থায় আকাশ মার্গ ছিলো অভেদ্য। তাই বৃষ্টিপাত হতো না। আর পৃথিবীও ছিলো অচ্ছেদ্য। তাই পৃথিবীতে জন্ম নিতো না কোনো উদ্ভিদ। আল্লাহ্ তাদের ওই অনমনীয় অবস্থা দূর করে দিলেন। ফলে শুরু হলো বৃষ্টিপাত। পৃথিবীতেও অংকুরোদগম ঘটলো উদ্ভিদরাজির।

'আস্‌সামাওয়াত' শব্দটি বহুবচন। শব্দটির দ্বারা একত্রে আকাশ-পৃথিবীও বুঝায়, যখন এ দু'টো মিলিত ছিলো। আবার আকাশের অনেক স্তর রয়েছে বলেও এভাবে আকাশকে বহুবচনবোধক শব্দরূপের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, বৃষ্টিকে সৃষ্টি করা হয়েছে পরে। তাই পৃথিবীতে বৃক্ষের বিস্তার ঘটেছিলো আকাশ ও পৃথিবীর পৃথকীকরণের অনেক পরে। নতুন ও পুরাতন সকল সৃষ্টির উন্মেষ ঘটান আল্লাহ্ই। মানুষ কখনোই কোনো কিছুর সৃজয়িতা নয়, আবিষ্কারক অথবা নির্মাতা মাত্র। আল্লাহ্পাক প্রথমে আকাশ-পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন একত্রে। তারপর বাতাস সৃষ্টি করে প্রবেশ করিয়েছিলেন তার অভ্যন্তরভাগে। তারপর সৃষ্টি করেছেন বৃষ্টি, উদ্ভিদ ইত্যাদি। এভাবে তিনি তাঁর মহা সৃষ্টিকে তাঁর অভিপ্রায় ও পরিকল্পনানুসারে বিন্যস্ত করেছেন। ইকরামা ও আতিয়ার উপরে বর্ণিত বর্ণনাটি পরিপুষ্টি লাভ করেছে পরবর্তী বাক্যে এভাবে— 'এবং প্রাণবান সকল কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে।' একথার অর্থ— আকাশ ও পৃথিবী পৃথক করবার পর আমি সৃষ্টি করলাম পানি। আর পানি থেকে সৃষ্টি করলাম প্রাণীসমূহকে।

একটি প্রশ্ন ঃ উদ্ভিদ, তৃণগুল্ম— এগুলোর সৃষ্টি তো পানি থেকেই হয়। কিন্তু মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী তো সৃষ্টি হয় শুক্রকণা থেকে। তাহলে এরকম বলা যায় কি করে যে, প্রাণবান সকল কিছুকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

উত্তর ঃ কথাটি প্রকাশ করা হয়েছে পরোক্ষার্থে। পানি ছাড়া কোনো প্রাণীই জীবন ধারণ করতে পারে না। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বলা হয়েছে পানি দ্বারা সকল কিছু সৃষ্টি হওয়ার কথা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ।' একথায় বুঝা যায়, যেনো ত্বরাপ্রবণতার উপকরণ দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'বাক্বা' (স্থায়িত্ব) কথাটি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য কথাটিসহ আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— আমি মানুষের স্থায়িত্ব বা অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টি নির্ভরশীল করেছি পানির উপর। কিংবা বলা যায়, পানির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আর্দ্রতা। সেই আর্দ্রতা তো শুক্র কণার মধ্যেও

রয়েছে। সুতরাং শুক্রকণাও পানির অন্তর্ভুক্ত। আবুল আ'লীয়া বলেছেন, অধিকাংশ তাফসীরকার আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এভাবে— প্রতিটি প্রাণবান অস্তিত্ব পানি দ্বারা সৃষ্ট। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি বস্তুকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমি বলি, এখানে পানি দ্বারা শুক্রকণাকেই বুঝানো হয়েছে। এরকম বক্তব্য এসেছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'ওয়াল্লহু খলাক্বা কুল্লা দাব্বাতিম্ মিম্ মায়ি' (এবং আল্লাহ্ প্রতিটি চতুষ্পদ জন্তুকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন)। উপরে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে 'শাইইন' (সকল কিছু) কথাটি। এই 'সকল কিছু' অর্থ মানুষ ও অধিকাংশ জীবজন্তু। অর্থাৎ অধিকাংশ প্রাণবান সৃষ্টির উৎস পানি। অধিকাংশকে সামগ্রিক অর্থে প্রকাশ করা ও গ্রহণ করার রীতিটি সুপ্রচলিত। যেমন এক হাদিসে এসেছে— তোমাদের প্রত্যেকে তার অধীনস্তদের জিম্মাদার।

এরপরে বলা হয়েছে— 'তবুও কি তারা বিশ্বাস করে না' (আফালা ইউ'মিনূন)? এই প্রশ্নটি অস্বীকৃতি জ্ঞাপক এবং এখানকার 'ফা' অক্ষরটি পরিণতি প্রকাশক। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে — আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর চিরন্তন নিদর্শনের এতো স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ প্রকাশিত হওয়ার পরেও কি তারা ইমান আনবে না?

এর পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক ঢলে না যায়। আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ, যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।' এখানে 'রওয়াসিয়া' অর্থ সুদৃঢ় পর্বত। শব্দটি এসেছে 'রাসা' থেকে। এর অর্থ— 'ছাবাত' (প্রতিষ্ঠিত)।

'আন তামীদা বিহিম' অর্থ এদিক ওদিক চলে না যায়। 'মা' (লা) কথাটি রয়েছে এখানে অনুক্ত। এভাবে বুঝানো হয়েছে, পৃথিবী যাতে এদিক ওদিকে ঢলে না পড়ে, সে কারণেই পৃথিবীর উপরে স্থাপন করা হয়েছে সুদৃঢ় পর্বত।

'ওয়া জায়ালনা ফীহা ফিজাজান সুবুলান' অর্থ আমি পৃথিবীর পাহাড়ে ও সমতলভূমিতে সৃষ্টি করে দিয়েছি বহুরকমের পথ— জনপথ, সড়ক, গিরিপথ। 'লায়াল্লাহুম ইয়াহ্তাদূন' অর্থ যাতে তারা ওই সকল পথ ধরে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যেতে পারে।

এর পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।' একথার অর্থ— আমি আকাশকে বিনা স্তম্ভে ছাদরূপে প্রতিষ্ঠিত রেখেছি, যা নিখুঁত ও

অটুট, কিয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত। শয়তানের গমনাগমনও সেখানে নিষিদ্ধ। নক্ষত্র, নীহারিকাসহ আরো অনেক কিছু দিয়ে আমি আকাশকে করে রেখেছি রহস্যময় ও অসংখ্য নিদর্শনে ভরপুর। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ওই সকল নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না, রহস্য উদ্ধার করতে চায় না। ঔদাসীন্যবশতঃ মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এর পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।' রাত্রি-দিবস, সূর্য-চন্দ্র এসকল কিছু হচ্ছে আল্লাহ্র এককত্ব, প্রতিপালকত্ব ও অপার প্রজ্ঞা-পরাক্রমের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আলোচ্য আয়াতে এই অনন্যসাধারণ প্রমাণগুলির প্রতিই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্ই এগুলোর একক স্রষ্টা। 'ফী ফালাকিঁ ইয়্যাস্‌বাহূন' অর্থ প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। 'ফালাকুন' অর্থ কক্ষপথ। শব্দটির বহুবচন 'আফলাকুন'। গোলাকার বৃত্তকে আরবী ভাষায় বলে 'ফালাক'। উল্লেখ্য যে, নক্ষত্রসমূহ গোলাকার কক্ষপথে বৃত্তাকারে সতত ঘূর্ণায়মান। কাতাদা বলেছেন, 'ফালাকুন' অর্থ আকাশ, যার মধ্যে নক্ষত্রপুঞ্জ বিদ্যমান এবং প্রতিটি নক্ষত্র তাদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। কালাবী বলেছেন, আকাশের বৃত্তাকৃতিকে বলে 'ফালাক'। কেউ কেউ বলেছেন, আকাশের নিচের ঢেউয়ের মতো স্থানকে বলে 'ফালাক', যার মধ্যে চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রসমূহ বিচরণ করে।

আমি বলি, 'ফালাকুন' অর্থ আকাশ-ই। আর পৃথিবীর আকাশেই পরিক্রমণ করে গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ। এখানকার 'ফালাকিন' শব্দটির তান্‌ভিন একথাই প্রকাশ করছে যে, প্রতিটি নক্ষত্র পরিক্রমণ করে তাদের আপনাপন কক্ষপথ। প্রত্যেকের রয়েছে সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ। কিন্তু আরবী ভাষার রীতি অনুসারে একবচনরূপে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফালাক'। যেমন আরববাসীরা বলে, সর্দার তাদের সকলকে পোশাক পরিয়েছে। কথাটির অর্থ— সর্দার তাদের প্রত্যেককে এক একটি পোশাক পরিয়েছে।

'ইয়াসবাহুন' অর্থ বিচরণ করে। অর্থাৎ মাছ যেমন পানিতে দ্রুত ও স্বাভাবিকভাবে বিচরণ করে, তেমনি স্বাভাবিক নিয়মের গতিতে আকাশের কক্ষপথে বিচরণ করে নক্ষত্রসমূহ।

আবু জাও সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, রসুল স.কে যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর মহাপ্রস্থানের সংবাদ জানানো হলো, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমার পরে আমার উম্মতের তত্ত্বাবধায়ক কে হবে? তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ○

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ○

❒ আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করি নাই, সুতরাং তোমার মৃত্যু হইলে উহারা কি চিরজীবি হইবে?

❒ জীব মাত্রই মরণশীল; আমি তোমাদিগকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার পূর্বেও আমি অনেক মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের কাউকেই চিরকাল পৃথিবীতে রাখিনি। নির্দিষ্ট হায়াত শেষে সকলকেই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে— এটাই আমার চিরন্তন বিধান। আপনার শত্রুরা আপনার মহাপ্রস্থানের অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু নিজেদের মৃত্যু সম্পর্কে তারা উদাসীন। কী ভেবেছে তারা? মৃত্যু কি তাদের হবে না?

'খুল্‌দ' অর্থ অনন্তজীবন, মৃত্যুহীন জীবন। বাগবী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা বলতো, মোহাম্মদ তো আর চিরদিন বেঁচে থাকবে না। তারপর আমাদের রাজত্ব। তাদের একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তাদের অপবিত্র ধারণাকে শেষে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে এভাবে— তারা কি চিরজীবি হবে?

এর পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'জীব মাত্রই মরণশীল; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।' একথার অর্থ— জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যুবরণ করতে হবে, এটা আমার অনড় বিধান। আমি তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠাই মন্দ ও ভালো দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করবার জন্য। পরীক্ষার নির্ধারিত সময় শেষ হলে তোমাদেরকে দান করি মৃত্যু। ওই মৃত্যুর মাধ্যমে তোমরা সকলেই প্রত্যানীত হবে আমার নিকটে।

এখানে 'বিশ্‌শাররি ওয়াল খইরি' অর্থ মন্দ ও ভালো। অর্থাৎ কঠোরতা-নম্রতা, সুস্থতা-অসুস্থতা, স্বচ্ছলতা-দারিদ্র,অনুকূলতা-প্রতিকূলতা, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি। এসকল কিছুর মাধ্যমে পৃথিবীতে আমি পরীক্ষা করি তোমাদেরকে, যেনো সর্বসমক্ষে এ বিষয়টি প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, কে কৃতজ্ঞ, কে অকৃতজ্ঞ, কে ধৈর্যশীল এবং কে ধৈর্যচ্যুত।

'ওয়া ইলাইনা তুরজ্বাউ'ন' অর্থ আমারই নিকটে তোমরা প্রত্যানীত হবে। অর্থাৎ যখন তোমরা আমার সকাশে উপস্থিত হবে, তখন আমি তোমাদেরকে যথাপ্রতিফল প্রদান করবো— কৃতজ্ঞতা ও সহিষ্ণুতার জন্য স্বস্তি এবং অকৃতজ্ঞতা ও ধৈর্যহীনতার জন্য শাস্তি।

সুদ্দী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন— একবার আবু জেহেল ও আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে রসুল স. কোথাও গমন করছিলেন। তাঁকে দেখে আবু জেহেল হাসতে শুরু করলো। তাচ্ছিল্যের স্বরে আবু সুফিয়ানকে বললো, এই দেখো, বনী আব্‌দে মান্নাফের নবী। আবু সুফিয়ান এ কথায় খুব রাগান্বিত হলো। বললো, আব্‌দে মান্নাফ গোত্রের কেউ নবী হলে তোমার হিংসা লাগে কেনো। রসুল স. তাদের আলোচনা শুনে ফেললেন। ফিরে এসে আবু জেহেলকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার মনে হচ্ছে, তোমার চাচার উপরে যে মুসিবত নেমে এসেছিলো সেই মুসিবত তোমার উপরে পতিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি ক্ষান্ত হবে না। একথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১

وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

❒ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা যখন তোমাকে দেখে তখন উহারা তোমাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে। উহারা বলে, 'একি সেই যে তোমাদিগের দেব-দেবীগুলির সমালোচনা করে?' উহারাই তো 'রহমান' এর উল্লেখের বিরোধিতা করে।

❒ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাইব, সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করিতে বলিও না।

❒ এবং উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল এই প্রতিজ্ঞা কখন পূর্ণ হইবে?'

❐ হায়, যদি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেই সময়ের কথা জানিত যখন উহারা উহাদিগের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে অগ্নি প্রতিরোধ করিতে পারিবে না এবং উহাদিগকে সাহায্য করাও হইবে না।

❐ বস্তুতঃ উহা উহাদিগের উপর আসিবে অতর্কিতভাবে এবং উহাদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া দিবে; ফলে, উহারা উহা রোধ করিতে পারিবে না এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।

❐ তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছিল; পরিণামে তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল তাহা বিদ্রূপকারীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মক্কার অংশীবাদীরা আপনার প্রতি তাচ্ছিল্য ভরে দৃষ্টিপাত করে। আপনাকে বানায় তাদের বিদ্রূপের পাত্র। বলে, দেখো, এই হচ্ছে সেই লোক, যে তোমাদের দেব-দেবীদের প্রতিমাগুলোর নিন্দা করে।

এখানে 'হুয্ওয়ান' অর্থ বিদ্রূপের পাত্র। আর এখানকার 'ইয়াজকুরু' (স্মরণ করে) কথাটির অর্থ নিন্দা বা সমালোচনা করে । উল্লেখ্য যে, শত্রুকে স্মরণ করা হয় নিন্দা-সমালোচনার সঙ্গেই, আর বন্ধুকে স্মরণ করা হয় প্রশংসা ও ভালোবাসার সঙ্গে। তাই পাত্রভেদে 'জিকির' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় বিপরীতার্থক। যেমন— 'ফুলানুন ইয়াজকুরু ফুলানান' অর্থ অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির সমালোচনা করে এবং 'ফুলানুন ইয়াজকুরুল্লহ' অর্থ অমুক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জিকির করে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উত্তম গুণাবলী বর্ণনা করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারাই তো 'রহমান' এর উল্লেখের বিরোধিতা করে।' একথার অর্থ— অথচ বিদ্রূপের পাত্র তারাই। কারণ তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, মিথ্যাশ্রয়ী। তারা অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র এককত্বকে, অংশীবিহীন হওয়াকে, কিতাব অবতীর্ণ হওয়াকে এবং রসুল প্রেরণ করাকে। অথবা তারা অস্বীকার করে কোরআনকে এবং বলে, আল্লাহ্‌কে 'রহমান' বলা ঠিক নয়। আমরা তো ইয়ামামার মুসায়লামা ব্যতীত অন্য কোনো রহমানকে চিনি না ইত্যাদি।

এর পরের আয়াতে (৩৭)বলা হয়েছে— 'মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ।' একথার অর্থ— চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা মানুষের একটি স্বভাবজ বৃত্তি। তাই তাদের পক্ষে সুস্থির, সহিষ্ণু ও শান্ত হওয়া কঠিন। এসকল মহৎ গুণাবলী থেকে চাঞ্চল্য প্রবণতার কারণেই তারা বার বার স্খলিত হয়ে পড়ে। তাই তাদের এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করে এখানে বলা হয়েছে— মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ।

মানুষের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে তাদের স্বভাবের প্রবলতম বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে। তাই লোকে বলে, অমুক ব্যক্তি রাগী, অমুক ব্যক্তি দানশীল ইত্যাদি। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, যখন হজরত আদমের মস্তক ও চোখের মধ্যবর্তী স্থানে আত্মার সম্পাত ঘটানো হলো, তখন তৎক্ষণাৎ তিনি দৃষ্টিপাত করলেন জান্নাতের ফলভরা বৃক্ষের দিকে। যখন আত্মা প্রক্ষেপিত হলো উদরে, তখন তাঁর হৃদয়ে জাগলো ওই ফল ভক্ষণের বাসনা। আর যখন আত্মার প্রভাব পতিত হলো তাঁর পায়ে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওই ফল সংগ্রহের জন্য উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু উঠতে যেয়েও পারলেন না। পড়ে গেলেন। তাঁর ওই ব্যতিব্যস্ততার দিকে লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ'। বলা বাহুল্য যে, তাঁর ওই ত্বরাপ্রবণতার প্রভাবই বংশানুক্রমে মানুষের মধ্যে এখনো প্রবহমান। এই ত্বরাপ্রবণতা নিয়ন্ত্রণ না করা হলে মানুষ ধাবিত হয় অবিশ্বাসের দিকে। শত উপদেশও তখন আর তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

আমি বলি, সাফী ও সুফীগণ বলেন, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর প্রতিবিম্ব ও ছায়া। আর সৃষ্টির উৎসারণ ঘটেছে আল্লাহ্‌র বিভিন্ন গুণাবলী থেকে। সে সকল গুণ আবার পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তাই তাঁর নাম কখনো রহীম (দয়ালু) আবার কখনো কাহ্‌হার (অত্যন্ত কঠোর)। 'সবুর' (ধৈর্যশীল) এবং 'সারিউল হিসাব' (দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী) তাঁর পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দু'টো নাম। এই 'সারিউল হিসাব' থেকেই উৎসারিত হয়েছে মানুষের ত্বরাপ্রবণতা। সেদিকে লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে—'মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ।'

একটি প্রশ্নঃ ত্বরাপ্রবণতা যখন আল্লাহ্‌র গুণ থেকে সমাগত, তবে নিশ্চয়ই তা উত্তম। কিন্তু আয়াত দৃষ্টে একথাই মনে হয় যে, ত্বরাপ্রবণতা উত্তম স্বভাব নয়। আরেকটি কথা হচ্ছে, এই স্বভাবটি যদি জন্মগত হয় তবে তা দূর করা তো একটি অসম্ভব ব্যাপার। আর যা অসম্ভব, তাকে পরিবর্তন করার কথাই বা উঠবে কেনো?

উত্তরঃ সত্তাগতভাবে ত্বরাপ্রবণতা মন্দ কিছু নয়। তবে এক্ষেত্রে সীমালংঘন ও অযথার্থ স্থানে এর ব্যবহার অবশ্যই নিন্দনীয়। আল্লাহ্‌তায়ালা নবী রসুলগণের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন— 'তাঁরা সৎকাজের প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়।' ত্বরাপ্রবণতার এরকম ব্যাপার প্রশংসার্হ। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ততা ও অযথার্থতাকে পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে, যা অসম্ভব কিছু নয়। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আদমকে সৃষ্টি

করেছেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে। শুক্রবারে দিনের শেষাংশে শুরু করে সূর্যাস্তের আগেই সম্পন্ন হয়েছিলো তাঁর সৃষ্টি। অন্য সকল কিছু সৃষ্টি করা হয়েছিলো তার আগের দিন। হজরত আদমের ললাটদেশের সঙ্গে যখন রূহকে সম্পৃক্ত করা হলো তখন তিনি নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমাকে সূর্যাস্তের পূর্বেই সম্পূর্ণতা দান করুন। মুজাহিদও এরকম বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো একবারে। আর অন্যান্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয় ধারাবাহিকভাবে, ধাপে ধাপে— শুক্রবিন্দু, জমাটরক্ত, গোশতের টুকরা, এভাবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'আজাল' শব্দটির অর্থ গলিত মাটি, কর্দম বা মাটির খামির। কামুস গ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে। জনৈক কবি বলেছেন—

ওয়ান্ নাবউ' ফিস্‌সাখরাতিস্ সাম্‌মায়ি মামবাতুহু
ওয়ান্ নাখলু তানবুতু মিম্ মাইন্ ওয়ামিন আ'জাল

অর্থঃ নাবা বৃক্ষ অংকুরিত হয় নিবিড় পাথর থেকে, কিন্তু খর্জুর বৃক্ষ জন্ম নেয় পানি ও কাদামাটি থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো, সুতরাং— তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বোলো না।' এখানকার 'নিদর্শনাবলী' কথাটির অর্থ দুনিয়া ও আখেরাতের আযাব। অর্থাৎ বদর যুদ্ধ ও জাহান্নাম। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিকেরা বলে, মোহাম্মদ যা কিছু বলছে তা যদি সত্য হয় তবে তুমি আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করো। কারণ আমরা তাকে মানি না। আপনি তাদেরকে বলুন, যে শাস্তি তোমরা চাও, তা যথাসময়ে অবশ্যই প্রকাশিত হবে। সুতরাং এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে কোনো লাভ নেই। উল্লেখ্য যে, মুশরিকেরা মনে করতো তাদের উপরে কখনোই আযাব আসবে না। আর যদি আসে তবে তা দ্রুতই আসা উচিত। এক বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে নজর বিন হারেসকে লক্ষ্য করে। 'পাথর বর্ষণ করো' এরকম কথা বলেছিলো সে-ই।

এর পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'এবং তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো, এই প্রতিজ্ঞা কখন পূর্ণ হবে?' একথার অর্থ— রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে তারা আরো বলে, তোমরা বার বার বলো তোমাদের কথা না মানলে আযাব আসবে। যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তবে বলো, কখন আসবে আযাব?

এর পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— ' হায়, যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সেই সময়ের কথা জানতো, যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবে না।' একথার অর্থ— অংশীবাদীরা ওই সময়ের কথা জানে না, যখন তাদেরকে অগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টন করা হবে। সেই অগ্নি নির্বাপন হবে তাদের ক্ষমতাবহির্ভূত। আর তখন তাদের কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না। যদি তারা ওই ভয়াবহ পরিণতির কথা জানতো, তবে কিছুতেই তারা আযাব আগমনের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতো না। 'পাথর বর্ষণ করো' এরকম কথাও উচ্চারণ করতো না।

এর পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ তা তাদের উপর আসবে অতর্কিতভাবে এবং তাদেরকে হতবুদ্ধি করে দেবে; ফলে তারা তা রোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।'

এখানে 'তা'তীহিম' (তা তাদের উপর আসবে) কর্তৃবাচক সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত হবে পূর্ববর্তী আয়াতের 'নার' (অগ্নি) কথাটির সঙ্গে, অথবা তৎপূর্ববর্তী 'ওয়া'দু' (প্রতিজ্ঞা) কথাটির সঙ্গে, কিংবা আগের আয়াতের 'হীনা' (সেই সময়ের কথা) এর সঙ্গে। অর্থগত দিক থেকে 'ওয়া'দু' হচ্ছে নির্ধারিত সময় এবং 'হীনা' হচ্ছে সময়। তাই স্ত্রীলিংগ বাচক সর্বনাম তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে।

'বাগ্‌তাতান' অর্থ অতর্কিতভাবে, অকস্মাৎ, হঠাৎ, সহসা। আগের আয়াতে বলা হয়েছিলো 'ওয়ালা হুম ইউনসরুন' (তাদেরকে সাহায্য করাও হবে না)। আর এখানে বলা হলো 'ওয়ালা হুম ইউনজরুন' (তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না)। দু'টো বাক্যেই 'হুম' (তাদেরকে) সর্বনামটি এসেছে ক্রিয়ার পূর্বে। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, সেদিন কেবল তাদেরকেই সাহায্য করা হবে না এবং অবকাশ দেয়া হবে না। পাপী বিশ্বাসীদের বেলায় এরকম অবস্থা ঘটবে না। নবী- রসুল, আউলিয়া, সলিহীন ও ফেরেশতাদের সুপারিশজনিত সাহায্য তারা পাবে। অবকাশও পাবে। আর পাবে ক্ষমার ঔদার্য।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'তোমার পূর্বে অনেক রসুলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিলো; পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিলো, তা বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিলো।' আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দকে সান্ত্বনার বাণী শোনানো হয়েছে এবং সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে দেয়া হয়েছে দোজখের দুঃসংবাদ। আরো বলা হয়েছে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ এখন যেমন তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে, তেমনি করে সেদিন তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে অগ্নি। সেটাই হবে তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের পরিণাম।

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ
اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ
مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ۝ بَلْ مَتَّعْنَا هٰۤؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ
اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝
قُلْ اِنَّمَاۤ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ ۖ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ۝ وَلَئِنْ
مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَاۤ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

❒ বল 'রহমান' হইতে কে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে রাত্রিতে ও দিবসে? 'তবুও উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

❒ তবে কি আমা ব্যতীত উহাদিগের এমন কতগুলি দেব-দেবী আছে যাহারা উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? ইহারা তো নিজদিগকেই সাহায্য করিতে পারে না এবং আমার বিরুদ্ধে উহাদিগের সাহায্যকারীও থাকিবে না।

❒ বস্তুতঃ আমিই উহাদিগকে এবং উহাদিগের পিতৃ পুরুষদিগকে ভোগ-সম্ভার দিয়াছিলাম এবং উহাদিগের আয়ুষ্কালও হইয়াছিল দীর্ঘ। উহারা কি দেখিতেছে না যে আমি উহাদিগের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি। তবুও কি উহারা বিজয়ী হইবে?

❒ বল, 'আমি তো কেবল প্রত্যাদেশ দ্বারাই তোমাদিগকে সতর্ক করি,' কিন্তু যাহারা বধির তাহাদিগকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তাহারা সতর্কবাণী শুনে না।

❒ তোমার প্রতিপালকের শাস্তির কিছুমাত্রও উহাদিগকে স্পর্শ করিলে উহারা বলিয়া উঠিবেই, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদিগের, আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, রহমান থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে রাত্রিতে ও দিবসে?' হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির তাফসীর করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আল্লাহ্ যদি তোমাদেরকে শাস্তি দিতে চান, তবে কে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে? অথবা অর্থ হবে— আল্লাহ্র আযাব যদি তোমাদের উপরে আপতিত হয়, তবে তোমাদেরকে রক্ষা করবে কে? অর্থাৎ আল্লাহ্র রহমত ছাড়া আল্লাহ্র শাস্তি থেকে উদ্ধার প্রাপ্তির কোনো উপায়ই নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবুও কি তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।' একথার অর্থ— তাদেরকে আল্লাহ্‌র ভয় দেখাও। কিন্তু তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন তো নিরর্থক। তারা যে আল্লাহ্‌র আদেশ ও উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অথবা অর্থ হবে— রহমান সম্পর্কে তাদের অন্তরে তো কোনো চিন্তা -ভাবনাই নেই। তাহলে তারা তাঁকে ভয়ই বা পাবে কেমন করে?

পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'তবে কি আমা ব্যতীত তাদের এমন দেব-দেবী আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তারা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারে না এবং আমার বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারীও থাকবে না।' এখানে 'তামনাউ'হুম' অর্থ— এমন উপাস্য যে আমার শাস্তি থেকে তাদেরকে বাঁচাতে পারবে। 'তারা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারে না।' অর্থ ওই সকল তথাকথিত দেব-দেবীর তো আত্মরক্ষা করারও ক্ষমতা নেই। তাদের শরীরে মাছি বসলে সে মাছি তাড়াবার ক্ষমতাও তো তাদের নেই। আর 'আমার বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারীও থাকবে না' অর্থ সেদিন নবী, ওলী ও ফেরেশতাদের সুপারিশের সাহায্য পাবে কেবল গোনাহ্‌গার ইমানদারেরা, অংশীবাদীরা এরকম সাহায্য কিছুতেই পাবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— ওই সকল দেব-দেবীও তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। বরং তাদেরকেও শাস্তি দেয়া হবে তখন। এরকম কথা উচ্চারিত হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— ' এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যে সকল দেবদেবীর উপাসনা তোমরা করো সকলকেই করা হবে জাহান্নামের জ্বালানী।' মুজাহিদ এখানকার 'ইউস্‌হাবুন' কথাটির অর্থ করেছেন 'ইউনসারুন।' অর্থাৎ তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে সুপারিশ করার জন্য কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না এবং অন্য কোনো ভাবেও সাহায্য করা হবে না।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ আমিই তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলাম এবং তাদের আয়ুষ্কালও হয়েছিলো দীর্ঘ।' একথার অর্থ— পূর্ববর্তী যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আমি দিয়েছিলাম ভোগ-সম্ভারের বিভিন্ন উপকরণ। তাদেরকে দীর্ঘ হায়াতও আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা মনে করতো তাদের পূজিত প্রতিমাগুলোই তাদেরকে দিয়েছে দীর্ঘ জীবন ও সম্পদ। এরকমও বলা যেতে পারে যে— দীর্ঘ জীবন ও প্রতুল বৈভবকে তারা মনে করতো এটা তাদের অধিকার। আর তাদের জীবন ও সম্পদ কখনো শেষ হবে না। কিন্তু তা নয়। সেটা ছিলো সত্যোপলব্ধির জন্য আমার পক্ষ থেকে প্রদত্ত অবকাশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওরা কি দেখছে না যে, 'আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আনছি। তবুও কি ওরা বিজয়ী হবে?' এখানে 'আল আরদ্ব' অর্থ কাফেরের দেশ, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী-অধিকৃত ভূমি। 'নানকুসুহা' কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে, আমি তাদের অধিকৃত ভূমি ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের অধিকারে দিয়ে দিচ্ছি। মুসলমানদের সাম্রাজ্য হচ্ছে বিস্তৃত আর তাদের রাজ্য হচ্ছে ক্রমশঃ সংকুচিত। এমতাবস্থায় আমার রসুলের বিরুদ্ধে তারা বিজয়ী হওয়ার আশা করে কেনো?

এর পরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'বলো' আমি তো কেবল প্রত্যাদেশ দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি; কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সতর্কবাণী শোনে না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদের বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা একথা বুঝতে পারছো না কেনো যে, আমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ্র ভয় দেখাচ্ছি না। আমি যা কিছু বলছি, তা আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ, যা নিঃসন্দিগ্ধ। সুতরাং তোমরা এ প্রত্যাদেশ অমান্য কোরো না। কিন্তু হে আমার নবী! এভাবে তাদেরকে বুঝিয়েই বা কি করবেন। তারা যে বধির। সত্যের সংবাদ তাদের শ্রুতিকে সচকিত করেই না।

এরপরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের শাস্তির কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা বলে উঠবেই, হায় দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।' হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'নাফখাতুন' এর অর্থ করেছেন— কিছুমাত্র। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— সামান্য কিছু। ইবনে জারীর বলেছেন, শব্দটির অর্থ একটি অংশ। যেমন বলা হয়— 'নাফাখা ফুলানুন লি ফুলানিন্।' (অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তিকে তার নিজের সম্পদের একটি অংশ দিয়েছে)। কেউ কেউ বলেছেন, মারা, আঘাত করা। যেমন— 'নাফাখাতিদ্ দাব্বাতু বি রিজলিহা' (ঘোড়া তার পায়ের দ্বারা আঘাত করেছে)। অবশ্য 'নাফাখাতুন' এর শাব্দিক অর্থ সুবাসিত বাতাসের প্রবল প্রবাহ।

'মাস্সুন' অর্থ ছুঁয়ে যাওয়া সামান্য প্রলেপ। এর মধ্যে 'তা' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে কথাটিকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য (মাস্সাত)। এভাবে 'মাস্সাতহুম নাফখাতুন' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে— বড় ধরনের আযাব প্রকাশিত হওয়ার আগে যদি সেই শাস্তির কিছুমাত্রও তাদের স্পর্শ করে, তবু তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে বসবে হায় কপাল! আমরা তো সীমালংঘনকারীই ছিলাম।

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ○ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ○ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ○ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ۖ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○

❒ এবং কিয়ামত-দিবসে আমি স্থাপন করিব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কাহারও প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও উহা আমি উপস্থিত করিব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।

❒ আমি তো মূসা ও হারুনকে দিয়াছিলাম ফুরকান, আলো ও উপদেশ, সাবধানীদিগের জন্য—

❒ যাহারা না দেখিয়াও তোমাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত।

❒ ইহা কল্যাণময় উপদেশ; আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি। তবুও কি তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের মানদণ্ড।' এখানে 'আল ক্বিস্ত' অর্থ মানদণ্ড। এর পূর্বে 'ন্যায় বিচারের' কথাটি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য কথাটি সহ-ই এখানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'ন্যায়বিচারের মানদণ্ড।' অথবা 'মানদণ্ড' অর্থই ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। 'ক্বিস্ত' শব্দটি হচ্ছে শব্দমূল।

'লিইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ্' (কিয়ামতের দিবসে) কথাটির 'লাম' অব্যয়টির অর্থ এখানে 'ফী' (তে)। অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসেতে বা কিয়ামতের দিবসে। অথবা 'ইয়াওমা' (দিবসে) কথাটির পূর্বে 'বিনিময় প্রদানের জন্য' কিংবা 'কিয়ামত-বাসীদের জন্য' কথাটি এখানে রয়েছে উহ্য। এভাবে সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— আমি কিয়ামত দিবসে কিয়ামতবাসীদের জন্য অথবা তাদেরকে বিনিময় প্রদানের জন্য স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের মানদণ্ড।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'মানদণ্ড' দ্বারা এখানে পাল্লা, নিক্তি বা অন্য কোনো ধরনের পরিমাপক যন্ত্র স্থাপনের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সকলের হিসাব নিকাশ ও আমলের বিনিময় প্রদানের কথা। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমামগণের অভিমত কিন্তু এরকম নয়। তাঁদের মতে অবশ্যই সেদিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড পাল্লার আকৃতিতে স্থাপন করা হবে। ইবনে মোবারক তাঁর আজ্‌জুহুদ এবং আজরী তাঁর আশ্‌শরিয়ত গ্রন্থে হজরত সালমান কর্তৃক অপরিণত সূত্রবিশিষ্ট এক হাদিসে লিখেছেন, মীযানের (পাল্লার) মুখ হবে একটি এবং বাহু হবে দুটি। ইবনে হাব্বান তাঁর তাফসীরে কালাবী সূত্রে এরকমই বলেছেন। আরো বলেছেন আবু সালেহ্ হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে। ইবনে মারদুবিয়া তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন মীযানের দুটি পাল্লার মতো করে।

বায়হাকী হজরত ইবনে ওমরের একটি বর্ণনার সঙ্গে হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে জিবরাইলের শেষাংশ যুক্ত করে বলেছেন, জিবরাইল জিজ্ঞেস করলেন, ইমান কী? রসুল স. বললেন, ইমান হচ্ছে— আল্লাহ্, ফেরেশতা, নবী-রসুল, জান্নাত, জাহান্নাম ও মীযানকে বিশ্বাস করা। আরো বিশ্বাস করা যে— পুনরুত্থান সত্য ও তকদীর সত্য। জিবরাইল বললেন, এগুলো মানলেই কি আমি ইমানদার হয়ে যাবো? তিনি স. বললেন হ্যাঁ। জিবরাইল বললেন, আপনি সত্য বলেছেন।

হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে এবং সঠিক আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, হজরত সালমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন মীযান প্রতিষ্ঠিত হবে। ওই মীযানে আকাশ ও পৃথিবীরও সংকুলান হবে।

তিরমিজি ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক উত্তম আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, হজরত আ'মাস বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! দয়া করে কিয়ামতের দিন আমার জন্য শাফায়াত করবেন। তিনি স. বললেন, করবো। আমি বললাম, তখন কোথায় পাবো আপনাকে? তিনি স. বললেন, প্রথমে খুঁজে দেখবে মীযানের কাছে। আমি বললাম, সেখানে যদি না পাই? তিনি স. বললেন, তাহলে খুঁজবে পুলসিরাত অথবা হাউজের কাছে। তখন ওই তিন স্থান ছাড়া অন্য কোথাও আমি থাকবো না।

হাকেম, বায়হাকী ও আজরীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! মহাবিচারের দিবসে আপনারা (পুরুষেরা) কি তাদের আপনাপন স্ত্রীদের কথা মনে রাখবেন?

রসুল স. বললেন, তিনটি স্থানে কেউ কারো কথা মনে রাখতে পারবে না। ১. ওই স্থান, যেখানে প্রতিষ্ঠা করা হবে মীযান, যতক্ষণ না তার মাধ্যমে পাপ-পুণ্যের ওজন শেষ হয়। ২.পুলসিরাতের স্থানে, যতক্ষণ না কেউ পুলসিরাত পার হয় এবং ৩. ওই স্থানে, যেখানে আমলনামা পিছন থেকে উড়ে এসে পড়বে সকলের ডান অথবা বাম হাতে, যতক্ষণ না কেউ তার আমলনামা হাতে পায়। এরকম আরো অনেক হাদিস রয়েছে, যেখানে মীযান বা পাল্লার কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। সুরা আল 'ক্বারিয়া'হ্'র তাফসীরে আমি এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছি।

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত দাউদ একবার আবেদন করলেন, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে মীযান দেখিয়ে দিন। আল্লাহ্পাক তাঁর আবেদন গ্রহণ করলেন। মীযান দেখিয়ে দিলেন তাঁকে। তিনি দেখলেন, মীযানের বাহু দু'টি বিশাল— পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে হজরত দাউদ বেহুঁশ হয়ে গেলেন। হুঁশ ফিরে পাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার আল্লাহ! এমন কে আছে যে তার পুণ্য দিয়ে এই বিশাল পাল্লার এক বাহু পূর্ণ করবে? আল্লাহ্ বললেন, হে আমার প্রিয় নবী! আমি কারো প্রতি প্রসন্ন হলে তার একটি খেজুর দানের কারণেই আমি পূর্ণ করে দিবো তার নেকির পাল্লা।

'মাওয়াযীনা' শব্দটি বহুবচন। এখানে শব্দটির বহুবচনরূপে প্রয়োগ করার কারণ স্বরূপ নাসাফী তাঁর 'বাহ্রুল কালাম' গ্রন্থে লিখেছেন, ১. প্রত্যেক মীযান হবে পৃথক পৃথক। ২. অথবা বহুবচনকেই এখানে একবচনের অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। এরকম শব্দরূপ ব্যবহার করা হয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'ফানাদাত্হুল মালাইকাতু'। এখানে 'মালাইকাতু' বহুবচন হলেও এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে কেবল হজরত জিবরাইলকে। আবার— 'ইয়া আইয়্যুহার রসূলু কুলু মিনাত ত্বইয়েবাত', এখানেও 'আররসূলু' বহুবচন হওয়া সত্ত্বেও এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে কেবল রসুল স.কে। ৩. কিংবা মীযানের প্রত্যেক অংশকে মীযান ধরে নিয়ে সম্পূর্ণ মীযানকে এখানে বলা হয়েছে 'আল মাওয়াযীনা'। যেমন 'সারাবিলুন' বহুবচন হলেও এর দ্বারা বুঝানো হয় পাজামা বা সেলওয়ারকে। এর একবচন হচ্ছে 'সারাবিলাতুন'। আর পাজামার প্রতিটি অংশকে বলে 'সারাবিলাহ্'। আর সকল অংশকে একত্রে বলা হয় 'সারাবিলুন'।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না'। একথার অর্থ— কাউকে সেদিন তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে না। পুণ্য বা পাপ কোনো ক্ষেত্রেই ঘটানো হবে না কোনো সংযোজন অথবা বিয়োজন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করবো'। একথার অর্থ— ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পুণ্য অথবা পাপও সেদিন ওজনের জন্য উপস্থিত করবো আমি।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহাবিচারের দিনে প্রত্যেকের প্রতিটি পুণ্য ও পাপ ওজন করা হবে। পাপাপেক্ষা পুণ্য যদি কারো একটিও বেশী হয়, তবে তাকে প্রবেশ করানো হবে বেহেশতে। আর কারো পুণ্যাপেক্ষা পাপ একটি বেশী হলেও তাকে প্রবেশ করানো হবে দোজখে। তিনি একথাও বলেছেন যে, শস্যদানা পরিমাণ পুণ্য অথবা পাপ বেশী হওয়ার কারণেই মীযানের পাল্লা ভারী অথবা হাল্‌কা হবে। আর যার পুণ্য পাপ সমান হবে, তাকে রাখা হবে আ'রাফে, অথবা পুলসিরাতের নিকটে।

এরপর বলা হয়েছে— 'হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।' সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'হাসিবীন' অর্থ মুহ্‌সিয়ীন' (গণনার অন্তর্ভুক্তকারী)। 'হাসাবুন' অর্থ পরিমাপ করা। হজরত ইবনে আব্বাস শব্দটির অর্থ করেছেন, অবগত ব্যক্তি, স্মরণকারী ব্যক্তি, যে তার গণনা বা পরিমাপ সম্পর্কে নিশ্চিত, সম্যক জ্ঞাত। এভাবে শব্দটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌র চেয়ে অন্য কারো জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতা অধিক নয়।

এর পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'আমি তো মুসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম ফুরক্বান, আলো ও উপদেশ, সাবধানীদের জন্য—' এখানে 'আল ফুরক্বান' অর্থ তওবাত শরীফ, যা ছিলো সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যনির্দেশক।

'দ্বীয়াআন' অর্থ নূর, আলো, জ্যোতি। অর্থাৎ মূর্খতা ও অবিশ্বাসের অন্ধকারে যে দিশাহারা, তার জন্য তওরাত ছিলো পথের আলো। 'জিক্‌রাল লিল মুত্তাক্বীন' অর্থ সাবধানীদের জন্য উপদেশ, হেদায়েত, স্মারক। অথবা শরিয়তের বিধান। উল্লেখ্য যে, তওরাতের বৈশিষ্ট্য ছিলো তিনটি— সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য, আলো ও উপদেশ।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'ফুরক্বান' অর্থ শত্রুর উপরে বিজয়। আল্লাহ্ বদর-বিজয়কে বলেছেন 'ইয়াওমুল ফুরক্বান'। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সমুদ্রের পানি পৃথক করে দিয়ে তার মধ্য দিয়ে হজরত মুসা, হজরত হারূন ও তাঁদের অনুসারীদের জন্য সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিলো পথ। ওই পথকেই এখানে বলা হয়েছে 'ফুরক্বান'। এই অভিমতানুসারে 'দ্বিয়াআন' ও জিকরান' কথা দুটোর অর্থ হবে তওরাত, যে তওরাতের আলোকে পথপ্রদর্শন করা হয়েছিলো বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে।

এর পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'যারা না দেখেও তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত।' এখানে বর্ণনা করা হয়েছে মুত্তাকী বা সাবধানীদের দু'টি বৈশিষ্ট্য— ১. না দেখে আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং ২. কিয়ামতের ভাবনায় ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া। যারা সাবধানী নয়, তাদের এই বৈশিষ্ট্য দু'টো নেই।

এর পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'এটা কল্যাণময় উপদেশ; আমি এটা অবতীর্ণ করেছি। তবু কি তোমরা একে অস্বীকার করো?' এখানে 'হাজা'

(এটা) অর্থ এই কোরআন। 'জিক্‌রুম্ মুবারাকুন' অর্থ মহাকল্যাণময় নির্দেশনা বা উপদেশ। এখানকার 'অবতীর্ণ করেছি' কথাটির অর্থ— অবতীর্ণ করেছি মোহাম্মদের উপর। আর এখানকার 'আনতুম' (তোমরা) শব্দটির মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে মক্কাবাসীদেরকে।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নরূপে। এভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে— হে মক্কাবাসী! মহাকল্যাণময় উপদেশরূপে তোমাদের সম্প্রদায়ভূত এক সর্বোন্নত চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপরে আমিই অবতীর্ণ করেছি এই কোরআন। সুতরাং একে অস্বীকার কোরো না।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭,

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ○ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ○ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ○ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ○ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ○

❒ আমি তো ইহার পূর্বে ইব্‌রাহীমকে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দিয়াছিলাম এবং আমি তাহার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।

❒ যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, 'এই যে মূর্তিগুলি, যাহাদিগের পূজায় তোমরা রত রহিয়াছ, এইগুলি কী?'

❒ উহারা বলিল, 'আমরা আমাদিগের পিতৃপুরুষগণকে ইহাদিগের পূজা করিতে দেখিয়াছি।'

❒ সে বলিল, 'তোমরা নিজেরা তো রহিয়াছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে, তোমাদিগের পিতৃপুরুষগণও ছিল।'

❒ উহারা বলিল,'তুমি কি আমাদিগের নিকট সত্য আনিয়াছ, না তুমি কৌতুক করিতেছ?'

❒ সে বলিল, 'না, তোমাদিগের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিতেছি।'

❒ 'শপথ আল্লাহের, তোমরা চলিয়া গেলে আমি তোমাদিগের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করিব।'

'রুশ্‌দ' অর্থ তওহীদ বা আল্লাহ্‌র এককত্বে বিশ্বাস, মূর্তিপূজা থেকে বৈমুখ্য। শব্দটির সম্পর্ক হজরত ইব্রাহিমের নামের সঙ্গে হওয়ার কারণে একথাই প্রমাণিত হয় যে, তওহীদের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যুচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন । আর 'মিন ক্ববলু' (এর পূর্বে) অর্থ হজরত মুসা ও হজরত হারূনের পূর্বে। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— মোহাম্মদের উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হচ্ছে। এভাবে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি কোনো নতুন বিষয় নয়। এটা আমার চিরন্তন বিধান। মানুষের সংশোধনের নিমিত্তে আমি এভাবে যুগে যুগে আমার মনোনীত বার্তাবাহকগণের উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করে থাকি। যেমন মুসা ও হারূনের অনেক পূর্বে আমি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেছিলাম ইব্রাহিমের উপরে। তাকে দিয়েছিলাম ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান এবং আমি তার অবস্থা সম্পর্কে ছিলাম সম্যক জ্ঞাত।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'এরপূর্বে' কথাটির অর্থ হবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে। অর্থাৎ ওই সময়ে যখন তিনি অতিক্রম করছিলেন শৈশবকাল এবং যখন তিনি গুহা থেকে বের হয়ে এসে নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিলেন— নিশ্চয় আমি আমার মুখ ফিরালাম আকাশ, পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার প্রতি..........। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— আমি তো প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় পৌছানোর পূর্বেই ইব্রাহিমকে দিয়েছিলাম নবুয়তের জ্ঞান, যেমন জ্ঞান দান করেছিলাম ঈসাকে। কোরআনে আমি সেকথা বলেছি এভাবে— আমি তাকে শৈশবেই জ্ঞান দান করেছিলাম (সুরা মারয়াম) অথবা মর্মার্থ হবে — নবুয়তের দায়িত্বদানের পূর্বে আমি ইব্রাহিমকে দিয়েছিলাম রুশ্‌দ্‌ (ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান)।

'আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।' অর্থ আমি একথা ভালো করেই জানতাম যে, ইব্রাহিম ছিলো হেদায়েত ও নবুয়তের দায়িত্ব বহনের যোগ্য, কেননা তার মাবদায়ে তায়্যুন (সূচনাস্থল) ছিলো আমার 'হাদী' ও 'আলীম' নাম। তাই তার উপরে সতত বিচ্ছুরিত হতো হেদায়েত ও এলেমের নূর।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললো, এই যে মূর্তিগুলো, যাদের পূজায় তোমরা রত, এগুলো কী?'

একথার অর্থ— মূর্তিপূজক পিতা ও তার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে হজরত ইব্রাহিম একবার অবজ্ঞাভরে বললেন, এই মূর্তিগুলো তো প্রাণহীন, অসার। তবুও তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এগুলোকে পূজো করে চলেছো কেনো?

এর পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে—'ওরা বললো, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এদের পূজা করতে দেখেছি।' একথার অর্থ— মূর্তিপূজকেরা হজরত ইব্রাহিমের কথায় হতচকিত হয়ে গেলো। তাই যুক্তিসংগত কোনো উত্তর না দিতে পেরে কেবল বললো, আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এরকমই করতে দেখেছি।

এর পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে—'সে বললো, তোমরা নিজেরা তো রয়েছো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে, তোমাদের পিতৃপুরুষগণও ছিলো।' একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম বললেন, তোমরা বিভ্রান্ত। তোমাদের পূর্বপুরুষগণও তাই। প্রতিমা কি কখনো কারো কল্যাণ অথবা অকল্যাণ করতে পারে?

এর পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছো, না তুমি কৌতুক করছো? এ কথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিমের কথা শুনে তারা হয়ে পড়লো বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ। বললো, তুমি আমাদের সম্মানিত পিতৃপুরুষগণকে দোষারোপ করছো কেনো? তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার পরেও কি তুমি মনে করো তুমিই সত্য? না এটা তোমার কৌতুক।

এর পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'সে বললো, না, তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি।' এখানে 'ফাত্বরাহুন্না' (যিনি এদেরকে সৃষ্টি করেছেন) কথাটির অর্থ পূর্ব দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে এদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন। কথাটির পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, 'তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক।' হজরত ইব্রাহিম তাঁর বক্তব্য এভাবে উপস্থাপন করেছেন এ কারণে যে, তারা সম্রাট নমরুদকে প্রতিপালকরূপে জানতো। আর নমরুদ বলতো, আমিও জীবনদান করি ও মৃত্যু ঘটাই। মূর্তিপূজকদের এই ধারণা প্রতিহত করার জন্যই তাই হজরত ইব্রাহিম তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এভাবে— তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। যিনি এগুলোকে অস্তিত্বায়িত করেছেন। আর আমি এই সত্যবাণীর সাক্ষ্যদাতা। আর এখানে 'বাল' শব্দটির দ্বারা একথাই প্রকাশ পেয়েছে যে, আমি কোনো কৌতুক করছি না। সত্য সাক্ষ্য প্রদান করছি। আর দ্যাখো আকাশ ও পৃথিবী নিজেরাই তাদের সৃষ্টিকর্তার সাক্ষ্যদাতা, যিনি অংশীবিহীন এবং যিনি একমাত্র মাবুদ (উপাস্য) হওয়ার যোগ্য। আমিও এভাবে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর আন্তরিক ও মৌখিক সাক্ষ্য দেই।

এর পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।' এখানে 'কাইদা' অর্থ কৌশলগত ব্যবস্থা। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'তাল্লহি' কথাটির 'তা' অক্ষরটি শপথের অর্থ প্রকাশক। 'আল্লাহ্‌র শপথ' একথা বোঝানোর জন্য সাধারণত ব্যবহৃত হয় 'ওয়াল্লহ্' কিন্তু 'ওয়াও' অক্ষরটি বিস্ময়কর কোনো শপথ প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। একই সঙ্গে শপথ ও বিস্ময় প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় 'তা' অক্ষরটি। তাই এখানে ওয়াল্লহ্ না বলে বলা হয়েছে তাল্লহ্। উল্লেখ্য যে, তখন রাজত্ব ছিলো নমরুদের। মূর্তিপূজা ও মূর্তিপূজকদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলো সে। তাই তার রাজত্বে মূর্তি উচ্ছেদ করা ছিলো একটি বিস্ময়কর ও দুঃসাহসিক কর্ম। সে কারণেই এখানে বিস্ময় প্রকাশক শপথবাক্য উচ্চারণের পর ব্যবহৃত হয়েছে 'কাইদা' শব্দটি। আর এখানে 'মুদবিরীন' অর্থ তোমরা চলে গেলে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে কৌশলগত কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন অবশ্যই করবো।

বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম একথা বলেছিলেন নিম্নকণ্ঠে। উপস্থিত জনতার মধ্যে মাত্র একজন এ কথা শুনেছিলো, সে-ই সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলো যে, ইব্রাহিম কিন্তু আমাদের প্রতিমাগুলো সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছে। আমি একথা স্বকর্ণে শুনেছি।

সুদ্দী লিখেছেন, নমরুদের শহরের লোকেরা একটি বাৎসরিক মেলা বসাতো। মেলা থেকে ফিরে এসে প্রতিমাগুলোকে প্রণতি জানানোর পর তারা প্রবেশ করতো আপনাপন গৃহে। বছরের শেষে যখন মেলার সময় হলো, তখন তাঁর পিতা তাঁকে বললো, চলো মেলায় যাই। আমাদের সমাবেশে আন্তরিকতার সঙ্গে ওঠা বসা করো। দেখবে, আমাদের প্রথা, মতাদর্শ ও নিয়ম সবকিছু সুন্দর। হজরত ইব্রাহিম তার কথামতো তার সাথে কিছু পথ অতিক্রম করলেন। তারপর হঠাৎ মাটিতে বসে পড়ে বললেন, আমার শরীর ঠিক নেই। তিনি এমনভাব দেখালেন, যাতে করে মনে হতে লাগলো, তিনি তাঁর পায়ে ব্যথা পেয়েছেন। তাঁর পিতা অগত্যা তাঁকে ছেড়েই মেলায় চলে গেলো। এভাবে সকল সমর্থ লোক মেলায় চলে গেলো। সম্প্রদায়ের অচল ও অথর্ব লোকদেরকে হজরত ইব্রাহিম প্রতিমাপূজা যে নিষ্ফল ও অসত্য, সে কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন। তারা কেবল শুনে গেলো। কোনো উচ্চ বাচ্য করলো না। এরপর হজরত ইব্রাহিম গেলেন তাদের প্রধান পূজা মণ্ডপে। দেখলেন, একটি বিশাল আকৃতির প্রতিমার আশে পাশে স্থাপন করা হয়েছে আরো অনেক বিভিন্ন আকৃতির প্রতিমা। সেগুলোর সামনে রাখা হয়েছে অনেক রকম খাদ্য সামগ্রী। মেলায় গমনকারীরা যাবার আগে সেগুলো রেখে গিয়েছে প্রতিমাগুলোর আশীর্বাদ লাভের আশায়। মেলা থেকে ফিরে এসে

খাদ্যদ্রব্যগুলো তারা নিজ নিজ ঘরে নিয়ে যাবে, এটাই ছিলো তাদের পরিকল্পনা এবং এটাই ছিলো তাদের প্রথা। হজরত ইব্রাহিম প্রতিমাগুলোকে লক্ষ্য করে বিদ্রূপের স্বরে বললেন, কী ব্যাপার? খাবারগুলো খাচ্ছো না কেনো? কী হলো? কথা বলছো না কেনো? এরপর তিনি মূর্তিগুলোকে ভাঙতে শুরু করলেন এবং বললেন, শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ○ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ○ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ○ قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ○ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ○

❑ অতঃপর সে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল মূর্তিগুলিকে, উহাদিগের প্রধানটি ব্যতীত; যাহাতে উহারা ইহার শরণাগত হয়।

❑ উহারা বলিল, 'আমাদিগের দেবতাগুলির প্রতি এইরূপ করিল কে? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী।

❑ কেহ কেহ বলিল, 'এক যুবককে উহাদিগের সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি; তাহাকে বলা হয় ইব্‌রাহীম।'

❑ উহারা বলিল, 'তাহাকে উপস্থিত কর লোক সম্মুখে, যাহাতে উহারা সাক্ষ্য দিতে পারে।'

❑ উহারা বলিল, 'হে ইব্‌রাহীম তুমিই কি আমাদিগের দেবতাগুলির প্রতি এইরূপ করিয়াছ?'

❑ সে বলিল, 'ইহাদিগের এই প্রধানই তো ইহা করিয়াছে। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ না, যদি ইহারা কথা বলিতে পারে।'

❑ তখন উহারা মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিল এবং একে অপরকে বলিতে লাগিল, 'তোমরাই তো সীমালংঘনকারী?'

❑ অতঃপর উহাদিগের মস্তক অবনত হইয়া গেল এবং উহারা বলিল, 'তুমি তো ভালই জান যে ইহারা কথা বলে না।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলো মূর্তিগুলোকে, তাদের প্রধানটি ব্যতীত, যাতে তারা তার শরণাগত হয়।' এখানকার 'জুযাজান' (চূর্ণ বিচূর্ণ) শব্দটি সংকলিত হয়েছে 'জ্বাজ্‌জুন' থেকে। এর অর্থ কর্তন করা। কোনো কোনো অভিধানবেত্তা বলেছেন, 'জুজাজান' শব্দরূপটি বহুবচনের। এর কোনো একবচন হয় না। 'কাবীরুন' শব্দটির অর্থ এখানে প্রধান প্রতিমা। হজরত ইব্রাহিম ওই প্রতিমাটিকে ভাঙেননি। আর অন্যান্য প্রতিমাকে যে কুঠার দিয়ে তিনি ভেঙেছিলেন, সেই কুঠারটি তিনি ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন প্রধান প্রতিমাটির স্কন্ধে। প্রতিমাপূজকেরা তাদের প্রতিমাগুলোকে মনে করতো জাগ্রত ও জ্ঞানসম্পন্ন। তাই এখানে 'ফাজ্বায়ালাহুম' কথাটির সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনবোধক ও পুংলিংগ বাচক সর্বনামরূপে।

'যাতে তারা তার শরণাগত হয়' কথাটির অর্থ— হজরত ইব্রাহিম জানতেন, 'ভগ্ন প্রতিমাগুলোকে দেখলে লোকেরা প্রথমে তাঁর কাছেই ছুটে আসবে। কারণ তারা জানে তিনি মূর্তি-উপাসনার বিরোধী। তাই একাজ কেবল তাঁর দ্বারাই হওয়া সম্ভব। তারা এলে তিনি তাদেরকে তখন বলতে পারবেন, দেখো, তোমাদের উপাস্যরাও কতো অসহায়। একজন মানুষের মোকাবিলাও তারা করতে পারে না। এদিকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে— 'যাতে তারা তাঁর (ইব্রাহিমের) শরণাগত হয়।' অথবা এখানকার 'এর শরণাগত হয়' কথাটির অর্থ হবে— তারা যেনো শরণপ্রার্থী হয় প্রধান প্রতিমাটির। যেনো তাকেই জিজ্ঞেস করে জেনে নেয় প্রকৃত ঘটনা কি। কিন্তু তাদের প্রধান প্রতিমা অবশ্যই কোনো জবাব দিতে পারবে না। তখন তারা নিজেরাই অপদস্থ হবে। কিংবা 'শরণাগত হয়' কথাটির অর্থ হবে এখানে— তারা যেনো আল্লাহ্‌র শরণাগত হয়। অর্থাৎ প্রতিমাগুলোর অক্ষমতার কথা ভালোভাবে বুঝতে পেরে তারা যেনো ফিরে আসে আল্লাহ্‌র দিকে।

এর পরের আয়াতে(৫৯) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমাদের দেবতাগুলোর প্রতি এরূপ করলো কে? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী।' এখানে 'মান ফায়ালা' (এরূপ করলো কে) কথাটির 'মান' শব্দটি প্রশ্নবোধক এবং এটি 'মাউসুলাও' (যোজক অব্যয়) হতে পারে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যে এরূপ করেছে, সে সীমালংঘনকারী। কেননা সে আমাদের উপাস্যসমূহের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছে। অথবা তাদেরকে ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। কিংবা এমতো গর্হিত অপরাধ করে সে নিজেই নিজের উপরে জুলুম করেছে। প্রশস্ত করেছে তার ধ্বংসের পথ।

এর পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'কেউ কেউ বললো, এক যুবককে এদের সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে বলা হয় ইব্রাহিম।'

এর পরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তাকে উপস্থিত করো লোক সম্মুখে, যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে।' একথার অর্থ— এ সংবাদ পৌঁছে গেলো সম্রাট নমরুদের দরবারে। তখন সে ও তার পারিষদেরা বললো, যদি ইব্রাহিম এ কাজ করে থাকে, তবে তাকে সকলের সামনে এনে উপস্থিত করো। আর এ ব্যাপারে যারা জানে, তাদেরকে উপস্থিত করো সাক্ষী হিসেবে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কাতাদা, হাসান ও সুদ্দী। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, এখানে 'লোকসম্মুখে' কথাটির অর্থ গোত্রনেতা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সম্মুখে। মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, এখানকার 'যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে' কথাটির অর্থ— আমি ওই বিদ্রোহী যুবককে কীরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করতে পারি তা যেনো সকলে এসে স্বচক্ষে দেখে যেতে পারে।

এর পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে ইব্রাহিম! তুমিই কি আমাদের দেবতাগুলোর প্রতি এরূপ করেছো?'

এর পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'সে বললো, এদের এই প্রধানই তো এটা করেছে। এদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো না, যদি এরা কথা বলতে পারে।' প্রধান মূর্তিটির উপরে হজরত ইব্রাহিমের ক্রোধ ও ঘৃণা ছিলো সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ লোকেরা তাকেই সম্মান করতো সবচেয়ে বেশী। তাই তিনি ক্ষোভ প্রকাশার্থে বলেছিলেন, 'এই প্রধান মূর্তিটিই তো এরকম করেছে'। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে— এভাবেই তিনি বিদ্রূপের সঙ্গে মূর্তি ভেঙে ফেলার কথা স্বীকার করেছিলেন। যেমন, এক লোকের সুন্দর হস্তলিপি অন্য এক লোক অধিকার করলো এবং বললো, এ লেখা কি আপনার? সুন্দর হস্তলিপির অধিকারী ব্যক্তিটি তখন বিদ্রূপের স্বরে জবাব দিলো, না আপনার। এটা এক ধরনের পরোক্ষ স্বীকারোক্তি। 'এই প্রধানইতো এটা করেছে'— হজরত ইব্রাহিমের এ উক্তিটি ছিলো সে ধরনের। কিংবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, মূর্তিপূজারীদের অপবিশ্বাস ছিলো প্রধান মূর্তির সামনে অন্য মূর্তিগুলোর উপাসনা করলে প্রধান মূর্তিটি অসন্তুষ্ট হয়। তাই হজরত ইব্রাহিম তাদের বিশ্বাসের অনুকূলে বলেছিলেন, এই প্রধানই তো (অসন্তুষ্ট হয়ে) এ রকম করেছে।

কুতাইবী বলেছেন, অর্থগত দিক থেকে এই কথাটি পরবর্তী বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়—প্রধান মূর্তিটিকেই জিজ্ঞেস করে দেখো না, যদি সে কথা বলতে পারে, তবে বুঝবে সে এরকম করতেও পারে। আর যদি সে কথা বলতে না পারে, তবে বুঝবে সে এরকম করার ক্ষমতা রাখে না। এভাবে হজরত ইব্রাহিম মূর্তির অক্ষমতা প্রকাশের মাধ্যমে নিজের মূর্তি ভাঙার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু কুতাইবীর এই ব্যাখ্যাটি ভুল। কেননা ক্বারী কাসায়ী বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের আলোচ্য বক্তব্যের মধ্যে তাঁর মূর্তি ভাঙার স্বীকৃতি নেই। এর পরেও যদি পরোক্ষ স্বীকৃতির কথা বলা হয়, তবে বক্তব্যটি হয়ে পড়বে স্ববিরোধী একবার না, আরেকবার হ্যাঁ। একই বক্তব্যের মধ্যে এভাবে 'হাঁ' ও 'না' এর সমন্বয়ন শুদ্ধ নয়। এছাড়া হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিস থেকেও একথা প্রমাণিত হয় যে, 'ফায়ালাহু' কথাটির পরে কোনো যতি চিহ্ন নেই। বরং এখানে কথাটির ধারাবাহিক সম্পর্ক রয়েছে কাবীরুহুম' (এই প্রধানই) এর সঙ্গে।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, নবী ইব্রাহিম তিন বার এরকম কথা বলেছিলেন, যা দৃশ্যতঃ অসত্য মনে হলেও অসত্য নয়। দু'বার বলেছিলেন এরকম— 'ইন্নি সাক্বীম' (আমি অসুস্থ) এবং 'বাল ফায়ালাহু কাবীরুহুম' (এদের এই প্রধানই তো এটা করেছে)। তৃতীয় ঘটনাটি ছিলো এরকম— একবার তিনি তাঁর সহধর্মিণী সারাকে নিয়ে এক অত্যাচারী সম্রাটের রাজ্য অতিক্রম করছিলেন। কে যেনো সম্রাটের কানে সংবাদ পৌঁছালো, আপনার রাজ্য অতিক্রম করছে এক মরুচারী অভিযাত্রিক। তার সঙ্গে রয়েছে এক অনিন্দ্য সুন্দর রমণী। সম্রাট তৎক্ষণাৎ তার বিশেষ বাহিনী পাঠিয়ে নবী ইব্রাহিম ও তাঁর স্ত্রীকে দরবারে নিয়ে এলো। সম্রাট বললো, পথিক! রমণীটি কে? তিনি বললেন, আমার বোন। পরে স্ত্রীকে একান্তে বললেন, তুমি আমার স্ত্রী একথা জানলে সম্রাট তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতো। এখন তোমাকে ডেকে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তবে তুমিও এরকম উত্তর দিয়ো। মুসলমান হিসেবে আমরা তো ভ্রাতা-ভগ্নিই। আর এখন সারা পৃথিবীতে ইমানদার কেবল তুমি ও আমি। সম্রাট সারাকে ডেকে নিয়ে গেলো। নিরুপায় নবী নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। সম্রাট অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হলো তাঁর দিকে। কিন্তু তাকে অদৃশ্য ব্যবস্থাপনায় আটকে রাখা হলো। মাটিতে পড়ে গেলো সে। অনেক চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারলো না। কাকুতি মিনতি করে আবেদন জানালো, আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করো। আমি আর তোমার দিকে অগ্রসর হবো না। সারা দোয়া করলেন। সে ভালো হয়ে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু পুনরায় অগ্রসর হলো অসৎ কামনা নিয়ে। কিন্তু একটু অগ্রসর হতেই পুনরায় পড়ে গেলো মাটিতে। আবারো প্রতিজ্ঞা করলো, এবার আর ভুল হবে না। আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে আমাকে ভালো করে দাও। সারা পুনরায় দোয়া করলেন। দোয়া কবুলও হলো। সম্রাট

ভালো হয়ে উঠে দাঁড়ালো। প্রতিহারীকে ডেকে বললো, তুমি কাকে এনেছো আমার সামনে। এতো মানুষ নয়, জ্বিন। তারপর সম্রাট সারার সেবিকা হিসেবে দান করলেন বিবি হাজেরাকে এবং সসম্মানে নবী ইব্রাহিমের সঙ্গে চলে যাবার অনুমতি দিলেন। বিবি সারা বিবি হাজেরাকে নিয়ে নামাজরত নবীর কাছে পৌছলেন। তিনি ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর? বিবি সারা বললেন, উত্তম। সম্রাটতো উপঢৌকনরূপে সেবিকা হাজেরাকেও দান করেছেন। এ পর্যন্ত বলে হজরত আবু হোরায়রা উচ্চারণ করলেন, হে আকাশী সলিলের সন্তান (হে বিশুদ্ধ বংশের দাবিদার), এই হাজেরাই হচ্ছেন তোমাদের মহাসম্মানিতা জননী। বোখারী, মুসলিম।

এই হাদিসের মাধ্যমে এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অবজ্ঞাভরে হলেও হজরত ইব্রাহিম তিন বার অসত্য উচ্চারণ করেছিলেন, অথবা প্রত্যক্ষভাবে শাব্দিক অর্থ তো অসত্যকেই প্রমাণ করে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই একথা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর উপরে বর্ণিত উক্তি তিনটির একটিও অসত্য নয়। কারণ প্রতিটি বক্তব্যের অর্থ থাকে দু'টি— প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত। হজরত ইব্রাহিম তাঁর বক্তব্য বুঝাতে চেয়েছিলেন অন্তর্নিহিত অর্থে। আর শ্রোতা বা শ্রোতৃবৃন্দ তা বুঝেছিলো প্রকাশ্য অর্থে। এতে করে শ্রোতৃবর্গের বোধের অগভীরতাই প্রকাশ পায়, আর প্রকাশ পায় হজরত ইব্রাহিমের জ্ঞানের গভীরতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। সঙ্গীন পরিস্থিতিতে এভাবে আত্মরক্ষা শরিয়তের দৃষ্টিতে দূষণীয় কিছু নয়।

এর পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখলো এবং একে অপরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো, তোমরাই তো সীমালংঘনকারী।' একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিমের কথায় চেতনা ফিরে পেলো তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা। বুঝতে পারলো নিশ্চেতন প্রতিমার উপাসনা ঠিক নয়। ইব্রাহিম যা বলছে, সেটাই ঠিক। তাই তারা পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগলো এই বলে যে, তোমরাই সীমালংঘনকারী।

এর পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেলো এবং তারা বললো,তুমি তো ভালোই জানো যে, এরা কথা বলতে পারে না।' একথার অর্থ— কিছুক্ষণের জন্য তাঁর সম্প্রদায় শুভবুদ্ধিকে আশ্রয় করে রইলো। কিন্তু দীর্ঘদিনের লালিত অপবিশ্বাসের কাছেই শেষে নতি স্বীকার করলো তারা। গভীর নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি হঠাৎ জাগ্রত হলেও যেমন পরক্ষণে ডুবে যায় নিদ্রার অতলে, তেমনি তারা সাময়িক বিশ্বাসের জাগরণের ছোঁয়া পেয়েও পুনরায় ডুবে গেলো অবিশ্বাসের অতল তলে। কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ করে বললো, হে ইব্রাহিম! এভাবে কথা বলছো কেনো? তুমি তো জানোই, তারা কথা বলতে পারে না। অযথা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে বলছো কেনো?

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ○ اُفٍّ لَّكُمْ
وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا
اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى
اِبْرٰهِيْمَ ○ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ○ وَنَجَّيْنٰهُ وَ
لُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ○ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَ
يَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ○ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ
بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا
عٰبِدِيْنَ ○ وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ
تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ○ وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ
اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

❒ ইব্‌রাহীম বলিল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহের পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যাহা তোমাদিগের কোন উপকার করিতে পারে না, ক্ষতিও করিতে পারে না?'

❒ 'ধিক্ তোমাদিগকে এবং আল্লাহের পরিবর্তে তোমরা যাহাদিগের ইবাদত কর তাহাদিগকে! তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?'

❒ উহারা বলিল, 'তবে উহাকে পোড়াইয়া দাও, সাহায্য কর তোমাদিগের দেবতাগুলিকে, তোমরা যদি কিছু করিতে চাহ।'

❒ আমি বলিলাম, 'হে অগ্নি! তুমি ইব্‌রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হইয়া যাও।'

❒ উহারা ইব্‌রাহীমের বিরুদ্ধে এক ফন্দি আঁটিতে চাহিল। কিন্তু আমি উহাদিগকে করিয়া দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

❒ এবং আমি তাহাকে ও লূতকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলাম সেই দেশে যেথায় আমি কল্যাণ রাখিয়াছি বিশ্ববাসীর জন্য।

❒ এবং আমি ইব্রাহীমকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক, আরও দান করিয়াছিলাম ইয়াকূব এবং প্রত্যেককেই করিয়াছিলাম সৎকর্মপরায়ণ;

❒ এবং তাহাদিগকে করিয়াছিলাম নেতা; তাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করিত; তাহাদিগকে প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম সৎকর্ম করিতে, সালাত কায়েম করিতে এবং জাকাত প্রদান করিতে; তাহারা আমারই ইবাদত করিত।

❒ এবং লূতকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এমন এক জনপদ হইতে যাহার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কর্মে; উহারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী।

❒ এবং তাহাকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করিয়াছিলাম; সে ছিল সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইব্রাহিম বললেন, যে প্রতিমাগুলোর উপাসনা তোমরা করো, সেগুলো তো তোমাদের উপকার বা ক্ষতি কোনোটাই করতে পারে না। অথচ তোমরা জানো এবং এখন ভালো করে জানলে যে, এগুলো মিথ্যা। আক্ষেপ! শত আক্ষেপ! যে আল্লাহ্ আমার, তোমাদের ও সকলের সৃজয়িতা ও পালনকর্তা! সেই আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা এভাবে আটকে রয়েছো ঘৃণ্য অংশীবাদিতায়।

পরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদেরকে।' এখানে 'উফ্ফিন' অর্থ ধিক, অথবা এ ধরনের কোনো ঘৃণা প্রকাশক শব্দ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ঘৃণিত, দুর্গন্ধযুক্ত অথবা দুঃখজনক কোনো কিছু অনুভবের পর আপনাআপনি যে শব্দ উচ্চারিত হয় সেই শব্দই হচ্ছে 'উফ্'। রসুল স. একবার দুর্গন্ধ পেয়ে উচ্চারণ করে উঠেছিলেন 'উফ্', 'উফ্' এবং একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কাপড় চেপে ধরেছিলেন তাঁর নাসিকায়। বায়যাবী লিখেছেন, 'উফ্ফিন' অর্থ অপগন্ধ অথবা এ ধরনের নিন্দনীয় কোনো কিছু।

এর পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তবে একে পুড়িয়ে দাও, সাহায্য করো তোমাদের দেবতাগুলোকে, তোমরা যদি কিছু করতে চাও।' একথা বলেছিলো হানুন নামক এক লোক। আল্লাহ্ তাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করে দিয়েছিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে মাটিতে দেবে যেতেই থাকবে। কেউ কেউ বলেছেন, একথা বলেছিলো নমরুদ নিজে। অন্য সকলে ছিলো তার একথার সমর্থক। তাই এখানে বলা হয়েছে 'ওরা বললো'।

তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, হজরত ইব্রাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বন্দী করে রাখা হলো একটি প্রকোষ্ঠে। চারিদিকে গড়ে তোলা হলো দুর্ভেদ্য বেষ্টনী। কূছী নামক গ্রামে খনন করা হলো একটি বিরাট গর্ত। সেখানে একত্র করা হলো ভারী জাতীয় এক ধরনের কাঠ। আনন্দে উৎফুল্ল হলো অংশীবাদীরা। তাদের উদ্দীপনা এমন পর্যায়ে পৌছলো যে, পীড়িত ব্যক্তিরা মানত করতে লাগলো, আমি আরোগ্য লাভ করলে ওই অগ্নিকুণ্ডে কিছু কাঠ দিবো। মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ মানত করলো, আমার অমুক বাসনা পূর্ণ হলে আমিও ওই অগ্নিকুণ্ডে দান করবো কিছু জ্বালানী। কেউ কেউ অছিয়ত করলো, কাজ শেষ হওয়ার আগেই যদি আমি মৃত্যুবরণ করি, তবে তোমরা আমার নামে ওই অগ্নিকুণ্ডের জন্য কিছু কাঠ দান কোরো। মহিলাদের কেউ কেউ চরকা ঘুরিয়ে তার পারিশ্রমিক দ্বারা কাঠ ক্রয় করে পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাঠগুলো ফেলে দিতে শুরু করলো ওই গহ্বরে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, বিপুল উৎসাহে নমরুদের লোকেরা এক মাস ধরে বিভিন্ন স্থান থেকে কাঠ এনে স্তূপীকৃত করলো নির্ধারিত স্থানে। তারপর চার দিক থেকে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো কাঠগুলোতে। ক্রমে ক্রমে ভয়ংকর হয়ে উঠলো অগ্নিকুণ্ডটি। আগুনের শিখা উঠে গেলো অনেক উপরে। পালিয়ে গেলো আশেপাশের পক্ষীকুল। সাত দিন ধরে এভাবে জ্বলে ওঠার পর নমরুদ ঠিক করলো এবার ইব্রাহিমকে ফেলে দিতে হবে ওই বহ্নিমান অগ্নিকুণ্ডে। কিন্তু তারা কেউ বুঝে উঠতে পারলো না, কীভাবে ইব্রাহিমকে ওই জ্বলন্ত হুতাশনে নিক্ষেপ করা যায়। ওই আগুনের কাছাকাছি যাওয়া যে দুষ্কর। তখন মানুষের বেশ ধরে ইবলিস এসে বললো চড়ক বানানোর কথা। বললো, চড়কের এক প্রান্তে ইব্রাহিমকে বেঁধে দূর থেকে তাকে আগুনে ফেলে দেয়া যায়। ইবলিসের বুদ্ধি তাদের মনোপুত হলো। একটি উঁচু অট্টালিকার উপরে চড়ক প্রতিষ্ঠা করলো তারা। তারপর হজরত ইব্রাহিমকে বসিয়ে দিলো তার এক প্রান্তে। আহাজারি করে উঠলো আকাশ ও পৃথিবীর ফেরেশতাকুল। মানুষ ও জ্বিন ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টি চিৎকার করে প্রার্থনা জানালো, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! ইব্রাহিম তোমার খলিল (বন্ধু)। দেখো শত্রুরা তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছে। বর্তমান পৃথিবীতে তিনি ছাড়া তোমার উপাসক আর কেউ নেই। তুমি আমাদেরকে অনুমতি দাও, আমরা সকলে তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসর হই। আল্লাহ্ বললেন, ইব্রাহিম আমার খলিল। আমিই তার মাবুদ। আমি ছাড়া তার অন্য কোনো উপাস্য নেই। যদি আমার বন্ধুতোমাদের কারো কাছ থেকে সাহায্য চায়, তবে তোমরা তাকে সাহায্য করতে পারবে। এই অনুমতি তোমাদের সকলকেই দেয়া হলো। কিন্তু সে যদি আমি ছাড়া অন্য কারো শরণ প্রার্থী না হয়, তবে আমিই হবো তার সরাসরি পরিত্রাতা। আমি জানি, সে আমার কে। আর সে-ও জানে, আমি তার কি। সুতরাং তোমরা আমাদের দু'জনের মাঝে আড়াল সৃষ্টি কোরো না।

চড়ক আন্দোলিত করা হলো। পানির দায়িত্ববাহী ফেরেশতা ছুটে এসে বললো, হে খলিলুল্লাহ্! আপনি অনুমতি দিলে আমি এখনই অগাধ জলরাশি এনে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে নিভিয়ে দিতে পারি। বাতাস পরিচালনাকারী ফেরেশতা এসে বললো, অনুমতি দিন হে আল্লাহ্র বন্ধু, আমি এক্ষুণি তুফান এনে উড়িয়ে নিয়ে যাই এই জ্বলন্ত হুতাশনকে। হজরত ইব্রাহিম বললেন, না। তোমরা কেনো এগিয়ে আসতে চাইছো? আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আমি তাঁর। তিনি আমার।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের জন্য হজরত ইব্রাহিমকে চড়কের এক প্রান্তে বেঁধে ফেলা হলো, তখন তিনি উচ্চারণ করলেন— 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা লাকাল হামদু ওয়া লাকাল মুলকু লা শারীকা লাক।' চড়কটি ঘুরিয়ে হজরত ইব্রাহিমকে নিক্ষেপ করা হলো লেলিহান অনলে। সঙ্গে সঙ্গে হজরত জিবরাইল এসে বললেন, ভ্রাতা ইব্রাহিম অনুমতি দিন। আমি সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। হজরত ইব্রাহিম বললেন, আপনার সাহায্য আমি চাই না। জিবরাইল বললো, তাহলে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, কেনো? তিনি তো আমাকে দেখছেন।

হজরত কা'ব আহবার বর্ণনা করেছেন, তখন আল্লাহ্র সকল সৃষ্টি হজরত ইব্রাহিমকে সাহায্য করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলো। কেবল গিরগিটি ছিলো তাঁর বিরুদ্ধে। সে আরো ফুৎকার দিচ্ছিলো যাতে করে আগুন অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হয়।

হজরত উম্মে শুরাইক থেকে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. গিরগিটিকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন এবং বলেছেন, গিরগিটি নবী ইব্রাহিমের জন্য প্রস্তুতকৃত অগ্নিকুণ্ডকে ফুৎকার দিয়ে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করেছিলো।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সুপরিণতসূত্রে বোখারী, মুসলিম ও তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে। কাবাগৃহের মধ্যে গিরগিটি দেখতে পেলেও তাকে হত্যা কোরো। হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. গিরগিটিকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন এবং তাকে বলেছেন, ফাসেকের বাচ্চা। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত আর এক হাদিসে এসেছে, বর্শার প্রথম আঘাতে যে গিরগিটিকে হত্যা করতে পারবে, তাকে দেয়া হবে এক শত পুণ্য। দ্বিতীয় আঘাতে হত্যা করলে পুণ্য হবে কম, আর তৃতীয় আঘাতে হত্যা করলে আরো কম।

এর পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'আমি বললাম, হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ যদি তখন 'শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও' না বলে কেবল বলতেন 'শীতল হয়ে যাও', তবে শীতলতার কারণে হজরত ইব্রাহিমকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে

হতো। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, 'সালামান' (নিরাপদ, শান্তিদায়ক) শব্দটি এখানে 'কুনী' (হয়ে যাও) এর বিধেয় নয়। বরং শব্দটি এখানে একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— আমি ইব্রাহিমকে পরিপূর্ণরূপে নিরাপদ রেখেছিলাম।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, ওই দিন পৃথিবীর সকল আগুন নিভে গিয়েছিলো। আগুন দ্বারা সে দিন কেউ উপকার লাভ করতে পারেনি। আল্লাহ্ যদি তখন 'আ'লা ইবরাহীম' (ইব্রাহিমের জন্য) না বলতেন, তবে চিরদিনের জন্য সকল আগুন শীতল হয়ে যেতো। আমি বলি, তখন ওই অগ্নিকুণ্ডের রূপ ও বৈশিষ্ট্য ঠিকই ছিলো। কিন্তু তা হজরত ইব্রাহিমের উপরে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। অর্থাৎ তখন আগুনের দহণ ক্ষমতা থাকলেও সে হজরত ইব্রাহিমের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। 'আলা ইব্রাহিম' কথাটির মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয়।

সুদ্দী বলেছেন, ফেরেশতারা তখন হজরত ইব্রাহিমের দুই বাহু ধরে মাটিতে বসিয়ে দিলেন। হজরত ইব্রাহিম দেখলেন, বয়ে যাচ্ছে সুমিষ্ট সলিলের একটি অলৌকিক ঝর্ণা। আর চার পাশে ফুটে রয়েছে রক্তিম বর্ণের পুষ্প। হজরত কা'ব বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিমের দেহের কোনো অংশেই আগুন তার দাহিকা শক্তি প্রয়োগ করতে পারেনি। কেবল পুড়িয়ে দিতে পেরেছিলো তাঁর বন্ধনের রশিগুলো। বর্ণনাকারীগণ বলেছেন, ওই প্রজ্জ্বলিত অনলকুণ্ডের অভ্যন্তরে হজরত ইব্রাহিম ছিলেন সাত দিন। মিনহাল বিন আমর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিম বলেছেন, আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক আরাম ও শান্তিদায়ক সময় ছিলো ওই সাতদিন।

ইবনে ইয়াসার বলেছেন, আল্লাহ্ তখন মানুষের আকারে ছায়াপ্রদায়ক ফেরেশতাকে পাঠালেন হজরত ইব্রাহিমের কাছে। ওই ফেরেশতা হলো তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আর আল্লাহ্র নির্দেশে হজরত জিবরাইল নিয়ে গেলেন একটি বেহেশতি পোশাক ও একটি সিংহাসন। তিনি পোশাকটি হজরত ইব্রাহিমকে পরিয়ে দিলেন। তারপর তাঁকে বসালেন ওই সিংহাসনে। শেষে তাঁর কাছে উপবেশন করে বললেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা কি জানো যে, আমার বন্ধুকে পোড়ানোর ক্ষমতা আগুনের নেই। কয়েকদিন পর নমরুদ একটি উঁচু দালানে উঠে দেখলো, একটি সুদৃশ্য কুসুমকাননে সুশোভিত সিংহাসনোপরি বসে রয়েছেন হজরত ইব্রাহিম। তাঁর পাশে বসে আছে এক অচেনা লোক। তাঁদের চারিদিকে কেবল আগুন আর আগুন। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে নমরুদ চিৎকার করে বলে উঠলো, ইব্রাহিম! তোমার মাবুদ অনেক বড়। তার ক্ষমতা এতদূর যে, সে হয়ে গিয়েছে তোমার ও আগুনের মাঝখানের পর্দা। আমি তো সেরকমই

দেখছি। এবার বলো, তুমি কি ওখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবে? হজরত ইব্রাহিম বললেন হ্যাঁ। নমরুদ বললো, ওখানে থাকলে আগুন তোমাকে ভস্মীভূত করে ফেলবে, এ রকম আশংকা কি তোমার নেই? হজরত ইব্রাহিম বললেন, না। নমরুদ বললো, তাহলে বের হয়ে এসো। হজরত ইব্রাহিম উঠে দাঁড়ালেন এবং সেখান থেকে বের হয়ে এলেন ধীর পদক্ষেপে। নমরুদ বললো, ওই লোকটি কে, যে তোমার কাছে বসেছিলো? হজরত ইব্রাহিম বললেন, ছায়াপ্রদায়ক ফেরেশতা। আমার প্রভুপালক আমার কষ্ট দূর করবার জন্য তাকে পাঠিয়েছিলেন। নমরুদ বললো, আমি তার জন্য কিছু কোরবানী করতে চাই। কেননা আমি তার ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ ও অভিভূত। আমি তার নামে চার হাজার গাভী কোরবানী করবো। হজরত ইব্রাহিম বললেন, অংশীবাদিতা পরিত্যাগ করে আমার একনিষ্ঠ অনুসারী না হওয়া পর্যন্ত আমার প্রভুপালক তোমার কোনো কোরবানীই কবুল করবেন না। নমরুদ বললো, রাজসিংহাসন আমি পরিত্যাগ করতে পারবো না। কিন্তু কোরবানী অবশ্য করবো। একথা বলে সে তার কথামত চার হাজার গাভী কোরবানী করলো। এরপর থেকে সে হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে আর কোনো বিতণ্ডা করলো না। অংশীবাদীদের শত্রুতা থেকে হজরত ইব্রাহিম হয়ে গেলেন নিরাপদ।

শোয়াইব জাবায়ী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিমকে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, তখন তিনি ছিলেন মাত্র ষোল বৎসরের যুবক।

এর পরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'তারা ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে এক ফন্দি আঁটতে চাইল। কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।' এখানকার 'কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত' কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, ওই ঘটনার পর সারা দেশের জিনিসপত্র হয়ে উঠলো মহার্ঘ। এভাবে তাদেরকে করা হলো সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ তখন পাঠালেন মশক বাহিনী। তারা নমরুদের শরীরের গোশত খেয়ে শেষ করলো। শেষে একটি মশা ঢুকে গেলো তার মস্তকাভ্যন্তরে। এর ফলে মৃত্যু হলো তার।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে আসা অক্ষত নবীকে দেখে কতিপয় লোক তাঁর প্রতি ইমান আনলো। কিন্তু নমরুদের ভয়ে তারা সেকথা প্রকাশ করলো না। হজরত ইব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র লুত ও তাঁর পিতৃব্যপুত্রী সারাও ইমান আনলেন তখন। এরপর তিনি লুত ও সারাকে নিয়ে দেশ ত্যাগ করলেন। তাঁর ওই দেশত্যাগ ছিলো কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ সাধনের জন্য এবং শান্তির সঙ্গে একনিষ্ঠ ইবাদতের জন্য। তিনি তখন বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি আমার প্রভুপালকের দিকে হিজরতকারী। আর লুতের ইমান আনার কথা বিবৃত হয়েছে এক আয়াতে এভাবে— 'ফাআমানা লাহু লূত্ব' (লুত তার প্রতি ইমান এনেছিলো)।

দেশত্যাগের পর তিনি প্রথমে উপস্থিত হলেন হারান নামক স্থানে। কিছুকাল সেখানে বসবাসের পর চলে গেলেন মিসরে। মিসরে কিছুদিন থাকার পর সিরিয়ায় চলে গেলেন তিনি। বসতিস্থাপন করলেন ফিলিস্তিনের সাবা এলাকায়। সাদুমবাসীদের জনপদ ছিলো সেখান থেকে চব্বিশ ঘণ্টার দূরত্বে। সাদুমবাসীরাও ছিলো অংশীবাদী। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ হজরত লুতকে নবুয়ত দান করলেন। আল্লাহ্র হুকুম পেয়ে তিনি তখন চলে গেলেন সাদুমবাসীদের জনপদে।

এর পরের আয়াতে (৭১) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাকে ও লুতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই দেশে, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য।' এখানে 'কল্যাণ' অর্থ বৃক্ষরাজি ও ফল ফসলের আধিক্য। আর একটি কল্যাণ হচ্ছে, সেখানকার মাটি ছিলো বহু সংখ্যক নবী ও রসুলের আবির্ভাবের স্থল। হজরত উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, সেখানে ছিলো সুপেয় পানীয়। বায়তুল মাকদিসের নিম্নভূমিতে ছিলো একটি প্রবহমান স্রোতস্বিনী। সে দিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে— 'সেই দেশে, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য।'

কাতাদা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর একবার হজরত কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সিরিয়া ছেড়ে মদীনায় আসতে চাও না কেনো? মদীনা তো রসুল স. এর হিজরতের স্থান এবং এখানেই রয়েছে তাঁর পবিত্র সমাধি। হজরত কা'ব বললেন, হে বিশ্বাসীদের অধিনায়ক! আমি তওরাত কিতাবে পাঠ করেছি, সিরিয়ার ভূমি আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার, তাঁর বিশেষ বান্দাগণেরও আবির্ভাব স্থল।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, ভবিষ্যতের মানুষ হচ্ছে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা। তখন বান্দারা হিজরত করবে পিতা ইব্রাহিমের হিজরতের স্থানে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি হজরত ইব্রাহিমের হিজরতের স্থানে সুস্থির হবে, সে হবে পৃথিবীবাসীদের মধ্যে অধিকতর মর্যাদামণ্ডিত, অন্যত্র থাকবে কেবল অনুত্তম লোকেরা। তাদের বসবাসের মৃত্তিকা, তাদেরকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিবে। আল্লাহ্ তাদেরকে ঘৃণা করবেন। তারা বানর ও শূকরের সঙ্গী হয়ে একটি আগুনের তাড়া খেয়ে ফিরবে। রাত্র-দিন ওই আগুন ছুটবে তাদের পিছু পিছু। আবু দাউদ।

হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত থেকে আহমদ ও তিরমিজি বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার বললেন, সিরিয়ার জন্য সুসংবাদ। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রহমতের বাণীবাহক! এর কারণ? তিনি স. বললেন আল্লাহ্র রহমতের ফেরেশতা সেখানকার অধিবাসীদের উপরে ছায়া বিস্তার করবে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে তিরমিজি বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স.

বলেছেন একটি আগুন বের হবে হাজরে মাউতের (ইয়েমেনের) দিক থেকে। অথবা বলেছেন, হাজরে মাউত থেকে একটি আগুন মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর? তিনি স. বললেন, তখন তোমাদের উপরে সিরিয়া গমন করা হয়ে পড়বে অত্যাবশ্যক।

আহমদ ও আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু জাওয়ালাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, ওই সময় সন্নিকটে, যখন তোমাদের তিনটি বাহিনী সমবেত হবে তিনটি স্থানে— একটি সিরিয়ায়, একটি ইয়েমেনে এবং একটি ইরাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র বচনবাহক ! ওই সময় আমি যদি জীবিত থাকি, তবে কী করবো? তিনি স. বললেন, তোমার কর্তব্য হবে সিরিয়ায় গমন করা ও সেখানে স্থিত হওয়া। আল্লাহ্র পৃথিবীতে সিরিয়ার মৃত্তিকাই অধিকতর সম্মানার্হ। যারা সজ্জন, তারাই কেবল গমন করতে পারবে সেখানে। যদি তোমরা সেখানে যেতে না পারো , তবে ইয়েমেনে গমন করা হবে তোমাদের কর্তব্য। আল্লাহ্ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন সিরিয়া ও সিরিয়াবাসীর। শুরাইহ্ বিন উবায়েদ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে উবায়েদ বলেছেন, একবার হজরত আলীর সম্মুখে সিরিয়ার প্রসঙ্গ আলোচিত হলো। উপস্থিত লোকেরা বললো, হে বিশ্বাসীদের অধিনায়ক! সিরিয়াবাসীদেরকে অভিসম্পাত দিন। তিনি বললেন, না। আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, সিরিয়ায় সবসময় থাকে চল্লিশ জন আবদাল। তাদের কোনো একজনের ইন্তেকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। ওই আবদালগনের বরকতে বৃষ্টি হয়। তাদের কারণেই শত্রুদের উপরে দান করা হয় বিজয়। আর তাদের জন্যই সেখানকার অধিবাসীদের উপর থেকে প্রত্যাহৃত হয় আযাব। আহমদ।

হজরত ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি একবার দেখলাম আমার মস্তকের নিম্নদেশ থেকে উত্থিত হলো একটি আলোর স্তম্ভ। ওই অত্যুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভটি বিস্তৃত হলো সিরিয়া পর্যন্ত। বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর দালায়েল নামক পুস্তকে।

এর পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'এবং আমি ইব্রাহিমকে দান করেছিলাম ইসহাক, আরো দান করেছিরাম ইয়াকুব'।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আফিয়্যাতুন' শব্দটির মতো 'নাফিলাতুন' শব্দটিও একটি মূল শব্দ। এখানে নাফিলাতুন' (আরও) এর পূর্বে ক্রিয়ার উল্লেখ নেই। কিন্তু 'ওয়াহাব্না' শব্দের অর্থও দান করা। তাই শব্দটি এখানে 'ওয়াহাব্না' এর কর্মপদ। মুজাহিদ ও আতা বলেছেন, 'নাফিলাতুন' অর্থ আতীয়্যাতুন (দান)। হজরত ইসহাক এবং হজরত ইয়াকুব দু'জনেই ছিলেন আল্লাহ্র দান। তাই

এখানে 'নাফিলাতুন' শব্দটি এই দু'জনের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত হবে। হাসান ও জুহাক বলেছেন, 'নাফিলাতুন' অর্থ ফজল বা অনুগ্রহ। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— 'এবং আমি আমার অনুগ্রহরূপে ইব্রাহিমকে দান করেছি তার পুত্র ইসহাক ও প্রপৌত্র ইয়াকুবকে।' এমতাবস্থায় 'নাফিলাতুন' ব্যবহৃত হবে দান করার কারণরূপে।

হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত উবাই ইবনে কা'ব, ইবনে জায়েদ এবং কাতাদা বলেছেন, এখানে 'নাফিলাতুন' (আরো) শব্দটি প্রযোজ্য হবে কেবল হজরত ইয়াকুবের ক্ষেত্রে। হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ্র দরবারে পুত্র প্রার্থনা করেছিলেন। বলেছিলেন— 'হে আমার প্রভুপালক! আমাকে দান করুন এক পুণ্যবান সন্তান। আল্লাহ্ সে প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন। আর হজরত ইয়াকুবকে দান করেছিলেন বিনা প্রার্থনায়। তাই এই দানটি ছিলো অতিরিক্ত। সে কথা বুঝাতেই অতিরিক্ত বা 'আরো' কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে কেবল হজরত ইয়াকুবের ক্ষেত্রে। বর্ণনাটি সুসমঞ্জস ও অশিথিল।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং প্রত্যেককেই করেছিলাম সৎকর্মপরায়ণ।' একথার অর্থ— আমি ইব্রাহিম, লুত, ইসহাক, ইয়াকুব প্রত্যেকের হৃদয়কে করে দিয়েছিলাম অংশীবাদিতা থেকে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। মন্দ স্বভাব ও আচরণ থেকে মুক্ত। সজ্জিত করেছিলাম তাদেরকে অত্যুত্তম গুণাবলীর দ্বারা। তাই তারা হতে পেরেছিলো ধর্মের প্রতি একান্ত নিষ্ঠাবান ও উপাসনাপ্রবণ।

এর পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করতো, তাদেরকে প্রত্যাদেশ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং জাকাত প্রদান করতে, তারা আমারই ইবাদত করতো।'

এখানে 'খইরাত' অর্থ সৎকর্ম। সাধারণভাবে সকল পুণ্য কর্মই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে শব্দটিকে একবার সাধারণভাবে উল্লেখ করার পর পুনরায় বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে নামাজ ও জাকাতের সঙ্গে। কারণ এ দু'টো পুণ্য কর্ম অত্যুত্তম। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মমার্থ দাঁড়ায়— আমি তাদেরকে করেছিলাম সত্য পথের অধিনায়ক। আমার নির্দেশে তারা মানুষকে পথ দেখাতো। আর আমি তাদেরকে প্রত্যাদেশ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে এবং জাকাত দিতে। তারা আমার সকল নির্দেশই যথাযথরূপে পালন করতো।

এর পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'এবং লুতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিলো অশ্লীল কর্মে, তারা ছিলো এক মন্দ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী।' একথার

অর্থ— আমি লূতকে দিয়েছিলাম আমার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান, নবী সুলভ প্রজ্ঞা ও সুসিদ্ধান্তে উপনীত হবার যোগ্যতা। আর আমি তাকে উদ্ধার করেছিলাম অত্যন্ত অশ্লীল, ঘৃণ্য ও সত্যত্যাগী এক সম্প্রদায়ের জনপদ থেকে।

এর পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'এবং তাকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম; সে ছিলো সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।' এখানে 'ওয়াদ্খালনাহু ফী রহমাতিনা' অর্থ আমার রহমতপ্রাপ্ত, অনুগ্রহভাজন অথবা জান্নাতের অধিকারী। আমি বলি, আল্লাহ্র আনুরূপ্যহীন গুণাবলীর জ্যোতিস্নাত হয়েছিলেন বলেই হয়তো এখানে হজরত লূতকে বলা হয়েছে 'অনুগ্রহভাজন'। সুফী সাধকগণের মতে আত্মবিনাশনের পর আল্লাহ্র গুণাবলীর সঙ্গে চিরস্থায়ী যিনি হন, তাকেই আখ্যা দেয়া যায় 'আল্লাহ্র অনুগ্রহভাজন' বলে। আর 'আস্সলিহীন' অর্থ সৎকর্মপরায়ণগণ, আল্লাহ্ যাদের জন্য পূর্বাহ্নেই মঙ্গল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— এবং আমি লূতকে স্থায়ীভাবে রঞ্জিত করেছি আমার আনুরূপ্যহীন গুণরাজির অন্তহীন জ্যোতি-সম্পাতে। তাই সে আমার অনুগ্রহভাজন। আর পূর্বাহ্নে যাদের জন্য আমি নির্ধারণ করে রেখেছি কল্যাণ, সে ছিলো তাদের দলভূত।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৭৬, ৭৭

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ○ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ○

❒ স্মরণ কর নূহকে; পূর্বে সে যখন আহ্বান করিয়াছিল তখন আমি সাড়া দিয়াছিলাম তাহার আহ্বানে এবং তাহাকে ও তাহার পরিজনবর্গকে মহা সংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

❒ এবং আমি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যাহারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছিল; উহারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এই জন্য উহাদিগের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি আরো স্মরণ করুন নবী নূহের বৃত্তান্ত। লূতের মতো তাকেও আমি করেছিলাম আমার অনুগ্রহভাজন। দীর্ঘকাল ধরে স্বজাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক সময় সে

আমার নিকটে পরিত্রাণপ্রার্থী হয়েছিলো। আমি তার প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলাম। গজবরূপে অবতীর্ণ করেছিলাম মহাপ্লাবন। সে প্লাবনে নিমজ্জিত হয়েছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। কেবল তাকে ও তার পরিবারবর্গকে আমি তখন উদ্ধার করেছিলাম এক বিশাল নৌকার আরোহী করে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম' অর্থ— তাকে মুক্ত করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপবাদ ও অত্যাচার থেকে। উল্লেখ্য যে, হজরত নুহের পৃথিবীর আয়ুষ্কাল ছিলো অন্যান্য নবীগণের আয়ুষ্কালের চেয়ে অনেক বেশী। তাই অন্য নবী রসুলগণের চেয়ে তাঁকেই দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছিলো বেশী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাঁর সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীরা তাঁকে রাস্তাঘাটে দেখতে পেলেই প্রচণ্ড প্রহার করতো। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন। মনে হতো হয়তো তিনি আর নেই। লোকেরা তখন তাঁকে একটি চাটাইয়ে জড়িয়ে তাঁর বাড়ীতে ফেলে আসতো। জ্ঞান ফিরে পেলে নির্যাতিত নবী আবার তাদের মঙ্গল কামনা করেই আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা জানাতেন। দয়াল নবী পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করতেন সত্যপ্রচারের।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, ওবায়েদ বিন ওমর লাইছী বলেছেন, আমি অবগত হয়েছি যে, অবাধ্যরা প্রবল আক্রোশে হজরত নুহের গলা টিপে ধরতো। ফলে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন তিনি। যখন হুঁশ ফিরে আসতো তখন দোয়া করতেন, হে আমার দয়াময় প্রভুপালক! তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তারা যে অবুঝ।

পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিলো; তারা ছিলো এক মন্দ সম্প্রদায়। এই জন্য তাদের সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।' 'ওয়া নাসারনাহু' অর্থ— এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম। অর্থাৎ আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম বলেই সে বিরুদ্ধবাদীর উপরে বিজয়ী হয়েছিলো। আর 'বিআয়াতিনা' অর্থ নিদর্শনাবলী, যেগুলো ছিলো হজরত নুহের নবুয়তের প্রমাণ।

বায়যাবী লিখেছেন, 'সত্যপ্রত্যাখ্যান' ও 'মন্দ স্বভাব' এ দু'টো মহাপাপ এক সঙ্গে হলে আল্লাহ্‌র গজব নেমে আসে। সম্ভবত হজরত নুহের সম্প্রদায়ের অবাধ্যরা একই সঙ্গে অংশীবাদিতা ও অমানবিকতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো বলেই তাদের উপরে নেমে এসেছিলো ভয়ংকর গজব।

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ○ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ز وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۗ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ○ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ○ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۗ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ ○ وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ○

❒ এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলাইমানের কথা যখন তাহারা বিচার করিতেছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; উহাতে রাত্রিকালে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির মেষ; আমি দেখিতেছিলাম তাহাদিগের বিচার।

❒ এবং আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ের মীমাংসা জানাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগের প্রত্যেককে আমি দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আমি পর্বত ও বিহংগকুলের জন্য নিয়ম করিয়া দিয়াছিলাম যেন উহারা দাউদের সংগে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা।

❒ আমি তাহাকে তোমাদিগের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়াছিলাম, যাহাতে উহা তোমাদিগের যুদ্ধে তোমাদিগকে রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে না?

❒ এবং সুলাইমানের বশীভূত করিয়া দিয়াছিলাম উদ্দাম বায়ুকে; উহা তাহার আদেশক্রমে প্রবাহিত হইত সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রাখিয়াছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত।

❒ এবং শয়তানদিগের মধ্যে কতক তাহার জন্য ডুবুরির কাজ করিত, ইহা ব্যতীত অন্য কাজও করিত; আমি উহাদিগের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতাম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং স্মরণ করো দাউদ ও সুলায়মানের কথা যখন তারা বিচার করেছিলো শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে।' হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আব্বাস ও অধিকাংশ কোরআন-ভাষ্যকার বলেছেন, ওই শস্যক্ষেত্রটি ছিলো

একটি ফলবান দ্রাক্ষা-কানন। আর 'তারা বিচার করছিলো ' অর্থ হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মান দু'জনেই ছিলেন ওই মোকদ্দমার যৌথ বিচারক। কাতাদা বলেছেন, শস্যক্ষেত্রটি একটি ফসলের ক্ষেত্রই ছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাতে রাত্রিকালে ঢুকে পড়েছিলো সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তির মেষ।' মোকদ্দমাটি ছিলো এরকম— সাধারণতঃ পশুপাল চরানো হয় বিস্তীর্ণ চারণভূমিতে দিনের বেলায়। কিন্তু এক রাখালের মেষপাল তার অজান্তেই রাত্রিকালে ঢুকে পড়লো এক লোকের আঙ্গুরের বাগানে এবং নষ্ট করে ফেললো অনেক আঙ্গুর। কিছু ভক্ষণ করলো, কিছু করলো তছনছ।

এখানকার 'নাফাশাত্ ফিহী' অর্থ রাত্রিকালে ঢুকে পড়েছিলো। এরকম বলা হয়েছে কামুস গ্রন্থে। 'নিহায়াহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে 'নাফাশাতিস্ সায়িমাত' অর্থ বিচরণকারী পশু রাতে চড়াও হলো রাখালহীনভাবে। এভাবে দিনে চড়াও হওয়া পশুকে বলে 'হালিমাতিস্ সায়িমাত্'। 'নাফাশা' এর শাব্দিক অর্থ মেলে যাওয়া, উন্মুক্ত হওয়া বা বিস্তৃত হয়ে পড়া। ধুনিত পশমকেও তাই বলা হয় 'ইহ্নুন্ মানফুশ।' আল্লাহ্পাক এক আয়াতে বলেছেন— 'কাল ই'হনিল মানফুশ।'

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি দেখছিলাম তার বিচার।' এখানে 'তাদের বিচার' অর্থ বিচারক হজরত দাউদ, হজরত সুলায়মান, মামলার বাদী-বিবাদী ও উপস্থিত দর্শকদের সম্মিলিত বিচার সভা। ফাররা বলেছেন,কথাটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে কেবল হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মানকে। কারণ বহুবচন বোধক শব্দের দ্বারা দ্বিবচন বুঝানোতেও কোনো দোষ নেই। আর এরকম শব্দ ব্যবহার সচরাচর হয়েই চলেছে। কোরআন মজীদের অন্যত্রও এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যেমন— যদি মৃত ব্যক্তির দুই ভাই হয়, তবে তারা পাবে এক ষষ্ঠাংশ।' আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, উদ্ধৃত আয়াতের 'কয়েকজন ভাই' কথাটির অর্থ কমপক্ষে দুই ভাই।

পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'এবং আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা জানিয়ে দিয়েছিলাম।' আলোচ্য বাক্যের কিছু কথা রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত কথা সহ আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— আমি সুলায়মানকে ওই মামলার সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলাম। তাই দাউদ সুলায়মানের অভিমত বহাল রেখে তার নিজের অভিমত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলো।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর নবী দাউদের জন্য কিতাবুল্লাহ্ পাঠ সহজ করে দিয়েছিলেন। কাউকে ঘোড়ার জিন মজবুত করে বাঁধবার হুকুম দিয়ে তিনি যবুর তেলাওয়াত শুরু করতেন এবং জিন বাঁধা শেষ হওয়ার আগেই তা সম্পূর্ণ পাঠ করে ফেলতেন। আর তিনি সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করতেন আপন হাতের উপার্জনের দ্বারা।

আমি বলি, উদ্ধৃত হাদিসের 'কোরআন' শব্দটির অর্থ হবে যবুর। হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদার উক্তিরূপে বাগবী একথাই উল্লেখ করেছেন।

বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা এবং জুহুরী বর্ণনা করেছেন, দু'জন লোক বিচারপ্রার্থী হয়ে হজরত দাউদের কাছে গেলো। তাদের একজন ছিলো বাগানের মালিক, আর একজন ছিলো মেষপালের মালিক। বাগানের মালিক বললো, এ লোকের মেষপাল রাতের বেলা আমার বাগানে চড়াও হয়ে সব ফসল নষ্ট করে ফেলেছে। হজরত দাউদ সিদ্ধান্ত দিলেন, ফসলহানির ক্ষতিপূরণরূপে বাগানের মালিক পাবে মেষপালের মালিকের সবগুলো মেষ। বাদী-বিবাদী সম্রাট ও নবী হজরত দাউদের একথা মেনে নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে দেখা হলো সম্রাটপুত্র সুলায়মানের সঙ্গে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী সিদ্ধান্ত দেয়া হলো তোমাদেরকে? তারা প্রদত্ত সিদ্ধান্তের কথা জানালো। সম্রাটপুত্র সুলায়মান বললেন, তোমাদের মামলা আমার কাছে উপস্থাপন করা হলে রায় হতো অন্যরকম। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি তখন বলেছিলেন, আমি যদি এই মামলার রায় দিতাম, তবে তা হতো উভয়ের জন্য কল্যাণকর। একথা হজরত দাউদের কানে পৌঁছলো। তিনি তখন বাদী বিবাদী ও প্রিয় পুত্রকে কাছে ডাকলেন এবং বললেন, তুমিই তাহলে সিদ্ধান্ত দান করো।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত দাউদ তখন তাঁর নবুয়ত ও পিতৃত্বের দোহাই দিয়ে বললেন, তুমিই বলো, কোন সিদ্ধান্ত হবে দু'জনের জন্যই কল্যাণকর। নবীপুত্র বললেন, সাময়িকভাবে দু'জনের মালিকানা একে অপরকে দিয়ে দেয়া হোক। বাগানের মালিক মেষপাল ও তাদের যে শাবক জন্ম নিবে, তাদের দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে থাকুক। আর মেষপালের মালিক পরিচর্যা করতে থাকুক বাগানের। বাগান যখন আগের মতো ফল-ফসলে ভরে যাবে, তখন বাগান ও মেষপালের মালিকানা তারা হস্তান্তর করুক একে অপরকে। এভাবে বাগানের মালিক ফিরে পাক তার বাগান এবং মেষপালের মালিক ফিরে পাক তার মেষপাল। হজরত দাউদ সিদ্ধান্তটি খুবই পছন্দ করলেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে তদস্থলে বলবৎ করলেন প্রিয় পুত্রের অধিকতর বিজ্ঞজনোচিত সিদ্ধান্ত। ইবনে আবী শায়বা তাঁর আল মুসান্নিফে এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মুনজির ও ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বর্ণনা করেছেন। বায়যাবী লিখেছেন, হজরত দাউদের সিদ্ধান্তটি ইমাম আবু হানিফার সিদ্ধান্তের মতো। এরকম সিদ্ধান্ত তিনি প্রদান করেছেন অপরাধী গোলামের ক্ষেত্রে। আর হজরত সুলায়মানের অভিমত ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের মতো। তিনি বলেন, মালিকের বিরাগভাজন ক্রীতদাস যদি অন্য কারো সম্পদ নষ্ট করে, তবে তাকে ধরে এনে উপার্জন করাতে হবে। আর এভাবে আসল প্রাপ্য আদায় হয়ে গেলে তাকে প্রত্যার্পণ করতে হবে মূল মালিকের কাছে।

আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার অভিমত হজরত দাউদের অভিমতের মতো নয়। কারণ তাঁর অভিমতের রয়েছে দুটি দিক— ১. মালিক তাঁর ক্রীতদাসের দ্বারা ক্ষতিকৃত সম্পদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিবে, অথবা ২. যার ক্ষতি করা হয়েছে, সে ক্রীতদাসকে ততক্ষণ পর্যন্ত আটকে রেখে উপার্জন করাবে, যতক্ষণ না তার বিনষ্ট সম্পদের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

জাস্সাস বলেছেন, মেষপালের মালিককে বাগানের ক্ষতিপূরণ করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এজন্য যে, সে তার মেষগুলোকে বেঁধে রাখেনি। এক বর্ণনায় এসেছে, শেষ রসুলের শরিয়তে এই নির্দেশটি রহিত হয়েছে। বরং ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন, যদি কারো গৃহপালিত পশু রাতের বেলায় কারো ফসল নষ্ট করে, তবে ক্ষতির পরিমাণ অনুসারে পশুপালকের মালিকের উপর ক্ষতিপূরণ করার দায়িত্ব হবে অত্যাবশ্যক। আর যদি তা দিনের বেলায় হয়, তবে পশুপালের মালিকের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। আমি বলি, সম্ভবত হজরত দাউদের যুগে বিনষ্ট ফসলের মূল্য এবং মেষপালের মূল্য ছিলো সমান। তাই তিনি মেষপাল প্রদান করতে বলেছিলেন বাগানের মালিককে।

সাধারণ নিয়ম এই যে, দিনের বেলা ক্ষেতের মালিক তার ক্ষেতে পাহারার ব্যবস্থা করে। পশুপালও চরে থাকে দিনের বেলায়। তাই দিনের বেলায় কারো পশু কারো ফসল নষ্ট করলে তার দায়িত্ব পশুর মালিকের উপর বর্তায় না। কিন্তু রাতের বেলা ফসল নষ্ট করলে তার দায় বহন করতে হবে পশুর মালিককে। কারণ সে তার পশুকে বেঁধে রাখেনি। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ছুটে যাওয়া পশু যদি দিনে অথবা রাতে কারো ফসলের ক্ষতি করে, তবে ওই পশুর মালিকের উপরে কোনো ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। কেননা রসুল স. বলেছেন, ছুটন্ত পশু যদি কাউকে জখম করে, তবে তার ক্ষতিপূরণ নেই। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ ও সুনান রচয়িতাবৃন্দের বর্ণনায় এই হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, হাদিসে উল্লেখিত 'উজামাউ' শব্দটির অর্থ ছুটন্ত পশু। জমহুর হারাম বিন সা'দ বিন মাহীসাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণ করেছেন, হজরত বারা বিন আজীবের উট একবার একজনের বাগানে ঢুকে ফসলের ক্ষতি করলো। রসুল স.কে একথা জানানো হলে তিনি বললেন, দিনের বেলায় ক্ষেতের ফসলের সংরক্ষণ মালিকের দায়িত্বভূত। আর রাতের বেলার দায়িত্ব পশুর মালিকের। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী, সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়, দারাকুতনী, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও বায়হাকীও হাদিসটির বর্ণনাকারী। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আমি আমার অভিমতের সপক্ষে এই হাদিসটি প্রমাণ রূপে উপস্থাপন করি। উল্লেখ্য যে, হাদিসটি মুত্তাসিল (অছিন্ন সূত্র) পর্যায়ভূত এবং এর বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, হাদিসটির বর্ণনার ভিত্তি হচ্ছেন জুহুরী। অবশ্য তাঁর ভাষা ও অন্যান্য বর্ণনাপরম্পরায় ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুয়াত্তার বর্ণনাতো ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছেই। কিন্তু জুহুরী সূত্রে লাইছের বর্ণনায় 'আমার পিতা মাহীসা থেকে' কথাটির উল্লেখ নেই। মালেক সূত্রে মাআন বিন ঈসার বর্ণনায় আবার তাঁর পিতামহ মাহীসার নাম এসেছে। এদিকে আবার জুহুরী সূত্রে মুয়াম্মারের বর্ণনায় এসেছে— হারাম থেকে, তাঁর পিতা থেকে। কিন্তু এই সূত্রপ্রবাহটির অনুসরণ কেউই করেননি। আবু দাউদ এবং ইবনে হাব্বানের বিবরণও এ রকম। কিন্তু আওযায়ী, ইসমাইল বিন উমাইয়া এবং আব্দুল্লাহ্ বিন ঈসা জুহুরীর যে হাদিস উল্লেখ করেছেন, তার সূত্র প্রবাহ শুরু হয়েছে — হজরত বারা বিন আজীব থেকে।

আমি বলি, ইবনে জাওজী তাঁর তাহ্কিকুত তা'লীক গ্রন্থে ইমাম আহমদের পদ্ধতিতে এরকম বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হারাম এই হাদিসটি হজরত বারা বিন আজীব থেকে স্বকর্ণে শোনেননি। ইবনে হাজামের অনুসরণে আবদুল হক এরকমই বলেছেন। জুহুরী সূত্রে মোহাম্মদ বিন আবী হাফসার পদ্ধতিতে নাসাঈও এরকম বর্ণনা করেছেন। জুহুরী বলেছেন, আবু উসামা বিন সহল আমাকে বলেছেন, হজরত বারা বিন আজীবের উষ্ট্রী....।

ইবনে জিবের বর্ণনায় এসেছে, জুহুরী বলেছেন, আমার কাছে হজরত বারা বিন আজীবের ওই ছুটন্ত উটটির কথা পৌঁছেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তিনজন ইমামই হজরত বারা বিন আজীবের ছুটন্ত উট সম্পর্কিত হাদিসটিকে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত করেছেন এবং এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তটি কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা বলি, সাধারণ বিষয়ও বিশেষ বিধানের মতো শরিয়ত সম্মত অকাট্য দলিল। যতক্ষন পর্যন্ত সাধারণ ও বিশেষ একই সময়ে প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সাধারণ বিধানকে বিশেষ বিধান বলা যায় না। আর যদি একই সঙ্গে সংঘটিত না হয়, তাহলেও দু'টোর একটিকে রহিত হয়েছে বলা যেতে পারে। আর যদি এক্ষেত্রে পূর্বাপর অথবা মিলিত কোনোটাই প্রমাণিত না হয়, তবে বিষয়টি হবে অসমাধ্য। আর এরকম অসমাধ্য বা সন্দেহজনক অবস্থায় ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না। এছাড়া পরস্পরবিরোধী বর্ণনা নিষ্পত্তি না করা গেলে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। আর কিয়াস এর ক্ষেত্র এখানে ক্ষতিপূরণ প্রবর্তন না করারই পক্ষে। কেননা এ ক্ষেত্রে চতুষ্পদ প্রাণীর মালিকের কোনো অপরাধ নেই। মালিকতো সেখানে উপস্থিত ছিলো না এবং তার চতুষ্পদ প্রাণী ছিলো উন্মুক্ত। সে তার পশুকে ছেড়ে দেয়নি, তাড়িয়ে দেয়নি এবং টেনে হিঁছড়ে নিয়েও যায় নি। কিন্তু কথা হচ্ছে, ক্ষতিকর ক্রিয়ায় সম্পর্কতো কারণের সঙ্গে ছিন্ন হয়ে যায় না। তাই আমি বলি, যদি কোনো ব্যক্তি তার পশু ছেড়ে দিয়ে রাখে, তারপর ওই পশু যদি কারও ক্ষতি করে, তবে ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব বর্তাবে ওই পশুর মালিকের উপরে, কারণ সে-ই তো তার পশুটিকে ছেড়ে দিয়ে রেখেছিলো।

মাসআলাঃ যদি ঘোড়ার মালিক তার ঘোড়ায় সওয়ার হয় অথবা সেটিকে লাগাম ধরে নিয়ে যায়, কিংবা সেটিকে পিছন থেকে তাড়া করে— এমতাবস্থায় ঘোড়াটি যদি কাউকে লাথি মারে, পদদলিত করে, গুঁতো দেয়, আঘাত করে, এলোপাতাড়ি চলে, কারো কাছ থেকে ধাক্কা খায় অথবা সরাসরি কাউকে ধাক্কা দেয় এবং ওই স্থান যদি ঘোড়াওয়ালার হয় অথবা কোনো চুক্তির মাধ্যমে ওই জমি তার অধীনে থাকে, তবে ঘোড়াওয়ালার প্রতি ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব বর্তাবে কেবল প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে । অবশিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে তার উপরে ক্ষতিপূরণের কোনো দায়িত্ব বর্তাবে না। কেননা আরোহী অবস্থায় ঘোড়ায় সকল ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। অবশিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে সে তার ঘোড়ার সঙ্গে এরকম সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। কেননা এসকল ক্ষেত্রে এখানে রয়েছে একটি ব্যবধান। তবে পরোক্ষ ক্ষেত্রগুলোতেও কারো কোনো ক্ষতি হওয়া যদি ঘোড়াওয়ালার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে তার উপর ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব অবশ্যই বর্তাবে, যদি তা সুপ্রমাণিত হয়। কিন্তু ওই স্থানটি যদি ঘোড়ার মালিকের নিজস্ব বা অধিকৃত বা তার কর্তৃত্বাধীন না হয়; সেখানে যদি তার চলার অনুমতি থাকে, অবস্থানের অনুমতি না থাকে, যেমন রাজপথ— চলা ও দাঁড়ানো দু'টোরই অধিকার সেখানে সকলের রয়েছে, যেমন কোনো জঙ্গল অথবা হাট, যেখানে রয়েছে সর্বসাধারণের চলার এবং দাঁড়ানোর অধিকার— এমতো ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত সকল অবস্থায় ক্ষতিপূরণ প্রযোজ্য হবে, চাই সে সওয়ার হোক, লাগাম ধরে চলতে থাকুক অথবা পিছন থেকে তার ঘোড়াকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকুক। কিন্তু এমতাবস্থায়ও যদি তার ঘোড়া কাউকে লাথি মারে অথবা লেজের আঘাতে কারো ক্ষতি করে, তবে ঘোড়ার মালিককে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা সর্বসাধারণের চলার পথে কারোর ক্ষতির উদ্দেশ্য না নিয়ে তারও গমনাগমনের অধিকার রয়েছে অন্য সকলের মতো। কিন্তু দেখতে হবে, তার ঘোড়া যেনো কাউকে পদদলিত না করে। কেননা এরকম অধিকার তার নেই। তবে চলার পথে লেজের আঘাত এবং লাথি মারা থেকে মানুষকে নিরাপদ রাখা অশ্বারোহীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সুতরাং চলতে চলতে তার ঘোড়া যদি কাউকে লাথি মারে অথবা লেজের আঘাতে কারো ক্ষতি করে, তবে ওই অশ্বারোহীকে এ ব্যাপারে দায়ী করা যায় না। কেবল ক্ষতিপূরণ প্রযোজ্য হতে পারে তখন, যখন সে সর্বসাধারণের চলার পথে তার ঘোড়াকে থামিয়ে রাখে এবং ওই থামা অবস্থায় ঘোড়া যদি কাউকে লাথি মারে অথবা লেজের দ্বারা আঘাত করে।

ইমাম মালেক বলেছেন, ঘোড়ার আরোহী অথবা লাগামধারী অথবা তাড়াকারী যদি তার ঘোড়াকে না মারে অথবা উত্তেজিত না করে, তবে ওই ঘোড়ার মালিককে কোনোপ্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু যদি সে তার ঘোড়াকে

আঘাত করে অথবা আতংকিত করে, তবে ওই আহত ও আতঙ্কিত ঘোড়া কারো ক্ষতি করলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাই হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, অতর্কিতে ছুটে যাওয়া ঘোড়া কারো ক্ষতি করলে ওই ঘোড়ার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, পশু যদি তার মুখ, পা অথবা লেজ দ্বারা কাউকে কষ্ট দেয়, তবে ওই পশুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সে ক্ষতির কারণ সৃষ্টি করুক অথবা না করুক— ঘোড়ায় আরোহণ করে থাকুক, তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাক অথবা না যাক।

ইমাম আহমদ বলেছেন, অশ্বারোহী ব্যক্তির অশ্ব মুখ অথবা সামনের পা দ্বারা যদি কারো ক্ষতি করে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু যদি তার অশ্ব কাউকে লাথি মারে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা রসুল স. বলেছেন, লাথির কোনো বদলা নেই। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী।

জ্ঞাতব্যঃ মুজাহিদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত শস্যক্ষেত্র সম্পর্কিত সিদ্ধান্তটি হজরত সুলায়মান দিয়েছিলেন আপোষরফার ভিত্তিতে। আর হজরত দাউদের সিদ্ধান্তটি ছিলো নির্দেশনির্ভর। আর একথাও অনস্বীকার্য যে, নির্দেশ নির্ভরতা অপেক্ষা আপোষ উত্তম। এরকমও বলা যায়, হজরত দাউদ এবং হজরত সুলায়মান উভয়ের সিদ্ধান্তের ভিত্তি ছিলো ওহী। কিন্তু হজরত সুলায়মানের ফয়সালাটি ছিলো রহিতকারী (নাসেখ) এবং হজরত দাউদের সিদ্ধান্ত ছিলো রহিত (মনসুখ)। অবশ্য এরকম বলে ওই শ্রেণীর লোকেরা, যারা মনে করে নবী রসুলগণের জন্য ইজতেহাদের (চিন্তা ভাবনার) মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্ত দান বৈধ নয়, কেননা তাঁদের নিকটে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়। তাই তাঁদের ইজতেহাদের প্রয়োজনই নেই। ইজতেহাদের মধ্যে রয়েছে ভুলের সম্ভাবনা। কিন্তু নবী রসুলদের ভুল হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, এখানে পিতা পুত্র উভয়েরই সিদ্ধান্ত ছিলো ইজতেহাদ নির্ভর। হজরত দাউদের ইজতেহাদ ছিলো ভুল এবং হজরত সুলায়মানের ইজতেহাদ ছিলো সঠিক। তাই এখানে আল্লাহ্ হজরত সুলায়মানের বিচারের প্রশংসা করেছেন। সুতরাং এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, নবী রসুলগণের ইজতেহাদে ভুল হতে পারে। কিন্তু তাঁরা ভুলের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন না। ভুলের পরক্ষণেই তাঁদের কাছে ঘটানো হয় সত্যের উদ্ভাবন। তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাঁদের ভুল প্রত্যাহার করে নেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তাদের প্রত্যেককে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।' হাসান বলেছেন, এই বাক্যটি অবতীর্ণ না হলে বিচারকগণ ধ্বংস হয়ে যেতো।

কিন্তু আল্লাহ্ এখানে তাঁদের ভুল ও শুদ্ধ উভয় ইজতেহাদী সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন। হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মান দু'জনের সম্পর্কেই বলেছেন— আমি তাদের প্রত্যেককে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।

প্রকাশ্যতঃ আলোচ্য আয়াতাংশের মাধ্যমে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, মুজতাহিদগণের ইজতেহাদের ভিত্তি শুদ্ধতার উপরেই হয়। সুতরাং তাঁদের কোনো সিদ্ধান্তকেই ভুল বলা যায় না। তাই এখানে হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মান দু'জনেরই প্রশংসা করা হয়েছে। জাহ্‌রিয়্যা সম্প্রদায় এরকমই বলে থাকে। কিন্তু তাদের এ অভিমতটি ভুল। কারণ, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে কেবল এতোটুকুই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌পাক তাঁদের দু'জনকেই দান করেছিলেন বিচার মীমাংসা করার যোগ্যতা ও জ্ঞান। কিন্তু একথা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁদের উভয়ের মীমাংসাই ছিলো সঠিক। বরং 'আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা জানিয়ে দিয়েছিলাম' বাক্যটির মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত সুলায়মানের মীমাংসাটি ছিলো সঠিক এবং হজরত দাউদের সিদ্ধান্তটিই ছিলো ভুল।

হজরত আমর বিন আস বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, সঠিক ইজতেহাদ করলে বিচারক পাবে দ্বিগুণ সওয়াব এবং ভুল হলে পাবে একগুণ। বোখারী, মুসলিম, আহমদ ও সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মুজতাহিদের ফয়সালা কখনো কখনো ভুলও হতে পারে। আবার কখনো কখনো হতে পারে সঠিক। কিন্তু একই সঙ্গে তা ভুল ও শুদ্ধ হতে পারে না। হয় ভুল হবে, না হয় হবে সঠিক। ভুল হলে তিনি সওয়াব পাবেন একগুণ, আর সঠিক হলে দ্বিগুণ। কারণ তাঁরা দু'জনেই সত্যোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন এবং উভয়ের চেষ্টা ছিলো শুদ্ধ। সত্য অন্বেষণ একটি ইবাদত। এই ইবাদত সম্পাদনের সময়ে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে মুজতাহিদ একগুণ সওয়াব পাবেন। আর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে পাবেন দ্বিগুণ— এক গুণ সত্যোদ্ধারের প্রচেষ্টা চালানোর জন্য এবং আর একগুণ সত্য উদঘাটনের জন্য। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. এর নিকট থেকে এই ঘটনাটি শুনেছি— এক স্থানে বসবাস ছিলো দুই রমণীর। তাদের দু'জনেরই ছিলো দুগ্ধপোষ্য শিশু। একদিন একটি বাঘ এসে একটি শিশুকে ধরে নিয়ে গেলো। তখন তাদের একজন অপর জনকে ডেকে বলতে লাগলো 'তোমার বাচ্চাকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে' আর এই দেখ আমার বাচ্চা নিরাপদ। অপর রমণীটি একথা অস্বীকার করলো। বললো বাঘে নিয়ে গিয়েছে তোমার বাচ্চাকে। এই যে এখানে শুয়ে রয়েছে, এ বাচ্চাটিই তো আমার। তুমুল বিবাদ শুরু হলো দু'জনের মধ্যে। তখন তারা বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে হাজির

হলো হজরত দাউদের দরবারে। হজরত দাউদ অপেক্ষাকৃত বয়স্কা রমণীকে দান করলেন ওই শিশুর অধিকার। ফেরার পথে হজরত সুলায়মানের সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেলো। হজরত সুলায়মান তাদের সব কথা শুনে বললেন, কে আছো, একটি ছুরি নিয়ে এসো। দু'জনেই যখন শিশুটির দাবিদার, তখন শিশুটিকে দু'টুকরো করে দু'জনকেই ভাগ করে দেই। একথা শুনতেই অপেক্ষাকৃত কম বয়স্কা রমণীটি বলে উঠলো, আপনার উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক! আমার সঙ্গিনীটিকেই শিশুটি দিয়ে দিন। হজরত সুলায়মান তখন তারই বুকে শিশুটিকে ফিরিয়ে দিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলাম, যেনো তারা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।' এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্‌র জিকির করতে করতে যখন হজরত দাউদ শ্রান্ত হয়ে পড়তেন, তখন পাহাড়-পর্বত তসবিহ্ পাঠ করতে শুরু করতো। তাদের ওই তস্‌বিহ্ পাঠ শুনে শ্রান্তি দূর হয়ে যেতো হজরত দাউদের। পুনরায় তিনি শুরু করে দিতেন আল্লাহ্‌র জিকির। পশু পাখিরাও তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল হয়ে যেতো।

এখানে 'ওয়াত্‌ত্বইরা' কথাটির সম্পর্ক ঘটেছে 'পর্বত' কথাটির সঙ্গে। কারণ পাখিদের কণ্ঠ থেকে কোনো না কোনো প্রকার আওয়াজ উচ্চারিত হয়েই থাকে। কিন্তু পর্বত নির্বাক। তাই পর্বতের তস্‌বিহ্ পাঠ খুবই আশ্চর্যজনক। তাই এখানে 'ঘোষণা করে' কথাটির পূর্বে বসেছে 'পর্বত' শব্দটি।

ওয়াহাব বলেছেন, হজরত দাউদের তস্‌বিহ্ পাঠের জবাবে পাহাড় পর্বতও আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করতো। এরকম করতো পাখিরাও। কাতাদা বলেছেন, হজরত দাউদ যখন নামাজ পাঠ করতেন, তখন পাহাড়-পর্বতও তাঁর সাথে নামাজ পাঠ করতো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত দাউদ পাহাড় ও বৃক্ষের তসবিহ্ পাঠ বুঝতে পারতেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ইউসাব্বিহ্‌না' শব্দটি এসেছে 'সাব্‌হাত' থেকে। এর অর্থ ভাসমান হয়ে চলা। হজরত দাউদ যখন পথ চলতেন, তখন পাহাড়ও চলতো তাঁর সাথে সাথে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমিই ছিলাম এ সমস্তের কর্তা।' একথার অর্থ— নবী দাউদকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান আমি দান করেছিলাম, তাঁর বশীভূত করে দিয়েছিলাম পর্বতকে— এসকল কিছুর অধিকর্তা আমিই।

এর পরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?' এখানে 'লাবুস' অর্থ পরিধেয়। এখানে শব্দটির অর্থ লৌহ বর্ম। কাতাদা বলেছেন, ইতোপূর্বে লৌহবর্ম ছিলো তিনটি স্তর

বিশিষ্ট। সর্বপ্রথম তিনি লৌহবর্ম নির্মাণে আধুনিকতা আনেন। এর সঙ্গে এমন কড়া জুড়ে দেন, যাতে করে বর্মবাহীরা সহজে তা পরিধান করতে পারতো। ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন স্বহস্তের উপার্জনের দ্বারা। আর এখানকার 'লাকুম' (তোমাদের জন্য) কথাটির অর্থ মক্কার কুরায়েশদের জন্য। 'লিতুহ্সিনাকুম' অর্থ যাতে ওই লৌহবর্ম যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। সুদ্দী বলেছেন, কথাটির অর্থ যা তোমাদেরকে রক্ষা করে অস্ত্রের আঘাত থেকে। 'তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না' কথাটির অর্থ হে মক্কাবাসী! যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য এরকম নিরাপত্তাপ্রদায়ক ব্যবস্থা তো আমিই তোমাদেরকে করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না কেনো? এটি একটি প্রশ্নাকৃতির আদেশ।

এর পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'এবং সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম উদ্দাম বায়ুকে।' ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, 'আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলাম যেনো তারা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।' আর এখানে বলা হলো 'সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম উদ্দাম বায়ুকে।' এ দু'টো কাজ আল্লাহ্রই। কিন্তু 'নিয়ম করে দিয়েছিলাম' এবং 'বশীভূত করে দিয়েছিলাম' কথা দু'টোর মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য রয়েছে। তাই কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞ বলেন, হজরত দাউদের সঙ্গে পর্বত ও বিহঙ্গকুলের পবিত্রতা বর্ণনা তাঁর সরাসরি নির্দেশে হতো না। হতো আল্লাহ্র নির্দেশে। তাই বলা হয়েছে 'দাউদের সঙ্গে।' কিন্তু উদ্দাম বাতাস পরিচালিত হতো সরাসরি হজরত সুলায়মানের নির্দেশে। সেকারণেই তাঁর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'বশীভূত করে দিয়েছিলাম।' হজরত দাউদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'মাআ' দাউদা' (দাউদের সঙ্গে) এবং হজরত সুলায়মানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'লিসুলায়মান' (সুলায়মানের জন্য)।

'আ'সিফাতান' অর্থ উদ্দাম, তেজোদ্দীপ্ত। উল্লেখ্য যে, তীব্র গতিসম্পন্ন বাতাস হজরত সুলায়মানকে তাঁর সৈন্যসহ অতিদ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতো। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে, গুদুউবুহা শাহরুঁ ওয়া রওয়াহুহা শাহ্রুন্ (প্রাতঃভ্রমণ ছিলো একমাসের ও সান্ধ্যভ্রমণ ছিলো একমাসের পথের দূরুত্ব)। অর্থাৎ দিবসের প্রথমার্ধে নিয়ে যেতো এক মাসের পথের দূরত্বে এবং শেষার্ধে আর এক মাসের পথের দূরত্বে। কিন্তু এতো তীব্রগতিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ওই বাতাসকে ঝড় বা তুফান মনে হতো না। মনে হতো যেনো স্বাভাবিকভাবে বয়ে যাচ্ছে মন্দ সমীরণ। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত সুলায়মানের অভিপ্রায়ানুসারে বাতাস তার গতিবিধি পাল্টাতো। কখনো বয়ে যেতো জোরে। কখনো ধীরে।

এরপরে বলা হয়েছে— 'সে তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হতো সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি।' কোনো কোনো আলেম মনে করেন, এখানে 'সেই দেশের দিকে' কথাটির অর্থ— সিরিয়ার দিকে। অর্থাৎ হজরত সুলায়মান তাঁর আবাসভূমি থেকে দিবসের প্রথমভাগে বাতাসে ভর করে চলে যেতেন সিরিয়ায় এবং শেষভাগে এভাবে ফিরে আসতেন স্বআবাসে। এভাবেই তিনি তাঁর কর্মস্থল ও সিরিয়ার মধ্যে যাতায়াত করতেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ইলা' (দিকে) শব্দটি তার আসল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'মধ্যে' অর্থে নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত।' একথার অর্থ— আমি সকল কিছুর আদি-অন্তের জ্ঞানসম্পন্ন। তাই আমি আমার অতুলনীয় প্রজ্ঞাময়তার অনুকূলে যখন যা ইচ্ছা তখন তাই করি। বায়ুকে সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছি এজন্য যেনো সে হয় আমার প্রতি অধিকতর মনোযোগী ও কৃতজ্ঞ।

ওহাব বলেছেন, হজরত সুলায়মানের সমাবেশের উপরে পাখিরা ছায়া প্রদান করতো। জ্বিনেরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। এমতাবস্থায় তিনি স্বশরীরে উপস্থিত হতেন সেখানে। তিনি ছিলেন বীরপুরুষ ও প্রচণ্ড প্রতাপশালী। পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে কোনো রাজার সন্ধান পেলে তৎক্ষণাৎ তিনি বাতাসে ভর করে সসৈন্যে উপস্থিত হতেন সেখানে এবং সেই রাজাকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করতেন। বর্ণনাকারী আরো বলেছেন, কোথাও যুদ্ধযাত্রার পরিকল্পনা করলে তাঁর জন্য দরবারের সিংহাসনের আকৃতিতে বিছানো হতো একটি বিশাল সিংহাসন। একাংশে তাঁর জন্যে নির্মাণ করা হতো তাঁবু। অন্য অংশে একত্র করা হতো সৈন্য, অস্ত্রসস্ত্র, রসদসম্ভার ও পশুপাল। এভাবে সকলে একত্র হয়ে গেলে ওই বিশাল সিংহাসনের নিচে বাতাস এসে উঠিয়ে নিতো শূন্যমার্গে। ওই উদ্দাম বাতাসের গতিবেগ হয়ে যেতো শ্লথ ও স্বাভাবিক। তাই সিংহাসনটি বাগান বা অরণ্যের উপর দিয়ে উড়ে গেলেও বৃক্ষের পাতা নড়তো না এতটুকুও। উড়তো না কোনো ধূলোবালি। পশু, পাখি কারোই কোনো কষ্ট হতো না। এভাবে চলে একদিনের অর্ধাংশে অতিক্রান্ত হয়ে যেতো এক মাসের দূরত্বের পথ। অপর অর্ধাংশেও তিনি একইরকম দূরত্ব অতিক্রম করতে পারতেন।

ওহাব আরো বলেছেন, দজলা নদীর উপকূলে হজরত সুলায়মানের একজন মানুষ অথবা জ্বিন সাথী লিখে রেখেছিলো— আমরা এখানে অবতরণ করেছিলাম। কিন্তু নিশিযাপন করিনি। সকালের আগেই চলে গিয়েছিলাম ইসতেখার নামক অঞ্চলে। দুপুরে আবার এখানেই এসে গ্রহণ করেছিলাম দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম। ইনশাআল্লাহ্ কাল আবার আমরা যাত্রা করবো এবং রাত্রি যাপন করবো সিরিয়ায়।

মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, জ্বিনেরা স্বর্ণ ও রেশমের তন্তু দ্বারা বুনেছিলো একটি বিশাল বিছানা। তার আয়তন ছিলো এক বর্গ ফারসাখ (৩ X ৩ = ৯ বর্গ মাইল)। ওই বিছানার মধ্যস্থলে তাঁর জন্য প্রস্তুত রাখা হতো স্বর্ণ নির্মিত একটি আসন। ওই আসনে তিনি উপবেশন করতেন। আর তাঁর চারপাশে বসানো হতো আরো অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত কেদারা। পক্ষিকুল তাদের পক্ষ বিস্তার করে ছায়া প্রদান করতো সকলকে। বাতাস হজরত সুলায়মান তাঁর লোকজন, রসদসম্ভারসহ সকল কিছুকে নিয়ে উড়ে চলে যেতেন এবং পরিভ্রমণ করতেন সকাল থেকে সন্ধ্যায় এক মাসের পথ। আর এক মাসের পথ অতিক্রম করতেন সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, হজরত সুলায়মানের দরবারে বসানো হতো ছয়লক্ষ কেদারা। প্রথম সারিতে বসতো মানুষ এবং পরের সারিগুলোতে বসতো জ্বিন। বিহঙ্গকুল ডানা মেলে ছায়া দিতো তাদের উপর এবং বাতাস তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে চলতো।

হাসান বর্ণনা করেছেন, হজরত সুলায়মান একদিন তাঁর অশ্ব পরিদর্শন করতে গিয়ে আসরের নামাজ পাঠের কথা ভুলে গেলেন। নামাজের সময় চলে যাওয়ার পর তাঁর হুঁশ হলো। তিনি তখন দুঃখে, ক্ষোভে ও ক্রোধে তাঁর সকল অশ্বগুলোকে হত্যা করে ফেললেন। আল্লাহ্ তখন তাকে দান করলেন তদপেক্ষা উত্তম বাহন— সুনিয়ন্ত্রিত উদ্দাম বাতাস। ওই বাতাস তাঁকে অতিদ্রুত পৌঁছে দিতো তাঁর গন্তব্য স্থানে। ফলে তিনি সকালে রওনা হয়ে ইসতেখারে পৌঁছে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন দুপুরের। পরদিন সকালে আবার রওনা হয়ে দুপুরে বিশ্রাম নিতেন বাবেলে।

ইবনে জায়েদ বর্ণনা করেছেন, তাঁর একটি এক হাজার পায়া বিশিষ্ট আসন ছিলো। ওই বিশাল আসনে তাঁর সঙ্গে মানুষ ও জ্বিনেরা উপবেশন করতো। আবার এক হাজার জ্বিন ওই পায়াগুলো ধরে আসনটিকে উর্ধ্বে তুলে ধরতো। তখন বাতাস এসে আসনটিকে উড়িয়ে নিয়ে চলতো দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। এরমধ্যেই অতিক্রম হয়ে যেতো একমাসের দূরত্বের পথ। দ্বিপ্রহরের পর আবার যাত্রা করতেন তিনি। সন্ধ্যায় এমনস্থানে অবতরণ করতেন, যার ব্যবধানও হতো এক মাসের পথের দূরত্বের সমান। মানুষ বুঝতেই পারতো না কিভাবে তিনি এতো সৈন্যসামন্তসহ অতর্কিতে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গিয়ে উপনীত হন।

এক বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত সুলায়মান ইরাক থেকে রওনা হলেন সকালে। এক অচেনা মরুভূমিতে পৌঁছলেন দুপুর বেলায়। তারপর সেখান থেকে বলখে গিয়ে আদায় করলেন আসরের নামাজ। সেখান থেকে গেলেন তুর্কিস্তানে এবং তুর্কিস্তান থেকে চীনে। সেখান থেকে কান্দাহার। কান্দাহার থেকে মাকরান। মাকরান থেকে কেরমান। তারপর সেখান থেকে ফারেস। সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে সকালে রওনা হয়ে দুপুরে পৌঁছলেন কাসকার নামক স্থানে। সন্ধ্যায়

ফিরে এলেন কর্মস্থলে। তাঁর প্রধান বসবাস ছিলো দাম্মার নামক শহরে। সেখান থেকে একবার ইরাক যাত্রার প্রাক্কালে তিনি জ্বিনদেরকে নির্দেশ দিলেন, একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্মাণ করো। জ্বিনেরা তখন বিভিন্ন বর্ণের পাথর দ্বারা নির্মাণ করলো নয়নাভিরাম অট্টালিকা।

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'এবং শয়তানদের মধ্যে কেউ কেউ তার জন্য ডুবুরীর কাজ করতো, এছাড়া অন্য কাজও করতো; আমি তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম।' একথার অর্থ— নবী সুলায়মানের পক্ষে কোনো কোনো জ্বিন সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছে সেখান থেকে মনিমুক্তা তুলে নিয়ে আসতো। এছাড়া জ্বিনেরা অন্যান্য কাজও করতো— নির্মাণ করতো বিভিন্ন আকৃতির ইমারত, বড় বড় হাউজ, বিশাল আকৃতির ডেকচি, শিল্প সুষমামণ্ডিত ভাস্কর্য ইত্যাদি। আর আমি ওই জ্বিনগুলোর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম, যেনো তারা আমার প্রিয় নবীর উপর অবাধ্য না হয়। জুজায বলেছেন, 'আমি তাদের উপর সতর্ক সৃষ্টি রাখতাম' কথাটির অর্থ আমি তাদেরকে রাখতাম আমার সতর্ক পর্যবেক্ষণের সামনে, যেনো তারা নির্মিত বস্তুগুলোকে আবার ধ্বংস না করে ফেলে।

বাগবী লিখেছেন, যখন হজরত সুলায়মান কোনো জ্বিনকে কোনো মানুষের সাথে কাজে পাঠাতেন, তখন ওই মানুষকে বলে দিতেন, এক কাজ শেষ করলে সঙ্গে সঙ্গে ওকে অন্য কাজে লাগিয়ে দিয়ো। না হলে সে তার নির্মিতি ধ্বংস করে ফেলবে। উল্লেখ্য যে, জ্বিনদেরকে দিয়ে এক কাজ শেষ করার পর অন্য কাজ না করালে আবার তাদের আগের কাজ ধ্বংস করে দেয়।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৮৩, ৮৪

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ○

❒ এবং স্মরণ কর আইয়ুবের কথা, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পড়িয়াছি, তুমি তো দয়ালুদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু!'

❒ তখন আমি তাহার ডাকে সাড়া দিলাম এবং আমার নিকট হইতে দয়া ও ইবাদতকারীদিগের জন্য উপদেশ স্বরূপ তাহার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করিয়া দিলাম, তাহাকে তাহার পরিবার-পরিজন ফিরাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগের সঙ্গে তাহাদিগের মত আরো দিয়াছিলাম।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এবার শুনুন নবী আইয়ুবের কাহিনী, বিপদগ্রস্ত অবস্থায় সে আমার নিকটে প্রার্থনা জানিয়েছিলো, আমি দুঃখকষ্টে নিপতিত হয়েছি, আমাকে পরিত্রাণ দাও, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বোত্তম দয়ালু।

ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ বর্ণনা করেছেন, হজরত আইয়ুব ছিলেন রোম দেশের অধিবাসী। তাঁর ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর বংশধারা মিলিত হয়েছে এভাবে— আইয়ুব ইবনে আহ্‌রাস ইবনে রাযেখ ইবনে রোম ইবনে ঈ'স ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম। আর তাঁর মাতা ছিলেন হজরত লুত বিন হারানের বংশোদ্ভূতা। হজরত আইয়ুব ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী ও পুণ্যবান। আল্লাহ্ তাঁর জন্য পৃথিবীকে প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁকে দেয়া হয়েছিলো একটি বিশাল প্রান্তর ও একটি পাহাড়ের মালিকানা। তাঁর মালিকানায় আরো ছিলো অনেক উট, গাভী, ষাঁড়, মহিষ, মেষ, ছাগল, ঘোড়া ও গাধা। এছাড়া চাষাবাদের জন্য ছিলো পাঁচ জোড়া ষাঁড়। সেগুলোর প্রতিটি জোড়া দেখাশুনা করার জন্য ছিলো একজন করে খাদেম। ওই ক্রীতদাস খাদেমদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিও ছিলো। প্রতি জোড়া ষাঁড়ের কৃষি উপকরণ বহনের জন্য ছিলো একটি করে গাধা। প্রতিটি গাধার শাবকও ছিলো। কোনোটির দু'টি, কোনোটির তিনটি, কোনোটির চারটি এবং কোনোটির পাঁচটি। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে দান করেছিলেন পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততি। তিনি ছিলেন নেককার, পরহেজগার, দরিদ্র-দরদী, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানকারী, এতিম ও বিধবাদের পরিচর্যাকারী ও অতিথিপরায়ণ। সম্বলহারা মুসাফিরকেও তিনি অর্থ দান করতেন। এসকল নেয়ামতের কারণে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন এবং নিরবচ্ছিন্নরূপে আদায় করে যেতেন আল্লাহ্‌র হক। আল্লাহ্ তাঁকে বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে নিরাপদে রেখেছিলেন। শয়তান সাধারণতঃ বিত্তশালী ও অভিজাতদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন রাখে। কিন্তু তিনি ছিলেন শয়তানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তিনজন বিশিষ্ট উম্মত ছিলো তাঁর— ইয়াকীন, ইয়ালিদ এবং সাফের। ইয়াকীন ছিলো ইয়েমেনের অধিবাসী। আর ইয়ালিদ ছিলো তাঁর প্রতিবেশী। তাঁরা তিনজনই ছিলো মধ্যবয়সী মানুষ। ওই সময় ইবলিসের ছিলো প্রচণ্ড দৌরাত্ম্য। আকাশ পর্যন্ত ছিলো তার গমনাগমন। আকাশের যে কোনো স্থানে সে অবস্থান করতে পারতো। হজরত ঈসার আবির্ভাবের পরে তার আকাশগমনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর আবির্ভাবের পরে তাকে করা হয়েছে আরো বেশী নিয়ন্ত্রিত।

হজরত আইয়ুব অধিকাংশ সময় আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা ও জিকিরে মগ্ন থাকতে ভালোবাসতেন। একবারের ঘটনা — তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে আল্লাহ্‌র জিকির ও প্রশংসা বর্ণনা করলেন। ফেরেশতারা তখন সম্মিলিতভাবে তাঁর উপরে বিশেষ রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করলো। এই দৃশ্য দেখে ইবলিস ক্রোধ ও হিংসায় জ্বলে উঠলো। সোজা উঠে গেলো আকাশে। আল্লাহ্‌র কাছে নিবেদন করলো, হে আমার স্রষ্টা! আমি তোমার বান্দা আইয়ুবকে পরীক্ষা করে দেখেছি। সে কিন্তু তোমার খাঁটি বান্দা নয়। তুমি তাকে পার্থিব সুখ সম্পদ দান করেছো বলেই সে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততি দান করেছো বলেই বর্ণনা করে তোমার প্রশংসা। তুমি যদি তাঁর নিকট থেকে এসকল নেয়ামত ছিনিয়ে নাও তবে দেখবে, সে আর তোমার ইবাদত বন্দেগী করছে না। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হলো, অবশ্যই আইয়ুব আমার খাঁটি বান্দা। যাও, তার সম্পদের উপর তোমাকে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা দেয়া হলো। তুমি শত চেষ্টা করলেও তাঁকে আমার ভালোবাসা থেকে পৃথক করতে পারবে না। ইবলিস আকাশ থেকে জমিনে নেমে এলো। তার অনুসারীদেরকে একত্র করে বললো, আমাকে আইয়ুবের সম্পদের উপরে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমি পূর্ণরূপে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করবো এবং তার উপরে আপতিত হবে কঠিন মুসিবত। তখন তার ধৈর্যধারণ করা হয়ে পড়বে অসম্ভব। এখন তোমরা বলো, এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারবে? এক শয়তান বললো, আমি আগুনের গোলা হয়ে যেতে পারি। তখন আমার গমন পথের সবকিছুকে আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারি। ইবলিস বললো, ঠিক আছে, আইয়ুবের উটের পাল যখন চারণভূমিতে বিচরণ করবে তুমি সেগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম কোরো। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই শয়তানটি হয়ে গেলো একটি গোলাকার অগ্নিকুণ্ড। হজরত আইয়ুবের উটের পাল তখন ছিলো চারণভূমিতে। সে আর দেরী না করে ওই উটের পালকে দ্রুতবেগে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে গেলো। ইবলিস তখন একটি উটে চড়ে উট চালক রূপে গিয়ে উপস্থিত হলো হজরত আইয়ুবের বহির্বাটিতে। হজরত আইয়ুব তখন নামাজ পাঠ করছিলেন। উট চালকরূপী শয়তান বললো, হে গৃহস্বামী! আপনার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। আপনার রাখাল ও উটের পাল আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে। হজরত আইয়ুব বলে উঠলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। তিনিই আমাকে ওগুলো দান করেছিলেন, আবার তিনিই এখন তা প্রত্যাহার করে নিলেন। এমনিতেই তো ওগুলো ছিলো ধ্বংসশীল। ইবলিস বললো, আপনার প্রভুপালকই আকাশ থেকে আগুন পাঠিয়ে ওগুলো ভস্মীভূত করে দিয়েছেন। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলো চতুর্দিকে। বিস্মিত হলো সকলে। কেউ কেউ বললো, এতো দিন ধরে আইয়ুব আসলে কারো উপাসনাই করতো না। বরং

প্রতারণায় লিপ্ত ছিলো সে এতোদিন ধরে। কেউ বললো, আল্লাহ্‌ই এই আগুন পাঠিয়েছেন যেনো আইয়ুবের দুশমনেরা আনন্দিত হয় এবং ব্যথিত হয় বন্ধুবর্গ। কেউ কেউ আবার বললো, আইয়ুবের প্রভুপালক যদি শক্তিমান হতো, তবে তার উটের পালগুলোকে রক্ষা করতে পারতো। হজরত আইয়ুব এ সকল কিছুই শুনলেন। তারপর বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্‌! যিনি দিয়েছেন, তিনিই তো তা ফিরিয়ে নিয়েছেন। সর্বাবস্থায় তিনিই প্রশংসার যোগ্য। আমি মাতৃউদর থেকে পৃথিবীতে এসেছিলাম নগ্ন হয়ে। সেভাবেই পৃথিবী পরিত্যাগ করবো এবং সেভাবেই আবার পুনরুত্থিত হবো। আল্লাহ্‌প্রদত্ত বিপদ উপেক্ষা করার অধিকার ও ক্ষমতা কারোরই নেই। বিপদে হা-হুতাশ করা অনুচিত। আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা তা-ই করতে সক্ষম। তিনিই আমাদের সকলের একক সৃজয়িতা ও পালনকর্তা। সুতরাং হে মানুষ! অধিকতর কল্যাণকর সিদ্ধান্ত তো ছিলো শহীদ হওয়া। কিন্তু এখনো তো আমি বর্তমান। তাই মনে হচ্ছে আল্লাহ্‌ হয়তো আমাকে মন্দই ভেবেছেন। তাই ভস্মীভূত করেছেন আমার উটের পালকে, কিন্তু আমাকে রেখেছেন অক্ষত। হজরত আইয়ুবের এরকম মনোভাব ও কথোপকথন শুনে ইবলিস অপদস্থ ও হতাশ হয়ে গেলো। বিমর্ষ বদনে সে ফিরে গেলো তার সাথীদের কাছে। তাদেরকে বললো, আশ্চর্য! আইয়ুবকে তো আমি হতোদ্যম করতে পারলাম না। এক শয়তান বলে উঠলো, বিকট আওয়াজ সৃষ্টি করতে পারি আমি। ওই আওয়াজ তুললে শেষ হয়ে যাবে আইয়ুবের সকল মেষ, বকরী ও সেগুলোর রাখাল। ইবলিস বললো, তবে এক্ষুণি যাও, চিৎকার করে আইয়ুবের সকল ছাগল, মেষ ও তাদের রাখালকে মেরে ফেলো। হুকুম পেয়ে সে ছুটে গেলো অন্য চারণভূমিতে বিচরণরত রাখাল ও তাদের মেষ ও বকরীর পালের নিকটে। বিকট আওয়াজ তুললো সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে মরে গেলো সকল মেষ, ছাগল ও তাদের রাখাল। তখন ইবলিশ রাখালের বেশে হাজির হলো আল্লাহ্‌র জিকিররত হজরত আইয়ুবের কাছে। বললো, গিয়ে দেখুন আপনার মেষ ও ছাগল সব মরে পড়ে আছে। হজরত আইয়ুব আগের মতোই উত্তর দিলেন, আলহামদুলিল্লাহ্‌! আমার কোনো অনুযোগ নেই। ইবলিস বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেলো তার সঙ্গী-সাথীদের কাছে। বললো, আইয়ুবকে তো কাবু করতে পারলাম না। এবার বলো কি করা যায়। এক শয়তান বললো, আমি ইচ্ছে করলে প্রচণ্ড ঝড় হয়ে সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। ইবলিস বললো, তবে তাই করো। তার চাষাবাদের জন্য ব্যবহৃত ষাঁড় ও ক্ষেতের ফসল উড়িয়ে নিয়ে যাও। শয়তানটি তাই করলো। প্রচণ্ড তুফান হয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলো হজরত আইয়ুবের ক্ষেতের ফসল ও ষাঁড়গুলো। পড়ে রইলো শূন্য মাঠ। এবার ইবলিস ক্ষেতের ব্যবস্থাপকের বেশ ধরে হজরত আইয়ুবের নিকটে গিয়ে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা জানালো। হজরত আইয়ুব তবুও

নির্বিকার। আগের মতো একই জবাব দিয়ে তিনি নামাজ পাঠে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর অতুলনীয় সহিষ্ণুতা দেখে ক্ষোভে দুঃখে জর্জরিত হতে লাগলো ইবলিস। সে পুনরায় উঠে গেলো আকাশে। বললো, হে আল্লাহ্! আইয়ুব ভালো করে একথা জানে যে, তুমি তার পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকে যেহেতু অক্ষত রেখেছো, সেহেতু তাদের জীবিকার ব্যবস্থাও তুমি করবে। এবার তুমি আমাকে কর্তৃত্ব দান করো তার সন্তান-সন্ততিদের উপর। দেখবে সে আর ধৈর্য রাখতে পারবে না। তাকে বলা হলো, যাও, এ ক্ষমতাও তোমাকে দেয়া হলো। আকাশ থেকে ফিরে এসে ইবলিস দেখলো, হজরত আইয়ুবের সন্তান-সন্ততিরা একটি প্রাসাদের অভ্যন্তরে বিদ্যাভ্যাস করছে। সে প্রচণ্ড আঘাতে ধসিয়ে দিলো প্রাসাদটি। ছাদ চাপা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করলো নিষ্পাপ বালক-বালিকারা। এবার সে ধারণ করলো শিক্ষকের বেশ। মুখে হাতে শরীরে রক্ত লাগিয়ে নিয়ে নামাজপাঠরত হজরত আইয়ুবের কাছে গিয়ে বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, আপনি এখানে কি করছেন? গিয়ে দেখুন, আপনার আদরের ছেলে মেয়েদের অবস্থা। ছাদ ধসে পড়ে কী হাল হয়েছে তাদের। কারো নাড়ি ভুঁড়ি বের হয়ে গিয়েছে। কারো বের হয়েছে মাথার ঘিলু। ওই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখলে আপনি আর স্থির থাকতে পারবেন না। এবার হজরত আয়ুবের হৃদয় বিগলিত হলো। তিনি কেঁদে ফেললেন। এক মুঠো মাটি মাথায় রেখে বললেন, আক্ষেপ! আমাকে যদি সৃষ্টিই না করা হতো। ইবলিস এবার খুশী হলো। হজরত আইয়ুবকে ধৈর্যহারা হতে দেখে হৃষ্টচিত্তে সে উঠে গেলো আকাশে। হজরত আইয়ুব পরক্ষণেই সম্বিত ফিরে পেলেন। নিজের উক্তির জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন মহান আল্লাহ্র দরবারে। সে ক্ষমাপ্রার্থনা সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেলো আল্লাহ্ সকাশে। ইবলিস যথাস্থানে উত্থিত হওয়ার আগেই এভাবে ক্ষমাপ্রাপ্তির ঘটনা ঘটতে দেখে ইবলিস অপদস্থ হলো আর একবার। বললো, হে আল্লাহ্! তুমি তো আইয়ুবকে এখনো সুস্থ রেখেছো। সে তাই বিশ্বাস করে, শারীরিক সুস্থতার কারণে তুমি তাকে পুনরায় দান করবে ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই সে এখনো তোমার কথা মনে রেখেছে। তুমি আমাকে এবার তার শারীরিক সুস্থতায় হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দাও। দেখবে, তোমার প্রতি সে হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ বিমুখ। জবাবে তাকে জানানো হলো, যাও, এক্ষমতাও তোমাকে দেয়া হলো। কিন্তু তার হৃদয় ও রসনার উপরে তোমার কোনো প্রভাব খাটবে না। ইবলিস খুশী হলো খুব। আকাশ থেকে নেমে সোজা হজরত আইয়ুবের গৃহে গিয়ে দেখলো, তিনি সেজদাবনত। সেজদা থেকে মাথা ওঠাতে না ওঠাতেই ইবলিস তার নাসিকায় দিলো এক অশুভ ফুৎকার। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আইয়ুবের সারা শরীরে জ্বালা পোড়া শুরু হয়ে গেলো। শরীরের বিভিন্ন স্থানে দেখা দিলো

ফোসকা। তিনি সেগুলো চুলকাতে শুরু করলেন। চুলকাতে চুলকাতে খসে পড়লো হাতের নখ। এরপর তিনি সেগুলো চুলকাতে শুরু করলেন অমসৃণ চটের সাহায্যে। সে চটও টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়লো। তারপর তিনি তাঁর শরীরের ক্ষত স্থানগুলো চুলকাতে শুরু করলেন ভগ্ন মৃৎপাত্রের টুকরো দিয়ে। আবার কখনো প্রস্তরখণ্ড দিয়ে। খসে খসে যেতে লাগলো শরীরের গোশত। সমস্ত শরীর থেকে নির্গত হতে লাগলো দুর্গন্ধ। প্রতিবেশীরা তখন তাঁকে গ্রাম থেকে বের করে দিলো। দূরে একটি ঝুপড়ি নির্মাণ করে দিলো তাঁর জন্য। সম্পর্কচ্ছেদ করলো সকলে। তখন তাঁর সঙ্গে রইলো কেবল তাঁর সাধ্বী ও পতিঅন্তঃপ্রাণা সহধর্মিণী রহমত বিনতে আফরাইম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো রহিমা এবং তিনি ছিলেন হজরত ইউসুফের কন্যা। তিনি ওই ঝুপড়ির মধ্যে দিনের পর দিন নীরবে সেবা করে যেতে লাগলেন তাঁর স্বামীর। প্রথম দিকে ইয়াকিন, ইয়ালিব ও সাফের শিথিল সম্পর্ক রক্ষা করলেও শেষে তারাও সম্পর্কচ্ছেদ করলো হজরত আইয়ুবের সঙ্গে। তারা হজরত আইয়ুবের ধর্ম ত্যাগ করলো না, কিন্তু একথা মনে করতে শুরু করলো যে, নিশ্চয় কোনো গোনাহ্র কারণে তাঁকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তাই তারা সম্পর্কচ্ছেদের পূর্বে বললো, এ হচ্ছে পাপের শাস্তি। সুতরাং আপনি তওবা করুন।

এক বর্ণনাকারীর বর্ণনায় এসেছে, ওই বসতিতে ছিলো একজন যুবক ইমানদার। তিনি হজরত আইয়ুব সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার অপমন্তব্য শুনতে পেয়ে বসতির সকলকে সমবেত করে বললেন, হে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ! গুরুজন হওয়ার কারণে আপনারা বিভিন্ন মন্তব্য করার অধিকার রাখেন। কিন্তু আপনারা পুণ্যবান আইয়ুব সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য করে চলেছেন, তা অযথার্থ। তাঁর প্রতি আপনাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি আপনাদের প্রতিও রয়েছে তাঁর অধিকার। তাঁর প্রতি আপনাদের কিছু দায়িত্বও তো রয়েছে। অথচ সে দায়িত্ব পালন না করে আপনারা তাঁকে ক্রমাগত অসম্মান করে চলেছেন। আপনারা কি একথা জানেন না যে, তিনি আল্লাহ্র নবী ও পুণ্যবান? আপনারা কি তাঁকে কখনো কোনো প্রকার অন্যায় করতে দেখেছেন? তবে এখন ভালো করে জেনে নিন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র নির্বাচিত বান্দা। এ যুগের সকল মানুষের চেয়ে তিনি আল্লাহ্তায়ালার অধিকতর প্রিয়ভাজন। প্রিয় পয়গম্বরের প্রতি আল্লাহ্ কখনো অপ্রসন্ন হন না। প্রদত্ত সম্মান কখনো ছিনিয়েও নেন না। আপনারা ভাবছেন, আল্লাহ্ তাঁকে অপমানিত করেছেন। কখনোই নয়। তিনি তাঁর প্রিয় পয়গম্বর, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যবানগণকে এভাবেই বিভিন্ন দুঃখকষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। এমতো পরীক্ষার মাধ্যমে একথা কখনো প্রমাণিত হয় না যে, তাঁরা আল্লাহ্র বিরাগভাজন। বরং এই দুঃখকষ্টই হয় তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির

এক একটি দুর্লভ কারণ। আরো ভেবে দেখুন, তিনি আপনাদের স্বজন, ভ্রাতৃতুল্য। সুতরাং নবী হিসেবে আপনারা যদি তাঁকে না-ও মানেন, তবে তিনি যে আপনাদের স্বজন ও সুহৃদ, সে কথা কি আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন? বিবেকবানেরা কি কখনো বিপদের সময় তাদের বন্ধুকে পরিত্যাগ করে? তিরস্কার করে? অভিসম্পাত দেয়? তিনি তো এখন রোগাক্লিষ্ট ও বেদনাহত। এমতো অবস্থায় তিনি কি হতে পারেন আপনাদের দোষারোপের পাত্র? অথচ তাঁর কোনো দোষের কথা আপনাদের জানাও নেই। অতএব হে শ্রদ্ধার্হ গুরুজনগণ! আপনারা আপনাদের অপউক্তি প্রত্যাহার করুন। সংশোধন করুন আপনাদের মনোবৃত্তি ও আচরণ। প্রদর্শন করুন সহমর্মিতা ও ভালোবাসা। অশ্রুপাত করুন তাঁর বেদনায় ও বিরহে। আপনারা আপনাদের বিবেককে প্রশ্ন করে দেখুন, এরকমই জবাব মিলবে। হে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিত্ববৃন্দ! আল্লাহ্‌র মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পুনঃপুনঃ আলোচনা করুন। স্মরণ করুন মৃত্যুকে। এ পৃথিবীর মায়াতো একদিন সকলকেই ছিন্ন করতে হবে। আপনাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ্‌র কোনো কোনো বান্দা সহৃদয়, জ্ঞানী, স্পষ্টভাষী ও বাগ্মী। কিন্তু আল্লাহ্‌র ভয় তাঁদেরকে নিশ্চুপ করে রেখেছে। তাঁরা আল্লাহ্‌র পরাক্রমের কথা স্মরণ করে শিহরিত হন। হয়ে যান হুঁশহীন ও অনুভূতিহারা। আল্লাহ্‌র রোষতপ্ত মহিমা বা জালালিয়াত অবলোকন করেই তাঁরা এরকম হন। নিজেকে তখন তাঁদের মনে হয় সর্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী। এধরনের ব্যক্তিবর্গই প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানবান ও আল্লাহ্ প্রদত্ত মর্যাদায় মর্যাদায়িত।

অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে প্রদত্ত যুবক ইমানদারের ভাষণ দূরের ঝুপড়িতে থেকেও শুনতে পেলেন হজরত আইয়ুব। বললেন, আল্লাহ্ কখন কাকে কীভাবে যে তাঁর বিশেষ রহমত ও হেকমত প্রদানে ধন্য করেন, তা বোঝা যায় না। যাকে তিনি দয়া করে দান করেন বিশেষ প্রজ্ঞা, তাঁর রসনা থেকেই নিঃসৃত হয় অভিজ্ঞানের অমিয় প্রবাহ। বয়স একটি গৌণ ব্যাপার। আল্লাহ্ কাউকে কাউকে বাল্যবেলাতেই প্রদান করেন দুর্লভ জ্ঞান। তারা তাই বুঝতে পারে সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের অধিকার রয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র।

এই ঘটনার পর থেকে হজরত আইয়ুব পৃথিবীবাসীদের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কায়মনোবাক্যে নিরত হলেন আল্লাহ্‌র আরাধনায়। নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমি তো জানি না তুমি আমাকে কিসের জন্য সৃষ্টি করেছো! হায়! তুমি যদি আমাকে অস্তিত্বায়িতই না করতে। আক্ষেপ! আমি যদি জানতে পারতাম, কী আমার অপরাধ। প্রিয় প্রভুপালক আমার! আমি কী এমন করেছি, যার জন্য তুমি আমার উপরে আপতিত করেছো তোমার বৈমুখ্য। পাপী যদি হই, তবে তুমি তো আমাকে মৃত্যুদান করতে পারতে। আমি নিশ্চিন্তে মিলিত হতাম আমার পিতৃপুরুষগণের সঙ্গে। মৃত্যুই কি এখন আমার জন্য অধিক

উপযুক্ত নয়? হে আমার আপনতম সৃজয়িতা! আমি কি পথিকদের জন্য বিশ্রামাগার এবং পিতৃহীন অসহায়দের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করে দেই নি? দুঃস্থ জনতার তত্ত্বাবধানে ও বৈধব্যগ্রস্তাদের দেখা শুনা কি আমি করিনি? হে আমার দয়াময় প্রভুপালক! আমি তো তোমারই দাস। তুমি যদি আমাকে নিরাময় করো, তবে তা হবে তোমার একান্ত দয়া। কিন্তু আমাকে দুঃখকষ্ট দেয়ার অধিকারও তোমার রয়েছে। তুমি তো আমাকে বানিয়েছো বহ্নিমান বেদনার নিদর্শন। বিশাল পর্বতও তো এ বেদনা বহন করতে পারবে না। আমি তো রক্তমাংসে গড়া দুর্বল মানুষ। বলো, কীভাবে আমি এতো দুঃখ সহ্য করি। দলিত মথিত, ছিন্ন ভিন্ন তৃণগুচ্ছের মতো এই শরীর নিয়ে বলো, আমি এখন কোথায় যাই। কেবল প্রার্থনা করি, তুমি আমার হৃদয় ও রসনাকে সচল, সজীব ও জাগ্রত রাখো। আমি যেনো তোমার ভালোবাসা, নিবেদন ও স্মরণ দ্বারা নিরবচ্ছিন্নভাবে ভরে রাখতে পারি আমার হৃদয় ও রসনা। এটাই এখন আমার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপহার। তুমি আমাকে দেখো। কিন্তু আমি তো তোমাকে দেখি না। তুমি আমার কথা শোনো, কিন্তু আমি তো তোমার কথা শুনি না। আমার প্রতি রয়েছে তোমার সার্বক্ষণিক দৃষ্টিপাত। কিন্তু আমি তো তোমাকে দেখি না। তোমার নৈকট্য আনুরূপ্যবিহীন। তাই হৃদয়ে সর্বক্ষণ যেনো পাই তোমার নৈকট্যের অপার্থিব সৌরভ। রসনায় যেনো পাই যথার্থ নিবেদনের ভাষা। প্রার্থনায় সম্মিত উচ্চারণ।

ওদিকে যুবক ইমানদারের বক্তৃতা শুনে বসতির লোকেরা অনুতাপজর্জরিত মনে সকলে জড়ো হলো হজরত আইয়ুবের ঝুপড়িতে। গিয়ে দেখলো হজরত আইয়ুব তাঁর দীর্ঘ প্রার্থনা শুরু করেছেন। প্রার্থনা শেষে দেখা গেলো উর্ধ্বাকাশে ছায়া বিস্তার করেছে একখণ্ড মেঘ। কেউ কেউ ধারণা করলো, এ আবার আযাবের কোনো মেঘ নয় তো? কিন্তু তাদের ধারণা চূর্ণ করে দিয়ে মেঘ থেকে আওয়াজ উত্থিত হলো— হে আইয়ুব! আল্লাহ্ ঘোষণা করছেন, আমি তোমার সমীপবর্তী। আর আমার এই সামীপ্য তোমার সার্বক্ষণিক সহচর। ওঠো, প্রকাশ করো তোমার বাসনা ও বিচ্ছেদের কথা। শোনো আমার সঙ্গে কারো বাদ-প্রতিবাদ চলে না। কারণ আমি চির অসমকক্ষ ও চির অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হে আমার প্রিয়ভাজন আইয়ুব! তোমার প্রবৃত্তি কি মনে করে, স্বেচ্ছায় সে তার উদ্দেশ্যে উপনীত হতে পারবে? কোথায় তুমি ছিলে সেদিন, যেদিন আমি সৃষ্টি করেছিলাম আকাশ ও পৃথিবী? বিস্তৃত ও বাসযোগ্য করে তুলেছিলাম পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ। তুমি কি জানো, কোন উপকরণ দিয়ে কীভাবে আমি সৃষ্টি করেছি এই মহাবিশ্বকে? পানি কি তোমার নির্দেশে পৃথিবীর মৃত্তিকাকে উপরে ঠেলে তুলেছে? তোমার প্রজ্ঞা কি করতে পেরেছে মৃত্তিকাকে পানির আচ্ছাদন? তখন তুমি ছিলে কোথায়, যখন আমি আকাশকে বহু উঁচুতে স্থাপন করেছিলাম উদ্দাম বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কায়, যে আকাশ কোনো রশির সাহায্যে ঝুলন্ত নয়, অথবা স্থাপিত নয় কোনো স্তম্ভের উপর। তুমি কি তোমার ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এমতো বিন্যাস নির্মাণ করতে পারো? আমি

আকাশকে ভাসিয়ে দিয়েছি আলোয়। সেখানে পরিচালিত করেছি অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জকে। বলো তোমার অঙ্গুলি হেলনে কি দিবস-বিভাবরী বিবর্তিত হয়? যখন আমি মৃত্তিকা ছেদন করে সৃষ্টি করেছি তরঙ্গবিক্ষুব্ধ মহাসাগর, বলতো, কোথায় ছিলে তুমি তখন? তোমার পরিকল্পনায় কি উদ্বেলিত হয় জলধি তরঙ্গ? কে থামিয়ে রেখেছে ওই বিক্ষুদ্ধতাকে? মৃত্তিকার প্রাচীর দিয়ে আমিই তো ঠেকিয়েছি সেই উন্মত্ত তরঙ্গের আঘাত-প্রত্যাঘাত। আর স্থলভাগকে অচঞ্চল করেছি তার পৃষ্ঠদেশে পর্বতমালার পেরেক গেঁথে। ছিলে কোথায় তখন তুমি বলো? তুমি কি জানো, ভারসাম্যের কোন্ পরিমাপ দিয়ে আমি সুস্থির করে রেখেছি মৃক্তিকাস্থিত পাহাড়গুলোকে। এ সকল কিছুর তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা ও নিয়মায়ন কি তোমার পক্ষে সম্ভব? বলো, হে আমার প্রিয় নবী! মেঘপুঞ্জ কীভাবে সৃষ্টি হয়? কীভাবে আকাশে উত্থিত হয় বায়বীয় জলাধার? কীভাবে ঝরে মন্দ-মধুর ও ক্ষিপ্ত-ক্ষিপ্র বৃষ্টিপাত? বলো, বরফ সৃষ্টি হয় কেমন করে? পর্বতায়নের উৎস কোথায়? কীভাবে দিবসের বক্ষে রাত্রি এবং রাত্রির বক্ষে দিবস প্রতিনিয়ত আশ্রয়ায়িত হয়? বলো, বাতাসই বা আসে কোথা থেকে? বৃক্ষরাজি কথা বলে কোন অচেনা ভাষায়? কে সৃষ্টি করেছে মানুষ, বিবেক, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা? কে সৃষ্টি করেছে শ্রুতি ও দৃষ্টির অদৃশ্য আচ্ছাদন? ফেরেশতারা কার কর্তৃত্বাগত? কে তার সর্বত্রগামী শক্তিমত্তা দিয়ে চির পরাভূত করে রেখেছে সমগ্র সৃষ্টিকে? আর কে দান করে সকলকে রহস্যময় জীবনোপকরণ?

হজরত আইয়ুব নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালক! তুমি আমার পরিচয় আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছো। আমি নির্বাক, ভীত ও অভিভূত। আমি বুঝেছি, আমি কেউ নই, কোনো কিছুই নই। আমার রসনা রুদ্ধ। বুদ্ধি অবদমিত। হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তা! তোমার অপার প্রজ্ঞাময়তা ও অনির্ণেয় শক্তিমত্তা প্রকাশ পেয়েছে তোমার বক্তব্যে। তোমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে আমি যা ধারণা করতে সক্ষম, তার চেয়েও তুমি অনেক বড়, মহিমময়। কোনো সৃষ্টি তোমাকে উপেক্ষা করতে পারে না। কোনো কিছু তোমার কাছ থেকে থাকতে পারে না গোপন। হে মহাবিশ্বের মহা অধিকর্তা! পীড়ার তীব্রতা আমাকে নিরুপায় করে ফেলেছে। রোগ যন্ত্রণা আপনাআপনি ভাষা পেয়েছে আমার রসনায়। হায় আক্ষেপ! যদি মৃত্তিকা বিদীর্ণ হতো, আর আমি প্রোথিত হতে পারতাম মৃত্তিকাভ্যন্তরে, তবে হয়তো আমি তোমার মর্যাদার সান্নিধ্যে এরকম কথা উচ্চারণ করতে পারতাম না। নির্মাণ করতে পারতাম না তোমার অপ্রসন্নতার ন্যূনতম কোনো কারণ। মৃত্যুও তো এর চেয়ে উত্তম। অন্তরঙ্গ প্রার্থনা উপস্থিত করাই ছিলো আমার ব্যাকুল প্রাণের একান্ত উদ্দেশ্য। তাই কখনো আমি আর্তনাদ করে উঠেছি, যাতে তুমি আমার নিবেদন কবুল করে নাও। আবার কখনো নিশ্চুপ থেকেছি, যেনো আমার উপরে আপতিত

হয় তোমার দয়া। হে আমার প্রভুসৃজয়িতা! যা বলার আমি তাতো বলেছিই। আর কখনো এমতো অনুযোগ তোমার পবিত্র দরবারে উপস্থাপন করবো না। এই আমি হাত রাখলাম আমার মুখে। জিহ্বা সংলিপ্ত করলাম দন্তরাজিতে। আর মুখমণ্ডলে মাখলাম মৃত্তিকা। আজ কেবল আমি পরিত্রাণার্থী। প্রতীক্ষমান তোমার প্রবলতম রহমতের। সুতরাং আমাকে আশ্রয় দাও। ক্ষমা করো। তোমারই সকাশে আমি আজ একাগ্রচিত্ত প্রার্থী। সাহায্যার্থী। আমার সকল নির্ভরতা এখন তুমি। আমার উদ্দেশ্য সফল করো। বাঁচাও। মাফ করে দাও। তোমার প্রসন্নতাবিরোধী কোনো কিছু আমি আর কোনোদিনই করবো না।

আল্লাহ্ বললেন, আমি সর্বজ্ঞ। আমি জানি তুমি কে। কী। তুমি তো আমারই মনোনীত নবী। আর আমার রহমত আমার গজব অপেক্ষা প্রবল। তুমি ক্ষমা প্রাপ্ত। রহমতপ্রাপ্ত। পৃথিবীর সকল আকর্ষণ থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করেছি। আর তোমাকে করেছি সকল বিপদগ্রস্তদের জন্য উপদেশ। তোমাকে দেখে যেনো সকলে বুঝে নেয়, ধৈর্যশীলতাই হচ্ছে সম্মান লাভের সোপান। এবার তোমার পায়ের গোড়ালী দ্বারা মাটিতে আঘাত করো। দেখবে সেখান থেকে উৎসারিত হচ্ছে স্বচ্ছ ও সুপেয় সলিল। ওই সলিল পান করো। স্নান করো ওই অলৌকিক জলস্রোতে। এরমধ্যে রয়েছে তোমার নিরাময়। নিরাময়ের পর তোমার সঙ্গীদের পক্ষ থেকে কোরবানী করো। ক্ষমা প্রার্থনা করো তাদের জন্য। তারাই তোমার সম্পর্কে আমার বিরাগভাজন হয়েছে। অসৎ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমাকে পরিত্যাগ করেছে।

হজরত আইয়ুব তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন। তীব্র তেজে উত্থিত হলো পানির প্রস্রবন। সকৃতজ্ঞ চিত্তে তিনি ওই পানি পান করলেন এবং তাতে অবগাহনও করলেন। দূর হয়ে গেলো সকল দুঃখ-কষ্ট রোগ-যন্ত্রণা। ইত্যবসরে তাঁর সহধর্মিণী উপস্থিত হলেন সেখানে। প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের জন্য যেখানে তাঁকে রেখে গিয়েছিলেন, সেখানে এসে খুঁজতে থাকলেন তাঁকে। পেলেন না। কাছাকাছি এক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! এখানে যে পীড়িত লোকটি পড়ে ছিলো, তার সম্পর্কে তুমি কি কিছু জানো? ওই সুস্থ ও সুঠাম ব্যক্তিটিই ছিলেন নিরাময় প্রাপ্ত হজরত আইয়ুব। তিনি বললেন, হ্যাঁ। চিনবো না কেনো? একথা বলে তিনি মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, দেখো তো ভালো করে। মৃদু হাসি দেখেই তাঁকে চিনতে পারলেন তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণী। আনন্দে আলিঙ্গন করলেন আল্লাহ্র নবীকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী সেই পবিত্র সত্তার শপথ! হজরত রহিমা হজরত আইয়ুবকে ততক্ষণ পর্যন্ত জড়িয়ে ধরে ছিলেন, যতক্ষণ না হজরত আইয়ুবের ধ্বংস হয়ে

যাওয়া সন্তান-সন্ততি ও পশুপাল পুনর্জীবিত হয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিলো। উপরে বর্ণিত কাহিনীর দিকে লক্ষ্য রেখেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এখানে 'দ্বুররুন' অর্থ দুঃখকষ্ট— দৈহিক, বৈত্তিক অথবা সম্ভ্রমিক।

কামুস রচয়িতা লিখেছেন, শব্দটিকে 'দ্বররুন' ও 'দ্বুররুন' দু'ভাবেই উচ্চারণ করা যায়। শব্দটি একটি মূল শব্দ। 'দ্বুররুন' বললে শব্দটি হয় বিশেষ্যবাচক। বায়যাবী লিখেছেন, দুঃখকষ্ট প্রসঙ্গে 'দ্বররুন' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। সে দুঃখকষ্ট শারীরিকও হতে পারে, অথবা সম্পদগত। আর 'দ্বুররুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল শারীরিক দুঃখকষ্টের ক্ষেত্রে। যেমন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি, অথবা দৈহিক দুর্বলতাগ্রস্ত কোনো লোক।

দুঃখ কষ্টের কাল ও প্রার্থনার সময়ঃ বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস থেকে সুপরিণত সূত্রে জুহ্‌রী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, হজরত আইয়ুব দুঃখকষ্ট ভোগ করেছিলেন আঠারো বছর ধরে। ওহাব ইবনে মুনাববাহ্‌ বলেছেন, পূর্ণ তিন বছর এর এক দিনও বেশী নয়। হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, সাত বছর। এক বর্ণনায় এসেছে সাত বছর সাত মাস সাত দিন। হাসান বসরী বলেছেন, তিনি সাত বছর সাত মাস পীড়িত হয়ে পড়ে ছিলেন বনী ইসরাইল জনপদের পাশের এক জঙ্গলে। তাঁর শরীর ছিলো কীটের বিচরণভূমি। ওই সময় হজরত রহিমা ছাড়া তাঁর কাছে কেউ থাকতো না। হজরত রহিমা তাঁর আহার্য সংগ্রহ করে আনতেন এবং একান্ত দরদ দিয়ে সেবাযত্ন করতেন। অসহনীয় রোগযন্ত্রণা নিয়েও হজরত আইয়ুব আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করতেন। ওই সময় হজরত রহিমাও অংশগ্রহণ করতেন তাঁর সঙ্গে। ইবলিস ওই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠতো এবং তার সকল সঙ্গীসাথীদেরকে একত্র করে বলতো, আল্লাহ্‌র এই বান্দা তো আমাকে একেবারে অক্ষম করে দিলো। তাঁর সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়ে গেলেও সে ধৈর্যধারণ করেছিলো। এখনও তো দেখছি সে প্রকাশ করে চলেছে অধিকতর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। একদিন সে সকলকে এভাবে সমবেত করে বললো, এখন তোমরাই বলো, কীভাবে সাহায্য করতে পারো আমাকে? সঙ্গীরা বললো, আপনি আদমকে জান্নাত থেকে বের করে এনেছিলেন কীভাবে? ইবলিস বললো, আমি তার স্ত্রীকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছিলাম। সাথীরা বললো, তাহলে এখনো তো আপনি সেরকম কিছু করতে পারেন। চেষ্টা করে দেখুন না। সে তার স্ত্রীর বিপরীত কিছু করতে পারবে না। আর তার স্ত্রী ব্যতীত তার কাছে কেউ যায়ও না। ইবলিস বললো, ঠিক বলেছো তোমরা। এরপর সে এক পুরুষের আকৃতিতে উপস্থিত হলো হজরত রহিমার সামনে। বললো, হে আল্লাহ্‌র দাসী! তোমার স্বামী কোথায়? তিনি বললেন, ঝুপড়ির মধ্যে। তিনি তো কঠিন রোগে আক্রান্ত। সারা শরীরে তাঁর ফোঁড়া। তাই সারাক্ষণ শরীর চুলকাতে হয়। আর সেখানে সারাক্ষণ বিচরণ করে

অসংখ্য কীট। ইবলিস একথা শুনে মনে মনে প্রীত হলো। খুঁজে পেলো ধৈর্যহীনতার গন্ধ। আশা পোষণ করলো, এই ধৈর্যহীনতার সূত্র ধরে হয়তো তাকে কাবু করা যাবে। সে তখন বলতে শুরু করলো, হায় কতো কিছু ছিলো তোমার স্বামীর। ক্ষেত, খামার, পশুপাল, সুদৃশ্য বসতবাটী, আর শরীর ভরা যৌবন। কি নিদারুণ অদৃষ্ট! আজ যে সেগুলোর কোনো কিছুই নেই। কে জানে আর কখনো শেষ হবে কিনা এই ঘোর দুঃখের অমানিশা।

হাসানের বর্ণনায় এসেছে, ইবলিসের কথাগুলো শুনে পতি অন্তঃপ্রাণা রহিমা আর্তনাদ করে উঠলেন। শয়তান তাঁর আর্তনাদ শুনে বুঝতে পারলো, এই রমণীর ধৈর্য এখন টলটলায়মান। সে আশাধারী হয়ে একটি বকরির বাচ্চা পুণ্যবতী রহিমাকে এনে দিয়ে বললো, আইয়ুবকে বলো, সে যেনো এই বাচ্চাটি গায়রুল্লাহ্র নামে জবাই করে। এরকম করলেই সে সুস্থ হয়ে যাবে। স্বামীর সুস্থতার কথা শুনে হজরত রহিমা আশান্বিত হলেন। স্বামীর কাছে পৌঁছানোর আগেই দূর থেকে বলতে শুরু করলেন আমি তো বুঝতে পারছি না, আর কতদিন আপনার প্রভুপালক আপনাকে দুঃখকষ্টে রাখবেন। কোথায় গেলো আপনার সম্পদ, সন্তানাদি, বন্ধুবান্ধব, সুদর্শন অবয়ব ও সুঠাম দেহ? সুতরাং আমার কথা শুনুন। এই বকরির বাচ্চাটিকে গায়রুল্লাহ্র নামে জবাই করুন। আপনার দুঃখ কষ্ট আর থাকবে না। আপনি হয়ে যাবেন সবল ও সুস্থ। হজরত আইয়ুব বললেন, বুঝতে পেরেছি আল্লাহ্র দুশমন ইবলিস তোমার কাছে এসেছিলো। তোমার উপরে সে প্রভাব বিস্তার করেছে। তোমার অকল্যাণ হোক। বলো, সম্পদ, সন্তানাদি, পশুপাল তোমাকে কে দিয়েছিলো? তাঁর স্ত্রী বললেন, আল্লাহ্। হজরত আইয়ুব বললেন, কতোদিন ধরে আমরা সেগুলো ভোগ করেছি? রহিমা বললেন, আশি বছর ধরে। হজরত আইয়ুব বললেন, দুঃখকষ্ট চলছে কতোদিন ধরে? রহিমা বললেন, সাত বছরের অধিক কাল। হজরত আইয়ুব বললেন, যেহেতু সুখ ছিলো আশি বছর, সেহেতু দুঃখও তো আশি বছর হওয়াই সমীচীন। আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্ যদি আমাকে আরোগ্য দান করেন, তবে আমি তোমাকে আশিটি বেত্রাঘাত করবো। তুমি আমাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে কোরবানী করতে বলো। যাও, তোমার আনীত আহার্যদ্রব্য আজ থেকে আমার জন্য হারাম। এখন থেকে তুমি ও আমি পৃথক। আমাকে আর তোমার মুখ দেখিয়ো না। এভাবে হজরত আইয়ুব তাঁর স্ত্রীকে বের করে দিলেন। বিরহবিধুরা পুণ্যবতী রহিমা অবনতমস্তকে প্রস্থান করলেন সেখান থেকে। হজরত আইয়ুব হয়ে পড়লেন নিঃসঙ্গ। তিনি দেখলেন, পানাহারের ব্যবস্থা, সেবাযত্ন করার লোক, বন্ধু-বান্ধব কোনো কিছুই তাঁর নেই। তিনি তখন সেজদায় লুটিয়ে পড়ে বললেন, হে আমার প্রভুপালক! আমি দুঃখকষ্টে পড়েছি, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে উপস্থাপিত প্রার্থনায় হজরত আইয়ুব সোজাসুজি আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চাননি। কেবল তাঁর দূরবস্থার কথা বলেছেন এভাবে— আমি দুঃখকষ্টে পড়েছি। তারপর অকুণ্ঠচিত্তে আল্লাহ্‌র দয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন এভাবে— তুমিতো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

এর পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং আমার নিকট থেকে দয়া ও ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ তার দুঃখকষ্ট দূরীভূত করে দিলাম।'

হজরত আইয়ুবকে তখন নির্দেশ দেয়া হলো, পায়ের গোড়ালী দিয়ে মাটিতে আঘাত করো। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। সহসা সেখান থেকে উদ্‌গত হলো একটি উচ্ছলিত ঝর্ণা। পুনঃ নির্দেশ দেয়া হলো, গোসল করো। তিনি ওই পানিতে গোসল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রোগমুক্ত হয়ে গেলো তার শরীরের বহিরাবরণ। সম্মুখে অগ্রসর হলেন তিনি। চল্লিশ কদম যেতেই পুনঃনির্দেশ ঘোষিত হলো, পায়ের গোড়া দিয়ে মাটিতে আঘাত করো। এ নির্দেশটিও তিনি যথারীতি পালন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে উদ্‌গিরিত হলো শীতলসলিলবিশিষ্ট আর একটি নহর। আদেশ ঘোষিত হলো, পান করো। তিনি ওই ঝর্ণার পানি পান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে গেলো তাঁর শরীরের অভ্যন্তর ভাগ। তিনি পরিণত হলেন সুন্দর অবয়বধারী ও সুঠাম দেহবিশিষ্ট এক যুবকে। উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করলেন তিনি। ডানে বামে দৃষ্টিপাত করে হয়ে গেলেন অভিভূত। সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর পুনর্জীবনপ্রাপ্ত সন্তান-সন্ততিকে, প্রাসাদ, ক্ষেতখামার, ফসল, পশুপাল সবকিছুকে আল্লাহ্ করে দিয়েছেন দ্বিগুণ। ঝর্ণার পানি তখনো ছিটকে পড়ছিলো তাঁর বক্ষের উপর। তিনি দেখলেন আর এক বিস্ময়। পানির প্রতিটি ফোঁটা হয়ে যাচ্ছে একেকটি স্বর্ণের ফড়িঙ। ফড়িঙগুলোকে ধরবার জন্য হস্ত প্রসারিত করলেন তিনি। আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করলেন, আইয়ুব! আমি কি তোমাকে বিত্তশালী করিনি? তিনি বললেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! অবশ্যই। কিন্তু এ যে তোমার অতিরিক্ত দান। এরকম অতিরিক্ত দান থেকে মুখ ফিরায় কে? দাতা তো তুমিই। তোমার দান থেকে বিমুখ হওয়া কি শোভন? হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, নবী আইয়ুব তখন গোসল করেছিলেন নগ্ন হয়ে। আর সোনার ফড়িঙগুলো ওই সময় পতিত হচ্ছিলো তাঁর উপরে। তিনি সেগুলোকে ধরে ধরে পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে ভরে রাখতে শুরু করলেন। ঘোষিত হলো— আইয়ুব! তোমাকে তো আমি অনেক দিয়েছি। তবুও এগুলো সংগ্রহ করছো কেনো? হজরত আইয়ুব বললেন, তোমার মাহাত্ম্যের শপথ! তুমি আমাকে অবশ্যই অনেক দিয়েছো। কিন্তু তুমি এখন যা দান করছো সেই দান থেকে আমিতো অমুখাপেক্ষী হতে পারি না।

হাসান বর্ণনা করেছেন, নিরাময় লাভের পর হজরত আইয়ুব গিয়ে বসলেন একটি উঁচু স্থানে। ওদিকে তাঁর পুণ্যবতী সহধর্মিণী অনেক দূরে চলে যেতে গিয়েও পারলেন না। ভাবলেন, আল্লাহ্‌র নবীর আহার্যের ব্যবস্থা করবে কে? সেবাশুশ্রূষা করতেই বা কে এগিয়ে আসবে? অরণ্যের হিংস্র প্রাণীরা যদি আক্রমণ করে বসে? এসকল কিছু ভেবে তিনি পুনরায় ফিরে গেলেন ওই ঝুপড়ির দিকে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলেন তিনি নেই। ঝুপড়িটিরও কোনো চিহ্ন নেই। কেমন যেনো পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে সব। কোনো কিছু বুঝতে না পেরে তিনি অশ্রুপাত করতে লাগলেন অঝোর ধারায়। নিকটেই উঁচু টিলায় উপবিষ্ট হজরত আইয়ুব সব কিছু দেখছিলেন। তাঁর পরনে তখন শোভা পাচ্ছে অতিসুন্দর একটি পোশাক। আর নিজেও তখন সুন্দর ও সুঠামদেহী এক যুবক। হজরত রহিমা তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কিন্তু চিনতে পারলেন না। ভয়ে কোনো প্রশ্নও করতে পারলেন না। হজরত আইয়ুব তখন তাঁকে কাছে ডাকলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র দাসী! কী চাও তুমি? কাঁদছো কেনো? হজরত রহিমা বললেন, আমি এখানে একজন পীড়িত ব্যক্তিকে রেখে গিয়েছিলাম। তিনি আমার স্বামী। আমি তাঁকেই খুঁজছি। হজরত আইয়ুব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্বামী তাহলে নিহত হয়েছেন? হজরত রহিমা একথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। হজরত আইয়ুব বললেন, তাকে দেখলে কি তুমি চিনতে পারবে? হজরত রহিমা বলবেন, কেউ কি তার স্বামীকে না চিনে পারে? একথা বলে তিনি ভয়ে ভয়ে হজরত আইয়ুবের দিকে একবার ভালোভাবে দৃষ্টিপাত করলেন। বললেন, তিনি যখন সুস্থ ছিলেন, তখন তাঁর চেহারা ছিলো আপনার মতো। হজরত আইয়ুব বললেন, আমিই তো আইয়ুব। তুমি আমাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে কোরবানী করার পরামর্শ দিয়েছিলে। কিন্তু সে শয়তানী প্ররোচণার দিকে আমি ভ্রূক্ষেপও করিনি। আমি আল্লাহ্‌র কাছে নিরাময় চেয়েছিলাম। তিনি আমার প্রার্থনা কবুল করেছেন। এই দেখো, আমি এখন কেমন সুস্থ ও সবল।

ওহাব বর্ণনা করেছেন, হজরত আইয়ুব বেশ কয়েক বছর ধরে দুঃখ যাতনা ভোগ করেছিলেন। ইবলিস প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো তাঁর ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি, ক্ষেতখামার ও শরীরের উপর। কিন্তু এতো কিছু করেও সে যখন হজরত আইয়ুবকে আল্লাহ্‌র জিকির থেকে টলাতে পারলো না, তখন সে সুন্দর একটি ঘোড়ায় চড়ে দেখা করলো তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীর সঙ্গে। সে-ও ধারণ করলো আকর্ষণীয় রূপ। সে প্রথমে দাঁড়িয়ে রইলো বিবি রহিমার গমনপথের পাশে। কিছুক্ষণ পর তাঁকে আসতে দেখে বললো, তুমিই কি আইয়ুবের হতভাগিনী স্ত্রী? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইবলিস বললো, তুমি কি আমাকে চেনো? তিনি বললেন, না। ইবলিস বললো, আমি পৃথিবীর দেবতা। আমিই আইয়ুবকে পীড়িত করে রেখেছি।

কারণ সে আমাকে ছেড়ে আকাশের আল্লাহ্‌র উপাসনা করে যাচ্ছিলো। আমি তার প্রতি খুবই অপ্রসন্ন। এখনও সময় আছে, সে যদি আমাকে মাত্র একবার সেজদা করে, তবে আমি ফিরিয়ে দিবো তার হারিয়ে যাওয়া সম্পদ ও সন্তানাদি। ওগুলো আমার কাছেই জমা আছে। ওই দ্যাখো, একথা বলে সে পাশের মরুভূমির দিকে বিবি রহিমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি দেখলেন, সেখানে চরে বেড়াচ্ছে হজরত আইয়ুবের পশুপাল, আর দাঁড়িয়ে আছে মৃত সন্তান-সন্ততিরা। ওহাব আরো বর্ণনা করেছেন, একথাও আমার নিকটে এসেছে যে, ইবলিস তখন বলেছিলো, তোমার স্বামী যদি আহার গ্রহণের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ না বলে, তবে তাকে সুস্থ করে দেয়া হবে।

কোনো কোনো গ্রন্থে রয়েছে, ইবলিস বললো, হে আইয়ুব পত্নী! তুমি যদি আমাকে একবার সেজদা করো, তবে আমি তোমার স্বামীকে সুস্থ করে দিবো। ফিরিয়ে দিবো ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। হজরত রহিমা পীড়িত স্বামীর কাছে এসে একথা জানালেন। হজরত আইয়ুব বললেন, তুমি তো পড়েছো আল্লাহ্‌র দুশমনের পাল্লায়। আমিও শপথ করছি, আল্লাহ্ আমাকে সুস্থ করে দিলে আমি তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করবো। হজরত আইয়ুব এরকম বলেও স্বস্তি পেলেন না। তিনি আশংকা করলেন, ইবলিস যদি এভাবে তাঁর স্ত্রীকে ইমানহারা করে দেয়। এই আশংকার কারণেই তিনি সেজদাবনত হয়ে বলে উঠলেন, হে আমার প্রভুপালক! আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি, তুমি তো দয়াবানগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। আল্লাহ্ তখন পুণ্যবতী ও সেবাপরায়ণা রহিমার কারণে হজরত আইয়ুবকে সুস্থ করে দিলেন এবং তাঁকে জানিয়ে দিলেন, তার প্রতি কঠোর হয়ো না। একশত ছোট ডাল একত্র করে একবার মৃদু আঘাত করো তার শরীরে। এরকম করলেই তোমার শপথ পূর্ণ হয়ে যাবে। তুমিও তখন আর শপথভঙ্গের দায়ে দায়ী হবে না।

অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, ইবলিস একটি বাক্সে কিছু ঔষধপত্র ভর্তি করে চিকিৎসকের বেশে বিবি রহিমার গমনপথে এসে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পর তিনি সেখানে এসে অচেনা চিকিৎসককে দেখতে পেয়ে বললেন, আপনিতো মনে হয় চিকিৎসক। আমার স্বামী অসুস্থ। আপনি তাকে সুস্থ করে দিতে পারবেন? ইবলিস বললো, তা পারবো। তবে সুস্থ হওয়ার পর তাকে একথা স্বীকার করতে হবে যে, আমিই তাকে সুস্থ করে দিয়েছি। বিবি রহিমা স্বামীর কাছে গিয়ে একথা জানালেন। হজরত আইয়ুব বললেন, লোকটি ইবলিস। সে তোমাকে ধোকা দিয়েছে। আমি শপথ করলাম, সুস্থ হলে আমি তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করবো।

ওহাব ও অন্যান্যের বর্ণনায় এসেছে, পতিপ্রাণা রহিমা শ্রমের বিনিময়ে যা উপার্জন করতেন, তাই দিয়ে তাঁদের দুজনের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা চলতো । এই নিয়ে লোকেরা নানা কথা বলতে শুরু করলো। তিনি ছোঁয়াচে রোগীর কাছে থাকেন, তাই তার দ্বারা কাজ করানো ঠিক নয়— এরকম মন্তব্য করতে শুরু করলো অনেকে। অবস্থা এমন পর্যায়ে দাঁড়ালো যে, শেষে কেউ আর তাঁকে কাজ দিতে চাইলো না। সবাই তাঁকে দেখলেই দূরে সরে যায়। নিরুপায় রহিমা তাই একদিন তাঁর কেশ কর্তন করে তার বিনিময়ে সংগ্রহ করে আনলেন একটি রুটি। হজরত আইয়ুব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাথার চুল কী হলো? রহিমা খুলে বললেন সব। হজরত আইয়ুব তৎক্ষণাৎ সেজদায় লুটিয়ে পড়ে বললেন, হে আমার প্রভুপালয়িতা! আমি পড়েছি ঘোর দুঃখকষ্টের মধ্যে। আর তুমি তো দয়ার্দ্র-চিত্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক দয়াময়। কেউ কেউ বলেছেন, যখন তাঁর ক্ষতস্থানগুলোর কীট চড়াও হলো তাঁর বক্ষাভ্যন্তরে ও রসনায়, তাঁর জিকির বন্ধ হয়ে যায় কিনা, এই আশংকাতেই তিনি তখন ওরকম করে বলেছিলেন।

হাবিব বিন সাবেত বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের এই বক্তব্যটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন তখন, যখন তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিলো তিনটি ঘটনা— ১. একদিন তাঁর দু'জন সুহৃদ এসে দেখলো, তাঁর সারা শরীর রক্তাক্ত, চোখ দু'টিও নষ্ট হওয়ার পথে। তখন তারা বললো, আল্লাহ্র কাছে তোমার কোনো মর্যাদা থাকলে তোমার এ অবস্থা কখনো হতো না। ২. উপায়ন্তর না দেখে তাঁর স্ত্রী নিজের মাথার চুলের বিনিময়ে সংগ্রহ করে আনলেন কিছু খাদ্য। ৩. ইবলিস বললো, আমি তাকে নিরাময় করে দিতে পারি কিন্তু তাকে বলতে হবে, আমিই তার আরোগ্যদাতা ।

এরকমও বলা হয়েছে যে, ইবলিস একদিন হজরত আইয়ুবকে এই মর্মে কুমন্ত্রণা দিলো যে, তোমার স্ত্রী অসতী, তাই মানুষ শাস্তিস্বরূপ তার চুল কেটে নিয়েছে। হজরত আইয়ুব তখন উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, আমি তোমাকে দান করবো একশত বেত্রদণ্ড। তারপর তিনি পেশ করেছিলেন তাঁর দুঃখ কষ্টের কথা।

আলেমগণ বলেন, 'আমি দুঃখ কষ্টে পড়েছি' কথাটির অর্থ হবে এখানে— মানুষের অবজ্ঞা ও আনন্দ আমাকে ফেলে দিয়েছে অধিকতর দুঃখকষ্টের মধ্যে। এক বর্ণনায় এসেছে, আরোগ্য লাভের পর একবার আল্লাহ্র প্রিয় নবী আইয়ুবকে জিজ্ঞেস করা হলো, রোগ ভোগকালে আপনি সবচেয়ে বেশী কষ্ট পেতেন কখন? তিনি বললেন, যখন শত্রুরা আমার দুর্দশা দেখে আনন্দিত হতো।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, একদিন হজরত আইয়ুব দেখলেন, ক্ষতস্থানের একটি পোকা মাটিতে পড়ে গেলো। তিনি সেটিকে উঠিয়ে পুনঃ স্থাপন করলেন তাঁর উরুদেশে। বললেন, আল্লাহ্ আমার শরীরে রেখেছেন তোমার আহার। তুমি

চলে যাচ্ছো কেনো? একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পোকাটি দংশন করতে শুরু করলো দ্বিগুণ শক্তিতে। হজরত আইয়ুব সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলেন— হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমি দুঃখকষ্টে নিপতিত হয়েছি।

একটি রহস্যঃ হজরত আইয়ুব ছিলেন সাবেরশ্রেষ্ঠ। অথচ আলোচ্য আয়াতে দেখা যাচ্ছে, তিনি তাঁর দুঃখকষ্টের কথা বলে ধৈর্যহারার পরিচয় দিচ্ছেন। এরকম ধৈর্যচ্যুতিপ্রকাশক বক্তব্য এসেছে অন্য আয়াতেও। যেমন— শয়তান তো আমাকে ফেলেছে কষ্ট ও যন্ত্রণায় (সুরা সোয়াদ)। এর রহস্য কী?

রহস্যভেদঃ এগুলো তাঁর কোনো অভিযোগ ছিলো না। তাই তাঁর এমতো বক্তব্যে ধৈর্যভঙ্গের কোনো প্রভাব নেই। বরং ওগুলো ছিলো তাঁর প্রার্থনা। তাই এখানে বলা হয়েছে— আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। অর্থাৎ তার দোয়া কবুল করলাম। আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর বান্দা দুঃখকষ্টের কথা জানাবেই। প্রিয়তমজনকে নিজের দুঃখকষ্টের কথা জানানোতে কোনো দোষ নেই। এরকম বক্তব্য অভিযোগ নয়, বরং আপনজনোচিত অনুযোগ। এরকম অনুযোগের কথা বিবৃত হয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'আমি আল্লাহ্‌র কাছে আমার অভ্যন্তরীণ কষ্ট ও দুশ্চিন্তার অনুযোগ করি।'

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে এবং তার দুঃখবেদনার কথা অপর কাউকে না জানিয়ে কেবল জানায় আল্লাহ্‌কে, সে ধৈর্যহীন নয়। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে রসুল স. এর পীড়িতাবস্থায় হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে বললেন, কেমন আছেন? তিনি স. বললেন, চিন্তাযুক্ত ও অস্থির। আমি বলি, ইবনে জওজীও এরকম বর্ণনা এনেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে, যেখানে বলা হয়েছে, জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে রোগগ্রস্ত রসুলকে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে সালাম প্রেরণ করেছেন এবং জিজ্ঞেস করতে বলেছেন, আপনি কেমন আছেন?

এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স.কে রোগযন্ত্রণায় কাতর হতে দেখে একসময় জননী আয়েশা বলে উঠলেন, হায় আমার মাথা! রসুল স. বললেন, আয়েশা! তোমার মাথা, না আমার মাথা? আমার মস্তক যে যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। ইবনে ইসহাক ও ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, জান্নাতুল বাকী কবরস্থান থেকে ফিরে এসে শয্যাগ্রহণ করলেন আল্লাহ্‌র রসুল। আমার তখন প্রচণ্ড মাথা ধরেছিলো। তাই বললাম, হায় আমার মাথা! তিনি বললেন, আয়েশা! আমার মাথাও যে যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরো দিয়েছিলাম।'

আল্লাহ্পাক হজরত আইয়ুবের মৃত পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকে পুনর্জীবিত করে দিয়েছিলেন, না তাদের মতো অবিকল অন্যান্য পরিজন ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে যথেষ্ট মতপ্রভেদ রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে মাসউদ, কাতাদা, হাসান, এবং অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁর মৃত পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকেই পুনরায় জীবিত করে দিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে আরো সমসংখ্যক পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিও দিয়েছিলেন। আলোচ্য বাক্যের প্রকাশ্য ব্যাখ্যা এরকমই।

হাসান বলেছেন, মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করা হয়নি। বরং তাঁকে দেয়া হয়েছিলো পূর্ববর্তীদের সমসংখ্যক নতুন পরিবার পরিজন। জুহাকের এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর স্ত্রীকে পুনরায় যৌবনবতী করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর উদর থেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলো ছাব্বিশটি সন্তান। ওহাব বলেছেন, জন্মগ্রহণ করেছিলো সাত কন্যা ও তিন পুত্র। ইবনে ইয়াসার বলেছেন, সাত পুত্র ও সাত কন্যার কথা।

সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে এসেছে, হজরত আইয়ুবের শস্যক্ষেত্র ছিলো দু'টি— একটি গমের, আর একটি যবের। আল্লাহ্র হুকুমে দু'জন ফেরেশতা ওই বিরান শস্যক্ষেত্র দু'টোর একটিতে স্বর্ণের বৃষ্টি বর্ষণ করলো এবং আরেকটিতে করলো রৌপ্যের বৃষ্টিপাত।

এক বর্ণনায় এসেছে, তখন হজরত আইয়ুবের কাছে এক ফেরেশতা এসে বললো, অভূতপূর্ব ধৈর্যাবলম্বনের কারণে আল্লাহ্ আপনাকে সালাম প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন, বাইরে বেরিয়ে শস্যাগারের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে। নির্দেশানুসারে তিনি গৃহের বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, শস্যাগারের উপরে উড়ছে স্বর্ণের ফড়িঙ। হজরত আইয়ুব একটি উড়ন্ত ও ছুটন্ত ফড়িঙকে ধরে ফেললেন। ফেরেশতা বললো, এরকম অনেক ফড়িঙতো আপনার শস্যাগার পরিপূর্ণ করেছে। ওগুলোই কি যথেষ্ট ছিলো না? হজরত আইয়ুব বললেন, এতো আমার প্রভুপালক প্রদত্ত বরকত। আমি তাঁর বরকতের প্রতি আকৃষ্ট হবো না কেনো?

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর পরিবার পরিজন ও পশুপালকে পুনর্জীবিত করেননি। বরং নতুন করে তাঁদের অনুরূপ পরিবার পরিজন তাঁকে দান করেছিলেন। ইকরামা বলেছেন, হজরত আইয়ুবকে বলা হয়েছিলো, তোমার মৃত সন্তান-সন্ততিকে তুমি পাবে আখেরাতে। তবে তুমি যদি চাও, তবে আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই ফিরিয়ে দিবো। আর যদি না চাও, তবে আমি তোমাকে দান করবো সমসংখ্যক ও সমআকৃতি বিশিষ্ট নতুন সন্তান-সন্ততি। এই বর্ণনাটিকে গ্রাহ্য করা হলে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— আমি আইয়ুবের মৃত সন্তান-সন্ততি রেখে দিয়েছিলাম আখেরাতের জন্য এবং তাদের অনুরূপ সন্তান-সন্ততি তাকে দিয়েছিলাম দুনিয়ায়। এখানে 'আহল' শব্দটির অর্থ হবে সন্তান-সন্ততি।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ○ وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

❑ এবং স্মরণ কর ইসমাইল, ইদরীস ও জুল-কিফল এর কথা, তাহাদিগের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল।

❑ এবং তাহাদিগকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করিয়াছিলাম; তাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এবার শুনুন, ইসমাইল, ইদ্রিস ও জুলকিফলের বৃত্তান্ত। তারা প্রত্যেকেই ছিলো ধৈর্যাবলম্বী।

জুলকিফল পয়গম্বর ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। আতা বলেছেন, বনী ইসরাইলের এক পয়গম্বরকে একবার এই মর্মে প্রত্যাদেশ করা হলো যে, তোমার পরলোক গমনের সময় আসন্ন। সুতরাং তোমার স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করো। লোকজনকে ডেকে বলো, রাতে নামাজ পাঠ, দিনে রোজা পালন, মানুষের মোকাদ্দমার যথামীমাংসা, ক্রোধমুক্ত জীবন— এসকল কিছু করতে যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে সে-ই হবে তোমার পরবর্তী প্রতিনিধি। তিনি তাই করলেন। তাঁর ঘোষণা শুনে জনসমাবেশের মধ্য থেকে এক যুবক উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, উল্লেখিত বিষয়ে আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ হলাম। যুবকের বক্তব্য শুনে সকলে আশ্বস্ত হলো। ওই যুবকের নাম জুলকিফল। আল্লাহ্‌পাক তাঁকে নবুয়ত দান করেছিলেন।

মুজাহিদ বলেছেন, নবী আল ইয়াসা যখন বয়োবৃদ্ধ হলেন, তখন নির্বাচন করতে চাইলেন তাঁর স্থলাভিষিক্তজনকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, জীবদ্দশায় তাকে দায়িত্ব দিয়ে তিনি দেখবেন, তাঁর অনুসারীগণের সঙ্গে সে কেমন ব্যবহার করে। একথা ভেবে তিনি তাঁর অনুসারীগণকে একত্র করলেন। বললেন, আমার তিনটি কথা পালনের অঙ্গীকার যে করবে, তার উপরে আমি আমার কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে অবসর গ্রহণ করবো— ১. দিবসের রোজা ২. নিশীথের নামাজ এবং ৩. বিচার সালিশের রোষবিবর্জিত মীমাংসা। একথা শুনে উঠে দাঁড়ালো এক ক্ষীণকায় ব্যক্তি। বললো, এ বিষয়ে আমি অঙ্গীকার করতে আগ্রহী। কিন্তু হজরত ইয়াসা তাকে পছন্দ করলেন না। কিছুদিন পর তিনি এক জনসমাবেশে পুনরায় উত্থাপন করলেন তাঁর এই প্রস্তাব। সেদিনও উঠে দাঁড়ালো ওই ক্ষীণকায় যুবকটিই। বললো, আমি প্রস্তুত। হজরত আল ইয়াসা এবার তাঁর কথা গ্রহণ করলেন।

দায়িত্ব প্রদান করলেন প্রতিনিধিত্বের। একদিনের ঘটনা। দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তিনি সবে মাত্র তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছেন, সাথে সাথে দরজায় কে যেনো করাঘাত করলো। মানুষের বেশধারী ওই আগন্তুক ছিলো ইবলিস। ভিতর থেকে প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করলেন কে? ইবলিস বললো, আমি এক মজলুম বৃদ্ধ। প্রতিনিধি দরজা খুলে বাইরে এলেন। বৃদ্ধ বললো, আমার ও আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়েছে। এই বলে সে তার কাল্পনিক বিবাদ বিসংবাদের দীর্ঘ ফিরিস্তি দিতে শুরু করলো। ফলে অতিক্রান্ত হলো তাঁর বিশ্রামের সময়। প্রতিনিধি বললেন, তোমার কথা শুনতে শুনতে তো অনেক সময় অতিক্রান্ত হলো। ঠিক আছে কাল সন্ধ্যায় এসো, তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবো। বৃদ্ধ চলে গেলো। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় সে আর এলো না। প্রতিনিধি এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করে তাঁকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু সমাবেশের কোনো স্থানে তাকে দেখা গেলো না। পরদিনও বিচারের জন্য এলো না সে। এলো দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামের সময়। আগের মতো বাইরের দরজায় খট্ খট্ আওয়াজ তুললো। প্রতিনিধি দরজা খুলে বাইরে এলেন এবং বললেন, আমি যখন মজলিসে বসি তখন তুমি আসো না কেনো? বৃদ্ধ বললো, লোকগুলো খুব খারাপ। আপনি এজলাসে বসলে তাঁরা বলে, আমরা তোমার প্রাপ্য দিয়ে দিবো। আর আপনি যখন এজলাস ছেড়ে চলে আসেন তখন বলে, যাও আমরা তোমাকে কিছুই দিবো না। প্রতিনিধি বললেন, এখন যাও, আগামী দিন বিচারের সময় উপস্থিত হয়ো। এভাবে বৃদ্ধের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে সেদিনও বিশ্রামের সময় চলে যাবার উপক্রম হলো। পরদিন বিচারস্থলে উপস্থিত হয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে বৃদ্ধটিকে খুঁজলেন তিনি। কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পেলেন না। উল্লেখ্য যে, ওই প্রতিনিধি সারারাত নামাজ পড়তেন এবং সারা দিন রোজা রাখতেন। সামান্য সময়ের জন্য নিদ্রা যেতেন কেবল দুপুরের সময়। পরপর দু'দিন বিশ্রাম বিঘ্নিত হওয়ার কারণে সেদিন তিনি তাঁর এজলাসে বসেই তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। তাই তৃতীয় দিবসে তিনি তাঁর গৃহপরিচারককে নির্দেশ দিলেন, আমার চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। এখন আমার নিদ্রা ও বিশ্রামের সময়। এসময় কাউকে তুমি আমার ঘরের কাছে আসতে দিয়ো না। একথা বলে তিনি তাঁর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করলেন। তখন এলো ওই বৃদ্ধ। কিন্তু পরিচারক তাকে কাছে ভিড়তে দিলো না। নিরুপায় হয়ে সে ফিরে যাচ্ছিলো। হঠাৎ দেখলো আলো বাতাস আসার জন্য ঘরের দেয়ালে রয়েছে একটি ছিদ্রপথ। পরিচারকের অগোচরে গোপন ওই ছিদ্র পথ দিয়ে একসময় সে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। দেখলো, প্রতিনিধি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাঁকে জাগিয়ে তুলবার জন্য সে তখন দরজার ভিতরে দিক থেকে খট্ খট্ আওয়াজ তুললো। ঘুম ভেঙে গেলো প্রতিনিধির।

তিনি তাঁর পরিচারককে জোরে ডেকে বললেন; তোমাকে কি বলিনি এখানে কাউকে আসতে দিয়ো না। বাইরে থেকে চিৎকার করে পরিচারক বললো, এদিক থেকে তো কেউ যায়নি। দেখুন না, দরজা তো এখনো বন্ধ। প্রতিনিধি দেখলেন, সত্যিই তাই। দরজা বন্ধ। অথচ ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই রহস্যময় বৃদ্ধ। সে বললো, বিচারপ্রার্থীরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর আপনি ঘুমাবেন? প্রতিনিধি এবার তাকে চিনতে পেরে বললেন, হে আল্লাহ্র দুশমন! তুমিতো ইবলিস। ইবলিস বললো, আপনি তো আমাকে পরাস্ত করলেন। আপনাকে ক্রোধান্ধ করবার জন্য আমি এতো কিছু করলাম, কিন্তু আমার সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে গেলো। সত্যিই আপনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। উল্লেখ্য যে, ওই যুবক প্রতিনিধি ছিলেন জুলকিফল। তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করেছিলেন।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, একদিন ইবলিস মানুষের বেশে জুলকিফলের কাছে এসে বললো, এক লোক আমার কাছে ঋণী। কিন্তু সে তার ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে টালবাহানা শুরু করে দিয়েছে। দয়া করে আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আমার প্রাপ্য আদায় করে দিন। জুলকিফল তার সাথে সাথে চললেন। চলতে চলতে উপস্থিত হলেন এক বাজারে। তারপর লোকটিকে আর কোথাও খুঁজে পেলেন না। এক বর্ণনায় এসেছে, বাজারে গিয়ে ইবলিস হজরত জুলকিফলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। বললো, যার কাছে আমি টাকা পাই, তাকে তো দেখছি না।

কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, পৃথিবী ত্যাগের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত জুলকিফল তাঁর কৃত অঙ্গীকারের উপর সুদৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। রাতে নামাজ পড়তেন একশত রাকাত। দিনে রাখতেন রোজা। আর বিচার মীমাংসা করতেন যথাযথরূপে, ক্রোধ-বিবর্জিত অবস্থায়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হজরত জুলকিফল ছিলেন নবী। কোরআনের বিবরণ এরকম। কিন্তু তিনি কোন যুগে কোন জনপদে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা জানা যায় না। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত জাকারিয়ার আরেক নাম জুলকিফল। হজরত আবু মুসা বলেছেন, তিনি নবী ছিলেন না, ছিলেন একজন পুণ্যবান।

পরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম; তারা ছিলো সৎকর্মপরায়ণ।' এখানে 'অনুগ্রহভাজন করেছিলাম' কথাটির অর্থ তাদেরকে আমি করেছিলাম আমার নৈকট্যভাজন ও জান্নাতের অধিকারী। আর 'তারা ছিলো সৎকর্মপরায়ণ' কথাটির অর্থ, তারা ছিলো ওই সকল লোকের অন্তর্ভূত, যাদেরকে রক্ষা করা হয় সকল প্রকার বিপথগামিতা ও পাপাচার থেকে।

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○
فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُـنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

❒ এবং স্মরণ কর জুন-নূন এর কথা যখন সে ক্রোধভরে বাহির হইয়া গিয়াছিল এবং মনে করিয়াছিল আমি তাহাকে সংকটে ফেলিব না, অতঃপর সে অন্ধকার হইতে আহ্বান করিয়াছিল, 'তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী।'

❒ তখন আমি তাহার ডাকে সাড়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম দুশ্চিন্তা হইতে এবং এই ভাবেই আমি বিশ্বাসীদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকি।

এখানে 'জুননূন' অর্থ হজরত ইউনুস ইবনে মাত্তা। তিনি বেশ কিছুদিন মাছের পেটে ছিলেন তাঁকে মৎস্যওয়ালাও বলা হয়।

আওফীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস ও জুহাক বলেছেন, হজরত ইউনুস তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবাস করতেন ফিলিস্তিনে। সেখানে বসবাস করতো তাদের বারোটি গোত্র। একবার এক অত্যাচারী রাজা তাদের জনপদের উপরে চড়াও হলো এবং বন্দী করে নিয়ে গেলো তাদের সাড়ে নয়টি গোত্রকে। অবশিষ্ট রইলো আড়াইটি গোত্র। আল্লাহ্ তখন নবী শা'ইয়ার কাছে প্রত্যাদেশ করলেন, তুমি সম্রাট হারকীয়ার কাছে যাও এবং বলো, সে যেনো তার রাজ্যের কোনো একজন শক্তিশালী নবীকে ওই অত্যাচারী রাজার কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর ওই নবী যেনো বলে, বন্দী বনী ইসরাইলদেরকে মুক্ত করে দাও। ওই রাজার অন্তরে আমি বন্দীমুক্তির ধারণা সৃষ্টি করে দেবো। প্রত্যাদেশানুসারে হজরত শা'ইয়া সম্রাটের দরবারে গিয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ জানালো। পাঁচজন নবী ছিলেন তখন তার রাজ্যে। আল্লাহ্র নির্দেশ শুনে সম্রাট হজরত শা'ইয়াকে বললো, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি কী বলেন? কাকে পাঠাবো? হজরত শা'ইয়া বললেন, নবী ইউনুসকে পাঠালেই ভালো হয়। তিনি শক্তিশালী ও আমানতদার। সম্রাট হজরত ইউনুসকে তার দরবারে ডেকে আনলো এবং ফিলিস্তিন গমনের প্রস্তাব উত্থাপন করলো। হজরত ইউনুস বললেন, আল্লাহ্ কি আমাকেই নির্দিষ্ট করে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন? সম্রাট বললো, না। হজরত ইউনুস বললেন, তাহলে আমার

দাবি হচ্ছে, অন্য কোনো শক্তিমান পয়গম্বরকে প্রেরণ করা হোক। কিন্তু দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ হজরত ইউনুসের এ কথা মানলো না। সকলে মিলে তাঁকেই পীড়াপীড়ি করতে লাগলো ফিলিস্তিন গমনের জন্য। হজরত ইউনুস তখন সম্রাট ও পারিষদবর্গের উপরে রাগান্বিত হয়ে অন্য এক অঞ্চলের দিকে যাত্রা করলেন। চলতে চলতে উপস্থিত হলেন এক সমুদ্রের কিনারায়। দেখলেন, যাত্রীবাহী এক নৌকা যাত্রার জন্য অপেক্ষমান। তিনি ওই নৌকায় উঠে বসলেন।

ওরওয়া বিন যোবায়ের, সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং বিদ্বানগণের একটি দলের অভিমত হচ্ছে, হজরত ইউনুস আল্লাহ্র প্রতি অভিমান করে তাঁর জনপদ ছেড়ে অন্যত্র রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর অভিমানের কারণ ছিলো এই— ক্রমাগত তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনকে সত্যধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়ে আসছিলেন। তাদেরকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই বলে, আল্লাহ্র মনোনীত ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের উপরে আপতিত হবে আল্লাহ্র আযাব। কিন্তু তারা তাঁর কথায় ভ্রূক্ষেপ করলো না। তাই যথাসময়ে একদিন দেখা গেলো আযাবের আলামত। ওই আলামত দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা কায়মনোবাক্যে তওবা করলো এবং পরিত্রাণপ্রার্থী হলো। আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করলেন এবং প্রত্যাহার করে নিলেন তাঁর আযাব। এমতো পরিস্থিতিতে হজরত ইউনুসের মনে হলো, এবার হয়তো লোকেরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলবে। একথা ভেবে তিনি তখন লজ্জায় ও অভিমানে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তখন হজরত ইউনুসের সম্প্রদায়ের মধ্যে মিথ্যাবাদীকে হত্যা করার রেওয়াজ ছিলো। তাই হজরত ইউনুসের আশংকা হলো, কথিত আযাব যখন এলো না, তখন লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে হত্যা করে ফেলবে।

এখানে 'মুগাদ্বিবাত' (ক্রোধ) শব্দটি বাবে মুফাইলার শব্দরূপ। শব্দটি এখানে উভয় দিকের সম্পৃক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়নি। বরং ব্যবহৃত হয়েছে 'মুসাফিরাত' এবং 'মুয়াক্বিবাত' এর মতো তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দরূপে। অর্থাৎ এখানে 'মুগাদ্বিবান' কথাটির অর্থ হবে ক্রোধে অথবা ক্রোধভরে।

হাসান বলেছেন, আল্লাহ্ হজরত ইউনুসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মানুষকে সত্য ধর্মে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানাও এবং বলো, এই আমন্ত্রণ গ্রহণ না করলে আল্লাহ্র শাস্তি অনিবার্য। হজরত ইউনুস বললেন, হে আমার প্রভুপালক! যখন তোমার শাস্তি নেমে আসবে, তখন আমাকে যথাপ্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে প্রস্থানের সুযোগ দিয়ো। আল্লাহ্ বললেন, বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রস্থান করতে হবে অতি দ্রুত। হজরত ইউনুস নিবেদন করলেন, আমার যেনো অন্ততঃ

জুতা পরিধানের অবকাশ থাকে। কিন্তু এ অনুমতি তাঁকে দেয়া হলো না। তাই তিনি হলেন অভিমানাহত। এক সময় আল্লাহ্‌র শাস্তির নিদর্শন প্রকাশ পেতে শুরু করলো। অভিমানাহত নবী তখন অতি দ্রুত প্রস্থান করলেন সেখান থেকে। ওহাব বলেছেন, হজরত ইউনুস ছিলেন পুণ্যবান। তাঁর উপরে যখন নবুয়তের ভার অর্পণ করা হলো, তখন তিনি ভয়ে ও আনন্দে হয়ে পড়লেন অভিভূত। এতো বড় বোঝা স্কন্ধে নিয়ে তিনি সুস্থির হতে পারলেন না। তাই আল্লাহ্ তাঁর প্রতি আর উলুল আজম পয়গম্বরের দায়িত্ব প্রদান করলেন না। সেকারণেই আল্লাহ্ রসুল স.কে সম্বোধন করে বলেছেন— আপনি উলুল আজম পয়গম্বরের মতো ধৈর্য অবলম্বন করুন। মৎস্যওয়ালার মতো হবেন না। উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আলোচ্য আয়াতের প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে আমার রসুল! আরো শুনুন মৎস্যওয়ালা জুন্‌নূনের ইতিবৃত্ত, যখন সে ক্রোধভরে তাঁর জনপদ থেকে অন্যত্র গমন করেছিলো।'

এরপর বলা হয়েছে, 'এবং মনে করেছিলো আমি তাকে সংকটে ফেলবো না।' এখানে ক্বদরত্ অর্থ সংকট। অন্য আয়াতেও শব্দটি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'আল্লাহু ইয়াব্‌সুত্বুর রিযক্বা লিমাঁইয়াশাউ ওয়া ইয়াক্বদির (আল্লাহ্ যাকে চান তার রিজিক প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে চান তার রিজিককে করেন সংকীর্ণ)। আতা এবং অধিকাংশ আলেম শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে। কিন্তু মুজাহিদ, জুহাক, কালাবী ও আওফীর বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ক্বদ্‌রুন্' শব্দটির অর্থ আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ হজরত ইউনুসের ধারণা হয়েছিলো, আল্লাহ্ তাঁকে সংকটে ফেলবেন না।' 'তাক্বদীর' এবং 'ক্বদর' শব্দ দু'টো সমার্থক। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'নাহ্‌নু ক্বদ্‌দারনা বাইনা কুমুল মাওতা '(আমি তোমাদের মাঝে মৃত্যুকে নির্ধারণ করেছি)।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ— ইউনুস ভেবেছিলো, আমি হয়তো তাকে বিপদে ফেলবো না। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার বক্তব্যটি গ্রহণ করতে হবে পরোক্ষার্থে। অর্থাৎ এখানে আল্লাহ্ হজরত ইউনুসকে এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন, যে আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষা না করে দেশবাসীদেরকে ছেড়ে অন্যত্র গমন করে এবং ধারণা করে, আল্লাহ্ তাকে সংকটগ্রস্ত করবেন না।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, বাক্যটি প্রশ্নবোধক। কিন্তু এখানকার প্রশ্নচিহ্নপ্রদায়ক অব্যয়টি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য অব্যয়সহ এখানকার প্রশ্নটি হবে একটি অস্বীকৃতি জ্ঞাপক প্রশ্ন। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— ইউনুস কি একথা ভেবে নিয়েছে যে, আমি তার উপরে আমার শক্তি প্রয়োগ করতে পারি?

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'মনে করেছিলো' কথাটি দৃঢ় বিশ্বাসসূচক নয়। বরং এটা ছিলো শয়তানের একটি নেপথ্য প্রভাবজাত ধারণা, যা হজরত ইউনুসের উপরে সাময়িকভাবে ছায়াপাত করেছিলো। বিশ্বাস ও ধারণা নিশ্চয় এক কথা নয়। তাই এখানে 'দৃঢ় বিশ্বাস করেছিলো' না বলে বলা হয়েছে 'ধারণা করেছিলো'।

হাসান বলেছেন, আমি এ বিষয়ে যা জেনেছি তা হচ্ছে, হজরত ইউনুস যখন অভিমানাহত হয়ে অন্যত্র যাত্রা করলেন, তখন শয়তান, আল্লাহ্ এবং তাঁর মাঝে অনড় ব্যবধান রচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করলো। কিন্তু হজরত ইউনুস ছিলেন প্রকৃত অর্থে পুণ্যবান ও উপাসনাপ্রিয়। তাই আল্লাহ্ তাঁকে শয়তানের পরিকল্পনার আওতা থেকে মুক্ত করে প্রবেশ করালেন মাছের উদরে। এভাবে দীর্ঘ চল্লিশ দিন ধরে হজরত ইউনুস মৎস্য-উদরে সময়াতিপাত করতে বাধ্য হলেন। আতা বলেছেন, তিনি মাছের পেটে ছিলেন সাত দিন। কেউ কেউ বলেছেন তিন দিন। এরকমও বলা হয়েছে যে, মাছ তাকে উদরে ধারণ করে নিয়ে গিয়েছিলো ছয় হাজার বছরের দূরত্বে। অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, মাছটি তাঁকে নিয়ে নিমজ্জিত হয়েছিলো পৃথিবীর সপ্তম স্তরের তলদেশ পর্যন্ত। ওই অবস্থায় তিনি আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত করেছিলেন অনুতাপজর্জরিত গভীর, গভীরতর প্রার্থনা।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে অন্ধকার থেকে আহবান করেছিলো, তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, তুমি পবিত্র, মহান! আমিতো সীমালংঘন-কারী।'এখানে 'অন্ধকার' অর্থ রাতের অন্ধকার, সমুদ্রাভ্যন্তরের অন্ধকার অথবা মৎস্য-উদরের তমসা। ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— অপেক্ষমান নৌকায় উঠে বসলেন অভিমানাহত নবী। নৌকা চলতে শুরু করলো। কিন্তু মাঝ দরিয়ায় গিয়ে আর অগ্রসর হতে পারলো না। এক স্থানে ঘুরতে থাকলো চক্রাকারে। যাত্রীরা বললো, নিশ্চয় এ নৌকায় কোনো অপরাধী রয়েছে। নবী বললেন, আমিই অপরাধী। আমাকে তোমরা সমুদ্রে নিক্ষেপ করো। কিন্তু তাঁর একথা কেউ মানলো না। বললো, লটারী করা হোক। তাই করা হলো। লটারীতে উঠলো হজরত ইউনুসের নাম। তখন সকলে মিলে তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিলো। অথবা তিনি নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন উত্তাল তরঙ্গে। মুখব্যাদান করে ছিলো বিশালাকৃতির একটি মাছ। সমুদ্রে পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাছটি তাঁকে গিলে ফেললো।

'তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই; তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী' কথাটির অর্থ— মৎস্য-উদরের ঘোর অন্ধকার থেকে হজরত ইউনুস আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন, হে আমার পরম প্রভুপ্রতিপালক! আমি আমার সত্তার অন্তঃস্থল থেকে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করছি, তুমি ব্যতীত উপাস্য

আর কেউই নেই, তুমি পবিত্রতম, মহানতম। আর আমি? আমিতো তোমার আনুরূপ্যবিহীন মর্যাদাকে লক্ষ্য করে প্রদর্শন করেছি বোধহীনদের মতো অভিমান, ক্ষোভ। নিশ্চয় এটা তোমা প্রদত্ত অধিকারের সীমালংঘন।

সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ ওই মৎস্যকে তখন নির্দেশ দিলেন, ইউনুসকে গলাধঃকরণ করো। কিন্তু সাবধান! তার গাত্রচর্ম ও অস্থিতে যেনো লাগে না কোনো আঁচড় অথবা আঘাত। বলা বাহুল্য, মৎস্য তাই করলো। উদরে আল্লাহ্র নবীকে নিয়ে চলে গেলো অনেক গভীরে। রহস্যময় অন্ধকারে বসে হজরত শুনতে পেলেন চতুর্দিক থেকে ধ্বনিত হচ্ছে তসবীহ্ পাঠের আওয়াজ। বিস্মিত হলেন তিনি। দরিয়ার অচেনা তলদেশে এভাবে মুহুর্মুহু আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছে কারা? প্রত্যাদেশ হলো, এ আওয়াজ সমুদ্রবাসী প্রাণীদের। হজরত ইউনুসও তখন তসবীহ্ পাঠ শুরু করলেন সকলের সঙ্গে। সেখানকার ফেরেশতারা নতুন কণ্ঠের উচ্চারণ শুনে বিস্মিত হলো। বললো, হে আমাদের সৃজয়িতা। আমরা তো পৃথিবীবাসীর মতো ক্ষীণকণ্ঠে তসবীহ্ পাঠ শুনছি সাগরের অতলে। এক বর্ণনায় এসেছে, ফেরেশতারা তখন বললো, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা চেনা কণ্ঠের আওয়াজ শুনছি অচেনা জায়গায়। আল্লাহ্ বললেন, এ হচ্ছে আমার বান্দা ইউনুসের আওয়াজ। সে আমার প্রতি প্রকাশ করেছিলো তার ক্ষোভ-অভিমান। তাই আমি তাকে বন্দী করেছি মৎস্য-উদরে। ফেরেশতারা বললো, এতো তোমার সেই প্রিয়ভাজন দাস, যার অসিলায় প্রতিদিন কিছু লোকের পুণ্যকর্ম তোমার দরবারে উপনীত হতো। আল্লাহ্ বললেন, তোমরা ঠিকই বলেছো। তখন ফেরেশতারা হজরত ইউনুসের পক্ষে সুপারিশ করতে শুরু করলো। মাছের প্রতি প্রত্যাদেশ হলো, ইউনুসকে উগরে দাও। মৎস্য সমুদ্রোপকূলে উপনীত হয়ে উগরে দিলো হজরত ইউনুসকে।

পরের আয়াতে (৮৮) বলা হয়েছে— 'তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা থেকে এবং এভাবেই আমি বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করে থাকি।' একথার অর্থ— আমি তখন আমার প্রিয়ভাজন নবীর প্রার্থনায় সাড়া না দিয়ে পারিনি, যদিও সর্বপ্রকার অপারগতা থেকে আমি চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। আমি তার বিশুদ্ধ প্রার্থনা কবুল করলাম। নির্বাপিত করে দিলাম তার মনোবেদনার আগুন। তার মতো লজ্জা ও অনুতাপানলে দগ্ধীভূত বিশ্বাসীদেরকেও আমি এভাবে পরিত্রাণ দানে ধন্য করে থাকি।

রসুল স. বলেছেন, নবী জুন্নূনের ওই সময়ের দোয়া ছিলো 'লাইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্জলিমীন'। এই দোয়া সহযোগে কেউ যদি তার প্রার্থনা আল্লাহ্র দরবারে পেশ করে, তবে তার সে প্রার্থনা কবুল করা হয়। আহমদ, তিরমিজি, হাকেম। সিহাহ্ পুস্তকসমূহে হাদিসটি এসেছে হজরত সা'দ

ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে। হাকেমের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— রসুল স. একবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ওই দোয়াটির কথা জানাবো, যা পাঠ করলে আল্লাহ্ অবশ্যই দূর করে দেন ওই দোয়া পাঠকারীর মুসিবত? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! অবশ্যই বলুন। তিনি স. বললেন— সেই দোয়াটি হচ্ছে— 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্জলিমীন'। ইবনে জারীরের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— আল্লাহ্র যে নাম উচ্চারণ করলে দোয়া কবুল করা হয় এবং মনোস্কামনা পূর্ণ করা হয়, সেই নাম রয়েছে জুন্নূন নবীর দোয়ায়। আর সে দোয়া হচ্ছে— 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্জলিমীন'। আমি সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে লিখেছি, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর চেয়ে 'লা ইলাহা ইল্লা হুয়া' এবং 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা' দোয়ার মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে। কারণ পরের দোয়া দু'টো নির্দেশ করে চিরঅদৃশ্য এক সত্তাকে। 'আল্লাহ্' নামের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে তাঁর সকল গুণাবলী। কিন্তু 'হুয়া' (তিনি) এবং 'ইল্লা আন্তা' (তুমি ব্যতীত) সর্বনাম দু'টো নির্দেশ করে কেবল জাত বা সত্তাকে। আবার 'তুমি' সম্বোধন 'তিনি' এর চেয়ে অধিকতর পূর্ণ, পরিণত ও যথাযথ।

হজরত ইউনুসকে পয়গম্বর বানানো হয়েছিলো কখনঃ বাগবী লিখেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মৎস্য-উদর থেকে মুক্তি লাভের পর হজরত ইউনুসকে পয়গম্বর করা হয়েছিলো। কেননা সুরা আস্সফ্ফাতে প্রথমে এসেছে— 'ফানাজ্বাইনাহু বিল আ'রায়ি ওয়া হুয়া সাক্বীম' (আমি তাকে পরিত্রাণ দিয়েছিলাম ঝাউ বনের নিকট, আর সে ছিলো পীড়িত), তারপর এসেছে— 'ওয়া আরসালনা ইলা মিয়াতি আলফিন্ আও ইয়াযিদুন' (অতঃপর আমি তাকে একলক্ষ অথবা তার ইপ্সিত সংখ্যকের জন্য প্রেরণ করেছিলাম)। এভাবে প্রমাণিত হয় যেন প্রথমে মৎস্য তাঁকে বেলাভূমিতে উগরে দিয়েছিলো, তারপর এক লক্ষ অথবা ততোধিক মানুষকে হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ তাঁকে দান করেছিলেন নবুয়ত।

আমি বলি, দলিলটি দুর্বল। কেননা দুর্ঘটনার বিবরণের মধ্যবর্তীতে সংযোজক অব্যয় 'ওয়াও' (এবং) ঘটনার ক্রমধারার পরিচায়ক নয়। এখানে শুধু নির্ণয় করা হয়েছে পূর্বাপর সম্পর্কটি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মৎস্যের গিলে ফেলা ও উগরে দেয়ার আগে থেকেই হজরত ইউনুস ছিলেন আল্লাহ্র রসুল। কেননা আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'ওয়া ইন্না ইউনুসা লা মিনাল মুরসালীনা ইজ আবিক্বা ইলাল ফুলকিল মাশহুন' (এবং ইউনুস রসুল ছিলো যখন সে পরিপূর্ণ কিশতির দিকে ধাবিত হলো)।

وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَأَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۚ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝

❒ এবং স্মরণ কর জাকারিয়ার কথা, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নিঃসন্তান রাখিও না, তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

❒ অতঃপর আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তাহার জন্য তাহার স্ত্রীকে করিয়াছিলাম বন্ধ্যাত্বমুক্ত। তাহারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করিত, তাহারা আমাকে ডাকিত আশা ও ভীতির সহিত এবং তাহারা ছিল আমার নিকট বিনীত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আরো শুনুন নবী জাকারিয়ার ইতিকাহিনী। সে তার প্রার্থনায় বলেছিলো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমি তো নিঃসন্তান। আমি চাই, আমার পরলোক গমনের পর আমার সন্তান হোক তোমার মনোনীত ধর্মের একনিষ্ঠ প্রচারক। সুতরাং আমার স্থলাভিষিক্তরূপে আমাকে দান করো এক পুণ্যবান সন্তান। তুমিইতো সকল কিছুর চূড়ান্ত মালিক।

এখানে 'খইরুন ওয়ারিছীন' কথাটির মর্মার্থ— সকল কিছুই ধ্বংসশীল, আর চিরস্থায়ী ও চিরন্তন কেবল আল্লাহ্, যিনি সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বোর্ধ্ব।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তার আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে করেছিলাম বন্ধ্যাত্বমুক্ত।' একথার অর্থ, আমি জাকারিয়ার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলাম। তাঁর বন্ধ্যা স্ত্রীকে করে দিয়েছিলাম সন্তান জন্মদানের উপযোগী। এভাবে আমি তাকে দিয়েছিলাম এক পুণ্যবান পুত্র। তার নাম ছিলো ইয়াহ্ইয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতো, তারা আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতির সঙ্গে এবং তারা ছিলো আমার নিকট বিনীত।' এখানে 'রগাবাত্' অর্থ কামনা। অর্থাৎ আল্লাহ্র সঙ্গে মিলনের, নৈকট্য লাভের, পুণ্যার্জনের, দোয়া কবুল হওয়ার অথবা আনুগত্যের কামনা বা অনুরাগ। হজরত

আনাস থেকে ইমাম আহমদ, নাসাঈ, হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে— নামাজকে আমার জন্য করে দেয়া হয়েছে চোখের শান্তি। আর এখানকার 'খওফুন্' শব্দটির অর্থ ভীতি— আল্লাহ্ থেকে পৃথক হওয়ার, পাপপ্রবণতার শাস্তি অথবা আল্লাহ্র অপ্রসন্নতার।

'তারা ছিলো আমার নিকট বিনীত' কথাটির অর্থ— তারা আমাকে ভয় করে আমার কাছে তাদের প্রার্থনা উপস্থিত করতো। মুজাহিদ বলেছেন, অন্তরের অন্তঃস্থলে অবস্থিত ভয়কে বলে খুশু। শব্দটির বহুবচন 'খশিয়ীন'। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— তারা আমার অতুলনীয় মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারতো। তাই প্রকাশ করতো চরমতম বিনয়। কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— তারা ছিলো বিনয়াবনতার শিখরারোহী।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৯১, ৯২, ৯৩

❐ এবং স্মরণ কর সেই নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর তাহার মধ্যে আমি আমার রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাহার পুত্রকে করিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।

❐ এই যে তোমাদিগের জাতি— ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদিগের প্রতিপালক, অতএব আমার ইবাদত কর।

❐ কিন্তু মানুষ নিজদিগের কার্যকলাপ দ্বারা মতাদর্শ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যানীত হইবে আমার নিকট।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এবার শুনুন ওই কুমারী ও পুতপবিত্রা রমণীর কথা, যে ছিলো নিষ্কলংক। আমি আমার প্রেরিত দূত জিবরাইলের মাধ্যমে তার প্রতি রূহ্ ফুৎকার করে দিয়েছিলাম। ওই ফুৎকারের ফলে মরিয়ম নাম্নী ওই সাধ্বী রমণীর উদর থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলো আমার রসুল ঈসা। এভাবে আমি ঈসা ও তাঁর মাতাকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ওই নিদর্শন ছিলো আমার অপার পরাক্রমের এক বিরল দৃষ্টান্ত। আমিতো সর্বশক্তিধর। আমি মানুষ সৃষ্টি করতে পারি বিনা পিতায় ও বিনা

মাতায়— যেমন আদম। তেমনি বিনা পিতায় কেবল মাতার মাধ্যমে— যেমন ঈসা। এখানে 'মির রূহিনা' (আমার রূহ হতে) কথাটির অর্থ হবে আমার নির্দেশিত রূহ। কিন্তু এখানে হজরত ঈসাকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যেই সরাসরি বলা হয়েছে আমার রূহ্। আর 'রূহ' অর্থ এখানে হজরত ঈসা। অথবা এখানে 'রূহিনা' শব্দটির পূর্বে উহ্য রয়েছে একটি সম্বন্ধ পদ। ওই সম্বন্ধ পদটি সহ কথাটির মর্মার্থ হবে— আমা কর্তৃক প্রেরিত রূহ। অর্থাৎ হজরত জিবরাইল। আর এখানে 'মির রূহিনা' কথাটির 'মিন' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত।

পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'এই যে তোমাদের জাতি, এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার ইবাদত করো।'

এখানে 'উম্মাতান্' অর্থ জাতি। শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে 'উম্মুন্' থেকে। 'উম্মুন' অর্থ ইচ্ছা করা, একই উদ্দেশ্যে ঐকবদ্ধ হওয়া, অথবা একই ধর্মাদর্শের উপরে একত্র হওয়া। এরকম বলা হয়েছে কামুস গ্রন্থে। এভাবে কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সকল দলের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে বলে 'উম্মাত' বা জাতি। এরকম একত্রায়নের নাম ইসলাম বা আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম। উল্লেখ্য যে, সকল যুগে নবী রসুলগণ একই মতাদর্শের উপরেই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের সকলের ধর্মাদর্শ এক। তাই এখানে বলা হয়েছে 'এটা তো একই জাতি'। সুতরাং আল্লাহ্‌র নিকটে তাঁর মনোনীত ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণীয় নয়। অন্য এক আয়াতে বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— 'কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করলে, তার ধর্ম কখনো কবুল করা হবে না।' এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— তোমরা আমার নবী রসুলগণের অনুসরণ করে যে দলগুলো সৃষ্টি করেছো, সে দলগুলো মূলতঃ এক, একই জাতি। আর আমিই তোমাদের স্রষ্টা ও প্রভুপালনকর্তা। অতএব তোমরা কেবল আমার ইবাদত করো।

এর পরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— 'কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা মতাদর্শ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই প্রত্যানীত হবে আমার নিকট।' একথার অর্থ— কিন্তু মানুষ আমার সত্যধর্মের পাশাপাশি নির্মাণ করেছে বহুবিধ বাতিল পথ ও মত। এভাবে তারা হয়ে পড়েছে শতধাবিচ্ছিন্ন। কিন্তু তারা কি জানে না, অবশেষে সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে আমার নিকটে? তখন তো আমি অবশ্যই তাদেরকে যথোপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করবো। আমার মনোনীত ধর্মের অনুসারীদেরকে প্রদান করবো পুরস্কার। আর বাতিল ধর্মাবলম্বীদেরকে দিবো শাস্তি।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ○ وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○ حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ○ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۖ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۖ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ○ لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ۖ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ○

❑ সুতরাং কেহ বিশ্বাসী হইয়া সৎকর্ম করিলে তাহার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হইবে না এবং আমি উহা লিখিয়া রাখি।

❑ ইহা সম্ভব নহে যে, যে-জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি তাহার অধিবাসীবৃন্দ ফিরিয়া আসিবে,

❑ যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং উহারা প্রতি উচ্চভূমি হইতে ছুটিয়া আসিবে।

❑ অমোঘ প্রতিশ্রুতকাল আসন্ন হইলে অবিশ্বাসীদিগের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে, উহারা বলিবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদিগের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, আমরা সীমালংঘনকারীই ছিলাম।'

❑ তোমরা এবং আল্লাহের পরিবর্তে তোমরা যাহাদিগের ইবাদত কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরাই উহাতে প্রবেশ করিবে।

❑ যদি উহারা ইলাহ্-ই হইত তবে উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিত না; উহাদিগের সকলেই উহাতে স্থায়ী হইবে,

❑ সেথায় অংশীবাদীরা করিবে চীৎকার এবং সেথায় উহারা কিছুই শুনিতে পাইবে না;

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সুতরাং কেউ আমার উপর, আমার রসুলের উপর এবং আমার রসুল কর্তৃক প্রবর্তিত শরিয়তের উপর ইমান আনবে,

তাদের পুণ্যকর্ম ও শুভপ্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করা হবে না। আমি আমার পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমল লেখক ফেরেশতাগণের মাধ্যমে তাদের সকল কর্মকাণ্ডের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখি।

পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'এটা সম্ভব নয় যে, যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে।' এখানে 'হারামুন' অর্থ অসম্ভব, যা ধারণা বা কল্পনা করা যায় না। 'আহ্লাকনাহা' অর্থ ধ্বংস করেছি অথবা ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছি। অর্থাৎ যে জনপদের অধিবাসীকে আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরূপে পাই, তাদের সকল সৎকর্ম অবশ্য ধ্বংস করে দেই। অথবা এখানে 'হারামুন' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, ওই জনপদবাসীদের তওবার সুযোগ লাভ অসম্ভব, কিংবা পৃথিবীতে তাদের পুনর্জীবন প্রাপ্তি অসম্ভব, বা শাস্তি প্রদানের জন্য পুনরুত্থান দিবসে তাদের পুনরুত্থিত না হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের অধিবাসীদের পুনর্জীবন প্রাপ্তি, তওবা, ইমান আনার সুযোগ, বিচারের ময়দানে উপস্থিত না হওয়া কোনোটাই সম্ভব নয়।

এখানে 'লা ইয়ারজ্বিউন' কথাটির 'লা' অতিরিক্ত। হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে— যে জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের পৃথিবীতে ফিরে আসা আর সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদেরকে দেখানো হয়েছে শাস্তির ভয় এবং বিশ্বাসীদেরকে প্রচ্ছন্নভাবে দেয়া হয়েছে পুণ্যের অঙ্গীকার।

এর পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে— 'যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তারা প্রতি উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে।' উল্লেখ্য যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ দু'টি দুর্ধর্ষ জনগোষ্ঠীর নাম। কিয়ামতের কিছুদিন পূর্বে তাদেরকে বন্দী অবস্থা থেকে ছেড়ে দেয়া হবে। তখন তারা ভয়ংকর রূপ নিয়ে পঙ্গপালের মতো দলে দলে পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমভূমিতে নেমে আসবে। হজরত নুআস ইবনে সামআনের হাদিসে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে। আমি ওই হাদিসটি সুরা কাহফের তাফসীরে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেছি। আর এখানে 'উচ্চভূমি' কথাটি একারণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা তখন সমভূমিতে নেমে আসবে তাদের পার্বত্য আবাস থেকে।

এখানে 'ওয়া হুম' (এবং তারা) কথাটির 'হুম' (তারা) সর্বনামটি ইয়াজুজ মাজুজের স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, সর্বনামটি এখানে সমভূমির মানুষের স্থলাভিষিক্ত। আর 'ছুটে আসবে' কথাটির অর্থ হবে— মানুষেরা তখন তাদের আপনাপন সমাধিক্ষেত্র থেকে অতিদ্রুত পুনরুত্থিত হবে। মুজাহিদের ক্বেরাতে এখানকার 'হাদাবিন' (উচ্চ ভূমি থেকে) কথাটির স্থলে এসেছে 'ক্বাবরিনা' (কবর)। তার ক্বেরাতকে মান্য করলে কথাটির

অর্থ হবে— কবর থেকে ছুটে আসবে। অন্য এক আয়াতেও এরকম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন— (যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে) তখনই তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে (সুরা ইয়াসিন)।

হজরত হুযায়ফা বিন আসাদ গিফারী বর্ণনা করেছেন, আমরা কয়েকজন নিজেদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা বলছিলাম। এমন সময় রসুল স. সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, কোন প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলে তোমরা? আমরা বললাম, কিয়ামত সম্পর্কে। তিনি স. বললেন, যতদিন পর্যন্ত দশটি নিদর্শনের প্রকাশ না ঘটবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। ওই দশটি নিদর্শন হচ্ছে— ধুম্রকুণ্ডলীর উদ্গীরন, দাজ্জালের আবির্ভাব, দাব্বাতুল আরদ্বের অভ্যুদয়, পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়, রসুল ঈসার অবতরণ, ইয়াজুজ মাজুজের নিষ্ক্রমণ, তিনটি স্থানের ভূমিধস— পূর্বে, পশ্চিমে ও আরব ভূখণ্ডে। সর্বশেষ নিদর্শনটির কথা তিনি স. বললেন এভাবে— ইয়েমেন থেকে বের হবে একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ড, ওই অগ্নিকুণ্ডটি মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে হাশরের প্রান্তরে। এক বর্ণনায় এসেছে, একটি আগুন তখন এডেনের একটি কূপ থেকে বের হয়ে লোকদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশরের ময়দানে। অপর এক বর্ণনায় ওই ঝোড়ো বাতাসকেও রসুল স. দশটি নিদর্শনের মধ্যে গণ্য করেছেন, যা মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করবে সমুদ্রে।

এর পরের আয়াতে (৯৭) বলা হয়েছে— 'অমোঘ প্রতিশ্রুতকাল আসন্ন হলে অবিশ্বাসীদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে'। একথার অর্থ— ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাবের পরে দেখা দিবে কিয়ামতের অন্যান্য আলামত। নির্ধারিত প্রলয় হয়ে পড়বে অত্যাসন্ন। শুরুতেই কিয়ামতের ভয়াবহ রূপ দেখে ভয়ে, আতংকে ও দুশ্চিন্তায় অবিশ্বাসীদের চক্ষু হয়ে যাবে স্থির। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে তারা। হজরত হুযায়ফা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে রসুল স. বলেছেন, ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাবের পর উষ্ট্রশাবক বাহন হিসেবে উপযুক্ত হওয়ার আগেই শুরু হয়ে যাবে মহাপ্রলয়।

এরপর বলা হয়েছে— তারা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, আমরা সীমালংঘনকারীই ছিলাম।' একথার অর্থ— আতংকিত অবিশ্বাসীরা তখন বলবে, হায়, একি দুর্ভোগ! আমরা তো সত্য ধর্ম সম্পর্কে এতোদিন ছিলাম উদাসীন। না, না, আমরা তো ছিলাম আসলে আত্মঅত্যাচারী, সীমালংঘনকারী, স্বেচ্ছাচারী। হঠকারিতা ও উন্নাসিকতার কারণে এক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে আমরা গ্রহণ করেছিলাম বহুতর উপাস্যকে।

এর পরের আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা করো, সেগুলোতো জাহান্নামের ইন্ধন।' একথার অর্থ— হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমরা এবং তোমাদের পরমপূজনীয় প্রতিমাগুলো অবশ্যই হবে জাহান্নামের ইন্ধন। এখানে 'মা তা'বুদূন' (তোমরা যাদের ইবাদত করো) কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে সামেরী কর্তৃক নির্মিত গো-বৎস মূর্তি, দেব-দেবীদের প্রতিমা ইত্যাদি নিষ্প্রাণ বস্তুসমূহকে। উপাস্যরূপে পূজিত সপ্রাণ সৃষ্টিসমূহও একথার অন্তর্ভুক্ত। যেমন—শয়তান, শয়তান প্রভাবিত মানুষ, যেমন ফেরাউন, নমরুদ ইত্যাদি। অর্থাৎ নিষ্প্রাণ প্রতিমা ও তাদের পূজকদেরকে যেমন জাহান্নামের ইন্ধন করা হবে, তেমনি জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে ফেরাউন, নমরুদ ও তাদের অনুসারীদেরকে। এভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা সুবিবেচক, জ্ঞানী, তারা কখনো নিজেদেরকে পূজনীয় বলে দাবি করে না। সুতরাং তারা এখানকার 'তোমরা যাদের উপাসনা করো' কথাটির অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের এবং ফেরেশতামণ্ডলী, যাদেরকে অংশীবাদীরা আল্লাহ্‌র কন্যা বলে বিশ্বাস করতো। উল্লেখ্য যে, একজনের পাপের কারণে অন্যজনকে অভিযুক্ত করা যায় না।

আর এখানকার 'মা তা'বুদুন' এর 'মা' সাধারণ অর্থবোধক। এরকম বলেছেন অধিকাংশ তাফসীরকার ও অভিধানবেত্তাগণ। অর্থাৎ সপ্রাণ ও অপ্রাণ সকলকিছুই কথাটির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং 'তোমরা যাদের ইবাদত করো' কথাটি এখানে বিশেষায়িত হওয়া প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বায়যাবী একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। ইবনে যাবআরী আলোচ্য আয়াত শুনে একবার জিজ্ঞেস করলেন, যে সকল পুণ্যবান ব্যক্তিত্বকে অংশীবাদীরা আল্লাহ্‌জ্ঞানে উপাসনা করে, তারাও কি 'তোমরা যাদের ইবাদত করো, সেগুলোতো জাহান্নামের ইন্ধন' কথাটির অন্তর্ভুক্ত? রসুল স. বললেন, না। আবু দাউদ, ইবনে মুনজির, ইবনে মারদুবিয়া এবং তিবরানীও হাদিসটির বর্ণনাকারী।

'হাসাবু জাহান্নাম' অর্থ জাহান্নামের ইন্ধন বা জ্বালানী, যার দ্বারা জাহান্নামের আগুনকে করা হবে আরো অধিক প্রজ্জ্বলিত। 'হাসাবাহু' অর্থ পাথর বর্ষণ করা হবে। আর 'হাসাবাহু' অর্থ প্রস্তরখণ্ড। এরকম বলেছেন জুহাক। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, ইয়েমেনী ভাষায় হাসাব্‌ অর্থ জ্বালানী কাঠ। ইকরামা বলেছেন, শব্দটি আবিসিনীয়। এর অর্থ— জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত কাষ্ঠখণ্ড। বাগবী বলেছেন, হজরত আলী এখানকার 'হাসাব' শব্দটির অর্থ করেছেন 'হাত্বাব' (ইন্ধন)।

এরপর বলা হয়েছে 'তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে' (আনতুম লাহা ওয়ারিদূন)। এখানকার 'লাহা' শব্দের 'লাম' অক্ষরটি বিশেষত্ব প্রকাশক। তাই 'তোমরা' বলে এখানে বোঝানো হয়েছে মুশরিক জনগোষ্ঠীকে। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— হে মুশরিক জনসাধারণ! তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তোমাদের পূজিত প্রতিমাগুলোকে নিয়ে।

এর পরের আয়াতে (৯৯) বলা হয়েছে— 'যদি তারা ইলাহ্-ই হতো, তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না; তাদের সকলেই তাতে স্থায়ী হবে'। একথার অর্থ অংশীবাদীদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করার পর তাদেরকে তিরস্কার করা হবে এই বলে, দেখো এখন তোমাদের উপাস্যগুলোর অবস্থা। প্রকৃত উপাস্য যদি তারা হতো, তবে এভাবে তারা কখনোই দোজখে প্রবেশ করতো না। এভাবে তাদের সকলকে বানানো হবে দোজখের চিরস্থায়ী অধিবাসী।

এর পরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে— 'সেখানে অংশীবাদীরা করবে চিৎকার এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না।' এখানে 'যাফীর' অর্থ শ্বাসরুদ্ধকর আর্তনাদ বা চিৎকার। ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, দোজখের মধ্যে যারা আর্তনাদ করতে থাকবে তাদেরকে বন্দী করা হবে লোহার সিন্দুকে। তারপর পেরেক মেরে দেয়া হবে ভালো করে। এরপরে সিন্দুকটিকে আরেকটি লোহার মজবুত সিন্দুকের মধ্যে ভরে ফেলা হবে এবং পেরেক মেরে পুনরায় বন্ধ করা হবে সেটিকেও। তখন তাদের মনে হবে আমাকে ছাড়া আর কাউকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ কেউ তখন কারো আর্তনাদ আর শুনতে পাবে না। এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর হজরত ইবনে মাসউদ পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত। বাগবী তাঁর বর্ণনায় লোহার সিন্দুক ও লোহার পেরেকের স্থলে উল্লেখ করেছেন আগুনের সিন্দুক ও আগুনের পেরেকের কথা।

হাকেম প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করো সেগুলোতো জাহান্নামের ইন্ধন' যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন অংশীবাদীরা বললো, উপাসনাতো ঈসা, উযায়ের ও ফেরেশতাদেরও করা হয়। তাহলে কি তারাও দোজখে প্রবেশ করবে? তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ○ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ○ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ○ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ○ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ○ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ○

❒ যাহাদিগের জন্য আমার নিকট হইতে পূর্ব হইতে কল্যাণ নির্ধারিত রহিয়াছে তাহাদিগকে উহা হইতে দূরে রাখা হইবে।

❒ তাহারা উহার ক্ষীণতম শব্দও শুনিবে না এবং সেথায় তাহারা তাহাদিগের মন যাহা চাহে চিরকাল উহা ভোগ করিবে।

❒ মহা ভীতি তাহাদিগকে বিষাদ-ক্লিষ্ট করিবে না এবং ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবে এই বলিয়া, 'এই তোমাদিগের সেই দিন যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।'

❒ সেই দিন আকাশমণ্ডলীকে গুটাইয়া ফেলিব যে ভাবে গুটান হয় লিখিত দফতর; যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিবই।

❒ আমি 'উপদেশের' পর কিতাবে লিখিয়া দিয়াছি যে আমার যোগ্যতাসম্পন্ন দাসগণ পৃথিবীর অধিকারী হইবে।

❒ ইহাতে রহিয়াছে বাণী সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা ইবাদত করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমার নিকট থেকে যাদের জন্য পূর্বাহ্নে নির্ধারিত রয়েছে মর্যাদা, নৈকট্য, উত্তম স্বভাব, সৌভাগ্য, আনুগত্য, জান্নাত ইত্যাকার কল্যাণ, তাদেরকে রাখা হবে দোজখ থেকে অনেক দূরে। জুনায়েদ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সৃষ্টির সূচনালগ্নে যারা আমার কল্যাণ লাভ করেছে, তারা অবশেষে আমার বেলায়েত অথবা নৈকট্য লাভ করে ধন্য হবে এবং তাদেরকে রাখা হবে অসন্তোষ থেকে দূরে।

ইবনে মারদুবিয়া এবং আলমুখতার গ্রন্থে জীয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার আবদুল্লাহ্ ইবনে যাবআরী রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, 'মোহাম্মদ! তুমি কি দাবি করো, 'তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা করো সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন'— এ আয়াত তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। ইবনে যাবআরী বললো, উপাসনা তো চন্দ্র, সূর্য, ফেরেশতা এবং উযায়ের-ঈসারও করা হয়। তবে তারা কি সকলেই আমাদের পূজিত প্রতিমাগুলোর সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ করবে? তখন তার ওই অপকথনকে প্রত্যাখ্যান করে অবতীর্ণ হলো— 'যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব থেকে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে, তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে।'

বাগবী লিখেছেন, একবার কাবাগৃহের প্রাঙ্গণে রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটলো কতিপয় কুরায়েশ গোত্রপতির। রসুল স. এর সঙ্গে কথা বলার জন্য তাদের মধ্য থেকে এগিয়ে এলো নজর বিন হারেছ। তিনি স. তাকে আলোচ্য সুরার ৯৮, ৯৯ ও ১০০ সংখ্যক আয়াত পড়ে শোনালেন। নজর বিন হারেছ নিশ্চুপ হয়ে গেলো। ইত্যবসরে সেখানে উপস্থিত হলো ইবনে যাবআরী। ওলিদ ইবনে মুগীরা তখন রসুল স. এর আবৃত্তিকৃত আয়াত তিনটির উল্লেখ করলো। ইবনে যাবআরী বললো, মোহাম্মদ তুমি কি সত্যি সত্যি এরকম বলেছো? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। ইবনে যাবআরী বললো, ইহুদীরা উযায়েরের, খৃষ্টানেরা ঈসার এবং আইলাহ্ গোত্রের লোকেরা কি ফেরেশতাদের উপাসনা করে না? রসুল স. বললেন, না। তারা তো পূজা করে শয়তানের। একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— 'যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব থেকে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে, তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে।' আর ইবনে যাবআরী সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো— 'মা দ্বরাবুহু লাকা ইল্লা জ্বাদালান্ বালহুম ক্বওমুন খসিমূন' (তারা তার দৃষ্টান্ত আরোপ করছে শুধুমাত্র কলহ করার জন্য। তারাতো কলহপ্রবণ সম্প্রদায়)। ওয়াহেদীও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনা এনেছেন।

উসুলে কিতাবের কোনো কোনো অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে, রসুল স. তখন ইবনে যাবআরীকে বললেন, তোমরা তোমাদের মাতৃভাষা সম্পর্কে কতোই না অজ্ঞ। তোমরা কি একথাও জানো না যে 'তোমরা যাদের ইবাদত করো' বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'মা তা'বুদূন'। আর 'মা' ব্যবহৃত হয় কেবল অচেতন বস্তু সম্পর্কে (ঈসা, উযায়ের ও ফেরেশতা তো অচেতন কোনো সৃষ্টি নয়। সুতরাং জাহান্নামের ইন্ধন তাঁরা হবেন কীভাবে)। হাদিসগ্রন্থসমূহে কিন্তু এরকম বলা হয়নি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'ইন্নাল্লাজীনা' (যাদের জন্য) কথাটির অর্থ হবে 'ইল্লাল্লাজীনা' (তারা ব্যতীত)। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। কারণ ১. আরবী ভাষায় কখনো 'ইন্না' ইসতেসনা (ব্যতিক্রমী) অর্থে আসে না।

২. কোনো কোনো লোক ইসতেসনা মুনফাসিল (বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমী) কে বৈধ বললেও সাধারণভাবে এর ব্যবহার ঘটে যোগাযোগের ক্ষেত্রে। আর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার যে কারণ আমি বর্ণনা করেছি, তা হচ্ছে নিষ্পত্তিমূলক প্রমাণ। সে কারণেই অধিকাংশ আলেম আলোচ্য আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতা থেকে পৃথক বলে গণ্য করেছেন। অবশ্য হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা দ্বারা আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য, পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে হয়। কিন্তু সাধারণ সাহাবীগণের অভিমত এর বিপরীত। ইমাম আবু হানিফার মতে ওই বাক্যই পৃথক বাক্য, যা যতিচিহ্নের পরে নতুন করে শুরু হয় এবং যা বর্ণিত হয় সময়ের ব্যবধানে। আর নাসেখ-মনসুখের (রহিতকারী ও রহিতের) নিয়মও এখানে প্রযোজ্য হবে না। কারণ আলোচ্য আয়াত বিজ্ঞপ্তিমূলক, নির্দেশপ্রকাশক নয়। এক নির্দেশকে রহিত করে তদস্থলে অন্য নির্দেশ আরোপ করা যায়, কিন্তু কোনো বিজ্ঞপ্তিকে অন্য বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রহিত করা যায় না। কেননা এরকম করলে পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিটি হয়ে যায় মিথ্যা।

আবু দাউদ, ইবনে আবী হাতেম ও সা'লাবীর বর্ণনায় এবং ইবনে মারদুবিয়ার তাফসীরে এসেছে, একবার হজরত আলী বক্তৃতা প্রদান করলেন। বক্তৃতার মধ্যে আলোচ্য আয়াত আবৃত্তি করার পর বললেন, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের জন্য পূর্বাহ্নে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে কল্যাণ। হজরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, তালহা, যোবায়ের, সা'দ, আবদুর রহমান বিন আউফ এবং আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্‌ও এ দলের অন্তর্ভূত। বক্তৃতা শেষে নামাজের জন্য ইকামত দেয়া হলো।

পরের আয়াতে (১০২) বলা হয়েছে— 'তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং সেখানে তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে।' একথার অর্থ— যাদের জন্যে পূর্বাহ্নে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে, তারা দোজখ থেকে এতো দূরে থাকবে যে, সেখানকার আর্তনাদ ও কোলাহলের ক্ষীণতম আওয়াজও তারা শুনতে পাবে না। আর সেখানে তাদের মন যা চাইবে, চিরকাল তারা তা-ই সম্ভোগ করতে পারবে। এখানে 'ফীমা' শব্দটিকে 'খলিদূন' শব্দটির পূর্বে ব্যবহার করে ওই সকল জান্নাতবাসীদের বিশেষত্ব ও গুরুত্বকে প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সুফীসাধকগণের মনে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও দীদার ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। তাই জান্নাতেও তাঁরা আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন নৈকট্য ও দর্শনের আনন্দই চিরকাল উপভোগ করতে থাকবেন।

এর পরের আয়াতে (১০৩) বলা হয়েছে— 'মহাভীতি তাদেরকে বিষাদক্লিষ্ট করবে না'। এখানে 'ফাযাউ'ল আক্‌বার' (মহাভীতি) অর্থ কিয়ামতের সময়ের শিঙ্গার শেষ ফুৎকার। হজরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে বাগবী এরকম লিখেছেন। কেননা শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের সময় সকলেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে।

সুতরাং তখন আর কারো ভয়ভীতির অবকাশ থাকবে না। এক আয়াতে সে কথা বলা হয়েছে এভাবে— 'এবং যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হবে' (সুরা যুমার)।

আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাসের 'শেষ ফুৎকার' কথাটির অর্থ হবে ওই ফুৎকার, যা ধ্বনিত হবে পৃথিবীর অন্তিম সময়ে। অর্থাৎ প্রথম ফুৎকার। কেউ কেউ বলেছেন, যে ফুৎকারের ফলে পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হবে, সেই ফুৎকারকেই এখানে বলা হয়েছে মহাভীতি। এই উক্তি ও আমার উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। কেননা শিঙ্গার প্রথম আওয়াজেই সকলে মূর্ছিত হবে ও মৃত্যুবরণ করবে। কুরতুবীও এই অভিমতটিকে সমর্থন করেছেন। এর কারণ হচ্ছে, অধিকাংশ হাদিসে কেবল দু'বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার কথা বলা হয়েছে। একটি ধ্বংসের ফুৎকার, আরেকটি পুনরুত্থানের। ইবনে আরাবী বলেছেন, ফুৎকার দেয়া হবে *তিনটি— ১. মহাভীতির ফুৎকার ২. মৃত্যুর ফুৎকার ৩. পুনরুত্থানের ফুৎকার।* আমি বলি এই অভিমতটিই যথার্থ।

ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে, তিবরানী, আবু ইয়া'লী, বায়হাকী, আবু মুসা মাদিনী, আলী বিন সাঈদ এবং আবু শায়েখ তাঁদের আপন আপন গ্রন্থে এবং আব্দ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় হজরত আবু হোরায়রা থেকে একটি দীর্ঘ হাদিস এসেছে। ওই হাদিসে রয়েছে তিনটি ফুৎকারের কথা— ভীতির, মৃত্যুর ও পুনরুত্থানের। ওই হাদিসে উল্লেখিত 'ফাযাউ' (ভীতি) শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যা আমরা করেছি সুরা আন্ নমলের তাফসীরে।

হাসান বলেছেন, মহাভীতি প্রকাশিত হবে তখন, যখন মানুষকে দোজখের দিকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়া হবে। ইবনে জারীর বলেছেন, মৃত্যুকে যখন জবাই করা হবে এবং যখন ঘোষিত হবে। হে দোজখবাসী, দোজখের মধ্যে তোমরা চিরদিন থাকবে মৃত্যুহীন অবস্থায় তখন দেখা দিবে মহাভীতি। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও জুহাক বলেছেন, কোনো কোনো দোজখীকে নিষ্কৃতি প্রদানের পর যখন দোজখের প্রবেশপথ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হবে, তখনই প্রকাশ পাবে মহাভীতি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে একথা বলে, এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিলো।' একথার অর্থ— জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতের দিকে প্রবেশ করতে শুরু করবে, তখন জান্নাতের দরজায় ফেরেশতারা তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে এবং বলবে, আজ সেই দিন, যে দিন সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো।

এর পরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে — 'সেদিন আকাশমণ্ডলী গুটিয়ে ফেলবো যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দপ্তর।' একথার অর্থ— কিয়ামতের দিন আমি আকাশসমূহকে ভাঁজ করে ফেলবো, যেভাবে লেখার জন্য ভাঁজ করা হয় কাগজকে। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও অধিকাংশ আলেম বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— অনেক লেখার পর যেভাবে কাগজকে ভাঁজ করে রাখা হয়, সেভাবে আমি সেদিন আকাশসমূহকে ভাঁজ করে ফেলবো। এখানে 'সিজিল্লি' অর্থ কাগজ। সুদ্দী বলেছেন, ওই ফেরেশতার নাম সিজিল্লি, যে মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করে। আর এখানকার 'লিলকুতুব' (লিখিত দপ্তর) কথাটির 'লাম' অক্ষরটি একটি বাড়তি সংযোজন। যেমন 'রাদিফা লাকুম' কথাটির 'লাম' অতিরিক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সিজিল্লি ফেরেশতা যেভাবে আমলনামাকে গুটিয়ে নেয়, সেভাবে আমি সেদিন গুটিয়ে নিবো আকাশগুলোকে। এরকমও বলা যায় যে, রসুল স. এর একজন ওহী লেখক সাহাবীর নাম ছিলো সিজিল্লি।

কামুস প্রণেতা লিখেছেন, লিখিত অঙ্গীকারনামাকে বলে কুতুবুস্‌সিজ্‌জিল। এর বহুবচন সাজালাত। আবিসিনীয় ভাষায় সিজিল বলা হয় লেখককে। রসুল স. এর একজন লেখকের নামও ছিলো সিজিল। আর সিজিল একটি ফেরেশতারও নাম, যে হিসাব কিতাব লেখে। এরকমও বলা হয়েছে, যে পাথরের উপরে কিছু লিখে রাখা হয়, সেই পাথরকে বলে সিজল্লুন। আর সাধারণভাবে সকল মুদ্রিত বস্তুকেও সিজিল বলা যায়।

এরপরে বলা হয়েছে— 'যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেই ভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো।' এ কথার অর্থ— যে ভাবে আমি আমার অপার পরাক্রমের নিদর্শনরূপে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সকল কিছু ধ্বংস করার পর আমি সে ভাবেই সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করবো। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় সৃষ্টি আমার মহা পরাক্রমের বেষ্টনীভূত। কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— প্রথমবারের সৃষ্টি যেমন আমার কুদরতের অধীনে প্রকাশিত হয়েছিলো, তেমনিভাবে দ্বিতীয়বারের সৃষ্টিও অন্তর্ভুক্ত হবে আমার মহা সৃজনীশক্তির। অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টি যেহেতু সম্ভব হয়েছে, সেহেতু পরের সৃষ্টি অবশ্যই সম্ভব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দ্বিতীয় সৃষ্টি কি প্রথম সৃষ্টির অনুরূপ হবে, না হবে ভিন্নতর? এমতো প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় সৃষ্টি হবে অবিকল সমআকৃতিবিশিষ্ট ও সমগুণসম্পন্ন। সত্তাগত দিক থেকেও উভয় সৃষ্টি হবে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার ভাষণদানের জন্য দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, হে জনতা! তোমরা খালি গায়ে খালি পায়ে কবর থেকে উঠে আল্লাহ্‌র সকাশে

উপস্থিত হবে। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন— 'যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো।' এরপর তিনি স. বললেন, তখন সর্বপ্রথম পোশাক পরিধান করানো হবে পিতা ইব্রাহিমকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবোই।' একথার অর্থ— প্রতিশ্রুতি পালনকে আমি আমার অবশ্যকর্তব্য বলে নির্ধারণ করেছি, যদিও আমি বাধ্যতা ও ঔচিত্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র। সুতরাং পুণ্যবানদেরকে পুরস্কৃত এবং পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান আমি করবোই।

এর পরের আয়াতে (১০৫) বলা হয়েছে— 'আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন দাসগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে।' হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'যাবুর' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে সকল আসমানী কিতাবকে। আর 'জিক্‌র' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে লওহে মাহ্‌ফুজকে। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আমি লওহে মাহফুজে মুদ্রিত করার পর অবতারিত আসমানী কিতাবসমূহে একথা লিখে দিয়েছি যে, ইমান ও পুণ্যকর্মে যারা যোগ্য, আমার সেই সকল বান্দাকে আমি অধিকারী করবো জান্নাতের জমিনের।

শা'বী বলেছেন, এখানে 'যাবুর' শব্দটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে হজরত দাউদের উপর অবতীর্ণ যবুর কিতাবকে এবং 'জিক্‌র' দ্বারা বুঝানো হয়েছে কোরআন পাককে।

একটি প্রশ্নঃ এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র যোগ্যতাসম্পন্ন দাসগণকে জান্নাতের জমিনের অধিকারী করে দেয়ার কথা। তাহলে গোনাহ্‌গার ইমানদারেরা কি জান্নাতে প্রবেশ করবে না?

উত্তরঃ পাপী বিশ্বাসীরা পাপমোচনের পর পুণ্যবান বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই তখন তাদেরকে মিলিয়ে দেয়া হবে পুণ্যবান বিশ্বাসীদের সঙ্গে জান্নাতে।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ইবাদিয়াস্‌ সলিহূন' (যোগ্যতাসম্পন্ন দাসগণ) বলে বোঝানো হয়েছে উম্মতে মোহাম্মদীকে। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা প্রবেশ করে বলবে, প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির, আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো (সুরা যুমার)। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'আল আরদ্ব' (পৃথিবী) অর্থ 'আরদ্ব মুকাদ্দাসা' বা পবিত্রভূমি। আর 'যোগ্যতাসম্পন্ন দাস' কথাটির অর্থ ওই সকল লোক, পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত অধিকার করার ব্যাপারে যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আল আরদ্ব' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সাম্রাজ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমার যোগ্যতাসম্পন্ন দাসেরা অধিকার করে নিবে কাফেরদের রাজ্য। এটা ছিলো একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী। এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর অর্থ ইসলাম বিজয়ী হবে এবং মুসলমানেরা অধিকার করে নেবে কাফেরদের দেশ। আমি বলি, এখানে 'আল আরদ্ব' কথাটির অর্থ হবে সমগ্র ভূখণ্ড।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মেকদাদ বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, সমগ্র পৃথিবীর সকল গৃহে আল্লাহ্ ইসলামের বাণী পৌঁছাবেন। আর ইসলামের মাধ্যমে সম্মানী ব্যক্তিরা তো সম্মানার্হ হবেই, সম্বলহীনেরাও হবে ইসলামের আভিজাত্যে অলংকৃত। অথবা বাধ্যতামূলকভাবে হলেও অপদস্থতার সঙ্গে সকলকে মেনে নিতে হবে ইসলামের বিজয়কে। হজরত মেকদাদ বলেছেন, আমি বলি, ওই সকল মানুষ হবে আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের অনুসারী।

এর পরের আয়াতে (১০৬) বলা হয়েছে— 'এতে রয়েছে বাণী সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ইবাদত করে।' এ কথার অর্থ— নিশ্চয় এই কোরআনে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার সকল কিছুই জান্নাতে পৌঁছানোর বাণী বা নির্দেশনা, ওই সকল বিশ্বাসীদের জন্য, যারা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্র ইবাদতে সমর্পিত হয়। অর্থাৎ গন্তব্যাভিসারী মুসাফিরদের পাথেয় যেরূপ, জান্নাতের পথযাত্রীদের জন্যও কোরআন সেরূপ অমূল্য অবলম্বন। অথবা 'বালাগান্' (বাণী) শব্দটির অর্থ এখানে— সাফল্যের মাধ্যম। অর্থাৎ এই কোরআনের উপদেশাবলীকে যে বিশ্বাসে ও কর্মে মান্য করে চলবে, সে অবশ্যই পৌঁছে যাবে তার কাংখিত গন্তব্যে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'যারা ইবাদত করে' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ধর্মজ্ঞান সম্পন্ন বিদ্বজ্জনকে। হজরত কা'ব আহ্বার বলেছেন, কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওই সকল উম্মতকে, যারা যথানিয়মে সম্পন্ন করে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ও রমজান মাসের রোজা।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰۤى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرِىْۤ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ○ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ○ وَاِنْ اَدْرِىْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○ قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ○

❒ আমি তো তোমাকে বিশ্ব-জগতের প্রতি কেবল আশিসরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

❐ বল 'আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদিগের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্, সুতরাং তোমরা হইয়া যাও আত্মসমর্পণকারী।'

❐ তবে উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে তুমি বলিও, 'আমি তোমাদিগকে যথাযথভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছি এবং আমি জানি না তোমাদিগকে যে-বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে তাহা আসন্ন না দূরস্থিত।

❐ তিনি জানেন যাহা কথায় ব্যক্ত এবং যাহা তোমরা গোপন কর।

❐ 'আমি জানি না হয়ত এই অবকাশ তোমাদিগের জন্য এক পরীক্ষা এবং জীবনোপভোগ কিছুকালের জন্য।'

❐ রসূল বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি ন্যায়ের সহিত ফয়সালা করিয়া দিও, আমাদিগের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র সাহায্যস্থল তিনিই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রহমাতাল্লিল আ'লামীন (আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল আশিসরূপেই প্রেরণ করেছি)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি তো আপনাকে রহমতরূপে প্রেরণ করেছি জ্বিন ও ইনসানের জন্য। অথবা— আপনিই জগতবাসীদের জন্য রহমতপ্রাপ্তির কারণ বা মাধ্যম, কিংবা— আপনি জ্বিন ও মানুষকে দয়া করতে চান, তাই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি তাদের পথপ্রদর্শক রূপে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাকেম এবং অপরিণতসূত্রে আবু সালেহের মাধ্যমে ইবনে সা'দ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি রহমতের দূত। বোখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে রহমতরূপে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের সম্পৃক্তি রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত 'বাণী' (কোরআন) কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ কোরআন যেহেতু জান্নাতের পাথেয়, সেহেতু যার উপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি অবশ্যই রহমত বা আশিস। এভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, আমার রেসালত মানুষের সৌভাগ্য লাভের কারণ এবং মানুষের ইহ-পরকালকে অর্থবহ করবার মাধ্যম বা নিশ্চয়তা। সুতরাং রহমতরূপী এই অনন্য ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে যারা অস্বীকার করে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করে। রহমত বিতরণ, প্রদান বা বর্ষণের মধ্যে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। তারতম্য ঘটে যায় কেবল গ্রহীতার দিক থেকে, দাতার দিক থেকে নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল পৃথিবীবাসীদের জন্য রসুল স. হচ্ছেন রহমত। তাই পৃথিবীতে পূর্ববর্তী জামানার মতো সর্বগ্রাসী কোনো আযাব আসে না। সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না কোনো

জনপদ, বিকৃত হয় না কারো আকৃতি। এতদসত্ত্বেও দেখা যায়, রসুল স. এর সময় ও পরবর্তীতে কাফেরদের উপরে নেমে এসেছিলো পরাজয়, বন্দিত্ব অথবা নিধনের আযাব। এরকম হওয়ার কারণ হচ্ছে, অবিশ্বাসীরা কিছুতেই রসুল স. এর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় নিতে সম্মত হয়নি। আল্লাহ্‌র এই বিশেষ আশিসকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। সুতরাং এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, রসুল স. বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল পৃথিবীবাসীর জন্য রহমত নন।

পরের আয়াতে (১০৮) বলা হয়েছে; 'বলো, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্, সুতরাং তোমরা হয়ে যাও আত্মসমর্পণকারী।'

কোরআনে কেবল আল্লাহ্‌র একমাত্র উপাস্য হওয়ার কথা বর্ণিত হয় নি, বর্ণিত হয়েছে আরো অনেক কিছু। যেমন— বিভিন্ন বিধান, অতীত যুগের অনেক সম্প্রদায়ের কাহিনী, নবী-রসুলগণের ইতিবৃত্ত, চির স্বস্তি ও চির শাস্তির অঙ্গীকার, বেহেশত-দোজখ, হিসাব-কিতাব ও মহাপ্রলয়ের অনিবার্যতা। আরো বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণাবলী ও কার্যকলাপের প্রসঙ্গ, জ্ঞান ও কর্মের বিভিন্নমুখী আলোচনা, জীবন-মৃত্যুর তত্ত্ব, তথ্য ও নির্দেশনা ইত্যাদি। সুতরাং একথা কীভাবে বলা যেতে পারে যে, কোরআনে কেবল 'তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্' এই কথাটি প্রত্যাদেশ করা হয়? এর জবাবে বলা যায়, প্রত্যাদেশের মূল ভিত্তি হচ্ছে তওহীদ বা আল্লাহ্‌র এককত্ব। অন্যান্য বিষয়াবলী এই তওহীদেরই সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তৃত শাখা প্রশাখা। সুতরাং কোরআনে কেবল তওহীদের প্রত্যাদেশ করা হয়, এমতো উক্তি অসঙ্গত নয়। অথবা এখানকার বক্তব্যটি এরকম— আল্লাহ্‌র ইবাদত বিষয়ক যে প্রত্যাদেশ আমার কাছে আসে, তার মূল মর্ম হচ্ছে— তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য।

একটি প্রশ্নঃ তওহীদই যদি ওহী বা প্রত্যাদেশের মূলমর্ম হয়, তবে রেসালতের প্রয়োজন আর অবশিষ্ট থাকে কীভাবে? তাছাড়া তওহীদের মূলমর্ম জেনে নেয়ার পর প্রত্যাদেশের প্রয়োজনই বা আর থাকে কোথায়?

উত্তরঃ তওহীদের বার্তাতো অবশ্যই প্রচারযোগ্য একটি বিষয়। রেসালত তো ওই প্রচারেরই নাম। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন প্রচার ব্যতিরেকে তওহীদের বাণী মানুষের কাছে কীভাবে পৌছানো সম্ভব? তওহীদের মতো রেসালতও ধর্মের একটি অপরিহার্য ভিত্তি।

'সুতরাং তোমরা হয়ে যাও আত্মসমর্পণকারী।' কথাটির অর্থ তোমরা আল্লাহ্‌কে বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে মান্য করো এবং কেবল তাঁর ইবাদতে রত হও। বাস্তবায়িত করো প্রত্যাদেশের উদ্দেশ্যকে। নিজেকে প্রস্তুত করো আল্লাহ্‌র রহমত লাভের যোগ্য গ্রহীতারূপে।

এর পরের আয়াতে (১০৯) বলা হয়েছে— 'তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে তুমি বোলো আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে সতর্ক করে দিয়েছি।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এভাবে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে পরিপূর্ণরূপে সত্য উদঘাটনের পরেও তারা যদি আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি তাদেরকে বলুন, আমি কিন্তু আমার দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করেছি। সময় থাকতে তোমাদের সকলকে সতর্ক করে দিয়েছি।

'যথাযথরূপে সতর্ক করে দিয়েছি' কথাটির উদ্দেশ্য এখানে— আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশরূপে অবতীর্ণ হয়েছে, তার কোনো কিছুই আমি তোমাদের কাছে গোপন রাখিনি। একথার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট শিয়াদের মতবাদ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তারা বলে, ইমামগণ তাদের বিশিষ্ট সঙ্গীসাথীদেরকে শরিয়তের নির্দেশাদি সঙ্গোপনে শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, দেয়ালেরও কান আছে। অথবা উদ্ধৃত বাক্যের উদ্দেশ্য এরকমও হতে পারে যে, সত্যধর্ম সম্পর্কে যা কিছু আমাকে জানানো হয়েছে, তার সকল কিছু আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি। কিংবা উদ্দেশ্য হতে পারে এরকম— সুস্পষ্টরূপে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি আল্লাহ্‌র আহকাম, কিছুই গোপন করিনি। কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি এই সত্য ধর্মের বচনাবলীকে সুদৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছি। সকল কিছুই উপস্থাপন করেছি দলিল প্রমাণ সহকারে।

এরপরে বলা হয়েছে— 'এবং আমি জানি না তোমাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা আসন্ন না দূরস্থিত।' এ কথার অর্থ— ইসলামের বিজয়, কিয়ামত, হাশর-নশর এ সকল কিছু অবশ্যই সংঘটিত হবে। বিষয়টি নিঃসন্দিগ্ধ। কিন্তু তা কখন সংঘটিত হবে তা আমি তোমাদেরকে জানাতে পারবো না। হয়তো তা অত্যাসন্ন, অথবা দূরবর্তী।

এর পরের আয়াতে (১১০) বলা হয়েছে— 'তিনি জানেন যা কথায় ব্যক্ত এবং যা তোমরা গোপন করো।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ সকলের এবং সকল কিছুর প্রকাশ্য ও গোপন সম্পর্কে সম্যক অবগত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। সুতরাং যথাসময়ে তোমাদের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলরূপে তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারণ করবেন চিরন্তন স্বস্তি, অথবা চিরস্থায়ী শাস্তি। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে বিশুদ্ধচিত্ততা অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে বিশ্বাসীদেরকে এবং হুমকি দেয়া হয়েছে কপট, অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদেরকে।

এর পরের আয়াতে (১১১) বলা হয়েছে— 'আমি জানি না হয়তো এই অবকাশ তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং জীবনোপভোগ কিছুকালের জন্য।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ক্রমাগত সত্যপ্রত্যাখ্যান করে চলেছো। অথচ এখনো তোমরা রয়েছো আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্ত। আমি জানি না তোমাদেরকে এভাবে অবকাশ দেয়া হচ্ছে কেনো। হয়তো এটা তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা। এমতো অবকাশ প্রদানের মাধ্যমে মনে হয় তোমাদেরকে করা হচ্ছে আরো কঠিন শাস্তির উপযুক্ত। কিংবা শাস্তি বিলম্বিত করে তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে সংশোধনের সুযোগ। এখন তোমরা বিশুদ্ধ তওবার মাধ্যমে সত্যধর্মের আশ্রয়ে ফিরে আসবে কি না; তা তোমরা জানো, আমি জানি না। তবে একথাটিও তোমরা ভালো করে জেনে রাখো যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত অবকাশ চিরকালীন নয়। এই জীবনোপভোগ মাত্র কিছুকালের জন্য।

জালালউদ্দিন মাহাল্লী লিখেছেন, এখানকার 'লাআল্লা' কথাটি সর্বত্র ব্যবহৃত হয় আকাংখা প্রকাশের ক্ষেত্রে। ফেত্না বা পরীক্ষার সঙ্গে শব্দটির সম্পৃক্তি অসঙ্গত। তাই এই অসঙ্গতি দূরীকরণার্থে আলোচ্য আয়াত শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, 'মাতাউ'ন ইলা হীন' (এবং জীবনোপভোগ কিছুকালের জন্য)।

সর্বশেষ আয়াতে (১১২) বলা হয়েছে— 'রসুল বলেছিলো, হে আমার প্রতিপালক, তুমি ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা করে দিয়ো, আমাদের প্রতিপালকতো দয়াময়, তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র সাহায্যস্থল তিনিই।' প্রকাশ থাকে যে, ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা করার অর্থ, অবিশ্বাসীদের শাস্তিদান করা এবং বিশ্বাসীদেরকে অত্যাচারিত অবস্থা থেকে মুক্ত করা। এখানে 'আর্রহ্মান' অর্থ দয়াময় বা রহমতবর্ষণকারী। 'আলমুসতাআন' অর্থ ওই সত্তা, যার শরণ প্রার্থনা করা হয়। 'আ'লা মা তাসিফূন' (তোমরা যা বলছো) অর্থ হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়! 'মোহাম্মদের কথা সত্য হলে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করো'— এ ধরনের অপবিত্র ও ভয়াবহ উক্তি যারা করো, অথবা 'আল্লাহ্র সন্তান রয়েছে', 'মোহাম্মদ যাদুকর', 'কোরআন মজীদ কবিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়'— এরকম কথা যারা বলো।

'সে বিষয়ে একমাত্র সাহায্যস্থল তিনিই' কথাটির অর্থ তোমাদের ওই সকল অপবচন থেকে আমি আল্লাহ্র শরণ প্রার্থনা করি। অংশীবাদিতাসম্ভূত ওই সকল উক্তি থেকে আমার প্রভুপালনকর্তা সতত মুক্ত ও পবিত্র। তিনি রহমান, রহীম ও

সাহায্যদাতা। তাই আমি কেবল তাঁরই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি। বলাবাহুল্য যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত রসুল স. এর বিশেষ প্রার্থনা আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছিলেন। রসুল স. ও তাঁর অনুসারীদেরকে কিছুকাল পরে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন বদর প্রান্তরে। ফলে শোচনীয়রূপে পরাজিত হয়েছিলো অংশীবাদীরা। আর মুসলমানেরা পেয়েছিলো কাংখিত বিজয়।

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন। ওয়া সল্লাল্লাহু তায়ালা আ'লা খইরি খলক্বিহি মুহাম্মাদ। সুরা আম্বিয়ার তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ ২৫শে জমাদিউস্ সানি মঙ্গলবার, ১২০৩ হিজরীতে।

সপ্তম খণ্ড শেষ